শরদিন্দু অম্‌নিবাস

শরদিন্দু অম্‌নিবাস

ষষ্ঠ খণ্ড

ছোট গল্প

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রকাশক : ফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রথম সংস্করণ : ১৩৬২
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১৩৭৬
তৃতীয় মুদ্রণ : ১৩৭৭

নিবেদন

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র রচনাবলী কয়েক খণ্ডে শরদিন্দু অমনিবাস নামে প্রকাশিত হচ্ছে।

লেখকের গোয়েন্দা কাহিনী, ঐতিহাসিক উপন্যাস, কিশোরদের জন্য লেখা গল্প, এবং অলৌকিক ও হাস্য-কৌতুকরসের গল্পগুলি যথাক্রমে শরদিন্দু অমনিবাস প্রথম—পঞ্চম খণ্ডে ইতিপূর্বে মুদ্রিত হয়েছে।

ষষ্ঠ খণ্ডে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমুদয় ঐতিহাসিক গল্প ও তেরটি সামাজিক গল্প মিলিয়ে মোট ত্রিশটি গল্প সঙ্কলিত হল।

—প্রকাশক

সূচী

অমিতাভ

যত অসম্ভব কথাই বলি না কেন, যদি একজন বড় পণ্ডিতের নাম সেই সঙ্গে জুড়িয়া দিতে পারি, তবে আর কথাটা কেহ অবিশ্বাস করে না। আমি যদি বলি, আজ রাত্রিতে অন্ধকার পথে একেলা আসিতে আসিতে একটা ভূত দেখিয়াছি, সকলে তৎক্ষণাৎ তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে; বলিবে,—"বেটা গাঁজাখোর, ভেবেছে আমরাও গাঁজা খাই!" কিন্তু স্যর অলিভার লজ যখন কাগজে-কলমে লিখিলেন, একটা নয়, লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি ভূত দিবারাত্রি পৃথিবীময় কিল্‌বিল করিয়া বেড়াইতেছে, তখন সকলেই সেটা খুব আগ্রহ সহকারে পড়িল এবং গাঁজার কথাটা একবারও উচ্চারণ করিল না।

এটা অবিশ্বাসের যুগ—অথচ মানুষকে একটা কথা বিশ্বাস করানো কত সহজ! শুধু একটি পণ্ডিতের নাম—একটি বড়সড় আধুনিক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত,—সেকেলে হইলে চলিবে না এবং দেশী হইলে তো সবই মাটি!

তাই ভাবিতেছি, আমি যে জাতিস্মর এ কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করাইব? কোন্ বিদেশী বৈজ্ঞানিকের নাম করিয়া সন্দেহ-দ্বিধা ভঞ্জন করিব? আমি রেলের কেরানী, বিদ্যা এণ্ট্রান্স্ পর্যন্ত। তের বৎসর একাদিক্রমে চাকরি করিবার পর আজ ছিয়াত্তর টাকা মাসিক বেতন পাইতেছি—আমি জাতিস্মর! হাসির কথা নয় কি?

রেলের পাস পাইয়া যে বৎসর আমি রাজগীরে ভগ্নাবশেষ দেখিতে যাই—ঘন জঙ্গলের মধ্যে প্রাচীন ইষ্টকস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া সেদিন প্রথম আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে কালের যবনিকা সরিয়া গিয়াছিল। যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহা কতদিনের কথা! দু' হাজার বৎসর, না তিন হাজার বৎসর? ঠিক জানি না। কিন্তু মনে হয়, পৃথিবী তখন আরও তরুণ ছিল, আকাশ আরও নীল ছিল, শষ্প আরও শ্যাম ছিল।

আমি জাতিস্মর! ছিয়াত্তর টাকা মাহিনার রেলের কেরানী—জাতিস্মর! উপহাসের কথা—অবিশ্বাসের কথা! কিন্তু তবু আমি বারবার—বোধ হয় বহু শতবার এই ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কখনও দাস হইয়া জন্মিয়াছি, কখনও সম্রাট্ হইয়া সসাগরা পৃথ্বী শাসন করিয়াছি; শত মহিষী, সহস্র বন্দিনী আমার সেবা করিয়াছে। বিদ্যুৎ-শিখার মতো, জ্বলন্ত বহ্নির মতো রূপ লইয়া আজ সেই নারীকুল কোথায় গেল? সে রূপ পৃথিবীতে আর নাই—সে নারীজাতিও আর নাই, ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এখন যাহারা আছে, তাহারা তেলাপোকার মতো অন্ধকারে বাঁচিয়া আছে। তখন নারী ছিল অহির মতো তীব্র দুর্জ্ঞেয়। আরণ্য অশ্বিনীর মতো তাহাদিগকে বশ করিতে হইত।

আর পুরুষ? আরশিতে নিজের মুখ দেখি আর হাসি পায়। সেই আমি—শূরসেন-রাজের দুই কন্যাকে দুই বাহুতে লইয়া দুর্গপ্রাচীর হইতে পরিখার জলে লাফাইয়া পড়িয়া সন্তরণে যমুনা পার হইয়াছিলাম। তার পর—কিন্তু যাক্ সে কথা। কেহ বিশ্বাস করিবে না, কেবল হাসিবে। আমিও হাসি—অফিসে কলম পিষিতে পিষিতে হঠাৎ অট্টহাসি হাসিয়া উঠি।

কিন্তু কথাটা সত্য। এমন বহুবার ঘটিয়াছে। রাজগীরের ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া মনে হইয়াছিল, এ-স্থান আমার চিরপরিচিত; একবার নহে—শত সহস্রবার আমি এইখানে দাঁড়াইয়াছি। কিন্তু তখন এ-স্থান জঙ্গল ও ইষ্টকস্তূপে সমাহিত ছিল না। ঠিক যেখানে আমি দাঁড়াইয়া আছি, তাহার বাঁ দিক্ দিয়া এক সংকীর্ণ দীর্ঘ পথ গিয়াছিল। পথের দুই পাশে ব্যবহারীদের গৃহ ছিল; দূরে ঐ স্থানে মহাধনিক

সুবর্ণদত্তের দারু-নির্মিত প্রাসাদ ছিল। যেদিন রাজগৃহে আগুন লাগে, সেদিন সুবর্ণদত্ত আসবপানে বিবশ হইয়া কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া ঘুমাইতেছিল। তাহার সঙ্গে ছিল চারিজন রূপাজীবা নগরকামিনী। নগর ভস্মীভূত হইবার পর পৌরজন তাহাদের মৃতদেহ কক্ষ হইতে বাহির করিল। দেখা গেল, শ্রেষ্ঠী মরিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার দেহ দগ্ধ হয় নাই—সুসিদ্ধ হইয়াছে মাত্র। কিছুকাল পূর্বে সে বলিদ্বীপ হইতে এক অষ্টোত্তর-সহস্রনাল ইন্দ্রচ্ছন্দা মালা আনিয়াছিল। সেরূপ মুক্তাহার মগধে আর ছিল না। সকলে দেখিল, বণিকের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া আছে সেই ইন্দ্রচ্ছন্দার মুক্তাভস্ম।

কিন্তু ক্রমেই আমি অসংযত হইয়া পড়িতেছি। শূরসেনের সহিত মগধ, অগ্নিদাহের সহিত রাজকন্যা-হরণ মিশাইয়া ফেলিতেছি। এমন করিলে তো চলিবে না।

আসল কথাটা আর একবার বলিয়া লই—আমি জাতিস্মর! মিউজিয়ামে রক্ষিত এক শিলাশিল্প দেখিয়া আমার বুকের ভিতরটা আলোড়িত হইয়া উঠে, কণ্ঠ বাষ্প-রুদ্ধ হইয়া যায়। এ শিল্প তো আমার রচনা! আসমুদ্রকরগ্রাহী সম্রাট্ কণিষ্কের সময় যখন সদ্ধর্মের পুনরুত্থান হইয়াছিল, তখন বিহারের গাত্রশোভার জন্য এ নব-পত্রিকা আমি গড়িয়াছিলাম। তখন আমার নাম ছিল পুণ্ডরীক। আমি ছিলাম প্রধান শিল্পী—রাজভাস্কর। সেই পুণ্ডরীক-জীবনের প্রত্যেক ঘটনা যে আমার স্মরণে মুদ্রিত আছে। এই যে নবপত্রিকার মধ্যবর্তী বিনগ্না যক্ষিণী-মূর্তি দেখিতেছেন, তাহার আদর্শ কে ছিল জানেন? সিতাংশুকা—তক্ষশিলার সর্বপ্রধানা রূপোপজীবিনী, বারমুখ্যা। সকলেই জানিত, সিতাংশুকা রাজ-ঔরসজাতা। সেই সিতাংশুকাকে নিরংশুকা করিয়া, সম্মুখে দাঁড় করাইয়া, বজ্রসূচী দিয়া পাষাণ কাটিয়া কাটিয়া এই যক্ষিণী-মূর্তি গড়িয়াছিলাম। পুণ্ডরীক ভিন্ন এ মূর্তি আর কে গড়িতে পারিত? কিন্তু তবু মনে হয়, সে অপার্থিব লাবণ্য কঠিন প্রস্তরে ফুটে নাই। আজও, এই কেরানী জীবনেও সেই অলৌকিক রূপৈ-শ্বর্য আমার মস্তিষ্কের মধ্যে অঙ্কিত আছে।

আবার কেমন করিয়া বিষ-ধূম দিয়া সিতাংশুকা আমার প্রাণসংহার করিল, সে কথাও ভুলি নাই। সুরম্য কক্ষ, চতুষ্কোণে স্ফটিক-গোলকের মধ্যে পুন্নাগচম্পক-তৈলের সুগন্ধি দীপ জ্বলিতেছে, কেন্দ্রস্থলে বিচিত্র চীনাংশুকে আবৃত পালঙ্কশয্যা, শিয়রে ধূপ জ্বলিতেছে।—সেই ধূপশলাকার গন্ধে ধীরে ধীরে দেহ অবশ হইয়া আসিতেছে। বহুদূর হইতে বাদ্যের করুণ নিক্কণ ইন্দ্রিয়সকলকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করিয়া আনিতেছে; তার পর মোহনিদ্রা—সে নিদ্রা সে জন্মে আর ভাঙিল না।

এমনই কত জীবনের কত বিচ্ছিন্ন ঘটনা, কত অসমাপ্ত কাহিনী স্মৃতির মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। সেই সুদূর অতীতে এমন অনেক জিনিস ছিল—যাহা সেকালের সম্পূর্ণ নিজস্ব, একালের সহিত তাহার সম্বন্ধমাত্র নাই। অতিকায় হস্তীর মতো তাহারা সব লোপ পাইয়াছে। মনে হয় যেন, তখন মানুষ বেশী নিষ্ঠুর ছিল, জীবনের বড় একটা মূল্য ছিল না। অতি তুচ্ছ কারণে একজন আর একজনকে হত্যা করিত এবং সেই জন্যই বোধ করি, মানুষের প্রাণের ভয়ও কম ছিল। আবার মানুষের মধ্যে ক্রূরতা, চাতুরী, কুটিলতা ছিল বটে, কিন্তু ক্ষুদ্রতা ছিল না। একালের মানুষ যেন সব দিক্ দিয়াই ছোট হইয়া গিয়াছে। দেহের, মনের, হৃদয়ধর্মের সে প্রসার আর নাই। যেন মানুষ তখন তরুণ ছিল, এখন বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

আর একটা কথা, একালের মতো স্বাধীনতা কথাটাকে তখন কেহ এত বড় করিয়া দেখিত না। মাছ যেমন জলে বাস করে, মানুষ তেমনই স্বাধীনতার আবহাওয়ায় বাস করিত। স্বাধীনতায় ব্যাঘাত পড়িলে লড়াই করিত, মরিত; বাঘের মতো পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াও পোষ মানিত না। যুগান্তরব্যাপী অধীনতার শৃঙ্খল তখনও মানুষের পায়ে

কাটিয়া বসে নাই, মনের দাসবৃত্তি ছিল না। রাজা ও প্রজার মধ্যে প্রভেদও এত বেশী ছিল না। নির্ভয়ে দীন প্রজা চক্রবর্তী সম্রাটের নিকট আপনার নালিশ জানাইত, অধিকার দাবি করিত, ভয় করিত না।

ঘরের কোণে বসিয়া লিখিতেছি, আর ধূম-কুণ্ডলীর মতো বর্তমান জগৎ আমার সম্মুখ হইতে মিলাইয়া যাইতেছে। আর একটি মায়াময় জগৎ ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বের এক স্বপ্ন দেখিতেছি। এক পুরুষ—ভারত আজ তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছে—তাঁহার কোটিচন্দ্রস্নিগ্ধ মুখপ্রভা এই দুই নশ্বর নয়নে দেখিতেছি, আর অন্তরের অন্তস্তল হইতে আপনি উৎসারিত হইতেছে—

"অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়—"

সেই জ্যোতির্ময় পুরুষকে একদিন দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিয়াছিলাম—তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলাম—আজ সেই কথা জন্মান্তরের স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত করিব।

উত্তরে মাতুলবংশ লিচ্ছবি ও পশ্চিমে মাতুলবংশ কোশল মগধেশ্বর পরমবৈষ্ণব শ্রীমন্মহারাজ অজাতশত্রুকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। পূর্বতন মহারাজ বিম্বিসার শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন, তাই লিচ্ছবি ও কোশলের সহিত বিবাদ না করিয়া তাহাদের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু কিন্তু সে ধাতুর লোক নহেন—বিবাহ করা অপেক্ষা যুদ্ধ করাকে তিনি বেশী পছন্দ করেন। তা ছাড়া, ইচ্ছা থাকিলেও মাতুলবংশে বিবাহ করা সম্ভব নহে। তাই অজাতশত্রু পিতার অপঘাত মৃত্যুর পর প্রফুল্ল মনে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

কিন্তু অসুবিধা এই যে, শত্রু দুই দিকে—উত্তরে এবং পশ্চিমে। উত্তরের শত্রু তাড়াইতে গেলে পশ্চিমের শত্রু রাজ্যের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে; কোশলকে কাশীর পরপারে খেদাইয়া দিয়া ফিরিবার পথে দেখেন, লিচ্ছবিরা রাজগৃহে ঢুকিবার বন্দোবস্ত করিতেছে। মগধরাজ্যের অন্তপাল সামন্ত রাজারা সীমানা রক্ষা করিতে না পারিয়া কেহ রাজধানীতে পলাইয়া আসিতেছে, কেহ বা শত্রুর সহিত মিলিয়া যাইতেছে। রাজ্যে অশান্তির শেষ নাই। প্রজারা কেহই অজাতশত্রুর উপর সন্তুষ্ট নহে; তাহাদের মতে রাজা বীর বটে, কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি অধিক নাই, শীঘ্র ইহাকে সিংহাসন হইতে না সরাইলে রাজ্য ছারেখারে যাইবে।

প্রজারা কিন্তু ভুল বুঝিয়াছিল। অজাতশত্রু নির্বোধ মোটেই ছিলেন না। তাঁহার অসির এবং বুদ্ধির ধার প্রায় সমান তীক্ষ্ণ ছিল।

একদিন, বর্ষাকালের আরম্ভে যুদ্ধ স্থগিত আছে—অজাতশত্রু রাজ্যের মহামাত্য বর্ষকারকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। নগরের নির্জন স্থানে বেণুবন নামে এক উদ্যান আছে; বিম্বিসার ইহা বুদ্ধদেবকে দান করিয়াছিলেন, কিন্তু অজাতশত্রু আবার উহা কাড়িয়া লন। সেই উদ্যানে প্রাচীন মন্ত্রী ও নবীন মহারাজের মধ্যে অতি গোপনে কি কথাবার্তা হইল। সে সময় গুপ্তচরের ভয় বড় বেশী; সন্ন্যাসী, ভিক্ষুক, জ্যোতিষী, বারবনিতা, নট, কুশীলব, ইহাদের মধ্যে কে গুপ্তচর কে নহে, অনুমান করা অতিশয় কঠিন। সম্প্রতি নগরে বৈশালী হইতে জঘনচপলা নাম্নী এক বারাঙ্গনা আসিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া সমস্ত নাগরিক তো ভুলিয়াছেই, এমন কি স্বয়ং রাজা পর্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু জঘনচপলা কোশল কিংবা বৃজির গুপ্তচর কি না, নিশ্চিতরূপে না-জানা পর্যন্ত অজাতশত্রু নিজেকে কঠিন শাসনে রাখিয়াছেন। এইরূপ চর

সর্বত্রই ঘুরিতেছে; তাই গূঢ়তম মন্ত্রণা খুব সাবধান হইয়াই করিতে হয়। এমন কি, সকল সময় অন্যান্য অমাত্যদের পর্যন্ত সকল কথা জানানো হয় না।

নিভৃতে বহুক্ষণ আলাপের পর মহামন্ত্রী গৃহে ফিরিয়া গেলেন। উদ্যানের প্রতিহারী দেখিল, বৃদ্ধের শুষ্ক নীরস মুখে হাসি এবং নির্বাপিত চক্ষুতে জ্যোতি ফুটিয়াছে।

১

প্রহর রাত্রি অতীত হইবার পর আহারান্তে শয়ন করিয়াছিলাম, ঈষৎ নিদ্রাকর্ষণও হইয়াছিল। এমন সময় দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, "পরিব্রাজিকা সাক্ষাৎ চান।"

তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। চকিতে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "পরিব্রাজিকা? এত রাত্রে?"

এই রাজ-সম্মানিতা মহাশক্তিশালিনী নারী কি প্রয়োজনে এরূপ সময়ে আমার সাক্ষাৎপ্রার্থিনী, জানিবার জন্য ত্বরিতপদে দ্বারে উপস্থিত হইলাম। সসম্ভ্রমে তাঁহাকে গৃহের ভিতর আনিয়া আসনে বসাইয়া দন্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিলাম, "দেবী, কি জন্য দাসের প্রতি কৃপা হইয়াছে?"

পরিব্রাজিকার যৌবন উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু মুখশ্রী এখনও সুন্দর ও সম্ভ্রম-উৎপাদক। তাঁহার পরিধানে পট্টবস্ত্র, ললাটে কুঙ্কুমতিলক, হস্তে একটি সনাল পদ্ম-কোরক। সহাস্যে বলিলেন, "বৎস্য, অদ্য সন্ধ্যার পর কমলকোরক দিয়া কুমারীর পূজা করিতেছিলাম, সহসা এই কোরকটি কুমারীর চরণ হইতে আমার ক্রোড়ে পতিত হইল।"

কথার উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আমি শুধু বলিলাম, "তার পর?"

পরিব্রাজিকা বলিলেন, "কুমারীর আদেশ বুঝিতে না পারিয়া ধ্যানস্থ হইলাম। তখন দেবী আমার কর্ণে বলিলেন, 'এই নির্মাল্য শ্রেণিনায়ক কুমারদত্তকে দিবে। ইহার বলে সে সর্বত্র গতিলাভ করিবে'।"

আমি হতবুদ্ধির মতো পরিব্রাজিকার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলাম।

তিনি কক্ষের চতুর্দিকে ক্ষিপ্র দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "এই কোরক লও, ইহাতেই উপদেশ আছে। কার্যসিদ্ধি হইলে ইহার বিনাশ করিও। মনে রাখিও, ইহার বলে রাজমন্দিরেও তোমার গতি অব্যাহত হইবে।"

এই বলিয়া পদ্মকলিটি আমার হস্তে দিয়া পরিব্রাজিকা বিদায় লইলেন। আমি নির্বোধের মতো বসিয়া রহিলাম, তাঁহাকে প্রণাম করিতেও ভুলিয়া গেলাম।

আমি সামান্য ব্যক্তি—কুলী-মজুর খাটাইয়া খাই, রাজগৃহের স্থপতি-সূত্রধার-সম্প্রদায়ের শ্রেণিনায়ক। আমার উপর রাজ-রাজড়ার দৃষ্টি পড়িল কেন? যদি বা পড়িল, তবে এমন রহস্যময় ভাবে পড়িল কেন? রাজ-অবরোধের পরিব্রাজিকা আমার মতো দীনের কুটীরে পদধূলি দিলেন কি জন্য? কুমারী কুমারদত্তের উপর সদয় হইয়া তাহার সর্বত্র গতিবিধির ব্যবস্থাই বা করিয়া দিলেন কেন? এখন এই পদ্মকলি লইয়া কি করিব? কার্যসিদ্ধি হইলে ইহাকে বিনষ্ট করিতেই বা হইবে কেন? আমি পূর্বে কখনও রাজকীয় ব্যাপারে লিপ্ত হই নাই, তাই নানা চিন্তায় মন একেবারে দিশাহারা হইয়া গেল।

দ্বিপ্রহর রাত্রি প্রায় উত্তীর্ণ হইতে চলিল। দাসী দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া আছে। তাহার বোধ করি, আজ কোথাও অভিসার আছে, কারণ বেশ-ভূষায় একটু শিল্প-চাতুর্য রহিয়াছে। কবরীতে জাতিপুষ্পের শোভা, কঞ্চুলী দৃঢ়বন্ধ! দাসী দেখিতে মন্দ নহে, চোখ দুটি বড় বড়, মুখে মিষ্ট হাসি, তার উপর ভরা যৌবন। আমি তাহাকে

বলিলাম, "বনলতিকে, তুমি গৃহে যাও, রাত্রি অধিক হইয়াছে।" সে হাসিমুখে প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

পদ্মকোরক হস্তে শয়ন-মন্দিরে গেলাম; বর্তিকার সম্মুখে ধরিয়া বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিলাম। কোরকটি মুদিত হইয়া আছে, ধীরে ধীরে পলাশগুলি উন্মোচন করিয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে নাভির সমীপবর্তী কোমল পল্লবে অস্পষ্ট চিহ্ন-সকল চোখে পড়িল। সযত্নে পল্লবটি ছিঁড়িয়া দেখিলাম, কজ্জলমসী দিয়া লিখিত লিপি—'অদ্য মধ্যরাত্রে একাকী মহামন্ত্রীর দ্বারে উপস্থিত হইবে। সংকেত-মন্ত্র—কুট্‌মল।' লিপির নিম্নে মগধেশ্বরের মুদ্রা।

এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হইল। পরিব্রাজিকার নিগূঢ় কথাবার্তা, কুমারীর পূজা সমস্তই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। গোপনে মহামাত্যের নিকট আমার তলব হইয়াছে। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে ডাকিয়া পাঠাইলেই তো হইত! আকাশ-পাতাল ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আমি একজন অতি সামান্য নাগরিক, আমাকে লইয়া রাজ্যের মহামাত্য কি করিবেন? বুড়া অত্যন্ত খিট্‌খিটে, কি জানি যদি না-জানিয়া কোনও অপরাধ করিয়া থাকি তবে হয়তো শূলে চড়াইয়া দিবে। কিংবা কে বলিতে পারে, হয়তো গোপনে কোথাও রত্নাগার নির্মাণ করিতে হইবে, তাই এই সতর্ক আহ্বান।

উদ্বেগ, আশঙ্কা এবং উত্তেজনায় আরও কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। কিন্তু রাজাদেশ উপেক্ষা করিবার উপায় নাই,—স্বেচ্ছায় না যাইলে হয়তো বাঁধিয়া লইয়া যাইবে। তাই অবশেষে উত্তরীয় লইয়া পথে বাহির হইলাম।

আমার গৃহ নগরের উত্তরে, মহামন্ত্রীর প্রাসাদ নগরের কেন্দ্রস্থলে। পথ জনহীন, পথের উভয় পার্শ্বস্থ গৃহগুলিও নির্বাপিতদীপ, নিদ্রিত। দূরে দূরে সংকীর্ণ পথি-পার্শ্বে পাষাণ-বনদেবীর হস্তে স্ফটিকের দীপ জ্বলিতেছে। তাহাতে মধ্যরাত্রের গাঢ় অন্ধকার ঈষৎ আলোকিত।

মহামাত্যের বৃহৎ প্রাসাদ-সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। বাহিরে অন্ধকার, প্রহরীও নাই; কিন্তু বহির্দ্বার উন্মুক্ত। একটু ইতস্ততঃ করিয়া, সাহসে ভর করিয়া প্রবেশ করিতে গেলাম—অমনি তীক্ষ্ন ভল্লের অগ্রভাগ কণ্ঠে ফুটিল; অন্ধকারে অদৃশ্য থাকিয়া ভল্লের অন্যপ্রান্ত হইতে কে নিম্নস্বরে প্রশ্ন করিল, "তুমি কে?"

অকস্মাৎ এরূপভাবে আক্রান্ত হইয়া বাক্‌রোধ হইয়া গেল। বর্শার ফলা কণ্ঠ স্পর্শ করিয়া আছে, একটু চাপ দিলেই সর্বনাশ! আমি মূর্তির মতো ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে সেই সনাল পদ্মকলি তুলিয়া ধরিয়া দেখাইলাম।

আততায়ী জিজ্ঞাসা করিল, "উহা কি, নাম বল।"

বলিলাম, "সনাল উৎপল।"

সন্দিগ্ধকণ্ঠে পুনরায় প্রশ্ন হইল, "কি নাম বলিলে?"

বুঝিলাম, এ প্রহরী। লিপিতে যে সংকেত-মন্ত্র ছিল তাহা স্মরণ হইল, বলিলাম, "কুট্‌মল।"

বর্শা কণ্ঠ হইতে অপসৃত হইল। অন্ধকারে প্রহরী আমার হাত ধরিয়া প্রাসাদের মধ্যে লইয়া চলিল।

সূচীভেদ্য অন্ধকারে কিছুদূর পর্যন্ত সে আমাকে লইয়া গেল। তারপর আর একজন আসিয়া হাত ধরিল। সে আরও কিছুদূর লইয়া গিয়া অন্য এক হস্তে সমর্পণ করিল। এইরূপে পাঁচ ছয় জন দ্বারী, প্রহরী, প্রতিহারীর হস্ত হইতে হস্তান্তরিত হইয়া অবশেষে এক আলোকিত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলাম।

সেই কক্ষের মধ্যস্থলে অজিনাসনে বসিয়া একস্তূপ ভূর্জপত্র-তালপত্র সম্মুখে লইয়া বৃদ্ধ মহামন্ত্রী নিবিষ্ট-মনে পাঠ করিতেছেন। কক্ষে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই।

সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলাম। মহামাত্য সম্মুখে আসন নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "উপবিষ্ট হও।"

আমি উপবেশন করিলাম।

মহামাত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরিব্রাজিকার হস্তে যে লিপি পাইয়াছিলে, উহা কোথায়?"

পদ্মদল বাহির করিয়া মহামাত্যকে দিলাম। তিনি সেটার উপর একবার চক্ষু বুলাইয়া আমাকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "ভক্ষণ কর।"

কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার মুখের প্রতি মূঢ়বৎ তাকাইয়া রহিলাম। ভক্ষণ করিব আবার কি?

মহামন্ত্রী আবার বলিলেন, "এই লিপি ভক্ষণ কর।"

মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরে ডাকাইয়া পাঠাইয়া তার পর অকারণে লিপি ভক্ষণ করিতে বলা, এ কিরূপ ব্যবহার? হউন না তিনি রাজমন্ত্রী—তাই বলিয়া—

মন্ত্রীর ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ কুঞ্চন দেখা গেল। আবার অনুচ্চ কণ্ঠে কহিলেন, "চারিদিকে গুপ্তচর ঘুরিতেছে—তাই এ সতর্কতা। লিপি সুস্বাদু বলিয়া তোমাকে উহা খাইতে বলি নাই।"

তখন ব্যাপার বুঝিয়া সেই কোমল পদ্মপল্লবটি খাইয়া ফেলিলাম।

তারপর কিছুক্ষণ সমস্ত নীরব। মহামাত্যের শীর্ণ মুখ ভাবলেশহীন। প্রদীপের শিখা নিষ্কম্পভাবে জ্বলিতেছে। আমি উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি, এবার কি হইবে?

হঠাৎ প্রশ্ন হইল, "তুমি জঘনচপলার গৃহে যাতায়াত কর?"

অতর্কিত প্রশ্নে ক্ষণকালের জন্য বিমূঢ় হইয়া গেলাম। জঘনচপলা বেশ্যা, তাহার গৃহে যাই কি না সে সংবাদে রাজমন্ত্রীর কি প্রয়োজন? কিন্তু অস্বীকার করিবার উপায় নাই, বুড়া খোঁজ না লইয়া জিজ্ঞাসা করিবার পাত্র নহে। কুণ্ঠিতস্বরে কহিলাম, "এক-বার মাত্র গিয়াছিলাম। কিন্তু সে স্থান আমার মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তির নয়। তাই আর যাই নাই।"

মন্ত্রী বলিলেন, "ভালো করিয়াছ। সে লিচ্ছবির গুপ্তচর।"

আবার কিছুক্ষণ সমস্ত নিস্তব্ধ। মহামাত্য ধ্যানমগ্নের মতো বসিয়া আছেন; আমি আর একটি প্রশ্নের বজ্রাঘাত প্রতীক্ষা করিতেছি।

"তোমার অধীনে কত কর্মিক আছে?"

"সর্বসুদ্ধ প্রায় দশ সহস্র।"

"স্থপতি কত?"

"ছয় হাজার।"

"সূত্রধার?"

"তিন হাজারের কিছু উপর।"

"তক্ষক ও ভাস্কর?"

"তক্ষক-ভাস্করের সংখ্যা কম—পাঁচশতের অধিক নহে।"

দেখিতে দেখিতে মহামন্ত্রীর নির্জীব শুষ্ক দেহ যেন মন্ত্রবলে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। নিষ্প্রভ চক্ষুতে যৌবনের জ্যোতি সঞ্চারিত হইল। তিনি আমার দিকে তর্জনী তুলিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "শুন। এখন বর্ষাকাল। শরৎকাল আসিলে পথঘাট

শুকাইলে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। দুই দিক্ হইতে শত্রুর আক্রমণে দেশ বিধ্বস্ত হইয়া উঠিয়াছে। অতএব এবার যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে ভাগীরথী ও হিরণ্যবাহুর সংগমে এক ঔদক দুর্গ নির্মাণ করিতে হইবে। এমন দুর্গ নির্মাণ করিতে হইবে—যাহাতে পঞ্চাশ হাজার যোদ্ধা নিত্য বাস করিতে পারে। মধ্যে মাত্র তিন মাস সময়। এই তিন মাসের মধ্যে দুর্গ সম্পূর্ণ হওয়া চাই। এবার শরৎকালে কোশল ও বৃজি যখন নদী পার হইতে আসিবে, তখন সম্মুখে যেন মগধের গগনলেহী দুর্গচূড়া দেখিতে পায়।"

জলের মৎস্য ধীবরের জাল হইতে জলে ফিরিয়া আসিলে যেরূপ আনন্দিত হয়, আমারও সেইরূপ আনন্দ হইল। এই সকল কথা আমি বুঝি। বলিলাম, "দশ হাজার লোক দিয়া তিন মাসের মধ্যে এরূপ দুর্গ তৈয়ার করিয়া দিতে পারি। কিন্তু এই বর্ষাকালে পথ অতিশয় দুর্গম; মালমসলা সংগ্রহ হইবে না।"

মন্ত্রী বলিলেন, "সে ভার তোমার নয়। তুমি শুধু দুর্গ তৈয়ার করিয়া দিবে। উপাদান সংগ্রহ আমি করিব। রাজ্যের সমস্ত রণহস্তী পাষাণাদি বহন করিয়া দিবে। সেজন্য তোমার চিন্তা নাই।"

আমি বলিলাম, "তবে তিন মাসের মধ্যে দুর্গ তৈয়ার করিয়া দিব।"

মন্ত্রী বলিলেন, "যদি না পার?"

"আমার মুণ্ড শর্ত রহিল। কবে কার্য আরম্ভ করিব?"

মন্ত্রী ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "এখনও রবি স্থিররাশিতে আছেন; আজ হইতে চতুর্থ দিবসে গুরুবাসরে চন্দ্রও স্বাতীনক্ষত্রে গমন করিবেন। অতএব সেই দিনই কার্যের পত্তন হওয়া চাই।"

"যথা আজ্ঞা, তাহাই হইবে।"

কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া মহামাত্য বলিতে লাগিলেন, "এখন যাহা বলিতেছি, মনোযোগ দিয়া শুন। তোমার উপর অত্যন্ত গূঢ় কার্যের ভার অর্পিত হইতেছে। সর্বদা স্মরণ রাখিও যে শত্রুরাজ্যে দুর্গনির্মাণের সংবাদ পৌঁছিলে তাহারা কিছুতেই দুর্গ নির্মাণ করিতে দিবে না, পদে পদে বাধা দিবে। চারিদিকে গুপ্তচর ঘুরিতেছে, তাহারা যদি একবার মগধের উদ্দেশ্য জানিতে পারে, সপ্তাহকালমধ্যে কোশলের মহারাজ ও লিচ্ছবির কুলপতিগণ এ সংবাদ বিদিত হইবে। সুতরাং নিরতিশয় সতর্কতার প্রয়োজন। তুমি তোমার দশ সহস্র কর্মিক লইয়া কাল গঙ্গা-শোণ সংগমে যাত্রা করিবে। এমন ভাবে যাত্রা করিবে—যাহাতে কাহারও সন্দেহ উদ্রিক্ত না হয়। একবার যথাস্থানে পৌঁছিতে পারিলে আর কোনও ভয় নাই। কারণ, সে স্থান জঙ্গলপূর্ণ, প্রায় জনহীন। কিন্তু তৎপূর্বে পথে যদি কোনও ব্যক্তিকে গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে হত্যা করিতে দ্বিধা করিবে না। কার্যস্থলে উপস্থিত হইয়া মগধের মুদ্রাঙ্কিত পত্রের প্রতীক্ষা করিবে। সেই পত্রে দুর্গনির্মাণের নির্দেশ ও চিত্র লিপিবদ্ধ থাকিবে। যথাসময়ে চিত্রানুরূপ দুর্গের শুভারম্ভ করিবে। স্মরণ রাখিও, তুমি এ কার্যের নিয়ামক, কোনও বিঘ্ন ঘটিলে দায়িত্ব সম্পূর্ণ তোমার।"

আমি বলিলাম, "যথা আজ্ঞা। কিন্তু এই দশ সহস্র লোকের রসদ কোথায় পাইব?"

মন্ত্রী বলিলেন, "গঙ্গা-শোণ-সংগমের নিকট পাটলি নামে এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এক সন্ধ্যার জন্য সেই গ্রামে আতিথ্য স্বীকার করিবে। দ্বিতীয় দিনে আমি তোমাদের উপযুক্ত আহার্য পাঠাইব।"

তারপর ঊষাকাল সমাগত দেখিয়া মহামাত্য আমাকে বিদায় দিলেন। বিদায়কালে বলিলেন, "শুনিয়া থাকিবে, সম্প্রতি বৌদ্ধ নামে এক নাস্তিক ধর্ম-সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। এই বৌদ্ধগণ অতি চতুর ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের বিরোধী। শাক্যবংশের এক রাজ্যভ্রষ্ট

যুবরাজ ইহাদের নায়ক। এই যুবরাজ অতিশয় ধূর্ত, কপটী ও পরস্বলুব্ধ। মায়াজাল বিস্তার করিয়া গতাসু মগধেশ্বর বিম্বিসারকে বশীভূত করিয়া মগধে স্বীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিল; অধুনা অজাতশত্রু কর্তৃক মগধ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। এই বৌদ্ধদিগকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না, ইহারা মগধের ঘোর শত্রু। দুর্গসান্নিধানে যদি ইহাদের দেখিতে পাও, নির্দয়ভাবে হত্যা করিও।"

তাই ভাবি, কালের কি কুটিল গতি! আড়াই হাজার বৎসর পরে আজ পাটলিপুত্র-রচয়িতা মগধের পরাক্রান্ত মহামন্ত্রী বর্ষকারের নাম কেহ শুনিয়াছে কি? কিন্তু শাক্যবংশের সেই রাজ্যভ্রষ্ট যুবরাজ? আজ অর্ধেক এশিয়া তাঁহার নাম জপ করিতেছে। সসাগরা পৃথ্বীকে যাহারা বারবনিতার ন্যায় উপভোগ করিয়াছিল, তাহাদের নাম সেই ভুক্তা ধরিত্রীর ধূলিকণার সহিত মিশাইয়া গিয়াছে; আর যে নিঃসম্বল রাজ-ভিখারীর একমাত্র সম্পদ ছিল নির্বাণ, সেই শাক্যসিংহের নাম অনির্বাণ শিখার ন্যায় তমসান্ধ মানবকে জ্যোতির পথ নির্দেশ

বর্ষাকালে স্থপতি-সূত্রধার-সম্প্রদায় প্রায়শঃ বসিয়া থাকে। তাই আমার শ্রেণীভুক্ত শ্রমিকদিগকে সংগ্রহ করিতে বড় বিলম্ব হইল না। যথাসময় আমার দশ হাজার শিল্পী নগরের ভিন্ন ভিন্ন তোরণ দিয়া বাহির হইয়া গেল। কোনও পথে দুই শত, কোনও পথে চারি শত বাহির হইল—যাহাতে নাগরিক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে। বেলা প্রায় তিন প্রহরকালে নগরের উত্তরে তিন ক্রোশ দূরে সকলে সমবেত হইল।

এখান হইতে গঙ্গা-শোণ-সংগম প্রায় পঞ্চদশ ক্রোশ, ন্যূনাধিক এক দিনের পথ। পরামর্শের পর স্থির হইল যে, সন্ধ্যা পর্যন্ত যতদূর সম্ভব যাইব, তারপর পথিপার্শ্বে রাত্রি কাটাইয়া পরাহে অতিপ্রত্যূষে আবার গন্তব্যস্থানের উদ্দেশে যাত্রা করিব। তাহা হইলে মধ্যাহ্নের পূর্বে পাটলিগ্রামে পেঁাছিতে পারা যাইবে।

তখন সকলে যুদ্ধগামী পদাতিক সৈন্যের মতো শ্রেণীবদ্ধভাবে চলিতে আরম্ভ করিল। আকাশে প্রবল মেঘাড়ম্বর, শীতল বায়ু খরভাবে বহিতেছে; রাত্রিতে নিশ্চয় বৃষ্টি হইবে। কিন্তু সেজন্য কাহারও উদ্বেগ নাই। আসন্ন কর্মের উল্লাসে সকলে মহা-নন্দে গান গাহিতে গাহিতে চলিল।

মগধরাজ্যের স্থানীয় বলিয়া তখন রাজগৃহ হইতে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম চতুর্দিকে বিভিন্ন রাজ্যে যাইবার পথ ছিল। তদ্ভিন্ন নগর হইতে নগরান্তরে যাইবার পথও ছিল। রাজকোষ হইতে পথের জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় করা হইত। আবশ্যক হিসাবে পথের উপর প্রস্তরখন্ড বিছাইয়া পথ পাকা করা হইত, পথিকের সুবিধার জন্য পথের ধারে কূপ খনন করানো হইত, ছায়া করিবার জন্য দুই ধারে বট, অশ্বত্থ, শাল্মলী বৃক্ষ রোপিত হইত। মধ্যে নদী পড়িলে সেতু বা খেয়ার বন্দোবস্ত থাকিত।

এই সকল পথে দলবদ্ধ বৈদেশিক বণিক্‌গণ অশ্ব, গর্দভ ও উষ্ট্রপৃষ্ঠে মহার্ঘ পণ্যভার বহন করিয়া নগরে নগরে ক্রয়-বিক্রয় করিয়া বেড়াইত; নট-কুশীলব সম্প্রদায় আপন আপন কলা-নৈপুণ্য দেখাইয়া ফিরিত। রাজদূত দ্রুতগামী অশ্বে চড়িয়া বায়ু-বেগে গোপনবার্তা বহন করিয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইত। কদাচ রাত্রিকালে এই সকল পথে দস্যু-তস্করের ভয়ও শুনা যাইত। বন্য আটবিক জাতিরা এইরূপ উৎপাত করিত। কিন্তু তাহা ক্বচিৎ, কালেভদ্রে। পথের পাশে সৈনিকের গুল্ম থাকায়

তস্করগণ অধিক অত্যাচার করিতে সাহসী হইত না। রাজপথ যথাসম্ভব নিরাপদ ছিল।

উত্তরে ভাগীরথীতীর পর্যন্ত মগধের সীমা—সেই পর্যন্ত পথ গিয়াছে। আমরা সেই পথ ধরিয়া চলিলাম। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিল, বায়ু স্তব্ধ এবং আকাশে মেঘপুঞ্জ বর্ষণোন্মুখ হইয়া রহিল। আমরা রাত্রির মতো পথসন্নিকটে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে আশ্রয় লইলাম।

প্রত্যেকের সহিত এক সন্ধ্যার আহার্য ছিল। কিন্তু বর্ষাকালে উন্মুক্ত প্রান্তরে রন্ধনের সুবিধা নাই। কষ্টে যদি বা অগ্নি জ্বালা যায়, বৃষ্টি পড়িলেই নিবিয়া যাইবার সম্ভাবনা। তথাপি অনেকে একটা মৃত বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া যব-গোধূম-চূর্ণ ও শক্তু শানিয়া পিষ্টক-পুরোডাশ তৈয়ার করিতে লাগিল। আবার যাহারা অতটা পরিশ্রম স্বীকার করিেত অনিচ্ছুক, তাহারা চিপিটক জলে সিক্ত করিয়া দধি-শর্করা সহযোগে ভোজনের আয়োজন করিতে লাগিল।

চারিদিক হইতে দশ হাজার লোকের কলরব, গুঞ্জন, গান, চিৎকার, গালিগালাজ আসিতেছে। দূরে দূরে ধ্বনির ন্যায় অগ্নি জ্বলিতেছে। অন্ধকারে তাহারই আশেপাশে মানুষের ছায়ামূর্তি ঘুরিতেছে। কচিৎ অগ্নিতে তৈল বা ঘৃত প্রদানের ফলে অগ্নি অত্যুজ্জ্বল শিখা তুলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। সেই আলোকে চতুষ্পার্শ্বে উপবিষ্ট মানুষের মুখ ক্ষণকালের জন্য স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। এ যেন সহসা বিজন প্রান্তর মধ্যে এক ভৌতিক উৎসব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

আমার সহিত কদলী, কপিত্থ, রসাল ইত্যাদি ফল, কিঞ্চিৎ মৃগমাংস এবং এক দ্রোণ লোধ্ররেণু চিত্রকাদির দ্বারা সুরভিত হিঙ্গুল-বর্ণ অতি উৎকৃষ্ট আসব ছিল। আমি তদ্দ্বারা আমার নৈশ আহার সুসম্পন্ন করিলাম।

ক্রমে রাত্রি গভীর হইতে চলিল। এক বৃহৎ বৃক্ষতলে মৃত্তিকার উপর আস্তরণ পাতিয়া আমি শয়নের উপক্রম করিতেছি, এমন সময় অন্ধকারে দুই জন লোক আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে?"

একজন উত্তর দিল, "নায়ক, আমি এই ছাউনির রক্ষী। অপরিচিত এক ব্যক্তি কূপের নিকট বসিয়াছিল, তাই আদেশমত ধরিয়া আনিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "মশাল জ্বাল।"

মশাল জ্বলিলে দেখিলাম, প্রহরীর সঙ্গে এক দীর্ঘাকৃতি নগ্নপ্রায় অতিশয় শ্মশ্রুগুম্ফজটাবহুল পুরুষ। শুকচঞ্চুর ন্যায় বক্র নাসা, চক্ষু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কূপ-সন্নিকটে কি করিতেছিলে?"

সে ব্যক্তি স্থিরনেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "তুমি রাষ্ট্রপতি হইবে; তোমার ললাটে রাজদণ্ড দেখিতেছি।"

কৈতববাদে ভুলিবার বয়স আমার নাই। উপরন্তু মহামাত্য যে সন্দেহ আমার মনের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন, এই অপরিচিত জটিল সন্ন্যাসীকে দেখিবামাত্র তাহা জাগরূক হইয়া উঠিল। বলিলাম, "আপনি দেখিতেছি জ্যোতির্বিদ। আসন পরিগ্রহ করুন।"

আসন গ্রহণ করিয়া জটাধারী কহিলেন, "আমি শৈব সন্ন্যাসী। রুদ্রের কৃপায় আমার তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত হইয়াছে। ত্রিকাল আমার নখ-দর্পণে প্রকট হয়। আমি দেখিতেছি, তুমি অদূর-ভবিষ্যতে মহালোকপালরূপে রাজদণ্ড ধারণ করিবে। তোমার যশোদীপ্তিতে ভূতপূর্ব রাজন্যগণের কীর্তিপ্রভা ম্লান হইয়া যাইবে।"

সন্ন্যাসীকে বুঝিয়া লইলাম। অত্যন্ত শ্রদ্ধাপ্লুতকণ্ঠে কহিলাম, "আপনি মহাজ্ঞানী। আমি অতি দুষ্কর কার্যে যাইতেছি; কার্যে সফল হইব কি না, আজ্ঞা

করুন।"

ত্রিকালদর্শী ভ্রূকুটি করিয়া কিছুক্ষণ নিমীলিতনেত্রে রহিলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইতেছ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আপনিই বলুন!"

সন্ন্যাসী তখন মৃত্তিকার উপর এক খণ্ড প্রস্তর দিয়া রাশিচক্র আঁকিলেন। আমি মৃদু হাস্যে প্রশ্ন করিলাম, "এ কি, আপনার নখ-দর্পণ কোথায় গেল?"

সন্ন্যাসী আমার প্রতি সন্দেহপ্রখর এক দৃষ্টি হানিয়া কহিলেন, "সূক্ষ্ম গণনা নখ-দর্পণে হয় না। তুমি জ্যোতিষশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, এ সকল বুঝিবে না।"

আমি বিনীতভাবে নীরব রহিলাম। সন্ন্যাসী গভীর মনঃসংযোগে রাশিচক্রে আঁক কষিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ অঙ্কপাত করিবার পর মুখ তুলিয়া কহিলেন, "তুমি কোনও গুপ্ত রাজকার্যে পররাজ্যে যাইতেছ। শনি ও মঙ্গল দৃষ্টি-বিনিময় করিতেছে, এজন্য মনে হয় তুমি যুদ্ধ-সংক্রান্ত কোনও গূঢ় কার্যে ব্যাপৃত আছ।" এই বলিয়া সপ্রশ্ন-নেত্রে আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

আমি চমৎকৃত হইয়া বলিলাম, "আপনি সত্যই ভবিষ্যদ্দর্শী, আপনার অগোচর কিছুই নাই। আমি রাজানুজ্ঞায় লিচ্ছবি দেশে যাইতেছি, কি উদ্দেশ্যে যাইতেছি তাহা অবশ্যই আপনার ন্যায় জ্ঞানীর অবিদিত নাই। এখন কৃপা করিয়া আমার এক সুহৃদের ভাগ্যগণনা করিয়া দিতে হইবে। প্রহরী, কুলিক মিহিরমিত্র জম্বু-বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহাকে ডাক।"

কুলিক মিহিরমিত্র আমার অধীনে প্রধান শিল্পী এবং আমার প্রাণোপম বন্ধু। ভাস্কর্যে তাহার যেরূপ অধিকার জ্যোতিষশাস্ত্রেও সেইরূপ পারদর্শিতা। ভৃগু, পরা-শর, জৈমিনি তাহার কণ্ঠাগ্রে।

মিহিরমিত্র আসিয়া উপবিষ্ট হইলে, আমি সন্ন্যাসীকে নির্দেশ করিয়া কহিলাম, "ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত, তোমার ভাগ্য গণনা করিবেন।"

মিহিরমিত্র সন্ন্যাসীর দিকে ফিরিয়া বসিল। তাঁহার আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিয়া নিজ করতল প্রসারিত করিয়া বলিল, "কোন্ লগ্নে আমার জন্ম?"

সন্ন্যাসীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ঈষৎ চাঞ্চল্য ও উৎকণ্ঠার লক্ষণ দেখা দিল। সে করতলের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়াই বলিল, "তোমার অকালমৃত্যু ঘটিবে।"

মিহিরমিত্র বলিল, "ঘটুক, কোন্ লগ্নে আমার জন্ম?"

সন্ন্যাসী ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বৃষ লগ্নে।"

"বৃষ লগ্নে!" মিহিরমিত্র হাসিল, "উত্তম। চন্দ্র কোথায়?"

"তুলা রাশিতে।"

"তুলা রাশিতে? ভালো। কোন্ নক্ষত্রে?"

সন্ন্যাসী নীরব। ব্যাকুলনেত্রে একবার চারিদিকে নিরীক্ষণ করিল, কিন্তু পলায়নের পথ নাই। জ্যোতিষীর নাম শুনিয়া উৎসুক কর্মিকগণ একে একে আসিয়া চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

মিহিরমিত্র কঠোরকণ্ঠে আবার প্রশ্ন করিল, "চন্দ্র কোন্ নক্ষত্রে?"

জিহ্বা দ্বারা শুষ্ক ওষ্ঠাধর লেহন করিয়া স্খলিতকণ্ঠে সন্ন্যাসী কহিল, "চন্দ্র মৃগশিরা নক্ষত্রে।"

মিহিরমিত্র আমার দিকে ফিরিয়া অল্প হাস্য করিয়া বলিল, "এ ব্যক্তি শঠ। জ্যোতিষশাস্ত্রের কিছুই জানে না।"

তখন সন্ন্যাসী দ্রুত উঠিয়া সেই শ্রমিক-ব্যূহ ভেদ করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিল।

সন্ন্যাসী অসাধারণ বলিষ্ঠ—কিন্তু বিশ জনের বিরুদ্ধে একা কি করিবে? অল্পকালের মধ্যেই সকলে ধরিয়া তাহাকে ভূমিতে নিপাতিত করিল। রজ্জু দ্বারা তাহার হস্তপদ বাঁধিয়া ফেলিবার পর সন্ন্যাসী বলিল, "মহাশয়, আমাকে বৃথা বন্ধন করিতেছেন। আমি দীন ভিক্ষুক মাত্র, জ্যোতিষীর ভান করিয়া কিছু বেশী উপার্জনের চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু আপনারা জ্ঞানী—আমার কপটতা ধরিয়া ফেলিয়াছেন। এখন দয়া করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমার যথেষ্ট দণ্ডভোগ হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "ভণ্ড সন্ন্যাসী, তুমি কোশল অথবা বৃজির গুপ্তচর। আমাকে ভুলাইয়া কথা বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিলে।"

সন্ন্যাসী ভয়ে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "কুমারীর শপথ, জয়ন্তের শপথ, আমি গুপ্তচর নহি। আমি ভিক্ষুক। আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি আর কখনও এমন কাজ করিব না...উঃ, আমি বড় তৃষ্ণার্ত—একটু জল..." এই পর্যন্ত বলিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল।

আমি একজন প্রহরীকে আদেশ করিলাম, "কূপ হইতে এক পাত্র জল আনিয়া ইহাকে দাও।"

জল আনীত হইলে সন্ন্যাসীর মুখের কাছে জলপাত্র ধরা হইল। কিন্তু সন্ন্যাসী নিশ্চেষ্ট, জল পানের কোনও আগ্রহ নাই।

প্রহরী বলিল, "জল আনিয়াছি—পান কর।"

সন্ন্যাসী নীরব নিস্পন্দভাবে পড়িয়া রহিল, কথা কহিল না। আমি তখন তাহার নিকটে গিয়া বলিলাম, "তৃষ্ণার্ত বলিতেছিলে, জল পান করিতেছ না কেন?"

সন্ন্যাসী তখন ক্ষীণস্বরে কহিল, "আমি জল পান করিব না।"

সহসা যে প্রহরী জল আনিয়াছিল, সে জলপাত্র ফেলিয়া দিয়া কাতরোক্তি করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। 'কি হইল, কি হইল'—বলিয়া সকলে তাহাকে ধরিয়া তুলিল। দেখা গেল, এই অল্পকালের মধ্যে তাহার মুখের অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মুখ তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে, চক্ষু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। ক্রমে সৃক্কণী বহিয়া ফেন নির্গত হইতে লাগিল। বাক্য একেবারে রোধ হইয়া গিয়াছে। 'কি হইয়াছে?' 'কেন এরূপ করিতেছ?'—এই প্রকার বহু প্রশ্নের উত্তরে সে কেবল ভূপাতিত জলপাত্রটি অঙ্গুলিসংকেতে দেখাইতে লাগিল।

তারপর অর্ধদণ্ডের মধ্যে দারুণ যন্ত্রণায় হস্তপদ উৎক্ষিপ্ত করিতে করিতে উৎকট মুখভঙ্গি করিয়া প্রহরী ইহলোক ত্যাগ করিল। তাহার বিষ-বিধ্বস্ত দেহ মৃত্যুর করস্পর্শে শান্ত হইলে পর, সমবেত সকলের দৃষ্টি সেই ভণ্ড সন্ন্যাসীর উপর গিয়া পড়িল। ক্রোধান্ধ জনতার সেই জিঘাংসানিষ্ঠুর দৃষ্টির অগ্নিতে সন্ন্যাসী যেন পুড়িয়া কুঁকড়াইয়া গেল।

আর এক মুহূর্ত বিলম্ব হইলে বোধ করি সেই ক্ষিপ্ত কর্মিকদল সন্ন্যাসীর দেহ শত খণ্ডে ছিঁড়িয়া ফেলিত, কিন্তু সেই মুহূর্তে শ্রমিক-ব্যূহ ঠেলিয়া কর্মিক-জ্যেষ্ঠ বিশালকায় দিঙ্নাগ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ভূশায়িত সন্ন্যাসীর জটা ধরিয়া সকলের দিকে ফিরিয়া পরুষ-কণ্ঠে কহিল, "ভাই সব, এই ভণ্ড তপস্বী শত্রুর চর। আমাদের প্রাণনাশের জন্য কূপের জল বিষ-মিশ্রিত করিয়াছে। ইহার একমাত্র উচিত শাস্তি,—মৃত্যু; অতএব সে শাস্তি আমরা ইহাকে দিব। কিন্তু এখন নয়। তোমরা সকলেই জান, যে কার্যে আমরা যাইতেছি, তাহাতে নরবলির প্রয়োজন। ভৈরবের তুষ্টিসাধন না করিলে আমাদের কার্য সুসম্পন্ন হইবে না। সুতরাং এখন কেহ ইহার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিও না। যথাসময় গঙ্গার উপকূলে আমরা ইহাকে জীবন্ত সমাধি

দিব। এই পাপাত্মার প্রেতমূর্তি অনন্তকাল ধরিয়া আমাদের দুর্গ পাহারা দিবে।"

দিঙ্‌নাগের কথায় সকলে ক্ষান্ত হইল।

তারপর মৃত প্রহরীর দেহ সকলে মিলিয়া কূপ-সন্নিকটে এক বৃক্ষতলে সমাধিস্থ করিল এবং সন্ন্যাসীকে সেই বৃক্ষশাখায় হস্তপদ বাঁধিয়া ভাণ্ডবৎ ঝুলাইয়া রাখিল।

পরদিন প্রত্যূষে যাত্রা করিয়া আমরা প্রায় বেলা তৃতীয় প্রহরে পাটলিগ্রামে উপস্থিত হইলাম। গঙ্গার উপকূলে জঙ্গল পরিবৃত অতি ক্ষুদ্র একটি জনপদ—সর্বসাকুল্যে বোধ করি পঞ্চাশটি দরিদ্র পরিবারের বাস। গ্রামবাসীরা অধিকাংশই নিষাদ কিংবা জালিক—বনে পশু শিকার করিয়া এবং নদীতে মৎস্য ধরিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। মাঝে মাঝে বৃহৎ অরণ্যের মধ্যে বৃক্ষাদি কাটিয়া, ক্ষেত্র সমতল করিয়া, যব গোধূম চণক ইত্যাদিও উৎপন্ন করে। আমরা সদলবলে উপস্থিত হইলে গ্রামিকেরা আমাদের আততায়ী মনে করিয়া গ্রাম ছাড়িয়া অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমরা অনেক আশ্বাস দিলাম, কিন্তু কেহ শুনিল না, কিরাতভীত মৃগযূথের মতো গভীর বনমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

তখন আমরা অনাহূত যেখানে যাহা পাইলাম, তাহাই গ্রহণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম। গ্রামের সম্বৎসরের সঞ্চিত খাদ্য এক সন্ধ্যার আহারে প্রায় নিঃশেষ হইয়া গেল।

সেদিন আর কোনও কাজ হইল না। শ্রান্ত কর্মিকদল যে যেখানে পারিল ঘুমাইয়া রাত্রি কাটাইয়া দিল।

পরদিন প্রভাতে কাজের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। রণহস্তীর পৃষ্ঠে স্তূপীকৃত খাদ্য বস্ত্রাবাস প্রভৃতি যাবতীয় আবশ্যক বস্তু আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। ছাউনি ফেলিতে, প্রস্তরাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে সমস্ত দিন কাহারও নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ রহিল না।

দূতহস্তে মহামন্ত্রী দুর্গের নক্সা পাঠাইয়াছেন, তাহা লইয়া মিহিরমিত্র ও দিঙ্‌নাগকে সঙ্গে করিয়া আমি দুর্গের স্থান-নির্ণয়ের জন্য নদীসংগমে গেলাম। বর্ষায় কূলপ্লাবী দুই মহানদী স্ফীত তরঙ্গায়িত হইয়া ঘোররবে ছুটিয়াছে। গঙ্গা ধূসর, শোণ স্বর্ণাভ। দুই স্রোত যেখানে মিলিত হইয়াছে, সেখানে আবর্তিত জলরাশি ফেনপুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছে।

এই সংগমের দক্ষিণ উপকূলে দাঁড়াইয়া আমরা দেখিলাম যে, শোণ এবং সংযুক্ত প্রবাহের সন্ধিস্থলে এক বিশাল দ্বিভুজের সৃষ্টি হইয়াছে—মনে হয় যেন, দুই নদী বাহু বিস্তার করিয়া দক্ষিণের তটভূমিকে আলিঙ্গন করিবার প্রয়াস করিতেছে। বহু পর্যবেক্ষণ ও বিচারের পর স্থির করিলাম যে, এই দ্বিভুজের মধ্যেই দুর্গ নির্মাণ করিতে হইবে। কারণ, তাহা হইলে দুর্গের দুই দিক্ নদীর দ্বারা বেষ্টিত থাকিবে, পরিখা-খননের প্রয়োজন হইবে না।

তারপর সেই স্থানের জঙ্গল পরিষ্কৃত করিবার জন্য লোক লাগিয়া গেল। বড় বড় পুরাতন বৃক্ষ কাটিয়া ভূমি সমতল করা হইতে লাগিল। হস্তীসকল ভূপাতিত বৃক্ষকাণ্ড টানিয়া বাহিরে লইয়া ফেলিতে লাগিল। বৃক্ষপতনের মড়মড় শব্দে, মানুষের কোলাহলে, হস্তী ও অশ্বের নিনাদে দিক্‌প্রান্ত প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। যেন বহুযুগব্যাপী নিদ্রার পর অরণ্যানী কোন দৈত্যের বিজয়নাদে চমকিয়া উঠিল।

সমস্ত দিন এইরূপ পরিশ্রমের পর রাত্রিতে আহারাদি শেষ করিয়া বিশ্রামের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় দিঙ্‌নাগ আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "নায়ক, রাত্রি দ্বিপ্রহর সমাগত; আজ দুর্গারম্ভের পূর্বে দৈবকার্য করিতে হইবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিরূপ দৈবকার্য?"

দিঙ্‌নাগ বলিল, "ইহারই মধ্যে ভুলিয়া গেলেন? সেই ভণ্ড তপস্বী—আজ তাহাকে জীবন্ত পুঁতিয়া ফেলিতে হইবে।"

তখন সকল কথা স্মরণ হইল। বলিলাম, "ঠিক কথা, তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তা বেশ, তাহাকে যখন বধ করিতেই হইবে, তখন এক কার্যে দুই ফল হউক। শত্রু নিপাত ও দেবতুষ্টি একসঙ্গেই হইবে। কিন্তু এই সকল দৈবকার্যের কি কি অনুষ্ঠান তাহা কি তোমাদের জানা আছে?"

দিঙ্‌নাগ বলিল, "অনুষ্ঠান কিছুই নহে। বলিকে সুরাপান করাইয়া যখন সে অচৈতন্য হইয়া পড়িবে, তখন তাহার কানে কানে বলিতে হইবে, 'তুমি চিরদিন প্রেত-দেহে এই দুর্গ রক্ষা করিতে থাক।'—এই বলিয়া তাহাকে জীবন্ত অবস্থায় পুঁতিয়া ফেলিতে হইবে।"

আমি ঈষৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি এত বিধি-ব্যবস্থা জানিলে কোথা হইতে?"

দিঙ্‌নাগ হাসিয়া বলিল, "এ কার্য আমি পূর্বে করিয়াছি। ধনশ্রী শ্রেষ্ঠী যখন গুপ্ত রত্নাগার মাটির নিচে তৈয়ার করে, তখন আমিই কুলিক ছিলাম। সেই সময় অরণ্য হইতে এক শবর ধরিয়া আনিয়া শ্রেষ্ঠী এই নরযাগ সম্পন্ন করে। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।"

আমি বলিলাম, "তবে এ কার্যও তুমিই কর।"

দিঙ্‌নাগ বলিল, "করিব। কিন্তু নায়ক, কার্যকালে আপনাকেও উপস্থিত থাকিতে হইবে। ইহাই বিধি।"

"বেশ থাকিব।"

দিঙ্‌নাগ চলিয়া যাইবার পর নানা চিন্তায় মগ্ন হইয়া আছি, এমন সময় সে ছুটিতে ছুটিতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "নায়ক, সর্বনাশ! সন্ন্যাসী আমাদের ফাঁকি দিয়াছে!"

"ফাঁকি দিয়াছে?"

"বিষপান করিয়াছে। তাহার কবচের মধ্যে বিষ লুকানো ছিল, জীবন্ত সমাধির ভয়ে তাহাই খাইয়া মরিয়াছে। এখন উপায়?"

"কিসের উপায়?"

"মানস করিয়াছি, বলি না দিলে যে সর্বনাশ হইবে! রুদ্র কুপিত হইবেন।" দিঙ্‌নাগ মাটিতে বসিয়া পড়িল।

চিন্তার কথা বটে। নির্বোধ সন্ন্যাসীটা আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিল না! পাছে আমাদের একটু উপকার হয়, তাই তাড়াতাড়ি বিষপান করিয়া বসিল। এদিকে আমন্ত্রিত দেবতা প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। অন্য বলি কোথায় পাওয়া যায়?

বিশেষ ভাবিত হইয়া পড়িয়াছি, এরূপ সময় শিবিরের প্রহরী আসিয়া সংবাদ দিল, "কতকগুলা মুণ্ডিত-মস্তক ভিখারী ছাউনিতে আশ্রয় খুঁজিতেছিল, ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছি। আজ্ঞা হয় তো লইয়া আসি।"

দিঙ্‌নাগ লাফাইয়া উঠিয়া মহানন্দে চিৎকার করিয়া উঠিল, "জয় রুদ্রেশ্বর, জয় ভৈরব!...নায়ক, দেবতা স্বয়ং বলি পাঠাইয়াছেন!"

এত সহজে যে বলি-সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইবে তাহা ভাবি নাই। ভিখারী অপেক্ষা উত্তম বলি আর কোথায় পাওয়া যাইবে? দিঙ্‌নাগ ঠিকই বলিয়াছে, দেবতা স্বয়ং বলি পাঠাইয়াছেন।

সর্বসুদ্ধ চারি পাঁচটি ভিখারী,—পরিধানে কৌপীন, সংঘাটি ও উত্তরীয়, হস্তে ভিক্ষাপাত্র,—আমার সম্মুখে আনীত হইল। ভিক্ষুকগণ সকলেই বয়স্থ;—কেবল একটি বৃদ্ধ,—বয়স বোধ করি সত্তর অতিক্রম করিয়াছে।

বৃদ্ধ স্মিত হাস্যে বলিলেন, "মঙ্গল হউক!"

এই বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া সহসা আমার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন তড়িৎস্পৃষ্ট হইয়া জাগিয়া উঠিল। আমি কে, কোথায় আছি, এক মুহূর্তে সমস্ত ভুলিয়া গেলাম। কেবল বুকের মধ্যে এক অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাস আলোড়িত হইয়া উঠিল। কে ইনি? এত সুন্দর, এত মধুর, এত করুণাসিক্ত মুখকান্তি তো মানুষের কখনও দেখি নাই। দেবতার মুখে যে জ্যোতির্মণ্ডল কল্পনা করিয়াছি, আজ এই বৃদ্ধের মুখে তাহা প্রথম প্রত্যক্ষ করিলাম। এই জ্যোতির স্ফুরণ বাহিরে অতি অল্প, কিন্তু চক্ষুর মধ্যে দৃষ্টি-পাত করিলেই মনে হয়, ভিতরে অমিতদ্যুতি স্থির সৌদামিনী জ্বলিতেছে। কিন্তু সে সৌদামিনীতে জ্বালা নাই, তাহা অতি স্নিগ্ধ, অতি শীতল, যেন হিম-নির্ঝরিণীর শীকর-নিষিক্ত।

সে মূর্তির দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া আমার প্রাণের মধ্যে একটি শব্দ কেবল রণিত হইতে লাগিল,—'অমিতাভ! অমিতাভ!'

আমি বাক্‌রহিত হইয়া বসিয়া আছি দেখিয়া তিনি আবার হাসিলেন। অপূর্ব প্রভায় সে মুখ আবার সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বলিলেন, "বৎস, আমরা যাযাবর ভিক্ষু, কুশীনগর যাইবার অভিপ্রায় করিয়াছি। অদ্য রাত্রির জন্য তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করি।"

অবরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কে?"

তাঁহার একজন সহচর উত্তর করিলেন, "শাক্যসিংহ গৌতমের নাম কখনও শুন নাই?"

শাক্যসিংহ? ইনিই তবে সেই শাক্যবংশের রাজ্যভ্রষ্ট যুবরাজ! মহামন্ত্রী বর্ষকারের কথা মনে পড়িল। ইঁহারই উদ্দেশ্যে তিনি বলিয়াছিলেন,—ধূর্ত, কপটী, পরস্বলুব্ধ! মরি মরি, কে ধূর্ত কপটী? মনে হইল, মানুষ তো অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু আজ এই প্রথম মানুষ দেখিলাম। হায়, মহামন্ত্রী বর্ষকার, তুমি এই পুরুষসিংহকে দেখ নাই, কিংবা দেখিয়াও আত্মাভিমানে অন্ধ ছিলে। নহিলে এমন কথা মুখে উচ্চারণ করিতে পারিতে না।

বুকের মধ্যে প্রবল রোদনের উচ্ছ্বাস সমস্ত দেহকে কম্পিত করিতে লাগিল। আমার অতিবাহিত জীবনের অপরিমেয় শূন্যতা, অশেষ দৈন্য, যেন এককালে মূর্তি ধরিয়া আমার সম্মুখে দেখা দিল! কি পাইয়া এত দিন ভুলিয়া ছিলাম!

আমি উঠিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া বলিলাম, "অমিতাভ, আমি অন্ধ, আমাকে চক্ষু দাও, আমাকে আলোকের পথ দেখাইয়া দাও।"

অমিতাভ আমাকে ধরিয়া তুলিলেন। মস্তকে করার্পণ করিয়া বলিলেন, "পুত্র, আশীর্বাদ করিতেছি, তোমার অন্তরের দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইবে, আপনিই আলোকের পথ দেখিতে পাইবে।"

আমি আবার তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া বলিলাম, "না শ্রীমন্‌, আমার হৃদয় অন্ধকার। আজ প্রথম তোমার মুখে দিব্যজ্যোতি দেখিয়াছি। ঐ জ্যোতির কণামাত্র আমাকে দান কর।"

একজন ভিক্ষু বলিলেন, "শাস্তা, আপনি ইহাকে ত্রিশরণ দান করুন।"

শাক্যসিংহ কহিলেন, "আনন্দ, তাহাই হউক।" আমার মস্তকে হস্ত রাখিয়া

বলিলেন, "পুত্র, তুমি ত্রিশরণ গ্রহণ করিয়া গৃহস্থের অষ্টশীল পালন কর। আশীর্বাদ করি, যেন বাসনামুক্ত হইতে পার।"

তখন বুদ্ধের চরণতলে বসিয়া তদ্‌গতকণ্ঠে তিনবার ত্রিশরণ মন্ত্র উচ্চারণ করিলাম।

অদূরে দাঁড়াইয়া দিঙ্‌নাগ—দুর্ধর্ষ, নিষ্করুণ, অসুরপ্রকৃতি দিঙ্‌নাগ—গলদশ্রু হইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার বিকৃত কণ্ঠ হইতে কি কথা বাহির হইতে লাগিল বুঝা গেল না।

এ যেন কয়েক পলের মধ্যে এক মহা ভূমিকম্পে আমাদের অতীত জীবন ধূলিসাৎ হইয়া গেল। কীট ছিলাম, এক মুহূর্তে মানুষ হইয়া গেলাম।

পরদিন উষাকালে তথাগত কুশীনগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। হিরণ্যবাহুর সুবর্ণ-সৈকতে দাঁড়াইয়া আমার হস্তধারণ করিয়া তিনি কহিলেন, "পুত্র, আমি চলিলাম। হিংসায় হিংসার ক্ষয় হয় না, বৃদ্ধি হয়—এ কথা স্মরণ রাখিও।"

বাষ্পাকুল-স্বরে কহিলাম, "শাস্তা, আবার কত দিনে সাক্ষাৎ পাইব?"

সেই হিমবিদ্যুতের ন্যায় হাসি তাঁহার ওষ্ঠাধরে খেলিয়া গেল, বলিলেন, "আমি কুশীনগর যাইতেছি, আর ফিরিব না।"

তারপর বহুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে গঙ্গা-শোণ-সংগমে দুর্গভূমির প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। শেষে স্বপ্নাবিষ্ট কণ্ঠে কহিলেন, "আমি দেখিতেছি, তোমার এই কীর্তি বহু-সহস্রবর্ষ স্থায়ী হইবে। এই ক্ষুদ্র পাটলিগ্রাম ও তোমার নির্মিত এই দুর্গ এক মহীয়সী নগরীতে পরিণত হইবে। বাণিজ্যে, ঐশ্বর্যে, শিল্পে, কারুকলায়, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে পৃথিবীতে অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবে। সদ্ধর্ম এইস্থানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। তোমার কীর্তি অবিনশ্বর হউক।"

এই বলিয়া, পুনর্বার আমাকে আশীর্বাদ করিয়া, দিব্যদর্শী পরিনির্বাণের পথে যাত্রা করিলেন।

১৯৩০

রক্ত-সন্ধ্যা

মানুষের সহজ সাধারণ বৈচিত্র্যহীন জীবনযাত্রার মাঝখানে ভূমিকম্পের মত এমন এক-একটা ঘটনা ঘটিয়া যায় যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া সেটাকে একটা অসম্ভব অঘটন বলিয়া মনে হয়। যে গল্পটা আজ বলিতে বসিয়াছি, সেটাও

একদিন এমনই অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে আমার জীবনে আসিয়া হাজির হইয়াছিল। যদিও শুধু দর্শক হিসাবে ছাড়া এ গল্পের সঙ্গে আমার কোনও সংস্রব নাই, তবু ইহা আমার মনের উপর এমন একটা গভীর দাগ কাটিয়া দিয়াছে—যাহা বোধ করি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মুছিবে না।

যে লোকটার কাহিনী আজ লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়াছি, আজ সাত দিন হইল সে হাইকোর্টের রায় মাথায় করিয়া পরলোক যাত্রা করিয়াছে। সুতরাং সাক্ষীসাবুদ উপস্থিত করিবার আমার আর উপায় নাই। তবে সংবাদপত্রের নথি হইতে এবং আসামীর বিচারের সময় সাক্ষীদের মুখের যে যে কথা এই গল্পে কাজে আসিতে পারে, তাহা প্রয়োজনমত ব্যবহার করিব। বিশ্বাস আমি কাহাকেও করিতে বলি না এবং নিছক গাঁজা বলিয়া যাঁহারা উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধেও আমার কোন নালিশ নাই। আমি শুধু এইটুকুই ভাবি যে, সে লোকটা মরিবার পূর্বে নিজের দোষ-ক্ষালনের বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়াও এতগুলি অনাবশ্যক মিথ্যা কথা বলিয়া গেল কেন?

এই সময় দৈনিক সংবাদপত্র 'কালকেতু'তে এই ঘটনার যে বিবরণ বাহির হইয়াছিল, তাহাই সর্বাগ্রে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছিঃ—

"গতকল্য বেলা প্রায় সাড়ে নয়টার সময় কলিকাতার দুর্গাচরণ ব্যানার্জির লেনে এক কসাইয়ের দোকানে ভীষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। দোকানের মালিক গোলাম কাদের অন্য দিনের ন্যায় যথারীতি মাংস বিক্রয় করিতেছিল। দোকানে কয়েকজন ফিরিঙ্গী ও মুসলমান খরিদ্দার উপস্থিত ছিল। এমন সময় একজন অপরিচিত ফিরিঙ্গী দোকানে প্রবেশ করিয়া কিছু গোমাংস খরিদ করিতে চাহে। তাহাকে দেখিয়াই দোকানদার গোলাম কাদের ভীষণ চিৎকার করিয়া মাংস-কাটা ছুরি হস্তে তাহার উপর লাফাইয়া পড়ে এবং নৃশংসভাবে তাহার বুকে, পেটে, মুখে ছুরিকাঘাত করিতে থাকে। আক্রান্ত ব্যক্তি মাটিতে পড়িয়া যায়, তখন গোলাম কাদের তাহার বুকের উপর বসিয়া এক একবার ছুরিকাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে বলিতে থাকে, "ভাস্কো-ডা-গামা, এই আমার স্ত্রীর জন্যে—এই আমার কন্যার জন্যে—এই আমার বৃদ্ধ পিতার জন্যে।" দোকানে যাহারা ছিল সকলেই এই লোমহর্ষণ কাণ্ড দেখিয়া দ্রুত পলায়ন করিয়া পুলিসে খবর দেয়। পুলিস আসিয়া যখন গোলাম কাদেরকে গ্রেপ্তার করিল, তখনও সে মৃতদেহের উপর ছুরি চালাইতেছে ও পূর্ববৎ বকিতেছে।

"সন্দেহ হয় যে, গোলাম কাদের হঠাৎ পাগল হইয়া গিয়াছে। কারণ, হত ব্যক্তির সহিত পূর্ব হইতে তাহার পরিচয় ছিল বলিয়া জানা যাইতেছে না এবং তাহার স্ত্রী, কন্যা বা বৃদ্ধ পিতা কেহই বর্তমান নাই। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, গোলাম কাদের প্রায় পনেরো বৎসর পূর্বে বিপত্নীক হইয়াছিল। তাহার স্ত্রী এক মৃত কন্যা প্রসব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার পর সে আর বিবাহ করে নাই।

"পুলিস-তদন্তে বাহির হইয়াছে যে, হত ব্যক্তি গোয়া হইতে নবাগত একজন পোর্তুগীজ ফিরিঙ্গী, ব্যবসায় উপলক্ষে কয়েকদিন পূর্বে কলিকাতায় আসিয়া এক ক্ষুদ্র হোটেলে বাস করিতেছিল। তাহার নাম গেব্রিয়েল ডিরোজা।

"গোলাম কাদের এখন হাজতে আছে। ডিরোজার লাস পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে।"

ঘটনাস্থলের খুব কাছেই আমার বাড়ি এবং অনেকদিন হইতে এই গোলাম কাদের লোকটার সহিত আমার মুখ-চেনাচিনি ছিল বলিয়াই ব্যাপারটা বেশী করিয়া আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাহা ছাড়া আর একটি জিনিস আমার কৌতূহল উদ্রিক্ত করিয়া-

ছিল, সেটি ভাস্কো-ডা-গামার নাম। ছেলেবেলা হইতেই আমি ইতিহাসের ভক্ত, তাই হঠাৎ কসাইখানার হত্যাকাণ্ডের মধ্যে এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নামটা উঠিয়া পড়ায় আমার মন সচকিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। 'ভাস্কো-ডা-গামা' সাধারণ প্রচলিত নাম নহে; একজন অশিক্ষিত মুসলমান কসাইয়ের মুখে এ নাম এমন অবস্থায় উচ্চারিত হইতে দেখিয়া কোন্ এক গুপ্ত রোমান্সের গন্ধে আমার মনটা ভরিয়া উঠিয়াছিল। কি অদ্ভুত রহস্য এই বিশ্রী হত্যাকাণ্ডের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে? কে এই গেব্রিয়েল ডিরোজা—যাহাকে হত্যাকারী ভাস্কো-ডা-গামা বলিয়া সম্বোধন করিল? সত্যই কি ইহা কেবলমাত্র এক বাতুলের দায়িত্বহীন প্রলাপ?

তা সে যাহাই হউক, কৌতূহল আমার এতই বাড়িয়া গিয়াছিল যে, যেদিন এই মোকদ্দমা করোনারের কোর্টে উঠিল, সেদিন আমি একটু সকাল সকাল আদালতে গিয়া হাজির হইলাম। করোনার তখনও উপস্থিত হন নাই, কিন্তু আসামীকে আনা হইয়াছে। চারিদিকে পুলিস গিসগিস করিতেছে। আসামীর হাতে হাতকড়া—একটি টুলের উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছে। আমাকে দেখিয়া সে চিনিতে পারিল এবং হাত তুলিয়া সেলাম করিল। পাগলের লক্ষণ কিছুই দেখিলাম না, নিতান্ত সহজ মানুষের মত চেহারা। মুখে ভয় বা উৎকণ্ঠার কোনও চিহ্নই নাই। দেখিয়া কে বলিবে, এই লোকটাই দুই দিন আগে এমন নির্দয়ভাবে আর একটা লোককে হত্যা করিয়াছে।

করোনার আসিয়া পড়িলেন। তখন কাজ আরম্ভ হইল। প্রথমেই ডাক্তার আসিয়া এজাহার দিলেন। তিনি বলিলেন, লাসের গায়ে সর্বসুদ্ধ সাতাশটি ছুরিকাঘাত পাওয়া গিয়াছে। এই সাতাশটির মধ্যে কোন্‌টি মৃত্যুর কারণ, বলা শক্ত। কারণ, সবগুলিই সমান সাংঘাতিক।

ডাক্তারের জবানবন্দি শেষ হইলে জর্জ ম্যাথুস নামক একজন দেশী খ্রীস্টানকে সাক্ষী ডাকা হইল। অন্যান্য সওয়াল জবাবের পর সাক্ষী কহিল, 'আমি গত দশ বৎসর প্রায় প্রত্যহ গোলাম কাদেরের দোকানে মাংস কিনিয়াছি; কিন্তু কোনও দিন তাহার এরূপ ভাব দেখি নাই। সে স্বভাবত বেশ শান্ত শিষ্ট লোক।'

প্রশ্ন—আপনার কি মনে হয়, সে যে-সময় হত ব্যক্তিকে আক্রমণ করে, সে সময় সে স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না?

উত্তর—হত ব্যক্তি দোকানে প্রবেশ করিবার আগে পর্যন্ত সে স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল—আমাদের সঙ্গে সহজভাবে কথাবার্তা কহিতেছিল; কিন্তু ডিরোজাকে দেখিয়াই একেবারে যেন পাগল হইয়া গেল।

প্রশ্ন—আপনার কি বোধ হয়, আসামী হত ব্যক্তিকে পূর্ব হইতে চিনিত?

উত্তর—হাঁ। কিন্তু তাহার আসল নাম না বলিয়া ভাস্কো-ডা-গামা বলিয়া ডাকিয়াছিল।

প্রশ্ন—ডিরোজা আক্রান্ত হইয়া কোন কথা বলিয়াছিল?

উত্তর—না।

প্রশ্ন—আসামী মদ বা অন্য কোনও নেশা করে, আপনি জানেন?

উত্তর—আমি কখনও তাহাকে নেশা করিতে বা মাতাল হইতে দেখি নাই।

প্রশ্ন—আসামীর ভাবে ইঙ্গিতে কি আপনার বোধ হইয়াছিল যে, সে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য ডিরোজাকে খুন করিতেছে?

উত্তর—হাঁ। তাহার কথায় ও মুখের ভাবে আমার মনে হইয়াছিল যে, ডিরোজা পূর্বে তাহার স্ত্রী, কন্যা ও বৃদ্ধ পিতার উপর কোনও অত্যাচার করিয়া থাকিবে।

জর্জ ম্যাথুসের পরে আরও কয়েকজন সাক্ষী প্রায় ওই মর্মে এজাহার দিবার পর

পুলিসের ডেপুটি কমিশনার এজাহার দিতে উঠিলেন। তিনি বলিলেন যে, গোয়া হইতে খবর পাইয়াছেন যে, ডিরোজা সেখানকার একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, জাতিতে ফিরিঙ্গী পোর্তুগীজ—বয়স বিয়াল্লিশ বৎসর। সে পূর্বে কখনও গোয়া ছাড়িয়া অন্যত্র যায় নাই—জীবনে এই প্রথম কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছিল। আসামী সম্বন্ধে ডেপুটি কমিশনার বলিলেন, 'আসামীর আত্মীয়-স্বজন স্ত্রী পুত্র পরিবার কেহ নাই। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে সে কলিকাতা ছাড়িয়া কোথাও যায় নাই। তাহার বয়স অনুমান সাতচল্লিশ বৎসর। সুতরাং ডিরোজার সহিত তাহার যে পূর্বে কখনও দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহা সম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে না।'

আসামী এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এবার সে কথা কহিল, বলিল, 'ডা-গামাকে আমি অনেকবার দেখিয়াছি।'

মুহূর্তমধ্যে ঘর একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গেল। করোনার ডেপুটি কমিশনারকে চুপ করিতে ইঙ্গিত করিয়া আসামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি ডিরোজাকে পূর্বে হইতে জানো?'

আসামী বলিল, 'ডিরোজাকে আমি কখনও দেখি নাই—আমি ভাস্কো-ডা-গামাকে চিনি। ভাস্কো-ডা-গামা ছদ্মবেশে আমার দোকানে মাংস কিনিতে আসিয়াছিল।'

করোনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আসামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, ভাস্কো-ডা-গামাকে তুমি কোথায় দেখিয়াছ?'

আসামী কহিল, 'প্রথম দেখি কালিকটের বন্দরে—শেষ দেখি সমুদ্রের বুকের উপর—' এই পর্যন্ত বলিয়া আসামী হঠাৎ থামিয়া গেল। দেখিলাম, তাহার মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না। সে অবরুদ্ধকণ্ঠে একবার 'ইয়া খোদা!'—বলিয়া দুই হাতে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া পড়িল—আর কোনও কথা বলিল না।

তারপর করোনার যথসময়ে রায় দিলেন যে, ক্ষণিক উন্মত্ততার বশে গোলাম কাদের ডিরোজাকে খুন করিয়াছে।

কোর্ট হইতে যখন বাহিরে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন আমার মাথার ভিতর ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে। 'কালিকট', 'সমুদ্রের বুকের উপর'—আসামী এ সব কি বলিল? আরও কত কথা, না জানি কোন্ অপূর্ব কাহিনী এই মূর্খ নিরক্ষর কসাই গোলাম কাদেরের বুকের মধ্যে লুকানো আছে। কারণ, সে যে পাগলামির ভান করিতেছে না, তাহা নিঃসন্দেহ। কোনও কথা বা কাজই তাহার পাগলের মত নহে। অথচ দুই-একটা অসংলগ্ন কথার ভিতর দিয়া অতীতের পর্দার একটা কোণ তুলিয়া ধরিয়া এ কি এক আশ্চর্য রূপকথার ইঙ্গিত দিয়া গেল!

ইহার পর গোলাম কাদেরের ভাগ্যে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বিস্তারিতভাবে বলিবার কোনও প্রয়োজন দেখিতেছি না। দায়রা-সোপর্দ হইয়া মামলা হাইকোর্টে উঠিলে হাইকোর্টের জজবাহাদুর গোলাম কাদেরকে এক মাস ডাক্তারের নজরবন্দিতে থাকিবার হুকুম দিলেন। এক মাস পরে ডাক্তারের রিপোর্ট আসিল—গোলাম কাদের সুস্থ সহজ মানুষ, পাগলামির চিহ্নমাত্র তাহার মধ্যে নাই। তারপর বিচার। বিচারে গোলাম কাদের নিজের উকিলের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া স্পষ্ট ভাষায় বলিল, 'আমি খুন করিয়াছি, সে জন্য বিন্দুমাত্র দুঃখিত বা অনুতপ্ত নই। আবার যদি তাহার সহিত দেখা হয়, আবার তাহাকে এমনই ভাবে হত্যা করিব।'

হাইকোর্ট নিরুপায় হইয়া তাহার ফাঁসির হুকুম দিলেন।

আমি শেষ পর্যন্ত আদালতে উপস্থিত ছিলাম। গোলাম কাদেরের জীবননাট্যে বিচারের অঙ্কটা শেষ হইয়া গেলে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

বিচারে তাহার মুক্তির প্রত্যাশা কোন দিনই করি নাই, কিন্তু তবু অকারণে মনটা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল। বুকের নিভৃত স্থানে যেন একটা সংশয় লাগিয়াই রহিল যে, এ সুবিচার হইল না, কোথায় যেন কি একটা অত্যন্ত জরুরী প্রমাণ বাদ পড়িয়া গেল।

এই সব নানা কথা ভাবিতেছি, এমন সময় কয়েকজন পুলিসের লোক আসামীকে বাহিরে লইয়া আসিল। আমি গোলাম কাদেরের মুখের দিকে চাহিতেই সে ইসারা করিয়া আমাকে কাছে ডাকিল। তারপর গলা নামাইয়া বলিল, 'বাবুজী, আপনি আমার মোকদ্দমার শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত আছেন, তাহা আমি দেখিয়াছি। আমি তো চলিলাম, আমার একটি শেষ আর্জি আছে—একবার জেলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন, আমার কিছু বলিবার আছে।'

আমি বলিলাম, 'নিশ্চয় করিব।'

গোলাম কাদের হাতকড়া-বাঁধা দুই হাত তুলিয়া আমাকে সেলাম করিয়া জেলের গাড়িতে চড়িয়া চলিয়া গেল।

তারপর কি করিয়া কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া জেলে তাহার সহিত দেখা করিলাম, সে বিবৃতি এখানে অনাবশ্যক। শুধু কন্‌ডেম্‌ড্ আসামীর কক্ষে বসিয়া মৃত্যুর দুই দিন পূর্বে সে আমাকে যে গল্প বলিয়াছিল, তাহাই বাংলাভাষায় অনুদিত করিয়া আনুপূর্বিক উদ্ধৃত করিতেছি।—

গোলাম কাদের বলিল, 'বাবুজী, আমার এই কাহিনী আপনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আমি যে পাগল নই—আমার এই কথাটি আপনি অবিশ্বাস করিবেন না। সত্য কথা বলিতে কি, আমার কাছেও ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। আমি কিতাব পড়ি নাই, আজীবন মাংস বিক্রয় করিয়াছি। গল্প বানাইয়া বলিবার শক্তি আমার নাই। যাহা আজ বলিব, তাহা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়াই বলিব। অথচ এ সকল ঘটনা আমার—এই গোলাম কাদেরের জীবনে যে ঘটে নাই, তাহাও নিশ্চিত। আপনাকে কেমন করিয়া বুঝাইব জানি না, আমি মূর্খ লোক। শুধু এইটুকু বলিতে পারি যে, ইহা আজিকার ঘটনা নয়, বহু বহু যুগের পুরাতন।

'তবে শুরু হইতেই কথাটা বলি। পনের-ষোল বৎসর পূর্বে আমার স্ত্রী এক কন্যা প্রসব করিতে গিয়া মারা যায়, মেয়েটিও মারা গেল। কি করিয়া জানি না, আমার মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গেল যে, কোনও দুশমন আমার স্ত্রী-কন্যাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছে। শোকের অপেক্ষা ক্রোধ ও প্রতিহিংসায় আমার অন্তঃকরণ অধিক পূর্ণ হইয়া উঠিল; সর্বদাই মনে হইত, যদি সেই অজ্ঞাত দুশমনটাকে পাই, তাহা হইলে তাহার প্রতি অঙ্গ ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া ইহার প্রতিশোধ লই।

'এই ভাবে কিছুদিন কাটিবার পর ক্রমে বুঝিতে পারিলাম যে, ইহা আমার ভ্রান্তি—সত্যের উপর ইহার কোনও প্রতিষ্ঠা নাই। তারপর যত দিন কাটিতে লাগিল, আস্তে আস্তে শোক এবং ক্রোধ দুই ভুলিতে লাগিলাম; কিন্তু আর বিবাহ করিতে পারিলাম না। শেষ পর্যন্ত হয়তো জীবনটা আমার এমনই সহজভাবে কাটিয়া যাইত, যদি না সেদিন অশুভক্ষণে সেই লোকটা আমার দোকানে পদার্পণ করিত।

'শুনিয়াছি, মানুষ জলে ডুবিলে তাহার বিগত জীবনের সমস্ত ঘটনা ছবির মত চোখের পর্দার উপর দেখিতে পায়। এই লোকটাকে দেখিবামাত্র আমারও ঠিক তাহাই হইল। এক মুহূর্তের মধ্যে চিনিয়া লইলাম—এই সেই নৃশংস রাক্ষস, যে আমার স্ত্রী-কন্যা এবং পিতাকে হত্যা করিয়াছিল। ছবির মত সে সকল দৃশ্য আমার চোখের

উপর জাগিয়া উঠিল। মজ্জমান জাহাজের উপর সেই মরণোন্মুখ অসহায় যাত্রীদের হাহাকার কানে বাজিতে লাগিল। ভাস্কো-ডা-গামার সেই ক্রূর হাসি আবার দেখিতে পাইলাম।'

'আমার জজসাহেবরা হত্যার কারণ খুঁজিতেছিলেন, কৈফিয়ৎ চাহিতেছিলেন। বাবুজী, আমি কি কৈফিয়ৎ দিব, আর দিলেই বা তাহা বুঝিত কে?

'আপনি হয়তো বুঝিবেন। আপনার চোখে মুখে আমি তাহার পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাই আপনাকে এই কষ্ট দিয়াছি। ইহাতে ফল কিছু হইবে না জানি, কিন্তু আমার হৃদয়ভার লাঘব হইবে; এ ছাড়া আমার অন্য স্বার্থ নাই।

'আমার এই কসাই-জীবনের ইতিহাসটা এখানেই শেষ করিতেছি। এবার যাহার কথা আরম্ভ করিব, তাহার নাম মির্জা দাউদ বিন্ গোলাম সিদ্কী। আমিই যে এই মির্জা দাউদ, তাহা এখন ভুলিয়া যান। মনে করুন, ইহা আর কাহারও জীবনের কাহিনী।'—

কালিকটের নাম আপনি শুনিয়া থাকিবেন। মালাবার উপকূলে অতি সুন্দর মহার্ঘ মণিখণ্ডের মত একটি ক্ষুদ্র নগর। মোরগের ডাক যতদূর শুনা যায়, ততদূর তাহার নগর-সীমানা। নগরের পশ্চাতে ছোট ছোট পাহাড়, উপত্যকা, কঙ্করপূর্ণ সমতল ক্ষেত্র, এবং তাহার পশ্চাতে অভ্রভেদী পশ্চিমঘাট সমস্ত পৃথিবী হইতে যেন এই স্থানটুকুকে পৃথক করিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছে। সম্মুখে অপার সমুদ্র ভিন্ন কালিকটে প্রবেশ বা নিষ্ক্রমণের অন্য সুগম পথ নাই। এই সমুদ্রপথে অসংখ্য বাণিজ্যতরণী কালিকটের বন্দরে প্রবেশ করে, আবার পাল তুলিয়া সমুদ্রে বিলীন হইয়া যায়। কালিকট যেন পৃথিবীর সমগ্র বণিক-সমাজের মোসাফিরখানা।

পীতবর্ণ চৈনিক, তাম্রবর্ণ বাঙালী, লোহিতবর্ণ পারসিক, কৃষ্ণবর্ণ মুর—সকলেই কালিকটের পথে সমান দর্পে পা ফেলিয়া চলে, কেহ কাহারও অপেক্ষা হীন নহে। চীন হইতে লাক্ষা, দারুশিল্প; ব্রহ্ম হইতে গজদন্ত; মলয়দ্বীপ হইতে চন্দন; বঙ্গ হইতে ক্ষৌম পট্টবস্ত্র, মলমল, ব্যাঘ্রচর্ম; চম্পা ও মগধ হইতে চামর, কস্তুরী, চারু-কেশরার পুষ্পবীজ; দাক্ষিণাত্য হইতে অগুরু, কর্পূর, দারুচিনি; লঙ্কা হইতে মুক্তা আসিয়া কালিকটে স্তূপীকৃত হয়। পশ্চিম হইতে তুরস্ক, পারসিক, আরব ও মুর সওদাগর তাহাই স্বর্ণের বিনিময়ে ক্রয় করিয়া জাহাজে তুলিয়া, কেহ বা পারস্যোপ-সাগরের ভিতর দিয়া ইউফ্রাটেস নদের মোহনায় উপস্থিত হয়, কেহ বা লোহিত সাগরের উত্তর প্রান্তে নীলনদের সন্নিকটে গিয়া তরণী ভিড়ায়। তথা হইতে প্রাচী-র পণ্য সমগ্র পাশ্চাত্য খণ্ডে ছড়াইয়া পড়ে। কালিকটের রাজা সামরী বাণিজ্যতরণীর শুল্ক আদায় করিয়া রাজ্যের ব্যয়ভার নির্বাহ করেন। রাজকোষ সর্বদা সুবর্ণ-মণিমাণিক্যে পূর্ণ। রাজ্যে কোথাও দৈন্য নাই, অশান্তি নাই, অসন্তোষ নাই; ইতর-ভদ্র সকলেই সুখী।

মির্জা দাউদ এই কালিকটের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী। তাঁহার একুশখানি বাণিজ্যতরী আছে,—হোয়াংহো হইতে নীলনদের প্রান্ত পর্যন্ত তাহাদের গতিবিধি। যখন এই তরণী সকল শুভ্র পাল তুলিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সমুদ্রযাত্রায় বাহিত হয়, তখন মনে হয়, রাজহংসশ্রেণী পক্ষ বিস্তার করিয়া নীল আকাশে ভাসিয়া চলিয়াছে।

মির্জা দাউদ জাতিতে মুর। কালিকটে তাঁহার শ্বেত-প্রস্তরের প্রাসাদ মুর-প্রথায় নির্মিত। সুদূর মরক্কো দেশে এখনও তাঁহার বৃদ্ধ পিতা বর্তমান; কিন্তু তিনি কালিকটকেই মাতৃভূমিরূপে বরণ করিয়াছেন। অনেক বৈদেশিক সওদাগরই এরূপ করিয়া

থাকেন। মির্জা দাউদ ধর্মে মুসলমান হইলেও একপত্নীক। সম্প্রতি চৌত্রিশ বৎসর বয়সে প্রথমে একটি কন্যা জন্মিয়াছে। কন্যার জন্মদিনে মির্জা দাউদ এক সহস্র তোলা সুবর্ণ বিতরণ করিয়াছেন—তারপর তাঁহার গৃহে সপ্তাহব্যাপী উৎসব চলিয়াছিল। নগরে ধন্য ধন্য পড়িয়া গিয়াছিল।

বস্তুত মির্জা দাউদের মত সর্বজনপ্রিয় বহু-সম্মানিত ব্যক্তি নগরে আর দ্বিতীয় নাই। উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে। স্বয়ং রাজা সামরী তাঁহাকে বন্ধুর মধ্যে গণ্য করেন। এদিকে ব্যবসায়ে দিন দিন অধিক অর্থাগম হইতেছে। মানুষ পৃথিবীতে যাহা কিছু পাইলে সুখী হয়, কিছুরই তাঁহার অভাব নাই।

একদিন গ্রীষ্মের সায়াহ্নে পশ্চিম দিগ্বলয় রঞ্জিত করিয়া সূর্যাস্ত হইতেছে। সমুদ্রের জল যতদূর দৃষ্টি যায়, রাঙা হইয়া টলমল করিতেছে। দূর লাক্ষাদ্বীপ হইতে সুগন্ধ বহন করিয়া স্নিগ্ধ বায়ু বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। আকাশ মেঘ-নির্মুক্ত।

সমস্ত দিন গরম ভোগ করিয়া নগরের নরনারী শীতল বায়ু সেবন করিবার জন্য এই সময় বন্দরের ঘাটে আসিয়া জমিয়াছে। বহুদূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অর্ধচন্দ্রাকৃতি ঘাট—বড় বড় চতুষ্কোণ পাথর দিয়া বাঁধানো। পাথরের উপর সারি সারি জাহাজ বাঁধিবার লোহার কড়া। জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল ওই ঘাটের কানায় কানায় ভরিয়া উঠে, আবার ভাঁটার সময় সিক্ত বালুকারাশি মধ্যে রাখিয়া দূরে সরিয়া যায়। এই ঘাটই নগরের কর্মকেন্দ্র। ক্রয়-বিক্রয়, দর-দস্তুর, আমোদ-প্রমোদ সমস্তই এই স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। তাই সকল সময় এখানে মানুষের ভিড়।

সে সময় ঘাটে একটিও নবাগত কিংবা বহির্গামী বাণিজ্যতরী ছিল না। কাজকর্ম কিছু শিথিল। নাগরিকগণ নানা বিচিত্র বেশ পরিধান করিয়া কেহ সস্ত্রীক সপুত্রকন্যা পাদচারণ করিতেছে, কেহ উচ্চৈঃস্বরে গান ধরিয়াছে। চঞ্চলমতি কিশোরগণ ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছে, আবার কেহ বা ঘাট হইতে সমুদ্রের জলে লাফাইয়া পড়িয়া সন্তরণ করিতেছে।

চীনদেশীয় এক বাজিকর নানা প্রকার অদ্ভুত খেলা দেখাইতেছে। জনতার মধ্য হইতে মাঝে মাঝে উচ্চ হাসির রোল উঠিতেছে।

বাজিকর একজন স্থূলকায় প্রৌঢ় সিংহলীকে ধরিয়া তাহার কানের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, 'তোমার মাথার মধ্যে ২৫৬টি পাথরের নুড়ি রহিয়াছে, বলো তো বাহির করিয়া দিই।' অমনিই জনতা সোল্লাসে চিৎকার করিয়া উঠিল, 'বাহির কর, বাহির কর।' তখন বাজিকর ক্ষিপ্রহস্তে ক্ষুদ্র চিমটা দিয়া তাহার কর্ণ হইতে সুপারীর মত বড় বড় অসংখ্য পাথর বাহির করিয়া মাটিতে স্তূপীকৃত করিল। প্রৌঢ় সিংহলী বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহা দেখিতে লাগিল। ভারি হাসির একটা ধুম পড়িয়া গেল। একজন পরিহাস করিয়া বলিল, 'শেঠ, তোমার মাথা যে এত নিরেট, তাহা জানিতাম না।'

ক্রমে সূর্য অস্তমিত হইল। সমুদ্রের গায়ে সীসার রং লাগিল। দিগন্তরেখার যে স্থানটায় সূর্য অস্ত গিয়াছিল, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া সন্ধ্যার রক্তিমাভা ধীরে ধীরে সংকুচিত হইয়া আসিতে লাগিল।

এমন সময় দূর সমুদ্রবক্ষে সেই রক্তিমাভার সম্মুখে তিনটি কৃষ্ণবর্ণের ছায়া আবির্ভূত হইল। সকলে দেখিল, তিনখানি জাহাজ বন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

তখন, জাহাজ কোথা হইতে আসিয়াছে, কাহার জাহাজ—ইহা লইয়া ঘাটের দর্শক-দিগের মধ্যে তর্ক চলিতে লাগিল। কেহ বলিল, আরবী জাহাজ, কেহ বলিল, চীনা; কিন্তু অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল—কোন্ দেশীয় জাহাজ, নিশ্চয়রূপে কিছু বুঝা

গেল না।

মির্জা দাউদ ঘাটে ছিলেন। তিনি বহুক্ষণ একদৃষ্টে সেই জাহাজ তিনটির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে তাঁহার মুখে উদ্বেগের চিহ্ন দেখা দিল। তিনি অস্ফুটস্বরে কহিলেন, 'পোর্তুগীজ জাহাজ!—কিন্তু ফিরিঙ্গী কোন্ পথে আসিল?'

তারপর গগনপ্রান্তে দিবা-দীপ্তি নিবিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনটি জীর্ণ সিন্ধুবিধ্বস্ত ক্ষুদ্র পোত ছিন্ন পাল নামাইয়া কালিকটের বন্দরে আসিয়া ভিড়িল।

পরদিন প্রভাতে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মির্জা দাউদ বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, কয়েকজন বিদেশীকে ঘিরিয়া ভারি ভিড় জমিয়া গিয়াছে। ফিরিঙ্গী-গণ অপরিচিত ভাষায় কি বলিতেছে, কেহই বুঝিতেছে না এবং প্রত্যুত্তরে নানা দেশীয় ভাষায় তাহাদের প্রশ্ন করিতেছে। মির্জা দাউদ ভিড় ঠেলিয়া তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া সকলে সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিল।

আগন্তুকদিগের মধ্যে একজন বলিল, 'এখানে পোর্তুগীজ ভাষা বুঝে, এমন কেহ কি নাই? আমি জামোরিনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই—দোভাষী খুঁজিতেছি।'

মির্জা দাউদ দেখিলেন, বক্তা শালপ্রাংশু বিশালদেহ এক পুরুষ। তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, দীর্ঘ স্বর্ণাভ কেশ এবং হ্রস্ব সূচ্যগ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল। ঊর্ধ্বাঙ্গে সোনার জরির কাজ-করা অতি মূল্যবান মখমলের অঙ্গরক্ষা, কটি হইতে জানু পর্যন্ত ঐ মখমলের জাঙিয়া এবং জানু হইতে নিম্নে পদদ্বয় চর্মনির্মিত খাপে আবৃত। মস্তকে টুপির উপর কঙ্কপত্র বক্রভাবে অবস্থিত, এই পুরুষের সহিত অন্য পাঁচ-ছয় জন যাহারা রহিয়াছে, তাহারাও প্রায় অনুরূপ বেশধারী। সকলের কটিবন্ধে তরবারি।

মির্জা দাউদ এই প্রধান পুরুষের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, 'আমি পোর্তুগীজ ভাষা বুঝি।'

নবাগত কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে মির্জা দাউদের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। তাহার মুখ অন্ধকার হইল। সে ধীরে ধীরে কহিল, 'তুমি দেখিতেছি মূর!'

এই তিনটি শব্দের অন্তর্নিহিত যে সুতীক্ষ্ণ ঘৃণা, তাহা মীর্জা দাউদকে বিদ্ধ করিল। তিনিও মনোগত বিদ্বেষ গোপন করিবার চেষ্টা না করিয়া কহিলেন, 'হ্যাঁ, আমি মূর। তোমরা দেখিতেছি পোর্তুগীজ—জলদস্যু; তোমাদের সহিত পরিচয় আমার প্রথম নহে, কিন্তু ফিরিঙ্গীর সঙ্গে আমাদের সদ্ভাব নাই।'

এতক্ষণে দ্বিতীয় একজন পোর্তুগীজ কথা কহিল। তাহার বয়স অল্প, উদ্ধত কণ্ঠে বলিল, 'মূর-কুক্কুরের সহিত আমরা সদ্ভাব রাখি না—মূরের উচ্ছেদ করাই আমাদের ধর্ম।'

নিমেষ মধ্যে মির্জা দাউদের কটি হইতে ছুরিকা বাহির হইয়া আসিল, দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু পরক্ষণেই আগন্তুকদিগের প্রধান ব্যক্তি হাত তুলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিল। বিনীতস্বরে কহিল, 'মহাশয়, আমার এই স্পর্ধিত সঙ্গীকে ক্ষমা করুন। আপনি মূর এবং আমরা পোর্তুগীজ বটে; কিন্তু আমরা উভয়েই ব্যবসায়ী, জলদস্যু নহি। অন্যত্র যাহাই হোক্, এখানে আমার সহিত আপনাদের বিবাদ নাই। বরঞ্চ আপনার হৃদ্যতা লাভ করিলেই আমরা কৃতার্থ হইব।' তারপর নিজ সঙ্গীর দিকে ফিরিয়া বলিল, 'পেড্রো, আর কখনও যদি তোমার মুখে এরূপ কথা শুনিতে পাই, তোমার প্রত্যেক অস্থি চাকায় ভাঙিয়া তারপর ডালকুত্তা দিয়া খাওয়াইব।'

ভয়ে পেড্রোর মুখ পীতবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু তথাপি সে কম্পিত বিদ্রোহের কণ্ঠে কহিল, আমি সত্য কথা বলিতে ভয় করি না। মূরমাত্রেই আমাদের ঘৃণার পাত্র। আপনি নিজেও তো মূরকে—'

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই প্রথম ব্যক্তি বিদ্যুতের মত দুই হাত বাড়াইয়া তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। বজ্রমুষ্টিতে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ তাহার কণ্ঠনালী চাপিয়া থাকিবার পর ছাড়িয়া দিতেই পেড্রো হতজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তাহার প্রতি আর দৃক্‌পাত না করিয়া প্রথম ব্যক্তি মির্জা দাউদের দিকে ফিরিয়া ঈষৎ হাস্যে কহিল, 'মিথ্যাবাদীর দন্ডদান ধার্মিকের কর্তব্য। এখন দয়া করিয়া আমার সহিত জামোরিনের নিকট গিয়া আমার নিবেদন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলে আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিব।'—বলিয়া মাথার টুপি খুলিয়া আভূমি লুণ্ঠিত করিয়া অভিবাদন করিল। দর্শকবৃন্দ—যাহারা পোর্তুগীজ ভাষা বুঝিল না, তাহারা অবাক হইয়া এই দুর্বোধ্য অভিনয় দেখিতে লাগিল।

মির্জা দাউদ আগন্তুকের মিষ্ট বাক্যে ভুলিলেন না, অটল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শেষে ধীরে ধীরে কহিলেন, 'ফিরিঙ্গী, তুমি অতি ধূর্ত। কি জন্য সামরীর রাজ্যে আসিয়াছ, সত্য বল।'

'বাণিজ্য করিতে।'

'খ্রীস্টান, আমি তোমাদের চিনি। কলহ তোমাদের ব্যবসায়, লোভ তোমাদের ধর্ম, পরশ্রীকাতরতা তোমাদের স্বভাব। এ রাজ্যে কলহ-বিদ্বেষ নাই—হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, হিব্রু নির্বিবাদে শান্তিতে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতেছে। সত্য বল, তোমরা কি উদ্দেশ্যে এই হিন্দে পদার্পণ করিয়াছ?'

ফিরিঙ্গীর মুখ রক্তহীন হইয়া গেল। শুধু তাহার চক্ষুযুগল জ্বলন্ত অঙ্গারের মত নিষ্ফল ক্রোধ ও হিংসা বিকীর্ণ করিতে লাগিল; কিন্তু পরক্ষণেই আপনাকে সংবরণ করিয়া সে কণ্ঠবিলম্বিত সুবর্ণ-ক্রুশ হস্তে তুলিয়া বলিল, 'এই ক্রুশ স্পর্শ করিয়া সত্য করিতেছি—সকলের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া বাণিজ্য করা ব্যতীত আমাদের আর অন্য উদ্দেশ্য নাই।'

ক্ষণকাল নিঃশব্দে তাহার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া মির্জা দাউদ কহিলেন, 'তোমার কথা বিশ্বাস করিলাম। চল, সামরীর প্রাসাদে তোমাদের লইয়া যাই।'

তখন বিদেশীরা মির্জা দাউদের অনুসরণ করিয়া রাজপ্রাসাদ অভিমুখে চলিল। পেড্রোর সংজ্ঞাহীন দেহ ঘাটের পাথরের উপর মৃতবৎ পড়িয়া রহিল।

প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া সামরীর সম্মুখে নতজানু হইয়া তাঁহার বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করিয়া পোর্তুগীজ বণিকদিগের অধিনায়ক বলিল, 'আমার নাম ভাস্কো-ডা-গামা—আমি পোর্তুগালের রাজদূত। আপনার নিকট কালিকটে বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি।' এই বলিয়া পোর্তুগাল-রাজ-প্রেরিত মহার্ঘ উপঢৌকন সকল সামরীর সম্মুখে স্থাপন করিতে সঙ্গীগণকে ইঙ্গিত করিল।

মুখে যাহাই বলুন, সন্দেহ এবং অবিশ্বাস মির্জা দাউদের অন্তর হইতে দূর হইল না। তিনি ফিরিঙ্গীকে পূর্ব হইতেই চিনিতেন—মুরমাত্রেই চিনিত। স্বদেশে বহু সংঘর্ষের ভিতর দিয়া এই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। তাহারা জানিত যে, ফিরিঙ্গী অতিশয় অর্থলিপ্সু ও ভোগলুব্ধ। ইহাদের জন্মভূমি অর্থপ্রসূ নহে; তাই অন্নের জন্য ইহাদিগকে দৈহিক ও মানসিক কঠোরতার মধ্যে জীবনযাপন করিতে হয় বটে, কিন্তু এই জন্যই ইহারা অপেক্ষাকৃত ধনী মুসলমানদিগকে অত্যন্ত ঈর্ষা করে। পরের উন্নতি ইহাদের চক্ষুশূল। কোথাও একবার ধনরত্ন-ঐশ্বর্যের সন্ধান পাইলে ইহাদের লালসা ও ক্ষুধা এত উগ্র, নির্মম হইয়া উঠে যে, কোনও মতে সেখানে প্রবেশ লাভ করিয়া নিজেকে

একবার ভালরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে শত্রুমিত্রনির্বিচারে সকলের উপর দুর্বিনীত বাহুবল, স্পর্ধা ও জুলুম প্রকাশ করিতে থাকে। ইহারা নিরতিশয় কলহপ্রিয় ও যুদ্ধ-নিপুণ। স্বার্থরক্ষার জন্য এমন কাজ নাই যাহা ইহারা পারে না এবং স্বজাতির স্বার্থ-বর্ধনের জন্য প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করিতে ইহারা তিলমাত্র কুণ্ঠিত নহে।

পোর্তুগাল হইতে সমুদ্রপথে আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া আজ পর্যন্ত কেহ ভারতবর্ষে আসে নাই, এ পথ এতদিন অজ্ঞাত ছিল। ভাস্কো-ডা-গামা সেই পথ ইউরোপীয়দের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বহু নূতন সম্ভাবনা ও দুর্ভাবনার সৃষ্টি করিল। সম্প্রতি ভাস্কো-ডা-গামার উদ্দেশ্যও নিশ্চয়ভাবে বুঝা যায় না। অথচ উদ্ধত ও কটুভাষী পেড্রোর কণ্ঠরোধ করিয়া সে যে একটা গূঢ় অভিপ্রায় গোপন করিয়া গেল, তাহাও বুঝিতে মির্জা দাউদের বিলম্ব হইল না। শঙ্কা ও সংশয়ের মেঘে তাঁহার মন আচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

পোর্তুগীজগণ কালিকটে বাস করিতে লাগিল এবং দিন দিন নূতন পণ্যে তরণী পূর্ণ করিতে লাগিল। অতি অপদার্থ পণ্য দ্বিগুণ চতুর্গুণ মূল্য দিয়া কিনিতে লাগিল। ইহাতে নির্বোধ ব্যবসায়ীরা যতই উৎফুল্ল হউক না কেন, মির্জা দাউদের ন্যায় বহুদর্শী শ্রেষ্ঠীদের মনে সন্দেহ ততই ঘনীভূত হইয়া উঠিল। উচিত মূল্যের অধিক মূল্য দিয়া পণ্য ক্রয় করা ব্যবসায়ীর স্বভাব নহে, অথচ নবাগতরা অব্যবসায়ী বা নির্বোধ নহে। এ ক্ষেত্রে বাণিজ্য ছলমাত্র, অন্য কোনও দুরভিসন্ধি তাহাদের অন্তরে প্রচ্ছন্ন আছে, ইহা অনুমান করিয়া বিচক্ষণ ব্যবসায়ীদের চিন্তা ও উৎকণ্ঠার অবধি রহিল না।

এইরূপে কিছুকাল বিগত হইল। কালিকটের জীবনপ্রবাহ পূর্ববৎ প্রশান্তভাবে চলিতে লাগিল।

একদিন শরৎকালে মেঘমার্জিত আকাশে শুভ্র পাল উড়াইয়া দুইটি জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে নগরে রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, বঙ্গদেশ হইতে প্রভাকর শ্রেষ্ঠীর নৌকা আসিতেছে। প্রভাকর শেঠ অতি প্রসিদ্ধ বণিক—প্রতি বৎসর এই সময় লক্ষাধিক মুদ্রার বস্ত্রাদি পণ্য বহন করিয়া তাহার তরণী কালিকটে উপস্থিত হয়। কাশ্মীরের শাল, বারাণসীর চেলি, কৌশেয় পট্ট, বাংলার মলমল কিনিবার জন্য কালিকটে সওদাগর-সমাজে হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। এত সুন্দর এবং এত মূল্যবান বস্ত্র কেহই আনিতে পারে না, সেজন্য প্রভাকরের এত খ্যাতি।

প্রভাকরের নৌকা ঘাটে লাগিবার পূর্বেই নগরের বড় বড় ব্যবসায়ীরা ঘাটে সমবেত হইয়াছিলেন। প্রভাকর নৌকার উপর দাঁড়াইয়া পরিচিত সকলকে নমস্কার-সংভাষণাদি করিতে লাগিল। সে অতিশয় বাক্‌পটু ও রহস্যপ্রিয়, এজন্য সকলেই তাহাকে ভাল-বাসিত।

হিব্রু মুশা ইব্রাহিম তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'প্রভাকর, এবার তোমার দেরি দেখিয়া আমরা ভাবিয়াছিলাম, বুঝি আর আসিলে না—পথে তোমাদের সুন্দরবনের কুমীর তোমাকে পেটে পুরিয়াছে।'

প্রভাকর হাসিয়া বলিল, 'মুশা সাহেব, পেটে পুরিলেও কুমীর আমাকে হজম করিতে পারিত না!—এই যে মির্জা সাহেব! আদাব আদাব—শরীর-গতিক সব ভালো তো? এবার আপনার ফরমাশী জিনিস সমস্ত আনিয়াছি, কত লইতে পারেন দেখিব। আপনার কোমরে তলোয়ারখানি নূতন দেখিতেছি, ডামাস্কাসের বুঝি? আমার কিন্তু এক জোড়া চাই—গৌড়েশ্বরের কাছে বাক্যদত্ত হইয়া আছি। ভালো কথা, পথে আসিতে শ্রীখণ্ডের নিকট আপনার যবদ্বীপ-যাত্রী জাহাজের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল—খবর সব ভালো।—হায়দর মুস্তফা যে, ইতিমধ্যে কয়টি সাদি করিলেন? এবার কিন্তু ইস্পাহানী আঙ্গুরের

রস না খাওয়াইলে বড়ই অন্যায় হইবে।—জাম্বো, শাঁখালুর মত দাঁত বাহির করিয়া হাসিস না—দাঁড়িটা ধর্।'

নৌকা বাঁধা হইলে প্রভাকর ঘাটে নামিয়া সকলের সহিত আলিংগনাদি করিল। তখন মির্জা দাউদ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রভাকর, কি কি সওদা আনিলে?'

প্রভাকর বলিল, 'এবার যে মলমল আনিয়াছি, মির্জা সাহেব, তেমন মলমল আজ পর্যন্ত কখনও চোখে দেখেন নাই। মাকড়শার জালের চেয়েও নরম, কাশফুলের চেয়েও হালকা—মুঠির মধ্যে দেড়শ গজ কাপড় ধরা যায়। কিন্তু এক থান কাপড়ের দাম পাঁচ তোলা সোনা, তার কমে দিতে পারিব না। কোচিনে চার তোলা পর্যন্ত দিতে চাহিয়াছিল—আমি লই নাই। শেষে কি লোকসান দিয়া ঘরে ফিরিব। শেঠনী তাহা হইলে আমার মুখ দেখিবে না।'

মির্জা দাউদ হাসিয়া বলিলেন, 'তা না দেখুক। তোমার মুখ না দেখিলেও শেঠনীর কোনও লোকসান হইবে না।—এখন তোমার সওদা দেখাও।'

প্রভাকর বলিল, 'বলেন কি মির্জা সাহেব, লোকসান হইবে না? শেঠনীর এখন যৌবনকাল, কাঁচা বয়স; এখন স্বামীর মুখদর্শন না করিলে জীবন-যৌবন সমস্তই লোকসান হইয়া যাইবে যে!—ভালো কথা, গতবারে শুনিয়াছিলাম, আপনার বিবি-সাহেবা নাকি অসুস্থ। তা কোনও শুভ সংবাদ আছে নাকি?'

মির্জা দাউদ বলিলেন, 'খোদার দয়ায় একটি মেয়ে হইয়াছে—'

প্রভাকর বলিল, 'এত বড় আনন্দের সংবাদ এতক্ষণ চাপিয়া রাখিয়াছিলেন! আমাদের দেশে বলে, মেয়ে হইলে পিতার পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। তাহা হইলে আজ রাত্রে আপনার দৌলতখানায় আমার নিমন্ত্রণ রহিল। দেশে কুক্কুটাদি ভোজনের সুবিধা হয় না—দুষ্প্রাপ্যও বটে, আর ব্রাহ্মণগুলা বড়ই গন্ডগোল করে।—ও বাবা! এটি আবার কে, মির্জা সাহেব? এ রকম পোশাক-পরিচ্ছদ তো কখনও দেখি নাই। ইহারা কোথা হইতে আসিল?'

মির্জা দাউদ ফিরিয়া দেখিলেন, ভাস্কো-ডা-গামা দুই জন সহচর সংগে সেই দিকে আসিতেছে। ইতিমধ্যে কালিকটের পথে-ঘাটে দুই জনের দেখা-সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু কোন পক্ষেই সৌহার্দ্য বর্ধনের আগ্রহ দেখা যায় নাই। বরঞ্চ উভয়ে উভয়কে যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিয়াছেন।

প্রভাকরের প্রশ্নের উত্তরে মির্জা দাউদ কহিলেন, 'ইহারা পোর্তুগীজ। ক্রমে পরিচয় পাইবে।'

ইত্যবসরে প্রভাকরের নৌকা হইতে পণ্যসামগ্রী-সকল পরিদর্শনের জন্য ঘাটে নামানো হইতেছিল। সওদাগরেরা ভিড় করিয়া তাহাই দেখিতেছিলেন। মির্জা দাউদও সেই সংগে যোগ দিলেন। অন্য দিক হইতে ভাস্কো-ডা-গামাও আসিয়া মিলিত হইল।

মলমলের নমুনা দেখিয়া মির্জা দাউদ কহিলেন, 'অতি উৎকৃষ্ট মলমল। প্রভাকর, এ জিনিস কত আনিয়াছ?'

প্রভাকর সগর্বে বলিল, 'পুরা এক জাহাজ।'

দাউদ কহিলেন, 'ভালো, আমি এক জাহাজই লইলাম। দর-দামের কথা আজ রাত্রে স্থির হইবে।'

ভাস্কো-ডা-গামা এরূপ অপূর্ব সূক্ষ্ম মলমল পূর্বে কখনও দেখে নাই। বস্তুত, এত মহার্ঘ মলমল পারস্য দেশ ভিন্ন অন্য কোথাও যাইত না। পোর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশে যাহা যাইত, তাহা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর মলমল। ডা-গামার অন্তর লুব্ধ হইয়া উঠিল। পোপ এবং রাজা ইম্যানুয়েলকে নজর দিতে হইলে

ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু আর কি আছে? সে বলিল, 'এ মলমল আমি কিনিব।'

মির্জা দাউদ হাসিয়া বলিলেন, 'আর উপায় নাই। এই মলমল আমি কিনিয়াছি।'

ডা-গামা প্রভাকরের দিকে ফিরিয়া বলিল, 'আমি অধিক মূল্য দিব।'

মির্জা দাউদ কহিলেন, 'অধিক মূল্য দিলেও পাইবে না—এ মলমল এখন আমার।'

ডা-গামা সেদিকে কর্ণপাত না করিয়া প্রভাকরকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, 'আমি দ্বিগুণ মূল্য দিব।'

মির্জা দাউদ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'শতগুণ দিলেও আর পাইবে না।'

ডা-গামা বিদ্যুদ্‌বেগে মির্জা দাউদের দিকে ফিরিল। কর্কশকণ্ঠে কহিল, 'মূর, চুপ কর্—আমি মালের মালিকের সহিত কথা কহিতেছি।'

প্রভাকর বুদ্ধিমান, মির্জা দাউদ তাহার পুরাতন খরিদ্দার, অথচ এই ব্যক্তিকে সে চেনেও না। সে বলিল, 'উনিই এখন মালের মালিক, আমি কেহ নই। উনি যদি আপনাকে বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, করিতে পারেন।'

ডা-গামার অশিষ্ট কথায় কিন্তু মির্জা দাউদের মুখ ক্রোধে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি তিক্তকণ্ঠে কহিলেন, 'ডা-গামা, পূর্বেও বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু আজ তোর প্রকৃত স্বরূপ ধরা পড়িল। ব্যবসায় তোর ভান মাত্র, তুই তস্কর। নচেৎ অনুচিত মূল্য দিয়া বাণিজ্য নষ্ট করিবি কেন?'

আহত ব্যাঘ্রের মত গর্জন করিয়া ভাস্কো-ডা-গামা নিজ কটি হইতে তরবারি বাহির করিল। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া ক্রোধকষায়িত নেত্রে কহিল, 'স্পর্ধিত মূর, আজ তোর রক্তে তরবারির কলঙ্ক ধৌত করিব।'

মির্জা দাউদও তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া কহিলেন, 'বর্বর ফিরিঙ্গী, আজ তোকে জাহান্নমে পাঠাইব।'

মুহূর্তমধ্যে ব্যগ্র জনতা চতুর্দিকে সরিয়া গিয়া মধ্যে বৃত্তাকৃতি স্থান যুযুৎসুদের জন্য ছাড়িয়া দিল। শান্তিপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র হইলেও এরূপ ব্যাপার কালিকটে একান্ত বিরল নহে। কলহ যখন তরবারি পর্যন্ত পৌঁছায়, তখন তাহা ভঞ্জন করিবার প্রয়াস যে শুধু নিষ্ফল নহে, অত্যন্ত বিপজ্জনক, তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না। তাই সকলে সরিয়া দাঁড়াইয়া অস্ত্রদ্বারা উভয় পক্ষকে বিবাদের মীমাংসা করিবার সুবিধা করিয়া দিল।

ভাস্কো-ডা-গামা ও মির্জা দাউদ প্রথম দৃষ্টিবিনিময়েই পরস্পরকে যে বিষদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, সেই বিষ উভয়ের অন্তরে সঞ্চিত হইয়া আজ সামান্য সূত্র ধরিয়া দুর্নিবার বিরোধরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। এ কলহ যে একজন না মরিলে নিবৃত্ত হইবে না, তাহা উভয়েই মনে মনে বুঝিলেন।

নিস্তব্ধ জনতার কেন্দ্রস্থলে অসিধারী দুই জন দাঁড়াইলেন। ভাস্কো-ডা-গামা বিশালকায়, প্রস্তরের মত কঠিন, হস্তীর মত বলশালী। মির্জা দাউদ অপেক্ষাকৃত কৃশ ও খর্ব; কিন্তু বিষধর কালসর্পের মত ক্ষিপ্র, তেজস্বী ও প্রাণসার। ভাস্কো-ডা-গামার তরবারি বেত্রবৎ ঋজু, তীক্ষ্ণাগ্র; মির্জা দাউদের তরবারি ঈষৎ বক্র ও ক্ষুরধার। নগ্ন কৃপাণহস্তে ক্ষণকালের জন্য দুইজন পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিয়া লইলেন। তারপর ঝড়ের মত তরবারিকে অগ্রবর্তী করিয়া ভাস্কো-ডা-গামা আক্রমণ করিল।

কিন্তু ডা-গামার তরবারি মির্জা দাউদের অঙ্গ স্পর্শ করিবার পূর্বেই তিনি ক্ষিপ্রহস্তে নিজ তরবারি দ্বারা তাহা অপসারিত করিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং পরক্ষণেই তাঁহার বক্র অসি বিদ্যুতের মত একবার ডা-গামার জানু দংশন করিয়া ফিরিয়া আসিল। ডা-গামা পিছু হটিয়া আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তাহার

জানুর চর্মাবরণ ধীরে ধীরে রক্তে ভিজিয়া উঠিল।

ডা-গামা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিল না; কিন্তু সাবধান হইল। সংযত ও সতর্কভাবে অসিচালনা করিতে লাগিল। সে বুঝিল যে, বিপক্ষকে অবজ্ঞা করিলে চলিবে না। মির্জা দাউদের অসি-কৌশল অসাধারণ, তাঁহার সম্মুখে দ্বিতীয়বার ভুল করিলে আর তাহা সংশোধনের অবকাশ থাকিবে না।

এদিকে মির্জা দাউদও বুঝিলেন যে, ডা-গামা অসি-কৌশলে তাঁহার সমতুল্য, কিন্তু তাঁহার অপেক্ষা দ্বিগুণ বলশালী। আবার সে তাঁহার মত ক্ষিপ্রগামী ও লঘুদেহ নয় বটে, কিন্তু তাহার তরবারি ঋজু এবং দীর্ঘ—মির্জা দাউদের তরবারি বক্র এবং খর্ব। তাঁহাদের যুদ্ধরীতিও সম্পূর্ণ পৃথক। এ ক্ষেত্রে, মির্জা দাউদ দেখিলেন, ডা-গামার জয়ের সম্ভাবনাই অধিক। মির্জা দাউদ অত্যন্ত সাবধানে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

সর্প ও নকুলের যুদ্ধে যেমন উভয়ে উভয়ের চক্ষুতে চক্ষু নিবদ্ধ রাখিয়া পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে এবং সুযোগ পাইবামাত্র তীরবেগে আক্রমণ করিয়া আবার স্বস্থানে ফিরিয়া আসে, ডা-গামা ও মির্জা দাউদও সেইরূপে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অস্ত্রে অস্ত্রে প্রতিরুদ্ধ হইয়া মুহুর্মুহুঃ ঝনৎকার উঠিতে লাগিল, চঞ্চল অসিফলকে সূর্যকিরণ পড়িয়া তড়িৎরেখার মত জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। নিস্পন্দ জনব্যূহ সহস্রচক্ষু হইয়া এই অদ্ভুত যুদ্ধ দেখিতে লাগিল।

যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে মির্জা দাউদ বাক্যশূলে ডা-গামাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, 'ফিরিঙ্গী দস্যু, চাহিয়া দেখ্, তোর রক্ত মানুষের রক্তের মত লাল নয়. শয়তানের রক্তের মত নীল! খ্রীস্টান কুত্তা, এখনও ক্ষমা প্রার্থনা কর্—তোর প্রাণ ভিক্ষা দিব।'

ডা-গামা কোনও উত্তর না দিয়া নিঃশব্দে যুদ্ধ করিতে লাগিল। শ্লেষ করিয়া মির্জা দাউদ যে তাহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছেন, চতুর ডা-গামা তাহা বুঝিয়াছিল।

যুদ্ধ ক্রমে আরও প্রখর ও তীব্র হইয়া উঠিল। দুই যোদ্ধারই ঘন ঘন শ্বাস বহিল। সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরিতে লাগিল; কিন্তু উভয়েই যেন এক অদৃশ্য বর্মে আচ্ছাদিত। ডা-গামার তরবারি বার বার মির্জা দাউদের কণ্ঠের নিকট হইতে, বক্ষের নিকট হইতে ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া গেল, মির্জা দাউদের অসি ডা-গামাকে ঘিরিয়া এক ঝাঁক ক্রুদ্ধ মৌমাছির মত গুঞ্জন করিয়া ফিরিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও হুল ফুটাইতে পারিল না।

সহসা এক সময় ডা-গামা সভয়ে দেখিল যে, সে ঘুরিতে ঘুরিতে একেবারে ঘাটের কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর এক পা পিছাইলেই সমুদ্রের জলে পড়িয়া যাইবে। মির্জা দাউদ তাহার মুখের ভাব দেখিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। বিদ্রূপ-বিষাক্ত কণ্ঠে কহিলেন, 'ফিরিঙ্গী, আজ তোকে ঐ সমুদ্রের জলে চুবাইব। তারপর মরা ইঁদুরের মত তোর রাজা ইম্যানুয়েলের কাছে তোকে বকশিশ পাঠাইয়া দিব।'

এতক্ষণে মির্জা দাউদ যাহা চাহিতেছিলেন তাহাই হইল—ভাস্কো-ডা-গামা ধৈর্য হারাইল। উন্মত্ত বন্যমহিষের মত গর্জন করিয়া অসি ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিয়া সে মির্জা দাউদকে আক্রমণ করিল। ইচ্ছা করিলে মির্জা দাউদ অনায়াসে ডা-গামাকে বধ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি তরবারির উল্টা পিঠ দিয়া ডা-গামার দক্ষিণ মুষ্টিতে দারুণ আঘাত করিলেন. সঙ্গে সঙ্গে তাহার তরবারি হস্তমুক্ত হইয়া ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া দূরে গিয়া পড়িল। অকস্মাৎ অস্ত্রহীন হইয়া ডা-গামা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

ডা-গামার দুই জন সহচর এতক্ষণ সকলের সঙ্গে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ দেখিতেছিল। প্রভুর অপ্রত্যাশিত বিপৎপাতে তাহারা সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু দুই

পদ অগ্রসর হইবার পূর্বেই, অতি বিশাল-কলেবর নিকষকৃষ্ণ হাবসী জাম্বো মাস্তুলের ন্যায় দুই হস্ত বাহির করিয়া তাহাদের কেশ ধরিয়া ফিরাইয়া আনিল এবং নিরতিশয় শুভ্র দুইপাটি দন্ত বিনিষ্ক্রান্ত করিয়া যাহা বলিল, তাহার একটি বর্ণও তাহারা বুঝিতে না পারিলেও জাম্বোর মনোগত অভিপ্রায় অনুধাবন করিতে তাহাদের বিন্দুমাত্র ক্লেশ হইল না।

মির্জা দাউদ তরবারির ধার ডা-গামার কণ্ঠে স্থাপন করিয়া কহিলেন, 'ডা-গামা, নতজানু হ, নহিলে তোকে বধ করিব।'

ডা-গামা নতজানু হইল না—বাহুদ্বয়ে বক্ষ নিবদ্ধ করিয়া বিকৃতমুখে হাস্য করিয়া কহিল, 'মূর, নিরস্ত্রকে হত্যা করা তোদের স্বভাব বটে।'

মির্জা দাউদ কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, 'ভালো, তোকে ছাড়িয়া দিব—কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর্—'

ডা-গামা কহিল, 'আমি কোন প্রতিজ্ঞা করিব না, তোর যাহা ইচ্ছা কর্।'

মির্জা দাউদ বলিলেন, 'শপথ কর্ যে, আজ হইতে সপ্তাহ মধ্যে সদলবলে এ দেশ ছাড়িয়া যাইবি, আর কখনও ফিরিবি না।'

ডা-গামা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, কহিল, 'মূর, তুই অতি নির্বোধ! আমি শপথ করিব না, আমাকে বধ কর্। আমার রক্তে কালিকটের মাটি ভিজিলে হিন্দে ইম্যানুয়েলের জয়ধ্বজা সহজে রোপিত হইবে।'

মির্জা দাউদ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'এতদিনে নিজ মুখে নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলি! কিন্তু তাহা হইতে দিব না। ইম্যানুয়েলের জয়ধ্বজা কালিকটে রোপিত হইবে না। কালিকট চিরদিন পৃথিবীর সমস্ত জাতির মিলনক্ষেত্র হইয়া থাকিবে। প্রতিজ্ঞা কর্, নচেৎ—'

ডা-গামা ভ্রুকুটি করিয়া কহিল, 'নচেৎ?'

'নচেৎ পোর্তুগালে ফিরিয়া যাইতে একটি প্রাণীও জীবিত রাখিব না। তোদের জাহাজ পুড়াইয়া এই একশত ত্রিশ জন লোককে কাটিয়া সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া দিব।'

ডা-গামা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কোন উত্তর দিল না।

মির্জা দাউদ পুনশ্চ কহিলেন, 'ডা-গামা, এখনও শপথ কর্—তোর ধর্মের উপর বিশ্বাস করিয়া ছাড়িয়া দিব।—ভাবিয়া দেখ্, তোরা মরিলে কে তোর দেশবাসী ভিক্ষুক-দের পথ দেখাইয়া লইয়া আসিবে?'

ডা-গামা অবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, 'শপথ করিতেছি—'

মির্জা দাউদ কহিলেন, 'তোদের যেশুর জননী মেরীর নামে শপথ কর্।'

ডা-গামা তখন কম্পিত ক্রোধ-জর্জরিত কণ্ঠে শপথ করিল যে, সপ্তাহ মধ্যে এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে এবং আর কখনও ভারতভূমির উপর পদার্পণ করিবে না।

ডা-গামাকে ছাড়িয়া দিয়া মির্জা দাউদ ও আরও প্রধান প্রধান নাগরিকগণ সামরীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সমস্ত বিবরণ আদ্যোপান্ত শুনিয়া সামরী কহিলেন, 'যত-দিন উহারা আমার রাজ্যের কোনও প্রকাশ্য অনিষ্ট না করিতেছে, ততদিন শুধু সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া আমি উহাদিগকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিতে পারি না। তবে কেহ যদি তোমাদের ব্যক্তিগত অনিষ্ট করিয়া থাকে, তোমরা প্রতিশোধ লইতে পার, আমি বাধা দিব না।'

সকলে সামরীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, ইহারা অত্যন্ত কূটবুদ্ধি ও যুদ্ধনিপুণ, তাহাদের কামান, বন্দুক, গোলাগুলি আছে; সুযোগ পাইলেই তাহারা

বাহুবলে এই সোনার রাজ্য অপূর্ব অমরাবতী গ্রাস করিবে।

সামরী হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'আমার সৈন্যবল নাই সত্য, কিন্তু এই সামরীবংশ পঞ্চদশ শতাব্দী ধরিয়া এই মসলন্দে রাজত্ব করিতেছে—কেহ তাহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করে নাই। আমার সিংহাসন সুশাসন ও জনপ্রিয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত। উহারা আমার কি করিতে পারে?'

সকলে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

সপ্তাহ পরে স্বর্ণপত্রে লিখিত সামরীর সন্ধিলিপি মস্তকে ধারণ করিয়া ভাস্কো-ডা-গামা অনুচরসহ জাহাজে উঠিল।

মির্জা দাউদ বন্দর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, 'ডা-গামা, শপথ স্মরণ রাখিও।'

একটা ক্রূর হাস্য ডা-গামার মুখের উপর খেলিয়া গেল, মির্জা দাউদের প্রতি স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া সে বলিল, 'মির্জা দাউদ, আবার আমাদের সাক্ষাৎ হইবে।'

মির্জা দাউদ হাসিয়া উত্তর দিলেন, 'সম্ভব নয়। আমি মুসলমান—বেহেস্তে যাইব।'

ডা-গামা দুই চক্ষুতে অগ্নিবর্ষণ করিয়া কহিল, 'ইহজন্মেই আবার আমাদের সাক্ষাৎ হইবে।'

তারপর ধীরে ধীরে তাহার তিনটি জাহাজ বন্দরের বাহির হইয়া গেল।

চারি বৎসর অতীত হইয়াছে। এই চারি বৎসরে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা এই কাহিনীর অন্তর্গত না হইলেও সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। ভাস্কো-ডা-গামা কালিকট ত্যাগ করিবার দুই বৎসর পরে আবার পোর্তুগীজ জাহাজ ভারতবর্ষে আসিল। এবার পোর্তুগীজদের অধিনায়ক আল্‌ভারেজ কেব্‌লার নামক একজন পাদ্রী এবং তাঁহার অধীনে নয়খানি জাহাজ। পাদ্রী আল্‌ভারেজ কালিকট বন্দরে প্রবেশ করিয়াই জাহাজ হইতে নগরের উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। ফলে বহু নাগরিকের প্রাণনাশ হইল, অনেকে আহত হইল এবং কয়েকটি অট্টালিকা চূর্ণ হইয়া গেল। এইরূপে রাজা-প্রজার মনে ভীতি ও কর্তব্যজ্ঞান সঞ্চারিত করিয়া পোর্তুগীজরা আবার ভারতভূমিতে পদার্পণ করিল। রাজা সামরী আগন্তুকদিগকে সম্মান দেখাইলেন ও তাহাদের বাসের জন্য নগরের বাহিরে ভূমিদান করিয়া কুঠি-নির্মাণের অনুমতি দিলেন। কিন্তু পোর্তুগীজ-দিগের এই অহেতুক জিঘাংসা ও নিষ্ঠুরতায় কালিকটের জনসাধারণের মন তাহাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

তারপর কলহ বাধিতে বিলম্ব হইল না। দাম্ভিক বিদেশীদের প্রতি যাহাদের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল, তাহারা ঝগড়া বাধাইয়া রক্তপাত করিতে লাগিল। পোর্তুগীজরাও জবাব দিল। ক্রমে ভিতরে বাহিরে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। একদিন নাগরিকগণ পোর্তুগীজদের কুঠিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া সত্তর জন ফিরিঙ্গীকে হত্যা করিল। অবশিষ্ট পলাইয়া জাহাজে উঠিল এবং জাহাজ হইতে গোলা মারিয়া নগরের এক অংশে আগুন লাগাইয়া দিল। তারপর সেই যে তাহারা কালিকট ছাড়িয়া গেল, দুই বৎসরের মধ্যে আর ফিরিয়া আসিল না।

কালিকটের রাজা-প্রজা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল—আপদ দূর হইয়াছে, আর ফিরিবে না।

শেষোক্ত ঘটনার বৎসরেক পরে মির্জা দাউদ স্ত্রী-কন্যা লইয়া তাঁহার জন্মভূমি মরক্কো দেশে গেলেন। সেখানে কিছু দিন অবস্থানের পর বৃদ্ধ পিতাকে সঙ্গে লইয়া মক্কাশরীফ দর্শন করিলেন। তারপর তীর্থ-দর্শন শেষ করিয়া সকলে মিলিয়া কালিকটে প্রত্যাবর্তন

করিতেছিলেন।

কথা ছিল, মক্কাশরীফ হইতে মির্জা দাউদ কালিকটে আসিবেন, তাঁহার পিতা মরক্কো দেশে ফিরিয়া যাইবেন। কিন্তু পিতা স্থবির ও জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন—অধিক দিন পরমায়ু নাই। পুনরায় মরক্কো যাইবার সুযোগ হয়তো শীঘ্র হইবে না, ততদিন পিতা বাঁচিবেন কি না, এই সকল বিবেচনা করিয়া মির্জা দাউদ তাঁহাকে ছাড়িলেন না, নিজের সঙ্গে কালিকটে লইয়া চলিলেন। বৃদ্ধও ঈদের চাঁদের মত সুন্দর ক্ষুদ্র নাতিনীটিকে দেখিয়া ভুলিয়াছিলেন—তিনিও বিশেষ আপত্তি করিলেন না।

মক্কাশরীফ দর্শনের সময় কালিকটের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত মির্জা দাউদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি তাঁহাদের বলিলেন, 'আপনারাও কালিকটে ফিরিতেছেন—আমার জাহাজেই চলুন।' তাঁহারা আনন্দিত হইয়া সপরিবারে মির্জা দাউদের জাহাজে আশ্রয় লইলেন।

মক্কা হইতে কালিকট তিন মাসের পথ। জাহাজ যথা সময়ে আরব উপকূল ছাড়িয়া লোহিত সাগর পার হইল। ক্রমে পারস্য উপসাগর উত্তীর্ণ হইয়া ভারত সমুদ্রে আসিয়া পড়িল।

মহাসাগরের বুকের উপর বায়ু-বর্তুলিত পালের ভরে মির্জা দাউদের তরণী দক্ষিণাভিমুখে চলিয়াছে। চারিদিকে অতল জল দুলিতেছে, ফুলিতেছে—লক্ষকোটি-খণ্ডে বিচূর্ণিত দর্পণের মত রবিকরে প্রতিফলিত হইতেছে। পূর্ণ দিগন্তরেখা অখণ্ডভাবে তরণীকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া আছে। কেবল বহুদূরে পূর্বচক্রবালে মেঘের মত কচ্ছভূমির তটবনানী ঈষন্মাত্র দেখা যাইতেছে।

জাহাজে যে অভিজ্ঞ আড়কাঠি আছে, সে বলিয়াছে যে বায়ুর দিক এবং গতি পরিবর্তিত না হইলে অষ্টাহমধ্যে কালিকটে পেঁছানো যাইবে। আশু যাত্রাশেষ কল্পনা করিয়া আরোহীরা সকলেই হৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন।

সেদিন শুক্রবার, সূর্য ক্রমে মধ্যগগন অতিক্রম করিয়া পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল। জাহাজের বিস্তৃত ছাদের উপর মির্জা দাউদ, তাঁহার পিতা ও আর আর পুরুষগণ দ্বিপ্রাহরিক নমাজ প্রায় শেষ করিয়াছেন। জাহাজের নিয়ামক সম্মুখে স্থিরদৃষ্টি করিয়া হালের নিকট নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া আছে। চারিদিক নিস্তব্ধ, শুধু তরণীর বেগবিদীর্ণ জলরাশি ফেন-হাস্যে কল্‌কল্‌ করিতেছে।

এমন সময় আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করিয়া মেঘগর্জনের ন্যায় ভীষণ শব্দে সকলে চমকিত হইয়া দেখিলেন, পশ্চাৎ হইতে পাঁচখানা ফিরিঙ্গী জাহাজ সমস্ত পাল তুলিয়া দিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে অগণ্য দাঁড় বাহিয়া যেন বহুপদবিশিষ্ট অতিকায় জলজন্তুর মত ছুটিয়া আসিতেছে। অতর্কিতে এত নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে যে, জাহাজের মানুষগুলাকে পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। এই আকস্মিক দৃশ্য দেখিয়া সকলেই বুদ্ধিভ্রষ্টের মত সেই দিকে নিস্পলকভাবে তাকাইয়া রহিলেন।

বিস্মিত হইবার মত দৃশ্য বটে! দুই দণ্ড পূর্বেও চতুর্দিকে কোথাও একটা ভেলা পর্যন্ত ছিল না। সহসা সমুদ্রের কোন্‌ অতল গুহা হইতে এই পাঁচটা ভীষণ দৈত্য বাহির হইয়া আসিল? মির্জা দাউদের মন বলিল, আজ আর রক্ষা নাই। কামান দাগিয়া ইহারা নিজ আগমনবার্তা ঘোষণা করিয়াছে—আজ তাহারা দয়ামায়া দেখাইবে না। মুরের রক্তে হিংসা চরিতার্থ করিবার আজ তাহাদের সুযোগ মিলিয়াছে।

এরূপ ঘটনা প্রতীচ্যখণ্ডের সমুদ্রবক্ষে পূর্বে কখনও ঘটে নাই। স্মরণাতীত কাল হইতে এই পথে শত শত তরণী অবাধে যাতায়াত করিয়াছে। চীন হইতে কাস্পীয় হ্রদ পর্যন্ত কেহ কখন হিংস্রিকা বা বোম্বেটের নাম পর্যন্ত শুনে নাই। স্থলপথ

অপেক্ষা জলপথ অধিক নিরাপদ ছিল বলিয়াই জলবাণিজ্য এত প্রসার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু আজ যুগযুগান্তরের বাহিতপণ্য অব্যাহত পথে স্বার্থান্ধ ফিরিঙ্গী তাহার অগ্নি-অস্ত্র লইয়া পথরুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু যুদ্ধদান করা মির্জা দাউদের পক্ষে অসম্ভব। তাঁহার জাহাজ তীর্থযাত্রীর জাহাজ, তাহাতে বারুদ-গোলা কিছুই নাই। আছে কেবল কতকগুলি অসহায় যুদ্ধানভিজ্ঞ ধর্মপরায়ণ তীর্থযাত্রী এবং তদপেক্ষাও অসহায় কতকগুলি নারী ও শিশু। এরূপ অবস্থায় পাঁচখানা রণপোতের সঙ্গে যুদ্ধ করা বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এক উপায় পলায়ন; কিন্তু মির্জা দাউদের জাহাজ কেবল পলের ভরে চলে—বিপক্ষের পাল দাঁড় দুই আছে; এ ক্ষেত্রে পলায়নও সাধ্যাতীত।

মির্জা দাউদ ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে চিন্তা করিলেন। একবার আকাশের দিকে দৃষ্টি করিলেন। আকাশ নির্মেঘ—বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর। রাত্রি হইতে বিলম্ব আছে। তিনি নাবিককে ডাকিয়া সমস্ত পাল তুলিয়া প্রাণপণে জাহাজ ছুটাইতে আজ্ঞা দিলেন।

কিন্তু এই আজ্ঞা পালিত হইতে না হইতে জলদস্যুদিগের পাঁচখানা জাহাজ হইতে একসঙ্গে কামান ডাকিল। একটা গোলা বড় পালের ভিতর ছিদ্র করিয়া জাহাজের পরপারে গিয়া সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিল, অন্যগুলা জাহাজের চারিদিকে জলের উপর পড়িল। কোনটাই কিন্তু জাহাজকে গুরুতর জখম করিতে পারিল না।

জাহাজের পুরুষযাত্রীদের মুখ শুকাইল। নিম্ন হইতে ভীত শিশু ও নারীগণের আর্তস্বর ও ক্রন্দন উঠিল। দন্তে দন্তে চাপিয়া মির্জা দাউদ নাবিকদের হুকুম দিলেন, 'যতক্ষণ পার, জাহাজ চালাও, ফিরিঙ্গী দস্যুর হাতে ধরা দিব না।'

এমন সময় মির্জা দাউদের চারি বৎসরের কন্যা হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপরে উঠিয়া আসিয়া পিতার জানু জড়াইয়া ধরিল। বলিল, 'বাবা, মা তোমাকে ডাকছেন।'—বলিয়া পিতার মুখের দিকে চোখ তুলিয়াই উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, 'বাবা, আমার বড় ভয় করছে।'

মির্জা দাউদ কন্যাকে দুই হাতে তুলিয়া বুকে চাপিয়া ধরিলেন। তাহার কানে কানে কহিলেন, 'হারুণা, কাঁদিস না। তুই মুরের কন্যা—তোর কিসের ভয়? আজ আমরা সকলে একসঙ্গে বেহেস্তে যাইব।'

কন্যাকে পিতার ক্রোড়ে দিয়া মির্জা দাউদ নিচে নামিয়া গেলেন। সম্মুখেই আকুলনয়না স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইল।

নিজ কটি হইতে ক্ষুদ্র মাণিক্যখচিত ছুরিকা পত্নীর হস্তে দিয়া সংযত কণ্ঠে কহিলেন, 'শালেহা, বোধ হয় আজ অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছে। বোম্বেটে জাহাজ পিছু লইয়াছে। যদি উহারা এ জাহাজে পদার্পণ করে, এ ছুরি নিজের উপর ব্যবহার করিও। তার পূর্বে কিছু করিও না। আর অন্যান্য স্ত্রীলোকদের আশ্বাস দিও, অকারণে ভয় না পায়। চলিলাম।'—এই বলিয়া মুহূর্তকালের জন্য পত্নীর মস্তক বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া মির্জা দাউদ উপরে ফিরিয়া গেলেন।

উপরে উঠিয়া দেখিলেন, এই অল্পকাল মধ্যে দস্যুজাহাজগুলি অর্ধচন্দ্রাকারে তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। এত নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদের কণ্ঠস্বর পর্যন্ত স্পষ্ট শুনা যাইতেছে। মির্জা দাউদ দেখিলেন, প্রত্যেক জাহাজ হইতে কামানের মুখ তাঁহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আছে। এত নিকট হইতে এবার আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে না।

মির্জা দাউদের পিতা আসিয়া বলিলেন, 'দাউদ, আর উপায় নাই। ধরা না দিলে জাহাজডুবি হইয়া মরিতে হইবে।'

মির্জা দাউদ কহিলেন, 'ধরা দিলেও নিশ্চয় মরিতে হইবে, তাহার অপেক্ষা ডুবিয়া মরাই শ্রেয়ঃ।'

পিতা বলিলেন, 'সে কথা ঠিক। কিন্তু সঙ্গে শিশু ও স্ত্রীলোক রহিয়াছে। তাহাদের রক্ষা করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে কি?'

মির্জা দাউদ কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, 'কিন্তু দস্যুরা শিশু ও নারীদের দয়া করিবে কি? বরঞ্চ—'

পিতা কহিলেন, 'ফিরিঙ্গী অর্থলোভী, অর্থের বিনিময়ে তাহাদের ছাড়িয়া দিতে পারে।'

অন্যান্য পুরুষগণও বৃদ্ধের বাক্য সমর্থন করিলেন। মির্জা দাউদ তখন কহিলেন, 'ভালো, চেষ্টা করিয়া দেখা যাক্।'

ঠিক এই সময় একখানা জাহাজ হইতে আবার কামান দাগিল। এবার গোলার আঘাতে প্রকাণ্ড মাস্তুল পালসুদ্ধ মড়মড় শব্দে ভাঙিয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে স্তূপীকৃত পালের কাপড়ে আগুন লাগিয়া গেল।

রমণীরা এতক্ষণ পর্যন্ত আব্রু রক্ষা করিয়া জাহাজের খোলের মধ্যেই ছিল, কিন্তু এবার আর লজ্জার বাধা মানিল না। সন্তানবতীরা সন্তান কোলে লইয়া, যাহাদের সন্তান নাই—তাহারা যে যেমন ভাবে ছিল, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে উপরে উঠিয়া আসিল। সকলেই ভয়বিহ্বলা। কেহ ঊর্ধ্বমুখী নতজানু হইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রাণের আকুল আবেদন জানাইতে লাগিল, কেহ শিশু-সন্তানকে দুই হাতে উচ্চে তুলিয়া ধরিয়া জলদস্যুদিগকে দেখাইয়া তাহাদের কৃপা আকর্ষণের চেষ্টা করিতে লাগিল।

এদিকে পালের আগুন ক্রমে বাড়িয়া উঠিয়া জাহাজময় ব্যাপ্ত হইবার উপক্রম করিল। পুরুষগণ তখন সমুদ্র হইতে জল তুলিয়া অগ্নিনির্বাণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বহু কষ্টে অনেক জল ঢালিবার পর অগ্নি নির্বাপিত হইল। তখনকার মত জাহাজ রক্ষা পাইল।

একখানা ফিরিঙ্গী জাহাজ মির্জা দাউদের জাহাজের একেবারে পাশে আসিয়া পড়িয়াছিল। মধ্যে মাত্র একশত গজের ব্যবধান। কামান ঘুরাইয়া তাহারা আবার গোলা ছুঁড়িবার উদ্যোগ করিতেছিল। তখন মির্জা দাউদ উচ্চকণ্ঠে তাহাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, 'গোলা ছুঁড়িও না—আমরা আত্মসমর্পণ করিতেছি।'

কামান ছাড়িয়া তাহারা উল্লাসধ্বনি করিয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে একজন—বোধ হয়, সেই প্রধান নাবিক—কহিল, 'তোমাদের জাহাজে যত অস্ত্র আছে, জলে ফেলিয়া দাও—নাহলে কামান ছুঁড়িব।'

মির্জা দাউদ কহিলেন, 'আমাদের সঙ্গে কোনও অস্ত্র নাই। ইহা তীর্থযাত্রীর জাহাজ। যাহা কিছু ধনরত্ন সঙ্গে আছে, দিতেছি—আমাদের ছাড়িয়া দাও।'

এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় আক্রমণকারী জাহাজের ভিতর হইতে এক জন পুরুষ উপরে উঠিয়া আসিল। অতি মহার্ঘ বেশভূষায় সজ্জিত বিশালদেহ এক পুরুষ। তাহাকে দেখিয়া মির্জা দাউদের বুকের রক্ত সহসা যেন স্তব্ধ হইয়া গেল। চিনিলেন—ভাস্কো-ডা-গামা। তাহার মুখের উপর কৃষ্ণ কাল-সর্পের মত হিংসা যেন কুণ্ডলিত হইয়া আছে। মির্জা দাউদকে দেখিয়া ভাস্কো-ডা-গামা হাসিল। মাথার কঙ্কপত্রযুক্ত টুপি খুলিয়া তাহা আভূমি সঞ্চারিত করিয়া বলিল, 'মির্জা দাউদ, আজ সুপ্রভাত! স্মরণ আছে, বলিয়াছিলাম আবার দেখা হইবে?'

মির্জা দাউদের মুখ দিয়া সহসা কথা বাহির হইল না। ভাস্কো-ডা-গামা তখন পূর্বোক্ত প্রধান নাবিকের দিকে ফিরিয়া কঠোর কণ্ঠে কহিল, 'কাপ্তেন, কামান নীরব

কেন? আমার হুকুম কি ভুলিয়া গিয়াছ?'

ভীত কাপ্তেন বলিল, 'প্রভু, উহারা ধনরত্ন দিয়া পরিত্রাণের আর্জি করিতেছে।'

দুই জাহাজ ক্রমে আরও নিকটবর্তী হইতেছিল। ডা-গামা আবার মির্জা দাউদের দিকে ফিরিয়া শ্লেষতীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল, 'মুর, ধনরত্ন দিয়া প্রাণভিক্ষা চাও?'

মির্জা দাউদ কহিলেন, 'নিজের প্রাণভিক্ষা চাহি না। আমাদের সর্বস্ব লইয়া বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের ছাড়িয়া দাও।'

ডা-গামা শত্রুর লাঞ্ছনার মিষ্ট রস অল্প অল্প করিয়া পান করিতে লাগিল, কহিল, 'বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের ছাড়িয়া দিব? কিন্তু তাহাতে আমাদের লাভ? বরঞ্চ তোমরা যুবতী নারীদের আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়া পুরুষগণ প্রাণ বাঁচাইতে পার। আমাদের জাহাজে স্ত্রীলোকের কিছু প্রয়োজন হইয়াছে। আমার নিজের জন্য নয়—খালাসিদের জন্য। আমার নারীতে রুচি নাই।'

ক্রোধে অপমানে মির্জা দাউদের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। বুঝিলেন, ডা-গামা তাঁহাকে লইয়া খেলা করিতেছে। অতি কষ্টে আত্মদমন করিয়া কহিলেন, 'ডা-গামা, তোমার প্রস্তাবের উত্তর দিতে ঘৃণা হইতেছে। যদি অভিরুচি হয়, আমাদের সহিত যাহা মূল্যবান সামগ্রী ও স্বর্ণ রৌপ্য আছে, তাহা লইয়া আমাদের নিষ্কৃতি দাও। নতুবা কিছুই পাইবে না।'

ডা-গামা ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, 'কিছুই পাইব না, তার অর্থ?'

মির্জা দাউদ কহিলেন, 'তার অর্থ—জোর করিলে আমাদের মারিয়া ফেলিতে পারিবে, কিন্তু কিছু লাভ করিতে পারিবে না। যদি আমার জাহাজে চড়াও করিবার চেষ্টা কর, তক্তা খুলিয়া জাহাজ ডুবাইয়া দিব।'

মির্জা দাউদের কথা শুনিয়া ডা-গামার ভ্রূকুটি গভীরতর হইল, সে নতমুখে চিন্তা করিতে লাগিল।

এদিকে জাহাজের মাস্তুল ভাঙিয়া যাওয়ায় মির্জা দাউদ পঙ্কে নিবদ্ধ হস্তীর মত চলচ্ছক্তিহীন। ফিরিঙ্গীর পাঁচখানা জাহাজ ধীরে ধীরে তিন দিক হইতে ঘিরিয়া আরও নিকটবর্তী হইতে লাগিল।

মির্জা দাউদ অধীর হইয়া কহিলেন, 'ডা-গামা, যাহা করিবে, শীঘ্র কর। আমাদের সহিত বারশত তোলা সোনা আছে—আরও অন্যান্য মহার্ঘ বস্তু আছে; যদি পাইতে ইচ্ছা কর, শীঘ্র বল। অধিক বিলম্ব করিলে সব হারাইবে।'

ডা-গামা বলিল, 'রমণীদের দিবে না?'

মির্জা দাউদ গর্জিয়া উঠিলেন, 'না, দিব না। আমরা স্ত্রী-কন্যার ব্যবসা করি না।'

ডা-গামা কহিল, 'মুর, এখনও তোর স্পর্ধা কমিল না!—ভালো, অর্থই লইব। তোমার জাহাজে যাহা কিছু আছে, ভেলায় করিয়া আমার জাহাজে পাঠাও।'

'যাহা কিছু আছে, পাইলে ছাড়িয়া দিবে?'

'দিব।'

'তোমাকে বিশ্বাস কি?'

'আমি মিথ্যা কথা বলি না।'

'মিথ্যাচারি, শপথ করিয়াছিলে কখনও হিন্দে পদার্পণ করিবে না, তাহার কি হইল?'

ডা-গামা হাসিয়া বলিল, 'এখনও হিন্দে পদার্পণ করি নাই।'

মির্জা দাউদ তখন অন্যান্য সকলের সহিত পরামর্শ করিলেন। সকলেই কহিলেন, উহাদের কবলে যখন পড়িয়াছি, তখন উহাদের কথায় বিশ্বাস করা ভিন্ন উপায় নাই।

অগত্যা মির্জা দাউদ সম্মত হইলেন।

তখন এক ভেলা প্রস্তুত করিয়া তাহারই উপর যাহা কিছু ছিল, এমন কি, নারীগণের অলংকার পর্যন্ত তুলিয়া ডা-গামার জাহাজে পেঁাছাইয়া দেওয়া হইল।

ডা-গামা জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমাদের আর কিছু নাই?'

'না।'

'আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি—নারীদের দিবে না?'

অসহ্য ক্রোধে মির্জা দাউদের বাক্‌রুদ্ধ হইয়া গেল। শুধু তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় অগ্নিশিখার মত জ্বলিতে লাগিল।

ভাস্কো-ডা-গামা কালকূটের মত হাসিল। বলিল, 'ভালো, তোমাদের যেরূপ অভিরুচি।' তারপর কাপ্তেনের দিকে ফিরিয়া বলিল, 'কাপ্তেন, গোলা মারিয়া উহাদের জাহাজে আগুন লাগাইয়া দাও। আজ মুসলমান কুকুরগুলাকে পুড়াইয়া মারিব।'

মির্জা দাউদ চিৎকার করিয়া উঠিলেন, 'শঠ! বিশ্বাসঘাতক! মিথ্যাবাদী শয়তান!'

ডা-গামা কহিল, 'মির্জা দাউদ, তোর প্রাণরক্ষা করিতে পারে, এত অর্থ পৃথিবীতে নাই। তবে তুই তোর স্ত্রীর বিনিময়ে এখনও প্রাণরক্ষা করিতে পারিস। তোর স্ত্রীকে আমি বাঁদী করিয়া রাখিব।'

মির্জা দাউদ উন্মত্তের মত গর্জন করিতে লাগিলেন, 'শয়তান! শয়তান!'

জাহাজে ভীষণ কোলাহল উঠিল। নর-নারী সকলে পাগলের মত চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। সকলেই যেন এই অভিশপ্ত জাহাজ হইতে পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। চতুর্দিক হইতে আর্তরব উঠিল 'রক্ষা কর! দয়া কর! প্রাণ বাঁচাও!'

এই আকুল প্রার্থনার জবাব আসিল। সহসা শিলাবৃষ্টির মত জাহাজের উপর বন্দুকের গুলি পড়িতে লাগিল। কেহ হত, কেহ আহত হইয়া পড়িতে লাগিল। মৃত্যুর বিভীষিকা যেন ভীষণতর রূপ ধরিয়া দেখা দিল।

মির্জা দাউদের পিতা ক্ষুদ্র হারুণাকে বক্ষে লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পুত্রের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্খলিত কণ্ঠে একবার শুধু ডাকিলেন, 'দাউদ!'

দুর্দম আবেগে মির্জা দাউদ একসঙ্গে পিতা ও কন্যাকে জড়াইয়া ধরিলেন, এমন সময় লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়া শালেহা আসিয়া স্বামীর হস্ত ধরিয়া দাঁড়াইলেন।

মির্জা দাউদ বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে একবার তিন জনের মুখের দিকে চাহিলেন। তারপর অবরুদ্ধ স্বরে কহিলেন, 'পিতা, ঈশ্বর কি নাই?'

সহসা হারুণা ক্ষুদ্র একটি কাতরোক্তি করিয়া এলাইয়া পড়িল। দ্রুত কন্যাকে নিজের ক্রোড়ে লইয়া মির্জা দাউদ দেখিলেন, তাহার দেহে প্রাণ নাই। নিষ্ঠুর গুলি তাহার বক্ষে প্রবেশ করিয়াছে।

তারপর দ্রুত অনুক্রমে স্ত্রী ও পিতা গুলির আঘাতে মাটিতে পড়িয়া গিয়া মরণযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। ভাস্কো-ডা-গামা তখন স্বয়ং ধূমায়িত বন্দুক হাতে করিয়া পিশাচের মত উচ্চ হাসি হাসিতেছে।

সূর্য তখন পশ্চিম দিগন্তরেখা স্পর্শ করিয়াছে। আকাশ এবং সমুদ্র তপ্ত রক্তের মত রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সাগরবক্ষে সূর্যাস্ত হইতেছে।

এইবার পাঁচখানা জাহাজ হইতে এককালে কামান ডাকিল। গোলার সংঘাতে শীতার্ত বৃদ্ধের মত মির্জা দাউদের জাহাজখানা কাঁপিয়া উঠিল। পালের কাপড়ে দপ করিয়া আবার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে টলিতে টলিতে জাহাজ নিমজ্জিত হইতে লাগিল। আবার কামান গর্জিল। এবার জাহাজের সম্মুখ দিকটা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। কল্‌কল্ শব্দে জল ঢুকিতে লাগিল।

তারপর নিমেষের মধ্যে সমস্ত শেষ হইয়া গেল। আরোহীদের মিলিত কণ্ঠ হইতে এক মহা হাহাকার-ধ্বনি উঠিল। জ্বলন্ত জাহাজ অকস্মাৎ জীবিতবৎ সোজা দাঁড়াইয়া উঠিল; তারপর সবেগে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিল। যাত্রীদের ঊর্ধ্বোত্থিত কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হইয়া গেল। মুহূর্তপূর্বে যেখানে জাহাজ ছিল, সেখানে আবর্তিত তরঙ্গশীর্ষ জলরাশি ক্রীড়া করিতে লাগিল।

ফিরিঙ্গী জাহাজগুলি চিত্রার্পিতবৎ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রায়ান্ধকারে তাহাদিগকে যেন অন্য জগতের কোন ভৌতিক তরণীর মত দেখাইতে লাগিল।

ক্ষণকাল পরে সান্ধ্য নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া ভাস্কো-ডা-গামার জাহাজ হইতে দামামা ও তূর্য বাজিয়া উঠিল।

সূর্য তখন সমুদ্রপারে অস্তমিত হইয়া অন্য কোন্ নূতন গগনে উদিত হইয়াছে।

১৯৩০

মৃৎপ্রদীপ

প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা মাটি খুঁড়িয়া অধুনালুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক জীবের যে সকল অস্থি-কঙ্কাল বাহির করেন, তাহাতে রক্তমাংস সংযোগ করিয়া তাহার জীবিত-কালের বাস্তব মূর্তিটি তৈয়ারি করিতে গিয়া অনেক সময় তাঁহাদিগকে নিছক কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়। ফলে যে মূর্তি সৃষ্টি হয়, সত্যের সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে কি না এবং থাকিলেও তাহা কতদূর, সে সম্বন্ধে মতভেদ ও বিবাদ-বিসংবাদ কিছুতেই শেষ হয় না।

আমাদের দেশের ইতিহাসও কতকটা ঐ ভূ-প্রোথিত অতিকায় জন্তুর মতো। যদি বা বহু ক্লেশে সমগ্র কঙ্কালটুকু পাওয়া যায়, তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হওয়া দূরের কথা, তাহার সজীব চেহারাখানা যে কেমন ছিল তাহা আংশিকভাবে প্রতিপন্ন হইবার পূর্বেই বড় বড় পণ্ডিতেরা অত্যন্ত তেরিয়া হইয়া এমন মারামারি কাটাকাটি শুরু করিয়া দেন যে, রথি-মহারথী ভিন্ন অন্য লোকের সে কুরুক্ষেত্রের দিকে চক্ষু ফিরাইবার আর সাহস থাকে না। এবং যুদ্ধের অবসানে শেষ পর্যন্ত সেই কঙ্কালের বিভিন্ন হাড় কয়খানাই রণাঙ্গনে ইতস্ততঃ পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়।

তাই, যখনই আমাদের জন্মভূমির এই কঙ্কালসার ইতিহাসখানা আমার চোখে পড়ে তখনই মনে হয়, ইহা হইতে আসল বস্তুটির ধারণা করিয়া লওয়া সাধারণ লোকের পক্ষে কত না দুরূহ ব্যাপার। যে মৃৎপ্রদীপের কাহিনী লিখিতে বসিয়াছি, তাহারই কথা

ধরি না কেন। প্রাচীন পাটলিপুত্রের যে সামান্য ধ্বংসাবশেষ খনন করিয়া বাহির করা হইয়াছে, তাহারই চারিপাশে স্বপ্নাবিষ্টের মতো ঘুরিতে ঘুরিতে জঞ্জাল-স্তূপের মধ্যে এই মৃৎপ্রদীপটি কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম। নিতান্ত একেলে সাধারণ মাটির প্রদীপের মতোই তাহার চেহারা, ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া প্রায় কাগজের মতো পাতলা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এতকাল পরেও তাহার মুখের কাছটিতে একটুখানি পোড়া দাগ লাগিয়া আছে। এই নোনাধরা জীর্ণ বিশেষত্ববর্জিত প্রদীপটি দেখিয়া কে ভাবিতে পারে যে, উহার মুখের ঐ কালির দাগটুকু একদিন ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠাকে একেবারে কালো করিয়া দিয়াছিল এবং উহারই ঊর্ধ্বোত্থিত ক্ষুদ্র শিখার বহ্নিতে একটা রাজ্য পুড়িয়া ছারখার হইয়া গিয়াছিল।

অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকেরা বোধ করি অবহেলা করিয়া এই তুচ্ছ প্রদীপটা ফেলিয়া মিউজিয়ামে স্থান দেন নাই। আমি সযত্নে কুড়াইয়া আনিয়া সন্ধ্যার পর আমার নির্জন ঘরে মধুমিশ্রিত গব্য ঘৃত দিয়া উহা জ্বালিলাম। কতদিন পরে এ প্রদীপ আবার জ্বলিল? পুরাবৃত্তের কোন্ মসীলিপ্ত অধ্যায়কে আলোকিত করিল? বিজ্ঞ পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তাহা কোথা হইতে জানিবেন? উহার অঙ্গে তো তাম্রশাসন-শিলালিপি লটকানো নাই! সে কেবল আমার,—এই জাতিস্মরের মস্তিষ্কের মধ্যে দুরপনেয় কলঙ্কের কালিমা দিয়া মুদ্রিত হইয়া আছে।

প্রদীপ জ্বলিলে যখন ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া বসিলাম, তখন নিমেষমধ্যে এক অদ্ভুত ইন্দ্রজাল ঘটিয়া গেল। স্তম্ভিত কাল যেন অতীতের সঙ্গী এই প্রদীপটাকে আবার জ্বলিয়া উঠিতে দেখিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে পিছু ফিরিয়া তাকাইয়া রহিল। এই পাটলিপুত্র নগর মন্ত্রবলে পরিবর্তিত হইয়া কবেকার এক অখ্যাত মগধেশ্বরের মহাস্থানীয় রাজধানীতে পরিণত হইল। আর আমার মাথার মধ্যে যে স্মৃতিপুঞ্জগুলি এতক্ষণ স্বপ্নের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তাহারা সজীব হইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ঘটনা—কত নগণ্য অনাবশ্যক কথা—এই বর্তিকার আলোকে দীপ্তিমান জীবন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিল। আমার সম্মুখ হইতে বর্তমান মুছিয়া একাকার হইয়া গেল, কেবল অতীতের বহুদূর জন্মান্তরের স্মৃতি ভাস্বর হইয়া জ্বলিতে লাগিল।

সেই প্রদীপ সম্মুখে ধরিয়া তাহারই আলোতে আজ এই কাহিনী লিখিতেছি।

আজ হইতে ষোল শতাব্দী আগেকার কথা।

ক্ষুদ্র ভূস্বামী ঘটোৎকচগুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবি রাজবংশে বিবাহ করিয়া শ্যালককুলের বাহুবলে পাটলিপুত্র দখল করিয়া রাজা হইলেন। রাজা হইলেন বটে, কিন্তু নামে মাত্র। পট্টমহাদেবী লিচ্ছবিদুহিতা কুমারদেবীর দুর্ধর্ষ প্রতাপে চন্দ্রগুপ্ত মাথা তুলিতে পারিলেন না। রাজমুদ্রায় রাজার মূর্তির সহিত মহাদেবীর মূর্তি ও লিচ্ছবিকুলের নাম উৎকীর্ণ হইতে লাগিল। রাজার নামে রাণী স্বেচ্ছামত রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। রাজা একবার নিজ আজ্ঞা প্রচার করিতে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার আজ্ঞা কেহ মানে না। চন্দ্রগুপ্ত বীরপুরুষ ছিলেন, তাঁহার আত্মাভিমানে আঘাত লাগিল; কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না। নিষ্ফল ক্রোধে শক্তিশালী শ্যালককুলের প্রতি বক্রদৃষ্টিপাত করিয়া তিনি মৃগয়া, সুরা ও দ্যূতক্রীড়ায় মনোনিবেশ করিলেন।

প্রজাদের তাহাতে বিশেষ আপত্তি ছিল না। রাজা বা রাণী যিনিই রাজত্ব করুন, তাহাদের কিছু আসে যায় না। মহামারী, দুর্ভিক্ষ অথবা যুদ্ধের হাঙ্গামা না থাকিলেই

তাহারা সন্তুষ্ট। কাণ্ববংশ লুপ্ত হইবার পর বহুবর্ষব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহ অন্তর্বিবাদে দেশ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। প্রকাণ্ড মগধ সাম্রাজ্য বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন সতীদেহের ন্যায় খণ্ড খণ্ড হইয়া বহু ক্ষুদ্র রাজ্যের সমষ্টিতে দাঁড়াইয়াছিল। ক্ষুদ্র রাজারা ক্ষুদ্র কারণে পরস্পর কলহ করিয়া প্রজার দুর্গতি বাড়াইয়া তুলিয়াছিলেন। এই সময় চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্র ও তাহার পারিপার্শ্বিক ভূখণ্ড অধিকার করিয়া কিছু শান্তি আনয়ন করিয়াছিলেন। শান্তিতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পাইয়া প্রজারা তৃপ্ত ছিল, রাজা বা রাণী—কে প্রকৃতপক্ষে রাজ্যশাসন করিতেছেন, তাহা দেখিবার তাহাদের প্রয়োজন ছিল না।

যাহা হউক, তরুণী পট্টমহিষী একমাত্র শিশুপুত্র সমুদ্রগুপ্তকে ক্রোড়ে লইয়া রাজ-অবরোধ হইতে প্রজাশাসন করিতেছেন, দেশে নিরুপদ্রব শান্তিশৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছে, এমন সময় একদিন শরৎকালের নির্মল প্রভাতে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত নগরোপকণ্ঠের বনমধ্যে মৃগয়া করিতে গেলেন। মহারাজ মৃগয়ায় যাইবেন, সুতরাং পূর্ব হইতে বনমধ্যে বস্ত্রাবাস ছাউনি পড়িল। কারুকার্যখচিত রক্তবর্ণের পট্টাবাস সকল অকালপ্রফুল্ল কিংশুকগুচ্ছের ন্যায় বনস্থলী আলোকিত করিল। কিঙ্করী, নর্তকী, তাম্বুলিক, সংবাহক, সূপকার, নর্মাপিত প্রভৃতি বহুবিধ দাসদাসী কর্ম-কোলাহলে ও আনন্দ-কলরবে কাননলক্ষ্মীর বিশ্রব্ধ শান্তি ভঙ্গ করিয়া দিল। তারপর যথাসময়ে পারিষদ-পরিবেষ্টিত হইয়া সুরারুণনেত্র মগধেশ্বর মৃগয়াস্থলে উপস্থিত হইলেন।

প্রভাতে দ্যূতক্রীড়া ও তিত্তিরি-যুদ্ধ দর্শন করিয়া চন্দ্রগুপ্ত আনন্দে কালহরণ করিলেন। দ্বিপ্রহরে পানভোজনের পর অন্য সকলকে শিবিরে রাখিয়া মাত্র চারিজন বয়স্য সঙ্গে মহারাজ অশ্বারোহণে অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বয়স্যরা সকলেই মহারাজের সমবয়স্ক যুবা, সকলেই সমান লম্পট ও উচ্ছৃঙ্খল। চাটূর্মিশ্রিত ব্যঙ্গ-পরিহাস করিতে করিতে তাহারা মহারাজের সঙ্গে চলিল।

মৃগ-অন্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে প্রায় দিবা তৃতীয় প্রহরে এক ক্ষুদ্র স্রোত-স্বিনীর কূলে সহসা তাঁহাদের গতিরোধ হইল। সর্বাগ্রে মহারাজ দেখিলেন, তটিনীর উচ্চ তটের উপর ছিন্নমৃণাল কুমুদিনীর মতো এক নারীমূর্তি পড়িয়া আছে। দেহে বস্ত্র কিংবা আভরণ কিছুই নাই—সম্পূর্ণ নগ্ন। কণ্ঠে, প্রকোষ্ঠে, কর্ণে অল্প রক্ত চিহ্ন। দেখিলে বুঝা যায়, দস্যুতে ইহার সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া পলাইয়াছে।

রাজা ত্বরিদপদে অশ্ব হইতে নামিয়া রমণীমূর্তির নিকটে গেলেন। নির্নিমেষ নেত্রে তাহার নগ্ন দেহ-লাবণ্যের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নারীর বয়স ষোড়শ কি সপ্তদশের অধিক হইবে না। নবোদ্ভিন্ন যৌবনের পরিপূর্ণ বিকশিত রূপ; রাজা দুই চক্ষু ভরিয়া পান করিতে লাগিলেন। তাহার পর নতজানু হইয়া সন্তর্পণে বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া দেখিলেন—প্রাণ আছে, দ্রুত হৃৎস্পন্দন অনুভূত হইতেছে।

বয়স্য চারিজন ইতিমধ্যে রাজার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল ও লুব্ধদৃষ্টিতে সংজ্ঞাহীনার অনাবৃত সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করিতেছিল। সহসা রাজা তাহাদের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "এ নারী কাহার?"

রাজার আরক্ত মুখমণ্ডল ও চক্ষুর ভাব দেখিয়া বয়স্যগণ পরিহাস করিতে সাহসী হইল না। একজন কুণ্ঠাজড়িত কণ্ঠে বলিল, "রাজ্যের সকল নর-নারীই মহারাজের।"

মহারাজ বোধ করি অন্য কিছু ভাবিয়া এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু এইরূপ উত্তর পাইয়া তিনি প্রদীপ্ত দৃষ্টিতে দ্বিতীয় বয়স্যের দিকে ফিরিলেন। পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "এ নারী কাহার?"

মন বুঝিয়া বয়স্য বলিল, "মহারাজের।"

তৃতীয় বয়স্যের দিকে ফিরিয়া চন্দ্রগুপ্ত জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিলেন।

কিন্তু তৃতীয় বয়স্য—সে অন্তরের দুর্দম লালসা গোপন করিতে পারিল না—ঈষৎ হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "দস্যু-উপদ্রুতা নারী শ্রীমৎ মগধেশ্বরের ভোগ্যা নয়। এই নারীদেহটা মহারাজ অধমকে দান করুন।"

বারুণী-কষায়িত নেত্র কিছুক্ষণ তাহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া মহারাজ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বিট, স্বর্গের পারিজাত লইয়া তুই কি করিবি? এ নারী আমার!"—এই বলিয়া উষ্ণীষ খুলিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রজালে রমণীর সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া দিলেন।

লুব্ধ বয়স্য তখনও আশা ছাড়ে নাই—রূপসীর প্রতি সতৃষ্ণ একটা কটাক্ষ হানিয়া বলিল, "কিন্তু মহারাজ, এ অনুচিত। পট্টমহাদেবী শুনিলে..."

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় রাজা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। কর্কশ কণ্ঠে কহিলেন, "পট্টমহাদেবী? রে পীঠমর্দ, পট্টমহাদেবী আমার ভর্ত্রী নয়, আমি তাঁর ভর্তা—বুঝিলি? এ রাজ্য আমার, এ নারী আমার—পট্টমহাদেবীর নয়।"

এই আকস্মিক উগ্র ক্রোধে বয়স্যগণ ভয়ে নিশ্চল বাক্‌শূন্য হইয়া গেল। চন্দ্রগুপ্ত নিজেকে কিঞ্চিৎ সংযত করিয়া কহিলেন, "এই নারীকে আমি মহিষীরূপে গ্রহণ করিলাম। বয়স্যগণ, মহাদেবীকে প্রণাম কর।"

যন্ত্রচালিতবৎ বয়স্যগণ প্রণাম করিল।

তখন সেই সংজ্ঞাহীন দেহ সন্তর্পণে বক্ষে তুলিয়া মহারাজ অশ্বারোহণে শিবিরে ফিরিয়া চলিলেন। মূর্ছিতার অবেণীবদ্ধ মুক্ত কুন্তল কৃষ্ণ ধূমকেতুর মতো পশ্চাতে উড়িতে উড়িতে চলিল।

শিবিরে ফিরিয়া সংজ্ঞালাভ করিবার পর রমণী যে পরিচয় দিল তাহা এইরূপঃ—

তাহার নাম সোমদত্তা। সে শ্রাবস্তীর এক শ্রেষ্ঠীর কন্যা, পিতার সহিত চম্পাদেশে যাইতেছিল, পথে আটবিক দস্যু কর্তৃক অপহৃতা হয়। তাহার পিতাকে দস্যুরা মারিয়া ফেলে। অতঃপর দস্যুপতি তাহার রূপযৌবন দেখিয়া তাহাকে আত্মসাৎ করিতে মনস্থ করে। অন্য দস্যুগণ তাহাতে ঘোরতর আপত্তি করিল। ফলে তাহারা পরস্পরের সহিত বিবাদ-বিসংবাদ আরম্ভ করিল এবং একে অন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিতে গিয়া, যাহাকে লইয়া কলহ তাহাকেই অরক্ষিত ফেলিয়া গেল। যাইবার সময় একজন চতুর দস্যু, পাছে সোমদত্তা কোথাও পলায়ন করে, এই ভয়ে তাহার বস্ত্র কাড়িয়া লইয়া তাহাকে অজ্ঞান করিয়া রাখিয়া যায়।

যথাকালে চন্দ্রগুপ্ত সোমদত্তাকে দোলায় তুলিয়া নগরে লইয়া গেলেন। শাস্ত্রমত বিবাহ হইল কি না জানা গেল না, যদি বা হইয়া থাকে তাহা গান্ধর্ব কিংবা পৈশাচ-জাতীয়। যাহা হউক, দাসীসহচরীপরিবৃতা সোমদত্তা রাজপুরীর পুরন্ধ্রী হইয়া বাস করিতে লাগিল। তাহার অবস্থানের জন্য মহারাজ একটি স্বতন্ত্র মহল নির্দেশ করিয়া দিলেন।

কুমারদেবী রাজার এই দুষ্যন্ত-উপাখ্যান শুনিলেন, কিন্তু ঘৃণাভরে কোনও কথা বলিলেন না। বিশেষতঃ, সেকালে রাজাদের পক্ষে ইহা এমন কিছু গর্হিত কার্য ছিল না। একাধিক পত্নী ও উপপত্নী সকল রাজ-অন্তঃপুরেই স্থান পাইত। এমন কি, প্রকাশ্য বেশ্যাকে বিবাহ করাও রাজন্যসমাজে অপ্রচলিত ছিল না। কুমারদেবী অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত পুত্রকে সম্মুখে রাখিয়া রাজকার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত মধুভাণ্ডের নিকট ষট্‌পদের মতো সোমদত্তার পদপ্রান্তে পড়িয়া রহিলেন।

এইরূপে ছয় মাস কাটিল।

তারপর একদিন চূত-মধুক-সুগন্ধি বসন্তকালের প্রারম্ভে জলস্থল অন্ধকার করিয়া পঙ্গপালের মতো এক বিরাট বাহিনী দেশ ছাইয়া ফেলিল। ইতিহাসে এই ঘটনার উল্লেখমাত্র আছে। পুষ্করণা নামক মরুরাজ্যের অধিপতি চন্দ্রবর্মা দিগ্বিজয় যাত্রার পথে মগধ আক্রমণ করিলেন। হীনবীর্য মগধ বিনা যুদ্ধে অধিকৃত হইল। কিন্তু চন্দ্রবর্মা যাহা সংকল্প করিয়াছিলেন তাহা এত সহজে সিদ্ধ হইল না,—তিনি পাটলিপুত্রে জয়স্কন্ধাবার স্থাপন করিতে পারিলেন না। তাঁহার বিশাল সেনা-সমুদ্রের মধ্যস্থলে পাটলিপুত্র দুর্গ দশ লৌহদ্বারে ইন্দ্রকীলক আঁটিয়া দিয়া ক্ষুদ্র পাষাণদ্বীপের মতো জাগিয়া রহিল।

মগধেশ্বর তখন সোমদত্তার গজদন্ত পালঙ্কে শুইয়া ঘুমাইতেছিলেন; প্রহরিণীর মুখে এই বার্তা শুনিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার বহুকাললুপ্ত ক্ষাত্রতেজ নিমেষের জন্য জাগ্রত হইয়া উঠিল, কক্ষের চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "আমার বর্ম?"—বলিয়াই তাঁহার কুমারদেবীর কথা স্মরণ হইল, মুখের দীপ্তি নিবিয়া গেল। ক্ষীণ শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আক্রমণ করিয়াছে তা আমি কি করিব! পট্টমহাদেবীর কাছে যাও।"—বলিয়া পুনশ্চ শয্যায় শয়ন করিলেন।

সোমদত্তা প্রাসাদচূড়া হইতে দ্রুত চঞ্চলপদে নামিয়া আসিয়া দেখিল, রাজা পূর্ববৎ নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছেন। তাহার শিখরতুল্য দশনে বিদ্যুতের ন্যায় হাসি হাসিয়া গেল। রাজার মস্তকে মৃদু করস্পর্শ করিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, "ঘুমাও বীরশ্রেষ্ঠ! ঘুমাও!"

এদিকে প্রহরিণী পট্টমহাদেবীকে গিয়া সংবাদ দিল। কুমারদেবী তখন ষষ্ঠবর্ষীয় কুমার সমুদ্রগুপ্তকে শিক্ষা দিতেছিলেনঃ "পুত্র, তুমি লিচ্ছবিকুলের দৌহিত্র, এ কথা কখনও ভুলিও না। পাটলিপুত্র তোমার পাদপীঠ মাত্র। ভরতের মতো, মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের মতো, চণ্ডাশোকের মতো এই সপ্তসমুদ্রবেষ্টিত বসুন্ধরা তোমার সাম্রাজ্য,—এ কথা স্মরণ রাখিও। তুমি বাহুবলে গুর্জর হইতে সমতট, হিমাদ্রি হইতে অনার্য পাণ্ড্য-দেশ পর্যন্ত পদানত করিবে। তোমার যজ্ঞীয় অশ্ব উত্তরাপথে ও দক্ষিণাপথে, আর্যাবর্তে ও দাক্ষিণাত্যে সমান অপ্রতিহত হইবে।"

বালক রত্নখচিত ক্রীড়াকন্দুক হস্তে লইয়া গম্ভীরমুখে মাতার কথা শুনিতেছিল।

এমন সময় প্রতিহারিণীর মুখে ভয়ংকর সংবাদ শুনিয়া মহাদেবীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল; ক্ষণকাল নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। একবার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করেন, আর্যপুত্র কোথায়। কিন্তু সে ইচ্ছা নিরোধ করিয়া বলিলেন, "শীঘ্র কঞ্চুকীকে মহামাত্যের কাছে পাঠাও—এখনি তাঁহাকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করুক। দুর্গের দ্বার সকল রুদ্ধ হউক। বিনা যুদ্ধে মহাস্থানীয় শত্রুর হস্তে সমর্পণ করিব না।"

মহাদেবীর আদেশের প্রয়োজন ছিল না, মহাসচিব ও সান্ধিবিগ্রহিক পূর্বেই দুর্গ-দ্বার রোধ করিয়াছিলেন। প্রাকারে প্রাকারে ভল্লহস্তে সতর্ক প্রহরী ঘুরিতেছিল, সিংহদ্বারগুলির উপরে বৃহৎ কটাহে তৈল উত্তপ্ত হইতেছিল। লৌহজালিকে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া স্নায়ুজ্যাযুক্ত ধনুহস্তে ধানুকিগণ ইন্দ্রকোষে লুক্কায়িত থাকিয়া পরিখা-পারস্থিত শত্রুর উপর বিষ-বিদূষিত শর নিক্ষেপ করিতেছিল। প্রাকারের হস্তিনখমধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সেনানীগণ শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলেন। বুভুক্ষিত কুম্ভীরদল পরিখার কমলবনের মধ্যে খাদ্যান্বেষণে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল। বাহিরে শত্রুসৈন্য মাঝে মাঝে একযোগে দুর্গদ্বার আক্রমণ করিতেছিল। তখন মকরমুখ হইতে প্রচণ্ডবেগে তপ্ত-তৈল বর্ষিত হইতেছিল। আক্রমণকারীরা হতাহত সহচরদিগকে দুর্গদ্বারে ফেলিয়া ভগ্নোদ্যমে ফিরিয়া যাইতেছিল।

পূর্ণ একদিন এইভাবে যুদ্ধ হইল। চন্দ্রবর্মা রণহস্তীর দ্বারা দুর্গদ্বার ভাঙিয়া

ফেলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে চেষ্টাও বিফল হইল। সর্বাঙ্গে বাণবিদ্ধ হস্তী মাহুতকে ফেলিয়া দিয়া আর্তনাদ করিতে করিতে পলায়ন করিল। চন্দ্রবর্মা দেখিলেন, যুদ্ধ করিয়া দুর্গজয় সহজ নহে।

তখন তাঁহার সৈন্য যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া দুর্গ বেষ্টন করিয়া বসিল। ক্রোশের পর ক্রোশ, যোজনের পর যোজন ব্যাপ্ত করিয়া তাহাদের শিবির পড়িল। নদীতে কাতারে কাতারে তরণী আসিয়া দুর্গ-প্রাকারের বাহিরে গণ্ডী রচনা করিল। পাটলিপুত্রে পিপীলিকারও আগম-নিগমের পথ রহিল না।

ভিতরে মহামাত্য কুমারদেবীকে গিয়া সংবাদ দিলেন, "আশু ভয়ের কারণ নাই। কিন্তু বর্বর চন্দ্রবর্মা আমাদের অনাহারে শুকাইয়া মারিবার চেষ্টা করিতেছে। দেখা যাক্, কতদূর কি হয়।"

দিগ্বিজয়ী রণপণ্ডিত চন্দ্রবর্মার উদ্দেশ্য কিন্তু দুই প্রকার ছিল। ক্ষুদ্র দুর্বল পাটলিপুত্র অচিরাৎ দখল করিতে তিনি বড় ব্যগ্র ছিলেন না। হইলে ভালো, না হইলেও বিশেষ ক্ষতি নাই; আপাততঃ মগধের অন্যত্র জয়স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেই চলিবে। কিন্তু তাঁহার স্থল-সৈন্য বহুদূর পথ যুদ্ধ করিতে করিতে আসিয়া পরিশ্রান্ত— তাহাদের কিছুদিন বিশ্রামের প্রয়োজন। তাই তিনি এই অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাজার দেশে নিরুপদ্রবে ক্লান্তিবিনোদনের জন্য বসিলেন। গঙ্গার স্রোতে তাঁহার নৌবহর নোঙর ফেলিল। দুর্গাবরোধ ও শ্রান্তি অপনোদন একসঙ্গে চলিল।

দুর্গ অবরোধের পঞ্চম দিবসে মহামাত্য আসিয়া রাণীকে জানাইলেন যে, দুর্গের খাদ্যভার কমিতে আরম্ভ করিয়াছে—শীঘ্র ইহার কিছু বিধি-ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

মন্ত্রীর সহিত কুমারদেবী বহুক্ষণ পরামর্শ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোপনে খাদ্য আনিবার কোনও পথ কি নাই?"

সচিব বলিলেন, "হয়তো আছে, কিন্তু আমরা জানি না। নদীপথে খাদ্য আনা যাইতে পারিত, কিন্তু সে পথও বন্ধ। দুর্বৃত্ত চন্দ্রবর্মা নৌকা দিয়া ব্যূহ সাজাইয়া রাখিয়াছে।

"তবে এখন উপায়?"

"একমাত্র উপায় আছে।"

তারপর আরও অনেকক্ষণ পরামর্শ চলিল।

শেষে মহামাত্য বিদায় লইলে পর কুমারদেবী অলক্ষিতে প্রাসাদশীর্ষে উঠিলেন। অঞ্চলের ভিতর হইতে রক্তচক্ষু ধূম্রবর্ণ দূত-পারাবত বাহির করিয়া আকাশে উড়াইয়া দিলেন। পারাবত দুইবার প্রাসাদ পরিক্রমণ করিয়া উত্তরাভিমুখে ধাবিত হইল। যতক্ষণ দেখা যায়, কুমারদেবী আকাশের সেই কৃষ্ণবিন্দুর দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিলেন।

অতঃপর আরও আট দিন কাটিল। চন্দ্রবর্মা কোনও প্রকার যুদ্ধোদ্যম না করিয়া কেবলমাত্র পথরোধ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ক্রমে দুর্গে খাদ্যদ্রব্য দুর্মূল্য হইতে আরম্ভ করিল। নাগরিকদিগের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল।

এইরূপে আশায় আশঙ্কায় আরও একপক্ষ অতীত হইল। ফাল্গুন নিঃশেষ হইয়া আসিল।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। সেই বিট—সেই পীঠমর্দ, যে সোমদত্তার অনাবৃত যৌবনশ্রী দেখিয়া উন্মত্ত হইয়াছিল, সে আমি। তখন আমার নাম ছিল, চক্রায়ুধ

ঈশানবর্মা। ঘটোৎকচগুপ্তের ন্যায় আমার পিতাও একজন পরাক্রান্ত ভূস্বামী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর আমি স্বাধীন হইয়া রাজধানীতে রাজার সাহচর্যে নাগরিক-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ঐশ্বর্যে বিলাসে কালযাপন করিতেছিলাম।

তীব্র আসবপান করিলে যে বিচারহীন বিবেকহীন মত্ততা জন্মে, সোমদত্তাকে দেখিয়া আমার সেই মত্ততা জন্মিয়াছিল। অবশ্য, বিবেকবুদ্ধি তৎপূর্বেই যে আমার অত্যন্ত অধিক ছিল তাহা নহে। চিরদিন আমার চিত্ত বল্গাশূন্য অশ্বের মতো শাসনে অনভ্যস্ত। কোনও বস্তু আত্মসাৎ করিতে—তা সে নারীই হউক বা ধনরত্নই হউক—নিজের ঐহিক সুবিধা ও সামর্থ্য ভিন্ন কোনও নিষেধ কখনও স্বীকার করি নাই। গুরুলঘু-জ্ঞান কদাপি আমার বাসনার সামগ্রীকে দুষ্প্রাপ্য করিয়া তুলে নাই। যখন যাহা অভিলাষ করিয়াছি, ছলে-বলে যেমন করিয়া পারি তাহা গ্রহণ করিয়াছি।

চন্দ্রগুপ্ত যখন সোমদত্তাকে শ্যেনপক্ষীর মতো আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল, তখন বাধাপ্রাপ্ত প্রতিহত বাসনা দুর্বার আক্রোশে আমার বক্ষের মধ্যে গর্জন করিতে লাগিল। চন্দ্রগুপ্ত রাজা, আমি তাহার নর্মসহচর—বয়স্য; কিন্তু তথাপি কোনও দিন তাহাকে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা যোগ্যতর ভাবিতে পারি নাই। শ্যালকপ্রসাদে সে রাজা হইয়াছে; সুযোগ ঘটিলে আমিও কি হইতে পারিতাম না? বাহুবলে, রণশিক্ষায়, নীতিকৌশলে, বংশগরিমায় আমি তাহার অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নহি। তবে কোন্ অধিকারে সে আমার ঈপ্সিত বস্তু কাড়িয়া লইল?

অন্য তিন জন রাজপ্রাসাদলোভী চাটুকার, যাহারা সেদিন আমার নিগ্রহ দেখিয়াছিল, তাহারা আমার ক্রোধ ও অন্তর্দাহে ইন্ধন নিক্ষেপ করিতে লাগিল, তামাশা-বিদ্রূপ-ইঙ্গিতের গোপন দংশনে আমাকে জর্জরিত করিয়া তুলিল। একদিন, চন্দ্রগুপ্ত তখনও সভায় আগমন করেন নাই, সভাস্থ পারিষদবর্গের মধ্যে নিম্নকণ্ঠে বাক্যালাপ হাস্য-পরিহাস চলিতেছিল, এমন সময় সিদ্ধপাল আমাকে লক্ষ্য করিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে কহিল, "চক্রায়ুধ, দেখ তো এই রত্নটি কেমন, কোশলের কোনও শ্রেষ্ঠী মহারাজকে উপহার দিয়াছে। মহারাজ বলিয়াছেন, রত্নটি যদি অনাবিদ্ধ হয় তাহা হইলে স্বয়ং রাখিবেন, নচেৎ তোমাকে উহা দান করিবেন। দেখ তো, রত্নটি বজ্রসমুৎকীর্ণ কি না।"—বলিয়া একটি ক্ষুদ্র অতি নিকৃষ্টজাতীয় মণি আমার সম্মুখে তুলিয়া ধরিল।

সভারূঢ় ব্যক্তিগণ এই কদর্য ইঙ্গিতে কেহ দাঁত বাহির করিয়া, কেহ বা নিঃশব্দে হাসিল। সিংহাসনের পার্শ্বে চামরবাহিনী কিঙ্করীগণ মুখে অঞ্চল দিয়া পরস্পরের প্রতি সকৌতুক কটাক্ষ হানিল। আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম।

ক্রমে আমার কথা পাটলিপুত্র নগরে কাহারও অবিদিত রহিল না। আমি কোনও গোষ্ঠীসমবায় বা সমাপানকে পদার্পণ করিবামাত্র চোখে চোখে কটাক্ষে কটাক্ষে গুপ্ত ইঙ্গিতের স্রোত বহিয়া যাইত। রাজসভায় রাজা আমাকে দেখিয়া ভ্রূকুটি করিতে লাগিলেন। অতঃপর আমাকে রাজসভা ছাড়িতে হইল, লোক-সমাজও দুঃসহ হইয়া উঠিল। নিজ হর্ম্যতলে একাকী বসিয়া অন্তরের অগ্নিতে অহরহ দগ্ধ হইতে লাগিলাম।

এই সময় সমুদ্রোচ্ছ্বাসতুল্য অভিযান পাটলিপুত্রের দুর্গতটে আসিয়া প্রহত হইল। আমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধের সময় আমার ডাক পড়িল। মহাবলাধিকৃত বিরোধবর্মা আমাকে শতরক্ষীর অধিনায়ক করিয়া গোতম-দ্বার নামক দুর্গের পশ্চিম তোরণ রক্ষার ভার দিলেন।

কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রহীন রাত্রি। আমি অভ্যাসমত প্রাকারের উপর একাকী পাদচারণ

করিতেছিলাম। অবসন্ন বসন্তের শেষ পুষ্প চম্পা চারিদিকে তীব্র বাস বিকীর্ণ করিতেছিল।

বাহিরে শত্রুশিবিরে দীপসকল প্রায় নিবিয়া গিয়াছে—দূরে দূরে দুই একটা জ্বলিতেছে। নিম্নে পরিখার জল স্থির কৃষ্ণদর্পণের মতো পড়িয়া আছে, তাহাতে আকাশস্থ নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। নগরের মধ্যে শব্দ নাই, আলোক নাই, গৃহে গৃহে দ্বার রুদ্ধ, দীপ নির্বাপিত। রাজপথও আলোকহীন। তামসী রাত্রির গহন অন্ধকার যেন বিরাট পক্ষ দিয়া চরাচর আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

পাটলিপুত্র সুপ্ত, অরাতি-সৈন্যও সুপ্ত। কিন্তু নগরদ্বারের প্রহরীরা জাগ্রত। তোরণের উপর নিঃশব্দে রক্ষীগণ প্রহরা দিতেছে। প্রাকারের উপর স্থানে স্থানে সতর্ক রক্ষী নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান। শত্রু পাছে অন্ধকারে গা ঢাকিয়া অতর্কিতে প্রাকার-লংঘনের চেষ্টা করে, এইজন্য রাত্রিতে পাহারা দ্বিগুণ সাবধান থাকে।

রাজপুরী হইতে বেহাগ-রাগিণীতে মধ্যরাত্রি বিজ্ঞাপিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে পাটলিপুত্রের দশ দ্বারের প্রহরী দুন্দুভি বাজাইয়া উচ্চ-কণ্ঠে প্রহর হাঁকিল। নৈশ নীরবতা ক্ষণকালের জন্য বিক্ষুব্ধ করিয়া এই উচ্চরোল ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া গেল; নগরী যেন শত্রুকে জানাইয়া দিল—"সাবধান! আমি জাগিয়া আছি!"

একাকী পাদচারণ করিতে করিতে নানা চিন্তা মনে উদয় হইতেছিল। কিসের জন্য এই রাত্রি দ্বিপ্রহরে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া নিশাচরের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছি? পাটলিপুত্র দুর্গ রক্ষা করিয়া আমার লাভ কি? যাহার রাজ্য, সে তো কামিনীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে। পাটলিপুত্র যদি চন্দ্রবর্মা অধিকার করে, তবে কাহার কি ক্ষতি? দুর্গের মধ্যে অন্নাভাবের সঙ্গে সঙ্গে রোগ দেখা দিয়াছে, মানুষ না খাইয়া মরিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাহির হইতে খাদ্য আনয়নের উপায় নাই। শুধু রাত্রির অন্ধকারে লুকাইয়া জালিকেরা নদী হইতে প্রত্যহ কিছু কিছু মৎস্য সংগ্রহ করিতেছে। কিন্তু তাহাই বা কতটুকু?—নগরীর ক্ষুধা তাহাতে মিটে না। এভাবে আর কত দিন চলিবে? অবশেষে এক দিন বশ্যতা স্বীকার করিতেই হইবে; তবে অনর্থক এ ক্লেশভোগ কেন? সমগ্র দেশ যখন চন্দ্রবর্মার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে, তখন পাটলিপুত্র নগর একা কয়দিন টিকিয়া থাকিবে?

চন্দ্রগুপ্ত যদি রাজ্যাধিকারের যোগ্য হইত, তবে সে নিজে আসিয়া নিজের রাজ্য রক্ষা করিত। আমি কেন এই অপদার্থ রাজার রাজ্যরক্ষায় সাহায্য করিতেছি? সে আমার কি করিয়াছে? আমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছে, আমাকে জগতের সম্মুখে হাস্যাস্পদ করিয়াছে। সোমদত্তা! সেই দেবভোগ্যা অপ্সরা! বুঝি পুরুষের লালসা-পরিতৃপ্তির জন্যই তাহার অনুপম দেহ সৃষ্ট হইয়াছিল! তাহাকে না পাইলে আমার এই অনির্বাণ তৃষ্ণা মিটিবে কি?—সে এখন চন্দ্রগুপ্তের অংকশায়িনী। চন্দ্রগুপ্ত কি তাহাকে বিবাহ করিয়াছে? করুক না করুক, সোমদত্তাকে আমার চাই; যেমন করিয়া পারি, যে উপায়ে পারি, সোমদত্তাকে আমি কাড়িয়া লইব। পারিব না? নারীর মন কত দিন এক পুরুষে আসক্ত থাকিবে? তখন চন্দ্রগুপ্ত! তোমাকে জগতের কাছে হাস্যাস্পদ করিব। সেই আমার লাঞ্ছনার যোগ্য প্রতিশোধ হইবে।

এই সর্বগ্রাসী চিন্তা মনকে এমনই আচ্ছন্ন করিয়াছিল যে, অজ্ঞাতসারে গোতম-দ্বার হইতে অনেকটা দূরে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। প্রাকারের এই অংশ রাত্রিকালে স্বভাবতঃই অতিশয় নির্জন। এই স্থানের দুর্গ-প্রাচীর এতই দুরধিগম্য যে, প্রহরী-স্থাপনেরও প্রয়োজন হয় নাই।

ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ফিরিব ভাবিতেছি, এমন সময় সহসা চোখে

পড়িল, সম্মুখে কিছুদূরে প্রাকারের প্রান্তস্থিত এক কণ্টকগুল্মের অন্তরালে দীপ জ্বলিতেছে। পাছে বাহির হইতে শত্রু দুর্গ-প্রাচীরে আরোহণ করে, এজন্য প্রাচীরগাত্রে সর্বত্র কাঁটাগাছ রোপিত থাকিত। কখনও কখনও এই সকল কাঁটাগাছ প্রাকারশীর্ষ ছাড়াইয়া মাথা তুলিত। সেইরূপ দুইটি ঘন-পল্লবিত কণ্টকতরুর মধ্যস্থিত ঝোপের ভিতর প্রদীপ জ্বলিতেছে দেখিলাম। প্রদীপ কখনও উঠিতেছে, কখনও মণ্ডলাকারে আবর্তিত হইতেছে। কেহ যেন একান্তে দাঁড়াইয়া কোন অদৃশ্য দেবতার আরতি করিতেছে।

পাদুকা খুলিয়া ফেলিয়া নিঃশব্দে কটি হইতে তরবারি বাহির করিয়া হস্তে লইলাম। তারপর অতি সন্তর্পণে সেই সঞ্চরমান দীপশিখার দিকে অগ্রসর হইলাম।

কণ্টকগুল্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তন্মধ্যে এক নারী দাঁড়াইয়া পরিখার অপর পারে অনন্য স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। এবং প্রদীপ ইতস্ততঃ আন্দোলিত করিতেছে। পশ্চাৎ হইতে তাহার মুখ সম্পূর্ণ দেখিতে পাইলাম না, শুধু চোখে পড়িল, তাহার নবমল্লিকাবেষ্টিত কুণ্ডলিত কবরীভার, তন্মধ্যে দুইটি পদ্মরাগমণি সর্পচক্ষুর মতো জ্বলিতেছে। বুঝিতে বিলম্ব হইল না, এ রমণী গুপ্তচর; আলোকের ইঙ্গিতে শত্রুর নিকট সংবাদ প্রেরণ করিতেছে।

লঘুহস্তে তাহার স্কন্ধ স্পর্শ করিলাম। সশব্দ নিশ্বাস টানিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে রমণী ফিরিয়া দাঁড়াইল। তখন তাহারই হস্তধৃত মৃৎপ্রদীপের আলোকে তাহাকে চিনিলাম।

সোমদত্তা!

কম্পিত দীপশিখার আলোক তাহার ত্রাসবিকৃত মুখের উপর পড়িল। চক্ষুর সুবৃহৎ কৃষ্ণতারকা আরও বৃহৎ দেখাইল। মুহূর্তের জন্য আমার মনে সন্দেহ জন্মিল, এ কি সত্যই সোমদত্তা, না আমার দৃষ্টিবিভ্রম? যে চিন্তা অহরহ আমার অন্তরকে গ্রাস করিয়া আছে, সেই চিন্তার বস্তু কি মূর্তি ধরিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল? কিন্তু এ ভ্রম অল্পকালের জন্য, আকস্মিক আঘাতে বিপন্ন বুদ্ধি পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিল। দেখিলাম, সোমদত্তার হস্তে প্রদীপ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, এখনই পড়িয়া নিবিয়া যাইবে। আমি তরবারি কোষবদ্ধ করিয়া তাহার হাত হইতে প্রদীপ লইলাম,—তাহার মুখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া মৃদুহাস্যে বলিলাম, "এ কি! পরমভট্টারিকা মহাদেবী সোমদত্তা!"

সোমদত্তা ভয়সূচক অস্ফুটধ্বনি করিয়া নিজ বক্ষে হস্তার্পণ করিল। পরক্ষণেই ছুরির একটা ঝলক এবং সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্র আমার বস্ত্রাবৃত লৌহজালিকের ব্যবধানপথে বক্ষের চর্ম স্পর্শ করিল। ভিতরে লৌহজালিক না থাকিলে সোমদত্তার হস্তে সেদিন আমার প্রাণ যাইত। আমি ক্ষিপ্রহস্তে ছুরিকা কাড়িয়া লইয়া নিজ কটিতে রাখিলাম, তারপর সবলে দুই বাহু দিয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলাম। তাহার কর্ণে কহিলাম, "সোমদত্তা, কুহকিনী, আজ তোমাকে পাইয়াছি!"

তৈলপ্রদীপ মাটিতে পড়িয়া নিবিয়া গেল।

জালবদ্ধা ব্যাঘ্রীর মতো সোমদত্তা আমার বাহুমধ্যে যুদ্ধ করিতে লাগিল, নখ দিয়া আমার মুখ ছিঁড়িয়া দিল। আমি আরও জোরে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, "ভালো, ভালো। তোমার নখর-ক্ষত কাল চন্দ্রগুপ্তকে দেখাইব!"

সহসা সোমদত্তার দেহ শিথিল হইয়া এলাইয়া পড়িল; অন্ধকারে ভাবিলাম, বুঝি মূর্ছা গিয়াছে। তারপর তাহার দ্রুত কম্পনে ও কণ্ঠোত্থিত নিরুদ্ধ শব্দে বুঝিলাম, মূর্ছা নহে—সোমদত্তা কাঁদিতেছে। কাঁদুক—কামিনীর ক্রন্দন আমার জীবনে এই প্রথম নহে। প্রথম প্রথম এমনই কাঁদে বটে। আমি তাহাকে কাঁদিতে দিলাম।

কিছুক্ষণ ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিবার পর সোমদত্তা সোজা হইয়া দাঁড়াইল; অশ্রুবিকৃত কন্ঠে কহিল, "তুমি কে? কেন আমাকে ধরিয়াছ? শীঘ্র ছাড়িয়া দাও!"

আমি আলিঙ্গন শিথিল করিলাম না, বলিলাম, "আমি কে শুনিবে? আমি চক্রায়ুধ ঈশানবর্মা—তোমার চন্দ্রগুপ্তের বয়স্য, উপস্থিত দুর্গ-তোরণের রক্ষক। আরও অধিক পরিচয় চাও তো বলি, আমি সোমদত্তার রূপের মধুকর। যেদিন তটিনীতটে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলে, ছলনাময়ী, সেইদিন হইতে তোমার রূপযৌবনের আরাধনা করিতেছি!"

অনুভব করিলাম, সোমদত্তা শিহরিয়া উঠিল। আমি বলিলাম, "চিনিয়াছ দেখিতেছি! হাঁ, আমি সেই বিট, যে স্বর্গের পারিজাত দেখিয়া লুব্ধ হইয়াছিল।"

সোমদত্তা কহিল, "পাপিষ্ঠ, আমাকে ছাড়িয়া দাও, নচেৎ রাজ-আদেশে তোমার মুণ্ড যাইবে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "পাপিষ্ঠা, তোমাকে ছাড়িব না। ছাড়িয়া দিলে পট্টমহাদেবীর আদেশে আমার মুণ্ড যাইতে পারে। তুমি নিশীথ সময়ে রাজপুরী ছাড়িয়া কি জন্য বাহিরে আসিয়াছ? প্রাকারের নিভৃত স্থানে প্রদীপ লইয়া কি করিতেছিলে?"

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া সোমদত্তা উত্তর করিল, "আমি রাজার অনুমতি লইয়া পুরীর বাহিরে আসিয়াছি।"

ব্যঙ্গ করিয়া বলিলাম, "চন্দ্রগুপ্ত বোধ করি তোমাকে শত্রুর নিকটে সংকেত প্রেরণ করিবার জন্য পাঠাইয়াছে?"

সোমদত্তা আবার শিহরিল। বলিল, "আমি বৌদ্ধ সেবাশ্রমে আর্তের চিকিৎসা করিতে প্রত্যহ আসি—রাজার অনুমতি আছে। আজিও আসিয়াছি।"

'প্রাকারের উপর এতক্ষণ কোন্ আর্তের চিকিৎসা করিতেছিলে?'

"প্রাকারের উপর আহত কেহ আছে কি না দেখিতে আসিয়াছিলাম।"

"ভালো, আজ রাত্রিতে আমার নিকট বন্দিনী থাক, কাল চন্দ্রগুপ্তকে এই কথা বলিও। প্রহরী ডাকি?"

সোমদত্তা নীরব, মুখে কথা নাই।

আমি পুনরায় কহিলাম, "কি বল? প্রহরী ডাকি?"

অবরুদ্ধ কণ্ঠে সোমদত্তা কহিল, "তুমি যাহা চাও দিব—আমাকে ছাড়িয়া দাও।"

আমি বলিলাম, "যাহা চাই, তাহা এখন জোর করিয়া লইব। তোমার দানের অপেক্ষা রাখি না।"

ভীত অস্পষ্ট কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাও?"

"তোমাকে।"

সোমদত্তা পুনরায় আমার আলিঙ্গন-মুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। শেষে বিফল হইয়া আমার বক্ষের উপর সবলে করাঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "আমাকে ছাড়িয়া দাও! ছাড়িয়া দাও! ছাড়িয়া দাও! আমি রাজমহিষী, আমার উপরে অত্যাচার করিলে তুমি শূলে যাইবে।"

আমি বলিলাম, "তুমি চন্দ্রবর্মার চর,—রাজাকে রূপের কুহকে ভুলাইয়া রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছ। শূল তো দূরের কথা, তোমার উপর অত্যাচার করিলে কুমারদেবী আমাকে পুরস্কৃত করিবেন। মনে রাখিও, তুমি তাঁর সপত্নী।"

সোমদত্তা কাঁদিয়া উঠিল, "দয়া কর, আমি রাজার স্ত্রী।"

"তুমি গুপ্তচর।"

তখন সোমদত্তা আমার বক্ষের উপর নিঃসহায়ে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এত কাঁদিল যে, বোধ করি পাষাণও দ্রব হইয়া যাইত। কিন্তু আমি লোভে নিষ্ঠুর—তাহার অশ্রু আমাকে দ্রব করিতে পারিল না।

কাঁদিতে কাঁদিতে সোমদত্তা জিজ্ঞাসা করিল, "দয়া করিবে না?"

আমি বলিলাম, "এইটুকু দয়া করিতে পারি, আমি যাহা চাই তাহা স্বেচ্ছায় যদি দাও, তবে চন্দ্রগুপ্ত কিছু জানিবে না।"

ব্যাকুল হইয়া সোমদত্তা কহিল, "আমি সেরূপ স্ত্রীলোক নহি। চন্দ্রগুপ্ত আমার স্বামী, আমি তাঁহাকে ভালবাসি। শুন, আমি চন্দ্রবর্মার গুপ্তচর এ কথা সত্য, তাঁহারই কার্যসিদ্ধির জন্য মগধে আসিয়াছিলাম। কিন্তু তখন জানিতাম না—ভালবাসার স্বাদ পাই নাই। আজ আমি স্বামীর রাজ্য পরের হস্তে তুলিয়া দিবার যত্ন করিতেছি, কেন করিতেছি তাহা তুমি বুঝিবে না। কিন্তু স্বরূপ বলিতেছি, আমি তাঁহাকে ভালবাসি, আমার চোখে তিনি ভিন্ন অন্য পুরুষ নাই। তুমি আমাকে দয়া কর, মুক্তি দাও। আমি শপথ করিতেছি, চন্দ্রবর্মা পাটলিপুত্র অধিকার করিলে আমি তোমাকে কাশী, কোশল, চম্পা, গৌড়—যে রাজ্য চাও তাহার সিংহাসনে বসাইব। চন্দ্রবর্মা আমাকে স্নেহ করেন, আমার যাচ্ঞা কখনো নিস্ফল হইবে না।"

"কিন্তু চন্দ্রবর্মা যদি পাটলিপুত্র অধিকার করিতে না পারেন?"

"এমন কখনো হইতে পারে না।"

"বুঝিলাম। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি যদি চন্দ্রগুপ্তকে সত্যই ভালবাস, তবে তাহার সর্বনাশ করিতেছ কেন?"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সোমদত্তা বলিল, "চন্দ্রবর্মা আমার পিতা।"

ঘোর বিস্ময়ে কহিলাম, "তুমি চন্দ্রবর্মার কন্যা?"

অধোমুখে সোমদত্তা কহিল, "হাঁ, কিন্তু বারাঙ্গনার গর্ভজাতা।"

"বুঝিয়াছি।"

"তুমি নরাধম, কিছু বুঝ নাই। আমি শৈশব হইতে রাজ-অন্তঃপুরে পালিতা।"

"ভালো, তাহাও বুঝিলাম। বুঝিলাম যে, পিতার জন্য তুমি স্বামীর সর্বনাশ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমার কথাও তুমি বুঝিয়া লও। আমি গৌড় চাহি না, চম্পা চাহি না, কাশী-কোশল কিছুই চাহি না—আমি তোমাকে চাই। অস্বীকার করিলে কোনও ফল হইবে না—উপরন্তু চন্দ্রগুপ্ত তোমার এই অভিসার-কথা জানিতে পারিবে।"

সোমদত্তা কম্পিতস্বরে কহিল, "ইচ্ছা হয়, আমাকে হত্যা করিয়া ঐ পরিখার জলে ফেলিয়া দাও, আমি কোন কথা কহিব না। কিন্তু মহারাজকে এ কথা বলিও না। পুরুষের মন সর্বদা সন্দিগ্ধ, তিনি আমার প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিবেন না, আমাকে অবিশ্বাস করিবেন। স্বীকার কর, বলিবে না?"

নারী-চরিত্র কে বুঝিবে? কহিলাম, "উত্তম, বলিব না। কিন্তু আমার পুরস্কার?"

সোমদত্তা নীরব।

আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার পুরস্কার?"

তথাপি সোমদত্তা মৌন।

আমি তখন ক্ষিপ্ত। নির্মম পীড়নে তাহার দেহলতা বিমথিত করিয়া অধরে চুম্বন করিলাম।

বলিলাম, "সোমদত্তা, তোমার রূপের আগুনে আজ আপনাকে আহুতি দিলাম।"

সোমদত্তা যেন মর্মতন্তু ছিঁড়িয়া কথা কহিল, বলিল, "শুধু তুমি নহ, তুমি, আমি, চন্দ্রগুপ্ত, মগধ—সব এই আগুনে পুড়িয়া ছাই হইবে!"

নগরের কেন্দ্রস্থলে প্রায় পাদক্রোশ ভূমির উপর মগধের প্রাচীন রাজপুরী। এই পাদক্রোশ ভূমি উচ্চ পাষাণ-প্রাচীর বেষ্টিত। পূর্বদিকে প্রশস্ত রাজপথের উপর কারু-কার্যশোভিত উচ্চ পাষাণ তোরণ। এই তোরণ উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমেই বহুস্তম্ভযুক্ত বিচিত্র দ্বিতল মন্ত্রগৃহ। তাহার পশ্চাতে মহলের পর মহল, প্রাসাদের পর প্রাসাদ,—কোনটি কোষাগার, কোনটি অলংকারগৃহ, কোনটি দেবগৃহ, কোনটি চিত্রভবন। মধ্যে কুঞ্জবেষ্টিত কমল-সরোবর—তাহাতে সারস মরাল প্রভৃতি পক্ষী ও বহুবর্ণের মৎস্য ক্রীড়া করিতেছে।

সকলের পশ্চাতে শীর্ণ অথচ জলপূর্ণ পরিখার গণ্ডীনিবদ্ধ মগধেশ্বরের অন্তঃপুর। সেতু পার হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে হয়। সেতুমুখে কঞ্চুকীসেনা অহোরাত্র পাহারা দিতেছে। ভিতরে সুন্দর কারুশিল্পমণ্ডিত উচ্চশীর্ষ সৌধ সকল পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যেন ইন্দ্রভুবন রচনা করিয়াছে। এখানে সকল গৃহই ত্রিতল, প্রথম তল শ্বেত-প্রস্তরে রচিত, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তল দারুনির্মিত।

এই পুরী চন্দ্রগুপ্তের নির্মিত নহে, মৌর্যকালীন প্রাচীন রাজভবন। রাজ্যজয়ের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত ইহা অধিকার করিয়াছিলেন। অধিকার করিয়াই রাজপুরীর যাহা সারবস্তু সেই মোহনগৃহ সন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু বহু চেষ্টাতেও তাহা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। মোহনগৃহ রাজভবনের একটি গোপন কক্ষ, দেখিতে অন্যান্য সাধারণ কক্ষের মতোই, কিন্তু ইহার প্রাচীর ও হর্ম্যতলে নানা গুপ্তদ্বার থাকিত। সেই গুপ্তদ্বার দিয়া ভূ-নিম্নস্থ সুড়ঙ্গপথে পুরীর বাহিরে যাওয়া যাইত; এমন কি ঘোর বিপদ-আপদের সময় দুর্গের বাহিরে পলায়ন করাও চলিত। এই মোহনগৃহ প্রত্যেক রাজপুরীর একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল; স্বয়ং রাজা এবং পট্টমহিষী ভিন্ন ইহার সন্ধান আর কাহারও জানা থাকিত না। মৃত্যুকালে রাজা পুত্রকে বলিয়া যাইতেন।

এই রাজপ্রাসাদে পূর্ববর্ণিত ঘটনার পরদিন প্রভাতে আমি কিছু গোপন অভিসন্ধি লইয়া উপস্থিত হইলাম। সম্মুখেই মন্ত্রগৃহ,—বহুজনাকীর্ণ। সচিব, সভাসদ্, সেনানী, শ্রেষ্ঠী, বয়স্য, বিদূষক—সকলেই উপস্থিত; সকলের মুখেই দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠার চিহ্ন। চারিদিক্ হইতে তাহাদের মৃদুজল্পিত গুঞ্জনধ্বনি উঠিতেছে। সভার কেন্দ্রস্থলে রত্নসিংহাসনে বসিয়া কেবল মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত নির্লিপ্ত নির্বিকার। আমি সভায় প্রবেশ করিতে চন্দ্রগুপ্ত একবার চক্ষু তুলিয়া আমার দিকে চাহিল—মোহাচ্ছন্ন স্বপ্নাবিষ্ট ভাব—যেন কিছুতেই আসে যায় না। আমি সম্ভ্রম দেখাইয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করিলাম. চন্দ্রগুপ্ত ঈষৎ বিরক্তিসূচক ভ্রূকুটি করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। আমার হাসি আসিল. মনে মনে বলিলাম, "চন্দ্রগুপ্ত! যদি জানিতে!..."

রাজ-সম্মুখ হইতে অপসৃত হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে এক স্তম্ভের আড়ালে সন্নিধাতার সহিত দেখা হইল। সর্বদা রাজ-সন্নিধানে থাকিয়া তাঁহার পরিচর্যা করা সন্নিধাতার কার্য। নানা কারণে এই সন্নিধাতার সহিত আমার কিছু প্রণয় ছিল; অনেকবার রাজপ্রাসাদের অনেক গূঢ় সংবাদ তাহার নিকট হইতে পাইয়াছি। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বল্লভ, খবর কি?"

বল্লভ বলিল, "নূতন খবর কিছুই নাই। মহারাজ আজ পত্রচ্ছেদ্যকালে বলিতে-ছিলেন যে, মোহনগৃহের সন্ধান জানা থাকিলে এ পাপ রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেন।"

আমি বলিলাম, "সংসারে এত বৈরাগ্য কেন?"

বল্লভ চোখ টিপিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "সংসারের সকল বস্তুতে নয়!—সে যাক্, তোমায় বহুদিন দেখি নাই, সভায় আস না কেন?"

আমি বলিলাম, "দিনরাত গোতম-দ্বারে পাহারা—সময় পাই না।—বিরোধবর্মা কোথায় বলিতে পার? সভায় তো তাঁহাকে দেখিতেছি না।"

বল্লভ বলিল, "মহাবলাধিকৃত উপরে আছেন, সান্ধিবিগ্রহিকের সঙ্গে কি পরামর্শ হইতেছে।"

"আমারও কিছু পরামর্শ আছে"—বলিয়া সোপান অতিবাহিত করিয়া আমি উপরে গেলাম।

বিরোধবর্মা তখন গুপ্তসদস্যগৃহে বসিয়া সান্ধিবিগ্রহিকের সহিত চুপি চুপি কথা কহিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া উভয়ে জিজ্ঞাসু নেত্রে আমার দিকে চাহিলেন। আমি কোনও প্রকার ভণিতা না করিয়া বলিলাম, "এরূপভাবে কতদিন চলিবে? দুর্গে খাদ্য নাই, পানীয় নাই; এক দীনারের কমে আঢ়ক পরিমাণ মাধ্বী পাওয়া যায় না। ঘরে ঘরে লোক না খাইয়া মরিতে আরম্ভ করিয়াছে। যুদ্ধে মরিত কোন কথা ছিল না; কিন্তু শত্রুকে বিতাড়িত করিবার কোন চেষ্টাই নাই। কেবলমাত্র দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকিলে কি ফল দর্শিবে? নাগরিকগণ নানা কথা বলিতেছে—দুর্গরক্ষীরাও সন্তুষ্ট নয়।"

সান্ধিবিগ্রহিক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহারা কি বলে?"

আমি বলিলাম, "কাল সন্ধ্যায় চণ্ডপালের মদিরাগৃহে গিয়াছিলাম। সেখানে শুনিলাম, অনেকেই বলাবলি করিতেছে—চন্দ্রবর্মার দিগ্বিজয়ী সেনার বিরুদ্ধে শূন্য উদর লইয়া দুর্গরক্ষার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। দুর্গ একদিন তাহারা অধিকার করিবেই, সুতরাং বাধা না দিয়া নির্বিবাদে আসিতে দেওয়াই সুবুদ্ধি—তাহাতে তাহাদের নিকট সদ্ব্যবহার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।"

সান্ধিবিগ্রহিক ও মহাবলাধিকৃত দৃষ্টি-বিনিময় করিলেন। বিরোধবর্মা কহিলেন, "চন্দ্রবর্মা পাটলিপুত্র অধিকার করিতে পারিবে না, তাহার দিগ্বিজয়যাত্রা এইখানেই শেষ হইবে।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু—"

বাধা দিয়া বিরোধবর্মা বলিলেন, "ইহার মধ্যে কিন্তু নাই। জানিয়া রাখ, আজ হইতে দশ দিনের মধ্যে দিগ্বিজয়ী চন্দ্রবর্মা লাঙ্গুল উচ্চে তুলিয়া মগধ হইতে পলায়ন করিবে। ইচ্ছা হয়, তুমি তার পশ্চাদ্ধাবন করিও।"

ভিতরে কিছু কথা আছে বুঝিলাম। কি কথা জানিবার জন্য পুনশ্চ বলিলাম, "কেমন করিয়া এই অঘটন সম্ভব হইবে জানি না। দশ দিনের মধ্যে নগর শ্মশানে পরিণত হইবে। তখন চন্দ্রবর্মা রহিল কি পলাইল, কে দেখিতে যাইবে?"

বিরোধবর্মা কহিলেন, "খাদ্যের আয়োজন হইয়াছে, কল্য হইতে সকলে প্রচুর খাদ্য পাইবে।"

আমি বিস্মিতভাবে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলাম। ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করি, কি ভাবে কোথা হইতে খাদ্য আসিবে! কিন্তু প্রশ্ন করা সুবিবেচনা হইবে না বুঝিয়া বলিলাম, "কিন্তু খাদ্য পাইলেই কি চন্দ্রবর্মাকে বিতাড়িত করা যাইবে?"

বিরোধবর্মা বলিলেন, "বলিয়াছি, দশ দিনের মধ্যে চন্দ্রবর্মাকে তাড়াইব!"

"কিন্তু এই দশ দিন প্রজাদের কি বলিয়া বুঝাইয়া রাখিবেন? প্রজা ও রক্ষিসৈন্য মিলিয়া যদি মাৎস্যন্যায় করে?"

"মাৎস্যন্যায়!"—বিরোধবর্মা গর্জিয়া উঠিলেন,—"চক্রায়ুধ, যে যোদ্ধা শত্রুকে দুর্গ-সমর্পণের কথা চিন্তা করিবে তাহাকে শূলে দিব, যে প্রজা মাৎস্যন্যায়ের কথা উচ্চারণ করিবে তাহাকে হাত-পা বাঁধিয়া পরিখার কুম্ভীরের মুখে ফেলিয়া দিব। মাৎস্যন্যায়! —এখনো আমি বাঁচিয়া আছি।" ঈষৎ শান্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি যাও, যে জিজ্ঞাসা

করিবে, তাহাকে বলিও অন্তরীক্ষপথে বার্তা আসিয়াছে, চন্দ্রবর্মার উচ্ছেদ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই।"

অন্তরীক্ষ-পথে! আমি উঠিলাম। উভয়কে প্রণাম করিয়া বাহির হইতেছি, সান্ধি-বিগ্রহিক আমাকে ফিরিয়া ডাকিলেন। ধীরে ধীরে কহিলেন, "চক্রায়ুধ! যাহা শুনিলে, তাহা হইতে যদি কিছু অনুমান করিয়া থাক, তাহা নিজ অন্তরে রাখিও। মন্ত্রভেদে রাজ্যের সর্বনাশ হয়।"

"যথা আজ্ঞা"—বলিয়া মনে মনে হাসিয়া আমি বিদায় লইলাম।

সেই রাত্রিতে মধ্যযাম ঘোষিত হইবার পর সোমদত্তা আবার আসিল। গতরাত্রির সংকেতস্থানে আমি পূর্ব হইতেই উপস্থিত ছিলাম, প্রদীপ হস্তে ধরিয়া ভুবনমোহিনীর ন্যায় আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইলাম। সোমদত্তা ভুবনমোহন হাসি হাসিয়া আমার আলিঙ্গনে আত্ম-সমর্পণ করিল।

এক রাত্রির মধ্যে কি পরিবর্তন। নারীর মন এমনই বটে—কাল যে ধর্মের জন্য যুদ্ধ করিতেছিল, আজ সে নাগরের প্রেমে পাগল! আমি এমন অনেক দেখিয়াছি, তাই বিস্মিত হইলাম না। স্ত্রীজাতি যখন দেখে কূল গিয়াছে, তখন প্রাণপণে নাগরকে ধরিয়া থাকে; দুকূল হারাইয়া ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্ট হইতে চাহে না।

আমি বলিলাম, "সোমদত্তা, চন্দ্রগুপ্ত ভিন্ন অন্য পুরুষ পৃথিবীতে আছে কি?"

সোমদত্তা দুই মৃণালভুজে আমার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া মুখের অত্যন্ত নিকটে মুখ আনিয়া মৃদু সলজ্জ স্বরে কহিল, "আগে জানিতাম না, এখন বুঝিয়াছি, তুমি ভিন্ন জগতে অন্য পুরুষ নাই।"

সোমদত্তার কথা, তাহার স্পর্শ, তাহার দেহসৌরভ আমার সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া হর্ষের প্লাবন আনিয়া দিল। অনির্বচনীয় সুখের মাদকতা মস্তিষ্ককে যেন অবশ করিয়া ফেলিল। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে এমনই বুঝি নারী পুরুষকে বশ করিয়া রাখিয়াছে!

আমি বলিলাম, "সোমদত্তা, প্রিয়তমে, তোমাকে আমি সমগ্রভাবে, অনন্যভাবেই চাই! রাত্রিতে চোরের মতো লুকাইয়া এই ক্ষণিকের মিলন—ইহাতে আমার হৃদয় পূর্ণ হইতেছে না!"

সোমদত্তা আমার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিল, "তাহা কি করিয়া হইবে, প্রাণাধিক? আমি যে রাজপুরীর পুরন্ধ্রী—চন্দ্রগুপ্তের বনিতা।"

বহুক্ষণ দুইজনে নীরব রহিলাম। সোমদত্তার মতো নারীকে যে পায় নাই, সে জানে না, তাহার জন্য পুরুষের মনে কি তীব্র—কি দুর্বার আকাঙ্ক্ষা জাগিতে পারে। আমিও যতদিন তাহাকে দূর হইতে কামনা করিয়াছিলাম, ততদিন তাহার এই দুর্নিবার শক্তি অনুভব করি নাই। সোমদত্তাকে লাভ করিবার বাসনা অপেক্ষা তাহাকে একান্তে নিজস্ব করিয়া ভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষা শতগুণ প্রবল! তাহার মধ্যে এমন একটা আকর্ষণ আছে, যাহা তাহার অলৌকিক যৌবনশ্রীরও অতীত, যাহা ভোগে অবসাদ আসে না, ঘৃতাহুতির ন্যায় কামনার অগ্নিকে আরও বাড়াইয়া তুলে। সোমদত্তার ন্যায় নারীর জন্য পুরুষ ইহকাল পরকাল অকাতরে বিসর্জন করিতে পারে, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়, সৃষ্টি রসাতলে পাঠাইতে তিলমাত্র দ্বিধা করে না।

"শত্রুর নিকট কাল কি সংকেত পাঠাইতেছিলে?"

সোমদত্তা আমার স্কন্ধ হইতে মস্তক তুলিল। আমার মুখের উপর দুই চক্ষু

পাতিয়া যেন অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত অন্বেষণ করিয়া লইল। সেখানে কি দেখিল জানি না, বলিল, "দুর্গের দুই একটা কথা জানাইতেছিলাম।"

"তাহা না বলিলেও বুঝিয়াছি। কি কথা?"

"নগরে খাদ্য নাই, এই সংবাদ দিতেছিলাম।"

আমি বলিলাম, "ভুল সংবাদ দিয়াছ—কাল প্রভাত হইতে নগরে আর অন্নাভাব থাকিবে না।"

সোমদত্তা চমকিত হইয়া বলিল, "সে কি! কোথা হইতে খাদ্য আসিবে?"

আমি বলিলাম, "তাহা জানি না! বোধ হয় কোনও সুড়ঙ্গ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই পথে বাহির হইতে খাদ্যাদি আসিবে।"

"সুড়ঙ্গ? কোথায় সুড়ঙ্গ?"

"তাহা কি করিয়া জানিব? এ আমার অনুমান মাত্র। কিন্তু নিশ্চিত বলিতেছি, নগরে আর দুর্ভিক্ষ থাকিবে না, সে আয়োজন হইয়াছে। শুধু তাই নয়, শীঘ্রই চন্দ্রবর্মা বাহির হইতে আক্রান্ত হইবেন—বোধ হয় বৈশালী হইতে সৈন্য আসিতেছে।"

"সত্য বলিতেছ? আমাকে প্রতারণা করিতেছ না?"

"সত্য বলিতেছি, আজ বিরোধবর্মার মুখে এ কথা শুনিয়াছি।"

সোমদত্তা ললাটে করাঘাত করিল; বলিল, "হায়! কাল এ কথা শুনি নাই কেন? শুনিলে প্রাণ দিতাম, তবু..."

সোমদত্তা বিদ্যুদগ্নিপূর্ণ দুই চক্ষু আমার দিকে ফিরাইল। দীর্ঘকাল মৌন থাকিয়া শেষে বলিল, "যাহা হইবার হইয়াছে, ললাট-লিখন কে খণ্ডাইবে? বেশ্যা-কন্যার বুঝি ইহাই প্রাক্তন!"

আমি বাহু দ্বারা তাহার কটিবেষ্টন করিয়া সোহাগে গদ্গদ স্বরে বলিলাম, "সোমদত্তা, প্রেয়সী, কেন বৃথা খেদ করিতেছ? তুমি আমার। চক্রায়ুধ ঈশানবর্মা তোমার জন্য অগ্নিতে প্রবেশ করিবে, জলে ঝাঁপ দিবে। চন্দ্রগুপ্তের কাল পূর্ণ হইয়াছে, তোমার জন্য আমি তার সর্বনাশ করিব।"

"তুমিও চন্দ্রগুপ্তের সর্বনাশ করিবে?"

"করিব। তুমি পার, আর আমি পারি না? চন্দ্রগুপ্ত আমার কে?"

"সখা!"

"সখা নয়। আমি তার প্রমোদের সহচর, স্তাবক সভাসদ্, বিট-বিদূষক মাত্র। চন্দ্রগুপ্ত একদিন আমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছিল, আমিও লইয়াছি। যার অঙ্কলক্ষ্মীকে কাড়িয়া লইয়াছি, তার সঙ্গে আবার সখ্য কিসের? এখন আমরা দু'জনে মিলিয়া তার উচ্ছেদ করিব।"

কিছুক্ষণ নির্বাক্ থাকিয়া সোমদত্তা প্রশ্ন করিল, "কি করিতে চাও?"

"শুন বলিতেছি। প্রভাতে বিরোধবর্মার মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহা হইতে অনুমান হয় যে, আজ হইতে দশ দিনের মধ্যে লিচ্ছবিদেশ হইতে পাটলিপুত্রের সাহায্যার্থে সৈন্য আসিবে—পারাবত-মুখে এই সংবাদ আসিয়াছে। চন্দ্রবর্মা যদি পাটলিপুত্র অধিকার করিতে চান, তবে তৎপূর্বেই করিতে হইবে, লিচ্ছবিরা আসিয়া পড়িলে আর তাহা সুসাধ্য হইবে না। তখন নিজের প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িয়া যাইবে। এদিকে নগরের খাদ্যাভাবও ঘুচিয়াছে, সুতরাং বাহুবলে এই দশ দিনের মধ্যে দুর্গ জয় করা অসম্ভব। এরূপ ক্ষেত্রে উপায় কি?"

"কি উপায়?"

"বিশ্বাসঘাতকতা।"

"কে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে?"

"আমি করিব। কিন্তু পরিবর্তে চন্দ্রবর্মা আমাকে কি দিবেন?"

"যাহা পাইয়াছ তাহাতে তৃপ্তি নাই?"

"না। কাল বলিয়াছিলাম বটে, রাজ্য—সিংহাসন চাহি না, কিন্তু তাহা ভুল। রাজ্য না পাইলে তোমাকে পাইয়াও আমার অতৃপ্তি থাকিয়া যাইবে। তুমি রাজ-ঐশ্বর্যের স্বাদ পাইয়াছ,—অল্পে কি তোমার মন উঠিবে?"

"তা বটে, অল্পে আমার ক্ষুধা মিটিবে না!...কৃতঘ্নতার মূল্য কি চাও?"

"আমি সব স্থির করিয়াছি। তুমি দীপসংকেতে চন্দ্রবর্মাকে সমস্ত সংবাদ দাও,—জানাও যে বিশ্বাসঘাতকতা ভিন্ন দুর্গ অধিকার হইবে না। তাঁহাকে এ কথাও বল যে, একজন দ্বারপাল সেনানী দুর্গদ্বার খুলিয়া দিতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু পুরস্কারস্বরূপ তাহাকে মগধের সিংহাসন দিতে হইবে।"

সোমদত্তা প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর হাসিয়া উঠিল! দীপের কম্পমান আলোকে সে হাসি অদ্ভুত দেখাইল। বলিল, "বেশ বেশ! আমিও তো ইহাই চাহিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম পিতাকে তুষ্ট করিয়া এক জনের জন্য মগধের সিংহাসন ভিক্ষা মাগিয়া লইব, এক স্পর্ধিতা দুর্বিনীতা নারীর দর্পচূর্ণ করিব। কিন্তু এই ভালো। তোমার ও আমার ষড়যন্ত্রে পিতা দুর্গ অধিকার করিবেন, তারপর তুমি সিংহাসনে বসিবে, আর আমি—আমি তোমার পট্টমহিষী হইব। এই ভালো!"—বলিয়া সোমদত্তা আবার হাসিল।

আমি বলিলাম, "চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করিতে হইবে। তাহাকে বাঁচিতে দিয়া কোন লাভ নাই। পরে গণ্ডগোল বাধিতে পারে। একটা সুবিধা আছে, চন্দ্রগুপ্ত পলাইতে পারিবে না, সে মোহনগৃহের সন্ধান জানে না।"

চন্দ্রগুপ্তের প্রতি সোমদত্তার মনে কোন মমতা আছে কি না দেখিবার জন্য এই কথা বলিয়াছিলাম। দেখিলাম, তাহার মুখে করুণার ভাব ফুটিয়া উঠিল না, বরঞ্চ মুখ ও অধরোষ্ঠ আরও কঠিনভাব ধারণ করিল। সে স্থির নিষ্করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। জিজ্ঞাসা করিল, "মোহনগৃহ কি?"

মোহনগৃহ কি, বুঝাইয়া দিলে সোমদত্তার মুখে কিছু উৎফুল্লতা দেখা দিল। সে আমার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া বলিল, "প্রিয়তম, চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারদেবী পুত্র লইয়া পলাইবে, এই কথা ভাবিয়া আমার মনে সুখ ছিল না; এখন নিশ্চিত হইলাম। ভাবিও না, তোমাতে আমাতে নিরাপদে রাজ্যসুখ ভোগ করিব।"

"আর চন্দ্রগুপ্ত?"

"সে ভার আমার। আমি তার ব্যবস্থা করিব?"

উষার সূচনা করিয়া শীতল বায়ু আমাদের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া গেল। পূর্বগগনে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষয়প্রাপ্ত শশিকলা রোগপাণ্ডুর মুখ তুলিয়া চাহিল। আমি বলিলাম, "আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে, এই বেলা সংকেত পাঠাও।"

সোমদত্তা প্রদীপ লইয়া প্রাকারের প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইল। প্রসারিত-হস্তে কিছুক্ষণ প্রদীপ ধরিয়া থাকিয়া মুখে নিশাচর পক্ষীর মতো একপ্রকার শব্দ করিল। উৎকর্ণ হইয়া শুনিলাম, পরিখার পরপার হইতে অস্পষ্ট উত্তর আসিল। তখন সোমদত্তা প্রদীপ ধীরে ধীরে সঞ্চালিত করিতে লাগিল। তাপসীর মতো আত্মসমাহিত মুখ, নিশ্চল তন্ময় চক্ষু, সোমদত্তা দীপরশ্মির সাহায্যে সমস্ত সংবাদ বাহিরে প্রেরণ করিল।

সংবাদ শেষ হইলে বাহিরের অন্ধকার হইতে আবার শব্দ আসিল—এবার পাপিয়ার উচ্চতান—শব্দ স্তরে স্তরে উঠিয়া ঊর্ধ্বে বায়ুমণ্ডলে বিলীন হইয়া গেল।

সোমদত্তা প্রদীপ নামাইয়া বলিল, "কল্য উত্তর পাইবে।"

নিশাবসানে পৌরজন নিদ্রাত্যাগ করিয়া দেখিল, নগরের হট্টে রাশি রাশি খাদ্য স্তূপীকৃত হইয়াছে। ঘৃত, তৈল, শালি-তণ্ডুল, গোধূম, চণক, শাক-সব্জী—কোন বস্তুরই অভাব নাই। কোথা হইতে খাদ্য আসিল, কেহ জানিল না। শুধু দেখা গেল, বুদ্ধ তথাগতের পাষাণময় বিহারের অভ্যন্তর হইতে এই খাদ্য-স্রোত নিঃসৃত হইতেছে। নাগরিকগণ ঊর্ধ্ব কণ্ঠে সৌগতের জয়ঘোষণা করিতে করিতে হট্টের অভিমুখে ছুটিল।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত তখন মল্লগৃহের সুচিক্কণ শীতল মণি-কুট্টিমের উপর শয়ান ছিলেন, দুই জন নহাপিত সুগন্ধি তৈল দ্বারা তাঁহার হস্তপদাদি মর্দন করিয়া দিতেছিল। নাগরিকদের এই আনন্দনিনাদ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল; তিনি মুদিত চক্ষু ঈষন্মাত্র উন্মীলিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল্লভ, কিসের চিৎকার? চন্দ্রবর্মা কি দুর্গপ্রবেশ করিল?"

সন্নিধাতা বল্লভ সুবর্ণস্থালীর উপর স্ফটিকপাত্রপূর্ণ ফলাম্লরস লইয়া অদূরে দাঁড়াইয়াছিল—মহারাজ স্নানান্তে পান করিয়া শরীর স্নিগ্ধ করিবেন। সে বলিল, "না অজ্জ, বহুদিন পরে পৌরজন খাদ্য পাইয়াছে, তাই মহারাজের জয়-ধ্বনি করিতেছে।"

চন্দ্রগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাদ্য কোথা হইতে আসিল?"

বল্লভ সবিশেষ জানিত না, তথাপি মহারাজের কথার উত্তর দিতে হইবে; বলিল, "বিহারমধ্যে খাদ্য সঞ্চিত ছিল, ভিক্ষুগণ তাহাই বিতরণ করিতেছেন।"

মহারাজ আর প্রশ্ন করিলেন না, পুনশ্চ চক্ষু মুদিত করিয়া কহিলেন, "ভাল, মহাদেবীকে সমাচার দাও। তিনি প্রকৃতিপুঞ্জের জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিলেন।"

মহারাজের গূঢ় শ্লেষ বল্লভ অনুধাবন করিল না, মহাদেবী বলিতে প্রেয়সী সোমদত্তাকেই বুঝিল। "যথা আজ্ঞা!"—বলিয়া বাহিরে গেল। বাহিরে গিয়া দেখিল, অসংবৃতকুন্তলা এক তরুণী দাসী দ্রুতপদে বহির্মুখে যাইতেছে। বল্লভ ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে কাছে ডাকিল, বলিল, "জয়ন্তী, তোমার কেশবেশ যেরূপ বিস্রস্ত, বাহিরে গেলে লোকে নিন্দা করিবে!"

জয়ন্তী মথিত-কজ্জল চক্ষু মার্জনা করিয়া কহিল, "কি প্রয়োজন তাই বল না, রসিকতার সময় নাই। আমি কাজে যাইতেছি।"

বল্লভ বলিল, "কাজ পরে করিও, এখন অন্দরে ফিরিয়া যাও।"—বলিয়া তাহার মুখে সংবাদ পাঠাইয়া দিল।

জয়ন্তী সংবাদ লইতেই আসিতেছিল, ফিরিয়া গিয়া সোমদত্তাকে সকল কথা জানাইল।

সোমদত্তা তখন শীতল হর্ম্যতলে পড়িয়া দুই বাহুর উপর মুখ রাখিয়া চিন্তা করিতেছিল। কি গহন, কি কুটিল তাহার চিন্তা, তাহা কে বলিবে? দাসীর কথা শুনিয়া সে উঠিয়া বসিল। দুই চক্ষু কালিমাবেষ্টিত হইয়া যেন আরও উজ্জ্বল আরও প্রভাময় হইয়াছে, শিশির-কালের প্রস্ফুট হিমচম্পকের ন্যায় কপোল দুইটি পাণ্ডুর। রূপের বুঝি অন্ত নাই! দাসী এই ক্লান্ত-সন্তপ্ত সৌন্দর্যের সম্মুখ হইতে বোধ করি লজ্জা পাইয়া ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছিল; সোমদত্তা ডাকিল, "জয়ন্তী!"

দাসী ফিরিয়া আসিয়া সসম্ভ্রমে বলিল, "অজ্জা!"

অধোমুখে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সোমদত্তা বলিল, "তুই একবার বাহিরে যা। বৌদ্ধ-বিহারে গিয়া শ্রমণাচার্য ভিক্ষু অকিঞ্চনকে আমার কাছে ডাকিয়া আন্। বলিবি

যে ভিক্ষুণী দীপান্বিতা তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছে। আর কঞ্চুকী যদি তাঁর পুরপ্রবেশে বাধা দেয়, এই মুদ্রা দেখাস্।"—বলিয়া আপন কণ্ঠের রত্নহার হইতে সুবর্ণমুদ্রা খুলিয়া দাসীর হস্তে দিল।

জয়ন্তীর মুখ পাংশু হইয়া গেল, সে ভীতকণ্ঠে বলিল, "কিন্তু অজ্জা, কুমারদেবী জানিতে পারিলে—"

সোমদত্তা কহিল, "ত্যক্ত করিস্ না, যা বলিলাম কর্।"

জয়ন্তী প্রস্থান করিল, মনে মনে বলিতে বলিতে গেল, "তোমার আর কি! অন্দরে বৌদ্ধ ভিক্ষু ডাকিয়াছি শুনিলে পট্টদেবী আমার মাথাটি খাইবেন।"

ভিক্ষু অকিঞ্চনকে লইয়া যখন জয়ন্তী ফিরিল, তখন সোমদত্তা স্নান করিয়া শুদ্ধশুচি হইয়া বসিয়াছে। ললাটে কুঙ্কুম-তিলক পরিয়াছে, বক্ষে কাঁচুলি বাঁধিয়া উচ্ছল দেহলাবণ্য সংযত করিয়াছে। ভিক্ষু কক্ষে প্রবেশ করিয়া সোমদত্তাকে আশীর্বাদ করিলেন এবং আসন পরিগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সংঘস্থবিরের বয়স হইয়াছে, মস্তক ও মুখ মুণ্ডিত, পরিধানে পীতবস্ত্র, শান্ত সৌম্য মূর্তি। কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে কিছু কৃশ, কিন্তু মুখমণ্ডলে ব্রহ্মচর্যের নির্মল দীপ্তি জাজ্বল্যমান।

সোমদত্তা জয়ন্তীকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল। জয়ন্তী প্রস্থান করিলে সে ভিক্ষুকে প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, "অর্হৎ, আত্ম-পরিচয় গোপন করিয়া সংঘারামে গিয়াছিলাম—ক্ষমা করুন!"

অকিঞ্চন কহিলেন, "আত্মগোপন করিয়া যে আর্তের সেবা করে, সিদ্ধার্থ তাহাকে অধিক কৃপা করেন।"

সোমদত্তা কহিল, "আজ রাত্রে বোধ হয় সংঘারামে যাইবার অবকাশ হইবে না। তাই অজ্জা কুমারদেবীর বৌদ্ধ-বিদ্বেষ জানিয়াও আপনাকে এখানে আহ্বান করিয়াছি। আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।"

অকিঞ্চন কহিলেন, "সময় উপস্থিত হইলে ভগবান শাক্যসিংহ কুমারদেবীকে সুমতি দিবেন।...তোমার জিজ্ঞাস্য কি?"

সোমদত্তা কহিল, "শুনিলাম, নগরে খাদ্য আসিতেছে; এ কথা সত্য?"

"সত্য।"

"কি করিয়া আসিল?"

ভিক্ষু কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিলেন, "তথাগতের কৃপায়।"

সোমদত্তা ঈষৎ অধীর হইয়া বলিল, "তাহা জানি। কিন্তু কোথা হইতে কোন্ পথে আসিল?"

অকিঞ্চন মৃদুহাস্যে বলিলেন, "সংঘের পথে।"

শিরঃসঞ্চালন করিয়া সোমদত্তা কহিল, "তাহাও জানি; খাদ্য সংঘারামে সঞ্চিত ছিল?"

"না।"

"তবে?"

"এ অতি গূঢ় বৃত্তান্ত। দীপান্বিতে, তুমি কৌতূহল প্রকাশ করিও না,—আমি বলিব না।"

"তবে আমিই বলিতেছি! সংঘমধ্যে কোনও সুড়ঙ্গ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই পথে দুর্গের বাহির হইতে খাদ্য আসিতেছে—সত্য কি না?"

ইতস্ততঃ করিয়া ভিক্ষু কহিলেন, "সত্য। জান যদি, প্রশ্ন করিতেছ কেন?"

"জানি না, অনুমান করিয়াছি মাত্র। অর্হৎ, কন্যার প্রতি একটি অনুগ্রহ করুন;

কি করিয়া কবে এই সুড়ঙ্গ আবিষ্কৃত হইল, আমাকে বলুন।"

কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া সংঘাচার্য বলিলেন, "ভাল, শুনুন। এই সুড়ঙ্গের সন্ধান একপক্ষ পূর্বে পর্যন্ত আমি অথবা অন্য কেহ জানিত না। আমার পূর্ববর্তী সংঘস্থবির নির্বাণের পূর্বে মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাই ইহার কথা আমাকে বলিয়া যাইতে পারেন নাই।"

নির্নিমেষ চক্ষুর্দ্বয় ভিক্ষুর মুখের উপর স্থাপন করিয়া সোমদত্তা শুনিতে লাগিল।

অকিঞ্চন বলিতে লাগিলেন, "সংঘের মধ্যে ভূগর্ভস্থ যে প্রকোষ্ঠে বুদ্ধের অস্থি রক্ষিত আছে, তাহার উপরে আর একটি কক্ষ আছে, তুমি দেখিয়া থাকিবে। কক্ষটি সচরাচর ব্যবহৃত হয় না, কদাচ আমি মননাদির জন্য উহা ব্যবহার করিয়া থাকি। গত পূর্ণিমা-তিথিতে আমি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখি, ঘরটি অত্যন্ত অপরিষ্কার হইয়াছে এবং ছাদের মধ্যস্থলে যে প্রস্তরের ধর্মচক্র ক্ষোদিত আছে, তাহার উপর মধুমক্ষিকা চক্রনির্মাণ করিয়াছে। ঘরটিকে মলনির্মুক্ত করিবার মানসে আমি প্রথমে একটি বংশদণ্ডাগ্রে মশাল যোজিত করিয়া ধূম প্রয়োগ দ্বারা মধুমক্ষিকাগুলিকে বিদূরিত করিলাম, তারপর মধুচক্রটি স্থানচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে বংশদণ্ডদ্বারা উহা তাড়িত করিবামাত্র এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। ধর্মচক্রের মধ্যস্থলে যে ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, তাহার মধ্যে বংশের অগ্রভাগ প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কক্ষপ্রাচীরের এক স্থানে প্রস্তর সরিয়া গিয়া একটা চতুষ্কোণ গহ্বর দেখা দিল। আমি অতিশয় বিস্মিত হইয়া সেই রন্ধ্রটি পরীক্ষা করিলাম, দেখিলাম, অন্ধকার মধ্যে সোপান নামিয়া গিয়াছে।

"পাছে অন্য কেহ আসিয়া পড়ে, এ জন্য তখন আর কিছু করিলাম না—কক্ষের কবাট বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রিতে সকলে ঘুমাইলে, প্রদীপ লইয়া কক্ষের ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ করিয়া দিয়া সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রস্তর ও ইষ্টকনির্মিত সুড়ঙ্গ, অতিশয় সংকীর্ণ ও অনুচ্চ, মস্তক অবনত করিয়া চলিতে হয়। অর্ধ ক্রোশান্তরে বায়ুপ্রবাহের জন্য কূপ আছে—সেই কূপ সকল লঙ্ঘন করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। আমি এইভাবে বহুদূর পর্যন্ত গমন করিয়াও সুড়ঙ্গের শেষ পাইলাম না। প্রদীপের তৈল নিঃশেষ হইয়া আসিতেছিল, সে রাত্রিতে ভগ্নোদ্যমে ফিরিয়া আসিলাম। তারপর উপর্যুপরি পঞ্চরাত্রি চেষ্টার পর ষষ্ঠরাত্রিতে সুড়ঙ্গের অপর প্রান্তে পৌঁছিলাম। কুক্কুটপাদ বিহারের অঙ্গনে গিয়া সুড়ঙ্গ শেষ হইয়াছে..."

সংহত নিশ্বাসে সোমদত্তা বলিল, "তারপর?"

নিশ্বাস ফেলিয়া অকিঞ্চন কহিলেন, "কুক্কুটপাদ বিহারের পূর্বশ্রী আর নাই, এখন উহা জনহীন ভগ্নপ্রায়, শ্বাপদের বাসভূমি। কিন্তু গোতমের করুণার উৎস এখনো শতমুখে উৎসারিত হইতেছে। তাই ভগবান পথ দেখাইয়া দিলেন। আমি ফিরিয়া আসিয়া সান্ধিবিগ্রহিককে সংবাদ দিলাম, বলিলাম, সংঘের পথেই বুভুক্ষিতের ক্ষুধা নিবারণ হউক।"

ভিক্ষু নীরব হইলেন। সোমদত্তা নতমুখে চিন্তা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিবার পর ভিক্ষু আসন ত্যাগ করিয়া উঠিবার উপক্রম করিলেন। তখন সোমদত্তা যুক্তপাণি হইয়া বলিল, "শ্রীমন্, আর একটি প্রশ্ন আছে। এই রাজপুরী যিনি নির্মাণ করিয়াছিলেন, তিনি কি বৌদ্ধ ছিলেন?"

অকিঞ্চন কহিলেন, "হাঁ, শুনিয়াছি, অশোক প্রিয়দর্শী এই পুরী নির্মাণ করাইয়াছিলেন, সংঘারামও তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত।"

সোমদত্তা প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "ভগবন্, আশীর্বাদ করুন, যেন পূর্ণমনোরথ হইতে পারি।"

হাস্যমুখে অকিঞ্চন কহিলেন, "সুমঙ্গলে, গোতমের ইচ্ছায় তোমার মনস্কাম সিদ্ধ হইবে—গোতম অন্তর্যামী।"

সংঘস্থবির বিদায় হইলে সোমদত্তা কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল। দীর্ঘকাল গভীর চিন্তা করিল। ধর্মচক্র! ধর্মচক্র! কিন্তু পুরীমধ্যে কোথাও তো ধর্মচক্র নাই। বুদ্ধের মূর্তি, ধর্মচক্র প্রভৃতি যাহা ছিল, তাহা অপসারিত করিয়া তৎপরিবর্তে দেবমূর্তি স্থাপিত হইয়াছে।

ভাবিতে ভাবিতে অজ্ঞাতসারে তাহার চক্ষু ঊর্ধ্বে নিপাতিত হইল। তখন বিস্ফারিত নেত্রে স্তম্ভিত বক্ষে সোমদত্তা দেখিল, উচ্চ ছাদের মধ্যস্থলে রক্তপ্রস্তরে উৎকীর্ণ ধর্মচক্র —এবং তাহার কেন্দ্রমধ্যে ক্ষুদ্র সুগোল একটি ছিদ্র!

বহুক্ষণ তদবস্থ থাকিবার পর সোমদত্তা ছুটিয়া গিয়া জয়ন্তীকে ডাকিল। উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, "জয়ন্তী, শীঘ্র যা—অস্ত্রাগার হইতে ধনুর্বাণ লইয়া আয়! জিজ্ঞাসা করিলে বলিস্, মহাদেবী সোমদত্তা লক্ষ্যবেধ শিক্ষা করিবেন।"

শব্দতরঙ্গে অন্ধকার পরিপূর্ণ করিয়া বাঁশি বাজিতেছিল। সোমদত্তা প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া করতলে চিবুক রাখিয়া এই দূরাগত বংশীধ্বনি শুনিতেছিল। আমি প্রাকার-কুড্য আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম।

বাঁশি প্রথমে বসন্ত-রাগ ধরিল; তার পর কিছুক্ষণ গুর্জরী-রাগ লইয়া ক্রীড়া করিয়া আবার বসন্ত-রাগে ফিরিয়া আসিল। শেষে এই দুই রাগ ছাড়িয়া বাঁশি মালকোষ ধরিল। কত নিপুণ সুরের কৌশল, কত মীড়-গমক-ঝংকার, কত তান-লয়ের পরিবর্তন দেখাইল। তার পর সহসা বাঁশি স্তব্ধ হইল।

"বাঁশি কি বলিল?"

সোমদত্তা যেন তন্দ্রার ঘোর হইতে জাগিয়া উঠিল। অতি দীর্ঘ এক নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "তুমি যাহা চাও পাইবে। চন্দ্রবর্মা তোমাকে মগধের ক্ষত্রপ নিযুক্ত করিবেন। আগামী অমাবস্যার রাত্রিতে দ্বিতীয় প্রহর ঘোষিত হইবার পর আমি এই প্রদীপ দ্বারা রাজপুরীতে অগ্নিসংযোগ করিব। অগ্নি যখন ব্যাপ্ত হইয়া আকাশ লেহন করিবে, সেই সময় তুমি গোতম-দ্বারের অর্গল খুলিয়া দিবে। রাজপ্রাসাদে অগ্নিসংযোগই সংকেত; এই সংকেত পাইয়া চন্দ্রবর্মার সেনা দুর্গপ্রবেশের জন্য প্রস্তুত থাকিবে, তুমি দ্বার খুলিয়া দিলেই তাহারা প্রবেশ করিবে। পৌরজন রাজপুরী রক্ষার্থ ব্যস্ত থাকিবে, সেই অবসরে চন্দ্রবর্মা বিনা বাধায় পাটলিপুত্র অধিকার করিবেন।"

আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, "অমাবস্যার রাত্রি? তার তো আর বিলম্ব নাই—আগামী পরশ্ব!"

"হাঁ। অধিক বিলম্বে ভয় আছে, লিচ্ছবিগণ আসিয়া পড়িতে পারে।"

ইহার পর সোমদত্তা আবার মৌন অবলম্বন করিল, করলগ্নকপোলে নিষ্পলক দৃষ্টিতে দীপশিখার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। আমিও সহসা কি কথা বলিব ভাবিয়া পাইলাম না, মানসিক উত্তেজনা রসনাকে যেন জড় করিয়া দিল। তথাপি চেষ্টা করিয়া কহিলাম, "বাঁশি তো রাগ-রাগিণীর আলাপ করিল, তুমি এত কথা বুঝিলে কি করিয়া?"

সোমদত্তা অন্যমনে কহিল, "ঐ রাগ-রাগিণীতে সংযুক্ত কথাগুলা আমার জানিত। যিনি বাঁশি বাজাইতেছিলেন, তিনি আমার গীতাচার্য ছিলেন!"

অতঃপর আবার দীর্ঘ নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল। কাহারও মুখে কথা নাই।

এই সুকঠিন মৌন আর সহ্য করিতে না পারিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ভাবিতেছ?"

সোমদত্তা মুখ তুলিয়া বলিল, "ভাবিতেছি, কি অপরিমেয় শক্তি এই ক্ষুদ্র মৃৎ-প্রদীপের! এত তুচ্ছ, ভঙ্গুর—মাটিতে পড়িলে ভাঙিয়া শতখণ্ড হইবে; অথচ একটা রাজ্য ধ্বংস করিবার শক্তি ইহার আছে। এমনি কতশত ছার মৃৎপ্রদীপ কেবল রূপ-শিখার অনলে সংসার ভস্মীভূত করিতেছে!"

আমি তাহার বাক্যের মর্ম বুঝিয়া হস্তধারণপূর্বক বলিলাম, "মৃৎপ্রদীপ নয়, সোমদত্তা, তুমি রত্নপ্রদীপ! তোমার দীপ্তিতে মগধ আলোকিত হইবে।"

সোমদত্তা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আমি শ্মশানের আলো!...এখন চলিলাম, সেই অমাবস্যার রাত্রিতে আবার সাক্ষাৎ হইবে। চন্দ্রবর্মাকে সঙ্গে লইয়া প্রাসাদে যাইও, আমি মন্ত্রগৃহে প্রতীক্ষায় থাকিব।"

আমি তাহাকে সাদরে নিকটে টানিয়া লইয়া বলিলাম, "সেই দিন আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে!"

ঈষৎ হাসিয়া সোমদত্তা বলিল, "হাঁ, সেই দিন আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে।"

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত সোমদত্তার কক্ষে রাত্রিকালে নিদ্রা যাইতেছিলেন। অকস্মাৎ তীব্র শ্বাসরোধকর ধূমের গন্ধে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু না খুলিয়াই ডাকিলেন, "সোমদত্তা!" উত্তর পাইলেন না। তখন নিদ্রাকষায়নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, শয্যায় সোমদত্তা নাই। কক্ষের চারিদিকে চাহিলেন, সোমদত্তাকে দেখিতে পাইলেন না।

বাহিরে তখন সমস্ত পুরী জাগিয়া উঠিয়াছে। সদ্যোত্থিতা নারীদের ভীত চিৎকার, গৃহপালিত ময়ূর শারিকা প্রভৃতি পক্ষীদের সচকিত আর্তস্বর এবং সর্বোপরি বিস্তারশীল অগ্নির গর্জন নৈশ বায়ুকে বিলোড়িত করিতেছে। দারুপ্রাসাদে আগুন লাগিলে রক্ষা করিবার কোনও উপায় নাই, পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করাই একমাত্র পথ। পুরীস্থ সকলে মহাকোলাহল করিয়া নিজ নিজ মূল্যবান দ্রব্য যাহা পাইতেছে, লইয়া পলাইতেছে। কে পড়িয়া রহিল, রাজা-রাণী কে মরিল কে বাঁচিল, কাহারও দেখিবার অবসর নাই। নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য সকলেরই উগ্র বাহ্যজ্ঞানশূন্য ত্বরা।

অগ্নি ক্রমশঃ আরও ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, এক প্রাসাদ ছাড়িয়া সংলগ্ন প্রাসাদসকল আক্রমণ করিল। বায়ুর বেগ বাড়িয়া গেল। অমাবস্যা রাত্রির মসীতুল্য অন্ধকার এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে যেন বিদীর্ণ শতখণ্ড হইয়া গেল। বহুদূর পর্যন্ত নগর রক্তাভ আলোকে উদ্ভাসিত হইল।

নাগরিকগণ জাগিয়া উঠিয়া কোলাহল করিতে করিতে রাজপুরীর দিকে ছুটিল! উত্তেজিত বিহ্বল নর-নারী স্খলিতবসনে মুক্ত-কেশে বাহ্যজ্ঞানশূন্যভাবে জ্বলন্ত রাজ-প্রাসাদের চতুর্দিকে সমবেত হইতে লাগিল।

সহসা বহুদূরে সম্মিলিত সহস্রকণ্ঠে মহাজয়ধ্বনি শ্রুত হইল। রাজপুরীর চারিপাশে সমবেত নাগরিকগণ ঊর্ধ্বমুখে অনলোল্লাস দেখিতেছিল, তাহার মধ্য হইতে কে একজন চিৎকার করিয়া বলিল, "পালাও! পালাও! নগরে শত্রু প্রবেশ করিয়াছে!"—অমনই বিক্ষুব্ধ জনতা উন্মত্তের ন্যায় চারিদিকে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। কেহ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে পড়িয়া গিয়া জানু ভাঙিল, কেহ জনমর্দের চরণতলে পড়িয়া পিষ্ট হইয়া গেল। ক্রন্দন, হাহাকার এতক্ষণ রাজপুরীর মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, এবার নগরময় ছড়াইয়া পড়িল।

সোমদত্তা তখন কোথায়?

সোমদত্তা তখন আলুলায়িত কুন্তলে, লুণ্ঠিত বসনে পট্টমহাদেবীর প্রাসাদে প্রবেশ করিতেছে। কুমারদেবীর ভবনে তখনও ভালো করিয়া আগুন লাগে নাই, কিন্তু দাসী, কিঙ্করী, প্রহরিণী—যে যেখানে ছিল সকলে পলাইয়াছে। কুমারদেবীর অরক্ষিত শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া সোমদত্তা দেখিল, বিস্তৃত শয্যার উপর পুত্রকে বুকের কাছে লইয়া তিনি তখনও নিদ্রিতা।

সোমদত্তা সবলে তাঁহার অঙ্গে নাড়া দিয়া বলিল, "দেবী, উঠুন, উঠুন—প্রাসাদে আগুন লাগিয়াছে!"

কুমারদেবী চক্ষু মুছিয়া শয্যায় উঠিয়া বলিলেন, "কে?"

"আমি, সোমদত্তা। আর বিলম্ব করিবেন না, শীঘ্র শয্যাত্যাগ করুন"—বলিয়া ঘুমন্ত সমুদ্রগুপ্তকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইতে গেল।

কুমারদেবীর দৃষ্টি তীক্ষ্ম ও কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "আমার পুত্রকে স্পর্শ করিও না। দাসীরা কোথায়?"

"কেহ নাই, সকলে প্রাণভয়ে পলাইয়াছে।"

"মহলে কি করিয়া আগুন লাগিল?"

আর গোপন করিবার প্রয়োজন ছিল না। সোমদত্তা স্থিরদৃষ্টিতে কুমারদেবীর মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "আমি মহলে আগুন দিয়াছি।"

কুমারদেবী চিৎকার করিয়া কহিলেন, "স্বৈরিণী! তাহা জানি। যখন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে ঘরে আনিয়াছিস্ তখনি তোর অভিসন্ধি বুঝিয়াছি।"

সোমদত্তা কহিল, "অজ্জা, ক্রোধে অন্ধ হইয়া নির্দোষের প্রতি দোষারোপ করিবেন না। সেই বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রসাদেই আজ আপনাদের প্রাণরক্ষা করিতে পারিব। এখন আসুন, পুরী এতক্ষণে ভস্মসাৎ হইল। আর বিলম্ব করিলে বুঝি আপনাদের বাঁচাইতে পারিব না।"

"তুই বাঁচাইবি? কেন, আমি কি আত্মরক্ষা করিতে জানি না?"

"না অজ্জা, আজ আমি ভিন্ন আর কেহ আপনাদের বাঁচাইতে পারিবে না।"

"তার অর্থ?"

"তার অর্থ চন্দ্রবর্মার সেনা দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে, এতক্ষণে বোধ করি রাজপুরী ঘিরিল।"

কুমারদেবীর চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, "ডাকিনী! এ তোর কার্য; তুই মগধরাজ্য ছারখারে দিলি!"

সোমদত্তা স্থিরভাবে বলিল, "স্বীকার করিলাম। কিন্তু আর বিলম্ব করিলে কুমারকে বাঁচাইতে পারিব না। ঐ দেখুন, অগ্নি প্রাসাদ বেষ্টন করিয়াছে।"

এই সময় অর্ধচন্দ্রাকৃতি বাতায়নপথে অগ্নির আরক্ত লোলরসনা ও কুণ্ডলিত ধূমোদ্গার কক্ষে প্রবেশ করিল।

সোমদত্তা সমুদ্রগুপ্তকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বলিল, "আজ আমার স্বামীর বংশ-ধরকে বাঁচাইব বলিয়া আসিয়াছি, নহিলে আসিতাম না। আপনি থাকিতে হয় থাকুন, আমি চলিলাম"—বলিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

কুমারদেবী ছুটিয়া আসিয়া তাহার বাহু ধরিলেন, বলিলেন, "রাক্ষসী, ছাড়িয়া দে, আমার পুত্রকে ছাড়িয়া দে!"

সোমদত্তা প্রজ্বলিত নয়নে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "দুর্ভাগিনী, নিজের ইষ্ট বুঝিতে পার না? আমার স্বামীর পুত্র কি আমার পুত্র নয়? এ রাজ্যে আগুন

আমি জ্বালি নাই, জ্বালিয়াছে তোমার দুরন্ত অন্ধ অভিমান। সেই আগুনে তুমি পুড়িয়া মর!"

কুমারদেবীর হাত ছাড়াইয়া পুত্র বুকে লইয়া সোমদত্তা ধূম্রান্ধকার অলিন্দের ভিতর দিয়া ছুটিয়া চলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে উন্মাদিনীর ন্যায় কুমারদেবী তাহার পশ্চাতে চলিলেন।

নিজ শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিয়া সোমদত্তা দেখিল, রাজা অভিভূতের ন্যায় শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া আছেন—চতুর্দিকে কি ঘটিতেছে, তাঁহার যেন কোনও ধারণা নাই। ঘর ধূমাচ্ছন্ন—ঘরের চারিকোণে চারিটি সুবর্ণ-প্রদীপ তখনও ক্ষীণ আলোক বিস্তার করিয়া জ্বলিতেছে।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে পুত্রকে স্বামীর ক্রোড়ে ফেলিয়া দিয়া সোমদত্তা ছুটিয়া গিয়া ধনুর্বাণ লইয়া আসিল। ভালো দেখা যায় না, দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রুধারা ঝরিতেছে, সোমদত্তা ধর্মচক্রের মধ্যস্থল লক্ষ্য করিয়া শরসন্ধান করিল। লক্ষ্যভ্রষ্ট শর পাথরে লাগিয়া ফিরিয়া আসিল। আবার শরনিক্ষেপ করিল, ব্যর্থ শর আবার প্রতিহত হইয়া ভূমিতে পড়িল। অদম্য ক্রন্দনের আবেগে সোমদত্তার বক্ষ ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তবে কি গুপ্তদ্বার খুলিবে না?

এদিকে ঘরের মধ্যে অগ্নির অসহ্য উত্তাপ উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। রাজা এবং কুমার-দেবী নির্বাক্ নিষ্পলক হইয়া সোমদত্তার এই উন্মত্তবৎ কার্য দেখিতে লাগিলেন। সোমদত্তা অসীম বলে আপনাকে সংযত করিয়া পুনশ্চ ধনুর্বাণ তুলিয়া লইল। লক্ষ্যবস্তু নিকটেই কিন্তু ভালো করিয়া দেখা যায় না, হাত কাঁপে, চক্ষু কূলে কূলে ভরিয়া উঠে। বহুক্ষণ ধরিয়া, অনেকবার চক্ষু মুছিয়া, অতি সাবধানে লক্ষ্য স্থির করিয়া সোমদত্তা তীর ছুঁড়িল। এবার আর তীর ফিরিয়া আসিল না—ধর্মচক্রের মধ্যস্থলে বিঁধিয়া রহিল। সোমদত্তা ধনু ফেলিয়া দিয়া একবার ক্ষণকালের জন্য মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

কিন্তু পরক্ষণেই চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কুমারদেবীর নিকটে গিয়া বলিল, "অজ্জা, এইবার স্বামিপুত্র লইয়া এই সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করুন। সুড়ঙ্গ নগর বাহিরে কুক্কুটপাদ বিহারে গিয়া শেষ হইয়াছে। সেখানে শত্রু নাই, সেখান হইতে সহজেই নিরাপদ স্থানে যাইতে পারিবেন।"

চন্দ্রগুপ্ত সুড়ঙ্গমুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিলেন, এতক্ষণে প্রথম কথা কহিলেন, "নগরের বাহিরে যাইবার প্রয়োজন কি?"

সোমদত্তা কহিল, "প্রয়োজন আছে। শত্রু নগর অধিকার করিয়াছে।"

তখন পুত্র লইয়া দুইজনে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিলেন। সোমদত্তা চন্দ্রগুপ্তের চরণে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "প্রিয়তম! এইবার বিদায় দাও।"

সহসা চন্দ্রগুপ্ত যেন তাঁহার সমস্ত চেতনা ফিরিয়া পাইলেন; ভীষণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সোমদত্তা, তুমি আসিবে না?"

সোমদত্তা দুই হাতে মুখ ঢাকিল; বলিল, "না প্রিয়তম, আমি আর তোমার সঙ্গে যাইবার যোগ্য নহি। কেন নহি, তাহা দেবীর মুখে শুনিও। চন্দ্রবর্মা আমার পিতা—এই কথা মনে করিয়া যদি পারো, আমাকে ক্ষমা করিও। তোমরা যাও—আমি ভিন্ন পথে যাইব।"

হৃদয়-বিদারক স্বরে চন্দ্রগুপ্ত ডাকিলেন, "সোমদত্তা!" দুই হস্তে কর্ণ আবরণ করিয়া সোমদত্তা কাঁদিয়া উঠিল, "না, না, ডাকিও না—আমি যাইতে পারিব না। আমায় মরিতে হইবে। প্রাণাধিক, আবার জন্মান্তরে দেখা হইবে, তখন তোমার সোমদত্তাকে সঙ্গে লইও।"

এই বলিয়া সবলে টানিয়া সুড়ঙ্গের পাষাণ-দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। চন্দ্রগুপ্তের মুখনিঃসৃত অর্ধোচ্চারিত বাণী পাষাণ প্রাচীরে লাগিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল।

তখন সেই উত্তপ্ত হর্ম্যতলে পড়িয়া, বসুধা আলিঙ্গন করিয়া, কেশ বিকীর্ণ করিয়া, ভূতলে ললাট প্রহত করিয়া সোমদত্তা কাঁদিল।

কিন্তু তবু অগ্নি নিবিল না।

এক হস্তে মুক্ত তরবারি, অন্য হস্তে প্রজ্বলিত উল্কা লইয়া দুর্গাবরোধকারী সেনা গোতম-দ্বার দিয়া প্রবেশ করিল। তাহাদের পুরোভাগে লৌহবর্মাবৃত ধাতুনির্মিত শিরস্ত্রাণধারী ভীষণাকৃতি স্বয়ং চন্দ্রবর্মা। দ্বারের প্রহরীদিগকে পূর্বেই সরাইয়া দিয়াছিলাম, সুতরাং একবিন্দুও রক্তপাত হইল না।

চন্দ্রবর্মা আমাকে দেখিয়া পরুষকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমিই বিশ্বাসঘাতক দ্বারপাল?"

কথার ভাবটা ভালো লাগিল না। যাহার জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করিলাম, সে-ই বিশ্বাসঘাতক বলে! যাহা হউক, বিনীত কণ্ঠে বলিলাম, "হাঁ আমিই। সম্রাটের জয় হউক।"

চন্দ্রবর্মা নিষ্করুণ আরক্ত দুই চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপন করিয়া মনে মনে কি যেন গবেষণা করিল, তার পর বলিল, "ভালো, সর্বাগ্রে পথ দেখাইয়া রাজপ্রাসাদে লইয়া চল।"

পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। বিরাট অনলস্তম্ভের মতো প্রাসাদ তখন জ্বলিতেছে—সমস্ত নগর আলোকিত করিয়াছে। আপনার প্রভায় রাজপুরী স্বয়ংপ্রকাশ।

সেনাদলের অগ্রে অগ্রে আমি চলিলাম। পথে কেহ গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিল না, যে সম্মুখে পড়িল চৈত্রের বায়ুতাড়িত শুষ্কপত্রের মতো নিমেষমধ্যে বিপরীত মুখে অন্তর্হিত হইল।

প্রাসাদের শূন্য তোরণ পার হইয়া সদলবলে সম্মুখস্থ মন্ত্রগৃহে প্রবেশ করিলাম। অগ্নি তখনও মন্ত্রগৃহ পর্যন্ত সংক্রামিত হয় নাই, তবে দীর্ঘ জিহ্বা বিস্তার করিয়া অগ্রসর হইতেছে—অচিরাৎ গ্রাস করিবে।

বিশাল বহুস্তম্ভযুক্ত মন্ত্রগৃহ প্রায়ান্ধকার, জনশূন্য। কেবল তাহার মধ্যস্থলে সিংহাসনের বেদীর সম্মুখে সোমদত্তা দাঁড়াইয়া আছে। অশনিপূর্ণ বৈশাখী মেঘের ন্যায় তাহার মূর্তি; বক্ষে পৃষ্ঠে মুক্ত কৃষ্ণ কেশজাল, ললাটে রক্তরেখা, নয়নের কৃষ্ণতারকায় জ্বালাময় বিদ্যুৎ।

বহু মশালের দীপ্তিতে মন্ত্রগৃহ আলোকিত হইল। তখন সোমদত্তা চন্দ্রবর্মাকে দেখিতে পাইয়া দ্রুতপদে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

"বৎসে! কল্যাণী!"—বলিয়া চন্দ্রবর্মা সোমদত্তাকে পদপ্রান্ত হইতে তুলিলেন। ক্ষণকালের জন্য এই ভীষণ দুর্ধর্ষ যোদ্ধার কণ্ঠস্বর যেন প্রসাদগুণ প্রাপ্ত হইল।

সোমদত্তা অবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "পিতা, আপনার কার্য সিদ্ধ হইয়াছে।"

চন্দ্রবর্মা বলিলেন, "পুত্রী, সে তোমারই জন্য! তোমার যোগ্য পুরস্কার আমি সযত্নে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি। এখন এই রত্নহার গ্রহণ কর।"—বলিয়া নিজ বক্ষ হইতে অমূল্য রশ্মিকলাপ মণিহার খুলিয়া সোমদত্তার হস্তে দিলেন।

সোমদত্তা হার দুই হস্তে ছিঁড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিল; বলিল, "আর আমার

পুরস্কারে প্রয়োজন নাই। আমার জীবনের সমস্ত প্রয়োজন শেষ হইয়াছে।"

চন্দ্রবর্মা বলিলেন, "সে কি! চন্দ্রগুপ্ত কোথায়?"

সোমদত্তা কহিল, "তা নয়, আমি বিধবা হই নাই। কিন্তু আমার স্বামীকে আর আপনি খুঁজিয়া পাইবেন না। তিনি পুরী ত্যাগ করিয়াছেন।"

"পুরী ত্যাগ করিয়াছেন! কোথায় গেল?"

"তাঁহাকে গুপ্তপথে দুর্গের বাহিরে পাঠাইয়াছি।"

"কন্যা, এ কার্য কেন করিলে?"

"দেব, এ ভিন্ন আমার আর অন্য পথ ছিল না। তিনি থাকিলে সকল কথা জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে মরিয়াও আমার এ নরক-যন্ত্রণা শেষ হইত না। পিতা, আমার কিছুই নাই—সব গিয়াছে। নারীর যাহা কিছু মূল্যবান, যাহা কিছু প্রেয়, এক নরকের পশু তাহা হরণ করিয়াছে।"

অঙ্গারের মতো দুই চক্ষু সোমদত্তা আমার দিকে ফিরাইল। তর্জনী প্রসারিত করিয়া বিকৃতমুখে চিৎকার করিয়া কহিল, "এই নরকের পশু আমার সর্বস্ব হরণ করিয়াছে!"

অল্পকালের জন্য সমস্ত পৃথিবী যেন নীরব হইয়া গেল। আমি আমার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্তপ্রবাহের শব্দ শুনিতে পাইলাম। তার পর ব্যাঘ্রের মতো গর্জন করিয়া চন্দ্রবর্মা আসিয়া আমার কেশমুষ্টি ধারণ করিল। অন্য হস্তের অঙ্গুলিগুলা আমার চক্ষু উৎপাটিত করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিল, ক্রূর হাসি হাসিয়া সোমদত্তা কহিল,—"পিতা, ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি পুরস্কার লইব। এই পিশাচকে এখনি মারিবেন না, ইহাকে তিলে তিলে দগ্ধ করিয়া মারিবেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া বিষকণ্টকপূর্ণ অন্ধকূপে যেন এই নরাধম পচিয়া পচিয়া মরে, গলিত ক্রিমিপূর্ণ শূকরমাংস ভিন্ন যেন অন্য খাদ্য না পায়; মরিবার পূর্বে যেন ইহার প্রত্যেক অঙ্গ গলিয়া খসিয়া পড়ে! আমার আত্মা পরলোক হইতে দেখিয়া সুখী হইবে।"

চন্দ্রবর্মা আমার কেশ ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "তাহাই করিব!...ইহাকে বাঁধিয়া রাখ।"

দশ জন মিলিয়া আমাকে বাঁধিয়া মাটিতে ফেলিল। তখন সোমদত্তা আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। আমার প্রতি অগ্নিপূর্ণ দুই চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া থাকিয়া সে আমার মুখে একবার পদাঘাত করিল। তারপর চন্দ্রবর্মার নিকট ফিরিয়া গিয়া স্থির শান্ত স্বরে কহিল, "পিতা, এইবার পিতার কার্য করুন।"

চন্দ্রবর্মার বজ্রের মতো কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল, "কি কার্য, বৎসে?"

সোমদত্তা বলিল, "এ দেহ আপনিই দিয়াছিলেন, আপনিই ইহার নাশ করুন।"

পাষাণ-স্তম্ভের মতো চন্দ্রবর্মা দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সোমদত্তা পুনরায় কহিল, "আমার মন নিষ্কলুষ, এই দূষিত দেহ হইতে তাহাকে মুক্ত করিয়া পিতার কর্তব্য করুন।"

বহুক্ষণ পরে অস্ফুট কণ্ঠে চন্দ্রবর্মা বলিলেন, "সেই ভালো, সেই ভালো।"

সোমদত্তা তখন দুই হস্তে বক্ষের কঞ্চুলী ছিঁড়িয়া ফেলিয়া পিতার সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিল।

চন্দ্রবর্মা দক্ষিণহস্তে সুতীক্ষ্ম ভল্ল তুলিয়া লইয়া চতুর্দিকে চাহিয়া কর্কশভয়ানক কণ্ঠে কহিলেন, "সকলে শুন, আমার কন্যার দেহ অশুচি হইয়াছিল, আমি তাহা ধ্বংস করিলাম।"—বলিয়া দুই পদ পিছু হটিয়া গিয়া ভল্ল ঊর্ধ্বে তুলিলেন। সোমদত্তা উন্মুক্ত বক্ষে নির্ভীক নিষ্পলক দৃষ্টিতে পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

আমি সভয়ে চক্ষু মুদিলাম।

পুনরায় যখন চক্ষু উন্মীলিত করিলাম, তখন দেখিলাম, রক্তচন্দন-চর্চিত শৈবাল-বেষ্টিত শ্বেত কমলিনীর মতো সোমদত্তার বিগতপ্রাণ দেহ মাটিতে পড়িয়া আছে।

১ বৈশাখ ১৩৩৮

বাঘের বাচ্চা

পুণা গ্রাম হইতে প্রায় সাত-আট ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে উপত্যকা হইতে বহু ঊর্ধ্বে গিরিসংকটের ভিতর দিয়া দুইজন সওয়ার নিম্নাভিমুখে অবতরণ করিতেছিল। চারিদিকেই উচ্চনীচ ছোটবড় পাহাড়ের শ্রেণী,—যেন কতকগুলা অতিকায় কুম্ভীর পরস্পর ঘেঁষাঘেঁষি হইয়া তাল পাকাইয়া এই হেমন্ত অপরাহ্নের সোনালী রৌদ্রে শুইয়া আছে। তাহারি মধ্যে পিপীলিকার মতো দুইটি প্রাণী সূর্যের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া ক্রমশঃ দীর্ঘায়মান ছায়া সম্মুখে ফেলিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছিল।

এখান হইতে উপত্যকা দৃষ্টিগোচর নয়, পথেরও কোন চিহ্ন কোথাও বিদ্যমান নাই। চতুর্দিকে কেবল উলঙ্গ কর্কশ পাহাড়, মাঝে মাঝে দুই একটা খর্বাকৃতি কণ্টকগুল্ম। এই সকল চিহ্ন ছাড়া পথিককে বহুদূরস্থ জনপদে পরিচালিত করিবার কোন নিদর্শন নাই,—অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এরূপ স্থানে দিক্‌ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক।

অশ্বারোহী দুইজন যে পথ দিয়া নামিতেছিল তাহাকে পথ বলা চলে না, বর্ষার জল চূড়া হইতে নামিবার সময় পর্বতগাত্রে যে উপলপিচ্ছিল প্রণালী রচনা করে, এ সেইরূপ একটি প্রণালী, পাহাড়ের শীর্ষ হইতে প্রায় ঋজুরেখায় পাদমূল পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে।

সওয়ার দুইজন ঘোড়ার বল্গা ছাড়িয়া দিয়া পরস্পর বাক্যালাপ করিতে করিতে চলিয়াছিল, খর্বদেহ রোমশ পাহাড়ী ঘোড়া স্বেচ্ছামত সেই ঢালু বিপজ্জনক পথে সাবধানে অবতরণ করিতেছিল। এই স্থানে পথ এত বেশি ঢালু যে একবার অশ্বের পদস্খলন হইলে আরোহীর মৃত্যু অনিবার্য; কিন্তু সেদিকে আরোহীদের দৃষ্টি নাই।

আরোহীদের মধ্যে একজন প্রাচীন বয়স্ক; মাথার চুল ও গোঁফ পাকা, বর্ণ এত বয়সেও তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়। কপালের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত শ্বেত-চন্দনের দুইটি রেখা বোধ করি জরাজনিত ললাটরেখাকে ঢাকিয়া দিয়াছে। মস্তকে শুভ্র কার্পাসবস্ত্রের উষ্ণীষ; দেহে তুলট্ আংরাখার ফাঁকে বাম স্কন্ধের উপর উপবীতের একাংশ দেখা যাইতেছে। চোখে-মুখে একটি দৃঢ় অচঞ্চল বুদ্ধির প্রভা। দেখিলেই বুঝা যায় ইনি একজন শাস্ত্রাধ্যায়ী অভিজাতবংশীয় ব্রাহ্মণ। ইঁহার হস্তে কোন অস্ত্র

নাই, কিন্তু যেরূপ স্বচ্ছন্দ নিশ্চিন্ততার সহিত অবতরণশীল অশ্বপৃষ্ঠে অটল হইয়া বসিয়া আছেন, তাহাতে মনে হয় কেবল ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করিয়াই ইনি জীবন অতিবাহিত করেন নাই।

দ্বিতীয় আরোহীটি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বয়স বোধ করি ষোল বৎসরও অতিক্রম করে নাই; দেহের বর্ণ শ্যাম, কিন্তু মুখের গঠন অতিশয় ধারালো। মৃদঙ্গ-সদৃশ মুখের মধ্যস্থলে শ্যেনচঞ্চুর মতো নাসিকা এই অল্প বয়সেই তাহার মুখে শিকারীর মতো একটা শাণিত তীব্রতা আনিয়া দিয়াছে। চক্ষু দুটি বড় বড়, চক্ষুতারকা নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ; বালকসুলভ চঞ্চলতা সত্ত্বেও দৃষ্টি অতিশয় তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী। ওষ্ঠের উপর ও চিবুকের নিম্নে ঈষন্মাত্র রোমরেখা দেখা দিয়াছে, তাহাও বর্ণের মলিনতার জন্য স্পষ্ট প্রতীয়মান নয়। ভ্রূ-যুগল সূক্ষ্ম ও দূরপ্রসারিত। সহসা এই বালকের মুখ দেখিলে একটা অপূর্ব বিভ্রম জন্মে, মনে হয় যেন একখানা তীক্ষ্ণধার বাঁকা কৃপাণ সূর্যালোকে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।

মুখ হইতে দৃষ্টি নামাইয়া দেহের প্রতি চাহিলে কিন্তু আরো চমক লাগে। মুখের মতো দেহের সৌষ্ঠব নাই, প্রস্থের তুলনায় দৈর্ঘ্যে দেহ অত্যন্ত খর্ব। প্রথমেই মনে হয়, অতিশয় বলশালী। কটি হইতে পায়ে শুঁড়তোলা নাগরা জুতা পর্যন্ত প্রাণসার অথচ ক্ষীণ, মৃগচরণের মতো যেন অতি দ্রুত দৌড়িবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে; কিন্তু কটি হইতে ঊর্ধ্বে দেহ ক্রমশঃ প্রশস্ত হইয়া বক্ষস্থল এরূপ বিশাল আয়তন ধারণ করিয়াছে যে বিস্মিত হইতে হয়। আরো অদ্ভুত তাহার দুই বাহু; আজানুলম্বিত বলিলেও যথেষ্ট হয় না, সন্দেহ হয় ঘোড়ার পিঠে বসিয়া হাত বাড়াইলে মাটি হইতে উপলখণ্ড তুলিয়া লইতে পারে। তাহার উপর যেমন সুপুষ্ট তেমনি পেশীবহুল; দুই বাহু দিয়া কাহাকেও সবলে জড়াইয়া ধরিলে তাহার পঞ্জর ভাঙিয়া যাওয়া অসম্ভব নয়।

এই বালক হাসিতে হাসিতে চতুর্দিকে চঞ্চল চক্ষে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে নামিতেছিল। ঘোড়ার রেকাব নাই, লাল রেশমের জরিমোড়া লাগামও ছাড়িয়া দিয়াছে, অথচ কম্বলের জিনের উপর এমন ভাবে বসিয়া আছে যেন সে আর ঘোড়া পৃথক নয়—কোন ক্রমেই তাহাদের বিচ্ছিন্ন করা যাইবে না। বাম হস্তে আগাগোড়া লোহার ভারি বল্লমটা এমনি অবহেলাভরে ধরিয়া আছে যেন পাগড়ির উপর খেলাচ্ছলে রোপিত শুকপুচ্ছটার চেয়েও সেটা হালকা।

ঘোড়া দুইটি পাহাড়ের পাদমূলে আসিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে আর একটা পাহাড় আরম্ভ হইয়াছে, এবার সেইটাতে চড়িতে হইবে। সূর্য পিছনের উচ্চ পাহাড়ের চূড়া স্পর্শ করিল, শীঘ্রই তাহার আড়ালে ঢাকা পড়িবে।

বালক চতুর্দিকে চাহিয়া যেন প্রাণশক্তির আতিশয্যবশতঃই উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, তারপর বলিল, "দাদো, প্রতিধ্বনি শুনবে? হোয়া হো হো হো হো! চুপ! এইবার শোনো।"

কয়েক মুহূর্ত পরেই তিন দিক হইতে ভৌতিক শব্দ ফিরিয়া আসিল—হোয়া! হো হো হো!

বালক অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া উত্তর দিকের একটা উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ দেখাইয়া বলিল, "ঐটে সব চেয়ে দূরে! আওয়াজ ফিরে আসতে কত দেরি হল দেখলে? চোখে দেখে কিন্তু বোঝা যায় না কোন্‌টা কাছে, কোন্‌টা দূরে। অন্ধকার রাত্রে পথ হারিয়ে গেলে প্রতিধ্বনি ভারি কাজে লাগে—না দাদো?"

বৃদ্ধ মৃদুহাস্যে উত্তর করিলেন, "তা লাগে; কিন্তু অন্ধকার রাত্রে এ-রকম জায়গায় পথ হারিয়ে যাবার তোমার কোন সম্ভাবনা আছে কি?"

বালক বলিল, "তা নেই। তুমি আমার চোখ বেঁধে দাও, দেখ আমি ঠিক পুণায় ফিরে যেতে পারব।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "সে আমি জানি। লেখাপড়ার দিকে তোমার একেবারে মন নেই, কেবল দিবারাত্রি পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে পেলেই ভালো থাকো। তোমার বাবা যখন আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবেন, তখন যে আমি কি কৈফিয়ৎ দেব তা জানি না।"

বালকের মুখে একটা দুষ্টামির হাসি খেলিয়া গেল, সে বৃদ্ধের দিকে আড়চোখে কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, "আচ্ছা দাদো, 'আলিফ' ভালো, না 'অ' ভালো? বাঁ দিক থেকে ডান দিকে লেখা সুবিধে, না ডান দিক থেকে বাঁ দিকে?"

বৃদ্ধ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "সে তুমি বুঝতে পারবে না। ষোল বছর বয়স হল, এখনো নিজের নাম সই করতে শিখলে না। তোমার লেখাপড়ার চেষ্টা করাই বৃথা!—কিন্তু শিকারের দিকেও তো তোমার মন নেই দেখতে পাই। আজ সারাদিন ঘুরে একটা খরগোসও মারতে পারলে না।"

বালক আক্ষেপে হস্ত উৎক্ষিপ্ত করিয়া বলিল, "খরগোস আমি মারতে পারি না, আমার ভারি মায়া হয়। ঐটুকু জানোয়ার, তার ওপর হিংসার লেশ তার শরীরে নেই—খালি প্রাণপণে পালাতে জানে।"

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কোন্ জানোয়ার মারতে চাও শুনি—বাঘ!"

উৎসাহ-প্রদীপ্ত চক্ষে কিশোর বলিল, "হ্যাঁ, বাঘ। এ পাহাড়ে বাঘ পাওয়া যায় না, দাদো?

বৃদ্ধ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, শুনেছি আরো দক্ষিণে পাহাড়ের গুহায় বাঘ আছে; কিন্তু তুমি বাঘ মারবে কি করে?"

কিশোর বলিল, "কেন, এই বল্লম দিয়ে মারব। মাটিতে সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে মারব।"

"ভয় করবে না?"

"ভয়!" বালকের উচ্চহাস্য আবার চারিদিকে প্রতিধ্বনি তুলিল। "আচ্ছা দাদো, ভয় জিনিসটা কি আমাকে বুঝিয়ে বলতে পারো? সকলের মুখেই ওই কথাটা শুনতে পাই, কিন্তু ওটা যে কি পদার্থ তা বুঝতে পারি না। ভয় কি ক্ষুধার মতো একটা প্রবৃত্তি?"

দাদো বলিলেন, "ভয় কি তা বুঝতে পারবে, যেদিন প্রথম যুদ্ধে নামবে, যেদিন হাতিয়ারবন্দ্ শত্রুকে সামনে দেখতে পাবে।"

বালক কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

দাদো বলিলেন, "আমি বড় বড় বীরের মুখে শুনেছি যে তাঁরাও প্রথমে শত্রুর সম্মুখীন হয়ে ভয় পেয়েছেন। এতে লজ্জার বিষয় কিছু নেই; সেই ভয়কে জয় করাই প্রকৃত বীরত্ব।"

সূর্য গিরিশৃঙ্গের অন্তরালে অদৃশ্য হইল, সঙ্গে সঙ্গে নিম্নভূমির উপর ছায়ার একটা সূক্ষ্ম যবনিকা পড়িয়া গেল। শুধু ঊর্ধ্বে নগ্ন গিরিকূট এবং আরো ঊর্ধ্বে নীল আকাশে একখণ্ড মেঘ সিন্দুরবর্ণ ধারণ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

দাদো নিজের অশ্ব সম্মুখে চালিত করিয়া কহিলেন, "আর দেরি নয়। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, এখনো দুটো পাহাড় পার হতে বাকি। পুণা পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে।"

বালক তাঁহার অনুগামী হইয়া বলিল, "তা হলেই বা? আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে ঠিক নিয়ে যাব।"

দাদো বলিলেন, "রাত্রে এ-সব পাহাড়-পর্বত নিরাপদ নয়। শোনোনি, এদিকের গাঁয়ে-বস্তিতে আজকাল প্রায় লুঠ-তরাজ হচ্ছে?"

বালক ভারি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "তাই নাকি? কৈ, আমি তো শুনিনি। কারা লুঠ-তরাজ করছে?"

দাদো বলিলেন, "তা কেউ জানে না। বোধ হয় এই দিকের বুনো পাহাড়ী মাওলীরা ডাকাতি করছে। বিজাপুর এলাকার তিনটে বড় বড় গ্রাম গত চার মাসের মধ্যে লুঠ হয়ে গেছে। শুনতে পাই তাদের সর্দার একজন ছোকরা, লোহার সাঁজোয়া আর মুখোস পরে ঘোড়ায় চড়ে লুঠেরাগুলোকে ডাকাতি করতে নিয়ে যায়। ছোঁড়াটা নাকি ভয়ংকর কালো, বেঁটে আর জোয়ান।"

বালক তাহার হাতের বল্লমটা খেলাচ্ছলে ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাচ্ছিল্যভরে জিজ্ঞাসা করিল, "তাই নাকি? তুমি এত কথা কোথা থেকে জানলে, দাদো?"

দাদো পাহাড়ে ঘোড়া চড়াইতে চড়াইতে বলিলেন, "ও অঞ্চলের দেশমুখরা দরবারে নালিশ করতে এসেছিল। তাদের বিশ্বাস ডাকাতের সর্দার পুণার লোক।"

দাদোর পশ্চাতে বালকও পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা দরবার থেকে কি ব্যবস্থা করলে?"

দাদো বলিলেন, "কিছু করা হয়নি। দেশমুখদের তোমার বাবার কাছে বিজাপুরে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

বালক পশ্চাতে থাকিয়া মিটিমিটি হাসিতেছিল, দাদো তাহা দেখিতে পাইলেন না। কিছুক্ষণ কোন কথা হইল না।

পাহাড়ের পিঠের উপর উঠিয়া দুইজনে ক্ষণকাল পাশাপাশি দাঁড়াইলেন। এখানে আবার সূর্যকিরণ আসিয়া বালকের বল্লমের ফলায় যেন আগুন ধরাইয়া দিল।

সম্মুখের পাহাড়তলিতে তখন ঘোর-ঘোর হইয়া আসিয়াছে, নিচের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বালক বলিল, "আচ্ছা দাদো, এখন যদি আমাদের ডাকাতে আক্রমণ করে, তুমি কি করো?"

দাদো ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে একবার চতুর্দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি আর করি! তাদের সঙ্গে লড়াই করি।"

"তারা যদি পঞ্চাশজন হয়?"

"তা হলেও লড়ি।"

বালক বলিল, "কিন্তু সে যে ভারি বোকামি হবে, দাদো। পঞ্চাশজনের সঙ্গে লড়াই করে তুমি পারবে কেন?"

দাদো বলিলেন, "তাতে কি! না হয় লড়াই করতে করতে মরব।"

বালক বিস্মিত হইয়া বলিল, "কিন্তু এরকম মরে লাভ কি, দাদো?" তারপর মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি কিন্তু লড়ি না, তীরের মতো এই ধার বেয়ে পালাই। এত জোরে পালাই যে ডাকাতের বর্শা আমাকে ছুঁতেও পারবে না।"

ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে দাদো বলিলেন, "ক্ষত্রিয়ের ছেলে তুমি, দুশমনের সামনে থেকে পালাবে? এই না বলছিলে, ভয় কাকে বলে জানো না?"

বালক বলিল, "ভয়! পালানোর সঙ্গে ভয়ের সম্পর্ক কি? পালাব, কারণ পালালেই আমার সুবিধে হবে, পরে ডাকাতদের জব্দ করতে পারব। আর লড়ে যদি মরেই যাই, তাহলে তো ডাকাতদের জিত হল।"

দাদো মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না না, এসব শিক্ষা তুমি কোথা থেকে পাচ্ছ? না লড়ে পালিয়ে যাওয়া ভয়ংকর কাপুরুষতা। যে বীর, সে কখনো পালায় না। রাজপুত বীরদের গল্প শোনোনি?"

বালক বলিল, "রাজপুতদের গল্প শুনলে আমার গা জ্বালা করে। তারা শুধু

লড়াই করতে পারে, বুদ্ধি এতটুকু নেই। যিনি যতবড় বীর, তিনি ততবড় বোকা।"

দাদো খোঁচা দিয়া বলিলেন, "তুমিও তো রাজপুত! মায়ের দিকে থেকে তোমার গায়েও তো যদুবংশের রক্ত আছে।"

বালক সবেগে শিরঃসঞ্চালন করিয়া বলিল, "না, আমি রাজপুত হতে চাই না, আমি মারাঠী।" বালকের ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "আচ্ছা দাদো, তোমার কাছে তো বড় বড় যুদ্ধের গল্প শুনেছি, কিন্তু একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারি না। সম্মুখ-যুদ্ধ করার মানে কি?"

দাদো সহসা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। শেষে বলিলেন, "সম্মুখ-যুদ্ধ মানে সামনা-সামনি শক্তি পরীক্ষা। যার শক্তি বেশি সেই জিতবে।"

"আর যার শক্তি কম, সে যদি চালাকি করে জিতে যায়?"

"সে তো আর ধর্মযুদ্ধ হল না।"

"নাই বা হল! যুদ্ধে হার-জিতই তো আসল—ধর্মযুদ্ধ হল কি না তা দেখে লাভ কি?"

দাদো অনেকক্ষণ বালকের জিজ্ঞাসু মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, শেষে দুঃখিতভাবে ঘাড় নাড়িয়া বিড় বিড় করিয়া বলিলেন, "বাপের স্বভাব ষোল আনা পেয়েছে, তেমনি ধূর্ত আর হুঁশিয়ার—সর্বদাই লাভ-লোকসানের দিকে নজর। আর শুধু বাপ কেন, বংশটাই ধূর্ত! মালোজী ভোঁস্‌লে যদি চালাকি করে যদুবংশের মেয়ে ঘরে না আনতে পারত, তাহলে ভোঁস্‌লে বংশকে চিনত কে? আর শাহুই বা এতবড় জায়গীরদার হত কোথা থেকে?"

পলকের মধ্যে বালকের সংশয়প্রশ্নপূর্ণ মুখভাবের পরিবর্তন হইল। বালকোচিত কৌতূহলে দাদোর নিকটে সরিয়া গিয়া সানুনয়কণ্ঠে বলিল, "দাদো, তুমি যে আমার মা'র বিয়ের গল্প বলবে বলেছিলে, কৈ বললে না? বলো না দাদো, কি করে ঠাকুর্দা যদুবংশী মেয়ে ঘরে আনলেন।"

এই সময় নিম্নের ছায়াচ্ছন্ন প্রদোষান্ধকার হইতে গাভীর হাম্বারব ভাসিয়া আসিল। বালক সচকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ঐ শোনো, দেওরামের গরু ঘরে ফিরে এলো। চলো, চলো দাদো, আর দেরি নয়; সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে ভারি ক্ষিদে পেয়ে গেছে—এতক্ষণ তা লক্ষ্যই করিনি। দেওরামের মেয়ে নুন্নার সঙ্গে সেই যে সকালবেলা তেঁতুলবনের ধারে দেখা হয়েছিল, সে বলেছিল ফেরবার সময় তাজা দুধ খাওয়াবে। জয় ভবানী!"

বালক দুই পা দিয়া ঘোড়ার পেট চাপিয়া ধরিতেই ঘোড়া লাফাইয়া সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইল। আঁকিয়া বাঁকিয়া পার্বত্য হরিণের মতো পাথর হইতে পাথরের উপর ধাপে ধাপে লাফাইয়া পড়িয়া বিদ্যুদ্বেগে নিচের দিকে অদৃশ্য হইল।

দাদো বালকের উচ্চ কণ্ঠস্বর দূর হইতে শুনিতে পাইলেন, "চলে এসো দাদো, দেওরামের ঘর ঝর্ণাতলার টালের উত্তর দিকে কুলগাছের জঙ্গলের মধ্যে; যদি খুঁজে না পাও, হাঁক দিও—নুন্না এসে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।"

বৃদ্ধ পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া বদরীবনের মধ্যে যখন দেওরামের কুটীর অঙ্গনে পৌঁছিলেন, তখন দেখিলেন একটি বারো-তেরো বছরের মাওলী চাষার মেয়ে একটা ক্ষুদ্রকায় গাভীকে দোহনের চেষ্টা করিতেছে এবং বালক ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া সকৌতুকে সেই দৃশ্য দেখিতেছে। গাভীটা বোধ হয় অপরিচিত ব্যক্তি ও ঘোড়া দেখিয়া ভয় পাইয়াছে, তাই কিছুতেই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া দুগ্ধ দোহন করিতে দিতেছে না, চেষ্টা করিবামাত্র সরিয়া সরিয়া যাইতেছে।

মেয়েটি বিব্রত হইয়া বলিল, "তুমি ওর শিং দুটো একবার ধরো না, নইলে বজ্জাত

গরু কিছুতেই দুইতে দেবে না।"

বালক গরুর শিং ধরিবার কোন চেষ্টা না করিয়া তামাসা করিয়া বলিল, "তুই কেমন মাওলার মেয়ে—গাই দুইতে জানিস না? দাঁড়া, বিশুয়াকে বলে দেব, সে আর তোকে বিয়ে করবে না।"

ক্ষুব্ধ লজ্জায় নুন্না এতটুকু হইয়া গিয়া বলিল, "তোমার ঘোড়া দেখেই তো আজ ও অমন করছে, নইলে আমিই তো রোজ দুই।"

বালক মুরুব্বিয়ানা দেখাইয়া বলিল, "হ্যাঁ, দুই! আর বড়াই করতে হবে না। দে আমায় ঘটি, আমি দুয়ে দিচ্ছি।"

নুন্না বলিল, "তুমি পারবে না। আমি আর বাবা ছাড়া কেউ ওকে দুইতে পারে না। তোমাকে ও এখনি ফেলে দেবে।"

বালকের আত্মাভিমানে ভীষণ আঘাত লাগিল, সে তর্জন করিয়া বলিল, "কি! ফেলে দেবে! দেখি তো কেমন তোর গরু? দে ঘটি।"

নুন্নার হাত হইতে জোর করিয়া ঘটি কাড়িয়া লইয়া বালক দুগ্ধ দোহন করিতে বসিল। গরুটা ঘাড় বাঁকাইয়া একবার দোহনকারীকে দেখিয়া লইয়া চক্রাকারে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বালকও ছাড়িবার পাত্র নয়, ঘটি লইয়া মুখে নানাপ্রকার প্রীতি-সূচক শব্দ করিতে করিতে তাহার পশ্চাতে ঘুরিতে লাগিল। অবশেষে কি মনে করিয়া গাভীটা দাঁড়াইয়া পড়িল। তখন বালক সন্তর্পণে তাহার দেহে হাত বুলাইয়া দিয়া গাভীর পশ্চাদ্দিকে বসিয়া দুই জানুর মধ্যে ভাণ্ডটি ধরিয়া যেমন গাভীর উধসের দিকে হাত বাড়াইয়াছে, অমনি গাভী এক চরণ তুলিয়া তাহাকে এরূপ সবেগে পদাঘাত করিল যে বালক ভাণ্ডসমেত চিৎ হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

নুন্না কলকণ্ঠে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। গাভীটা যেন কর্তব্যকর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রোমন্থন করিতে লাগিল।

বৃদ্ধ দাদো অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া বালকের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "লেগেছে নাকি?"

বালক অঙ্গের ধুলো ঝাড়িতে ঝাড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "গরু নয়—ঘোড়া। গরু কখনো অমন চাট ছোঁড়ে? নে নুন্না, তোর ঘটি, আমি ঘোড়ার দুধ খেতে চাই না। বাড়ি চললুম।"

বালক অশ্বপৃষ্ঠে উঠিতে যায় দেখিয়া নুন্না মিনতি করিয়া বলিল, "আর একটু দাঁড়াও না, বাবা এলো বলে। বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে বলছিলে—ঘরে বাজরার রুটি আছে, এনে দেব?"

বালক বলিল, "না, তোর রুটি-দুধ—কিছু খেতে চাই না। আমি চললুম।"

এমন সময় কুটীরের পশ্চাতের ঘন ঝোপের ভিতর হইতে দুইটি লোক বাহির হইয়া আসিল। একজন খর্বকায় বৃষস্কন্ধ মধ্যবয়স্ক লোক, অপরটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের দৃঢ়শরীর যুবা। হাতের বল্লম কুটীরের গায়ে হেলাইয়া রাখিয়া মধ্যবয়সী লোকটি দ্রুতপদে আসিয়া বালকের ঘোড়ার রাশ ধরিল। বালক তখন ঘোড়ার উপর চড়িয়া বসিয়াছে, লোকটি সানুনয় নিম্নকণ্ঠে বলিল, "রাজা, ঘোড়া থেকে ন্যামো, দুধ না খেয়ে যেতে পাবে না।"

যুবকটিও এতক্ষণে সসম্ভ্রম হাস্যোদ্ভাসিত মুখে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বালক একলম্ফে ঘোড়া হইতে নামিয়া দৌড়িয়া গিয়া নুন্নার চুলের মুঠি ধরিল, তাহাকে চুল ধরিয়া টানিতে টানিতে যুবকের সম্মুখে লইয়া গিয়া প্রায় তাহার বুকের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এই নে বিশুয়া, এটাকে তুই ঘরে নিয়ে যা, তোর সঙ্গে ওর

বিয়ে দিলুম। যদি বজ্জাতি করে, খুব পিটবি। আর ওই হতভাগা গরুটাকেও তুই নিয়ে যা, ওটা হল তোর বিয়ের যৌতুক।"

নন্না বালকের হাত ছাড়াইয়া কুটীরের ভিতর পলাইয়া গেল। বিশুয়া হাসিতে হাসিতে হেঁট হইয়া বালকের পদস্পর্শ করিয়া বলিল, "তুমি যখন দিলে রাজা, তখন আর আমার ভাবনা কি! এবার ঘোড়ার পিঠে তুলে ওকে ঘরে নিয়ে যাব। কি বলো, দেওরাম?"

দেওরাম গম্ভীরভাবে একটু হাসিয়া বলিল, "তা যাস্। রাজা যখন তোর হাতে নন্নাকে দিয়েই দিয়েছে, তখন আর আমি কি বলব? আর, আমি নন্নার মন জানি, সেও তোকেই বিয়ে করতে চায়।"

এই সময় নন্নার হাসিমুখ কুটীরের ভিতর হইতে পলকের জন্য দেখা গেল। সে সশব্দে কুটীর-দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

দেওরাম ভূপতিত ঘটিটা তুলিয়া লইয়া দুগ্ধ-দোহনে প্রবৃত্ত হইল। গাভীটা এবার আর কোন আপত্তি করিল না।

বৃদ্ধ দাদো এতক্ষণ অদূরে দাঁড়াইয়া ইহাদের কথাবার্তা শুনিতেছিলেন। তাহার মুখে সংশয় ও সন্দেহের ছায়া ঘনীভূত হইতেছিল। এই নির্জন বনের মধ্যে একটিমাত্র কুটীর, তাহার অধিবাসী এই ভীমকায় দেওরাম। ইহারা কে এবং বালকের সহিত ইহাদের পরিচয় হইল কিরূপে?

তিনি অগ্রসর হইয়া বিশুয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এঁকে চিনলে কি করে?"

নিমেষের জন্য বিশুয়া ও বালকের চোখে চোখে একটা ইঙ্গিত খেলিয়া গেল। বিশুয়ার মুখ ভাবলেশহীন হইয়া গেল, সে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "দরবারে ওঁকে দেখেছি, উনি জাগীরদারের ছেলে।"

বৃদ্ধ সন্দিগ্ধভাবে পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, "তোমরা ওঁকে রাজা বলে ডাকছ কেন?"

বিশুয়া কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইল না, দুগ্ধদোহন করিতে করিতে দেওরাম জবাব দিল, "জাগীরদারের ছেলে, উনিই একদিন মালিক হবেন, তাই রাজা বলে ডাকি।"

দাদো উত্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না, বলিলেন, "ইনি জায়গীদারের মেজো ছেলে তাও জানো না? সে যাক্—" বালকের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু তুমি এদের চিনলে কি করে জিজ্ঞাসা করি?"

বালক অত্যন্ত সরলভাবে উত্তর করিল, "শিকার করতে এসে এদের সঙ্গে ভাব হয়েছে, দাদো। তুমি তো আর প্রত্যেকবার আমার সঙ্গে আসো না, তাই জানো না। কতবার শিকার করে ফেরবার মুখে দেওরামের জোয়ারী রুটি খেয়েছি—দেওরাম আমাকে ভারি যত্ন করে।"

দাদো বালকের ছলনাহীন মুখের দিকে কিয়ৎকাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া শুধু কহিলেন, "হুঁ।" মনে মনে ভাবিলেন,—তোমার গতিবিধির উপর এখন হইতে একটু বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ব্যাপার ঠিক বুঝা যাইতেছে না।

ধারোষ্ণ দুগ্ধের পাত্র আনিয়া দেওরাম বালকের হাতে দিল। বালক জিজ্ঞাসা করিল, "দাদো, তুমি খাবে না?"

দাদো কহিলেন, "না, তুমি খাও। আমার এখনো আহ্নিক বাকি।"

দুগ্ধপাত্র দুই হস্তে ধরিয়া বালক অদূরে একটি শিলাখণ্ডের উপর গিয়া বসিল। দেওরামও তাহার অনুবর্তী হইয়া পাশে গিয়া দাঁড়াইল। এক চুমুক দুগ্ধ পান করিয়া

বালক অন্যমনস্কভাবে আকাশের দিকে তাকাইয়া নিম্নস্বরে বলিল, "পরশু অমাবস্যা।"

দেওরামও অলসভাবে ঊর্ধ্বে দৃষ্টি করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "হ্যাঁ। লোক সব তৈরি আছে। কোথায় থাকতে হবে?"

"রাক্ষসমুখো গুহার মধ্যে। আমি দেড় পহর রাত্রে আসব। পঁচিশ জনের বেশি লোক যেন না হয়।"

"বেশ। এবার কোন্ দিকে যাওয়া হবে?"

"উত্তর দিকে। দক্ষিণে আর নয়, সেদিকে বড় হৈ চৈ হয়েছে। দরবার পর্যন্ত খবর গেছে।"

দাদো তাহাদের দিকে লক্ষ্য করিতেছেন দেখিয়া দেওরাম প্রকাণ্ড একটা হাই তুলিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা। হরিণ কিন্তু এদিকে পাওয়া যায় না।"

বালক বাকি দুগ্ধটুকু নিঃশেষে পান করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহজভাবে বলিল, "আজ তাহলে চললুম, দেওরাম। নুন্নার বিয়ের দিন আমাকে খবর দিও—আমি দাদোকে নিয়ে আসব। দাদো একজন ভারি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত জানো তো? উনিই নুন্নার বিয়ে দেবেন।"

ঘোড়ার পিঠে একলাফে উঠিয়া বালক বলিল, "আর যদি হরিণছানা পাও, পুণায় নিয়ে যেও। আর দেরি করব না, রাত হয়ে এলো। দাদোর আবার ভারি ডাকাতের ভয়!"

বিশুয়া ও দেওরাম দাঁড়াইয়া রহিল, অশ্বারোহী দুইজনে বদরীকানন পার হইয়া ঝর্ণার সঞ্চিত অগভীর ক্ষুদ্র জলাশয়ের পাশ দিয়া আবার পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিল। এইটি শেষ পাহাড়—ইহার পরই উপত্যকা। কিছুক্ষণ কোন কথা হইল না, দুইজনেই স্ব স্ব চিন্তায় মগ্ন। এদিকে অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিতেছে। ঘোড়া দু'টি সতর্কভাবে পর্বতগাত্র আরোহণ করিতেছে।

হঠাৎ চমক ভাঙিয়া বালক দাদোর দিকে দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল দাদো তাহারই মুখের প্রতি সন্দেহাকুল চক্ষে চাহিয়া আছেন। বালক অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, তারপর জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, "কি দেখছো, দাদো? এবার আমার মা'র বিয়ের গল্প বলো।"

বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, আপনার মনে বলিলেন, "বংশের ধারা বদলানো যায় না; বাঘের বাচ্চা বাঘই হয়, শৃগাল হয় না—ঈশ্বরের এই বিধান। কে জানে, হয়তো এর মধ্যে মঙ্গলেরই বীজ নিহিত আছে।"

বালক তাঁহাকে দীর্ঘকাল চিন্তা করিবার অবকাশ না দিয়া পুনশ্চ কহিল, "বলো না দাদো?"

দাদো আবার একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "গল্প অতি সামান্যই। কিন্তু তোমার ঠাকুর্দা মালোজী ভোঁস্‌লে যে কি রকম চতুর ছিলেন, এই গল্প থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

"তোমার মাতুলবংশের মতো এতবড় বিখ্যাত যশস্বী বংশ দাক্ষিণাত্যে খুব অল্পই আছে। আজ থেকে নয়, চারশো বছর আগে আলাউদ্দিন খিলিজির আমল থেকে দেবগিরির যদুবংশের নাম দাক্ষিণাত্যের পাথরে পাথরে তলোয়ার দিয়ে খোদাই হয়ে আসছে।

"অতীতের কোন্ যুগে এই যদুবংশ রাজপুতানা থেকে এসে দেওগিরিতে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে কাহিনী লুপ্ত হয়ে গেছে। দেওগিরির রাজ্যও আর নেই; কিন্তু বীরত্বে, ধর্মনিষ্ঠায়, মহানুভবতায় এই বংশ আজ পর্যন্ত হিন্দুমাত্রেরই আদর্শ হয়ে আছে।

"এ-হেন বংশে তোমার দাদামশায় লখুজী যদুরাও একজন পরাক্রমশালী মহা-তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। দশ হাজার সিপাহী নিত্য তাঁর রুটি খেত। বিজাপুর-গোলকুণ্ডা তাঁকে যমের মতো ভয় করত, আমেদনগর রাজ্যের তিনি ছিলেন প্রধান স্তম্ভ। মালিক অম্বর যদি তাঁর সঙ্গে কপটচারিতা না করত—কিন্তু সে অন্য কথা। এখন আসল গল্পটা বলি।

"সে আজ বহুদিনের ঘটনা, তখন আমার বয়স দশ-এগারো বছরের বেশি নয়; কিন্তু সেদিনকার প্রত্যেক ঘটনাটি স্পষ্ট মনে আছে। সেদিন ছিল ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী, রাজপুতদের একটা মস্ত উৎসবের দিন। দাক্ষিণাত্যে দোলপূর্ণিমার দিন আবীর খেলার প্রথা এই যদুবংশই প্রচার করেছিলেন। সেদিন দেশের সমস্ত গণ্যমান্য লোক, এমন কি বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আমেদনগর দরবারের বড় বড় হিন্দু আমীর-ওমরা এসে লখুজীর কেল্লার মতো বিশাল ইমারতে জমা হতেন। সমস্ত রাত্রিদিনব্যাপী উৎসব চলত, ফাগ, রং এবং সুরার স্রোত বয়ে যেত।

"সেবার লখুজীর প্রকাণ্ড প্রাসাদের দরবার-ঘরে মজলিস বসেছে। মেঝের ওপর পাশী গালিচা পাতা, তার ওপর অনেকে বসেছেন; দরবার লোকে লোকারণ্য। সিপাহী থেকে সর্দার পর্যন্ত সকলের অবাধ যাতায়াত। সামান্য সৈনিক পাঁচহাজারী সর্দারের মুখে আবীর মাখিয়ে দিচ্ছে, মন্‌সবদার সিপাহীকে মাটিতে ফেলে তার মুখে মদ ঢেলে দিচ্ছে। হাসির হর্‌রা ছুটছে। ছোট বড়, উচ্চ নীচ কোনো প্রভেদ নেই, এই একদিনের জন্যে সকলে সমান। সবাই আমোদে মত্ত।

"সভার মাঝখানে মস্তবড় একটা চাঁদির থালায় আবীর স্তূপীকৃত রয়েছে, সেই থালা ঘিরে প্রধান প্রধান অতিথিরা বসেছেন। পানদান, গুলাবপাশ, আতরদান চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে। স্বয়ং লখুজী এখানে আসীন; তোমার ঠাকুর্দা মালোজীও আছেন। মালোজী তখন লখুজীর অনুগৃহীত একজন সামান্য সর্দার মাত্র; কিন্তু তার বুদ্ধি ও রণনৈপুণ্যের জন্যে লখুজী তাঁকে ভারি স্নেহ করতেন। তাই মালোজীও সাহস করে এই সভায় এসে বসেছেন। সকলের মুখেই আবীরের প্রলেপ, দেহের বস্ত্র এবং মিরজাই রঙে রক্তবর্ণ, চক্ষু ঢুলুঢুলু। এখানে গানের মজলিস বসেছে; আরো অনেক লোক চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে গান শুনছে এবং মজা দেখছে।

"গান গাইছেন আমেদনগরের একজন বুড়ো ওমরা—তাঁর নাম ভুলে গেছি। মস্ত ওস্তাদ বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। গড়গড়া টানতে টানতে হঠাৎ তিনি বসন্তরাগের এক তান মারলেন—সুরের ধমকে পাকা গোঁফ থেকে একরাশ আবীর উড়ে গেল। তোমার ঠাকুর্দা মালোজী সারঙ্গী কোলে করে ওস্তাদের পিছনে বসে ছিলেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে সংগত আরম্ভ করলেন। লখুজী নিজে মৃদঙ্গ বাজাতে লাগলেন।

"গান থামলে প্রশংসাধ্বনির একটা ঝড় বয়ে গেল, লখুজী পাখোয়াজ ফেলে প্রায় এক তোলা অম্বুরী আতর পলিতকেশ গায়কের গোঁফে মাখিয়ে দিয়ে দাড়ি ধরে নেড়ে দিয়ে বললেন, 'কৎল্ কিয়া বিবি! আর একঠো ফর্মাও!'

"বৃদ্ধ দন্তহীন হাসি হেসে চোখ ঠেরে আবার গান ধরলেন, 'চোলিমে ছিপাউ কৈসে যোবনা মোরি'।

"বিরাট হাসির একটা হল্লা পড়ে গেল। লখুজী ওস্তাদকে কোলে তুলে নিয়ে নৃত্য শুরু করে দিলেন।—কি আনন্দের দিনই গিয়েছে; এখন সব স্বপ্ন বলে মনে হয়।"

দাদো একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

ঘোড়া দুইটি ইতিমধ্যে পর্বত পার হইয়া উপত্যকায় নামিয়া আসিয়াছে, কিন্তু পথ এখনো শিলা-সংকুল। আশে-পাশে মাটি ফাটিয়া বড় বড় খাদ রচনা করিয়াছে।

শুষ্ক পয়ঃপ্রণালীর মতো এই খাদগুলি অন্ধকারে বড়ই বিপজ্জনক, ঘোড়া একবার পা ফস্কাইয়া উহার মধ্যে পড়িলে কোথায় অন্তর্হিত হইবে তাহার স্থিরতা নাই। এদিকে দিবার দীপ্তিও সম্পূর্ণ নিবিয়া গিয়াছে, কেবল সম্মুখে বহুদূরে পুণার দীপগুলি মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে।

বালক একাগ্রমনে গল্প শুনিতেছিল, দাদো থামিতেই সাগ্রহে গলা বাড়াইয়া বলিল, "তার পর?"

দাদো বলিলেন, "হুঁশিয়ার হয়ে পথ চলো, রাস্তা বড় খারাপ।" তারপর গল্প আরম্ভ করিলেন, "দু'টি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে এই দরবার ঘরের চারিদিকে খেলা করে বেড়াচ্ছিল, দু'জনেরই লাল বেনারসী চেলির জোড় পরা, কানে কুণ্ডল, হাতে বালা, গলায় হার। ছেলেটির বয়স পাঁচ বছর, আর মেয়েটির তিন।

"এদের দিকে কারো দৃষ্টি ছিল না, এরা নিজের মনে ঘরময় খেলে বেড়াচ্ছিল। কখন এক সময় মেয়েটি দূর থেকে ছেলেটিকে দেখতে পেয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল, গম্ভীর মুখে ছেলেটির আপাদমস্তক দেখে নিয়ে আধ আধ ভাষায় প্রশ্ন করলে, 'তুমি কে?'

"ছেলেটিও মেয়েটির দিকে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে বললে, 'আমি শাহু। আমি তীর ছুঁড়তে পারি। তুমি কে?'

"মেয়েটির দুই চক্ষু সম্ভ্রমে ভরে উঠল, সে ফুলের মতো ঠোঁট দুটি খুলে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে বললে, 'আমি দিদা।' তারপর একটু ভেবে আবার বললে, 'আমার বাবাও তীর ছুঁড়তে পারে।'

"অতঃপর এই বীর এবং বীরকন্যার মধ্যে ভাব হতে বেশি দেরি হল না। শাহু গিয়ে মেয়েটির গলা জড়িয়ে নিলে, মেয়েটিও শাহুর কোমর জড়িয়ে ধরলে। এইভাবে তারা অনেকক্ষণ দরবার-ঘরের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তাদের মধ্যে চুপিচুপি কি কথা হল তারাই জানে। খুব সম্ভব শাহু তার অসামান্য শৌর্য-বীর্যের কথা খুব ফলাও করে ব্যাখ্যা করে মেয়েটির ছোট্ট প্রাণটুকু জয় করে নিচ্ছিল। আর মেয়েটিও বোধ হয় নিঃসংশয় সহানুভূতি এবং প্রশংসা দ্বারা শাহুর বীর-হৃদয় সম্পূর্ণ বশীভূত করে ফেলছিল।

"এদিকে গানের মজলিশ তখন ঢিলে হয়ে এসেছে; বৃদ্ধ গায়ক তিন পাত্র গুলাবি সরবত খেয়ে কিংখাপের তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে হাঁপাচ্ছেন,—এমন সময় এই দুটি ছেলে-মেয়ে গলা-জড়াজড়ি করে তাদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। এতগুলো লোক চারি-পাশে বসে আছে, কিন্তু সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই, নিজেদের কথাতেই তারা মশগুল। বৈঠকে যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের সকলের মুগ্ধ দৃষ্টি একসঙ্গে তাদের ওপর গিয়ে পড়ল। এ কি অপূর্ব আবির্ভাব! আজ দোলের দিনে সত্যিই কি বৃন্দাবন-লীলা তাঁদের চোখের সামনে অভিনীত হচ্ছে? সকলে চোখ মুছে দেখলেন,—তাই তো! ছেলেটির বর্ণ নবজলধরশ্যাম, আর মেয়েটি বিদ্যুল্লতার মতো গৌরী!

"মেয়েটির হঠাৎ কি খেয়াল হল, সে আতরদানে তার ছোট্ট চাঁপার কলির মতো আঙুল ডুবিয়ে শাহুর নাকের নিচে আঙুলটি বুলিয়ে দিলে। শাহুও আদর-আপ্যায়নে কম যাবার পাত্র নয়, সে চাঁদির থালা থেকে এক মুঠি আবীর তুলে নিয়ে সযত্নে মেয়েটির মুখে কপালে মাখিয়ে দিলে।

"সকলে আনন্দে জয়ধ্বনি করে উঠলেন, 'রাধা-গোবিন্দজী কি জয়!'

"লখুজী আর মালোজী ছাড়া আর কেউ জানতেন না এ ছেলে-মেয়ে দু'টি কে। লখুজী উচ্চহাস্য করে উঠলেন, তারপর দু'টিকে কাছে টেনে নিয়ে নিজের কোলে

বসিয়ে বললেন, 'রাধা-গোবিন্দজী নয়, এরা আমার মেয়ে আর মালোজীর ছেলে। বন্ধুগণ, এ দু'টির বিয়ে হলে কেমন মানায় বলুন তো?'

"লখুজী পরিহাসচ্ছলেই কথাটা বলেছিলেন, তা ছাড়া গুলাবি সরবতের নেশাও অল্পবিস্তর ছিল। তাঁর কথা শুনে সকলে হেসে উঠলেন, কিন্তু মালোজী ভোঁস্‌লে তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে করজোড়ে সকলকে বললেন,—'মহাশয়গণ, আপনারা সাক্ষী থাকুন, লখুজী তাঁর কন্যাকে আমার পুত্রের সঙ্গে বাগ্‌দত্তা করলেন।'

"সকলে অবাক হয়ে রইলেন, লখুজীর নেশা ছুটে গেল। তাঁর মুখ আবীর-প্রলেপের ভিতর থেকে ক্রোধে কালো হয়ে উঠল। তাঁর মেয়েকে—দেবগিরির রাজবংশের মেয়েকে যে মালোজীর মতো একজন সামান্য প্রাণী নিজের পুত্রবধূ করবার স্পর্ধা করতে পারে, এ তাঁর কল্পনারও অতীত; কিন্তু তবু কথাটা যে তাঁর মুখ থেকেই বেরিয়ে গেছে এ কথাও অস্বীকার করা চলে না। মালোজীর দিকে কট্‌মট্‌ করে চেয়ে লখুজী বললেন, 'মালোজী, তুমি পাগলের মতো কথা বলছ। আমার মেয়ে রাজার ঘরে পড়বে।'

"মালোজী পূর্ববৎ জোড়করে বললেন, 'আমার ছেলে আপনার মেয়ের মুখে আবীর দিয়েছে, আপনার মেয়ে আমার ছেলের মুখে আতর দিয়েছে, তারপর আপনি তাদের কোলে নিয়ে যা বলেছেন তা উপস্থিত সকলেই শুনেছেন। ধর্মতঃ, আপনার মেয়ে আমার ছেলের বাগ্‌দত্তা। এখন যদি আপনি সে কথা প্রত্যাহার করতে চান, করুন, আমার আপত্তি নেই।'

"ক্রোধে লখুজী আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন, কিন্তু মুখ দিয়ে তাঁর কথা বেরুল না। একবার সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, কিন্তু তাঁদের মনোভাব বুঝতেও বিলম্ব হল না; সকলেই নীরবে মালোজীর কথার সমর্থন করছেন। লখুজী নিজের মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে ঝড়ের মতো অন্তঃপুরে চলে গেলেন।

"মালোজীও ছেলে নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন। চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে লখুজীর মেয়ে প্রকাশ্য দরবারে মালোজীর ছেলের বাগ্‌দত্তা হয়েছে। কথাটা অবশ্য বেশি দিন চাপা থাকত না, প্রকাশ হয়ে পড়তই; কিন্তু এমনি তোমার ঠাকুর্দার উদ্যম আর তৎপরতা যে সপ্তাহ মধ্যে মহারাষ্ট্রের সর্বত্র এই সুসংবাদ প্রচার হয়ে পড়ল, জনপ্রাণীরও জানতে বাকি রইল না।

"লখুজী নিষ্ফল ক্রোধে ফুলতে লাগলেন। মালোজীর সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়ে গেল, এমন কি মুখ-দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, মালোজীর মতো ধড়িবাজ অকৃতজ্ঞ লোককে আর তিনি কোন সাহায্য করবেন না, বরং তার যাতে অনিষ্ট হয় সেই চেষ্টাই করবেন।

"তাঁর প্রতিজ্ঞা কিন্তু রইল না। যতই বছরের পর বছর কেটে যেতে লাগল, ততই তিনি বুঝতে পারলেন চতুর মালোজী তাঁকে কি বিষম ফাঁদে ফেলেছে। তিনি বুঝলেন অন্যত্র মেয়ের বিয়ে দিলে মেয়ে সুখী হবে না, যত তার বয়স বাড়ছে শাহু ছাড়া আর কেউ যে তার স্বামী হতে পারে না, এ ধারণা তার মনে ততই দৃঢ় হচ্ছে। তাছাড়া অন্যের বাগ্‌দত্তা মেয়ে কেউ জেনে শুনে বিয়ে করতে চায় না, দু'চারটে ঘরানা ঘরে সম্বন্ধ করতে গিয়ে লজ্জা পেয়ে লখুজীকে ফিরে আসতে হল। শেষ পর্যন্ত তিনি দেখলেন শাহু ছাড়া জিজার গতি নেই।

"এইভাবে ন'-দশ বছর কেটে গেছে। মালোজী কপালের জোরে এবং বুদ্ধিবলে খুব উন্নতি করেছেন, বিষয়-সম্পত্তিও হয়েছে। লখুজীর বিদ্বেষ ও অনিচ্ছা ক্রমেই কমে আসতে লাগল। তারপর একদিন মালোজীকে নিজের বাড়িতে ডেকে পাঠিয়ে তাকে আলিঙ্গন করে বললেন, 'ভাই, আমারই ভুল; জিজাকে তুমি তোমার ছেলের জন্যে

নিয়ে যাও।'

"ব্যাস্, আর কি! এইখানেই গল্প শেষ। মালোজীর মতলব সিদ্ধ হল, মহা ধুমধাম করে তোমার বাপের সঙ্গে তোমার মায়ের বিয়ে হয়ে গেল। তখন তোমার মা'র বয়স তেরো বৎসর, আর শাহুর পনেরো। বিয়ের রাত্রে তোমার মা'র গর্বোজ্জ্বল হাসিভরা মুখ আমার আজও মনে আছে।

"তবে একথা ঠিক যে জন্মান্তরের সম্বন্ধ না হলে এত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে, এতবড় সামাজিক পার্থক্য লঙ্ঘন করে এ বিয়ে কখনই হতে পারত না। তোমার মা-বাবা পূর্বজন্মেও স্বামী-স্ত্রী ছিলেন।"

বৃদ্ধ দাদো মৌন হইলেন। কিছুক্ষণ কোন কথা হইল না, দুইজনে নীরবে চলিলেন। অন্ধকার তখন বেশ গাঢ় হইয়াছে, পাশের লোকও স্পষ্ট দেখা যায় না। দাদো লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, বালক দুই কর যুক্ত করিয়া ললাটে ঠেকাইয়া বারংবার কাহার উদ্দেশ্যে নমস্কার করিতেছে। দাদো কথা কহিলেন না, অপূর্ব আবেগভরে তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

কিয়ৎকাল পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অর্ধস্ফুটস্বরে বালক বলিল, "কি সুন্দর গল্প! আমার মা'র মতো এমন মা পৃথিবীর আর কারো নেই—না দাদো?"

দাদো সংযতকণ্ঠে বলিলেন, "না। তোমার মায়ের মতো এমন অসামান্যা নারী আর কোথাও নেই। সেই তিন বছর বয়স থেকে আজ পর্যন্ত দেখে আসছি, এমনটি আর দেখিনি।"

পূর্ণ হৃদয় লইয়া দুইজনে নীরব রহিলেন। ক্রমে পুণার আলোক নিকটবর্তী হইতে লাগিল, পথ সমতল ও অনুদ্ঘাত হইল। অশ্বদ্বয় আশু গৃহে পৌঁছিবার আশায় দ্রুতবেগে চলিতে আরম্ভ করিল।

পুণা পৌঁছিতে যখন পাদক্রোশ মাত্র বাকি আছে, তখন কে একজন সম্মুখের অন্ধকার হইতে উচ্চকণ্ঠে হাঁকিল, "হো শিব্বা হো! হো দাদোজী!"

বালক শিব্বা চমকিয়া উঠিয়া সানন্দে চিৎকার করিয়া উঠিল, "তানা! তানা!" তারপর তীরবেগে সম্মুখে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

অন্ধকারে তানাজী মালেশ্বর ঘোড়ার উপর বসিয়া ছিল, শিব্বা প্রায় তাহার ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িল।

তানাজী তিরস্কারের সুরে বলিল, "আজ কি আর বাড়ি ফিরতে হবে না? কোথায় ছিলে এতক্ষণ? মা কত ভাবছেন, শেষে আর থাকতে না পেরে আমাকে পাঠালেন?"

শিব্বা ঘোড়ার উপর হইতেই তানাজীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মা কোথায় রে, তানা?"

তানাজী বলিল, "কোথায় আবার—বাড়িতে! দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পথের পানে চেয়ে আছেন। তোমার এত দেরি হল কেন?" গলা খাটো করিয়া বলিল, "দেওরামের সঙ্গে দেখা হল নাকি? ওদিকের কি খবর? কবে?"

শিব্বা অন্যমনস্কভাবে বলিল, "খবর ভালো। অমাবস্যার রাত্রে সব ঠিক হয়েছে।—চল্ তানা, শীগ্‌গির বাড়ি যাই। মাকে সমস্ত দিন দেখিনি—ভারি মন-কেমন করছে।"

দুই কিশোর বন্ধু তখন নীড়-প্রতিগামী পাখির মতো দ্রুতবেগে গৃহের দিকে অগ্রসর হইল।

বৃদ্ধ দাদোজী কোণ্ডু বহুদূরে পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন।

১৩৩৮

রুমাহরণ

চক্রায়ুধ ঈশানবর্মা নামক জনৈক নাগরিকের ঘৃণিত জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছি। দিগ্বিজয়ী চন্দ্রবর্মা পাটলিপুত্রের প্রাসাদভূমির এক প্রান্তে এক অর্ধশুষ্ক কূপমধ্যে তাহাকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কূপের মুখ ঘনসন্নিবিষ্ট লৌহজাল দ্বারা আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই কূপের দুর্গন্ধ পঙ্কে আ-কটি নিমজ্জিত হইয়া, ভেক-সরীসৃপ-পরিবৃত হইয়া আমার অন্তিম তিন মাস কাটিয়াছিল।

জয়ন্তী নাম্নী পুরীর এক দাসী চণ্ডালহস্তে শূকের মাংস আনিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যায় আমার জন্য কূপে ফেলিয়া দিয়া যাইত। এই জয়ন্তীর নিকট আমি রাজ-অবরোধের অনেক কথা শুনিতে পাইতাম। জয়ন্তী সোমদত্তার সহচরী কিঙ্করী ছিল; সে সোমদত্তার মনের অনেক কথা জানিত, অনেক কথা অনুমান করিয়াছিল। সে কূপমুখে বসিয়া সোমদত্তার কাহিনী বলিত, আমি নিম্নে অন্ধকারে কীটদংশনবিক্ষত অর্ধগলিত দেহে দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনিতাম।

একদিন জয়ন্তীকে বলিয়াছিলাম, "জয়ন্তী, আমাকে উদ্ধার করিবে? আমার বহু গুপ্তধন মাটিতে প্রোথিত আছে, যদি মুক্তি পাই, তোমাকে দশ হাজার স্বর্ণদীনার দিব। তোমাকে আর চেটীবৃত্তি করিতে হইবে না।"

ভীতা জয়ন্তী আমাকে গালি দিয়া পলায়ন করিয়াছিল, আর আসে নাই। অনন্তর চণ্ডাল একাকী আসিয়া মাংস দিয়া যাইত।

আমি একাকী এই জীবন্ত নরকে বসিয়া থাকিতাম আর ভাবিতাম। কি ভাবিতাম, তাহা বলিবার এ স্থান নহে। তবে সোমদত্তা আমার চিন্তার অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া থাকিত। ভাবিতাম, সোমদত্তার মনে যদি ইহাই ছিল, তবে সে আমার নিকট আত্মসমর্পণ করিল কেন? যদি চন্দ্রগুপ্তকে এত ভালোবাসিত, তবে সে বিশ্বাসঘাতিনী না হইয়া আত্মঘাতিনী হইল না কেন? রমণীর হৃদয়ের রহস্য কে বলিবে? তখন এ প্রশ্নের কোন উত্তর পাই নাই।

কিন্তু আজ বহু জীবনের পরপারে বসিয়া মনে হয়, যেন সোমদত্তার চরিত্র কিছু কিছু বুঝিয়াছি। সোমদত্তা গুপ্তচররূপে রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ক্রমে চন্দ্রগুপ্তকে সমস্ত মনপ্রাণ ঢালিয়া ভালোবাসিয়াছিল। কুমারদেবী চন্দ্রগুপ্তকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন, ইহা সে সহ্য করিতে পারিত না। তাই সে সংকল্প করিয়াছিল, চন্দ্রবর্মাকে দুর্গ অধিকারে সাহায্য করিয়া পরে স্বামীর জন্য পাটলিপুত্র ভিক্ষা মাগিয়া লইবে; কুমারদেবীর প্রভাব অস্তমিত হইবে, চন্দ্রগুপ্ত সত্যই রাজা হইবেন এবং সেই সঙ্গে সোমদত্তাও স্বামীসোহাগিনী হইয়া পট্টমহিষীর আসন গ্রহণ করিবে।

আমার দুরন্ত লালসা যখন তাহার গোপন সংকল্পের উপর খড়্গের মতো পড়িয়া উহা খণ্ডবিখণ্ড করিয়া দিল, তখন তাহার মনের কি অবস্থা হইল সহজেই অনুমেয়। নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারিণী হীন গুপ্তচর বলিয়া কোন্ রমণী ধরা পড়িতে চাহে? সোমদত্তা দেখিল, ধরা পড়িলে স্বামীর অতুল ভালোবাসা সে হারাইবে; সে যে চন্দ্রগুপ্তকেই রাজ্য ফিরিয়া দিবার মানসে চক্রান্ত করিয়াছে, এ কথা চন্দ্রগুপ্ত বুঝিবে না, নীচ বিশ্বাসঘাতিনী বলিয়া ঘৃণাভরে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। এদিকে চক্রায়ুধের হস্তেও নিস্তার নাই, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, ধর্মনাশ নিশ্চিত। এরূপ অবস্থায় অসহায়া জালবদ্ধা কুরঙ্গিণী কি করিবে?

অপরিমেয় ভালোবাসার যূপে সোমদত্তা সতীধর্ম বিসর্জন দিল। ভাবিল, আমার তো চরম সর্বনাশ হইয়াছে, কিন্তু এই মর্মভেদী লজ্জার কাহিনী স্বামীকে জানিতে দিব না। এখন আমার যাহা হয় হউক, তারপর যে জীবন ধ্বংস করিয়াছে, তাহাকে যমালয়ে পাঠাইয়া নিজেও নরকে যাইব। কিন্তু স্বামীকে কিছু জানিতে দিব না।

ইহাই সোমদত্তার আত্মবিসর্জনের অন্তরতম ইতিহাস।

কিন্তু আর না, সোমদত্তার কথা এইখানেই শেষ করিব। এই নারীর কথা স্মরণে ষোল শত বৎসর পরে আজও আমার মন মাতাল হইয়া উঠে। জানি, সোমদত্তার মতো নারীকে বিধাতা আমার জন্য সৃষ্টি করেন না—সে দেবভোগ্যা। জন্মজন্মান্তরের ইতিহাস খুঁজিয়া এমন একটিও নারী দেখিতে পাই নাই, যাহার সহিত সোমদত্তার তুলনা করিব। আর কখনও এমন দেখিব কি না জানি না।

আমি বিশ্বাস করি, জন্মান্তরের পরিচিত লোকের সহিত ইহজন্মে সাক্ষাৎ হয়। সোমদত্তার সহিত যদি আবার আমার সাক্ষাৎ হয়, জানি, তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিব। নূতন দেহের ছদ্মবেশ তাহাকে আমার চক্ষু হইতে লুকাইয়া রাখিতে পারিবে না।

কিন্তু সে-ও কি আমাকে চিনিতে পারিবে? ললাটে কি স্মৃতির ভ্রূকুটি দেখা দিবে? অধরে সেই অন্তিমকালের অপরিসীম ঘৃণা স্ফুরিত হইয়া উঠিবে? জানি না! জানি না!

পূর্বে বলিয়াছি যে, আমি বিশ্বাস করি, জন্মান্তরের পরিচিত লোকের সঙ্গে ইহজন্মে সাক্ষাৎ হয়। আপনি তাহার মুখের পানে অবাক্ হইয়া কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকেন, চিনি-চিনি করিয়াও চিনিতে পারেন না। মনে করেন, পূর্বে কোথাও দেখিয়া থাকিবেন। এই পূর্বে যে কোথায় এবং কত দিন আগে, আপনি তাহা জানেন না; আমি জানি। ভগবান আমাকে এই অদ্ভুত শক্তি দিয়াছেন। তাহাকে দেখিবামাত্র আমার মনের অন্ধকার চিত্রশালায় চিত্রের ছায়াবাজি আরম্ভ হইয়া যায়। যে কাহিনীর কোনও সাক্ষী নাই, সেই কাহিনীর পুনরভিনয় চলিতে থাকে। আমি তখন আর এই ক্ষুদ্র আমি থাকি না, মহাকালের অনিরুদ্ধ স্রোতঃপথে চিরন্তন যাত্রীর মতো ভাসিয়া চলি। সে যাত্রা কবে আরম্ভ হইয়াছিল জানি না, কত দিন ধরিয়া চলিবে তাহাও ভবিষ্যের কুজ্ঝটিকায় প্রচ্ছন্ন। তবে ইহা জানি যে, এই যাত্রা শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন অব্যাহত। মাঝে মাঝে মহাকালের নৃত্যের ছন্দে যতি পড়িয়াছে মাত্র—সমাপ্তির 'সম' কখনও পড়িবে কি না এবং পড়িলেও কবে পড়িবে, তাহা বোধ করি বিধাতারও অজ্ঞেয়।

মহেঞ্জোদাড়োর নগর ও মিশরের পিরামিড যখন মানুষের কল্পনায় আসে নাই, তখনও আমি জীবিত ছিলাম। এই আধুনিক সভ্যতা কয় দিনের? মানুষ লোহা ব্যবহার করিতে শিখিল কবে? কে শিখাইল? প্রত্নতাত্ত্বিকেরা পরশুমুণ্ড পরীক্ষা করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতেছেন, কিন্তু উত্তর পাইতেছেন না। আমি বলিতে পারি, কবে লোহার অস্ত্র ভারতে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু সন-তারিখ দিয়া বলিতে পারিব না। সন-তারিখ তখনও তৈয়ার হয় নাই। তখন আমরা কাঁচা মাংস খাইতাম।

চারিদিকে পাহাড়ের গণ্ডি দিয়া ঘেরা একটি দেশ, মাঝখানে গোলাকৃতি সুবৃহৎ উপত্যকা। 'যজ্ঞিবাড়ি'তে কাঠের পরাতের উপর ময়দা স্তূপীকৃত করিয়া ঘি ঢালিবার সময় তাহার মাঝখানে যেমন নামাল করিয়া দেয়, আমাদের পর্বতবলয়িত উপত্যকাটি ছিল তাহারই একটি সুবিরাট সংস্করণ। আবার বিধাতা মাঝে মাঝে আকাশ হইতে প্রচুর ঘৃতও ঢালিয়া দিতেন; তখন ঘোলাটে রাঙা জলে উপত্যকা কানায় কানায় ভরিয়া

উঠিত। পাহাড়ের অঙ্গ বাহিয়া শত নির্ঝরিণী সগর্জনে নামিয়া আসিয়া সেই হ্রদ পুষ্ট করিত। আবার বর্ষাপগমে জল শুকাইত, কতক গিরিরন্ধ্র পথে বাহির হইয়া যাইত; তখন অগভীর জলের কিনারায় একপ্রকার দীর্ঘ ঘাস জন্মিত। ঘাসের শীর্ষে ছোট ছোট দানা ফলিয়া ক্রমে সুবর্ণবর্ণ ধারণ করিত। এই গুচ্ছ গুচ্ছ দানা কতক ঝরিয়া জলে পড়িত, কতক উত্তর হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে হংস আসিয়া খাইত। সে, সময় জলের উপরিভাগ অসংখ্য পক্ষীতে শ্বেতবর্ণ ধারণ করিত এবং তাহাদের কলধ্বনিতে দিবা-রাত্রি সমভাবে নিনাদিত হইতে থাকিত। শীতের সময় উচ্চ পাহাড়গুলার শিখরে শিখরে তুলার মতো তুষারপাত হইত। আমরা তখন মৃগ, বানর, ভল্লুকের চর্ম গাত্রাবরণরূপে পরিধান করিতাম। গিরিকন্দরে তুষার-শীতল বাতাস প্রবেশ করিয়া অস্থি পর্যন্ত কাঁপাইয়া দিত। পাহাড়ে শুষ্ক তরুর ঘর্ষণে অগ্নি জ্বলিতে দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু অগ্নি তৈয়ার করিতে তখনও শিখি নাই। অগ্নিকে বড় ভয় করিতাম।

আমাদের এই উপত্যকা কোথায়, ভারতের পূর্বে কি পশ্চিমে, উত্তরে কি দক্ষিণে, তাহা আমার ধারণা নাই। ভারতবর্ষের সীমানার মধ্যে কি না, তাহাও বলিতে পারি না। উপত্যকার কিনারায় পাহাড়ের গুহাগুলির মধ্যে আমরা একটা জাতি বাস করিতাম; পর্বতচক্রের বাহিরে কখনও যাই নাই, সেখানে কি আছে তাহাও জানিতাম না। আমাদের জগৎ এই গিরিচক্রের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। পাহাড়ে বানর, ভল্লুক, ছাগ, মৃগ প্রভৃতি নানাবিধ পশু বাস করিত, আমরা তাহাই মারিয়া খাইতাম; ময়ূরজাতীয় এক-প্রকার পক্ষী পাওয়া যাইত, তাহার মাংস অতি কোমল ও সুস্বাদু ছিল। তাহার পুচ্ছ দিয়া আমাদের নারীরা শিরোভূষণ করিত। গাছের ফলমূলও কিছু কিছু পাইতাম, কিন্তু তাহা যৎসামান্য; পশুমাংসই ছিল আমাদের প্রধান আহার্য।

চেহারাও আহারের অনুরূপ ছিল। মাথায় ও মুখে বড় বড় জটাকৃতি চুল, রোমশ কপিশ-বর্ণ দেহ, বাহু জানু পর্যন্ত লম্বিত। দেহ নিতান্ত খর্ব না হইলেও প্রস্থের দিকেই তাহার প্রসার বেশী। এরূপ আকৃতির মানুষ আজকালও মাঝে মাঝে দু'একটা চোখে পড়ে, কিন্তু জামা-কাপড়ের আড়ালে স্বরূপ সহসা ধরা পড়ে না। তখন আমাদের জামা-কাপড়ের বালাই ছিল না, প্রসাধনের প্রধান উপকরণ ছিল পশুচর্ম। তাহাও গ্রীষ্মকালে বর্জন করিতাম, সামান্য একটু কটিবাস থাকিত।

আমাদের নারীরা ছিল আমাদের যোগ্য সহচরী—তাম্রবর্ণা, কৃশাঙ্গী, ক্ষীণকটি, কঠিনস্তনী। নখ ও দন্তের সাহায্যে তাহারা অন্য পুরুষের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিত। স্তন্যপায়ী শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া অন্যহস্তে প্রস্তরফলকাগ্র বর্শা পঞ্চাশ-হস্ত দূরস্থ মৃগের প্রতি নিক্ষেপ করিতে পারিত। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে ইহারা যখন গুহাদ্বারে বসিয়া পক্ক লোহিত ফলের কর্ণাভরণ দুলাইয়া মৃদুগুঞ্জনে গান করিত, তখন তাহাদের তীব্রোজ্জ্বল কালো চোখে বিষাদের ছায়া নামিয়া আসিত। আমরা প্রস্তরপিণ্ডের অন্তরালে লুকাইয়া নিস্পন্দবক্ষে শুনিতাম—বুকের মধ্যে নামহীন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিত!

এই সব নারীর জন্য আমরা যুদ্ধ করিতাম, হিংস্র শ্বাপদের মতো পরস্পর লড়িতাম। ইহারা দূরে দাঁড়াইয়া দেখিত। যুদ্ধের অবসানে বিজয়ী আসিয়া তাহাদের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইত। আমাদের জাতির মধ্যে নারীর সংখ্যা কমিয়া

।।।ছল...

কিন্তু গোড়া হইতে আরম্ভ করাই ভালো। কি করিয়া এই অর্ধপশু জীবনের স্মৃতি জাগরূক হইল, পূর্বে তাহাই বলিব।

পূজার ছুটিতে হিমাচল অঞ্চলে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। রেলের চাকরিতে আর

কোনও সুখ না থাক, ঐটুকু আছে—বিনা খরচে সারা ভারতবর্ষটা ঘুরিয়া আসা যায়। আমি হিমালয়ের কোন্ দিকে গিয়াছিলাম, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই,—তবে সেটা দার্জিলিং কিংবা সিমলা পাহাড় নহে। যেখানে গিয়াছিলাম সে স্থান আরও নির্জন ও দূরধিগম্য; রেলের শেষ সীমা ছাড়াইয়া আরও দশ বারো মাইল রিক্‌শ কিংবা ঘোড়ায় যাইতে হয়।

হিমালয়ের নৈসর্গিক বর্ণনা করিয়া উত্ত্যক্ত পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইব না; সচরাচর আশ্বিনমাসে পাহাড়ের অবস্থা যেমন হইয়া থাকে, তাহার অধিক কিছু নহে। গিরিক্রোড়ের এই ক্ষুদ্র জনবিরল শহরটি এমন ভাবে তৈয়ারি যে, মানুষের হাতের কাজ খুব কমই চোখে পড়ে। যে পথটি সর্পিল গতিতে কখনও উঁচু কখনও নিচু হইয়া শহরটিকে নাগপাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, পাইন্ গাছের শ্রেণীর দ্বারা তাহা এমনই আচ্ছন্ন যে, তাহার শীর্ণ দেহটি সহসা চোখেই পড়ে না। ছোট ছোট পাথরের বাড়ি-গুলি পাহাড়ের অঙ্গে মিশিয়া আছে। মাঝে মাঝে পাইনের জঙ্গল, তাহার মধ্যে পাথরের টুকরা বসাইয়া মানুষের বিশ্রামের স্থান করা আছে। রাত্রিকালে ক্বচিৎ ফেউয়ের ডাক শুনা যায়। শীত চমৎকার উপভোগ্য।

সেদিন পাইন্ গাছের মাথায় চাঁদ উঠিয়াছিল। আধখানা চাঁদ, কিন্তু তাহারই আলোয় বনস্থলী উদ্ভাসিত হইয়াছিল। আমি একাকী পাইন্ বনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। গায়ে ওভারকোট ছিল, মাথায় একটা অদ্ভুত আকৃতির পশমের টুপি পরিয়াছিলাম। এ দেশের পাহাড়ীরা এইরকম টুপি তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করে। চাঁদের আলোয় আমার দেহের যে ছায়াটা মাটিতে পড়িয়াছিল, তাহা দেখিয়া আমারই হাসি পাইতেছিল। ঠিক একটি জংলী শিকারীর চেহারা,—হাতে একটা ধনুক কিংবা বর্শা থাকিলে আর কোনও তফাত থাকিত না।

এখানে আসিয়া অবধি কোনও বাঙালীর মুখ দেখি নাই, অন্য জাতীয় লোকের সঙ্গেও বিশেষ পরিচয় হয় নাই, তাই একাকী ঘুরিতেছিলাম। বাহিরের শীতশিহরিত তন্দ্রাচ্ছন্ন প্রকৃতি আমাকে গভীর রাত্রিতে ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছিল। এই প্রকৃতির পানে চাহিয়া চাহিয়া আমার মনে হইতেছিল, এ-দৃশ্য যেন ইহজগতের নহে, কিংবা যেন কোন্ অতীত যুগ হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া অর্ধ-ঘুমন্ত দৃশ্যটাকে কেহ এখানে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। বর্তমান পৃথিবীর সঙ্গে ইহার কোন যোগ নাই, চন্দ্রাস্ত হইলেই অস্পষ্ট স্বপ্নের মতো ইহা শূন্যে মিলাইয়া যাইবে।

এ বন রাত্রিকালে খুব নিরাপদ নহে জানিতাম, ফেউয়ের ডাকও স্বকর্ণে শুনিয়াছি; কিন্তু তবু এক অদৃশ্য মায়া আমাকে ধরিয়া রাখিয়াছিল। কিছুক্ষণ এদিক্-ওদিক্ ঘুরিয়া বেড়াইবার পর একটি গাছের ছায়ায় পাথরের বেদীর উপর বসিয়া পড়িলাম। নিস্তব্ধ রাত্রি। মাঝে মাঝে মৃদু বাতাসে গাছের পাতা অল্প নড়িতেছে; দু'একটা ফল বৃন্তচ্যুত হইয়া টুপটাপ করিয়া মাটিতে পড়িতেছে। ইহা ছাড়া জগতে আর শব্দ নাই।

আমি ভিন্ন এ-বনে আরও কেহ আছে! বনভূমির উপর আলো ও ছায়ার যে ছক পাতা রহিয়াছে, তাহার উপর একটি নিঃশব্দে সঞ্চরমান শুভ্রমূর্তি মাঝে মাঝে চোখে পড়িতেছে। মূর্তি কখনও তরুচ্ছায়ার অন্ধকারে মিলাইয়া যাইতেছিল, কখনও অবাস্তব কল্পনার মতো চন্দ্রালোক-কুহেলির ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। ক্রমে একটি ক্ষীণ তন্দ্রামধুর কণ্ঠস্বর কানে আসিতে লাগিল,—ঐ ছায়ামূর্তি গান করিতেছে। গানের কথা-গুলি ধরা গেল না, কিন্তু সুরটি পরিচিত, যেন পূর্বে কোথায় শুনিয়াছি। ঘুম-পাড়ানী ছড়ার মতো সুর, কিন্তু প্রাণের সমস্ত তন্ত্রী চির-পরিচয়ের আনন্দে ঝংকৃত করিয়া তুলে।

গান ক্রমশ নিকটবর্তী হইতে লাগিল। এই গান যতই কাছে আসিতে লাগিল, আমার শরীরের স্নায়ুমণ্ডলেও এক অপূর্ব ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিল। সে অবস্থা বর্ণনা করি এমন সাধ্য আমার নাই। সে কি তীব্র অনুভূতি! আনন্দের কোন্ উদ্দামতম অবস্থায় মানুষের শরীরে এমন ব্যাপার ঘটিতে পারে জানি না, কিন্তু মনে হইল, দেহের স্নায়ু-গুলা এবার অসহ্য হর্ষবেগে ছিঁড়িয়া-খুঁড়িয়া একাকার হইয়া যাইবে।—যে গান গাহিতেছিল, সে নারী এবং যে ভাষায় গান গাহিতেছিল তাহা বাংলা; কিন্তু সে জন্য নহে। আমার সমস্ত অন্তরাত্মা যে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার অন্য কারণ ছিল। এই গান এই কণ্ঠে গীত হইতে আমি পূর্বে শুনিয়াছি—বহুবার শুনিয়াছি। ইহার প্রত্যেকটি শব্দ আমার কাছে পুরাতন। কিন্তু তফাত এই যে, যে-ভাষায় এ গান পূর্বে শুনিয়াছিলাম, তাহা বাংলাভাষা নহে। সে ভাষা ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু গান ভুলি নাই! কোথায় অন্তরের কোন্ নির্জন কন্দরে এতকাল লুকাইয়া ছিল, শুনিবামাত্র প্রতিধ্বনির মতো জাগিয়া উঠিল। গানের কথাগুলি বাংলায় রূপান্তরিত হইয়া অসংযুক্ত ছড়ার মতো প্রতীয়মান হয়, কিন্তু একদিন উহারই ছন্দে আমার বুকের রক্ত নৃত্য করিয়া উঠিত। গানের কথাগুলি এইরূপঃ

বনের চিতা মেরেছে মোর স্বামী
ধারালো তীর হেনে!
চামড়া তাহার আমায় দেবে এনে
পরবো গায়ে আমি।
আমার চুলে বিনিয়ে দেব, ওরে,
তার ধনুকের ছিলা,
স্বামী আমার,—নিটোল দেহ তার
কঠিন যেন শিলা!

গায়িকা আরও কাছে আসিতে লাগিল। আমি দাঁড়াইয়া উঠিয়া রোমাঞ্চিত-দেহে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ওঃ, কত কল্পান্ত পরে সে ফিরিয়া আসিল! আমার প্রিয়া —আমার সঙ্গিনী—আমার রুমা! এত দিন কি তাহারই প্রতীক্ষায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেছিলাম?

যে তরুচ্ছায়ার নিম্নে আমি দাঁড়াইয়াছিলাম, সে গাহিতে গাহিতে ঠিক সেই ছায়ার কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইল। আমাকে সে দেখিতে পায় নাই, চাঁদের দিকে চোখ তুলিয়া গাহিল,—

স্বামী আমার,—নিটোল দেহ তার
কঠিন যেন শিলা!

তাহার উন্নমিত মুখের পানে চাহিয়া আর আমার হৃদয় ধৈর্য মানিল না। আমি বাঘের মতো লাফাইয়া গিয়া তাহার হাত ধরিলাম। কথা বলিতে গেলাম, কিন্তু সহসা কিছুই বলিতে পারিলাম না। যে ভাষায় কথা বলিতে চাই, সে ভাষার একটা শব্দও স্মরণ নাই। অবশেষে অতি কষ্টে যেন অর্ধজ্ঞাত বিদেশী ভাষায় কথা কহিতেছি, এমনই ভাবে বাংলায় বলিলাম, "তুমি রুমা—আমার রুমা!"

তাহার গান থামিয়া গিয়াছিল, সে ভয়-বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, "কে? কে?"

তাহার মুখের অত্যন্ত কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিলাম, "আমি, আমি! রুমা, চিনতে পারছ না?"

সভয় ব্যাকুল-কণ্ঠে সে বলিল, "না। কে তুমি? তোমাকে আমি চিনি না। হাত ছেড়ে দাও!"

জলবিম্ব যেমন তরঙ্গ-আঘাতে ভাঙিয়া যায়, তেমনই এক মুহূর্তে আমার মোহ-বুদবুদ্ ভাঙিয়া গেল। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খাইয়া বর্তমান জগতে ফিরিয়া আসিলাম। তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া লজ্জিত অপ্রতিভভাবে বলিলাম, "মাপ করুন। আমার ভুল হয়েছিল।"

রুমা চিত্রার্পিতার মতো স্থির অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমিও তাহার পানে চাহিলাম। এই আমার সেই রুমা! পরিধানে সাদা শালের শাড়ি, আর একটি ত্রিকোণ শুভ্র শাল স্কন্ধ বেষ্টন করিয়া বুকের উপর ব্রুচ দিয়া আঁটা, পায়ে সাদা চামড়ার জুতা। মস্তক অনাবৃত, কালো কেশের রাশি কুণ্ডলিত আকারে গ্রীবামূলে লুটাইতেছে। মুখখানি কুমুদের মতো ধবধবে সাদা, বয়স বোধ করি আঠারো-উনিশের বেশী নহে—একটি তরুণী রূপসী শিক্ষিতা বাঙালী মেয়ে!

কিন্তু না, এ আমার সেই রুমা! যাহাকে আমি তাহার স্বজাতির ভিতর হইতে কাড়িয়া আনিয়াছিলাম, যে আমার সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়াছিল, এ সেই রুমা! আজ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সে আমার কাছে আসিল? আমাকে সে চিনিতে পারিল না?

আমার গলার পেশীগুলি সংকুচিত হইয়া শ্বাসরোধের উপক্রম করিল। আমি রুদ্ধ-স্বরে আবার বলিয়া উঠিলাম, "রুমা, চিনতে পারছ না?"

রুমা স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, মোহাবিষ্ট স্বরে কহিল, "আমার নাম রমা।"

"না—না—না, তুমি রুমা! আমার রুমা! মনে নেই, গুহার মধ্যে আমরা থাকতুম, ওপরে পাহাড়, নিচে উপত্যকা? তুমি গান গাইতে—যে গান এখনই গাইছিলে, সেই গান গাইতে, মনে নেই?"

রুমার দুই চক্ষু আরও তন্দ্রাতুর হইয়া আসিল। ঠোঁট দুটি একটু নড়িল, বলিল, "মনে পড়ে না—কবে—কোথায়......"

মাথার টুপিটি অধীরভাবে খুলিয়া ফেলিয়া আমি ব্যগ্রস্বরে কহিতে লাগিলাম, "মনে পড়ে না? সেই উপত্যকায় তোমরা একদল যাযাবর এসেছিলে, তোমাদের সঙ্গে ঘোড়া উট ছিল, তোমরা আগুন জেবলে মাংস সিদ্ধ করে খেতে। হ্রদের জলে যে লম্বা ঘাস জন্মাতো, তার শস্য থেকে চাল তৈরি করতে তুমিই যে আমায় শিখিয়েছিলে! ভেড়ার লোম থেকে কাপড় বোনবার কৌশল যে আমি তোমার কাছ থেকেই শিখে-ছিলুম! মনে পড়ে না? একদিন অন্ধকার রাত্রিতে আমরা তোমাদের আক্রমণ করলুম! তোমার দলের সব পুরুষ মরে গেল! তোমাকে নিয়ে আমি যখন পালাচ্ছিলুম, তুমি লোহার ছুরি দিয়ে আমার কপালে ঠিক এইখানে মারলে!"

কপালের দিকেই রুমা একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিল। আমার মনে ছিল না যে, কপালের ঠিক ঐ স্থানটিতেই আমার একটা রক্তবর্ণ জড়ুল আছে। কপালে হাত পড়িতেই স্মরণ হইল, নিজেই চমকিয়া উঠিলাম। বহু পূর্বজন্মে যেখানে রুমার ছুরিকাঘাতে ক্ষত হইয়াছিল, প্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় বিধানে ইহজন্মে তাহা রক্তবর্ণ জড়ুলরূপ ধরিয়া দেখা দিয়াছে! রুমা সেই চিহ্নটার দিকে নির্নিমেষনেত্রে চাহিয়া হঠাৎ চিৎকার করিয়া আমার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, "গাক্কা! গাক্কা!"

গাক্কা! হাঁ, ঐ বিকট শব্দটাই তখন আমার নাম ছিল। বজ্রকঠিন বন্ধনে তাহাকে বুকের ভিতর চাপিয়া লইলাম, বলিলাম, "হ্যাঁ, গাক্কা—তোমার গাক্কা। চিনতে পেরেছ, রুমা! ওঃ, আমার জন্মজন্মান্তরের রুমা!"

কতক্ষণ এইভাবে কাটিল, বলিতে পারি না। এক সময় সযত্নে তাহার মুখখানি বুকের উপর হইতে তুলিয়া ধরিয়া দেখিলাম,— রুমা মূর্ছা গিয়াছে।

তিত্তিকে লইয়া হুড়ার সহিত আমার যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল। তিত্তিকে আমি ভালোবাসিতাম না, তাহাকে দেখিলে আমার বুকের রক্ত গরম হইয়া উঠিত না। কিন্তু সে ছিল আমাদের জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠা যুবতী,—সুন্দরী-কুলের রানী। আর আমি ছিলাম যুবকদের মধ্যে প্রধান, আমার সমকক্ষ কেহ ছিল না। সুতরাং তিত্তিকে যে আমি গ্রহণ করিব এ বিষয়ে কাহারও মনে কোনও সন্দেহ ছিল না—আমারও ছিল না।

আমাদের গোষ্ঠীর মধ্যে নারীর সংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল। আমরা জোয়ান ছিলাম প্রায় দুই শত, কিন্তু গ্রহণযোগ্যা যুবতী ছিল মাত্র পঞ্চাশটি। তাই নারী লইয়া যুবকদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। আমাদের ডাইনী বুড়ী রিক্‌থা তাহার গুহার সম্মুখের উঁচু পাথরের উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া দুলিয়া দুলিয়া সমস্ত দিন গান করিত—

"আমাদের দেশে মেয়ে নেই! আমাদের ছেলেদের সঙ্গিনী নেই! এ জাত মরবে—এ জাত মরবে! হে পাহাড়ের দেবতা, বর্ষার স্রোতে যেমন পোকা ভেসে আসে, তেমনই অসংখ্য মেয়ে পাঠাও। এ জাত মরবে! মেয়ে নেই—মেয়ে নেই!..."

রিক্‌থার দন্তহীন মুখের স্খলিত কথাগুলি গুহার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া অশরীরী দৈববাণীর মতো বাতাসে ঘুরিয়া বেড়াইত।

সঙ্গিনীর জন্য সকলে পরস্পর লড়াই করিত বটে, কিন্তু তিত্তির দেহে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করে নাই। দূর হইতে লোলুপ ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া সকলে সরিয়া যাইত। তিত্তির রূপ দেখিবার মতো বস্তু ছিল। উজ্জ্বল নব-পল্লবের মতো বর্ণ, কালো হরিণের মতো চোখ, কঠিন নিটোল যৌবনোদ্ভিন্ন দেহ—ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা! তাহার প্রকৃতিও ছিল অতিশয় চপল। সে নির্জন পাহাড়ের মধ্যে গিয়া তরুবেষ্টিত কুঞ্জের মাঝখানে আপন মনে নৃত্য করিত। নৃত্য করিতে করিতে তাহার অজিন শিথিল হইয়া খসিয়া পড়িত, কিন্তু তাহার নৃত্য থামিত না। বৃক্ষগুল্মের অন্তরাল হইতে অদৃশ্য চক্ষু তাহার নিরাবরণ দেহ বিদ্ধ করিত। কিন্তু তিত্তি দেখিয়াও দেখিত না—শুধু নিজ মনে অল্প অল্প হাসিত। সে ছিল কুহকময়ী চিরন্তনী নারী।

আমার মন ছিল শিকারের দিকে, তাই আমি তিত্তির চপলতা ও স্বৈরাচার গ্রাহ্য করিতাম না। কিন্তু ক্রমে আমারও অসহ্য হইয়া উঠিল। তাহার কারণ হুড়া। হুড়া ছিল আমারই মতো একজন যুবক, কিন্তু সে অন্যান্য যুবকদের মতো আমাকে ভয় করিত না। সে অত্যন্ত হিংস্র ও ক্রূরপ্রকৃতির ছিল, তাই শক্তিতে আমার সমকক্ষ না হইলেও আমি তাহাকে মনে মনে সম্ভ্রম করিয়া চলিতাম। সেও আমাকে ঘাঁটাইত না, যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিত। কিন্তু তিত্তিকে লইয়া সে এমন ব্যবহার আরম্ভ করিল যে, আমার অহংকারে ভীষণ আঘাত লাগিল। সে নিঃসংকোচে তিত্তির পাশে গিয়া বসিত, তাহার হাত ধরিয়া টানাটানি করিত, চুল ধরিয়া টানিত, তাহার কান হইতে পাকা বদরী ফলের অবতংস দাঁত দিয়া খুলিয়া খাইয়া ফেলিত। তিত্তিও হাসিত, মারিত, ঠেলিয়া ফেলিয়া দিত, কিন্তু সত্যিকার ক্রোধ প্রকাশ করিয়া হুড়াকে নিরুৎসাহ করিত না।

এইরূপে হুড়ার সহিত আমার লড়াই অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছিল।

সেদিন প্রকাণ্ড একটা বরাহের পিছনে পিছনে বহু ঊর্ধ্বে পাহাড়ের প্রায় চূড়ার কাছে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। হাতে তীরধনুক ছিল। কিন্তু বরাহটাকে মারিতে

পারিলাম না। সোজা যাইতে যাইতে সহসা সে একটা বিবরের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। হতাশ হইয়া ফিরিতেছি, এমন সময় চোখে পড়িল, নিচে কিছুদূরে একটি সমতল পাথরের উপর দুটি মানুষ পরস্পরের অত্যন্ত কাছাকাছি বসিয়া আছে। স্থানটি এমনই সুরক্ষিত যে, উপর হইতে ছাড়া অন্য কোনও দিক্ হইতে দেখা যায় না। মানুষ দুটির একটি স্ত্রী, অন্যটি পুরুষ। ইহারা কে, চিনিতে বিলম্ব হইল না— তিত্তি এবং হুড়া! তিত্তির মাথা হুড়ার স্কন্ধের উপর ন্যস্ত, হুড়ার একটা হাত তিত্তির কোমর জড়াইয়া আছে। দুই জনে মৃদুকণ্ঠে হাসিতেছে ও গল্প করিতেছে।

আমি সাবধানে পিঠ হইতে হরিণের শিঙের তীরটি বাছিয়া লইলাম। এটি আমার সবচেয়ে ভালো তীর, আগাগোড়া হরিণের শিং দিয়া তৈয়ারি, যেমন ধারালো তেমনই ঋজু। এ তীরের লক্ষ্য কখনও ব্যর্থ হয় না। আজ তিত্তি ও হুড়াকে এক তীরে গাঁথিয়া ফেলিব।

ধনুকে তীর সংযোগ করিয়াছি, এমন সময় তিত্তি মুখ ফিরাইয়া উপর দিকে চাহিল। পরক্ষণেই অস্ফুট চিৎকার করিয়া সে বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া একটা প্রস্তরখণ্ডের পিছনে লুকাইল। হুড়াও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আমাকে দেখিয়া সে হিংস্র জন্তুর মতো দাঁত বাহির করিল; গর্জন করিয়া কহিল, "গাক্কা, তুই চলে যা, আমার কাছে আসিস্ না। আমি তোকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবো!"

আমি ধনুঃশর ফেলিয়া নিচে নামিয়া গেলাম, হুড়ার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গর্বিত-ভাবে বলিলাম, "হুড়া, তুই পালিয়ে যা! আর যদি কখনও তিত্তির গায়ে হাত দিবি, তোর হাত-পা মুচড়ে ভেঙে পাহাড়ের ডগা থেকে ফেলে দেব। পাহাড়ের ফাঁকে মরে পড়ে থাকবি, শকুনি তোর পচা মাংস ছিঁড়ে খাবে।"

হুড়ার চোখ দুটা রক্তবর্ণ হইয়া ঘুরিতে লাগিল, সে দন্ত কড়মড় করিয়া বলিল, "গাক্কা, তিত্তি আমার! সে তোকে চায় না, আমাকে চায়। তুই যদি তার দিকে তাকাস্, তোর চোখ উপড়ে নেব। কেন এখানে এসেছিস্, চলে যা! তিত্তি আমার, তিত্তি আমার!" —বলিয়া ক্রোধান্ধ হুড়া নিজের বক্ষে সজোরে চপেটাঘাত করিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "তুই তিত্তিকে আমার কাছ থেকে চুরি করে নিয়েছিস্। যদি পারিস্, কেড়ে নে;—আয়, লড়াই কর্!"

হুড়া দ্বিতীয় আহ্বানের অপেক্ষা করিল না, বন্য শূকরের মতো আমাকে আক্রমণ করিল।

তখন সেই চত্বরের ন্যায় সমতল ভূমির উপর ঘোর যুদ্ধ বাধিল। দুইটি ভল্লুক সহসা ক্ষিপ্ত হইয়া গেলে যে ভাবে যুদ্ধ করে, আমরাও সেই ভাবে যুদ্ধ করিলাম। সেই আদিম যুদ্ধ, যখন নখ-দন্ত ভিন্ন অন্য অস্ত্র প্রয়োজন হইত না। হুড়া কামড়াইয়া আমার দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল, সর্বাঙ্গ দিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, শক্তিতে সে আমার সমকক্ষ ছিল না। আমি ধীরে ধীরে তাহাকে নিস্তেজ করিয়া আনিলাম। তারপর তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার পিঠের উপর চড়িয়া বসিলাম।

নিকটেই একখণ্ড পাথর পড়িয়াছিল। দুই হাতে সেটা তুলিয়া লইয়া হুড়ার মাথা গুঁড়া করিয়া দিবার জন্য ঊর্ধ্বে তুলিয়াছি, হঠাৎ বিকট চিৎকার করিয়া রাক্ষসীর মতো তিত্তি আমার ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িল। দুই হাতের আঙুল আমার চোখের মধ্যে পুরিয়া দিয়া প্রখর দন্তে আমার একটা কান কামড়াইয়া ধরিল।

বিস্ময়ে, যন্ত্রণায় আমি হুড়াকে ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম, তিত্তি কিন্তু গিরগিটির মতো আমার পিঠ আঁকড়াইয়া রহিল। চোখ ছাড়িয়া দিয়া গলা জড়াইয়া ধরিল, কিন্তু কান ছাড়িল না। ওদিকে হুড়াও ছাড়া পাইয়া সম্মুখ হইতে আক্রমণ করিল। দুইজনের মধ্যে

পড়িয়া আমার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল।

তিত্তিকে পিঠ হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। হাত-পা দিয়া সে এমনভাবে জড়াইয়া ধরিয়াছে যে, সে নাগপাশ হইতে মুক্ত হওয়া একেবারে অসম্ভব। তাহার উপর কান কামড়াইয়া আছে, ছাড়ে না। এদিকে হুড়া আমার পরি-ত্যক্ত প্রস্তরখণ্ডটা তুলিয়া লইয়া আমারই মস্তক চূর্ণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। আমার আর সহ্য হইল না, রণে ভঙ্গ দিলাম। রাক্ষসীটাকে পিঠে করিয়াই পলাইতে আরম্ভ করিলাম।

অসমতল পাহাড়ের উপর একটা উলঙ্গ উন্মত্ত ডাকিনীকে পিঠে লইয়া দৌড়ানো সহজ কথা নহে। কিন্তু কিছুদূর গিয়া সে আপনা হইতেই আমাকে ছাড়িয়া দিল। আমার কর্ণ ত্যাগ করিয়া পিঠ হইতে পিছলাইয়া নামিয়া পড়িল। আমি আর ফিরিয়া তাকাই-লাম না। পিছনে তিত্তি চিৎকার করিয়া হাসিয়া করতালি দিয়া নাচিতে লাগিল।—

"গাক্কা ভীতু, গাক্কা কাপুরুষ। গাক্কা মরদ নয়! সে কোন্ সাহসে তিত্তিকে পেতে চায়? তিত্তি হুড়ার বৌ! হুড়া তিত্তিকে গাক্কার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে, তিত্তির ভয়ে গাক্কা পালিয়েছে। গাক্কা ভীতু! গাক্কাকে দেখে সবাই হাসবে। গাক্কা আর মানুষের কাছে মুখ দেখাবে না। গাক্কা কাপুরুষ! গাক্কা মরদ নয়!"—তিত্তির এই তীব্র শ্লেষ রক্তাক্ত কর্ণে শুনিতে শুনিতে আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইলাম।

সেই দিন, সূর্য যখন উপত্যকার ওপারে পাহাড়ের আড়ালে ঢাকা পড়িল, তখন আমি চুপি চুপি নিজের গুহা হইতে পাথরের ফলকযুক্ত বর্শাটি লইয়া গোষ্ঠী পরিত্যাগ করিলাম। তিত্তিকে হারাইয়া আমার দুঃখ হয় নাই, কিন্তু গ্রামের সকলে, যাহারা এত কাল আমাকে ভয় করিয়া চলিত, তাহারা আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া উপহাস করিবে, তিত্তি করতালি দিয়া হাসিবে, ইহা সহ্য করা অপেক্ষা গোষ্ঠী ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। উপত্যকার পরপারে ঐ যেখানে সূর্য ঢাকা পড়িল, ওখানে একটি ছোট গুহা আছে, একদিন শিকার করিতে গিয়া উহা আবিষ্কার করিয়াছিলাম। গুহার পাশ দিয়া একটি সরু ঝরনা নামিয়াছে, তাহার জল চাকভাঙা মধুর মতো মিষ্ট। ওদিকে শিকারও বেশী পাওয়া যায়। এদিক্ হইতে তাড়া খাইয়া প্রায় সকল জন্তুই ওদিকে গিয়া জমা হয়, সুতরাং ঐখানে গিয়া বাস করিব।

গ্রাম ছাড়িয়া যখন চলিয়া আসিতেছি, তখন শুনিতে পাইলাম, বুড়ী ডাইনী রিক্‌খা তাহার চাতালে বসিয়া গাহিতেছে—

"মেয়ে নেই! মেয়ে নেই! আমাদের ছেলেরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে মরছে। এ জাত বাঁচবে না। হে পাহাড়ের দেবতা, মেয়ে পাঠাও..."

উপত্যকা পার হইয়া ওদিকের পাহাড়ে পেঁছিতে মধ্যরাত্রি অতীত হইয়া গেল। আকাশে চাঁদ ছিল। চাঁদটা ক্রমে ভরাট হইয়া আসিতেছে, দুই-তিন দিনের মধ্যেই নিটোল আকার ধারণ করিবে। এখন শরৎকাল, আকাশে মেঘ সাদা ও হাল্‌কা হইয়াছে, আর বৃষ্টি পড়ে না। উপত্যকার মাঝখানে হ্রদ,—ঠিক মাঝখানে নহে, একটু পশ্চিম দিক্ ঘেঁষিয়া,—তাহার কিনারায় লম্বা লম্বা ঘাস জন্মিয়াছে। ঘাসের আগায় শীষ গজাইয়া হেলিয়া পড়িয়াছে। আর কিছু দিন পরে ঐ শীষ পীতবর্ণ হইলে উত্তর হইতে পাখিরা আসিতে আরম্ভ করিবে।

হ্রদের ধার দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম, হরিণের দল জল পান করিয়া চলিয়া গেল। তাহাদের মসৃণ গায়ে চাঁদের আলো চকচক করিয়া উঠিল। ক্রমে যেখানে আমার

ক্ষীণা ঝরনাটি হ্রদের সঙ্গে মিশিয়াছে, সেইখানে আসিয়া পড়িলাম। এদিকে হ্রদের জল প্রায় পাহাড়ের কোল পর্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে, মধ্যে ব্যবধান পঞ্চাশ হাতের বেশী নহে। সম্মুখেই পাহাড়ের জঙ্ঘার একটা খাঁজের মধ্যে আমার গুহা। আমি ঝরনার পাশ দিয়া উঠিয়া যখন আমার নূতন গৃহের সম্মুখে পৌঁছিলাম, তখন চাঁদের অপরিপুষ্ট চক্রটি গুহার পিছনে উচ্চ পাহাড়ের অন্তরালে লুকাইল।

নূতন গৃহে নূতন আবেষ্টনীর মধ্যে আমি একাকী মনের আনন্দে বাস করিতে লাগিলাম। কাহারও সহিত দেখা হয় না— হরিণের অন্বেষণেও এদিকে কেহ আসে না। তাহার প্রধান কারণ, পাহাড়-দেবতার করাল মুখের এত কাছে কেহ আসিতে সাহস করে না। আমাদের জাতির মধ্যে এই চক্রাকৃতি পর্বতশ্রেণী একটি অতিকায় অজগর বলিয়া পরিচিত ছিল, এই অজগরই আমাদের পর্বত-দেবতা। পর্বত-দেবতার মুখ ছিল দংষ্ট্রাবহুল অন্ধকার একটা গহ্বর। বস্তুতঃ, দূর হইতে দেখিলে মনে হইত, যেন শল্কা-বৃত বিশাল একটা সরীসৃপ কুণ্ডলিত হইয়া তাহার ব্যাদিত মুখটা মাটির উপর রাখিয়া শুইয়া আছে। প্রাণান্তেও কেহ এই গহ্বরমুখের কাছে আসিত না।

গ্রীষ্মের অবসানে যখন আকাশে মেঘ আসিয়া গর্জন করিত, তখন আমাদের পাহাড়-দেবতাও গর্জন করিতেন। উপত্যকা জলে ভরিয়া উঠিলে তৃষ্ণার্ত দেবতা ঐ মুখ দিয়া জল শুষিয়া লইতেন। আমাদের গোষ্ঠী হইতে বর্ষা-ঋতুর প্রাক্‌কালে দেবতার প্রীত্যর্থে জীবন্ত জীবজন্তু উৎসর্গ করা হইত। দেবতার মুখের নিকটে কেহ যাইতে সাহসী হইত না—দূর হইতে দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া জন্তুগুলা ছাড়িয়া দিত। জন্তুগুলাও দেবতার ক্ষুধিত নিশ্বাসের আকর্ষণে ছুটিয়া গিয়া তাঁহার মুখে প্রবেশ করিত। দেবতা প্রীত হইয়া তাহাদিগকে ভোজন করিতেন।

দেবতার এই ভোজনরহস্য কেবল আমি ধরিয়া ফেলিয়াছিলাম; কিন্তু কাহাকেও বলি নাই। আমি দেখিয়াছিলাম, জন্তুগুলা কিছুকাল পরে দেবতার মুখ হইতে অক্ষত-দেহে বাহির হইয়া আসে এবং স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে করিতে পাহাড়ে ফিরিয়া যায়। পর্বত-দেবতার মুখ যে প্রকৃতপক্ষে একটা বড় গহ্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম, তাই তাহার নিকট যাইতে আমার ভয় করিত না। একবার কৌতূহলী হইয়া উহার ভিতরেও প্রবেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু গহ্বরের মুখ প্রশস্ত হইলেও উহার ভিতরটা অত্যন্ত অন্ধকার, এজন্য বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারি নাই। কিন্তু রন্ধ্র যে বহুদূর বিস্তৃত, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

এই পাহাড়-দেবতার মুখ আমার গুহা হইতে প্রায় তিন শত হাত দূরে উত্তরে পর্বতের সানুদেশে অবস্থিত। এ-প্রান্তে দেবতার ভয়ে কেহ আসে না, অথচ এদিকে শিকারের যত সুবিধা, অন্য দিকে তত নহে। রাত্রিতে ঝরনা ও হ্রদের মোহানায় লুকাইয়া থাকিলে যত ইচ্ছা শিকার পাওয়া যায়—শিকারের জন্য পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না। আমার গুহাটি এমনই চমৎকার যে, অত্যন্ত কাছে আসিলেও ইহাকে গুহা বলিয়া চেনা যায় না। গুহার মুখটি ছোট—লতাপাতা দিয়া ঢাকা; কিন্তু ভিতরটি বেশ সুপ্রসর। ছাদ উঁচু—দাঁড়াইলে মাথা ঠেকে না; মেঝেটি একটি আস্ত সমতল পাথর দিয়া তৈয়ারি। তাহার উপর লম্বাভাবে শুইয়া রন্ধ্রপথে মুখ বাড়াইলে সমস্ত উপত্যকাটি চোখের নিচে বিছাইয়া পড়ে। শীতের সময় একটা পাথর দিয়া স্বচ্ছন্দে গুহামুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, ঠান্ডা বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না। তাহা ছাড়া রাত্রিকালে হিংস্র জন্তুর অতর্কিত আক্রমণও এই উপায়ে প্রতিরোধ করা যায়।

এইখানে নিঃসঙ্গ শান্তিতে আমার কয়েকদিন কাটিয়া গেল। আকাশের চাঁদ নিটোল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়া আবার ক্ষীণ হইতে হইতে একদিন মিলাইয়া গেল। হ্রদের কিনা-

রায় লম্বা ঘাসের শস্য পাকিয়া রং ধরিতে আরম্ভ করিল। পাখির ঝাঁক একে একে আসিয়া হ্রদের জলে পড়িতে লাগিল; তাহাদের মিলিত কণ্ঠের কলধ্বনি আমার নিশীথ নিদ্রাকে মধুর করিয়া তুলিল।

একদিন অপরাহ্ণে, আমার গুহার পাশে ঝরনা যেখানে পাহাড়ের এক ধাপ হইতে আর এক ধাপে লাফাইয়া পড়িয়াছে, সেই পৈঠার উপর বসিয়া আমি একটা নূতন ধনুক নির্মাণ করিতেছিলাম। দুই দিন আগে একটা হরিণ মারিয়াছিলাম, তাহারই অন্ত্রে ধনুকের ছিলা করিব বলিয়া জলে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিলাম। পাহাড়ে একপ্রকার মোটা বেত জন্মায়, তাহাতে খুব ভালো ধনুক হয়, সেই বেত একটা ভাঙিয়া আনিয়া শুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। উপস্থিত আমার বর্শার ধারালো পাথরের ফলা দিয়া তাহারই দুই দিকে গুণ লাগাইবার খাঁজ কাটিতেছিলাম। অস্তমান সূর্যের আলো আমার ঝরনার জলে রক্ত মাখাইয়া দিয়াছিল; নিচে হ্রদের জলে পাখিগুলি ডাকাডাকি করিতেছিল। ঝরনার চূর্ণ জলকণা নিচের ধাপ হইতে বাষ্পাকারে উঠিয়া অত্যন্ত মিঠাভাবে আমার অনাবৃত অঙ্গে লাগিতেছিল। মুখ নত করিয়া আমি আপন মনে ধনুকে গুণ-সংযোগে নিযুক্ত ছিলাম।

হঠাৎ একটা অশ্রুতপূর্ব চিঁহি-চিঁহি শব্দে চোখ তুলিয়া উপত্যকার দিকে চাহিতেই বিস্ময়ে একেবারে নিস্পন্দ হইয়া গেলাম। এ কি! দেখিলাম, পাহাড়-দেবতার মুখবিবর হইতে পিপীলিকা-শ্রেণীর মতো একজাতীয় অদ্ভুত মানুষ ও ততোধিক অদ্ভুত জন্তু বাহির হইতেছে। এরূপ মানুষ ও এরূপ জন্তু জীবনে কখনও দেখি নাই।

আগন্তুকগণ বহু নিম্নে উপত্যকায় ছিল, অতদূর হইতে আমাকে দেখিতে পাইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি আমি সন্তর্পণে বুকে হাঁটিয়া ঝরনার তীর হইতে আমার গুহায় ফিরিয়া আসিয়া লুকাইলাম। গুহার মধ্যে লুকাইয়া দ্বারপথে মুখ বাড়াইয়া নবাগতদিগকে দেখিতে লাগিলাম।

মানুষ হইলেও ইহারা যে আমার সগোত্র নহে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না। বাহিরের কোনও অজ্ঞাত জগৎ হইতে রন্ধ্রপথে আমাদের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাও অস্পষ্টভাবে অনুভব করিলাম। কিন্তু যেখান হইতেই আসুক, এমন আশ্চর্য চেহারা ও বেশভূষা যে হইতে পারে তাহা কখনও কল্পনা করি নাই। জন্তুদের কথা পরে বলিব, প্রথমে মানুষগুলার কথা বলি। এই মানুষগুলার গায়ের রং আমাদের মতো মধুপিঙ্গল বর্ণ নহে—ধবধবে সাদা। ইহাদের চুল সূর্যাস্তের বর্ণচ্ছটার ন্যায় উজ্জ্বল, দেহ অতিশয় দীর্ঘ ও সুগঠিত। পশুচর্মের পরিবর্তে ইহাদের দেহ একপ্রকার শ্বেতবস্ত্রে আচ্ছাদিত। ইহারা সংখ্যায় সর্বসুদ্ধ প্রায় একশত জন ছিল, তাহার মধ্যে অর্ধেক নারী। নারীগণও পুরুষদের মতো উজ্জ্বল কেশযুক্ত ও দীর্ঘাকৃতি। তাহারা বস্ত্র দ্বারা বক্ষোদেশ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। পুরুষদের হাতে ধনুর্বাণ ও ভল্ল আছে, ভল্লের ফলা সূর্যের আলোয় ঝকমক করিতেছে। বর্শার ফলা এমন ঝকমক করিতে পূর্বে কখনও দেখি নাই।

ইহাদের সঙ্গে তিন প্রকার জন্তু রহিয়াছে। প্রথমতঃ, একপ্রকার বিশাল অথচ শীর্ণকায় জন্তু—তাহাদের পিঙ্গলবর্ণ দেহ আশ্চর্যভাবে ঢেউখেলানো; দেহের সন্ধিগুলা যেন অত্যন্ত অযত্ন সহকারে সংযুক্ত হইয়াছে, মুখ কদাকার। পিঠের উপর প্রকাণ্ড কুঁজ। ইহাদের পৃষ্ঠে নানাপ্রকার দ্রব্য চাপানো রহিয়াছে। উদ্‌গ্রীবভাবে গলা বাড়াইয়া ইহারা মন্থরগতিতে চলিয়াছে। দ্বিতীয় জাতীয় জন্তু ইহাদের অপেক্ষা অনেক ছোট, তাহাদের দেহ রোমশ ও রক্তবর্ণ, আঁটসাঁট মজবুত গঠন। ইহারা দেখিতে ক্ষুদ্র বটে,

কিন্তু পৃষ্ঠে বড় বড় বোঝা বহন করিয়া চলিয়াছে। উপরন্তু বহু মনুষ্য-শিশুও ইহাদের পিঠের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছে। এই জন্তুগুলাই গুহামুখ হইতে হ্রদ দেখিয়া অদ্ভুত শব্দ করিয়াছিল।

তৃতীয় শ্রেণীর জন্তু সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, দেখিতে কতকটা পাহাড়ী ছাগের মতো, কিন্তু ইহাদের দেহ ঘন রোমে আবৃত। এমন কি, ইহাদের রোম পেটের নিচে পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। ইহারা একসঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষিভাবে চলিয়াছে ও মাঝে মাঝে 'ব্যা-ব্যা' শব্দ করিতেছে।

এই সকল জন্তুর আচরণে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বস্তু এই যে, ইহারা মানুষ দেখিয়া তিলমাত্র ভয় পাইতেছে না, বরং মানুষের সঙ্গে পরম ঘনিষ্ঠভাবে মিলিয়া মিশিয়া চলিয়াছে। মানুষ ও বন্যপশুর মধ্যে এরূপ প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হইতে এই প্রথম দেখিলাম।

আগন্তুকের দল গুহাবিবর হইতে বাহির হইয়াই দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। মানুষগুলা হস্ত ঊর্ধ্বে তুলিয়া নানাপ্রকার বিস্ময়সূচক অঙ্গভঙ্গি করিতেছিল ও উত্তেজিতভাবে পরস্পরের সহিত কথা কহিতেছিল। তাহাদের কথা এতদূর হইতে শুনিতে পাইলাম না, কিন্তু তাহারা এই উপত্যকার সন্ধান পাইয়া যে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে কষ্ট হইল না। তাহাদের মধ্যে একজন হ্রদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া তারস্বরে একটা শব্দ বারংবার উচ্চারণ করিতেছিল, শুধু তাহাই ক্ষীণভাবে কানে আসিল—"বিহি, বিহি!" বোধ হইল যেন হ্রদের ধারে লম্বা ঘাসগুলাকে লক্ষ্য করিয়া সে ঐ কথাটা বলিতেছে।

ইহারা স্ত্রীপুরুষ একত্র হইয়া কিছুক্ষণ কি জল্পনা করিল, তারপর সদলবলে আমার ঝরনার মোহানার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বুঝিলাম, তাহারা এই স্থানেই ডেরা-ডাণ্ডা গাড়িবে বলিয়া মনস্থ করিয়াছে।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। দিবাশেষের নির্বাপিতপ্রায় আলোকে ইহারা ঠিক আমার গুহার নিম্নে—ঝরনার জল যেখানে পাহাড় হইতে নামিয়া স্বচ্ছ অগভীর স্রোতে উপত্যকার উপর দিয়া বহিয়া গিয়া হ্রদের জলে মিশিয়াছে, সেই স্থানে আসিয়া পশু-গুলির পৃষ্ঠ হইতে ভার নামাইল। ভারমুক্ত পশুগুলি ঝরনার প্রবাহের পাশে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া তৃষ্ণার্তভাবে জল পান করিতে লাগিল।

ইহারা আমার এত কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল যে, এই প্রদোষালোকেও আমি প্রত্যেকের মুখ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলাম। আমার গুহা হইতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে বোধ করি তাহাদের মাথায় ফেলিতে পারিতাম। তাহাদের কথাবার্তাও স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছিলাম, কিন্তু একবর্ণও বোধগম্য হইতেছিল না।

রাত্রি হইল। তখন ইহারা এক আশ্চর্য ব্যাপার করিল। একখণ্ড পাথরের সহিত আর একখণ্ড অজ্ঞাত পদার্থ ঠোকাঠুকি করিয়া স্তূপীকৃত শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করিল। অগ্নি জ্বলিয়া অঙ্গারে পরিণত হইলে সেই অঙ্গারে মাংস পুড়াইয়া সকলে আহার করিতে লাগিল। দগ্ধ মাংসের একপ্রকার অপূর্ব গন্ধ আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া জিহ্বাকে লালায়িত করিয়া তুলিল।

রাত্রি গভীর হইলে ইহারা পশুগুলির দ্বারা অগ্নির চারিপাশে একটি বৃহৎ চক্র-ব্যূহ রচনা করিল, তারপর সেই চক্রের ভিতর অগ্নির পাশে শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। কেবল একজন লোক ধনুর্বাণ হাতে লইয়া ব্যূহের বাহিরে পরিক্রমণ করিতে লাগিল।

ইহারা ঘুমাইল বটে, কিন্তু বিস্ময়ে উত্তেজনায় আমি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিলাম।

এই বিচিত্র জাতির অতি বিস্ময়কর আচার-ব্যবহার মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে তাহাদের ক্রমশঃ নির্বাণোন্মুখ অগ্নির দিকে চাহিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিলাম।

প্রাতঃকালে উঠিয়াই আগন্তুকরা কাজে লাগিয়া গেল। ইহারা অসাধারণ উদ্যমী; একদল পুরুষ উপত্যকার উপর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বড় বড় পাথরের টুকরা গড়াইয়া আনিয়া প্রাচীর-নির্মাণে প্রবৃত্ত হইল, আর একদল ধনুর্বাণ-হস্তে শিকারের অন্বেষণে পাহাড়ে উঠিয়া গেল। অবশিষ্ট অল্পবয়স্ক বালকগণ পশুগুলাকে লইয়া উপত্যকার শষ্পাচ্ছাদিত অংশে চরাইতে লইয়া গেল। স্ত্রীলোকরাও অলসভাবে বসিয়া রহিল না, তাহারা হ্রদের জলে নামিয়া লম্বা ঘাসের পাকা শীষগুলি কাটিয়া আনিয়া রৌদ্রে শুকাইতে লাগিল। এইরূপে মৌমাছি-পরিপূর্ণ মধুচক্রের মতো এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায় কর্ম প্রেরণায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে আমার দৃষ্টির সম্মুখে চক্রাকৃতি প্রস্তর-প্রাচীর গড়িয়া উঠিল। সন্ধ্যার পূর্বেই প্রাচীর কোমর পর্যন্ত উঁচু হইল। কেবল হ্রদের দিকে দুই হস্ত-পরিমিত স্থান নির্গমনের জন্য উন্মুক্ত রাখা হইল। সন্ধ্যার সময় শিকারীরা একটা বড় হরিণ ও দুটা শূকর মারিয়া বর্শাদণ্ডে ঝুলাইয়া লইয়া আসিল। তখন সকলে আনন্দ-কোলাহল সহকারে অগ্নি জ্বালিয়া সেই মাংস দগ্ধ করিয়া আহারের আয়োজন করিতে লাগিল।

আর একটা অভিনব ব্যাপার লক্ষ্য করিলাম। নারীগণ একপ্রকার বর্তুলাকৃতি পাত্র কক্ষে লইয়া ঝরনার তীরে আসিতেছে এবং সেই পাত্রে জল ভরিয়া পুনশ্চ কক্ষে করিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহারা কেহই ঝরনায় মুখ ডুবাইয়া কিংবা অঞ্জলি করিয়া জল পান করে না, প্রয়োজন হইলে সেই পাত্র হইতে জল ঢালিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে।

আর একটা রাত্রি কাটিয়া গেল, নবাগতগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বাস করিতে লাগিল। ভাব দেখিয়া বোধ হইল, এই উপত্যকাটি তাহাদের বড়ই পছন্দ হইয়াছে, সুতরাং এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবার আশু অভিপ্রায় তাহাদের নাই। আর একটা মনুষ্য জাতি যে সন্নিকটেই বাস করিতেছে, তাহা তাহারা জানিতে পারে নাই; এবং সেই জাতির এক পলাতক যুবা যে অলক্ষ্যে থাকিয়া অহরহ তাহাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতেছে, তাহা সন্দেহ করিবারও কোনও উপলক্ষ হয় নাই। দিনের বেলা আলো থাকিতে আমি কদাচ গুহা হইতে বাহির হইতাম না।

এইরূপে আরও দুই দিন কাটিয়া গেল। বরাহদন্তের মতো বাঁকা চাঁদ আবার পশ্চিম আকাশে দেখা দিল।

ইহাদের মধ্যে যে-সব রমণী ছিল, তাহারা সকলেই সমর্থা; বন্ধ্যা বা অকর্মণ্যা কেহ ছিল না। নারীগণ অধিকাংশই সন্তানবতী এবং কোনও-না-কোন পুরুষের বশবর্তিনী; কিন্তু কয়েকটি আসন্নযৌবনা কিশোরী কুমারীও ছিল। ইহাদের ভিতর একটি কিশোরী প্রথম হইতেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

এই কিশোরীর নাম আমি জানিতে পারিয়াছিলাম,—রুমা। রুমা বলিয়া ডাকিলেই সে সাড়া দিত। রুমার রূপ কেমন ছিল, তাহা আমি বলিতে পারিব না। যে-চোখে দেখিলে নিরপেক্ষ রূপবিচার সম্ভব হয়, আমি তাহাকে সে-চোখে দেখি নাই। আমি তাহাকে দেখিয়াছিলাম যৌবনের চক্ষু দিয়া—লোভের চক্ষু দিয়া। আমার কাছে সে ছিল আকাশের ঐ আভুগ্ন চন্দ্রকলাটির মতো সুন্দর। তিত্তি তাহার পায়ের নখের কাছে লাগিত না।

এই রুমার চরিত্র অন্যান্য বালিকা হইতে কিছু স্বতন্ত্র ছিল। কৈশোরের গণ্ডি অতি-

ক্রম করিয়া সে প্রায় যৌবনের প্রান্তে পদার্পণ করিয়াছিল, তাই তাহার চরিত্রে উভয় অবস্থার বিচিত্র সম্মিলন হইয়াছিল। সে অন্যান্য নারীদের সঙ্গে যথারীতি কাজ করিত বটে, কিন্তু একটু ফাঁক পাইলেই লুকাইয়া খেলা করিয়া লইত। তাহার সঙ্গিনী বা সখী কেহ ছিল না, সে একাকী খেলা করিতে ভালোবাসিত। কখনও হ্রদের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিত, সাঁতার কাটিতে কাটিতে বহুদূর পর্যন্ত চলিয়া যাইত। তাহাকে আসিতে দেখিয়া জলে ভাসমান পাখিগুলি উড়িয়া আর একস্থানে গিয়া বসিত। সে জলে ডুব দিয়া একেবারে তাহাদের মধ্যে গিয়া মাথা তুলিত, তখন পাখিরা ভয়সূচক শব্দ করিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইত।

কিন্তু এ খেলাও তাহার মনঃপূত হইত না। কারণ, তাহার দেখাদেখি অন্যান্য বালক-বালিকারা জলে পড়িয়া সাঁতার দিতে আরম্ভ করিত। সে তখন জল হইতে উঠিয়া সিক্ত কেশজাল হইতে জলবিন্দু মোচন করিতে করিতে অন্যত্র প্রস্থান করিত।

কখনও একটু অবসর পাইলে সে চুপি চুপি কোনও পুরুষের পরিত্যক্ত ধনুর্বাণ লইয়া পাহাড়ে উঠিয়া যাইত। আমি কিছুক্ষণ তাহাকে দেখিতে পাইতাম না, তারপর আবার সে চুপি চুপি ফিরিয়া আসিত। দেখিতাম, চুলে বনফুলের গুচ্ছ পরিয়াছে, কর্ণে পক্ক ফলের দুল দুলাইয়াছে, কটিতে পুষ্পিত লতা জড়াইয়া দেহের অপূর্ব প্রসাধন করিয়াছে। ভীরু হরিণীর মতো এদিক্-ওদিক্ চাহিয়া জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিত, তারপর ঈষৎ হাসিয়া ত্রস্ত চকিত পদে প্রস্থান করিত। আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম, সকলের অজ্ঞাতে একাকিনী কোনও কাজ করিতে পারিলেই সে খুশী হয়। ইহা যে তাহার বয়ঃসন্ধির একটা স্বভাবধর্ম, তাহা তখনও বুঝি নাই। কিন্তু আমার ব্যগ্র লোলুপ চক্ষু সর্বদাই তাহার পিছনে পিছনে ঘুরিতে থাকিত। এমন কি, রাত্রিকালে প্রস্তরব্যূহের মধ্যে ঠিক কোন্ স্থানটিতে সে শয়ন করিয়া ঘুমায়, তাহা পর্যন্ত আমার দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই!

পাখিরা যেমন খড়কুটা দিয়া গাছের ডালে বাসা তৈয়ার করে, ইহারাও তেমন গাছের ডালপালা দিয়া ব্যূহের মধ্যে একপ্রকার কোটর নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, বোধ হয় অধিক শীতের সময় উহার মধ্যে রাত্রিবাস করিবার সংকল্প ছিল। কিন্তু সেগুলির নির্মাণ তখনও শেষ হয় নাই, তাই উপস্থিত মুক্ত আকাশের তলেই শয়ন করিতেছিল।

ইহাদের আগমনের পঞ্চম দিনই বিশেষ স্মরণীয় দিন। আমার মনের মধ্যে যে অভিসন্ধি কয়েকদিন ধরিয়া ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছিল, সেইদিন মধ্যরাত্রি উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই যে তাহা এমন অচিন্তনীয়ভাবে ফলবান হইয়া উঠিবে, তাহা কে কল্পনা করিয়াছিল? আগন্তুকদের নির্ভয় অসন্দিগ্ধচিত্তে কোনও অমঙ্গলের ছায়া-পাত পর্যন্ত হয় নাই। এ রাজ্যে যে অন্য মানুষ আছে, এ সন্দেহই তাহাদের মনে উদয় হয় নাই।

সেদিন দ্বিপ্রহরে পুরুষেরা সকলে নানা কার্য উপলক্ষে বাহিরে গিয়াছিল। এক দল শিকারে বাহির হইয়াছিল, আর এক দল কাষ্ঠ আহরণের জন্য পর্বতপৃষ্ঠস্থ জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছিল। বালকেরা পশুগুলিকে চরাইতে গিয়াছিল। নারীগণ শিশু কোলে লইয়া অর্ধ-নির্মিত দারু কোটরের ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছিল। হ্রদের জলে সূর্যকিরণ পড়িয়া চতুর্দিকে প্রতিফলিত হইতেছিল ও জল হইতে একপ্রকার সূক্ষ্ম বাষ্প উত্থিত হইতেছিল।

আমি অভ্যাসমত গুহামুখে শয়ান হইয়া ভাবিতেছিলাম, রত্নাকে যদি হাতের কাছে পাই, তাহা হইলে চুরি করি। রাত্রিতে যে-সময় উহারা ঘুমায়, সে-সময় যদি চুরি করিয়া আনিতে পারিতাম, তাহা হইলে ভালো হইত। কিন্তু একটা লোক সমস্ত রাত্রি

জাগিয়া পাহারা দেয়, তাহার উপর আবার আগুন জ্বলে। লোকটাকে তীর মারিয়া নিঃশব্দে মারিয়া ফেলিতে পারি—কেহ জানিবে না; কিন্তু আগুনের আলোয় চুরি করিতে গেলেই ধরা পড়িয়া যাইব। তার চেয়ে রুমাকে কোনও সময়ে যদি একেলা পাই,—সন্ধ্যার সময় নির্জনে যদি আমার গুহার কাছে আসিয়া পড়ে, তবে তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া পলায়ন করি। এ গুহা ছাড়িয়া তাহাকে লইয়া এমন স্থানে গিয়া লুকাইয়া থাকি যে, তাহার জাতি-গোষ্ঠীর কেহ আমাদের খুঁজিয়া পাইবে না।

সূর্যতাপে গুহার বায়ু উত্তপ্ত হইয়াছিল, আমি তৃষ্ণাবোধ করিতে লাগিলাম। পাশেই নির্ঝরিণী, গুহা হইতে বাহির হইয়া দুই পদ অগ্রসর হইলেই শীতল জল পাওয়া যায়; কিন্তু গুহার বাহিরে যাইলে পাছে নিম্নস্থ কাহারও দৃষ্টিপথে পড়িয়া যাই, এই ভয়ে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। কিন্তু তৃষ্ণা ক্রমে প্রবলতর হইতে লাগিল, তখন সরীসৃপের মতো বুকে হাঁটিয়া বাহির হইলাম। উঠিয়া দাঁড়ানো অসম্ভব, দাঁড়াইলেই এদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। আমি সন্তর্পণে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঝরনার দিকে অগ্রসর হইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় এক অপ্রত্যাশিত বাধা পাইয়া দ্রুত নিজের কোটরে ফিরিয়া আসিয়া লুকাইলাম।

ঝরনার ধার দিয়া দিয়া রুমা উপরে উঠিয়া আসিতেছে। গুহামুখের লতাপাতার আড়ালে থাকিয়া আমি স্পন্দিতবক্ষে দেখিতে লাগিলাম। সে ধাপে ধাপে লাফাইয়া যেখানে ঝরনার জল প্রপাতের মতো নিচে পড়িয়াছে, সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

পূর্বে বলিয়াছি, আমার গুহার পাশেই ঝরনার জল প্রপাতের মতো নিচে পড়িয়াছে। যেখানে এই প্রপাত সবেগে উচ্ছলিত হইয়া পতিত হইয়াছে, সেইখানে পাথরের মাঝখানে একটি গোলাকার কুণ্ড সৃষ্টি করিয়াছিল। এই নাতিগভীর গর্তটি পরিপূর্ণ করিয়া স্বচ্ছ জল আবার নিচের দিকে গড়াইয়া পড়িতেছিল। রুমা এই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। একবার সতর্কভাবে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কক্ষ হইতে বর্তুলাকৃতি জলপাত্রটি নামাইয়া রাখিল, তারপর ধীরে ধীরে দেহের বস্ত্র উন্মোচন করিতে লাগিল।

অসন্দিগ্ধচিত্তা হরিণীর পানে অদূরবর্তী চিতাবাঘ যেরূপ লোলুপ ক্ষুধিতভাবে চাহিয়া থাকে, আমিও সেইভাবে তাহাকে দেখিতে লাগিলাম। মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য-কিরণে তাহার শুভ্র যৌবনকঠিন দেহ হইতে যেন লাবণ্যের ছটা বিকীর্ণ হইতেছিল। বস্ত্র খুলিয়া ফেলিয়া সে অলসভাবে দুই বাহু তুলিয়া তাহার সোমলতার মতো উজ্জ্বল কেশজাল জড়াইতে লাগিল। তারপর শূকরদন্তের মতো বাঁকা তীক্ষ্ণাগ্র একটা ঝকঝকে অস্ত্র পরিত্যক্ত বস্ত্রের ভিতর হইতে তুলিয়া লইয়া চুলের মধ্যে গুঁজিয়া দিল।

এইরূপে কুণ্ডলিত কুন্তলভার সংবরণ করিয়া রুমা শিলাপট্টের উপর হইতে ঝুঁকিয়া বোধ করি জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিবার চেষ্টা করিল। তারপর হর্ষসূচক একটি শব্দ করিয়া জলের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল।

দুর্নিবার কৌতূহল ও লোভের বশবর্তী হইয়া আমি নিজের অজ্ঞাতসারেই গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। ইহারা যেদিন প্রথম আসে, সেদিন আমি যে শিলা-পৈঠার উপর বসিয়া ধনুকে গুণ সংযোগ করিতেছিলাম, গিরগিটির মতো গুঁড়ি মারিয়া সেই পৈঠার উপর উপস্থিত হইলাম। ইহার দশ হাত নিচেই জলের কুণ্ড। গলা বাড়াইয়া দেখিলাম রুমা আবক্ষ জলে ডুবাইয়া বসিয়া আছে এবং নিজের ভাষায় গুন-গুন করিয়া গান করিতেছে। স্বচ্ছ নির্মল জলের ভিতর হইতে তাহার দেহখানি পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। শীকরকণাস্পৃষ্ট চূর্ণকুন্তল বেষ্টিত মুখটি প্রস্ফুট জলপুষ্পের মতো দেখাইতেছে।

নির্নিমেষ-নয়নে এই নিভৃত স্নানরতার পানে কতক্ষণ চাহিয়া রহিলাম, বলিতে পারি

না। অগ্নিগর্ভ মেঘ আমার বুকের ভিতর গুরুগুরু করিতে লাগিল।

ক্রীড়াচ্ছলে দুই হাতে জল ছিটাইতে ছিটাইতে হঠাৎ এক সময় রুমা চোখ তুলিয়া চাহিল। তাহার গান ও হস্তসঞ্চালন একসঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল। আমার বুভুক্ষু ভীষণ চক্ষুর সহিত তাহার বিস্ফারিত ভীত চক্ষু কিছুক্ষণ আবদ্ধ হইয়া রহিল। তারপর অস্ফুট চিৎকার করিয়া সে জল হইতে উঠিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল।

এই সুযোগ! আমি আর দ্বিধা না করিয়া উপর হইতে জলে লাফাইয়া পড়িলাম। রুমা তখনও জল হইতে উঠিতে পারে নাই, জল-কন্যার মতো তাহার সিক্ত শীতল দেহ আমি দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলাম।

কিন্তু সিক্ত পিচ্ছিলতার জন্যই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না, সে তাহার দেহটিকে সংসর্পিত বিভঙ্গিত করিয়া আমার হাত ছাড়াইয়া লইল, তারপর বিদ্যুদ্বেগে তীরে উঠিয়া এক হস্তে ভূপাতিত বস্ত্র তুলিয়া লইয়া পশ্চাদ্দিকে একটা ভয়চকিত দৃষ্টি হানিয়া নিমেষমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

ব্যর্থ-মনোরথে নিজের গুহায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, নিম্নে ভীষণ গোলযোগ বাধিয়া গিয়াছে। অসংবৃতবস্ত্রা রুমা নারীগণের মধ্যে দাঁড়াইয়া উত্তেজিতভাবে কথা কহিতেছে এবং অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া উপরদিকে দেখাইতেছে। নারীগণ সমস্বরে কলরব করিতেছে। ইতিমধ্যে একদল পুরুষ ফিরিয়া আসিল। তাহারা রুমার বিবৃতি শুনিয়া তীর-ধনুক ও বল্লম হস্তে দলবদ্ধভাবে আমার গুহার দিকে উঠিতে আরম্ভ করিল।

এই স্থানে থাকা আর নিরাপদ নহে দেখিয়া আমি গুহা ছাড়িয়া পলায়ন করিলাম। গাছপালার আড়ালে লুকাইয়া, পাহাড়ের বন্ধুর পথ ধরিয়া বহুদূর দক্ষিণে উপস্থিত হইলাম। অতঃপর এতদূর পর্যন্ত কেহ আমার অনুসরণ করিবে না বুঝিয়া এক ঝোপের মধ্যে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম।

এইখানে বসিয়া চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ একটা কথা আমার মনে উদয় হইল। তীর-বিদ্ধের মতো আমি লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম—একথা এতদিন মনে হয় নাই কেন? শিরায় রক্ত নাচিয়া উঠিল, আমি দ্রুতপদে আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম।

আমাদের গ্রামের কিনারায় আসিয়া যখন পৌঁছিলাম, তখন গোধূলি আগতপ্রায়। দূর হইতে শুনিতে পাইলাম, ডাইনী বুড়ী রিক্‌খা গাহিতেছে—

"রাত্রে পাহাড়-দেবতার মুখে আগুন জ্বলে। কেউ দেখে না, শুধু আমি দেখি। দেবতা কি চায়? মানুষ চায়—মানুষের তাজা রক্ত চায়! এ জাত বাঁচবে না, এ জাত মরবে! দেবতা রক্ত চায়—জোয়ানের তাজা রক্ত! কে রক্ত দেবে—কে দেবতাকে খুশী করবে! এ জাত মরবে—মেয়ে নেই! এ জাত মরবে—দেবতা রক্ত চায়! হে দেবতা, খুশী হও, তোমার মুখের আগুন নিবিয়ে দাও! মেয়ে পাঠাও, মেয়ে পাঠাও!"...

রিক্‌খার গুহা গ্রামের এক প্রান্তে। চুপি চুপি পিছন হইতে গিয়া তাহার কানের কাছে বলিলাম, "রিক্‌খা, দেবতা তোর কথা শুনেছে—মেয়ে পাঠিয়েছে!"

রিক্‌খা চমকিয়া ফিরিয়া বলিল, "গাক্কা! তুই ফিরে এলি? ভেবেছিলাম, দেবতা তোকে নিয়েছে—কি বললি—আমার কথা দেবতা শুনেছে?"

"হ্যাঁ, শুনেছে। দেবতা অনেক মেয়ে পাঠিয়েছে।...শোন্ রিক্‌খা, গাঁয়ের ছেলেদের গিয়ে বল্ যে, পাহাড়-দেবতার মুখ থেকে একপাল মানুষ বেরিয়েছে—তাদের মধ্যে অর্ধেক মেয়ে। রাত্রে উপত্যকার ওধারে যেখানে আগুন জ্বলে, সেইখানে ওরা থাকে। মেয়েদের চেহারা ঠিক ঐ চাঁদের মতো,—নীল তাদের চোখ, চুলে আলো ঠিক্‌রে পড়ে। আমি দেখেছি। তুই ছেলেদের বল্, যদি বৌ চায় আমার সঙ্গে আসুক। আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো। আমাদের গাঁয়ে যত জোয়ান আছে, সবাইকে ডাক্। আজ রাত্তিরেই

আমরা পুরুষগুলোকে মেরে ফেলে মেয়েদের কেড়ে নেব!”

আকাশে খণ্ডচন্দ্র তখন অস্ত গিয়াছে। আমরা প্রায় দুই শত জোয়ান অন্ধকারে গা ঢাকিয়া নিঃশব্দে আগন্তুকদের গৃহপ্রাচীরের নিকটে উপস্থিত হইলাম। প্রাচীরের মধ্যে সকলে সুপ্ত—কোথাও শব্দ নাই। ধুনির আগুন জ্বলিয়া সূক্ষ্ম ভস্ম আবরণে ঢাকা পড়িয়াছে। তাহারই অস্ফুট আলোকে দেখিলাম, ছায়ামূর্তির মতো চারিজন প্রহরী সশস্ত্রভাবে প্রাচীরের বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বুঝিলাম, আজ দ্বিপ্রহরে আমাকে দেখিবার পর ইহারা সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছে।

পূর্ব হইতেই স্থির ছিল। আমরা চারিজন তীরন্দাজ এক একটি প্রহরীকে বাছিয়া লইলাম। একসঙ্গে চারিটি ধনুকে টংকারধ্বনি হইল—অন্ধকারে চারিটি তীর ছুটিয়া গেল। আমার তীর প্রহরীর কণ্ঠে প্রবেশ করিয়া অপর দিকে ফুঁড়িয়া বাহির হইল। নিঃশব্দে প্রহরী ভূপতিত হইল।

তারপর বিকট কোলাহল করিয়া সকলে প্রাচীর আক্রমণ করিল। নৈশ নিস্তব্ধতা সহসা শতধা ভিন্ন হইয়া গেল।

আমি জানিতাম ব্যূহের কোন্ দিকে রুমা শয়ন করে। আমি সেই দিকে গিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া দেখিলাম, ভিতরে সকলে জাগিয়া উঠিয়াছে, পুরুষগণ অস্ত্র লইয়া ব্যূহ-প্রাচীরের দিকে ছুটিতেছে। একজন পুরুষ দীর্ঘ বল্লম-আঘাতে অগ্নির ভস্মাচ্ছাদন দূর করিয়া দিল, অমনই লেলিহান আরক্তচ্ছটায় দিক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিবার পর রুমাকে যখন দেখিতে পাইলাম, তখন সে সদ্য নিদ্রা হইতে উঠিয়া হতবুদ্ধির মতো ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছে, তাহার চারিপাশে সদ্যো-ত্থিতা নারীগণ আর্ত-ক্রন্দন করিতেছে। আমি লাফাইয়া গিয়া রুমার উপর পড়িলাম, তাহাকে দুই হাতে তুলিয়া লইয়া কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিলাম। কয়েক পদ যাইতে না-যাইতে দেখিলাম, একজন পুরুষ শাণিত দীর্ঘ অস্ত্র উত্তোলিত করিয়া আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। রুমাকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া আমি ক্ষিপ্রহস্তে মাটি হইতে একখণ্ড পাথর তুলিয়া লইয়া তাহাকে ছুঁড়িয়া মারিলাম। মস্তকে আঘাত লাগিয়া সে মৃতবৎ পড়িয়া গেল। রুমা চিৎকার করিয়া উঠিল। আমি আবার তাহাকে কাঁধে ফেলিয়া ছুটিলাম।

আমাদের দলের অন্য সকলে তখন প্রাচীর ডিঙাইয়া ভিতরে ঢুকিয়াছে—ব্যূহের কেন্দ্রস্থলে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে। দুই পক্ষেরই মানুষ পড়িতেছে, মরিতেছে—কেহ আহত হইয়া বিকট কাতরোক্তি করিতেছে। আমি দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম সেখানে জীবিত কেহ নাই, কয়েকটি রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়িয়া আছে। দ্বার অতিক্রম করিতে যাইতেছি, এমন সময় রুমা সহসা যেন মোহনিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল। নিজের কেশের মধ্যে হাত দিয়া সেই উজ্জ্বল বাঁকা অস্ত্রটা বাহির করিল, তারপর ক্ষিপ্তের মতো চিৎকার করিয়া আমার কপালের পাশে সজোরে বসাইয়া দিল।

কপাল হইতে ফিন্কি দিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। আমি আবার তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিলাম। তাহার হাত হইতে অস্ত্রটা কাড়িয়া লইয়া তাহাকে নির্দয়ভাবে মাটিতে চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, “তুই আমার বৌ! তুই আমার রুমা! এই রক্ত দিয়ে আমি তোকে আমার করে নিলাম!”—বলিয়া আমার ললাটস্রুত রক্ত হাতে করিয়া তাহার কপালে চুলে মাখাইয়া দিলাম।

ওদিকে তখন যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে—বিপক্ষ দলের একটি পুরুষও জীবিত নাই।

আমাদের দলের যাহারা বাঁচিয়া আছে, তাহারা রক্তলিপ্ত দেহে উন্মত্ত গর্জন করিয়া নারীদের অভিমুখে ছুটিয়াছে।

৫ শ্রাবণ ১৩৩৯

অষ্টম সর্গ

সেদিন সন্ধ্যার আকাশে দ্রুত সঞ্চরমান মেঘের দল শিপ্রার বর্ষাস্ফীত বক্ষে ধূমল ছায়া ফেলিয়া চলিয়াছিল। বৃষ্টি পড়িতেছে না বটে, কিন্তু পশ্চিম হইতে খর আর্দ্র বায়ু বহিতেছে—শীঘ্রই বৃষ্টি নামিবে। ছিন্ন ধাবমান মেঘের আড়ালে পঞ্চমীর চন্দ্রকলা মাঝে মাঝে দেখা যাইতেছে—যেন মহাকালের করচ্যুত বিষাণ খসিয়া পড়িতেছে, এখনই দিগন্তরালে অদৃশ্য হইবে।

শিপ্রার পূর্বতটে উজ্জয়িনীর পাষাণ-নির্মিত বিস্তৃত ঘাট। ঘাটের অসংখ্য সোপান বহু ঊর্ধ্ব হইতে ধাপে ধাপে নামিয়া শিপ্রার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে, ক্ষিপ্র জল-ধারা এই পাষাণ প্রতিবন্ধকে আছাড়িয়া পড়িয়া আবর্ত সৃষ্টি করিয়া বহিয়া যাইতেছে। কিন্তু শূন্য ঘাটে আজ শিপ্রার আক্ষেপোক্তি শুনিবার কেহ নাই।

ঘাট নির্জন। অন্যদিন এই সময় বহু স্নানার্থিনীর ভিড় লাগিয়া থাকে; তাহাদের কলহাস্য ও কঙ্কণকিঙ্কিণী মুখর ভাবে শিপ্রাকে উপহাস করিতে থাকে; তাহাদের ঘটোচ্ছলিত জল মসৃণ সোপানকে পিচ্ছিল করিয়া তোলে। আজ কিন্তু ভিড় নাই। মাঝে মাঝে দুই একটি তরুণী বধূ আকাশের দিকে সশঙ্ক দৃষ্টি হানিয়া ঘট ভরিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিতেছে। ক্বচিৎ এক ঝাঁক কিশোরী বয়স্যা মঞ্জীর বাজাইয়া গাগরী ভরিতে আসিতেছে; তাহারাও অল্পকাল জলক্রীড়া করিয়া পূর্ণঘট-কক্ষে চঞ্চল-চরণে সোপান আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিতেছে। নির্জন ঘাটে সন্ধ্যার ছায়া আরও ঘনীভূত হইতেছে।

ঘাট নির্জন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ জনশূন্য নহে। একটি পুরুষ নিম্নতর সোপানের এক প্রান্তে চিন্তামগ্ন ভাবে নীরবে বসিয়া আছেন। পুরুষের বয়স বোধ হয় পঁয়ত্রিশ কিম্বা ছত্রিশ বৎসর হইবে।—যৌবনের মধ্যাহ্ন। দেহের বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়, মস্তক মুণ্ডিত, স্কন্ধে উপবীত, ললাটে শ্বেত চন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক। মেঘাচ্ছন্ন প্রাবৃট-সন্ধ্যার স্বল্পালোকেও তাঁহার খড়্গের ন্যায় তীক্ষ্ণ নাসা ও আয়ত উজ্জ্বল চক্ষু স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। তিনি কখনও আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, কখনও উদ্বেল-যৌবনা নদীর তরঙ্গ-ভঙ্গ নিরীক্ষণ করিতেছেন, কখনও ক্রীড়া-চপলা তরুণীদের রহস্যালাপ

শ্রবণ করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।

কিন্তু তাঁহার মুখ চিন্তাক্রান্ত। গত দুইদিন হইতে একটি দুরূহ সমস্যা কিছুতেই তিনি ভঞ্জন করিতে পারিতেছেন না। অলঙ্কারশাস্ত্র ঘাঁটিয়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রশ্নের উত্তর কোথাও পাওয়া যায় নাই। এদিকে মহারাজ অবন্তীপতি ও সভাস্থ রসিক-মণ্ডলী সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। ঘরে গৃহিণী তাঁহার ঔদাস্য ও অন্যমনস্কতায় সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিতেছেন। নানা দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় এই মধুর আষাঢ় মাসেও রাত্রিতে নিদ্রা নাই!

কয়েকটি যুবতী এই সময় মঞ্জীর-ঝঙ্কারে অমৃতবৃষ্টি করিয়া সোপানশীর্ষ হইতে জলের ধারে নামিয়া আসিল। পুরুষকে কেহ লক্ষ্য করিল না—উত্তরীয় কলস নামাইয়া রাখিয়া জলে অবতরণ করিল; কৌতুক-সরস আলাপ করিতে করিতে পরস্পরের দেহে জল ছিটাইতে লাগিল। পুরুষ একবার সচকিতে তাহাদের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া নত-মুখে তাহাদের আলাপের ছিন্নাংশ শুনিতে লাগিলেন।

'কাল তোর বর দেশে ফিরিয়াছে—না? তাই—'

সমুচ্চ কলহাস্যে বাকী কথাগুলি চাপা পড়িয়া গেল।

'কি ভাই? কি হইয়াছে ভাই?'

'তুই আইবুড় মেয়ে—আমাদের সঙ্গে মিশবি কেন লা? তোকে কিছু বলিব না।'

'আহা বল্ বল্—ওর তো এই মাসেই বর আসিবে—ও এখন আমাদের দলে।...'

'মধু, মোম, কুঙ্কুম আর ইঙ্গুদী-তৈল মিশাইয়া ঠোঁটে লাগাস্—আর কোন ভয় থাকিবে না। সেই সঙ্গে একটু কেয়ার রেণুও দিতে পারিস্, কিন্তু খুব সামান্য...'

'ওলো দ্যাখ্ দ্যাখ্, কপোতিকার কি দশা হইয়াছে...'

পুরুষ আড়নয়নে দেখিলেন, কপোতিকা তাড়াতাড়ি আবক্ষ জলে ডুবাইয়া বসিল।

'...লোলার কি দুঃখ ভাই! তাহার স্বামী আজিও ফিরিল না—কে জানে হয়তো—যবদ্বীপ কতদূর ভাই?'

'সিংহল পার হইয়া যাইতে হয়—ছয় মাসের পথ—লোলার জন্য বড় দুঃখ হয়—আমাদের সঙ্গে আসে না—'

'—দ্যাখ, মেঘগুলা আজ পূর্বমুখে ছুটিয়াছে—'

'—হ্যাঁ। এ মেঘ অলকায় যাইবে না।'

পুরুষ কর্ণ উদ্যত করিয়া শুনিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আর অধিক শুনিতে পাইলেন না। যুবতীরা গাত্র মার্জনা সমাপন করিয়া তীরে উঠিল।

এই যুবতীযূথের মধ্যে একটিকে পুরুষ চিনিতেন। তাহারা বস্ত্র-পরিবর্তন সমাপ্ত করিলে তিনি ডাকিলেন—'ময়ূরিকে, তোমরা একবার এদিকে শুনিয়া যাও।'

চমকিত হইয়া সকলে মুখ ফিরাইল। বোধকরি একটু লজ্জাও হইল। তাই উত্তরীয় দ্বারা তাড়াতাড়ি অঙ্গ আবৃত করিয়া ফেলিল।

ময়ূরিকা নিম্নকণ্ঠে পুরুষের নাম উচ্চারণ করিল, নিমেষের মধ্যে চোখে চোখে একটা উত্তেজিত ইঙ্গিত খেলিয়া গেল। তারপর সকলে সংযতভাবে পুরুষের সমীপবর্তী হইয়া দাঁড়াইল।

ময়ূরিকা যুক্তকরে প্রণাম করিয়া বলিল—'ভট্ট, আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন।'

ভট্ট স্মিতমুখে আশীর্বাদ করিলেন—'আয়ুষ্মতী হও। তোমরা এতক্ষণ কি কথা কহিতেছিলে?'

সকলে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। যে সকল কথা হইতেছিল, তাহা পুরুষকে, বিশেষতঃ ভট্টকে কি করিয়া বলা যাইতে পারে?

মঞ্জরিকা ইহাদের মধ্যে ঈষৎ প্রগল্‌ভা, সে-ই উত্তর দিল। কৌতুক-চঞ্চল-দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—'ভট্ট, আজ আকাশের মেঘদল পূর্বদিকে চলিয়াছে। উত্তরে অলকাপুরীতে পৌঁছিতে পারিবে না, তাই আমরা আক্ষেপ করিতেছিলাম।'

ভট্ট জিজ্ঞাসা করিলেন—'সে জন্য আক্ষেপ কেন?'

মঞ্জরিকা বলিল—'যক্ষপত্নী বিরহ-বেদনায় কালযাপন করিতেছেন, যক্ষের সংবাদ পাইবেন না,—এই জন্য আক্ষেপ।'

এতক্ষণে যেন বুঝিতে পারিয়াছেন এমনিভাবে ভট্ট বলিলেন—'বুঝিয়াছি। তোমরা মেঘদূত কাব্যের কথা বলিতেছ। ভাল, তোমরা দেখিতেছি কাব্যশাস্ত্রে সুচতুরা। আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পার?'

সকলে যুক্তকরে বলিল,—'আজ্ঞা করুন।'

ভট্ট চিন্তা করিলেন; পরে শিরঃসঞ্চালন করিয়া কহিলেন—'না, সে বড় কঠিন প্রশ্ন, তোমরা পারিবে না।'

মঞ্জরিকা অনুনয় করিয়া বলিল—'তবু আজ্ঞা করুন আর্য।'

ভট্ট সকলের চক্ষে অধীর কৌতূহল লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'উত্তম, বলিতেছি শুনুন। —তোমরা বলিতে পার, কাব্যে নায়ক-নায়িকার বিবাহ সম্পাদিত হইবার পর কবির আর কিছু বক্তব্য থাকে কিনা?'

সকলে বিস্মিতভাবে নীরব রহিল; ভট্ট যে তাহাদের মত অপরিণত-বুদ্ধি যুবতীদের নিকট কাব্যশাস্ত্র সম্বন্ধীয় এরূপ প্রশ্ন করিবেন, তাহা যেন সহসা ধারণা করিতেই পারিল না।

শেষে ময়ূরিকা বলিল—'আর্য, নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটিলেই তো কাব্য শেষ হইল! তাহার পর কবির আর কি বক্তব্য থাকিতে পারে?'

ভট্ট বলিলেন—'ময়ূরিকে, আমি মিলনের কথা বলি নাই, বিবাহের কথা বলিয়াছি।'

বিস্মিতা মঞ্জরিকা বলিল—'উভয়ই এক নহে কি?'

ভট্ট গূঢ় হাসিয়া বলিলেন—'উহাই তো প্রশ্ন।'

ভট্টের কথার মর্ম কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না, সকলে নির্বাক হইয়া রহিল। ভট্ট ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চিন্তিতভাবে রহিলেন।

অবশেষে অরুণিকা কথা কহিল। সে ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা চতুরা, এতক্ষণ কথা বলে নাই, এবার মুখ টিপিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'ভট্ট, এ প্রশ্নটি কখনও ভট্টিনীর নিকট করিয়াছিলেন কি?'

ভট্ট চমকিয়া মুখ তুলিলেন। দেখিলেন অরুণিকার অরুণ ওষ্ঠপ্রান্তে একটু চাপা হাসি খেলা করিতেছে। তিনি ঈষৎ বিব্রতভাবে বলিলেন—'না, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই, স্মরণ ছিল না। আজ গৃহে ফিরিয়াই জিজ্ঞাসা করিব।—কিন্তু তোমরা আর বিলম্ব করিও না, এবার গৃহে যাও। রাত্রি আগতপ্রায়।'

বক্রোক্তিটা সকলের কানে পৌঁছিল না; শুধু অরুণিকা বুঝিল, ভট্ট মৃদু রকমের প্রতিশোধ লইলেন। সকলে যুক্তহস্তা হইয়া বলিল—'আর্য, আমাদের আশীর্বাদ করুন।'

ভট্ট হাসিলেন—'তোমাদের আমি আর কি আশীর্বাদ করিব? আমি শঙ্করের দাস —অথচ স্বয়ং শঙ্করারি তোমাদের সহায়। ভাল, আশীর্বাদ করিতেছি—' মুহূর্ত-কাল নীরব থাকিয়া জলদগম্ভীর-কণ্ঠে কহিলেন, 'মাভূদেবং ক্ষণমপি চ তে স্বামিনা বিপ্রয়োগঃ।'

সকলে কপোতহস্তে আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া শিরোধার্য করিল! তার পর প্রফুল্ল মনে প্রীতিবিম্বিমুখে শ্রোণি-কলস-ভার-মন্থর পদে প্রস্থান করিল।

ভট্ট বসিয়া রহিলেন। যুবতীদের নূপুরনিক্কণ ক্রমে শ্রুতি-বহির্ভূত হইয়া গেল।

তখন আবার তাঁহার মুখ চিন্তাচ্ছন্ন হইল। কি করা যায়? এ প্রশ্নের কি সমাধান নাই? তীরে আসিয়া শেষে তরী ডুবিবে? অবশ্য এ কথা সত্য যে, নায়ক-নায়িকার বিবাহ দিবার পর কবির কর্তব্য শেষ হয়। কিন্তু তবু তাঁহার মন সন্তোষ মানিতেছে না কেন? কাব্য তো শেষ হইয়াছে;—আর এক পদ অগ্রসর হইলে প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘন হইবে, যাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন তাহার অতিরিক্ত কথা বলা হইবে। তাহা করিবার প্রয়োজন কি? নায়িকার মুখে সলজ্জ হাসি ফুটাইয়া বিদায় লওয়াই তো কবির উচিত; আর সেখানে থাকিলে যে রসভঙ্গ হইবে। সবই ভট্ট বুঝিতেছেন, তবু তাঁহার মন উঠিতেছে না। কেবলি মনে হইতেছে— এ হইল না, কাব্য শেষ হইল না, চরম কথাটি বলা হইল না।

এদিকে রাত্রি মেঘের ধূসর পক্ষে আশ্রয় করিয়া দ্রুত অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সন্ধ্যা-আহ্নিকও হয় নাই—মন বিক্ষিপ্ত! ভট্ট উঠিবার চেষ্টা করিয়া চারিদিকে চাহিলেন। দেখিলেন, কলস-কক্ষে একটি তরুণী নিঃশব্দে নামিয়া আসিতেছে। তাহার গতিভঙ্গীতে এমন কিছু ছিল—যাহা দেখিয়া ভট্ট উঠিতে পারিলেন না, আবার বসিয়া পড়িলেন।

তরুণী ধীরে ধীরে কলস নামাইয়া সোপানের শেষ পৈঠায় আসিয়া বসিল। কোনও দিকে লক্ষ্য করিল না, বিষণ্ণ ব্যথিত চক্ষু দুটি তুলিয়া যেখানে শিপ্রার স্রোত দূরে বাঁকের মুখে অদৃশ্য হইয়াছে, সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

ভট্ট দেখিলেন—রমণীর দেহে সৌভাগ্যের চিহ্ন ব্যতীত অন্য কোনও অলঙ্কার নাই। রুক্ষকেশের রাশি একটা-মাত্র বেণীতে আবদ্ধ হইয়া অংসের উপর পড়িয়া আছে, শুষ্ক অশ্রুহীন চোখে কজ্জল নাই।

এই নীরব শোকপরায়ণা একবেণীধরা যুবতীকে ভট্ট বালিকা-বয়সে চিনিতেন। সম্প্রতি বহুদিন দেখেন নাই। তাঁহার চক্ষে জল আসিল, কিন্তু বক্ষে আনন্দের ক্ষণপ্রভাও খেলিয়া গেল। তিনি ডাকিলেন—'লোলা!'

তন্দ্রাহতের ন্যায় যুবতী ফিরিয়া চাহিল। ভট্টকে দেখিয়া সলজ্জে উত্তরীয় দ্বারা অঙ্গ আবৃত করিয়া সংকোচ-জড়িত-পদে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ভট্টের চক্ষু বড় তীক্ষ্ণ, বস্ত্র ভেদ করিয়া দেহ ও দেহ ভেদ করিয়া মনের অন্তরতম কথাটি দেখিয়া লয়। লোলা কুণ্ঠিত নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

ভট্ট জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি রৈবতক নাবিকের বধূ?'

লোলা হেঁটমুখে রহিল, উত্তর করিল না। তাহার অধর কাঁপিতে লাগিল।

ভট্ট পুনরায় বলিলেন—'তোমার স্বামী শ্রেষ্ঠী বরুণমিত্রকে লইয়া গত বৎসর যব-দ্বীপে গিয়াছে—আজিও ফিরে নাই?'

লোলার চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। সে কেবল মাথা নাড়িল।

ভট্ট সুস্মিত মুখে বলিলেন—'তুমি ভয় করিও না, রৈবতক কুশলে আছে।'

ব্যাকুল নয়নে লোলা ভট্টের মুখের দিকে চাহিল। তাহার দৃষ্টির কাতর বিহ্বল প্রশ্ন ভট্টের বক্ষে সূচীবেধবৎ বিঁধিল। তিনি লজ্জিত হইলেন—ছি, ছি, এতক্ষণ এই বালিকার আকুল আশঙ্কা লইয়া তিনি খেলা করিতেছিলেন!

অনুতপ্তস্বরে বলিলেন—'আজ রাজসভায় সংবাদ আসিয়াছে—রৈবতক সমস্ত নৌকা লইয়া সমুদ্র-সঙ্গমে ফিরিয়াছে! দুই এক দিনের মধ্যেই গৃহে ফিরিবে। তুমি নিশ্চিন্ত হও।'

থরথর কাঁপিয়া লোলা সেইখানেই বসিয়া পড়িল। তারপর গলদশ্রুনেত্রে গলবস্ত্র হইয়া ভট্টকে প্রণাম করিল, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—'দেব, আপনি আজ অভাগিনীর প্রাণ দিলেন। মহাকাল আপনাকে জয়যুক্ত করুন।' উদ্গত অশ্রু সম্বরণ করিয়া জিজ্ঞাসা

করিল—'আজ সংবাদ আসিয়াছে?'

'হ্যাঁ।'

'সকলে নিরাপদে আছেন?'

'হ্যাঁ, সকলেই নিরাপদে আছেন।—লোলা, তুমি অনুপমা। রৈবতক আসিলে তাহাকে আমার কাছে পাঠাইয়া দিও, তাহাকে তোমার কথা বলিব।'

অশ্রু মার্জনা করিয়া লোলা সিক্ত হাসি হাসিল, অস্ফুটস্বরে বলিল—'যে আজ্ঞা।'

এতক্ষণে শীকরকণার ন্যায় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, বায়ু-তাড়িত জলকণা তির্যকভাবে ভট্টের মুখে পড়িতে লাগিল। তিনি উঠিলেন, সস্নেহস্বরে লোলাকে বলিলেন—'লোলা, দুঃখের অন্তেই মিলন মধুর হয়। আমার উমাকে আমি যে দুঃখ দিয়াছি তাহা স্মরণ করিলেও বক্ষ বিদীর্ণ হয়; কিন্তু চরমে সে ঈপ্সিত বর লাভ করিয়াছে। মদন পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে।—তুমিও আমার গৌরীর ন্যায় সুভগা। তোমার জীবনেও মদন পুনরুজ্জীবিত হইবেন। কল্য তাঁহার মন্দিরে পূজা পাঠাইও।'

লোলা কৃতাঞ্জলি হইয়া বসিয়া রহিল, ভট্টের সকল কথা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু অপরিমিত সুখাবেশে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ভট্ট সহাস্যে তাহার মস্তকে একবার হস্তার্পণ করিয়া ত্বরিত পদে সোপান অতিবাহিত করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ঘাট হইতে পথে অবতীর্ণ হইয়া তিনি দেখিলেন, পথ পিচ্ছিল, কর্দমপূর্ণ। সম্মুখেই মহাকালের কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্মিত গগনভেদী মন্দির মেঘলোকে চূড়া তুলিয়া আছে। ভট্ট সেইদিকে অগ্রসর হইতেই মন্দির-অভ্যন্তর হইতে ঘোর রবে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সন্ধ্যা-রতির কাল উপস্থিত। মন্দিরের অঙ্গনে বহু লোক আরতি দেখিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। ভট্ট ভিতরে প্রবেশ করিলেন না, বাহির হইতে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ইষ্টদেবতাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। শঙ্খ-ঘণ্টার রোল চলিতে লাগিল; কালাগুরু ধূপ ও গুগ্-গুলের গন্ধ চারিদিকের বায়ুকে সৌরভে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল।

আরতি শেষ হইলে ভট্ট আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। অন্ধকার আকাশ হইতে সূক্ষ্ম বারিপতন হইতেছে—রাজপথে লোক নাই। এখন রাত্রি হইয়াছে, অথচ পাষাণ-বনদেবীর হস্তে পথদীপ জ্বলে নাই; মধ্যরাত্রির পূর্বে বনদেবীগণ প্রদীপহস্তা হইবেন না। পথিপার্শ্বের সুবৃহৎ অট্টালিকা-সমূহে বর্তিকা জ্বলিতেছে বটে, কিন্তু তাহা অভ্যন্তর মাত্র আলোকিত করিয়াছে; ক্কচিৎ নাগরিকদিগের বিলাস-কক্ষের মুক্ত গবাক্ষ-পথে আলোক-রশ্মি ও জাতী কদম্ব কেতকী যূথীর মিশ্র গন্ধ নির্গত হইয়া পথচারীকে গৃহের জন্য উন্মনা করিয়া তুলিতেছে। ভট্ট এই ঈষদালোকিত কর্দম-পিচ্ছিল পুষ্প-সুবাসিত পথ দিয়া সাবধানে চলিতে লাগিলেন।

উজ্জয়িনীর পথ অতিশয় সংকীর্ণ, কোন মতে দুইটি রথ বা প্রবহন পাশাপাশি চলিতে পারে। পথ ঋজু নহে, সংসর্পিত হইয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া বহু শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। ভট্ট হেঁটমুণ্ডে গৃহাভিমুখে চলিতে চলিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন—কোনও দিকে লক্ষ্য ছিল না; সহসা একটা মোড় ঘুরিয়া সম্মুখে দীপো-দ্ভাসিত প্রাসাদ-তোরণ দেখিয়া তাঁহার চমক ভাঙিল।

তোরণের পশ্চাতে প্রাসাদ, সেখানেও দীপোৎসব। তোরণ-সম্মুখে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির রথ, দোলা, যানবাহন যাতায়াত করিতেছে। প্রাসাদের অভ্যন্তর হইতে সঙ্গীতের সুমিষ্ট ধ্বনি কানে আসিতেছে। ভট্টের স্মরণ হইল, আজ প্রিয়দর্শিকার গৃহে সমাপানক। স্বয়ং মহামাণ্ডলিক অবন্তীপতি এই সমাপানকে যোগদান করিবেন বলিয়াছেন। ভট্টেরও নিমন্ত্রণ আছে।

ভট্টের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কি আশ্চর্য! এ কথাটা তাঁহার এতক্ষণ মনে

হয় নাই কেন? তাঁহার নিদারুণ সমস্যার যদি কেহ সমাধান করিতে পারে তো সে ঐ মহাবিদুষী চতুঃষষ্টিকলার পারংগতা অলোকসামান্যা বারবধূ প্রিয়দর্শিকা। তাহার মত সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা অবন্তী-রাজ্যে অন্য কে আছে? সত্য কথা বলিতে কি, তাঁহার কাব্যের নিগূঢ় রস ও ব্যঙ্গোক্তি প্রিয়দর্শিকা যতটা বুঝিবে, এত আর কেহ বুঝিবে না। সে সামান্যা রূপোপজীবিনী নহে—রাজ্যের বারমুখ্যা। স্বয়ং আর্যাবর্তের অধীশ্বর বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীতে পদার্পণ করিয়াই প্রিয়দর্শিকাকে স্মরণ করেন; শুধু তাহার অলৌকিক রূপযৌবনের জন্য নহে, তাহার অশেষ গুণাবলীর জন্য তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করেন। সেই প্রিয়দর্শিকার গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়াও তিনি এতক্ষণ ভুলিয়া ছিলেন? ভট্ট সহর্ষে তোরণ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

কিন্তু তোরণের সমীপবর্তী হইয়া ভট্টের মুখে ঈষৎ উদ্বেগের ছায়া পড়িল। গৃহে ভট্টিনী প্রতীক্ষা করিয়া আছেন; তিনি এসব পছন্দ করেন না। বিশেষতঃ প্রিয়দর্শিকাকে তিনি ঘোর সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন। দেশে নিন্দুকের অভাব নাই, ভট্টের সহিত প্রিয়-দর্শিকার গুপ্ত প্রণয়ের একটা জনশ্রুতি ভট্টিনীর কানে উঠিয়াছে। তদবধি প্রিয়-দর্শিকার নাম শুনিলেই তিনি জ্বলিয়া যান। সুতরাং গণ্ডের উপর পিণ্ডের ন্যায় আজ যদি ভট্ট প্রিয়দর্শিকার গৃহে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত যাপন করেন, তাহা হইলে আর রক্ষা থাকিবে না।

তোরণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভট্ট ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া তোরণপালিকা কিঙ্করীগণ কলকণ্ঠে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিল—'আসুন কবীন্দ্র! স্বাগত! আসুন পণ্ডিতবর, আর্যা প্রিয়দর্শিকা আপনার জন্য অধীরভাবে প্রতীক্ষা করিতেছেন। আসুন মহাভাগ, আপনার অভাবে নবরত্নমালিকা আজ মধ্যমণিহীন। স্বাগত! শুভাগত!'

দাসীগণ সকলেই যৌবনবতী, রসিকা ও সুন্দরী। তাহাদের কাহারও হস্তে পুষ্প-মালা, কাহারও হস্তে জলপূর্ণ ভৃঙ্গার, কেহ বা সুগন্ধি দ্রব্যপূর্ণ স্থালী লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা সকল অতিথিকেই মহা সম্মানপূর্বক স্বাগত-সম্ভাষণ করিতেছে; কিন্তু কবিকে দেখিয়া তাহারা যেরূপ সমস্বরে সাহ্লাদে আহ্বান করিল, তাহাতে কবি আর দ্বিধা করিতে পারিলেন না। গৃহের চিন্তা মন হইতে অপসারিত করিয়া হাস্যমুখে তোরণ-পথে প্রবেশ করিলেন।

মর্মর-পট্টের উপর পদার্পণ করিবামাত্র একটি দাসী ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার চরণে জল ঢালিয়া দিতে লাগিল, অন্য একজন নতজানু হইয়া বসিয়া পদ প্রক্ষালন করিয়া দিল। তৃতীয় দাসী শুভ্র কার্পাস বস্ত্র দিয়া পা মুছাইয়া দিল। কবিকে উজ্জয়িনীর নাগ-রিক-নাগরিকা যেরূপ ভালবাসিত, এরূপ আর কাহাকেও বাসিত না। তাই তাঁহার সেবা করিবার সৌভাগ্যের জন্য দাসীদের মধ্যে হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল।

গন্ধদ্রব্যের স্থালী হস্তে দাসী কবির সম্মুখে দাঁড়াইতেই তিনি অঙ্গুলির প্রান্ত চন্দনে ডুবাইয়া সকৌতুকে তাহার ভ্রূমধ্যে তিলক পরাইয়া দিলেন। সকলে আহ্লাদে হাস্য করিয়া উঠিল। যাহার হাতে পুষ্পমাল্য ছিল, সে আসিয়া তাড়াতাড়ি কবির গলায় যূথীর একটি স্থূল মালা পরাইয়া দিল। কবি তাহাকে ধরিয়া বলিলেন—'সুলোচনে, এ কি করিলে? তুমি আমার গলায় মালা দিলে?'

সুলোচনাও বাক্যবিন্যাসে কম নহে, সে কুটিল হাসিয়া উত্তর করিল—'কবিবর, এখানে আমরা সকলেই আর্যা প্রিয়দর্শিকার প্রতিনিধি।'

মুখের মত উত্তর পাইয়া কবি হাসিতে হাসিতে প্রাসাদ অভিমুখে চলিলেন। উদ্যানের মধ্য দিয়া শ্বেত প্রস্তরের পথ, তাহার দুইধারে ধ্যানাসীন মহাদেবের মূর্তি। মূর্তির শীর্ষস্থ জটাজাল হইতে সুগন্ধি বারি উৎসের ন্যায় নিক্ষিপ্ত হইতেছে।

প্রথম মহল নৃত্যশালা। সেখানে প্রবেশ করিয়া কবি দেখিলেন তরুণ নাগরিকদের

সভা বসিয়া গিয়াছে। মধ্যস্থলে নর্তকী বাহুবল্লরী বিলোলিত করিয়া অপাঙ্গে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিয়া কেয়ূর-কিঙ্কিণী মঞ্জীর-শিঞ্জনে অপূর্ব সম্মোহন সৃষ্টি করিয়া রাগ-দীপক নৃত্যে অপ্সরোলোকের ভ্রান্তি বহিয়া আনিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে নিপুণ চরণ-নিক্ষেপের তালে তালে মৃদঙ্গ ও সপ্তস্বরা বাজিতেছে। মৃদঙ্গীর চক্ষু নর্তকীর চরণে নিবদ্ধ; বীণা-বাদকের ললাটে ভ্রূকুটি, চক্ষু মুদিত। অন্য সকলে নর্তকীর অপরূপ লীলা-বিভ্রম দেখিতেছে। সকলেই গুণী রসজ্ঞ—কলা-সঙ্গত বিশুদ্ধ নৃত্য দেখিতে দেখিতে তাহাদের চক্ষু ভাবাতুর। কেহ নড়িতেছে না, মূর্তির মত বসিয়া দেখিতেছে।

কবি কিছুক্ষণ বসিয়া দেখিলেন, তার পর নিঃশব্দে কক্ষ হইতে নির্গত হইলেন। দ্বিতীয় প্রাসাদ নৃত্যশালার সংলগ্ন, মধ্যে একটি অলিন্দের ব্যবধান। সেখানে গিয়া কবি দেখিলেন, কথা-কাহিনীর আসর বসিয়াছে। বক্তা স্বয়ং বেতালভট্ট। তিনি মণিকুট্টিমের মধ্যস্থলে শঙ্খরচিত কমলাসনে বসিয়াছেন, তাঁহাকে ঘিরিয়া বহু নাগরিক-নাগরিকা কর-তলে চিবুক রাখিয়া অবহিত হইয়া শুনিতেছে। চষকহস্তা কিঙ্করীগণ পূর্ণ পানপাত্র সম্মুখে ধরিতেছে, কিন্তু কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। কিঙ্করীরাও পাত্র হস্তে চিত্রার্পিতার ন্যায় গল্প শুনিতেছে।

বেতালভট্ট গম্ভীর কণ্ঠে কহিতেছেন—'পিশাচ অট্ট অট্ট হাস্য করিল; কহিল, মহা-রাজ, এই শ্মশানভূমির উপর আপনার কোনও অধিকার নাই, ইহা আমার রাজ্য। ঐ যে নরমেদঃ-শোণিতলিপ্ত মহাশূল মশানের মধ্যস্থলে প্রোথিত দেখিতেছেন, উহাই আমার রাজদণ্ড।'

কবি আর সেখানে দাঁড়াইলেন, না, হাস্য গোপন করিয়া চুপিচুপি নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যাইবার পূর্বে সকলের মুখ একবার ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া লইলেন, কিন্তু প্রিয়দর্শিকাকে শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে দেখিতে পাইলেন না।

তৃতীয় প্রাসাদটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সুরম্য। সভার ন্যায় সুবিশাল কক্ষ, তাহার চারিদিকে বহুবিধ আসন ও শয্যা বিস্তৃত রহিয়াছে, কেন্দ্রস্থলের মর্মর-কুট্টিম অনাবৃত: তাহার উপর মণিময় অক্ষবাট অঙ্কিত রহিয়াছে। ছাদ হইতে সুবর্ণ শৃঙ্খলে অগণিত দীপ দুলিতেছে, কক্ষ-প্রাচীরে সারি সারি দীপ, উপরন্তু হর্ম্যতলে স্থানে স্থানে স্বর্ণ-দণ্ডের শীর্ষে সুগন্ধি বর্তিকা জ্বলিতেছে। কক্ষের কোথাও লেশমাত্র অন্ধকার নাই। এই কক্ষের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া কবির মনে হইল, কক্ষে বুঝি কেহ নাই—এত বিশাল এই কক্ষ যে সেখানে প্রায় ত্রিশজন লোক থাকা সত্ত্বেও উহা শূন্য মনে হইতেছে। সখী ও পরিচারিকাগণ ছায়ার মত গমনাগমন করিতেছে; তাহাদের নূপুরগুঞ্জনও যেন মৃদু ও অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ঘরের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া কবি দেখিলেন, মহারাজ অবন্তীশ্বর বররুচির সহিত অক্ষ-ক্রীড়ায় বসিয়াছেন। তাঁহাদের একপার্শ্বে রত্নখচিত সুরাভৃঙ্গার ও চষক, অন্য পার্শ্বে তাম্বুল-করঙ্ক। দুইজনেই খেলায় নিমগ্ন। কবি গিয়া দাঁড়াইতেই মহারাজ অন্যমনস্ক ভাবে চক্ষু তুলিয়া পাশ্টি ঘষিতে ঘষিতে বলিলেন—'কালিদাস? এস বন্ধু, আমার সহায় হও। বররুচি আমার অঙ্গদ জিতিয়া লইয়াছে—এবার কঙ্কণ পণ—' বলিয়া পাশ্টি ফেলিলেন। গজদন্তের পাশ্টিতে মরকতের অক্ষি আলোকসম্পাতে ঝলসিয়া উঠিল।

রাজার আহ্বানে কালিদাস বসিলেন। অন্যদিন হইলে নিমেষমধ্যে তিনিও খেলায় মাতিয়া উঠিতেন; কিন্তু আজ তাঁহার মন লাগিল না। বিশেষ ইঁহারা দুইজনেই খেলায় এত একাগ্র যে, মাঝে মাঝে সুরাপাত্র নিঃশেষ করা ব্যতীত আর কোনও দিকে মন দিতে পারিতেছেন না। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কালিদাস উঠিলেন; ঘরের চারিদিকে দৃষ্টিপাত

করিতে করিতে দেখিলেন, দূরে নীল পক্ষ্মল চীনাংশুকের আস্তরণের উপর প্রিয়দর্শিকা বসিয়া আছে—যেন সরোবরের মাঝখানে একটি মাত্র কমল ফুটিয়াছে। তাহার সম্মুখে বসিয়া একজন পুরুষ হাত নাড়িয়া কি কথা বলিতেছে, পশ্চাৎ হইতে কালিদাস তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন না। প্রিয়দর্শিকা কপোলে হস্ত রাখিয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। কালিদাস সেইদিকে ফিরিতেই দুইজনের চোখাচোখি হইল। প্রিয়দর্শিকা স্মিত হাসিয়া চোখের ইঙ্গিতে কবিকে ডাকিল।

কবি বুঝিলেন প্রিয়দর্শিকা বিপদে পড়িয়াছে। তিনি মন্দমন্থর পদে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। নিকটে গিয়া দেখিলেন, যে ব্যক্তি প্রিয়দর্শিকার সহিত কথা কহিতেছে, সে অত্যন্ত পরিচিত,—তাহার মুখ শূকরের ন্যায় কদাকার, দেহ রোমশ, মস্তকের কেশ কণ্টকবৎ ঋজু ও উদ্ধত। কবি মৃদুকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন—'কে ও? বরাহ —না না—মিহিরভট্ট যে! প্রিয়দর্শিকে, জ্যোতির্বিশারদ কি তোমার ভাগ্য-গণনা করিতেছেন?'

বাধাপ্রাপ্ত বরাহমিহির ক্রুদ্ধমুখে কবির দিকে ফিরিলেন। প্রিয়দর্শিকা যেন ইতি-পূর্বে কবিকে দেখে নাই, এমনিভাবে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া করজোড়ে তাঁহাকে প্রণাম করিল। তাহার কর্ণে নীলকান্তমণির অবতংস দুলিয়া উঠিল! কণ্ঠস্বরে মধু ঢালিয়া দিয়া বলিল—'কবিবর, স্বাগতোহসি। আপনার পদার্পণে আজ আমার গৃহে পরমোৎসব। আসন গ্রহণ করুণ আর্য।—হলা বকুলে, শীঘ্র কবিবরের জন্য পানীয় লইয়া আয়।'

কালিদাস বসিলেন, বলিলেন—'আচার্য মিহির, কিসের আলোচনা হইতেছিল? ফলিত জ্যোতিষ? উত্তম কথা, আমার ভাগ্যটা একবার গণনা করিয়া দেখুন তো। সম্প্রতি বড় বিপদে পড়িয়াছি।'

বরাহমিহির মুখে হাসির একটা অনুকৃতি করিয়া বলিলেন—'কবি, তুমি এখন বিনা-ইয়া বিনাইয়া একটা বর্ষা-সংহার কাব্য লেখ গিয়া। এসব কথা তুমি বুঝিবে না।'

পরিচারিকা স্ফটিকপাত্রে আসব লইয়া আসিল, প্রিয়দর্শিকা তাহা স্বহস্তে লইয়া কবিকে দিল। কবি পান করিয়া পাত্র দাসীকে ফিরাইয়া দিলেন, তারপর প্রিয়দর্শিকার হস্ত হইতে তাম্বূল লইয়া বলিলেন—'কেন বুঝিব না? জ্যোতিষশাস্ত্রে শক্ত কি আছে? দ্বাদশ রাশি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র আর নবগ্রহ—এই লইয়া তো ব্যাপার। ইহাও যদি বুঝিতে না পারি—'

বরাহমিহির কবিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া প্রিয়দর্শিকার দিকে ফিরিয়া অসমাপ্ত বক্তৃতা আবার আরম্ভ করিলেন। বলিলেন—'একবার ভাবিয়া দেখ, আমাদের অপৌরুষেয় শাস্ত্রের উপর এই অর্বাচীন যাবনিক বিদ্যা বলাৎকারপূর্বক বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ফল কিরূপ বিষময় হইয়াছে তাহা জান কি? অশ্বিন্যাদি বিন্দু পুরা তিন অংশ সরিয়া গিয়াছে।'

বরাহমিহির ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ নেত্রে প্রিয়দর্শিকাকে দগ্ধ করিবার উপক্রম করিলেন, যেন এই অপরাধের পরিপূর্ণ দায়িত্ব তাহারই—'তিন অংশ! কল্পনা কর—তিন অংশ! ইহার ফলে সমগ্র ভ-চক্র তিন অংশ সরিয়া গিয়াছে! সর্বনাশ হইতে আর বাকী কি? যে সকল গর্ভদাস এই কুকার্য করিয়াছে, তাহারা জানে না যে, আকাশচক্র রথচক্র নয়—উহা চিরস্থির চির-নিরয়ন। এই গ্রহতারামণ্ডিত ব্যোম নিরন্তর ঘূর্ণমান হইয়াও অচল গতিহীন—'

কালিদাস হাসিয়া উঠিলেন; দেখিলেন, বরাহ আজ যেরূপ ক্ষেপিয়াছে, সহজে উহার কবল হইতে প্রিয়দর্শিকাকে উদ্ধার করা যাইবে না। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—'মিহিরভট্ট, ওটা আপনার ভুল। আকাশচক্র সত্যই রথচক্র—মহাকালের নিঃশব্দ ঘর্ঘর-

হীন রথচক্র। উহা নিরন্তর ঘুরিতেছে এবং সেই সঙ্গে আমরাও ঘুরিতেছি।'

বরাহ কবির দিকে কেবল একটা কষায়িত নেত্রপাত করিয়া আবার কহিতে লাগিলেন—'শুধু কি তাই! এই দ্বাদশ রাশির অভিযানের ফলে ফলিত জ্যোতিষ একেবারে লণ্ড-ভণ্ড হইয়া গিয়াছে! অভিজিৎ আজ কোথায়? অভিজিৎকে ছাগমুণ্ড করিয়া তাহার গলা কাটিয়া তাহাকে নক্ষত্রলোক হইতে নির্বাসিত করা হইয়াছে! দ্বাদশ রাশিকে সুতন্ত্রিত করিবার জন্য অষ্টাবিংশতি নক্ষত্র এখন সপ্তবিংশতি হইয়াছে। দু'দিন পরে অভিজিতের নাম পর্যন্ত লোকে ভুলিয়া যাইবে—জ্যোতিঃশাস্ত্র মূর্খের দ্বারা লাঞ্ছিত অবজ্ঞাত হইবে—'

শুনিতে শুনিতে কবি অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। প্রিয়দর্শিকা তাঁহার প্রতি একবার করুণ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল; কিন্তু উপায় নাই। দৈত্য কর্তৃক আক্রান্ত উর্বশীকে পুরুরবা উদ্ধার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এ দৈত্য অবধ্য। বিমর্ষভাবে চিন্তা করিতে করিতে কবি কক্ষে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রাত্রিও ক্রমে গভীর হইতেছে; কবি ভাবিলেন, আজ আর কিছু হইল না, গৃহে ফিরি। এই সময় তাঁহার দৃষ্টি পড়িল কক্ষের দূর কোণ হইতে একব্যক্তি হস্ত-সঙ্কেতে তাঁহাকে ডাকিতেছে। লোকটি বোধহয় কিছু অধিক মাত্রায় মাদক-সেবা করিয়াছে, কারণ সে আসন হইতে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না এবং যতই উঠিতে অসমর্থ হইতেছে, ততই আর এক চষক পান করিয়া শক্তি সংগ্রহে যত্নবান হইতেছে। তিনজন গূঢ়হাস্যমুখী দাসী তাহার আসব যোগাইতেছে।

লোকটি বৃদ্ধ, কিন্তু বেশভূষা নবীন নাগরিকের ন্যায়। দেহটি স্থূল, মুখ বর্তুলাকার ও লোলমাংস; কিন্তু অতি যত্ন সহকারে অঙ্গ-সংস্কার করা হইয়াছে। চক্ষে কজ্জল, কর্ণে সুবর্ণ কুণ্ডল, কণ্ঠে মুক্তাহার, রোমশ দেহে পত্রচ্ছেদ্য—নব যুবক সাজিবার কোন কৌশলই পরিত্যক্ত হয় নাই। কালিদাস তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি চক্ষু তুলিয়াই সহসা কাঁদিয়া ফেলিলেন। দাসীরা মুখ ফিরাইয়া হাসিল।

কালিদাস বৃদ্ধের পাশে বসিয়া উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করিলেন—'বটু, কি হইয়াছে? এত কাতর কেন?'

চক্ষু মার্জনা করিয়া বৃদ্ধ স্খলিত বচনে কহিলেন—'বরাহমিহির একটা ষণ্ড!'

সমবেদনাপূর্ণ হৃদয়ে কালিদাস বলিলেন—'সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু কি হইয়াছে?'

বৃদ্ধ পুনশ্চ বলিলেন—'বরাহমিহির একটা বৃষ!'

কবি বলিলেন—'বটু, এ বিষয়ে আমি তোমার সহিত একমত। কিন্তু ব্যাপার কি—বৃষটা করিয়াছে কি?'

ভগ্নহৃদয় বৃদ্ধ আবার আরম্ভ করিলেন—'বরাহমিহির একটা—'

'বলীবর্দ!' কবি বৃদ্ধের পৃষ্ঠে হাত রাখিয়া বলিলেন—'উক্ষা ভদ্রো বলীবর্দঃ ঋষভো বৃষভো বৃষঃ' আমার কণ্ঠস্থ আছে—সুতরাং আবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। এখন বলীবর্দটার দুষ্কৃতি সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হইতে পারি।'

বৃদ্ধ আর এক চষক মদ্য পান করিলেন, তারপর কহিলেন—'কালিদাস, তুমি আমার প্রাণাধিক বয়স্য, তোমার সঙ্গে শৈশবে একসঙ্গে খেলা করিয়াছি, তোমার কাছে আমার গোপনীয় কিছুই নাই। আমি প্রিয়দর্শিকার প্রেমে মজিয়াছি।'—এইখানে বৃদ্ধ আর এক চষক পান করিলেন—'তাহাকে যে কতবার কত মদনালঙ্কার উপহার দিয়াছি, কত সঙ্কেত জানাইয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু দুষ্টা আমাকে দেখিলেই 'তাত' বলিয়া সম্বোধন করে—এমন ছলনা দেখায় যেন আমার মনের ভাব বুঝিতেই পারে নাই!—আজ

আমি সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিলাম যে, প্রিয়দর্শিকার চরণে আত্মনিবেদন করিব—কোন ছল-চাতুরী শুনিব না। কিন্তু আসিয়াই দেখিলাম, ঐ বরাহটা উহাকে কর-কবলিত করিয়াছে। সেই অবধি কেবলই সুযোগ খুঁজিতেছি, কিন্তু শূকরটা কিছুতেই উহার সঙ্গ ছাড়িতেছে না।' বলিয়া সুরাবিহ্বল নেত্রে যতদূর সম্ভব বিদ্বেষ-সঞ্চার করিয়া যেখানে বরাহমিহির বসিয়া ছিলেন, সেইদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

প্রবল হাস্যোচ্ছ্বাস দমন করিয়া কালিদাস কহিলেন—'বটু, তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে—প্রিয়দর্শিকার প্রতি প্রেমসঞ্চার তোমার পক্ষে অতীব গর্হিত। তুমি বালকমাত্র —প্রিয়দর্শিকা বর্ষীয়সী,—তাহার সহিত তোমার প্রণয় কদাপি যুক্তিযুক্ত নয়। তুমি বরঞ্চ তোমার বয়সোপযোগিনী কোনও কুমারী কন্যার প্রতি আসক্ত হও।'

বৃদ্ধ বিবেচনা করিয়া বলিলেন—'সে কথা যথার্থ। কিন্তু আমি প্রিয়দর্শিকাকে মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া ফেলিয়াছি, এখন আর ফিরাইয়া লইতে পারি না।' তারপর কালি-দাসের হস্ত ধারণ করিয়া কাতর ভাবে বলিলেন—'কালিদাস, তুমি আমার সখা, আজ সখার কার্য কর, ঐ শূকরটাকে প্রিয়দর্শিকার নিকট হইতে খেদাইয়া দাও। নতুবা বন্ধু-হত্যার পাপ তোমাকে স্পর্শ করিবে।'

অকস্মাৎ একটা কূটবুদ্ধি কালিদাসের মাথায় খেলিয়া গেল। ঠিক হইয়াছে—কণ্টকেনৈব কণ্টকম্! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'শুধু প্রিয়দর্শিকার নিকট হইতে খেদাইয়া দিলেই হইবে? আর কিছু চাহ না?'

'আর কিছু চাহি না।'

'ভাল, চেষ্টা করিয়া দেখি।' কালিদাস উঠিলেন। কিছু দূর গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—'একটা কথা। বটু, পৃথিবীর আহ্নিক গতি আছে, এ কথা তুমি বিশ্বাস কর?' বৃদ্ধ বলিলেন—'পৃথিবীর আহ্নিক গতি থাক্ বা না থাক্—'

কালিদাস বলিলেন—'না না, ওটা একান্ত আবশ্যক! বরাহমিহির আহ্নিক গতিতে বিশ্বাস করেন না।'

নিজের উরুর উপর প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া বটুক বলিলেন—'তবে আমি বিশ্বাস করি। মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি—'

কবি হাসিয়া বলিলেন—'থাক, উহাতেই হইবে। একেবারে মিথ্যা বলিতে চাহি না।'

বরাহমিহির তখন নিজের বাগ্মিতায় মাতিয়া উঠিয়াছেন; কালিদাস তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুঃখিতভাবে মস্তক আন্দোলন করিয়া কহিলেন—'আর্য মিহিরভট্ট, বড়ই দুঃসংবাদ শুনিতেছি।'

বরাহমিহির বাক্যস্রোত সম্বরণ করিয়া কহিলেন—'কি হইয়াছে?'

কালিদাস উপবেশন করিয়া বলিলেন—'এতক্ষণ তাত অমরসিংহের সহিত কথা হইতেছিল। তিনি বলিলেন, আর্যভট্টের মীমাংসাই সত্য; পৃথিবীর আহ্নিক গতি আছে।'

মিহিরভট্ট শূকর-দন্ত নিষ্ক্রান্ত করিয়া সক্রোধে বলিলেন—'অমরসিংহ একটা নখদন্তহীন বৃদ্ধ ভল্লুক, তাহার বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে।'

কালিদাস কহিলেন—'তিনি বলিতেছেন যে, 'আহ্নিক' নামে একটি নূতন শব্দ শীঘ্রই অমরকোষে সংযোজিত করিবেন। তাহাতে আর্যভট্টের মীমাংসাই—'

মিহিরভট্ট আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, অর্ধরুদ্ধ একটি গর্জন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর—'জড়বুদ্ধি জরদ্গব!' 'শৌণ্ড!' 'উন্মাদ!' ইত্যাদি কটূক্তি করিতে করিতে অমরসিংহের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

প্রিয়দর্শিকা ও কালিদাস পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিলেন। এই বারাঙ্গনা

ও কবির মধ্যে এমন একটি অন্তর্গূঢ় পরিচয় ছিল যে, একে অন্যের মুখের দিকে চাহিয়াই তাহার মনের অন্তরতম কথাটি জানিতে পারিতেন। আজ কবির চিত্ত কোনও কারণে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহা প্রিয়দর্শিকা বুঝিয়াছিল। কিন্তু সে সে-কথা না বলিয়া শ্রদ্ধাবিগলিত অস্ফুট কাকলীতে কহিল—'কবি, অবলার দুঃখমোচনে যদি পুণ্য থাকে, তবে সে পুণ্য আপনার।—কিন্তু ওদিকে যে গজকূর্মের যুদ্ধ বাধিল বলিয়া।'

কবি প্রাণে এক অপরূপ শান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। কেবলমাত্র এই নারীর সাহচর্যই যেন তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া তুলিল। তিনি শয্যার উপর অর্ধশায়িত হইয়া প্রিয়দর্শিকার দিকে চাহিয়া রহিলেন। প্রিয়দর্শিকা তাঁহার বাহুর নিম্নে সযত্নে একটি উপাধান ন্যস্ত করিয়া দিল।

কিছুক্ষণ দুইজনে মুখোমুখি বসিয়া রহিলেন। কবির চোখে প্রশান্ত নিস্তরঙ্গ শান্তি,—প্রিয়দর্শিকা কিছু বিচলিতা।

তারপর প্রিয়দর্শিকা চক্ষু নত করিল; তাম্বুল-করঙ্ক কবির সম্মুখে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'ভট্টিনীর সংবাদ কি?'

কবি ঈষৎ চমকিত হইয়া তাম্বুল লইলেন, ভ্রূ একটু কুঞ্চিত হইল, বলিলেন—'ভট্টিনী? সংবাদ কিছু নাই, তিনি গৃহে আছেন।'

একটা দুঃসহ ক্ষোভের ছায়া প্রিয়দর্শিকার মুখের উপর দিয়া বহিয়া গেল। কিন্তু তাহা নিমেষকালের জন্য। সে হাস্যমুখেই বলিল—'হায় কবি, এই সপ্তসাগরা পৃথিবী তোমার গুণে পাগল, কিন্তু তোমার গৃহিণী তোমাকে চিনিলেন না।'

বিস্ময়ে ভ্রূ তুলিয়া কালিদাস বলিলেন—'চিনিলেন না! কিন্তু তিনি তো আমাকে—'

প্রিয়দর্শিকা পূর্ণদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ব্যথা-বিদ্ধ কণ্ঠে কহিল—'আমি সব জানি কবি, আমার কাছে কোন কথা গোপন করিবার চেষ্টা করিও না।' তার-পর মুহূর্তমধ্যে কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করিয়া চটুল স্বরে বলিল—'কিন্তু থাক্ ও কথা! আজ কবির ললাটে চিন্তারেখা দেখিতেছি কেন? যে কাব্য শেষ হইতে আর দেরি নাই বলিয়া সকলকে আশ্বাস দিয়া রাখিয়াছেন, তাহা কি এখনও শেষ হয় নাই?'

কালিদাস উঠিয়া বলিলেন—'প্রিয়দর্শিকে, বড়ই বিপদে পড়িয়াছি,—গত তিন রাত্রি হইতে আমার নিদ্রা নাই। তোমার পরামর্শ চাহি।'

বিস্মিতা প্রিয়দর্শিকা বলিল—'কি ঘটিয়াছে?'

কালিদাস বলিলেন—'আমি যে কাব্য লিখিতেছি, তাহারই সংক্রান্ত ব্যাপার—অনেক ভাবিয়াও কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। তোমাকে উপদেশ দিতে হইবে।'

আনন্দে প্রিয়দর্শিকার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, বাষ্পাচ্ছন্ন নেত্রে সে বলিল—'কবি, আপনি রসের অমরাবতীতে বিজয়ী বাসব, কল্পনার ধ্যানলোকে আপনি শূলপাণি, আমি আপনাকে উপদেশ দিব? আমাকে লজ্জা দিবেন না।'

প্রিয়দর্শিকার জানুতে করাঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া কবি কহিলেন—'প্রিয়দর্শিকে, অবন্তীরাজ্যে যদি প্রকৃত রসের বোদ্ধা কেহ থাকে তো সে তুমি—এ কথা অকপটে কহিলাম। আর সকলে পল্লবগ্রাহী, মধুর শব্দে মুগ্ধ, বাহ্য সৌন্দর্যে আকৃষ্ট; রসের অতলে কেবল তুমিই ডুবিতে পারিয়াছ। তুমি ভাগ্যবতী।'

সজলনেত্রে যুক্তপাণি হইয়া প্রিয়দর্শিকা বলিল—'কবিবর, আমি সত্যই ভাগ্যবতী। কিন্তু কি আপনার সমস্যা, শুনি। কাব্য কি শেষ হয় নাই?'

কবি বলিলেন—'কাব্য শেষ হইয়াছে কিনা, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।'

বিস্ময়-কৌতূহল-মিশ্রিত স্বরে প্রিয়দর্শিকা বলিল—'কাব্য শেষ হইয়াছে কি না বুঝিতে পারিতেছেন না? এ তো বড় অদ্ভুত কথা!'

কালিদাস আরও নিকটে সরিয়া আসিয়া আগ্রহে বলিতে লাগিলেন—'এ পর্যন্ত অন্য কাহাকেও বলি নাই, তোমাকে প্রথম বলিতেছি, শুন। আমার কাব্যের নাম কুমারসম্ভব। স্বয়ং মহেশ্বর এই কাব্যের নায়ক—পার্বতী নায়িকা। কাব্যের বিষয় এইরূপ—তারকাসুরের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হইয়া দেবগণ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, মহাদেবের ঔরসে স্কন্দ জন্মগ্রহণ করিয়া তারকাসুরকে সংহার করিবেন। সতীর দেহত্যাগের পর শঙ্কর তখন ধ্যানমগ্ন; ও-দিকে সতী হিমালয় গৃহে উমা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। উমা যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া হরের পরিচর্যার জন্য তাঁহার তপোভূমিতে উপস্থিত হইলেন। হরের তপস্যা কিন্তু ভাঙে না। তখন দেবগণ মদনকে তপস্যা ভঙ্গের জন্য পাঠাইলেন। মদন তপোভঙ্গ করিলেন বটে, কিন্তু স্বয়ং হরনেত্রজন্মা বহ্নিতে ভস্মীভূত হইলেন। মহাদেব তপোভূমি ত্যাগ করিয়া গেলেন। ভগ্নহৃদয়া উমা তখন পতিলাভার্থে কঠোর তপশ্চর্যা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে মহেশ্বর প্রীত হইয়া উমার নিকট ফিরিয়া আসিলেন; তারপর উভয়ের বিবাহ হইল।'

এই পর্যন্ত বলিয়া কবি থামিলেন। প্রিয়দর্শিকা তন্ময় হইয়া শুনিতেছিল, মুখ তুলিয়া চাহিল।

কবি বলিলেন—'সপ্তম সর্গে আমি হরপার্বতীর বিবাহ দিয়াছি। বধূর সলজ্জ মুখে হাসি ফুটিয়াছে—কন্দর্প পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। কুমারসম্ভব কাব্যের যাহা প্রতিপাদ্য, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং কাব্যকলা-সঙ্গত ন্যায়ে কাব্য শেষ হইয়াছে—যথার্থ কি না?'

প্রিয়দর্শিকা উত্তর করিল না, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কবির প্রতি চাহিয়া রহিল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কবি বলিলেন—'আমিও বুঝিতেছি যে শাস্ত্রমতে কাব্য এইখানেই সমাপ্ত হওয়া উচিত! তথাপি মনের মধ্যে একটা সন্দেহ জাগিয়াছে।'

'কিসের সন্দেহ?'

'মনে হইতেছে যেন কাব্য সম্পূর্ণ হইল না। উমা-মহেশ্বরের পূর্বরাগ ও বিবাহ বর্ণনা করিলাম বটে, কিন্তু তবু কাব্যের মূল কথাটি অকথিত রহিয়া গেল। প্রিয়দর্শিকা, তোমার কি মনে হয়? দেবদম্পতির বিবাহোত্তর জীবন চিত্রিত করা কি কাব্যকলা-সঙ্গত হইবে?'

প্রিয়দর্শিকা বলিল—'অলঙ্কার-শাস্ত্রমতে হইবে না। প্রথমতঃ বিষয়াতিরিক্ত বর্ণনা বাগ্‌বাহুল্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ জগৎপিতা ও জগন্মাতার দাম্পত্য-জীবন-বর্ণনা অতিশয় গর্হিত বলিয়া নিন্দিত হইবে।'

কবি জিজ্ঞাসা করিলেন—'তবে তোমার মতে বিবাহ দিয়াই কাব্য শেষ করা কর্তব্য।'

প্রিয়দর্শিকা দীর্ঘকাল করতলে কপোল রাখিয়া বসিয়া রহিল। অবশেষে বলিল—'কবি, কাব্যশাস্ত্রের চেয়ে সত্য বড়। সত্যের অনুজ্ঞায় সকলেই শাস্ত্র লঙ্ঘন করিতে পারে, তাহাতে বাধা নাই।'

কবি বলিলেন—'কিন্তু এ ক্ষেত্রে সত্য কাহাকে বলিতেছ?'

প্রিয়দর্শিকা বলিল,—'হরপার্বতীর মিলনই সত্য।'

কবি বলিলেন—'তাহাই যদি হয় তবে সে সত্য তো পালিত হইয়াছে।'

'হইয়াছে কি?'

'হয় নাই?'

'তাহা আমি বলিতে পারিব না; উহা কবির অন্তরের কথা।'

কবি কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন—'আমার অন্তরের কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না—তাই এই সংশয়। তোমার অভিমত কি বল।'

প্রিয়দর্শিকা মৃদু হাস্য করিয়া বলিল—'আমার অভিমত শুনিবেনই?'

'হ্যাঁ?'

'না শুনিয়া নিরস্ত হইবেন না?'

'না।'

'ভাল। আজ আপনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করুন—রাত্রি গভীর হইয়াছে। কাল প্রাতে যদি আপনার মনে কোনও সংশয় থাকে, আমার অভিমত জানাইব।'—বলিয়া প্রিয়দর্শিকা উঠিয়া দাঁড়াইল।

কবি ঈষৎ নিরাশ হইলেন, কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না। প্রিয়দর্শিকা তোরণ-দ্বার পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে আসিল। বিদায়কালে কবি বলিলেন—'চলিলাম। মিহিরভট্ট ও অমরসিংহ হইতে দূরে দূরে থাকিও। আর কথাটা চিন্তা করিয়া দেখিও।' দুইজনের চোখে চোখে স্মিতহাস্য বিনিময় হইল।

প্রিয়দর্শিকা বলিল—'দেখিব।'

কবি যখন নিজ গৃহদ্বারে পেঁাছিলেন, তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর। দ্বার ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ—অন্ধকার। কবি উৎকর্ণ হইয়া শুনিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনও শব্দ পাইলেন না। বোধহয় সকলে নিদ্রিত।

তিনি কবাটে করাঘাত করিলেন।

ভিতর হইতে কণ্ঠস্বর শুনা গেল—'কে?'

কবি কুণ্ঠিতস্বরে উত্তর করিলেন—'আমি—কালিদাস।'

গৃহের কবাট খুলিল—কবি সভয়ে দেখিলেন প্রদীপ হস্তে স্বয়ং গৃহিণী!

গৃহিণী কহিলেন—'আসিয়াছ? এত রাত্রি পর্যন্ত কোথায় ছিলে?'

গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কবি ক্ষুব্ধস্বরে কহিলেন—'প্রিয়ে, তুমি এতক্ষণ জাগিয়া আছ কেন? দাসীকে বলিলেই তো—'

কবিপত্নী কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এত রাত্রি পর্যন্ত কোথায় ছিলে?'

সঙ্কুচিত হইয়া কবি কহিলেন—'সমাপানকে গিয়াছিলাম—'

কবিপত্নীর অবরুদ্ধ ক্রোধ এতক্ষণে ফাটিয়া পড়িল, তিনি প্রজ্বলিত নেত্রে কহিলেন—'প্রিয়দর্শিকার গৃহে গিয়াছিলে! বল বল, লজ্জা কি? কেহ নিন্দা করিবে না। তুমি মহাপণ্ডিত, তুমি সভাকবি, তুমি ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ—বেশ্যালয়ে রাত্রিযাপন করিয়াছ, তাহাতে আর লজ্জা কি?'

'প্রিয়ে—'

'ধিক্! আমাকে প্রিয়সম্বোধন করিতে তোমার কুণ্ঠা হয় না? কে তোমার প্রিয়া? আমি—না ঐ সহস্রভোগ্যা পথকুক্কুরী প্রিয়দর্শিকা?'

কবি নিরুত্তর দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার নীরবতা কবিপত্নীর ক্রোধে ঘৃতাহুতি দিল—'ধিক্ মিথ্যাচারী! ধিক্ লম্পট! কি জন্য রাত্রিশেষে গৃহে আসিয়াছ? বেশ্যার উচ্ছিষ্টভোগীকে স্পর্শ করিলে কুলাঙ্গনাকে স্নান করিয়া শুচি হইতে হয়! যাও—গৃহে তোমার কি প্রয়োজন? যেখানে এতক্ষণ ছিলে, সেইখানেই ফিরিয়া যাও!'—এই বলিয়া কবিপত্নী শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

অন্ধকারে কবি নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই তাঁহার গৃহ। এই তাঁহার ভার্যা। গৃহিণী সচিব সখী প্রিয়শিষ্যা! গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কবি ফিরিলেন। যে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বসিয়া কাব্য-রচনা করিতেন সেই প্রকোষ্ঠে গিয়া দীপ জ্বালিলেন।

মৃগচর্ম বিছাইয়া উপবেশন করিতেই অদূরে কাষ্ঠাসনে রক্ষিত কুমারসম্ভবের বৃহৎ পুঁথির উপর দৃষ্টি পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎচমকের ন্যায় আকস্মিক প্রভা তাঁহার

মস্তিষ্কের মধ্যে খেলিয়া গেল। প্রিয়দর্শিকা ঠিক বুঝিয়াছিল। সে বলিয়াছিল—'কাল প্রাতে যদি কোনও সংশয় থাকে—।' না, তাঁহার মনে আর লেশমাত্র সংশয় নাই। পত্নীর সহিত সাক্ষাতের সঙ্গে সঙ্গে সংশয়ের অন্ধকার কাটিয়া গিয়াছে।

কালিদাস উঠিলেন। প্রদীপদণ্ড আনিয়া আসনপার্শ্বে রাখিলেন, কাষ্ঠাসন-সমেত পুঁথি সম্মুখে স্থাপন করিলেন। মসীপাত্র, লেখনী ও তালপত্র পাড়িয়া আবার আসিয়া বসিলেন।

ক্রমে তাঁহার মুখের ভাব স্বপ্নাচ্ছন্ন হইল। লেখনী মুষ্টিতে লইয়া তালপত্রের উপর পরীক্ষা করিলেন, তারপর ধীরে ধীরে লিখিলেন—'অষ্টমঃ সর্গঃ।'

এই পর্যন্ত লিখিয়া অতি দীর্ঘকাল দৃষ্টিহীন নয়নে গবাক্ষের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বাহিরে তামসী রাত্রি, টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। কিন্তু কবির মানসপটে যে চিত্রগুলি একে একে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল, তাহা বসন্তের গন্ধে বর্ণে কাকলীতে সমাকুল—বর্ষা রজনীর শ্যামসজল ছায়া তাহার অম্লান দীপ্তিকে স্পর্শ করিতে পারিল না।

সহসা অবনত হইয়া কবি লিখিতে আরম্ভ করিলেন, শরের লেখনী তালপত্রের উপর শব্দ করিয়া চলিতে লাগিল—'পাণিপীড়নবিধেরনন্তরম্—'

৩০ আষাঢ় ১৩৪০

চুয়াচন্দন

একদিন গ্রীষ্মের শেষভাগে, সূর্য মধ্যাকাশে আরোহণ করিতে তখনও দণ্ড তিন-চার বাকি আছে, এমন সময় নবদ্বীপের স্নানঘাটে এক কৌতুকপ্রদ অভিনয় চলিতেছিল।

ভাগীরথীর পূর্বতটে নবদ্বীপ। স্নানের ঘাটও অতি বিস্তৃত—এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে। ঘাটের সারি সারি পৈঠাগুলি যেমন উত্তর-দক্ষিণে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত, তেমনি প্রত্যেকটি পৈঠা প্রায় সেকালের সাধারণ রাজপথের মতো চওড়া। গ্রীষ্মের প্রখরতায় জল শুকাইয়া প্রায় সব পৈঠাই বাহির হইয়া পড়িয়াছে—দু'-এক ধাপ নামিলেই নদীর কাদা পায়ে ঠেকে। স্নানের ঘাট যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখান হইতে বাঁধানো খেয়াঘাট আরম্ভ। তথায় খেয়ার নৌকা, জেলে-ডিঙ্গি, দুই-একটা হাজারমনী মহাজনী ভড় বাঁধা আছে। নৌকাগুলির ভিতরে দৈনিক রন্ধনকার্য চলিতেছে,—ছই ভেদ করিয়া মৃদু মৃদু ধূম উত্থিত হইতেছে।

বহুজনাকীর্ণ স্নান-ঘাটে ব্যস্ততার অন্ত নাই। আজ কৃষ্ণা চতুর্দশী। ঘাটের জনতাকে

সমগ্রভাবে দর্শন করিলে মনে হয়, মুণ্ডিতশীর্ষ উপবীতধারী ব্রাহ্মণ ও প্রৌঢ়া-বৃদ্ধা নারীর সংখ্যাই বেশী। ছেলে-ছোকরার দলও নেহাৎ কম নয়; তাহারা সাঁতার কাটিতেছে, জল তোলপাড় করিতেছে। নারীদের স্নানের জন্য কোনও পৃথক ব্যবস্থা নাই, যে যেখানে পাইতেছে সেখানেই স্নান করিতেছে। তরুণী বধূরা ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া টুপ্ টুপ্ ডুব দিতেছে। পর্দাপ্রথা বলিয়া কিছু নাই বটে, তবু অবগুণ্ঠন দ্বারা শালীনতা-রক্ষার একটা চেষ্টা আছে; যদিও সে চেষ্টা তনু-সংলগ্ন সিক্তবস্ত্রে বিশেষ মর্যাদা পাইতেছে না। সেকালে বাঙালী মেয়েদের দেহলাবণ্য গোপন করিবার সংস্কার বড় বেশী প্রবল ছিল না; গৃহস্থ-কন্যাদের কাঁচুলি পরিবার রীতিও প্রচলিত হয় নাই।

যে যুগের কথা বলিতেছি, তাহা আজ হইতে চারি শতাব্দীরও অধিককাল হইল অতীত হইয়াছে। সম্ভবতঃ আমাদের ঊর্ধ্বতন পঞ্চদশ পুরুষ সে সময় জীবিত ছিলেন। তখন বাংলার ঘোর দুর্দিন যাইতেছিল। রাজশক্তি পাঠানের হাতে; ধর্ম ও সমাজের বন্ধন বহু যুগের অবহেলায় গলিত রজ্জু-বন্ধনের ন্যায় খসিয়া পড়িতেছে। দেশও যেমন অরাজক, সমাজও তেমনি বহুরাজক। কেহ কাহারও শাসন মানে না। মৃত বৌদ্ধধর্মের শবনির্গলিত তন্ত্রবাদের সহিত শাক্ত ও শৈব মতবাদ মিশ্রিত হইয়া যে বীভৎস বামাচার উত্থিত হইয়াছে—তাহাই আকণ্ঠ পান করিয়া বাঙালী অন্ধ-মত্ততায় অধঃপথের পানে স্খলিতপদে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সহজিয়া সাধনার নামে যে উচ্ছৃঙ্খল অজাচার চলিয়াছে, তাহার কোনও নিষেধ নাই। কে কাহাকে নিষেধ করিবে? যাহারা শক্তিমান, তাহারাই উচ্ছৃঙ্খলতায় অগ্রবর্তী। মাতৃকাসাধন, পঞ্চ-মকার উদ্দাম নৃত্যে আসর দখল করিয়া আছে। প্রকৃত মনুষ্যত্বের চর্চা দেশ হইতে যেন উঠিয়া গিয়াছে।

তখনও স্মার্ত রঘুনন্দন আচারকে ধর্মের নিগূঢ় বন্ধনে বাঁধিয়া সমাজের শোধন-সংস্কার আরম্ভ করেন নাই। কাণভট্ট রঘুনাথ মিথিলা জয় করিয়া ফিরিয়াছেন বটে, কিন্তু নবদ্বীপে সরস্বতীর পীঠ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। নদের নিমাই তখনও ব্যাকরণের টোলে ছাত্র পড়াইতেছেন ও নানাপ্রকার ছেলেমানুষি করিতেছেন। তখনও সেই হরিচরণস্রুত প্রেমের বন্যা আসে নাই—বাঙালীর ক্লেদকলুষিত চিত্তের বহু শতাব্দী সঞ্চিত মলামাটি সেই পূত প্রবাহে ধৌত হইয়া যায় নাই।

১৪২৬ শকাব্দের প্রারম্ভে এক কৃষ্ণা চতুর্দশীর পূর্বাহ্ণে বাংলার কেন্দ্র নবদ্বীপের ঘাটে কি হইতেছিল, তাহাই লইয়া এই আখ্যায়িকার আরম্ভ।

ঘাটে যে সকলেই স্নান করিতেছে, তাহা নয়। এক পাশে সারি সারি নাপিত বসিয়া গিয়াছে; বহু ভট্টাচার্য গোঁসাই গলা বাড়াইয়া ক্ষৌরী হইতেছেন। বুরুজের গোলাকৃতি চাতালে একদল উলঙ্গপ্রায় পণ্ডিত দেহে সবেগে তৈলমর্দন করিতে করিতে ততোধিক বেগে তর্ক করিতেছেন। বাসুদেব সার্বভৌম মিথিলা হইতে সর্ববিদ্যায় পারংগম হইয়া ফিরিয়া আসিবার পর হইতে নবদ্বীপে বিদ্যাচর্চার সূত্রপাত হইয়াছিল। কিন্তু বিদ্যা তখনও হৃদয়ে আসন স্থাপন করেন নাই; তাই বাঙালী পণ্ডিতের মুখের দাপট কিছু বেশী ছিল। শাস্ত্রীয় তর্ক অনেক সময় আঁচড়া-কামড়িতে পরিসমাপ্তি লাভ করিত।

তৈল-মসৃণ পণ্ডিতদের তর্কও ন্যায়শাস্ত্রের সীমানা ছাড়াইয়া অরাজকতার দেশে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছিল। একজন অতি গৌরকান্তি যুবা—বয়স বিশ বছরের বেশী নয়—তর্ক বাধাইয়া দিয়া, পাশে দাঁড়াইয়া তাহাদের বিতণ্ডা শুনিতেছিল ও মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছিল। তাহার ঈষদরুণ আয়ত চক্ষু হইতে যেন তীক্ষ্ম বুদ্ধি, পাণ্ডিত্যের অভিমান ও কৌতুক এক সঙ্গে ক্ষরিয়া পড়িতেছিল।

জলের কিনারায় বসিয়া কেহ কেহ পায়ে ঝামা ঘষিতেছিল। নারীরা বস্ত্রাবরণের মধ্যে ক্ষার-খৈল দিয়া গাত্র মার্জনা করিতেছিল। কয়েকজন বর্ষীয়ান্ ব্রাহ্মণ আবক্ষ

জলে নামিয়া পূর্বমুখ হইয়া আহ্নিক করিতেছিলেন।

এই সময় দক্ষিণ দিকে গঙ্গার বাঁকের উপর দুইখানি বড় সামুদ্রিক নৌকা পালের ভরে উজান ঠেলিয়া ধীরে ধীরে নবদ্বীপের ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতেছিল—অধিকাংশ স্নানার্থীর দৃষ্টি সেই দিকেই নিবদ্ধ ছিল। সমুদ্রযাত্রী বাণিজ্যতরীদের দেশে ফিরিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; প্রতি সপ্তাহেই দুটি একটি করিয়া ফিরিতেছিল।

ক্রমে নৌকা দুইটি খেয়ার ঘাটে গিয়া ভিড়িল। মধুকর ডিঙ্গার ছাদের উপর একজন যুবা দাঁড়াইয়া পরম আগ্রহের সহিত ঘাটের দৃশ্য দেখিতেছিল; পাল নামাইবার সঙ্গে সঙ্গে সেও তীরে অবতরণ করিবার জন্য ছাদ হইতে নামিয়া গেল।

বড় নৌকা ঘাটের নিকট দিয়া যাইবার ফলে জলে ঢেউ উঠিয়া ঘাটে আঘাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; অনেক ছেলে-ছোকরা কোমরে গামছা বাঁধিয়া ঢেউ খাইবার জন্য জলে নামিয়াছিল। ঢেউয়ের মধ্যে বহু সন্তরণকারী বালকের হস্তপদসঞ্চালনে ঘাট আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল।

হঠাৎ তীর হইতে একটা 'গেল গেল' রব উঠিল। যে গৌরকান্তি যুবাটি এতক্ষণ দাঁড়াইয়া তর্করত পণ্ডিতদের রঙ্গ দেখিতেছিল, সে দুই লাফে জলের কিনারায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে?"

কয়েকজন সমস্বরে উত্তর দিল, "কানা-গোঁসাই এতক্ষণ জলে দাঁড়িয়ে আহ্নিক করছিলেন, হঠাৎ তাঁকে আর দেখা যাচ্ছে না। ভাবে-ভোলা মানুষ, হয়তো নৌকোর ঢেউ লেগে তলিয়ে গেছেন।"

যুবা কোমরে গামছা বাঁধিতে বাঁধিতে শুনিতেছিল, আদেশের স্বরে কহিল, "তোমরা কেউ জলে নেমো না, তাহলে গণ্ডগোল হবে। আমি দেখছি।"—বলিয়া সে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

গ্রীষ্মকালে ঘাটে স্নান করা ভাবে-ভোলা মানুষদের পক্ষে সর্বদা নিরাপদ নয়। কারণ, জলের মধ্যে দুই ধাপ সিঁড়ি নামিয়াই শেষ হইয়াছে—তারপর কাদা। এখানে বুক পর্যন্ত জলে বেশ যাওয়া যায়, কিন্তু আর এক পা অগ্রসর হইলেই একেবারে ডুবজল। যুবক জলে ঝাঁপ দিয়া কয়েক হাত সাঁতার কাটিয়া গেল, তারপর অথৈ জলে গিয়া ডুব দিল।

কিছুক্ষণ তাহার আর কোনও চিহ্ন নাই। ঘাটের ধারে কাতার দিয়া লোক দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। সকলের মুখেই উদ্বেগ ও আশঙ্কার ছায়া। কয়েকজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক ক্রন্দন-করুণ সুরে হা-হুতাশ করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

পঞ্চাশ গুণিতে যতক্ষণ সময় লাগে, ততক্ষণ পরে যুবকের মাথা জলের উপর জাগিয়া উঠিল। সকলে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল—কিন্তু পরক্ষণেই আবার নীরব হইল। যুবক নিমজ্জিত ব্যক্তিকে খুঁজিয়া পায় নাই, সে বার-কয়েক সুদীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া আবার ডুব দিল।

এবারও সমধিক কাল ডুবিয়া থাকিয়া সে আবার উঠিল; একবার সজোরে মস্তক সঞ্চালন করিয়া এক হাতে সাঁতার কাটিয়া তীরের দিকে অগ্রসর হইল।

সকলে সচিৎকারে প্রশ্ন করিল, "পেয়েছ? পেয়েছ?"

যুবক হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "বলতে পারি না। তবে এক মুঠো টিকি পেয়েছি।"

যুবক যখন তীরে আসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল, তাহার বামমুষ্টি এক গুচ্ছ পরিপুষ্ট শিখা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া আছে এবং নিমজ্জিত পণ্ডিতের দেহসমেত মুণ্ড উক্ত শিখার সহিত সংলগ্ন হইয়া আছে।

কিয়ৎকাল শুশ্রূষার পর পণ্ডিতের চৈতন্য হইল। তিনি কিছু জল পান করিয়াছিলেন, তাহা উৎক্ষিপ্ত হইবার পর চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। যুবক সহাস্যকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "শিরোমণি মশায়, বলুন দেখি বেঁচে আছেন, না মরে গেছেন? আপনার নব্য ন্যায়শাস্ত্র কি বলে?"

শিরোমণি এক চক্ষু দ্বারা কিছুক্ষণ ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, "কে—নিপাতনে সিদ্ধ? ডুবে গিয়েছিলুম—না? তুমি বাঁচালে?" যুবককে শিরোমণি মহাশয় 'নিপাতনে সিদ্ধ' বলিয়া ডাকিতেন। একটু ব্যাকরণের খোঁচাও ছিল; কূটতর্কে অপরাজেয় শক্তির জন্য সমাদরমিশ্রিত স্নেহও ছিল।

নিপাতনে সিদ্ধ হাসিয়া বলিল, "বাঁচাতে পেরেছি কি না, সেই কথাই তো জিজ্ঞাসা করছি। যদি বেঁচে থাকেন, ন্যায়ের প্রমাণ দিন।"

কাণভট্ট ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। এইমাত্র মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন—শরীরে বল নাই; কিন্তু তাঁহার এক চক্ষুতে প্রাণময় হাসি ফুটিয়া উঠিল; তিনি বলিলেন, "প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। আমি বেঁচে আছি—এ কথা স্বয়ংসিদ্ধ। আমি বেঁচে নেই, এ কথা যে বলে, সে তৎক্ষণাৎ প্রমাণ করে দেয় যে, সে বেঁচে আছে। বাজিকর যত কৌশলী হোক, নিজের স্কন্ধে আরোহণ করতে অক্ষম; মানুষ তেমনি নিজেকে অস্বীকার করতে পারে না।"

নৈয়ায়িকের কথায় সকলে হাসিয়া উঠিল। নিপাতনে সিদ্ধ বলিল, "যাক, তাহলে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।—এখন উঠতে পারবেন কি?"

শিরোমণি তাহার হাত ধরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "হঠাৎ হাতে পায়ে কেমন খিল ধরে গিয়েছিল। নিপাতন, তুমিই জল থেকে টেনে তুলেছ, না?"

নিপাতন বলিল, "উঁহু। আপনাকে টেনে তুলেছে আপনার প্রচণ্ড পাণ্ডিত্যের বিজয়-নিশান।"

"সে কি?"

"আপনার নধর শিখাটিই আপনার প্রাণদাতা! ওটি না থাকলে কিছুতেই টেনে তুলতে পারতাম না।"

"জ্যাঠা ছেলে।"

"আপনার পৈতে ছুঁয়ে বলছি—সত্যি কথা।—কিন্তু সে যা হোক, একলা বাড়ি ফিরতে পারবেন তো?"

"পারব, এখন বেশ সুস্থ বোধ করছি।" তারপর তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "বিশ্বম্ভর, এত দিন জানতাম তুমি নিপাতনেই সিদ্ধ, কিন্তু এখন দেখছি প্রাণদানেও তুমি কম পটু নও। আশীর্বাদ করি, এমনি ভাবে মজ্জমানকে উদ্ধার করেই যেন তোমার জীবন সার্থক হয়।"

নিপাতন হাসিয়া বলিল, "কি সর্বনাশ! শিরোমণি মশায়, ও আশীর্বাদ করবেন না। তাহলে আমার ব্যাকরণ-টোলের কি দশা হবে?"

ও-দিকে নৌকার মালিক যুবকটি এ-সব ব্যাপার কিছুই জানিতে পারে নাই। সে নগর-ভ্রমণের উপযুক্ত সাজসজ্জা করিয়া ঘাটে নামিল। স্নান-ঘাটের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। দেখিল, এক অতি গৌরকান্তি সুপুরুষ যুবা একজন মধ্যবয়স্ক একচক্ষু ব্যক্তির সহিত দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে। এই গৌরাঙ্গ যুবকের অপূর্ব দেহসৌষ্ঠব দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গেল। সে পৃথিবীর অনেক দেশ দেখিয়াছে; সিংহল, কোচিন, সুমাত্রা, যবদ্বীপ—কোথাও যাইতে তাহার বাকি নাই। কিন্তু এমন অপরূপ তেজোদীপ্ত পুরুষমূর্তি আর কখনও দেখে নাই।

একজন জেলে-মাঝি নিজের ক্ষুদ্র ডিঙিতে বসিয়া জাল বুনিতেছিল, যুবক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাপু, ঐ লোকটি কে জানো?"

জেলে একবার চোখ তুলিয়া বলিল, "ঐ উনি? উনি নিমাই পণ্ডিত।"

যুবক ভাবিল—পণ্ডিত! এত অল্প বয়সে পণ্ডিত! যুবকের নিজের পাণ্ডিত্যের সহিত কোনও সংবাদ ছিল না। সে বেনের ছেলে, বুদ্ধির বলেই সাত সাগর চষিয়া সোনাদানা আহরণ করিয়া আনিয়াছে। সে আর একবার নিমাই পণ্ডিতের অনিন্দ্য দেহকান্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হৃষ্টচিত্তে নগর পরিদর্শনে বাহির হইল।

বেনের ছেলের নাম চন্দনদাস। বেশ সুশ্রী চোখে-লাগা চেহারা; বয়স একুশ-বাইশ। বুদ্ধিমান, বাক্‌পটু, বিনয়ী—বেনের ছেলের যত প্রকার গুণ থাকা দরকার, সবই আছে; বরং দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া নানাজাতীয় লোকের সহিত মিশিয়া আরও পরিমার্জিত হইয়াছে। বেশভূষাও ঘরবাসী বাঙালী ইহতে পৃথক। পায়ে সিংহলী চটি, পরিধানে চাঁপা রঙের রেশমী ধুতি মালসাট করিয়া পরা; স্কন্ধে উত্তরীয়। দুই কানে হীরায় লবঙ্গ; মাথার কোঁকড়া চুল কাঁধ পর্যন্ত পড়িয়াছে—মাঝখানে সিঁথি। গলায় সোনার হার বণিক্‌পুত্রের জাতি-পরিচয় দিতেছে।

চন্দনদাস অগ্রদ্বীপের প্রসিদ্ধ সওদাগর রূপচাঁদ সাধুর পুত্র। রূপচাঁদ সাধুর বয়স হইয়াছে, তাই এবার নিজে না গিয়া উপযুক্ত পুত্রকে বাণিজ্যে পাঠাইয়াছিলেন। এক বৎসর নয় মাস পরে ছেলে বিলক্ষণ দু-পয়সা লাভ করিয়া দেশে ফিরিতেছে। বহুদিন একাদিক্রমে নৌকা চালাইয়া মাঝি-মাল্লারা ক্লান্ত; তাই একদিনের জন্য চন্দনদাস নবদ্বীপে নৌকা বাঁধিয়াছে। কাল প্রভাতেই আবার গৃহাভিমুখে যাত্রা করিবে।

চন্দনদাস হরষিত-মনে গঙ্গাঘাটের পথ ধরিয়া নগর দর্শনে চলিল। সে-সময় নবদ্বীপের সমৃদ্ধির বিশেষ খ্যাতি ছিল। পথে পথে নাটশালা, পাঠশালা, চূর্ণ-বিলেপিত দেউল, প্রতি গৃহচূড়ায় বিচিত্র ধাতু-কলস, প্রতি দ্বারে কারু-খচিত কপাট; বাজারের এক বিপণিতে লক্ষ তঙ্কার সওদা কেনা যায়। পথগুলি সংকীর্ণ বটে, কিন্তু তাহাতে নগরশ্রী আরও ঘনীভূত হইয়াছে। রাজপথে বহু লোকের ব্যস্ত যাতায়াত নগরকে সজীব ও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে।

অনায়াস-মন্থরপদে চন্দনদাস চারিদিকে চাহিতে চাহিতে চলিয়াছিল; কিছুদূর যাইবার পর একটি জিনিস দেখিয়া হঠাৎ তাহার বাইশ বছরের মুণ্ড ঘুরিয়া গেল; সে পথের মাঝখানেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়াইয়া পড়িল। বেচারা চন্দনদাস সাত সাগর পাড়ি দিয়াছে, কিন্তু সে বিদ্যাপতির কাব্য পড়ে নাই—'মেঘমাল সঞে তড়িতলতা জনু হৃদয়ে শেল দেই গেল'—এরূপ ব্যাপার যে সম্ভবপর, তাহা সে জানিত না। বিদ্যাপতি জানা থাকিলে হয়তো ভাবিতে পারিত—

অপরূপ পেখলুঁ রামা
কনকলতা অব- লম্বনে উয়ল
হরিণহীন হিমধামা।

কিন্তু চন্দনদাস কাব্যরসবঞ্চিত বেনের ছেলে, আত্মবিস্মৃতভাবে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল। প্রভাতে সে কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিল কে জানে, কিন্তু আজ তাহার সুন্দর মুখ দেখিবার পালা।

যাহাকে দেখিয়া চন্দনদাসের মুণ্ড ঘুরিয়া গিয়াছিল, সে মেয়েটি একজন বয়স্কা সহচরীর সঙ্গে ঘাটে স্নান করিতে যাইতেছিল। পূর্ণযৌবনা ষোড়শী—তাহার রূপের

বর্ণনা করিতে গিয়া হতাশ হইতে হয়। বৈষ্ণব-রসসাহিত্য নিঙড়াইয়া এই রূপের একটা কাঠামো খাড়া করা যাইতে পারে; হয়তো এমনই কোনও গোরোচনা গোরী নবীনার নববিকশিত রূপ দেখিয়া প্রেমিক বৈষ্ণব কবি তাঁহার রাই-কমলিনীকে গড়িয়াছিলেন, কে বলিতে পারে? মেয়েটির প্রতি পদক্ষেপে দর্শকের হৃৎকমল দুলিয়া দুলিয়া উঠে, যেন হৃৎকমলের উপর পা ফেলিয়া সে চলিয়াছে। তাহার মদির নয়নের অপাঙ্গদৃষ্টিতে মনের মধ্যে মধুর মাদকতা উন্মথিত হইয়া উঠে।

কিন্তু এত রূপ সত্ত্বেও মেয়েটির মুখখানি ম্লান, যেন তাহার উপর কালো মেঘের ছায়া পড়িয়াছে। চোখ দুটি অবনত করিয়া ধীরপদে সে চলিয়াছে; তৈলসিক্ত চুলগুলি পিঠের উপর ছড়ানো; পরণে আটপৌরে রাঙাপাড় শাড়ি। দেহে একখানিও গহনা নাই, এমন কি, নাকে বেসর, কানে দুল পর্যন্ত নাই। কেবল দুই হাতে দু'গাছি শঙ্খ।

মেয়েটির সঙ্গে যে সহচরী রহিয়াছে, তাহাকে সহচরী না বলিয়া প্রতিহারী বলিলেই ভালো হয়। সে যেন চারিদিক হইতে তাহাকে আগলাইয়া চলিয়াছে। তাহাকে দেখিলেই বুঝা যায়, বিগতযৌবনা ভ্রষ্টা স্ত্রীলোক। আঁটসাঁট দোহারা গঠন, গোলাকৃতি মুখ, কলহপ্রিয় বড় বড় দুইটা চোখ যেন সর্বদাই ঘুরিতেছে।

চন্দনদাস হাঁ করিয়া পথের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া রহিল, মেয়েটি তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল। পাশ দিয়া যাইবার সময় একবার চকিতের ন্যায় চোখ তুলিল, আবার তৎক্ষণাৎ মাথা হেঁট করিল। সঙ্গিনী স্ত্রীলোকটা কটমট করিয়া চন্দনদাসের পানে তাকাইল, তাহার আত্মবিস্মৃত বিহ্বলতার জন্য যেন কিছু বলিবে মনে করিল। কিন্তু চন্দনদাসের বিদেশীর মতো সাজ-সজ্জা দেখিয়া কিছু না বলিয়া সমস্ত দেহের একটা স্বৈরিণীসুলভ ভঙ্গী করিয়া চলিয়া গেল।

চন্দনদাসও অমনি ফিরিল। তাহার নগর-ভ্রমণের কথা আর মনে ছিল না, সে এক-দৃষ্টে মেয়েটির দিকে তাকাইয়া রহিল। মেয়েটিও কয়েক পা গিয়া একবার ঘাড় বাঁকাইয়া পিছু ফিরিয়া চাহিল। 'গেলি কামিনী, গজহু গামিনী, বিহসি পালটি নেহারি' —চন্দনদাসের যেটুকু সর্বনাশ হইতে বাকি ছিল, তাহাও এবার হইয়া গেল।

সেও গঙ্গাঘাটের দিকে ফিরিল, অগ্রবর্তিনী স্নানার্থিনীদের দৃষ্টি-বহির্ভূত হইতে না দিয়া তাহাদের পিছু পিছু চলিল।

ক্রমে তাহারা ঘাটের সম্মুখে পৌঁছিল। এখানে চন্দনদাস আবার নিমাই পণ্ডিতকে দেখিতে পাইল। তিনি স্নান শেষ করিয়া বোধ হয় গৃহে ফিরিতেছিলেন; ভিজা গামছা গায়ে জড়ানো। চন্দনদাস লক্ষ্য করিল, মেয়েটির প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই নিমাই পণ্ডিতের মুখে একটা ক্ষুব্ধ কারুণ্যের ভাব দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল। তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর স্ত্রীলোক দুইটি ঘাটে গিয়া স্নান করিল। চন্দনদাস একটু আড়ালে থাকিয়া চোরা চাহনিতে দেখিল। চন্দনদাস দুষ্মন্ত নয়,—"অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা" তাহার মনে আসিল না; কিন্তু নানা ক্ষুদ্র কারণে তাহার ধারণা জন্মিল যে, মেয়েটি বেনের মেয়ে, তাহার স্বজাতি। কিন্তু একটা কথা সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না, এত বয়স পর্যন্ত মেয়েটি অনূঢ়া কেন? বিধবা নয়, হাতের শঙ্খ ও রাঙাপাড় শাড়ি তাহার প্রমাণ। তবে ষোল-সতের বছরের মেয়ে বাংলাদেশে অবিবাহিতা থাকে কি করিয়া?

কিন্তু সে যাহা হউক, স্নান সারিয়া তাহারা যখন ফিরিয়া চলিল, তখন সেও তাহাদের পিছু লইল।

চন্দনদাসের ব্যবহারটা বর্তমানকালে কিছু বর্বরোচিত বোধ হইতে পারে; কিন্তু একালের রুচি দিয়া সেকালের শিষ্টাচার বিচার করা সর্বদা নিরাপদ নয়। তা ছাড়া,

উপস্থিত ক্ষেত্রে শিষ্টাচারের সূক্ষ্ম অনুশাসন মানিয়া চলিবার মতো হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা চন্দনদাসের ছিল না। তাঁহার কাঁচা হৃদ্‌যন্ত্রটা একেবারেই অবশ হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষ দোষ দেওয়াও যায় না। অনুরূপ অবস্থায় পড়িয়া সেকালের ঠাকুর-দেবতারাও কিরূপ বিহ্বল বে-এক্তিয়ার হইয়া পড়িতেন, তাহা তো ভক্ত কবিগণ লিপিবন্ধ করিয়াই গিয়াছেন।—"এ ধনি কে কহ বটে!"

মোট কথা, চন্দনদাস তাহার মন-চোরা মেয়েটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। এ-পথ হইতে ও-পথে কয়েকটা মোড় ফিরিয়া প্রায় একপোয়া পথ অতিক্রম করিবার পর মেয়েটি এক গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। চন্দনদাস দেখিল, পাড়াটা অপেক্ষাকৃত গরীব বেনে-পাড়া। অধিকাংশ বাড়ির খড়ের বা খোলার চাল।

গলির মধ্যে কিছুদূর গিয়া মেয়েটি এক ক্ষুদ্র পাকা বাড়ির দালানে উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। বাড়িটা পাকা বটে, কিন্তু অতিশয় জীর্ণ ও শ্রীহীন। বাড়ির সম্মুখীন হইয়া চন্দনদাস দেখিল, দালানের উপর একটি ক্ষুদ্র বেনের দোকান। আদা, মরিচ, হলুদ, চই ছোট ছোট ধামিতে সাজানো আছে; একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বেসাতি :। দালানের পশ্চাদ্ভাগে একটি দ্বার, উহাই অন্দরে প্রবেশ করিবার পথ। বুঝিল, ঐ পথেই মেয়েটি ও তাহার সঙ্গিনী অন্দরে প্রবেশ করিয়াছে।

চন্দনদাস বড় সমস্যায় পড়িল। সে কোন মতলব স্থির করিয়া ইহাদের অনুসরণ করে নাই, গুণের নৌকার ন্যায় অদৃশ্য রজ্জুবন্ধন তাহাকে টানিয়া আনিয়াছে। কিন্তু এখন সে কি করিবে? কেবলমাত্র মেয়েটির বাড়ি দেখিয়া ফিরিয়া যাইবে? চন্দনদাস বাড়ির সম্মুখ দিয়া কয়েকবার অলসভাবে যাতায়াত করিয়া কর্তব্য স্থির করিয়া লইল। তাহার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, তাহার মা তাহাকে নবদ্বীপ হইতে ভালো চুয়া কিনিয়া আনিতে বলিয়াছিলেন। সে-কথা সে ভুলে নাই, আজ নগর-ভ্রমণের সময় কিনিয়া লইবে স্থির করিয়াছিল; কিন্তু চুয়া কিনিবার অছিলা এমন ভাবে সদ্ব্যবহার করিবার কথা এতক্ষণ তাহার মনেই আসে নাই।

সে দৃঢ়পদে দোকানের সম্মুখীন হইল; মিঠা হাসিয়া বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগো ভালোমানুষের মেয়ে, তোমার দোকানে ভালো চুয়া আছে?"

যে বৃদ্ধা বেসাতি করিতেছিল, তাহার দেহ-যষ্টিতে বিন্দুমাত্র রস না থাকিলেও, প্রাণটা তাজা ও সরস ছিল। চন্দনদাসকে বাড়ির সম্মুখে অকারণ ঘুর্‌ঘুর্‌ করিতে দেখিয়া বুড়ী এই অনিশ্চিত ঘোরাঘুরির গূঢ় কারণটি ধরিয়া ফেলিয়াছিল এবং মনে মনে একটু আমোদ অনুভব করিতেছিল। পাড়ার কোনও চ্যাংড়া ছোঁড়া হইলে বুড়ী মুখ ছাড়িত; কিন্তু এই কান্তিমান সুদর্শন ছেলেটির বিদেশীর মতো সাজ-পোশাক দেখিয়া সে একটু আকৃষ্ট হইয়াছিল।

চন্দনদাসের প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল, "আছে বইকি বাছা। এসো, বসো।"

চন্দনদাসও তাই চায়, সে দালানে উঠিয়া জলচৌকির উপর চাপিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা, তোমাদের বাড়িতে কি পুরুষমানুষ নেই? তুমি নিজে বেসাতি করছ যে?"

বৃদ্ধা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সে কথা আর বলো না বাছা; একটা ব্যাটাছেলে ঘরে থাকলে কি আজ আমাদের এমন খোয়ার হয়?" তারপর কথা পাল্টাইয়া বলিল, "তা হ্যাঁ বাছা, তোমাকে তো আগে কখনও দেখিনি, ন'দের লোক নও বুঝি?"

চন্দনদাস বলিল, "না, আমার বাড়ি অগ্রদ্বীপ।"

বুড়ী বলিল, "ও—তাই। কথায়-বার্তায় যেন বেনের ছেলে বলে মনে হচ্ছে।"

চন্দনদাস তখন জাতি-পরিচয় দিল, নিজের ও পিতার নাম উল্লেখ করিল। বুড়ী

দু'দণ্ড বসিয়া গল্প করিবার লোক পায় না, সে আহ্লাদে গদগদ হইয়া বলিল, "ও মা, তুমি তো আমাদের ঘরের ছেলে গো—স্বজাত! আহা, যেমন সোনার কার্তিকের মতো চেহারা, তেমনি মা'র কোল জুড়ে বেঁচে থাকো।—কোথায় বিয়ে-থা করেছ?"

চন্দনদাস কহিল, "তের বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল আয়ি, এক বছর পরেই বৌ মরে যায়। তারপর আর বিয়ে করিনি।"

বুড়ী একটু বিমনা হইল; তারপর উৎসুকভাবে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

চন্দনদাস কথাপ্রসঙ্গে বলিল, "সমুদ্রে গিয়েছিলাম আয়ি, দু'বছর পরে দেশে ফিরছি। তা ভাবলাম, ন'দেয় একদিন থেকে যাই; মা'র বরাত আছে চুয়া কেনবার, চুয়া কেনাও হবে, একটু জিরেন দেওয়াও হবে।"

বুড়ী বলিল, "তা বেশ করেছ বাছা, ভাগ্যিস এসেছিলে তাই তো অমন চাঁদমুখখানি দেখতে পেলাম।" বুড়ী একটা নিশ্বাস ফেলিল। তাহার প্রাণের ভিতরটা হায় হায় করিয়া উঠিল। আহা, যদি সম্ভব হইত!

চন্দনদাস এতক্ষণ ফাঁক খুঁজিতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল, "আয়ি, তোমার আপনার জন কি আর কেউ নেই?"

"একটি নাতনী আছে, আর সব মরে হেজে গেছে। পোড়াকপালী ছুঁড়ীর কপাল!"—বলিয়া বুড়ী আঁচলে চোখ মুছিল।

"নাতনী!"—চন্দনদাস সচকিত হইয়া উঠিল; তবে বুড়ীর নাতনীকেই সে দেখিয়াছে। —"তবে তুমি বুড়োমানুষ দোকান দেখ কেন? সে দেখতে পারে না?"

বুড়ী উদাস আশাহীন সুরে বলিল, "সে অনেক কথা, বাছা। আমাদের দুঃখের কাহিনী কাউকে বলবার নয়। সমাজ আমাদের বিনা দোষে জাতে ঠেলেছে, মুখ তুলে চাইবার কেউ নেই। আর কাকেই বা দোষ দেব, সব দোষ ঐ হতভাগীর কপালের। এমন রূপ নিয়ে জন্মেছিল, ঐ রূপই ওর শত্তুর।"

চন্দনদাসের কৌতূহল ও উত্তেজনা বাড়িয়াই চলিয়াছিল। সে সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, "কি ব্যাপার আয়ি? সব কথা খুলেই বলো না।"

বুড়ী কিন্তু রাজী হইল না, বলিল, "কি হবে বাবা আমাদের লজ্জার কথা শুনে? কিছু তো করতে পারবে না, কেবল মনে দুঃখ পাবে।"

"কে বললে, কিছু পারব না?"

"না বাবা, সে কেউ পারবে না।—আহা! সোনার প্রতিমা আমার কালই জলে ভাসিয়ে দিতে হবে রে!"—বলিয়া বুড়ী হঠাৎ মুখে কাপড় চাপা দিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

চন্দনদাস বুড়ীর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আয়ি, আমি বেনের ছেলে, তোর গা ছুঁয়ে বলছি, মানুষের যা সাধ্য আমি তা করব। তোর নাতনীর কি বিপদ বল্।"

বুড়ী উত্তর দিবার পূর্বেই, বোধ করি তাহার ক্রন্দনের শব্দে আকৃষ্ট হইয়া সেই বিগতযৌবনা প্রহরিণী বাহির হইয়া আসিল, কর্কশকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁদছিস কেন রে, বুড়ী? কি হয়েছে।"

বুড়ী বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী, তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া আমতা আমতা করিয়া বলিল, "কিছু নয় রে চাঁপা—অমনি। এই ছেলেটি দূর-সম্পর্কে আমার নাতি হয়, অনেক দিন পরে দেখলুম—তাই—"

চাঁপা চন্দনদাসের দিকে ফিরিল, বৃহৎ সুবর্তুল চক্ষু তাহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া বুড়ীর উদ্দেশে বলিল, "হুঁ—নাতি!—তোর নাতি আছে, আগে কখনও বলিসনি তো?"

বুড়ী কম্পিতস্বরে বলিল, "বললুম না, দূর-সম্পর্কে। আমার পিসতুত বোনের—"

চাঁপা বলিল, "বুঝেছি।"—তারপর চন্দনদাসকে প্রশ্ন করিল, "তোমাকে আজ পথে দেখেছি না?"

চন্দনদাস সটান মিথ্যা কথা বলিল, "কই, না! আমার তো মনে পড়ছে না!"

চাঁপা তীক্ষ্ণ-চক্ষে আরও কিছুক্ষণ চন্দনদাসকে নিরীক্ষণ করিল, শেষে মুখে একটু হাসি আনিয়া বলিল, "তবে আমারই ভুল। বুড়ী, তুই তাহলে তোর নাতির সঙ্গে কথা ক'—আমি একটু পাড়া বেড়িয়ে আসি। তোর নাতি আজ এখানে থাকবে তো? দেখিস, ছেড়ে দিসনি যেন, এমন রসের নাতি কালেভদ্রে পাওয়া যায়।"—বলিয়া চোখ ঘুরাইয়া বাহিরের দিকে প্রস্থান করিল।

চাঁপা দৃষ্টি-বহির্ভূত হইয়া গেলে চন্দনদাস জিজ্ঞাসা করিল, "এটি কে?"

বুড়ীর তখনও হৃদ্‌কম্প দূর হয় নাই, সে বলিল, "ও মাগী যমের দূত। বাবা, এমন ভয় হয়েছিল—এখনি টুঁটি টিপে ধরত। তুই যা দাদা, আর এখানে থাকিসনি। ওরে, তুই আমাদের কি ভালো করবি? ভগবান আমাদের ভুলে গেছেন। তুই এখান থেকে পালা, শেষে কি মায়ের নিধি বেঘোরে প্রাণ দিবি?"

চন্দনদাস বলিল, "সে কি ঠান্‌দি, নাতিকে কি এমনি করেই তাড়াতে হয়? একটা পান পর্যন্ত দিতে নেই? তা ছাড়া চুয়া কিনতে এসেছি, চুয়া না দিয়েই তাড়িয়ে দিচ্ছিস? তুই কেমন বেনের মেয়ে?"

বুড়ী এবার হাসিয়া ফেলিল। এই ছেলেটির মুখের কথা যতই সে শুনিতেছিল, ততই তাহার মন ভিজিতেছিল। তাহার প্রাণের একান্তে বিদলিত মুহ্যমান আশা একটু মাথা তুলিল। তবে কি এই শেষ সময়ে ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিলেন?

বুড়ী মনে ভাবিল,—যা হয় তা হয়, একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিব। কে বলিতে পারে, হয়তো অভাগিনীর ভাগ্যে চরম দুর্গতি বিধাতা লেখেন নাই; নচেৎ নিরাশার গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে এই অপরিচিত বন্ধু কোথা হইতে আসিয়া জুটিল?

তখন বুড়ী সংকল্প স্থির করিয়া বলিল, "ও মা, সত্যি তো! চুয়ার কথা মনে ছিল না। তা দেব দাদা—কিন্তু বড় দামী জিনিস, দাম দিতে পারবে তো?"

"দাম কত?"

"জীবন-যৌবন-মন-প্রাণ সব দিলেও সে জিনিসের দাম হয় না।"

চন্দনদাস একটু অবাক হইল, কিন্তু হারিবার পাত্র সে নয়, বলিল, "আচ্ছা, আগে জিনিস দেখি।"

"এই যে, দেখাই। ওলো ও চুয়া, একবার এদিকে আয় তো, দিদি।"

চন্দনদাস তড়িৎস্পৃষ্টের মতো চমকিয়া উঠিল। তবে মেয়েটির নাম চুয়া! আর সে চুয়া কিনিতে এখানে আসিয়াছে! এ কি দৈব যোগাযোগ!

"কি বলছ ঠান্‌দি?"—বলিতে বলিতে চুয়া অন্দরের দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। চন্দনদাসকে দেখিয়া সে চমকিয়া বুকের উপর হাত রাখিল। চন্দনদাস সেই দিকেই তাকাইয়া ছিল, দেখিল, চুয়ার কুমুদের মতো গাল দুটিতে কে যেন কাঁচা সিঁদুর ছড়াইয়া দিল। তারপর ম্রিয়মাণ লজ্জায় তাহার চোখ দুটি ধীরে ধীরে নত হইয়া পড়িল। চন্দনদাস বুঝিল, চুয়া তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে; পথের ক্ষণিক-দেখা মুগ্ধ পান্থকে ভুলে নাই।

বুড়ী বলিল, "চুয়া, অতিথি এসেছে; একটু মিষ্টিমুখ করা, পান দে।"

চুয়া মুখ তুলিল না, আস্তে আস্তে চন্দনদাসের সতৃষ্ণ চক্ষুর সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল।

কিছুক্ষণ কোনও কথা হইল না। চন্দনদাস দ্বারের দিকেই তাকাইয়া রহিল। শেষে বুড়ী বলিল, "আমার চুয়াকে দেখলে?"

"দেখলাম।"—আগেও যে দেখিয়াছে, তাহা আর চন্দনদাস ভাঙিল না। বুড়ীও সে দিক দিয়া গেল না, বলিল, "কেমন মনে হল?"

"মনে হল—" সহসা চন্দনদাস বুড়ীর দিকে ঝুঁকিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ঠান্‌দি, চুয়ার কি বিপদ আমায় বলো। কেন তোমাদের সবাই জাতে ঠেলেছে? ওর এখনও বিয়ে হয়নি কেন?"

দ্বারের নিকট হইতে জবাব আসিল, "কি হবে তোমার শুনে?"

এক হাতে ফুল-কাঁসার ছোট রেকাবির উপর চারিখানি বাতাসা ও দুটি পান, অন্য হাতে জলের ঘটি লইয়া চুয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। চন্দনদাসের শেষ কথাগুলি সে শুনিতে পাইয়াছিল; শুনিয়া লজ্জায় ধিক্কারে তাহার মন ভরিয়া উঠিয়াছিল। কেন এই অপরিচিত যুবকের এত কৌতূহল? তাহাকে বলিয়াই বা লাভ কি? চুয়া রেকাবি ও ঘটি চন্দনদাসের সম্মুখে নামাইয়া আরক্ত-মুখে তীব্র অধীর স্বরে বলিল, "কে তুমি? কোথা থেকে এসেছ? কি হবে তোমার আমাদের কথা শুনে?"

ক্ষণকালের জন্য চন্দনদাস বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া রহিল; তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া চুয়ার মুখের উপর চোখ রাখিয়া শান্ত সংযত স্বরে বলিল, "চুয়া, আমি তোমার স্বজাতি; আমার বাড়ি অগ্রদ্বীপ। নবদ্বীপের ঘাটে আমার ডিঙ্গা বাঁধা আছে। তোমার কি বিপদ আমি জানি না; কিন্তু আমি যদি তোমায় সাহায্য করতে চাই, আমার সাহায্য কি নেবে না?"

চুয়ার মুখ হইতে সমস্ত রক্ত নামিয়া গিয়া মুখখানা সাদা হইয়া গেল। তাহার চোখে পরিত্রাণের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষণ-বিস্ফারিত আশার আলো ফুটিয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্তের জন্য তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তারপর সে রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, "কেন আমাকে মিছে আশা দিচ্ছ?"—বলিয়া দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

চন্দনদাস বসিয়া পড়িল। কিয়ৎকাল বসিয়া থাকিয়া অন্যমনস্কভাবে একখানা বাতাসা তুলিয়া লইয়া মুখে দিল; তারপর আলগোছে ঘটির জল গলায় ঢালিয়া জলপান করিল। শেষে পান দুটি মুখে পুরিয়া বুড়ীর দিকে তাকাইয়া মৃদুহাস্যে বলিল, "ঠান্‌দি, এবার তোমার গল্প বলো।"

"বলব, কিন্তু তুমি আগে একটা কথা দাও।"

"কি?"

"তুমি ওকে উদ্ধার করবে?"

"করব। অন্ততঃ প্রাণপণে চেষ্টা করব।"

"বেশ, উদ্ধার করা মানে ওকে এ দেশ থেকে নিয়ে পালাতে হবে। পারবে?"

"পারব—খুব পারব।"

"ভালো, কিন্তু তারপর?"

"তারপর কি?"

বুড়ী একটু দ্বিধা করিল; শেষে বলিল, "কিছু মনে করো না, সব কথা স্পষ্ট করে বলাই ভালো। তুমি জোয়ান ছেলে, চুয়াও যুবতী মেয়ে, তুমি ওকে চুরি করে নিয়ে যাবে। তার পর?"

চন্দনদাস জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া রহিল।

বুড়ী তখন স্পষ্ট করিয়া বলিল, "ওকে বিয়ে করতে পারবে?"

চন্দনদাসের চোখের সম্মুখে যেন একটা নূতন আলো জ্বলিয়া উঠিল; সে উদ্ভাসিত মুখে বলিল, "পারব।"

"তোমার বাপ-মা—"

"তাঁরা আমার কথায় অমত করবেন না।"

বৃদ্ধা কম্পিত স্বরে বলিল, "বেঁচে থাকো দাদা, তুমি বড় ভালো ছেলে। কিন্তু ছুঁড়ীর যা কপাল—"

বুড়ী তখন চুয়ার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। চন্দনদাস করতলে কপোল রাখিয়া শুনিতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে সে টের পাইল, চুয়া কখন চুপি চুপি আসিয়া দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়াছে।

চুয়ার বাপের নাম কাঞ্চনদাস। বেনেদের মধ্যে সে বেশ সংগতিপন্ন গৃহস্থ ছিল। চুয়ার বয়স যখন সাত বৎসর, তখন কাঞ্চনদাস বাণিজ্যের জন্য নৌকা সাজাইয়া সমুদ্র-যাত্রা করিল। কাঞ্চনদাসের নৌকা গঙ্গার বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল—আর ফিরিল না। সংবাদ আসিল, নৌকাডুবি হইয়া কাঞ্চনদাস মারা গিয়াছে।

এই ঘটনার এক বৎসর পরে চুয়ার মাও মরিল। তখন বুড়ী ছাড়া চুয়াকে দেখিবার আর কেহ রহিল না। বুড়ী কাঞ্চনদাসের মাসী—আট বছর বয়স হইতে সে হাতে করিয়া চুয়াকে মানুষ করিয়াছে।

নৌকাডুবিতে কাঞ্চনদাসের সমস্ত সম্পত্তিই ভরা-ডুবি হইয়াছিল, কেবল এই ভদ্রাসনটি বাঁচিয়াছিল। বুড়ী দোকান করিয়া কষ্টে সংসার চালাইতে লাগিল।

এইভাবে বৎসরাধিক কাল কাটিল। চুয়ার বয়স যখন দশ বছর, তখন এক গৃহস্থের ছেলের সঙ্গে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইল।

এই সময় একদিন জমিদারের ভ্রাতুষ্পুত্র ঘোড়ার চড়িয়া এই পথ দিয়া যাইতেছিল। চুয়াকে বাড়ির সম্মুখে খেলা করিতে দেখিয়া সে ঘোড়া হইতে নামিল। দুর্দান্ত জমিদারের মহাপাষণ্ড ভাইপো মাধবের নাম শুনিয়া দেশের লোক তো দূরের কথা, কাজি সাহেব পর্যন্ত থরথর করিয়া কাঁপে। রাজার শাসন—সমাজের শাসন কিছুই সে মানে না। জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলে কি হয়, স্বভাব তার চণ্ডালের মতো। সে দশ বছরের চুয়াকে চিবুক তুলিয়া ধরিয়া দেখিল, তারপর বাড়িতে আসিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। বুড়ী ভয়ে ভয়ে পরিচয় দিল। শুনিয়া মাধব বলিল, এ মেয়ের বিবাহ দেওয়া হইবে না, ইহাকে দৈবকার্যের জন্য মানত করিতে হইবে। ষোল বছর বয়স পর্যন্ত কুমারী থাকিবে, তারপর মাধব আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবে। তান্ত্রিক সাধনায় উত্তরসাধিকার স্থান অধিকার করিয়া কন্যার ষোল বছরের কৌমার্য সার্থক হইবে। সাধক—স্বয়ং মাধব।

এই হুকুম জারি করিয়া মাধব প্রস্থান করিল। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল; তান্ত্রিক সাধনার গূঢ় মর্মার্থ বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না। বণিক-সমাজ মাধবের বিরুদ্ধে কিছু করিতে সাহস করিল না, তাহারা চুয়াকে জাতিচ্যুত করিল। বিবাহও ভাঙিয়া গেল।

ক্রমে চুয়ার বয়স বাড়িতে লাগিল—বারো বছর বয়স হইল। বুড়ী দেশে কাহারও নিকট সাহায্য না পাইয়া শেষে চুয়াকে লইয়া দেশ ছাড়িয়া পলাইবার মতলব করিল। কিন্তু বুড়ীর হাতে পয়সা কম, আত্মীয়বন্ধুরও একান্ত অভাব। তাহার মতলব সিদ্ধ হইল না; মাধবের কানে সংবাদ গেল।

মাধব আসিয়া বুড়ীকে পদাঘাত মুষ্ট্যাঘাত দ্বারা শাসন করিল; তারপর চুয়াকে

পাহারা দিবার জন্য চাঁপাকে পাঠাইয়া দিল। নাপিত-কন্যা চাঁপা চুয়ার অভিভাবিকা-পদে অধিষ্ঠিত হইল। চাঁপা বয়সকালে তান্ত্রিক সাধন-ভজন করিয়াছিল, এখন যৌবনান্তে ধর্মকর্ম ত্যাগ করিয়াছে। সে চুয়া ও বুড়ীর উপর কড়া নজর রাখিতে লাগিল।

এইভাবে চারি বৎসর কাটিয়াছে। কয়েক দিন আগে মাধব আসিয়াছিল। সে চুয়াকে দেখিয়া গিয়াছে এবং বলিয়া গিয়াছে যে, আগামী অমাবস্যার রাত্রিতেই চুয়াকে দৈবকার্যে উৎসর্গ করিতে হইবে—সেজন্য যেন সে প্রস্তুত থাকে। অনুষ্ঠানের যাহাতে কোনও ত্রুটি না হয়, এজন্য মাধব নিজেই সমস্ত বিধান দিয়া গিয়াছে। অমাবস্যার সন্ধ্যার সময় চুয়া গঙ্গার ঘাটে গিয়া স্নান করিবে; স্নানান্তে রক্তবস্ত্র, জবামাল্য ও রক্তচন্দনের ফোঁটা পরিয়া ঘাট হইতে একেবারে সাধনস্থলে অর্থাৎ মাধবের উদ্যানবাটিকায় উপস্থিত হইবে। সঙ্গে ঢাক-ঢোল ইত্যাদি বাজিতে বাজিতে যাইবে। মাধব এইরূপ শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিয়া চলিয়া যাইবার পর পাঁচ দিন কাটিয়া গিয়াছে। আজ কৃষ্ণা চতুর্দশী—কাল অমাবস্যা।

গল্প শেষ করিয়া বুড়ী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দাদা, সব কথা তোমায় বললুম। এখন দেখ, যদি মেয়েটাকে উদ্ধার করতে পারো। তুমি ছাড়া ওর আর গতি নেই।"

গল্প শুনিতে শুনিতে চন্দনদাসের বুকের ভিতরটা জ্বালা করিতেছিল, ঐ দানব-প্রকৃতি লোকটার বিরুদ্ধে ক্রোধ ও আক্রোশ অগ্নিশিখার মতো তাহার দেহকে দাহ করিতেছিল। সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিয়া উঠিল, "আমি যদি চুয়াকে বিয়ে করে কাল আমার নৌকোয় তুলে নিয়ে দেশে নিয়ে যাই—কে কি করতে পারে?"

দ্বারের আড়ালে চুয়ার বুক দুরুদুরু করিয়া উঠিল। কিন্তু বুড়ী মাথা নাড়িয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "তা হয় না দাদা। চাঁপা রাক্ষুসী আছে—সে কখনই হতে দেবে না।"

চন্দনদাস বলিল, "চাঁপাকে সোনায় মুড়ে দেব। তাতে রাজী না হয়, মুখে কাপড় বেঁধে ঘরে বন্ধ করে রাখব।"

বুড়ী কাঁপিতে লাগিল, এতখানি দুঃসাহস তাহার পক্ষে কল্পনা করাও দুষ্কর; কিন্তু বুড়ীর প্রাণে আশা জাগিয়াছিল, আশা একবার জাগিলে সহজে মরিতে চায় না। তবু বুড়ী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "সে যেন হল, কিন্তু বিয়ে হবে কি করে? বিয়ে দেবে কে?"

"কেন—ন'দেয় কি পুরুত নেই?"

বৃদ্ধা মাথা নাড়িয়া বলিল, "তুমি মাধবকে জানো না। তার ভয়ে কোনও বামুন রাজী হবে না।"

চন্দনদাস আশ্চর্য হইয়া বলিল, "এখানকার বামুনরা এত ভীরু?"

"কার ঘাড়ে দশটা মাথা আছে দাদা, যে জমিদারের ভাইপোর শত্রুতা করবে? তবে—শুনেছি, জগন্নাথ ঠাকুরের ছেলে নিমাই পণ্ডিত বড় ডাকাবুকো ছেলে, কাউকে ভয় করেন না। বয়স কম কিনা!—কিন্তু তিনি কি রাজী হবেন?"

চন্দনদাস মহা উৎসাহে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "ভালো মনে করিয়ে দিয়েছ, ঠান্‌দি,—নিমাই পণ্ডিতই উপযুক্ত লোক। তাঁকে আমি আজ গঙ্গাঘাটে দেখেছি; ঠিক দেবতার মতো চেহারা—তিনি নিশ্চয় রাজী হবেন।—ঠান্‌দি, আমি এখন তাঁর খোঁজে চললাম, ওবেলা সব ঠিক করে আবার আসব। তখন—"

"কিন্তু তিনি যদি রাজী না হন?"

চন্দনদাস চিন্তা করিল, "যদি রাজী না হন—তিনি রাজী হোন বা না হোন, রাত্রিতে কোনও সময় আমি আসবই।—নাই বা হল বিয়ে? আজ রাত্রিতে চুয়াকে চুরি করে নিয়ে যাব। তারপর দেশে গিয়ে বিয়ে করব—কি বলো?"

বুড়ীর মুখে আশঙ্কার ছায়া পড়িল। চন্দনদাসের যে কোনও দুরভিসন্ধি নাই,

তাহা সে অন্তরে বুঝিতেছিল; কিন্তু তবু—চন্দনদাস একেবারে অপরিচিত। সেও যে একজন ধূর্ত প্রবঞ্চক নয়, তাহা বুড়ী কি করিয়া জানিবে? বারবার দাগা পাইয়া বুড়ীর মন বড় সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

এই সময় চুয়া দরজার আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিল। সংশয়-সংকোচ করিবার তাহার আর সময় ছিল না। এক দিকে অবশ্যম্ভাবী সর্বনাশ, অন্য দিকে সম্ভাবনা। চুয়া সজল চক্ষু চন্দনদাসের মুখের উপর রাখিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "তুমি আজ রাত্তিরে এসো। নিমাই পণ্ডিত যদি রাজী না হন, তবু, তোমার ধর্মের ওপর বিশ্বাস করে আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

চন্দনদাসের বুক নাচিয়া উঠিল। সে আনন্দের উচ্ছ্বাসে কি বলিতে যাইতেছিল—এমন সময় বাধা পড়িল।

গলির মধ্যে দ্রুত অশ্বক্ষুর-ধ্বনি শুনা গেল। চুয়া একটা আর্ত চিৎকার গলার মধ্যে রোধ করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গিয়া ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। বুড়ী থরথর করিয়া কাঁপিয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া পড়িল।

পরক্ষণেই একজন অশ্বারূঢ় ব্যক্তি বাড়ির সম্মুখে আসিয়া ঘোড়া থামাইল। লোকটার গায়ে লাল রঙের কোর্তা, কোমরে তরবারি, মাথায় পাগ নাই, ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল কাঁধ পর্যন্ত পড়িয়াছে; কপালে প্রকাণ্ড একটা সিন্দুরের ফোঁটা। ফোঁটার নিচে বিশাল ভাঁটার মতো চোখ দুটাও প্রায় অনুরূপ রক্তবর্ণ। মুখে ঘনকৃষ্ণ গোঁফ এবং গালে গালপাট্টা। বয়স বোধ করি পঁয়তাল্লিশ।

এই ভীষণাকৃতি লোকটার মুখের প্রতি অবয়বে যেন জীবনব্যাপী দুষ্কৃতি ও পাপ পঙ্কিল রেখায় অঙ্কিত হইয়া আছে। এমন দুষ্কার্য নাই—যাহা সে করে নাই; এমন মহাপাতক নাই—যাহা সে করিতে পারে না। একটা ঘৃণার শিহরণ চন্দনদাসের দেহের উপর দিয়া বহিয়া গিল; সে চিনিল, ইনিই জমিদারের দুর্দান্ত ভ্রাতুষ্পুত্র মাধব।

মাধব একলাফে ঘোড়া হইতে নামিয়া ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া দালানের উপর উঠিল। সম্মুখেই চন্দনদাস; রক্তচক্ষু দ্বারা আপাদমস্তক তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া স্বভাবকর্কশ ভয়ংকর সুরে মাধব প্রশ্ন করিল, "তুই কে?"

চন্দনদাসের ইচ্ছা হইল, মাধবের দম্ভস্ফীত মুখে একটা লাথি মারে; কিন্তু সে তাহা করিল না। তাহার মাথার মধ্যে বিদ্যুতের মতো চিন্তাকার্য চলিতেছিল। মাধবের অভাবনীয় আবির্ভাবে তাহার সমস্ত মতলব পণ্ড হইয়া গিয়াছিল; সে ভাবিতেছিল, এ অবস্থায় কি করিলে সব দিক রক্ষা হয়? মাধবের সঙ্গে একটা গণ্ডগোল বাধাইলে লাভ হইবে না, বরং অনিষ্টের সম্ভাবনা। উপস্থিত ক্ষেত্রে কোনও হাঙ্গামা না করিয়া অপসৃত হওয়াই সুবিবেচনার কাজ। অথচ এই পাষণ্ডটার মুখ দেখিলে ও কথা শুনিলে মেজাজ ঠিক রাখা দুষ্কর। চুয়ার সর্বনাশ করিবার জন্যই এই নরপশু তাহাকে ছয় বৎসর জিয়াইয়া রাখিয়াছে, ভাবিতে চন্দনদাসের চোখের দৃষ্টি পর্যন্ত রক্তাভ হইয়া উঠিল।

তবু সে যথাসাধ্য আত্মদমন করিয়া মাধবের কথার উত্তর দিল, বলিল, "সে খোঁজে তোমার দরকার কি?"

মাধব একটা অকথ্য গালি দিয়া বলিল, "তুই এখানে কি চাস?"

চন্দনদাস আর ধৈর্য রক্ষা করিতে পারিল না, তাহার মাথায় খুন চাপিয়া গেল। সে প্রত্যুত্তরে মাধবের নাসিকায় বজ্রসম কিল বসাইয়া দিয়া বলিল, "এই চাই।"

এই নিরীহ-দর্শন যুবকের নিকট হইতে মাধব এত বড় দুঃসাহসিক কার্য একেবারে প্রত্যাশা করে নাই, সে সরিষার ফুল দেখিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল।

চন্দনদাস দেখিল, আর বিলম্ব করা সমীচীন নয়; সে নিরস্ত্র, মাধবের কোমরে তরবারি রহিয়াছে। ঘোড়াটা সম্মুখেই দাঁড়াইয়াছিল, সে দালান হইতে লাফ দিয়া তাহার পিঠে চড়িয়া বসিল। এই সময় মাধব ষণ্ডের মতো গর্জন করিয়া কোমর হইতে তরবারি বাহির করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহার নাগালে পৌঁছিবার পূর্বেই চন্দনদাস তেজী ঘোড়ার পেট দুই পায়ে চাপিয়া ধরিয়া সবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

কেহ কেহ লুকাইয়া পাপাচরণ করে। কিন্তু ধর্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া পাশবিক বলে প্রকাশ্যভাবে পাপানুষ্ঠান করিতে যাহারা অভ্যস্ত, তাহাদের অপরাধ-ক্লান্ত জীবনে এমন অবস্থা আসে, যখন কেবল মাত্র রমণীর সর্বনাশ করিয়া আর তাহারা তৃপ্তি পায় না। তখন তাহারা পাপাচারের সহিত ধর্মের ভণ্ডামি মিশাইয়া তাহাদের দুষ্কার্যের মধ্যে এক প্রকার নূতন রস ও বিলাসিতা সঞ্চারের চেষ্টা করে। মাধব এই শ্রেণীর পাপী।

চন্দনদাস তাহারই ঘোড়ায় চড়িয়া তাহাকে ফাঁকি দিয়া পলায়ন করিবার পর মাধব নিষ্ফল আক্রোশে আর কাহাকেও সম্মুখে না পাইয়া বুড়ীকে ধরিল; বুড়ীর চুলের মুঠি ধরিয়া তলোয়ার দিয়া তাহাকে কাটিতে উদ্যত হইল। কিন্তু কাটিতে গিয়া তাহার মনে হইল, বুড়ীকে মারিলে হয়তো সেই ধৃষ্ট যুবকের পরিচয় অজ্ঞাত রহিয়া যাইবে। কিল খাইয়া কিল চুরি করিবার লোক মাধব নয়; তখনও তাহার নাকের রক্তে গোঁফ ভাসিয়া যাইতেছিল। সে বুড়ীর চুল ধরিয়া টানিতে টানিতে ভিতরে লইয়া চলিল।

আঙিনার মাঝখানে বুড়ীকে আছড়াইয়া ফেলিয়া তাহার শীর্ণ হাতে একটা মোচড় দিয়া মাধব বলিল, "হারামজাদী বুড়ী, ও ছোঁড়া তোর কে বল্।"

পূর্বেই বলিয়াছি, বুড়ী বুদ্ধিমতী; তাই ভয়ে প্রাণ শুকাইয়া গেলেও তাহার চিন্তা করিবার শক্তি ছিল। সে বুঝিয়াছিল, কোনও কথা না বলিলেও প্রাণ যাইবে এবং ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিয়া ফেলিলেও প্রাণ যাইবে; সুতরাং মধ্যপথ অবলম্বন করাই যুক্তিসঙ্গত। সর্বনাশ উপস্থিত হইলে পণ্ডিতগণ অর্ধেক ত্যাগ করেন, বুড়ীও তেমনই ষড়যন্ত্রের অংশটা বাদ দিয়া আর সব সত্য কথা বলিবে স্থির করিল। তাহাতে আর কিছু না হউক, মাধবের হাতে প্রাণটা বাঁচিয়া যাইতে পারে।

বুড়ী তখন অকপটে চন্দনদাসের যতটা পরিচয় জানিতে পারিয়াছিল, তাহা মাধবের গোচর করিল। চাঁপা পাছে অনর্থক হাঙ্গামা করে, এই ভয়ে মিছামিছি চন্দনদাসকে নাতি বলিয়া পরিচিত করিয়াছিল, তাহাও স্বীকার করিল। কাঁদিতে কাঁদিতে, অনেক মাথার দিব্য, চোখের দিব্য দিয়া বলিল যে, চন্দনদাসকে সে পূর্বে কখনও দেখে নাই, আজ প্রথম সে তাহার দোকানে আসিয়া মিষ্ট কথায় তাহার সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করে। তাহার কোনও দুরভিসন্ধি ছিল কি না, তাহাও বুড়ীর অজ্ঞাত।

চাঁপা মাধবের বাড়িতে খবর দিতে গিয়াছিল, এতক্ষণে এক ঝাঁক পাইক সঙ্গে লইয়া পদব্রজে ফিরিল। পাইকদের হাতে সড়কি, ঢাল; জাতিতে তেঁতুলে বাগ্দী। ইহাদেরই বাহুবলে মাধব দেশটাকে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। প্রভু ও ভৃত্যে অবস্থাভেদ ছাড়া প্রকৃতিগত পার্থক্য বিশেষ ছিল না।

বুড়ীকে নানা প্রশ্ন করিয়া শেষে বোধ হয় মাধব তাহার গল্প বিশ্বাস করিল। চাঁপা যাহা বলিল, তাহাতে বুড়ীর কথা সমর্থিত হইল। তা ছাড়া মাধবের রক্তচক্ষুর

সম্মুখে বুড়ী মিথ্যা কথা বলিবে, ইহাও দাম্ভিক মাধব বিশ্বাস করিতে পারে না। সে এদিক-ওদিক তাকাইয়া বলিল, "তোর নাতনী কোথায়?"

বুড়ী বলিল, "ঘরেই আছে, বাবা।"

মাধব চাঁপাকে হুকুম করিল, "দেখে আয়।"

চাঁপা দেখিয়া আসিয়া বলিল, চুয়া ঘরেই আছে বটে।

মাধবের তখন বিশ্বাস জন্মিল, চুয়া সম্বন্ধে ভয়ের কোনও কারণ নাই। তবু সে দুইজন পাইককে বুড়ীর বাড়ি পাহারা দিবার জন্য নিযুক্ত করিল, বলিল, "কাল সন্ধ্যে পর্যন্ত এ বাড়িতে কাউকে ঢুকতে দিবিনে। যদি কেউ ঢুকতে চায়, তার গলায় সড়কি দিবি।"

এইরূপে বাড়ির সুব্যবস্থা করিয়া মাধব বাহিরে আসিল। এই সময় একবার তাহার মনে হইল, আর বৃথা দেরি না করিয়া আজই চুয়াকে নিজের প্রমোদ-উদ্যানে টানিয়া লইয়া যায়। কিন্তু তাহা হইলে এত বৎসর ধরিয়া যে চরম বিলাসিতার আয়োজন করিয়াছে, তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। মাধব নিরস্ত হইল। তৎপরিবর্তে যে স্পর্ধিত বেনের ছেলেটা তাহার গায়ে হাত তুলিতে সাহস করিয়াছে, তাহার নৌকা লুঠ করিয়া তাহাকে নিজের চক্ষুর সম্মুখে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতিয়া কুকুর দিয়া খাওয়াইবার আয়োজনে দিনটা সদ্ব্যয় করিতে মনস্থ করিল। এটাও একটা মন্দ বিলাসিতা নয়।

বাহিরে আসিয়া মাধব তাহার সর্দার-পাইককে বলিল, "বদন, তুই দশ জন পাইক নিয়ে গঙ্গাঘাটে যা। সেখানে চন্দনদাস বেনের নৌকো আটক কর্। আমি যাচ্ছি।"—বলিয়া আর একজন পাইককে ঘোড়া আনিতে পাঠাইল।

বদন সর্দার প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া যখন ঘাটে পৌঁছিল, তখন চন্দনদাসের নৌকা দু'খানি ভাগীরথীর বক্ষে শুভ্র পাল উড়াইয়া উজান বাহিয়া চলিয়াছে; বহুপদ-বিশিষ্ট বিরাট জল-পতঙ্গের মতো তাহাদের দাঁড়গুলি যেন গঙ্গার উপর তালে তালে পা ফেলিতেছে।

ওদিকে চন্দনদাস তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিয়াছিল। দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, পথে লোকজন কম। চন্দনদাস ধাবমান ঘোড়ার পিঠে বসিয়া চিন্তা করিতেছিল—এখন কর্তব্য কি? প্রথমতঃ, চুয়াকে রক্ষা করিতে হইবে। মাধবের নাকে কিল মারার ফলে তাহার ক্রোধ কোন্ পথ লইবে, অনুমান করা কঠিন; মাধব চুয়ার কথা ভুলিয়া তাহার প্রতি ধাবমান হইতে পারে; তাহাতে চুয়া কিছুক্ষণের জন্য রক্ষা পাইবে। দ্বিতীয়তঃ, তাহার নৌকা বাঁচাইতে হইবে। ক্রোধান্ধ মাধব প্রথমে তাহাকেই ধরিতে আসিবে; তখন তাহার অমূল্য পণ্য ও সোনাদানায় বোঝাই নৌকা লুণ্ঠিত হইবে! মাধব রেয়াৎ করিবে না।

ঘাটে পৌঁছিবার পূর্বেই চন্দনদাস কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। অশ্বত্থ-শাখায় ঘোড়া বাঁধিয়া সে দ্রুতপদে নৌকায় গিয়া উঠিল; দেখিল, মাঝি-মাল্লারা আহার করিতে বসিয়াছে। চন্দনদাস সর্দার-মাঝিকে ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিল, "এখনি নৌকো খুলতে হবে।"

হতবুদ্ধি মাঝি বলিল, "এখনি? কিন্তু—"

"শোনো, তর্ক করবার সময় নেই। এই দণ্ডে নৌকো খোলো—পাল আর দাঁড় দুই লাগাও। আজ সন্ধ্যে পর্যন্ত যতদূর সম্ভব উজান বেয়ে যাবে, তারপর গাঙের মাঝখানে নোঙর ফেলবে। আমি যতদিন না ফিরি সেইখানে অপেক্ষা করবে। বুঝলে?"

"আপনি সঙ্গে যাবেন না?"

"না। এখন যাও, আর দেরি করো না। যতদিন আমি না ফিরি সাবধানে নৌকো পাহারা দিও।"

"যে আজ্ঞা।"—বলিয়া প্রাচীন মাঝি চলিয়া গেল। মুহূর্ত পরে দুই নৌকার মাঝি-মাল্লার হাঁকডাক ও পাল তোলার হুড়াহুড়ি আরম্ভ হইল। এই অবকাশে চন্দনদাস নৌকার পশ্চাতে মাণিকভাণ্ডরে গিয়া কিছু জিনিস সংগ্রহ করিয়া লইল। প্রথমে সিন্দুক হইতে মোহর-ভরা একটা সর্পাকৃতি লম্বা থলি বাহির করিয়া কোমরে জড়াইয়া লইল। যে-কার্যে যাইতেছে, তাহাতে কত অর্থের প্রয়োজন কিছুই স্থিরতা নাই; অথচ বোঝা বাড়াইলে চলিবে না। চন্দনদাস ভাবিয়া চিন্তিয়া একছড়া মহামূল্য সিংহলী মুক্তার হার গলায় পরিয়া লইল। যদি মোহরে না কুলায়, হার বিক্রয় করিলে যথেষ্ট অর্থ পাওয়া যাইবে।

এ ছাড়া আরও দুইটি জিনিস চন্দনদাস সঙ্গে লইল। একটি ইস্পাতের উপর সোনার কাজ করা ছোট ছোরা; এটি সে কোচিনে এক আরব বণিকের নিকট কিনিয়াছিল। দ্বিতীয়, এক কাফ্রির উপহার একটি লোহার কাঁটা। কৃষ্ণবর্ণ দ্বিভুজ লোহার কাঁটা, সেকালে শৌখীন স্ত্রী-পুরুষ এইরূপ কাঁটা চুলে পরিত। এই কাঁটার বিশেষত্ব এই যে, ইহার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ শরীরের কোনও অংশে ফুটিলে তিনবার নিশ্বাস ফেলিতে যতক্ষণ সময় লাগে, ততক্ষণের মধ্যে মৃত্যু হইবে। চন্দনদাস কাঁটার সূক্ষ্মাগ্র সোনার খাপে ঢাকিয়া সাবধানে নিজের চুলের মধ্যে গুঁজিয়া লইল।

নৌকা হইতে নামিয়া চন্দনদাস নগরের ভিতর দিয়া আবার হাঁটিয়া চলিল। ঝাঁ-ঝাঁ দ্বিপ্রহর, আশে-পাশে দোকানের মধ্যে দোকানী নিদ্রালু; মধ্যাকাশ হইতে সূর্যদেব প্রখর রৌদ্র ঢালিয়া দিতেছেন। গাছ-পালা পর্যন্ত নিঝুম হইয়া পড়িয়াছে; মানুষ গৃহতলের ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছে।

কিছুদূর যাইবার পর একটা মোড়ের মাথায় পৌঁছিয়া চন্দনদাস এবার কোন্ পথে যাইবে ভাবিতেছে, এমন সময় তাহার চোখে পড়িল, একটা নয়-দশ বছরের কটিবাস-পরিহিত শীর্ণকায় বালক প্রচণ্ড মার্তণ্ড-ময়ূখ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া পথের মধ্যে একাকী ডাণ্ডাগুলি খেলিতেছে। চন্দনদাস হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিল। বালক ক্রীড়ায় বিরাম না দিয়া, যষ্টির আঘাতে ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ডটিকে চন্দনদাসের দিকে তাড়িত করিতে করিতে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তারপর প্রবীণের মতো তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চন্দনদাসের বেশভূষা নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "সওদাগর! সমুন্দুর থেকে আসছ—ন্যাঃ?"

বালকের ভাষা ও বাক্‌প্রণালী অতি অদ্ভুত—আমরা তাহা সরল ও সহজবোধ্য করিয়া দিলাম।

চন্দনদাস বলিল, "হ্যাঁ। নিমাই পণ্ডিতের বাড়ি কোথায় জানিস?"

বালক বলিল, "হিঃ—জানি।"

"আমাকে সেখানে নিয়ে চল্।"

বালকের ধূর্ত মুখে একটু হাসি দেখা দিল, সে এক চক্ষু মুদিত করিয়া বলিল, "ডাংগুলি খেলছি যে।"

"পয়সা দেব।"

আকর্ণ দন্তবিকাশ করিয়া বালক হাত পাতিল, "আগে দাও!"

চন্দনদাস তাহাকে একটা কপর্দক দিল, তখন সে আবার ডাংগুলি খেলিতে খেলিতে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল।

বেশী দূর যাইতে হইল না; নিম্ববৃক্ষচিহ্নিত একটা বাড়ি যষ্টি-নির্দেশে দেখাইয়া দিয়া বালক প্রস্থান করিতেছিল, চন্দনদাস তাহাকে ফিরিয়া ডাকিল, বলিল, "তুই যদি আর একটা কাজ করতে পারিস, তোকে চারটে পয়সা দেব।"

"কি?"

"কাঞ্চন বেনের বাড়ি জানিস?"

বালকের চক্ষু উজ্জ্বল হইল, "চুয়া? মাধায়ের কইমাছ? জানি।—হি হি!"

চন্দনদাসের ইচ্ছা হইল, অকালপক্ক ছোঁড়ার গালে একটা চপেটাঘাত করে; কিন্তু সে কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, চুয়া। শোন্, তার বাড়ির সামনে দিয়ে যাবি, কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করবি না, কেবল দেখে আসবি, সেখানে কি হচ্ছে। পারবি?"

বালক বলিল, "হিঃ—পয়সা দাও।"

চন্দনদাস মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, আগে খবর নিয়ে আসবি, তবে পয়সা পাবি। আমি এইখানেই থাকব।"

বালক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মনে মনে গবেষণা করিল, চন্দনদাসকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে কি না? শেষে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া পূর্ববৎ ডাংগুলি খেলিতে খেলিতে প্রস্থান করিল।

চন্দনদাস তখন নিমাই পণ্ডিতের গৃহে প্রবেশ করিল। সম্মুখেই টোলের আটচালা; ছাত্ররা কেহ নাই, নিমাই পণ্ডিত একাকী বসিয়া আছেন। তাঁহার কোলে তুলটের একখানি নূতন পুঁথি; পাশে লেখনী ও মসীপাত্র। চন্দনদাসের পদশব্দে নিমাই পণ্ডিত মুখ তুলিলেন; প্রশান্ত বিশাল চক্ষু হইতে শাস্ত্র-চিন্তাজনিত স্বপ্নাচ্ছন্নতা দূর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাকে চান?"

চন্দনদাস বলিল, "নিমাই পণ্ডিতকে।"

"আমিই নিমাই পণ্ডিত।"

পাদুকা খুলিয়া চন্দনদাস গিয়া নিমাই পণ্ডিতকে প্রণাম করিল। নিমাই পণ্ডিত বয়সে তাহার অপেক্ষা ছোট হইলেও ব্রাহ্মণ। তুলসীপাতার ছোট বড় নাই।

নিমাই পণ্ডিত প্রণাম গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "দেখেছি বলে মনে হচ্ছে—আপনিই কি আজ দুখানি নৌকা নিয়ে সমুদ্রযাত্রা থেকে ফিরেছেন?"

চন্দনদাস বিনীতভাবে বলিল, "আজ্ঞা হাঁ, আমিই।"

নিমাই পণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন, "আজ আপনার নৌকার ঢেউয়ে নবদ্বীপের একটি অমূল্য রত্ন ভেসে যাচ্ছিল, অনেক কষ্টে রক্ষা করা গিয়েছে। যা হোক্, আপনি—?"

চন্দনদাস নিজের পরিচয় দিয়া শেষে করজোড়ে বলিল, "আপনি ব্রাহ্মণ এবং মহা-পণ্ডিত, আমাকে 'আপনি' সম্বোধন করলে আমার অপরাধ হয়।"

নিমাই পণ্ডিত বলিলেন, "বেশ, কি ব্যাপার বলো তো?"

চন্দনদাস বলিল, "একটা কাজে আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি। নবদ্বীপে কাউকে আমি চিনি না, কেবল আপনার নাম শুনেছি। শুনেছি, আপনি শুধু অপরাজেয় পণ্ডিত নন, সৎকার্য করবার সাহসও আপনার অদ্বিতীয়। আমাকে সাহায্য করবেন কি?"

নিমাই পণ্ডিত বুঝিলেন, বণিকতনয় আজ গুরুতর কোনও কাজ আদায় করিতে আসিয়াছে, মৃদুহাস্যে বলিলেন, "তোমার নম্রতা আর বিনয় দেখে ভয় হচ্ছে। যা হোক্, প্রস্তাবটা কি শুনি?"

চন্দনদাসও হাসিল; বুঝিল, নিমাই পণ্ডিতকে মিষ্ট চাটুকথায় বিগলিত করা চলিবে না, তাঁহার সহিত অকপট ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ। সে ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল,

"আপনি কাঞ্চন বেনের মেয়ে চুয়াকে জানেন?"

নিমাই পণ্ডিত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চন্দনদাসের মুখের পানে চাহিলেন। তাঁহার মুখ ঈষৎ গম্ভীর হইল, বলিলেন, "জানি। চুয়ার কথা নবদ্বীপে সকলেই জানে।"

চন্দনদাস বলিয়া উঠিল, "তবু তাকে উদ্ধারের চেষ্টা কেউ করে না?"

নিমাই পণ্ডিত স্থির হইয়া রহিলেন, কোনও উত্তর দিলেন না।

চন্দনদাস তখন বলিল, "আমি চুয়াকে বিয়ে করতে চাই। আপনি সহায় হবেন কি?"

নিমাই পণ্ডিত বিস্মিত হইলেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া কোল হইতে পুঁথি নামাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "কিন্তু চুয়া সম্বন্ধে সব কথা তুমি জানো কি?"

"যা জানি, আপনাকে বলছি।"—এই বলিয়া আজ নৌকা হইতে নামিবার পর এ পর্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত সবিস্তারে বর্ণনা করিল; শেষে কহিল, "এই নির্বান্ধব পুরীতে চুয়া যেমন একা, আমিও তেমনি একা। এখন আপনি যদি সাহায্য করেন, তবেই কিছু করিতে পারি। নচেৎ একটি বালিকার সর্বনাশ হয়।"

নিমাই পণ্ডিত ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চিন্তামগ্ন হইলেন।

এই সময় সেই বালক ডাংগুলি হস্তে ফিরিয়া আসিল। চন্দনদাস সাগ্রহে তাহাকে কাছে ডাকিতেই সে বলিল, "চুয়ার বাড়ির সামনে দুটো পাক্ বসে আছে; যে যাচ্ছে, তারে হুমকি দিচ্ছে।"

"আর কি দেখলি?"

"চুয়া আর তার ঠান্দি ঘরে আছে। চাঁপা নাপতিনী বুড়ীর সঙ্গে কোঁদল করছে।"

"আর কিছু?"

"আর মাধাই চন্নন বেনের ডিঙ্গি লুঠ করতে গেছে। পয়সা দাও।"

খুশি হইয়া চন্দনদাস বালককে চার পয়সার স্থলে দু'গন্ডা দিল। হৃষ্ট বালক তীক্ষ্ণস্বরে একবার "উ—" বলিয়া উল্লাস জ্ঞাপনপূর্বক ডাংগুলি খেলিতে খেলিতে প্রস্থান করিল।

বালককে বিদায় করিয়া চন্দনদাস নিমাই পণ্ডিতের দিকে ফিরিতেই তিনি উদ্দীপ্ত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আমি তোমাকে সাহায্য করব। তোমার উদ্যম প্রশংসনীয়; আমরা গাঁয়ের লোক যা করিনি, তুমি বিদেশী তাই করতে চাও। তোমার স্বার্থ আছে জানি, কিন্তু তাতে তোমার মহত্ত্বের কিছুমাত্র হানি হয় না; আমি কি করতে পারি বলো।"

চন্দনদাস বলিল, "তা আমিও জানি না। আপাততঃ পরামর্শ দিতে পারেন।"

"বেশ, এসো, পরামর্শ করা যাক্। মাধব যে রকম দুর্ধর্ষ পাষণ্ড, তার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগে কোনও ফল হবে না। আমার মনে হয়—"

চন্দনদাস বলিল, "একটি নিবেদন আছে। আমার বড় তৃষ্ণা পেয়েছে; ব্রাহ্মণবাড়ি একটু পাদোদক পেতে পারি?"

নিমাই সচকিত হইয়া বলিলেন, "তুমি এখনও আহার করোনি?"

চন্দনদাস হাসিয়া বলিল, "না, কেবল চুয়ার দেওয়া একখানি বাতাসা খেয়েছি।"

"কি আশ্চর্য! এতক্ষণ বলোনি কেন? দাঁড়াও, আমি দেখি।"—বলিয়া খড়ম পরিয়া ত্বরিতে অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

বেলা তখন তৃতীয় প্রহর। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ভৃত্য-পরিজন সকলকে খাওয়াইয়া নিজে আহারে বসিতে যাইতেছিলেন, নিমাই গিয়া বলিলেন, "একজন অতিথি এসেছে। খেতে দিতে পারবে?"

বিষ্ণুপ্রিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "পারব।" তারপর ক্ষিপ্রহস্তে দালানে জল-ছড়া দিয়া পিঁড়ি পাতিয়া নিজের অন্নব্যঞ্জন অতিথির জন্য ধরিয়া দিয়া স্বামীর মুখের পানে

চাহিলেন।

নিমাই দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন, স্মিতমুখে চন্দনদাসকে ডাকিতে গেলেন। এই নীরব কর্মপরায়ণা অনাদৃতা বধূটি ক্ষণকালের জন্য নিমাই পণ্ডিতের মন হইতে লক্ষ্মীদেবীর স্মৃতি মুছিয়া দিল।

অতঃপর চন্দনদাস পরিতোষপূর্বক ব্রাহ্মণগৃহে প্রসাদ পাইল।

পরামর্শ স্থির করিতে অপরাহ্ণ গড়াইয়া গেল। যে সকল ছাত্র টোলে পড়িতে আসিল, নিমাই পণ্ডিত তাহাদের ফিরাইয়া দিলেন।

সংকল্প স্থির করিয়া নিমাই বলিলেন, "এ ছাড়া আর তো কোনও উপায় দেখি না। তৃতীয় ব্যক্তিকে দলে টানতে ভয় করে; কথাটা জানাজানি হয়ে যদি মাধবের কানে ওঠে, তাহলে আর কোনও ভরসা থাকবে না।"

চন্দনদাস জিজ্ঞাসা করিল, "এ দেশের মাঝি-মাল্লাদের বিশ্বাস করা যেতে পারে?"

"অন্য ব্যাপারে বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু যে ব্যাপারে মাধব আছে, তাতে কাউকে বিশ্বাস করা চলে না। ঘুণাক্ষরে আমাদের মতলব টের পেলে তারা আমাদেরই মাধবের হাতে ধরিয়ে দেবে।"

"তাহলে—"

নিমাই হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, মাঝি-মাল্লার কাজ আমাকেই করতে হবে। কাণভট্টের আশীর্বাদ দেখছি এরি মধ্যে ফলতে আরম্ভ করেছে।"

চন্দনদাস বলিল, "চুয়াকে আমি খবর দেব। শেষ রাত্রির দিকে পাইকরা ঘুমিয়ে পড়বে—সেই উপযুক্ত সময়। কি বলেন?"

"হ্যাঁ। তুমি তোমার নৌকা পাঠিয়ে দিয়ে বড় বুদ্ধিমানের কাজ করেছ। মাধব নিশ্চিন্ত থাকবে, হয়তো রাত্রিতে চুয়ার বাড়িতে পাহারা না থাকতে পারে।"

"অতটা ভরসা করি না। যা হোক্, দেখা যাক্।"

সন্ধ্যার প্রাক্কালে দুই জন বাহির হইলেন। ব্রাহ্মণপল্লী হইতে অনেকটা উত্তরে গঙ্গাতীরে নৌ-কর সূত্রধরদের বাস। সেখানে উপস্থিত হইয়া দুই জনে দেখিলেন, রাশি রাশি স্তূপীকৃত শাল, পিয়াল, সেগুন, জারুল কাষ্ঠের প্রাকারের মধ্যে ছোট বড় নানাবিধ নৌকা তৈয়ার হইতেছে। কোনটির কংকালমাত্র গঠিত হইয়াছে, কোনটি পাটাতনে শোভিত হইয়া পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিতেছে। বড় বড় বজরা—পঞ্চাশ দাঁড়ের নৌকা—কাহারও হাঙ্গর-মুখ, কেহ বা ময়ূরপঙ্ক্ষী, কেহ বা হংসমুখী। আবার ক্ষুদ্রকায় ডিঙ্গি, সংকীর্ণ দেহ ছিপও আছে। কোনটি সম্পূর্ণ হইয়াছে, কোনটি এখনও অসম্পূর্ণ।

দুই জনে অনেক নৌকা দেখিয়া শেষে একটি ছোট ডিঙ্গি পছন্দ করিলেন। ডিঙ্গির সুন্দর গঠন, আড়াই হাত চওড়া, আট হাত লম্বা—শোলার মতো হালকা। মাত্র চারি জন লোক তাহাতে বসিতে পারে।

নিমাই পণ্ডিত ছুতারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাম কত?"

ছুতার কিন্তু ডিঙ্গি বেচিতে রাজী হইল না, বলিল, "ফরমাশী ডিঙ্গি।"

চন্দনদাস জিজ্ঞাসা করিল, "এ ডিঙ্গির জন্যে কত দাম পাবে?"

ছুতার একটু বাড়াইয়া বলিল, "তিন তঙ্কা।"

চন্দনদাস নিঃশব্দে তাহার হাতে এক মোহর দিল। ছুতার স্বপ্নেও এত মূল্য কল্পনা

করে নাই, সে কিছুক্ষণ হতবাক্ থাকিয়া মহানন্দে ডিঙির মালিকত্ব চন্দনদাসকে সমর্পণ করিল।

ডিঙি তৎক্ষণাৎ গঙ্গার জলে ভাসানো হইল। নিমাই পণ্ডিত ও চন্দনদাস তাহাতে আরোহণ করিয়া দুই জোড়া দাঁড় হাতে লইলেন। দাঁড়ের আঘাতে ডিঙি জ্যা-মুক্ত তীরের মতো জলের উপর ছুটিয়া গেল।

কিছুক্ষণ গঙ্গাবক্ষে দাঁড় টানিয়া উভয়ে দেখিলেন, ডিঙি নির্দোষ ও অতি সহজে নিয়ন্ত্রণযোগ্য। দুই জনে সন্তুষ্ট হইয়া তীরে ফিরিলেন। তারপর নৌকা ছুতারের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া নিমাই পণ্ডিত বলিলেন, "কাল বৈকালে আমি এসে ডিঙি নিয়ে যাব।"

ছুতার সাহ্লাদে এক দিনের জন্য নৌকা রাখিতে সম্মত হইল।

অতঃপর নিমাই পণ্ডিত গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। চন্দনদাসের তখনও কাজ শেষ হয় নাই, সে গঙ্গার ধার দিয়া ঘাটের দিকে চলিল।

যে ঘাটে দ্বিপ্রহরে নৌকা বাঁধিয়াছিল, সেই ঘাটে যখন উপস্থিত হইল, তখন সন্ধ্যার ছায়া ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। ঘাটে কয়েকটি ক্ষুদ্র ডিঙি বাঁধা ছিল; চন্দনদাস কয়েকজন মাঝিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাপু, তোমরা জেলে তো?"

"আজ্ঞে, কর্তা।"

"তোমাদের মোড়ল কে?"

একজন বৃদ্ধ-গোছের জেলে বলিল, "আজ্ঞে কর্তা, আমি মোড়ল। আমার নাম শিবদাস।"

"বেশ। তোমার সঙ্গে আমি কিছু কারবার করতে চাই। এখানে যত জেলে আছে, সবাই তোমার অধীন তো?"

"আজ্ঞে।"

"কত জেলে-ডিঙি তোমাদের আছে?"

"তা—ত্রিশ-চল্লিশখানা হবে।"

"বেশ। শোনো: তোমাদের যত জেলে-ডিঙি আছে, সব আমি ভাড়া করলাম। তোমরা জেলে-মাঝির দল কাল বেলা তিন পহরের সময় বেরুবে; বেরিয়ে সটান স্রোতের মুখে দক্ষিণে গিয়ে শান্তিপুরের ঘাটে নৌকো বাঁধবে। তারপর সেখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। সন্ধ্যে পর্যন্ত আমি যদি না যাই, তাহলে আবার ফিরে আসবে।—বুঝলে?"

"বুঝলাম কর্তা। কিন্তু কাজটা কি, তা তো এখনও জানতে পারিনি।"

"কাজের কথা শান্তিপুরের ঘাটে জানতে পারবে। কেমন, রাজী আছ?"

"আজ্ঞে, গররাজী নই। কিন্তু ধরুন, শান্তিপুরের ঘাটে যদি আপনার দেখা না পাই?"

"বলেছি তো, তাহলে ফিরে আসবে।"

"কিন্তু আমাদের যাওয়া-আসা যে তাহলে না-হক হয়রানি হয়, কর্তা। আপনাকে তখন পাব কোথায়? আপনাকে তো চিনি না।"

চন্দনদাস হাসিয়া বলিল, "তা হলেও তোমাদের লোকসান হবে না। তোমাদের অর্ধেক ভাড়া আমি আগাম দিয়ে যাব। সব নৌকো শান্তিপুরে যাওয়া-আসার জন্যে কত ভাড়া লাগবে?"

শিবদাস মোড়ল বিবেচনা করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, দশটি তঙ্কার কমে হবে না।"

চন্দনদাস একটু ব্যবসাদারি করিল। কারণ, এক কথায় রাজী হইয়া গেলে জেলেরা

কিছু সন্দেহ করিতে পারে। কিছুক্ষণ কষা-মাজার পর নয় তঙ্কা ভাড়া ধার্য হইল। চন্দনদাস পাঁচ তঙ্কা শিবদাস মোড়লের হাতে দিয়া বলিল, "এই নাও। কিন্তু কথার নড়চড় যেন না হয়।"

"আজ্ঞে"—শিবদাস মুদ্রা গনিয়া লইল, "আপনি নিশ্চিন্দি থাকুন কর্তা, ঠিক সময়ে আমরা শান্তিপুরের ঘাটে হাজির থাকব—"

"সব ডিঙ্গি নিয়ে যাবে, একখানাও বাদ না পড়ে।"

"আজ্ঞে, একখানাও বাদ পড়বে না।"

এইরূপে নবদ্বীপ হইতে সমস্ত ডিঙ্গি তফাৎ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া চন্দনদাস কতকটা নিশ্চিন্তমনে নিমাই পণ্ডিতের গৃহে ফিরিল। সেইখানেই তাহার রাত্রিতে থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

রাত্রি তিন প্রহরে, চুয়ার বাড়ির দালানে পাইক দুই জন বসিয়া বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। একজন দেয়ালে ঠেস দিয়া পদযুগল প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি ঘুমের ঘোরে কখন কাৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল; তাহার নাসারন্ধ্র হইতে কামারের হাপরের মতো একপ্রকার শব্দ নির্গত হইতেছিল।

চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার; কিন্তু অন্ধকারে চক্ষু অভ্যস্ত হইলে কিছু কিছু দেখা যায়। চন্দনদাস নিঃশব্দে ছায়ার মতো দালানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার বাঁ হাতে সেই ক্ষুদ্র ছোরা। কিয়ৎকাল মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া সে পাইকের নাসিকাধ্বনি শুনিল, তারপর দালানের গাঢ়তর অন্ধকারের ভিতর তাহার চক্ষু বস্তু নির্বাচন করিতে আরম্ভ করিল।

যে পাইকটা বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতেছে, তাহার পদদ্বয় ঠিক দরজার সম্মুখে প্রসারিত; ভিতরে প্রবেশ করিতে হইলে তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া যাইতে হইবে। তা ছাড়া দরজার কবাট ভেজানো রহিয়াছে, ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ কি না, বুঝা যাইতেছে না। চন্দনদাস ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে হাত বাড়াইয়া কবাট একটু ঠেলিল। মরিচা-ধরা হাঁসকলে ছুঁচার ডাকের মতো শব্দ হইল। দরজা ঈষৎ খুলিল।

হাঁসকলের শব্দে পাইকের হাপর হঠাৎ বন্ধ হইল। চন্দনদাস স্পন্দিত-বক্ষে ছোরা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু পাইক জাগিল না, আবার তাহার নাক ডাকিয়া উঠিল।

চন্দনদাস তখন আবার কবাট একটু ঠেলিল, কবাট খুলিয়া গেল। এবারও একটু শব্দ হইল বটে, কিন্তু কেহ জাগিল না। তখন চন্দনদাস ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিয়া নিঃশব্দে পাইকের পদযুগল লঙ্ঘন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

আঙ্গিনায় উপস্থিত হইয়া চন্দনদাস চারিদিকে চাহিল। সম্মুখে কয়েকটা ঘর অস্ফুটভাবে দেখা যাইতেছে। কিন্তু কোন্ ঘরে চুয়া ঘুমাইতেছে? চাঁপাও বাড়িতে আছে; চুয়াকে খুঁজিতে গিয়া যদি চাঁপা জাগিয়া উঠে, তবেই সর্বনাশ। চন্দনদাস কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় তাহার হাতে মৃদু স্পর্শ হইল।

চন্দনদাস চমকিয়া উঠিয়া অজ্ঞাতসারেই ছোরা তুলিল। এই সময় তাহার কানের কাছে মৃদু শব্দ হইল, "এসেছ?"

"চুয়া!" কোমরে ছোরা রাখিয়া চন্দনদাস দুই হাতে চুয়ার হাত ধরিল, বলিল, "চুয়া! এসেছি।"

চুয়ার নিশ্বাসের মতো মৃদু চাপা স্বর থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল; সে

বলিল, "তুমি আসবে বলেছিলে, তাই আমি তোমার জন্যে সারা রাত জেগে আছি।"

অন্য সময় কথাগুলি অভিসারিকার প্রণয়বাণীর মতো শুনাইত; কিন্তু বিপদের মাঝখানে দাঁড়াইয়াও চন্দনদাসের মনে হইল, এত মধুর শব্দসমষ্টি সে আর কখনও শুনে নাই। চুয়ার মুখখানি দেখিবার জন্য তাহার প্রাণে দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জাগিতে লাগিল। অথচ অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। চন্দনদাস চুয়ার কানে কানে বলিল, "চুয়া, একটা আলো জ্বালতে পারো না? তোমাকে বড় দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

দু'জনে অন্ধকারে হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, চুয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "আচ্ছা, এসো।"—বলিয়া হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। চন্দনদাস তেমনই মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "চাঁপা কোথায়?"

"ঘুমুচ্ছে।"

"ঠান্‌দি?"

"ঠান্‌দিও ঘুমিয়ে পড়েছে।"

গোহালের মতো একটা পরিত্যক্ত ঘরে লইয়া গিয়া চুয়া চক্‌মকি ঠুকিয়া আলো জ্বালিল। তখন প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে চুয়ার মুখ দেখিয়া চন্দনদাস চমকিয়া উঠিল—চোখ দুটি জবাফুলের মতো লাল, চোখের কোলে কালি পড়িয়াছে; আশা, আশঙ্কা ও তীব্রোৎকণ্ঠার দ্বন্দ্বে চুয়ার অনুপম রূপ যেন ছিঁড়িয়া ভাঙিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

চন্দনদাসের বুকে বেদনার শূল বিঁধিল, সে বাষ্পাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "চুয়া!"

চুয়া মাটিতে বসিয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল; রোদনরুদ্ধ স্বরে বলিল, "তোমার নৌকো চলে গেছে শুনে এত ভয় হয়েছিল!"

চন্দনদাস চুয়ার পাশে বসিয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "চুয়া, আর ভয় নেই। তোমার উদ্ধারের সমস্ত ব্যবস্থা করেছি।"

চুয়া চোখ মুছিয়া মুখ তুলিল, "কি?"

চন্দনদাস বলিল, "বলছি। আগে বলো দেখি, তুমি সাঁতার কাটতে জানো?"

অবসাদ-ভরা সুরে চুয়া বলিল, "জানি। তাই তো ডুবে মরতে পারিনি। কতবার সে চেষ্টা করেছি।"

চন্দনদাসের ইচ্ছা হইল, চুয়াকে বুকে জড়াইয়া লইয়া সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু সে লোভ সংবরণ করিল, বলিল, "ও কথা ভুলে যাও, চুয়া, বুকে সাহস আনো। আমি এসেছি দেখেও তোমার সাহস হয় না?"

চুয়া কেবল তাহার কালিমালিপ্ত চোখ দুটি তুলিয়া চন্দনদাসের মুখের পানে চাহিয়া রহিল; হয়তো নিজের একান্ত নির্ভরশীলতার কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে চাহিল, কিন্তু বলিতে পারিল না। চন্দনদাস তখন সংক্ষেপে প্রাঞ্জলভাবে উদ্ধারের উপায় বিবৃত করিয়া বলিল; চুয়া ব্যগ্র বিস্ফারিতনয়নে শুনিল। শুনিতে শুনিতে তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

চন্দনদাসের বিবৃতি শেষ হইলে চুয়া কিছুক্ষণ হেঁটমুখে নীরব হইয়া রহিল। লজ্জা করিবার সে অবকাশ পায় নাই,—হৃদয়ের তুমুল আন্দোলনের মধ্যে এই তরুণ উদ্ধার-কর্তাটিকে সে যে কি দৃষ্টিতে দেখিয়াছে, তাহা নিজেই জানিতে পারে নাই। তাই উদ্ধারের আশা যখন তাহার সংশয়ময় চিত্তে আগুনের মতো জ্বলিয়া উঠিল, তখন সে আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না, চন্দনদাসের পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িল। দুই হাতে পা জড়াইয়া কাঁদিয়া কহিল, "একটা কথা বলো।"

চন্দনদাস চুয়ার মুখ তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, "চুয়া, চুয়া, কি কথা?"

"বলো, আমায় বিয়ে করবে? তুমি আমায় প্রবঞ্চনা করছ না?"

চন্দনদাস জোর করিয়া চুয়ার মুখ তুলিয়া তাহার চোখের উপর চোখ রাখিয়া বলিল, 'চুয়া, আমার মায়ের নামে শপথ করছি, তোমাকে যদি বিয়ে না করি, যদি আমার মনে অন্য কোনও অভিসন্ধি থাকে, তবে আমি কুলাঙ্গার।"

চুয়ার মাথা আবার মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। তারপর সে চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল, বলিল, "তবে আমাকে এখনই নিয়ে যাচ্ছ না কেন?"

চন্দনদাসের ইচ্ছা হইতেছিল, এখনই এই কারাগার হইতে চুয়াকে মুক্ত করিয়া লইয়া পলায়ন করে; কিন্তু সুবুদ্ধি নিষেধ করিল। রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে, ধরা পড়িবার সম্ভাবনা বড় বেশী। সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না—এখন ভরসা হয় না। বাড়ির দোরে পাহারা—যদি ওরা জেগে ওঠে।—কিন্তু আমার এখানে আর থাকা বোধ হয় নিরাপদ নয়—চাঁপার ঘুম ভাঙতে পারে।"—বলিয়া চন্দনদাস অনিচ্ছাভরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

চুয়ার মনে আবার ভয় প্রবেশ করিল। সম্মুখে সমস্ত দিন পড়িয়া আছে; কি জানি কি হয়! সে ভয়-কাতর চক্ষু দুইটি তুলিয়া বলিল, "যাচ্ছ?—কিন্তু—"

"কোনও ভয় নেই, চুয়া।"

"কিন্তু—যদি বিঘ্ন হয়—যদি—একটা জিনিস দিতে পারবে?"

"কি?"

"একটু বিষ। যদি কিছু বিঘ্ন হয়—"

চন্দনদাস কিছুক্ষণ শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে নিজের চুল হইতে সেই কাঁটা বাহির করিয়া দিল। গাঢ়স্বরে বলিল, "চুয়া, যদি দেখ কোনও আশা নেই তবেই ব্যবহার ক'রো, তার আগে নয়।"—বলিয়া কাঁটার ভয়ংকর কার্যকারিতা বুঝাইয়া দিল।

এতক্ষণে চুয়ার মুখে হাসি দেখা দিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রোজ্জ্বল চক্ষে বলিল, "আর আমি ভয় করি না।"

চন্দনদাসের মুখে কিন্তু হাসির প্রতিবিম্ব পড়িল না। সে চুয়ার দুই হাত লইয়া নিজের বুকের উপর রাখিয়া বলিল, "চুয়া—"

বাক্‌পটু চন্দনদাস ইহার অধিক আর কথা খুঁজিয়া পাইল না।

চুয়া অশ্রু-আর্দ্র হাসিমুখ একবার চন্দনদাসের বুকের উপর রাখিল, অস্ফুটস্বরে কহিল, "চুয়া নয়—চুয়া-বউ। এই আমাদের বিয়ে।"

ঘরের বাহিরে আসিবার পর একটা কথা চন্দনদাসের মনে পড়িল, সে বলিল, "ঠান্‌দির কথা ভুলে গিয়েছিলাম। তাকে ব'লো—কাল সন্ধ্যের পর বাড়ি থেকে পালিয়ে যেন নিমাই পণ্ডিতের বাড়িতে যায়। সেখানে দু'এক দিন লুকিয়ে থাকবে, তারপর আমি তাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব।"

গ্রীষ্মের হ্রস্ব রাত্রি তখন শেষ হইয়া আসিতেছে। কাক-কোকিল ডাকে নাই, কিন্তু বাতাসে আসন্ন প্রভাতের স্পর্শ লাগিয়াছে। পূর্বাকাশে শুকতারা দপ্‌ দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছে।

আঙিনায় দাঁড়াইয়া চন্দনদাস আর একবার চুয়ার দুই হাত নিজের বুকে চাপিয়া লইল। তারপর যে ভাবে আসিয়াছিল, সেই ভাবে ছায়ামূর্তির মতো বাহির হইয়া গেল।

পাইক দুই জন শেষ রাত্রির গভীর ঘুম ঘুমাইতে লাগিল।

অমাবস্যার সংশয়পূর্ণ দিবস ধীরে ধীরে ক্ষয় হইয়া আসিল। অপ্রত্যাশিত কিছু

ঘটিল না। কেবল দ্বিপ্রহরে মাধব চুয়ার গৃহে আসিয়া তদারক করিয়া গেল ও জানাইয়া গেল যে, তাহার প্রদত্ত শাস্ত্রীয়-বিধান যেন যথাযথ পালিত হয়।

এখানে চাঁপার কাজ শেষ হইয়াছিল; মাধবের অনুমতি পাইয়া সে প্রমোদ-উদ্যানে পূজার আয়োজন করিতে গেল।

সায়াহ্নে নবদ্বীপের ঘাটে স্নানার্থীর বিশেষ ভিড় ছিল না। দুই-চারি জন নারী গা ধুইয়া যাইতেছিল, কেহ কেহ কলসে ভরিয়া গঙ্গাজল লইয়া যাইতেছিল। পুরুষের সংখ্যা অল্প। কেবল একজন পুরুষ অধীরভাবে সোপানের উপর পদচারণ করিতেছিল ও মাঝে মাঝে স্থির হইয়া উৎকর্ণভাবে কি শুনিতেছিল। তাহার গলায় মুক্তাহার বিলম্বিত—অন্যথা সাধারণ বাঙালীর বেশ। বলা বাহুল্য, সে চন্দনদাস।

ক্রমে সূর্য নদীর পরপারে অস্তমিত হইল। নিদাঘকালের দ্রুত সন্ধ্যা যেন পক্ষ বিস্তার করিয়া আসিয়া ভাগীরথীর জলে ধূসর ছায়া বিছাইয়া দিল। পাশে নৌকাঘাট নির্জন ও নিস্তব্ধ। জেলে-ডিঙি একটিও নাই। দুই-একখানি স্থূলকলেবর মহাজনী কিস্তি নিঃসঙ্গ অসহায়ভাবে বিস্তীর্ণ ঘাটে লাগিয়া আছে।

গঙ্গাবক্ষেও নৌকা নাই। কেবল দূরে উত্তরে একটি ক্ষুদ্র ডিঙি স্রোতের মুখে ভাসিয়া আসিতেছে। অস্পষ্ট আলোকে মনে হয়, একটি লোক দাঁড় ধরিয়া তাহাতে বসিয়া আছে।

ক্রমে ডিঙি মাঝগঙ্গা দিয়া ঘাটের সম্মুখীন হইল; কিন্তু ঘাটের নিকটে আসিল না, গঙ্গাবক্ষে স্থির হইয়া রহিল। নৌকারূঢ় ব্যক্তি মাঝে মাঝে দাঁড় টানিয়া নৌকা ভাসিয়া যাইতে দিল না।

চন্দনদাস চিন্তিতমুখে অধীরপদে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল—ঐ আসিতেছে। পথে দূরাগত বাদ্যোদ্যম শুনা গেল। চন্দনদাস একবার গঙ্গাবক্ষস্থ ডিঙির দিকে তাকাইল, তারপর স্পন্দিতবক্ষে একটা গোলাকার বুরুজের উপর গিয়া বসিল।

বাদ্যধ্বনি ক্রমশঃ কাছে আসিতে লাগিল। মহারোলে কাঁসর-ঘণ্টা শিঙা-ঢোল বাজিতেছে। তামাসা দেখিবার জন্য বহু স্ত্রী-পুরুষ-বালক জুটিয়াছিল, তাহাদের কলরব সেই সঙ্গে মিশিয়া কোলাহল তুমুল হইয়া উঠিয়াছে।

ঘাটের শীর্ষে আসিয়া কোলাহল থামিল; বাজনা বন্ধ হইল। চন্দনদাস দেখিল, কৌতূহলী জনতাকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া দুই সারি ঢাল-সড়কিধারী পাইক নামিয়া আসিতেছে। তাহাদের দুই সারির মধ্যস্থলে মুক্তকেশী জবামাল্য-পরিহিতা চুয়া। চন্দনদাসও কৌতূহলী দর্শকের মতো দাঁড়াইয়া এই বিচিত্র শোভাযাত্রা দেখিতে লাগিল।

পাইকগণ সদম্ভে অস্ত্র আস্ফালন করিয়া দর্শকদের ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া ঘাটের দিকে নামিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের মধ্যবর্তিনী চুয়া মন্থরপদে এদিক-ওদিক চাহিতে চাহিতে সোপান অবরোহণ করিতে লাগিল।

তারপর চন্দনদাসের সঙ্গে তাহার চোখাচোখি হইল। নিমেষের দৃষ্টি-বিনিময়ে যে ইঙ্গিত খেলিয়া গেল, আর কেহ তাহা দেখিল না।

বুরুজের পাশ দিয়া যাইবার সময় চন্দনদাস অগ্রগামী পাইককে উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ সর্দার, এ তোমাদের কিসের মিছিল?"

বদন সর্দার প্রশ্নকারীর দিকে ভ্রূকুটি করিয়া তাকাইল, তাহার গলায় দোদুল্যমান মুক্তার হার দেখিল, তারপর রূঢ়স্বরে কহিল, "তোর অত খবরে দরকার কি?"

চন্দনদাস মুখে বিনীতভাব প্রকাশ করিয়া বলিল, "না না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।" মনে মনে বলিল, "মালিক আর চাকরের রা দেখি একই রকম। দাঁড়াও, তোমার মুণ্ড-

পাতের ব্যবস্থা করছি!"

পরবর্তী পাইকগণ সকলেই চোখ পাকাইয়া চন্দনদাসের দিকে তাকাইল; তাহার গলায় লোভনীয় মুক্তাহার কাহারও দৃষ্টি এড়াইল না। দুর্দান্ত প্রভুর উচ্ছৃঙ্খল ভৃত্য—হারছড়া কাড়িয়া লইবার জন্য সকলেরই হাত নিশপিশ করিতে লাগিল।

জলের কিনারায় গিয়া পাইকের দল থামিল। চুয়া সোপান হইতে ঝুঁকিয়া গঙ্গাজল মাথায় দিল; তাহার ঠোঁট দুটি অব্যক্ত প্রার্থনায় একটু নড়িল। তারপর সে ধীরে ধীরে জলে অবতরণ করিল। প্রথমে এক হাঁটু, ক্রমে এক কোমর, শেষে বুক পর্যন্ত জলে গিয়া দাঁড়াইল। গলার মালা জলে ভাসাইয়া দিয়া ডুব দিল।

পাইকেরা কিনারায় কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া গল্প করিতে করিতে গোঁফে মোচড় দিতে লাগিল।

এই সময় একটি ক্ষুদ্র ব্যাপার ঘটিল। চন্দনদাস ইতিমধ্যে বুরুজ হইতে নামিয়া পাইকদের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, হঠাৎ ব্যাকুলস্বরে বলিয়া উঠিল, "ঐ যাঃ!"

একজন পাইক ফিরিয়া দেখিল, চন্দনদাসের গলার মুক্তাহার ছিঁড়িয়া গিয়াছে এবং মুক্তাগুলি সুতা হইতে ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া ঘাটের শানের উপর ঝরিয়া পড়িতেছে। সে লাফাইয়া আসিয়া মুক্তা কুড়াইতে লাগিল। তাহাকে মুক্তা কুড়াইতে দেখিয়া বাকি কয়জন পাইক হুড়মুড় করিয়া আসিয়া পড়িল। মুক্তার হরির লুট—এমন সুযোগ বড় ঘটে না। সকলে কাড়াকাড়ি করিয়া মুক্তা চুনিতে লাগিল, ঠেলা খাইয়া চন্দনদাস বাহিরে ছিটকাইয়া পড়িল।

পাইকেরা মুক্তা কুড়াইতেছে, দর্শকেরা তাহাদের ঘিরিয়া লুব্ধচক্ষে দেখিতেছে। কেহ লক্ষ্য করিল না যে, এই অবকাশে চন্দনদাস গঙ্গায় নামিল। চুয়া তখন সাঁতার দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

চুয়া ও চন্দনদাস পাশাপাশি সাঁতার কাটিয়া চলিল। অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে; তাহাদের কালো মাথা দুটি কেবল জলের উপর দেখা যাইতেছে। চুয়া চন্দনদাসের পানে তাকাইল, তাহার সিক্ত মুখের উচ্ছলিত হাসি চন্দনদাসকে পুরস্কৃত করিল।

তাহারা যখন ঘাট হইতে প্রায় চল্লিশ হাত গিয়াছে, তখন ঘাটে একটা হৈ-হৈ শব্দ উঠিল। তারপর "ধর্‌ ধর্‌, পালাল, পালাল—" বলিয়া কয়েক জন পাইক জলে লাফাইয়া পড়িল, কয়েক জন নৌকার সন্ধানে ছুটিল। কিন্তু নৌকা কোথায়? বদন সর্দার ষাঁড়ের মতো চেঁচাইতে লাগিল।

গঙ্গার বুকে যে ছোট্ট ডিঙ্গি ভাসিতেছিল, তাহা ক্রমে নিকটবর্তী হইতে লাগিল। চন্দনদাস বলিল, "চুয়া, যদি হাঁপিয়ে পড়ে থাকো, আমার কাঁধ ধরো।"

চুয়া বলিল, "না, আমি পারব।"

চন্দনদাস পিছু ফিরিয়া দেখিল, যে পাইকগুলা জলে ঝাঁপ দিয়াছিল, তাহারা সজোরে সাঁতারিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহারা এখনও অনেক দূরে, নৌকা সম্মুখেই। কয়েক মুহূর্ত পরে দুইজনে একসঙ্গে গিয়া নৌকার কানা ধরিল।

নিমাই পণ্ডিত দাঁড় ছাড়িয়া চুয়াকে ধরিয়া নৌকায় তুলিলেন। চন্দনদাস তাহার পরে উঠিল।

যে পাইকটা সর্বাগ্রে আসিতেছিল, সে প্রায় বিশ হাতের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। সে হাত তুলিয়া ভাঙা গলায় চিৎকার করিয়া কি একটা বলিল। প্রত্যুত্তরে চন্দনদাস উচ্চ হাসিয়া দু'খানা দাঁড় হাতে তুলিয়া লইল। নিমাই পণ্ডিতও দাঁড় হাতে লইলেন।

দুই জনে একসঙ্গে দাঁড় জলে ডুবাইয়া টানিলেন। প্রদোষের ছায়ালোকে ক্ষুদ্র ডিঙ্গি পাখির মতো উড়িয়া চলিল।

নবদ্বীপ হইতে পাঁচ ক্রোশ উত্তরে গঙ্গাবক্ষে চন্দনদাসের দুই সমুদ্রতরী নোঙর করা ছিল। অন্ধকারে তাহাদের একচাপ গাঢ়তর অন্ধকারের মতো দেখাইতেছিল।

রাত্রি এক প্রহরকালে ক্ষুদ্র নৌকা গিয়া চন্দনদাসের মধুকর ডিঙ্গার গায়ে ভিড়িল। মাঝিরা সজাগ ও সতর্ক ছিল; মুহূর্তমধ্যে সকলে বড় নৌকায় উঠিলেন।

নিমাই পণ্ডিত বলিলেন, "আমার কাজ তো শেষ হল, আমি এবার ফিরি।"

চন্দনদাস হাত জোড় করিয়া বলিল, "ঠাকুর, এত দয়া করলেন, একটু বিশ্রাম করে যান।"

নৌকায় দুইটি কুঠুরী—একটি মাণিকভাণ্ডার, অপরটি চন্দনদাসের শয়নকক্ষ। শয়নকক্ষের মেঝেয় রঙীন পক্ষ্মল সুতীর আস্তরণ। ঘরে দীপ জ্বলিতেছিল; সকলে তাহাতে প্রবেশ করিলেন। চুয়া এক কোণে জড়সড় হইয়া অর্ধশুষ্ক বসন গায়ে জড়াইয়া দাঁড়াইল। চন্দনদাস তাড়াতাড়ি পেটারি হইতে নিজের একখানা ক্ষৌমবস্ত্র বাহির করিয়া চুয়ার গায়ে ফেলিয়া দিল। চুয়া কাপড় লইয়া পাশের ঘরে গেল।

নিমাই পণ্ডিত আস্তরণের উপর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন; চুয়া প্রস্থান করিলে চন্দনদাস চুপিচুপি বলিল, "ঠাকুর, বিয়েটা আজ রাতেই দিয়ে দিলে ভাল হয়।"

নিমাই হাসিয়া বলিলেন, "এত তাড়া কিসের? বাড়ি গিয়ে বিয়ে করো।"

চন্দনদাস ভারি ভালোমানুষের মতো বলিল, "না ঠাকুর, চুয়া যদি কিছু মনে করে? —তা ছাড়া, নৌকোয় একটি বই শোবার ঘর নেই।"

নিমাই বলিলেন, "কিন্তু বিয়ে দিই কি করে? উপকরণ কই?"

"ঠাকুর, আপনি পণ্ডিতমানুষ, সামান্য পুরুত তো নন। আপনি ইচ্ছে করলে শুধু হাতেই বিয়ে দিতে পারেন।"

নিমাই স্মিতমুখে চিন্তা করিয়া বলিলেন, "মন্দ কথা নয়। তুমি কন্যাকে হরণ করে এনেছ, সুতরাং তোমাদের রাক্ষস-বিবাহ হতে পারে। রাক্ষস-বিবাহে কোনও অনুষ্ঠানের দরকার নেই।"

চন্দনদাস মহা উল্লাসে উঠিয়া গিয়া চুয়ার হাত ধরিয়া লইয়া আসিল; বলিল, "চুয়া, ঠাকুর এখনই আমাদের বিয়ে দেবেন।"

পট্টাম্বরপরিহিতা চুয়া নত-নয়নে রহিল। নিমাই হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "চন্দনদাস নাছোড়বান্দা, আজই বিয়ে করে তবে ছাড়বে।" চুয়ার মুখে অরুণরাগ দেখিয়া বুঝিলেন তাহার অমত নাই। বলিলেন, "বেশ। ফুলের মালা তো হবে না, দুছড়া হার যোগাড় করো।"

পুলকিত চন্দনদাস মাণিকভাণ্ডার হইতে দু'গাছা মুক্তার মালা বাহির করিয়া দিল। তখন বিবাহ-ক্রিয়া আরম্ভ হইল।

নিমাই একটি হার চুয়ার হাতে দিয়া বলিলেন, "দু'জনে দু'জনের গলায় দাও।"

উভয়ে মালা-বদল করিল।

নিমাই বলিলেন, "ঈশ্বর সাক্ষী করে গঙ্গার বুকের উপর ব্রাহ্মণ-সাক্ষাতে আজ তোমরা স্বামী-স্ত্রী হলে। আশীর্বাদ করি, তোমাদের মঙ্গল হোক।"

উভয়ে নতজানু হইয়া ভক্তিপূত-চিত্তে এই দেবকল্প তরুণ ব্রাহ্মণের পদধূলি লইল।

তারপর উঠিয়া চন্দনদাস বলিল, "ঠাকুর, এ বিয়ে লোকে মানবে তো?"

নিমাই পণ্ডিতের নাসা স্ফুরিত হইল, তিনি গর্বিতস্বরে বলিলেন, "নিমাই পণ্ডিত যে বিয়ের পুরুত, সে-বিয়ে অমান্য করে কে?"

চন্দনদাস তখন নিমাই পণ্ডিতের পদতলে একমুঠি মোহর রাখিয়া বলিল, "দেবতা, আপনার দক্ষিণা।"

নিমাই এইবার হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "ঐটি পারব না।—যাক্, আজ উঠলাম। বুড়ীকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা শীগ্‌গির করো। আর, বাড়ি গিয়ে যথারীতি লৌকিক বিবাহ করো। অধিকন্তু ন দোষায়।"

"তা করব। কিন্তু ঠাকুর, আপনি ক্লান্ত, পাঁচ-ছ' ক্রোশ দাঁড় টেনে এসেছেন, আজ রাত্রিটা নৌকোয় কাটিয়ে গেলে হত না?"

"না—আজই আমায় ফিরতে হবে। রাত্রিতে না ফিরলে মা চিন্তিত হবেন। তা ছাড়া, তোমার নৌকায় তো একটি বই ঘর নেই।"—বলিয়া মৃদু হাসিলেন।

চন্দনদাস একটু লজ্জিত হইল।

তারপর সেই মসীকৃষ্ণ অমাবস্যার মধ্যযামে নিমাই পণ্ডিত ডিঙ্গিতে উঠিয়া একাকী নবদ্বীপের পানে ফিরিয়া চলিলেন। যতক্ষণ তাঁহার দাঁড়ের শব্দ শুনা গেল, চুয়া ও চন্দন জোড়হস্তে তদ্গতচিত্তে নৌকার পাশে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল।

১৮ অগ্রহায়ণ ১৩৪১

বিষকন্যা

যে কালের উপর চিরবিস্মরণের পর্দা পড়িয়া গিয়াছে, সেকালে মিলনোৎকণ্ঠিতা নবযৌবনা নাগরী যখন সন্ধ্যাসমাগমে ভবনশীর্ষে উঠিয়া কেশপ্রসাধনে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন তাঁহার স্বর্ণমুকুরে যে উৎফুল্ল-উৎসুক স্মিত-সলজ্জ মুখের প্রতিবিম্ব পড়িত, তাহা এ কালেও আমরা সহজে অনুমান করিতে পারি। চিরন্তনী নারীর ঐ মূর্তিটিই শুধু শাশ্বত—যুগে যুগান্তরে অচপল হইয়া আছে। কেবলমাত্র ঐ নিদর্শন দ্বারাই তাঁহাকে সেই নারী বলিয়া চিনিয়া লইতে পারি।

কিন্তু অন্য বিষয়ে—?

সে যাক। প্রসাধনরতা সুন্দরীর দ্রুত অধীর হস্তে গজদন্ত-কঙ্কতিকা কেশ কর্ষণ করিয়া চলিতে থাকে। ক্রমে দুটি একটি উন্মূলিত কেশ কঙ্কতিকায় জড়াইয়া যায়; প্রসাধনশেষে সুন্দরী কঙ্কতিকা হইতে বিচ্ছিন্ন কেশগুচ্ছ মুক্ত করিয়া অন্যমনে দুই চম্পক-অঙ্গুলীর দ্বারা গ্রন্থি পাকাইয়া দূরে নিক্ষেপ করেন। ক্ষুদ্র কেশগ্রন্থি অবহেলার লক্ষ্যহীন বায়ুভরে উড়িয়া কোন্ বিস্মৃতির উপকূলে বিলীন হইয়া যায়, কে তাহার সন্ধান রাখে?

তেমনই, বহু বহু শতাব্দী পূর্বে একদা কয়েকটি মানুষের জীবন-সূত্র যেভাবে গ্রন্থি পাকাইয়া গিয়াছিল, ইতিহাস তাহার সন্ধান রাখে না। মহাকালভুজগের যে বক্ষচিহ্ন একদিন ধরিত্রীর উপর অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে। মৃন্ময়ী চিরনবীনা, বৃদ্ধ অতীতের ভোগ-লাঞ্ছন সে চিরদিন বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিতে ভালবাসে না। নিত্য নব নব নাগরের গৃহে তাহার অভিসার। হায় বহুভর্তৃকা, তোমার প্রেম এত চপল বলিয়াই কি তুমি চিরযৌবনময়ী?

দুই সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল হইল, যে কয়টি স্বল্পায়ু নর-নারীর জীবনসূত্র সুন্দরীর কুটিল কেশকুন্ডলীর মত জড়াইয়া গিয়াছিল, তাহাদের কাহিনী লিখিতে বসিয়াছি। লিখিতে বসিয়া একটা বড় বিস্ময় জাগিতেছে। জন্মজন্মান্তরের জীবন তো আমার নখদর্পণে, সহস্র জন্মের ব্যথা-বেদনা আনন্দের ইতিহাস তো এই জাতিস্মরের মস্তিষ্কের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, তবু যতই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমার বিগত জীবনের আলোচনা করি না কেন, দেখিতে পাই, কোনও না কোনও নারীকে কেন্দ্র করিয়া আমার জীবন আবর্তিত হইয়াছে; জীবনে যখনই কোনও বৃহৎ ঘটনা ঘটিয়াছে, তখনই তাহা এক নারীর জীবনের সঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছে। নারীদ্বেষক হইয়া জন্মিয়াছি, কিন্তু তবু নারীকে এড়াইতে পারি নাই। বিস্ময়ের সহিত মনে প্রশ্ন জাগিতেছে—পৃথিবীর শত কোটি মানুষের জীবন কি আমারই মত? ইহাই কি জীবনের অমোঘ অলঙ্ঘনীয় রীতি? কিম্বা—আমি একটা সৃষ্টিছাড়া ব্যতিক্রম?

ন্যূনাধিক চব্বিশ শতাব্দী পূর্বের কথা। বুদ্ধ তথাগত প্রায় শতাধিক বর্ষ হইল নির্বাণ লাভ করিয়াছেন। উত্তর ভারতে চারিটি রাজ্য—কাশী কোশল লিচ্ছবি ও মগধ। চারিটি রাজ্যের মধ্যে বংশানুক্রমে অহি-নকুলের সম্বন্ধ স্থায়িভাব ধারণ করিয়াছে। পাটলিপুত্রের সিংহাসনে শিশুনাগবংশীয় এক অশ্রুতকীর্তি রাজা অধিরূঢ়।

শিশুনাগবংশের ইতিবৃত্ত পুরাণে আদ্যন্ত ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ হইতে পায় নাই, অজাতশত্রুর পর হইতে কেমন যেন এলোমেলো হইয়া গিয়াছে। তাহার কারণ, অমিতবিক্রম অজাতশত্রুর পর হইতে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয় পর্যন্ত মগধে এক প্রকার রাষ্ট্রীয় বিপ্লব চলিয়াছিল। পিতাকে হত্যা করিয়া রাজ্য অধিকার করা শিশুনাগ-রাজবংশের একটা বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, বিপুল রাজপরিবারের মধ্যে সিংহাসনের জন্য হানাহানি অন্তর্বিবাদ সহজ ও প্রকৃতিসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। বংশের একজন শক্তিশালী ব্যক্তি রাজাকে বিতাড়িত করিয়া নিজে সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন, ইহার কিছুকাল পরে পূর্ববর্তী রাজা শক্তি সংগ্রহ করিয়া আবার সিংহাসন পুনরুদ্ধার করিলেন—এইভাবে ধারাবাহিক শাসন-পারম্পর্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বলা বাহুল্য, প্রজারাও সুখে ছিল না। তাহারা মাঝে মাঝে মাৎস্যন্যায় করিয়া রাজাকে মারিয়া আর একজনকে তাহার স্থানে বসাইয়া দিত। সেকালে প্রকৃতিপুঞ্জের সহিষ্ণুতা আধুনিক কালের মত এমন সর্বংসহা হইয়া উঠিতে পারে নাই, প্রয়োজন হইলে ধৈর্যের শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া যাইত। তখন শ্রীমন্মহারাজের শোণিতে পথের ধূলি নিবারিত হইত, তাঁহার জঠর-নিষ্কাশিত অন্ত্র দ্বারা রাজপুরী পরিবেষ্টিত করিয়া জিঘাংসু বিদ্রোহীর দল প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিত।

সে যাক। পুরাণে শিশুনাগবংশীয় মহারাজ চণ্ডের নাম পাওয়া যায় না। চণ্ডের প্রকৃত নাম কি ছিল তাহাও লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। মহিষের মত আকৃতির মধ্যে রাক্ষসের মত প্রকৃতি লইয়া ইনি কয়েক বৎসর মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তার পর—

কিন্তু সে পরের কথা।

রাজ-অবরোধে এক দাসী একটি কন্যা প্রসব করিয়াছিল। অবশ্য মহারাজ চণ্ডই কন্যার পিতা; সুতরাং সভাপণ্ডিত নবজাতা কন্যার কোষ্ঠী তৈয়ার করিলেন।

কোষ্ঠী পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিত বলিলেন—'শ্রীমন্, এই কন্যা অতিশয় কুলক্ষণা, প্রিয়জনের অনিষ্টকারিণী—সাক্ষাৎ বিষকন্যা। ইহাকে বর্জন করুন।'

সিংহাসনে আসীন মহারাজের বন্ধুর ললাটে ভীষণ ভ্রূকুটি দেখা দিল; পণ্ডিত অন্তরে কম্পিত হইলেন। স্পষ্ট কথা মহারাজ ভালবাসেন না; স্পষ্ট কথা বলিয়া অদ্যই সচিব শিবমিশ্রের যে দশা হইয়াছে, তাহা সকলেই জানে। পণ্ডিত স্খলিত বচনে বলিলেন—'মহারাজ, আপনার কল্যাণের জন্যই বলিতেছি, এ কন্যা বর্জনীয়া।'

কিন্তু মহারাজের ভ্রূকুটি শিথিল হইল না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'কোন্ প্রিয়জনের অধিক অনিষ্ট হওয়া সম্ভব?'

পণ্ডিত পুনরায় কোষ্ঠী দেখিলেন, তারপর ভয়ে ভয়ে বলিলেন—'উপস্থিত পিতা-মাতা সকলেরই অনিষ্ট-সম্ভাবনা রহিয়াছে। মঙ্গল সপ্তমে ও শনি অষ্টমে থাকিয়া পিতৃস্থানে পূর্ণদৃষ্টি করিতেছে।'

কে কোথায় দৃষ্টি করিতেছে তাহা জানিবার কৌতূহল মহারাজের ছিল না। তাঁহার মুখে স্ফুরিত-বিদ্যুৎ বৈশাখী মেঘ ঘনাইয়া আসিল। মহারাজের সাম্যদৃষ্টির সম্মুখে অপরাধী ও নিরপরাধের প্রভেদ নাই—অশুভ বা অপ্রীতিকর কথা যে উচ্চারণ করে সেই দণ্ডার্হ। এ ক্ষেত্রে শনি-মঙ্গলের পাপদৃষ্টির ফল যে জ্যোতিষাচার্যের শিরে বর্ষিত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? পণ্ডিত প্রমাদ গণিলেন।

সভা-বিদূষক বটুকভট্ট সিংহাসনের পাশে বসিয়াছিল। সে খর্বকায় বামন, মস্তকটি বৃহদাকার, কণ্ঠস্বর এরূপ তীক্ষ্ণ যে, মনে হয় কর্ণের পটহ ভেদ করিয়া যাইবে। পণ্ডিতের দুরবস্থা দেখিয়া সে সূচ্যগ্রসূক্ষ্ম কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, বলিল—'বিষকন্যা! তবে তো ভালই হইয়াছে, মহারাজ! এই দাসীপুত্রীকে সযত্নে পালন করুন। কালে যৌবনবতী হইলে ইহাকে নগর-নটির পদে অভিষিক্ত করিবেন। আপনার দুষ্ট প্রজারা অচিরাৎ যম-মন্দিরে প্রস্থান করিবে।'

বটুকভট্টকে রাজ-পার্ষদ সকলেই ভালবাসিত, শুধু তাহার বিদূষণ-চাতুর্যের জন্য নয়. বহুবার বহু বিপন্ন সভাসদ্‌কে সে রাজরোষ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল।

তাহার কথায় মহারাজের ভ্রূগ্রন্থি ঈষৎ উন্মোচিত হইল, তিনি বামহস্তে বটুকের কেশমুষ্টি ধরিয়া তাহাকে শূন্যে তুলিয়া ধরিলেন। সূত্রাগ্রে ব্যাদিত-মুখ মৎস্যের ন্যায় বটুক ঝুলিতে লাগিল।

রাজা বলিলেন—'বটুক, তোর জিহ্বা উৎপাটিত করিব।'

বটুক তৎক্ষণাৎ দীর্ঘ জিহ্বা বাহির করিয়া দিল। রাজা হাস্য করিয়া তাহাকে মাটিতে নামাইলেন। পণ্ডিতের ফাঁড়া কাটিয়া গেল।

ভৃঙ্গারে মাধ্বী ছিল। রাজার কটাক্ষমাত্রে কিঙ্করী চষক ভরিয়া তাঁহার হস্তে দিল। চষক নিঃশেষ করিয়া রাজা বলিলেন—'এখন এই বিষকন্যাটাকে লইয়া কি করা যায়?'

গণদেব নামক একজন চাটুকার পার্ষদ বলিল—'মহারাজ, উহাকেও শিবমিশ্রের পথে প্রেরণ করুন—রাজ্যের সমস্ত অনিষ্ট দূর হউক।'

মহারাজ চণ্ডের রক্ত-নেত্রে একটা ক্রূর কৌতুক নৃত্য করিয়া উঠিল, তিনি স্বভাব-স্ফীত অধর প্রসারিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'মহাসচিব শিবমিশ্র মহাশয় এখন কি

করিতেছেন, কেহ বলিতে পার?'

গণদেব মুণ্ড আন্দোলিত করিয়া মুখভঙ্গী সহকারে বলিল—'এইমাত্র দেখিয়া আসিতেছি, তিনি শ্মশানভূমিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া শ্মশান-শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন। ব্রাহ্মণভোজন করাইব বলিয়া কিছু মোদক লইয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিলাম ব্রাহ্মণের মিষ্টান্নে রুচি নাই।' বলিয়া নিজ রসিকতায় অতিশয় উৎফুল্ল হইয়া চারিদিকে তাকাইল।

মহারাজ অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন, বলিলেন—'ভাল। অদ্য নিশাকালে শিবাদল আসিয়া শিবমিশ্রের মুণ্ড ভক্ষণ করিবে।' তার পর ভীষণ দৃষ্টিতে চতুর্দিকে চাহিয়া বলিলেন—'শিবমিশ্র আমার আজ্ঞার প্রতিবাদ করিয়াছিল, তাই আজ তাহাকে শৃগালে ছিঁড়িয়া খাইবে।—তোমরা এ কথা স্মরণ রাখিও।'

সভা স্তব্ধ হইয়া রহিল, কেহ বাক্য উচ্চারণ করিতে সাহসী হইল না।

রাজা তখন সভা-জ্যোতিষীকে বলিলেন—'পণ্ডিতরাজ, আপনার অভিমত রাজ্যের কল্যাণে এ কন্যা বর্জিত হউক। ভাল, তাহাই হইবে। কন্যা ও কন্যার মাতা উভয়েই অদ্য রাত্রিতে শ্মশানে প্রেরিত হইবে। সেখানে কন্যার মাতা স্বহস্তে কন্যাকে শ্মশানে প্রোথিত করিবে। তাহা হইলে দৈব আপদ দূর হইবে তো?'

পণ্ডিত শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন—'মহারাজ, এরূপ কঠোরতা নিষ্প্রয়োজন। কন্যাকে ভাগীরথীর জলে বিসর্জন করুন, কিন্তু কন্যার মাতা নিরপরাধিনী—তাহাকে—'

রাজা গর্জিয়া উঠিলেন—'নিরপরাধিনী! সে এরূপ কন্যা প্রসব করে কেন?—যাক, আপনার বাগ্‌বিস্তারে প্রয়োজন নাই, যাহা করিবার আমি স্বহস্তে করিব।' বলিয়া মহারাজ সিংহাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

যাহার দুর্দম দানবপ্রকৃতি মর্ত্যলোকে কোনও বস্তুকে ভয় করিত না, দৈব আপদের আশঙ্কা তাহাকে এমনই অমানুষিক নিষ্ঠুরতায় জ্ঞানশূন্য করিয়া তুলিয়াছিল যে, নিজ ঔরসজাত কন্যার প্রতি তাহার চিত্তে তিলমাত্র মমতার অবকাশ ছিল না।

পাটলিপুত্র নগরের চৌষট্টি দ্বার, তন্মধ্যে দশটি প্রধান ও প্রকাশ্য। বাকীগুলি অধিকাংশই গুপ্তপথ।

এই গুপ্তপথের একটি রাজপ্রাসাদসংলগ্ন; রাজা বা রাজপরিবারস্থ যে কেহ ইচ্ছা করিলে এই দ্বারপথে নগর-প্রাকারের বাহিরে যাইতে পারিতেন। তাল-কাণ্ডের একটি শীর্ণ সেতু ছিল, তাহার সাহায্যে পরিখা পার হইতে হইত। এই স্থানে গঙ্গাপ্রবাহের সহিত খনিত পরিখা মিলিত হইয়াছিল।

পরিখার পরপারে কিছু দূর যাইবার পর গঙ্গাতটে পাটলিপুত্রের মহাশ্মশান আরম্ভ হইয়াছে;—যত দূর দৃষ্টি যায়, তরুগুল্মহীন ধু ধু বালুকা। বালুকার উপর অগণিত লৌহশূল প্রোথিত রহিয়াছে; শূলগাত্রে কোথাও অর্ধপথে বীভৎস উলঙ্গ মনুষ্যদেহ বিদ্ধ হইয়া আছে, কোথাও শুষ্ক নরকঙ্কাল শূলমূলে পুঞ্জীভূত হইয়াছে। চারিদিকে শত শত নরকপাল বিক্ষিপ্ত। দিবাভাগেই এই মহাশ্মশানের দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর; অপিচ, রাত্রিকালে নগরীর দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেলে এই মনুষ্যহীন মৃত্যুবাসরে যে পিশাচ-পিশাচীর নৃত্য আরম্ভ হয়, তাহা কল্পনা করিয়াই পাটলিপুত্রের নাগরিকরা শিহরিয়া উঠিত। দণ্ডিত অপরাধী ভিন্ন রাত্রিকালে মহাশ্মশানে অন্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল—চণ্ডালরাও মহাশ্মশানের অনির্বাণ চুল্লীতে কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়া সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রতিগমন করিত।

সে-রাত্রে আকাশে সপ্তমীর খন্ড চন্দ্র উদিত হইয়াছিল। অপরিস্ফুট আলোক শ্মশানের বিস্তীর্ণ বালুকারাশির উপর যেন একটা শ্বেতাভ কুজ্ঝটিকা প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল। তটলেহী গঙ্গার ধূসর প্রবাহ চন্দ্রালোকে কৃষ্ণবর্ণ প্রতিভাত হইতেছিল। শ্মশান ও নদীর সন্ধিরেখার উপর দূরে অনির্বাণ চুল্লীর আরক্ত অঙ্গার জ্বলিতেছিল।

প্রথম প্রহর রাত্রি—প্রাকাররুদ্ধ পাটলিপুত্রে এখনও নগরগুঞ্জন শান্ত হয় নাই; কিন্তু শ্মশানে ইহারই মধ্যে যেন প্রেতলোকের অশরীরী উৎসব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। চক্ষে কিছু দেখা যায় না, তবু মনে হয়, সূক্ষ্মদেহ পিশাচী-ডাকিনীরা চক্ষু-খদ্যোত জ্বালিয়া লুব্ধ লালায়িত রসনায় গলিত শবমাংস অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে। আকাশে নিশাচর পক্ষীর পক্ষশব্দ যেন তাহাদেরই আগমনবার্তা ঘোষণা করিতেছে।

এই সময়, যে দিকে রাজপ্রাসাদের গুপ্তদ্বার, সেই দিক হইতে এক নারী ধীরে ধীরে শ্মশানের দিকে যাইতেছিল। রমণীর এক হস্তে একটি লৌহখনিত্র, অন্য হস্তে বক্ষের কাছে একটি ক্ষুদ্র বস্ত্রপিণ্ড ধরিয়া আছে। ক্ষীণ চন্দ্রের অস্পষ্ট আলোকে রমণীর আকৃতি ভাল দেখা যায় না; সে যে যুবতী ও এক সময় সুন্দরী ছিল, তাহা তাহার রক্তহীন মুখ ও শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ দেখিয়া অনুমান করাও দুরূহ। অতি কষ্টে দুর্ভর দেহ ও লৌহখনিত্র বহন করিয়া জরাজীর্ণ বৃদ্ধার মত সে চলিয়াছে। রুক্ষ কেশজাল মুখে বক্ষে ও পৃষ্ঠে বিপর্যস্তভাবে পড়িয়া আছে। রমণী মাঝে মাঝে দাঁড়াইতেছে, ত্রাস-বিমূঢ় চক্ষে পিছু ফিরিয়া চাহিতেছে, আবার চলিতেছে।

শ্মশানের সীমান্তে পোঁছিয়া সে জানু ভাঙিয়া পড়িয়া গেল। তাহার কণ্ঠ হইতে একটি কাতর আর্তস্বর বাহির হইল; সেই সঙ্গে বক্ষের বস্ত্রপিণ্ডের ভিতর হইতেও ক্ষীণ ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইল।

কিছুক্ষণ পড়িয়া থাকিবার পর রমণী আবার উঠিয়া চলিতে লাগিল। ক্রমে সে শ্মশানের বীভৎস দৃশ্যাবলীর মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

একবার সে চক্ষু তুলিয়া দেখিল, সম্মুখে দীর্ঘ শূল প্রোথিত রহিয়াছে; শূলশীর্ষে বিকট ভঙ্গিমায় এক নরমূর্তি বিদ্ধ হইয়া আছে, শূলনিম্নে দুইটা শৃগাল ঊর্ধ্বমুখ হইয়া সেই দুষ্প্রাপ্য ভক্ষ্যের দিকে তাকাইয়া আছে। চন্দ্রালোকে তাহাদের চক্ষু জ্বলিতেছে।

রমণী চীৎকার করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অধিক দূর যাইতে পারিল না, কয়েক পদ গিয়া আবার বালুর উপর পড়িয়া গেল।

এবার দীর্ঘকাল পরে রমণী উঠিয়া বসিল। বোধ হয় সংজ্ঞা হারাইয়াছিল, উঠিয়া বসিয়া ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল। বক্ষের বস্ত্রপিণ্ড ভূমিতে পড়িয়া গিয়াছিল, সেদিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে উন্মত্তের মত উঠিয়া খনিত্র দিয়া বালু খনন করিতে আরম্ভ করিল।

অল্পকালমধ্যে একটি নাতিগভীর গর্ত হইল। তখন রমণী সেই বস্ত্রপিণ্ড তুলিয়া লইয়া গর্তে নিক্ষেপ করিল—অমনই ক্ষীণ নির্জীব ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। রমণী দুই হাতে কান চাপিয়া কিয়ৎকাল বসিয়া রহিল, তারপর বালু দিয়া গর্ত পূরণ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পারিল না। সহসা দুই বাহু বাড়াইয়া বস্ত্রকুণ্ডলী গর্ত হইতে তুলিয়া লইয়া সজোরে নিজ বক্ষে চাপিয়া ধরিল। একটা ধাবমান শৃগাল তাহার অতি নিকট দিয়া তাহার দিকে গ্রীবা বাঁকাইয়া চাহিতে চাহিতে ছুটিয়া গেল; বাহ্য-চেতনাহীন রমণী তাহা লক্ষ্য করিল না।

অতঃপর মৃগতৃষ্ণিকাভ্রান্ত মৃগীর মত নারী আবার এক দিকে ছুটিতে লাগিল। তখন তাহার আর ইষ্টানিষ্ট-জ্ঞান নাই—কোন্ দিকে ছুটিয়াছে তাহাও জানে না; শুধু

পূর্ববৎ এক হস্তে খনিত্র ধরিয়া আছে, আর অপর হস্তে সেই বস্ত্রাবৃত জীবনকণিকাটুকু বক্ষে আঁকড়িয়া আছে।

কিছু দূর গিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল; সম্মুখে দূরে গঙ্গার শ্যামরেখা বোধ করি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কয়েক মুহূর্ত বিহ্বল-বিস্ফারিত-নেত্রে সেই দিকে তাকাইয়া থাকিয়া, যেন সহসা উদ্ধারের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে, এমনই ভাবে সে হাসিয়া উঠিল। তারপর অসীমবলে অবসন্ন দেহ সেই দিকে টানিয়া লইয়া চলিল।

মানব-মানবীর জীবনে এরূপ অবস্থা কখনও কখনও আসে—যখন তাহারা মৃত্যুকে বরণ করিবার জন্য হাহাকার করিয়া ছুটিয়া যায়।

জাহ্নবীর শীতল বক্ষে পেঁছিতে আর বিলম্ব নাই, মধ্যে মাত্র ছয় সাত দণ্ড বালু-ভূমির ব্যবধান, এই সময় রমণীর মুহ্যমান চেতনা পার্শ্বের দিকে এক প্রকার শব্দ শুনিয়া আকৃষ্ট হইল। শব্দটা যেন মনুষ্যের কণ্ঠস্বর—অর্ধব্যক্ত তর্জনের মত শুনাইল। রমণীর গতি এই শব্দে আপনিই রুদ্ধ হইয়া গেল। সে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, চন্দ্রালোকে শুভ্র বালুকার উপর একপাল শৃগাল কোনও অদৃশ্য কেন্দ্রের চারিধারে ব্যূহ রচনা করিয়া রহিয়াছে। তাহাদের লাঙ্গুল বহির্দিকে প্রসারিত। ঐ শৃগালচক্রের মধ্য হইতে মনুষ্যকণ্ঠের তর্জন মাঝে মাঝে ফুঁসিয়া উঠিতেছে, অমনি শৃগালের দল পিছু হটিয়া যাইতেছে। আবার ধীরে ধীরে অলক্ষিতে তাহাদের চক্র সঙ্কুচিত হইতেছে।

রমণী যন্ত্রচালিতের মত কয়েক পদ সেই দিকে অগ্রসর হইল। শৃগালেরা একজন জীবন্ত মনুষ্যকে আসিতে দেখিয়া দংষ্ট্রাবিকাশ করিয়া দূরে সরিয়া গেল। তখন মধ্যস্থিত বস্তুটি দৃষ্টিগোচর হইল।

মাটির উপর কেবল একটি দেহহীন মুণ্ড রহিয়াছে। মুণ্ডের দুই বিক্ষত গণ্ড হইতে রক্ত ঝরিতেছে, চক্ষে উন্মত্ত দৃষ্টি। মুণ্ড রমণীর দিকেই তাকাইয়া আছে।

রমণী এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া অস্ফুট চীৎকার করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

মুণ্ড তখন বিকৃত স্বরে বলিল—'তুমি প্রেত পিশাচ নিশাচর যে হও, আমাকে উদ্ধার কর।'

মানুষের কণ্ঠস্বরে রমণীর সাহস ফিরিয়া আসিল। সে আরও কয়েক পদ নিকটে আসিল; রুদ্ধ শুষ্ক কণ্ঠ হইতে অতি কষ্টে শব্দ বাহির করিল—'কে তুমি?'

মুণ্ড বলিল—'আমি মানুষ, ভয় নাই। আমার দেহ মাটিতে প্রোথিত আছে—উদ্ধার কর।'

রমণী তখন কাছে আসিয়া ভাল করিয়া তাহার মুখ দেখিল, দেখিয়া সংহত অস্ফুট স্বরে বলিল—'মন্ত্রী শিবমিশ্র!'—তার পর খনিত্র দিয়া প্রাণপণে মাটি খুঁড়িতে আরম্ভ করিল।

মৃত্তিকাগর্ভ হইতে বাহিরে আসিয়া শিবমিশ্র কিয়ৎকাল মৃতবৎ মাটিতে শুইয়া রহিলেন। তার পর ধীরে ধীরে দুই হস্তে ভর দিয়া উঠিয়া বসিলেন। রমণীর ক্ষীণ অবসন্ন দেহ তখন ভূমিশয্যায় লুটাইয়া পড়িয়াছে।

শিবমিশ্রের শৃগালদ্রষ্ট গণ্ড হইতে রক্ত ঝরিতেছিল, তিনি সন্তর্পণে তাহা মুছিলেন। রমণীর রক্তলেশহীন পাংশু মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—'দুর্ভাগিনি, তুমি কোন্ অপরাধে রাত্রিকালে মহাশ্মশানে আসিয়াছ?'

রমণী নীরবে পার্শ্বস্থ বস্ত্রপিণ্ড দেখাইয়া দিল, শিবমিশ্র দেখিলেন—একটি শিশু। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার পরিচয় কি? তুমি আমার প্রাণদাত্রী, তোমার নাম স্মরণ করিয়া রাখিতে চাহি।'

রমণী নির্জীব কণ্ঠে বলিল—'আমার নাম মোরিকা—আমি রাজপুরীর দাসী।'

শিবমিশ্র সচকিত হইলেন, বলিলেন—'বুঝিয়াছি। তুমি কবে এই সন্তান প্রসব করিলে?'

'আজ প্রভাতে!'

শিবমিশ্র কিছুক্ষণ স্তব্ধ রহিলেন।

'হতভাগিনি! কিন্তু তুমি শ্মশানে প্রেরিত হইলে কেন? পরমভট্টারকের সন্তান গর্ভে ধারণ করা কি এতই অপরাধ?'

মোরিকা বলিল—'সভাপণ্ডিত গণনা করিয়া বলিয়াছেন, আমার কন্যা রাজ্যের অনিষ্টকারিণী বিষকন্যা—তাই—'

'বিষকন্যা!' শিবমিশ্রের চক্ষু সহসা জ্বলিয়া উঠিল—'বিষকন্যা! দেখি!'

শিবমিশ্র ব্যগ্রহস্তে শিশুকে তুলিয়া লইলেন। তখন চন্দ্র অস্ত যাইতেছে, ভাল দেখিতে পাইলেন না। তিনি শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া দূরে চুল্লীর দিকে দ্রুতপদে চলিলেন।

চুল্লীর অঙ্গারের উপর ভস্মের প্রচ্ছদ পড়িয়াছে। শিবমিশ্র একখণ্ড অর্ধদগ্ধ কাষ্ঠ তাহাতে নিক্ষেপ করিলেন—অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল।

তখন সেই শ্মশান-চুল্লীর আলোকে শিবমিশ্র নবজাত কন্যার দেহলক্ষণ পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষা করিতে করিতে তাঁহার রক্তলিপ্ত মুখে এক পৈশাচিক হাস্য দেখা দিল।

তিনি মোরিকার নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিলেন—'হাঁ, বিষকন্যা বটে।'

মোরিকা পূর্ববৎ ভূশয্যায় পড়িয়া ছিল, প্রত্যুত্তরে একবার গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

শিবমিশ্র আগ্রহকম্পিত স্বরে বলিলেন—'বৎসে, তুমি তোমার কন্যা আমাকে দান কর, আমি উহাকে পালন করি। কেহ জানিবে না।'

মোরিকা পুনরায় অতি গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

শিবমিশ্র বলিলেন—'তুমি ফিরিয়া গিয়া বলিও কন্যাকে বিনষ্ট করিয়াছ। আমি অদ্যই উহাকে লইয়া গঙ্গার পরপারে লিচ্ছবিদেশে পলায়ন করিব। তার পর—'

মোরিকা উত্তর দিল না। তখন শিবমিশ্র নতজানু হইয়া তাহার মুখ দেখিলেন। তার পর করাগ্রে শীর্ণ মণিবন্ধ ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিলেন।

ক্ষণেক পরে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দুই হস্তে শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া উদ্দীপ্ত চোখে দূরে অর্ধদৃষ্ট রাজপ্রাসাদশীর্ষের দিকে চাহিলেন। কহিলেন—'এই ভাল।'

এই সময় আকাশের নিকষে অগ্নির রেখা টানিয়া রক্তবর্ণ উল্কা রাজপুরীর ঊর্ধ্বে পিণ্ডাকারে জ্বলিয়া উঠিল,—তার পর ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

সেই আলোকে শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া শিবমিশ্র বলিলেন—"এ নিয়তির ইঙ্গিত। তোমার নাম রাখিলাম—উল্কা!"

তার পর মগ্নচন্দ্রা রাত্রির অন্ধকারে জাহ্নবীর তীররেখা ধরিয়া শিবমিশ্র পাটলিপুত্রের বিপরীত মুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

মোরিকার প্রাণহীণ শব মহাশ্মশানে পড়িয়া রহিল। যে শিবাকুল তাহার আগমনে সরিয়া গিয়াছিল, তাহারা আবার চারিদিক হইতে ফিরিয়া আসিল।

২

অতঃপর ষোল বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

কালপুরুষের পলকপাতে শতাব্দী অতীত হয়; কিন্তু ক্ষুদ্রায়ু মানুষের জীবনে ষোল বৎসর অকিঞ্চিৎকর নয়।

মগধে এই সময়ের মধ্যে বহু পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। পূর্বাধ্যায়বর্ণিত ঘটনার পর পাটলিপুত্রের নাগরিকবৃন্দ ত্রয়োদশ বর্ষ মহারাজ চণ্ডের দোর্দণ্ড শাসন সহ্য করিয়াছিল; তাহার পর একদিন তাহারা সদলবলে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। জনগণ যখন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে, তখন তাহারা বিবেচনা করিয়া কাজ করে না—এ ক্ষেত্রেও তাহারা বিবেচনা করিল না। ক্রোধান্ধ মৌমাছির পাল যদি একটা মহিষকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে দৃশ্যটা যেরূপ হয়, এই মাৎস্যন্যায়ের ব্যাপারটাও প্রায় তদ্রূপ হইল।

গর্জমান চণ্ডকে সিংহাসন হইতে টানিয়া নামাইয়া বিদ্রোহ-নায়কেরা প্রথমে তাহার মণিবন্ধ পর্যন্ত হস্ত কাটিয়া ফেলিল। মহারাজ চণ্ডকে এক কোপে শেষ করিয়া ফেলিলে চলিবে না, অন্য বিবেচনা না থাকিলেও এ বিবেচনা বিদ্রোহীদের ছিল। মহারাজ এত দিন ধরিয়া যাহা অগণিত প্রজাপুঞ্জকে দুই হস্তে বিতরণ করিয়াছেন, তাহাই তাহারা প্রত্যর্পণ করিতে আসিয়াছে। এই প্রত্যর্পণক্রিয়া এক মুহূর্তে হয় না।

অতঃপর চণ্ডের পদদ্বয় জঙ্ঘাগ্রন্থি হইতে কাটিয়া লওয়া হইল। কিন্তু তাহাতেও প্রতিহিংসাপিপাসু জনতার তৃপ্তি হইল না। এভাবে চলিলে বড় শীঘ্র মৃত্যু উপস্থিত হইবে—তাহা বাঞ্ছনীয় নয়। মৃত্যু তো নিষ্কৃতি। সুতরাং জননায়করা মহারাজের বিখণ্ডিত রক্তাপ্লুত দেহ ঘিরিয়া মন্ত্রণা করিতে বসিল। হিংসা-পরিচালিত জনতা চিরদিনই নিষ্ঠুর, সেকালে বুঝি তাহাদের নিষ্ঠুরতার অন্ত ছিল না।

একজন নাসিকাহীন শৌণ্ডিক উত্তম পরামর্শ দিল। চণ্ডকে হত্যা করিয়া কাজ নাই, বরঞ্চ তাহাকে জীবিত রাখিবার চেষ্টাই করা হউক। তার পর এই অবস্থায় তাহাকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া প্রকাশ্য সর্বজনগম্য স্থানে বাঁধিয়া রাখা হউক। নাগরিকরা প্রত্যহ ইহাকে দেখিবে, ইহার গাত্রে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে। চণ্ডের এই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া ভবিষ্যৎ রাজারাও যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিতে পারিবে।

সকলে মহোল্লাসে এই প্রস্তাব সমর্থন করিল। প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইতেও বিলম্ব হইল না।

তার পর মগধবাসীর রক্ত কথঞ্চিৎ কবোষ্ণ হইলে তাহারা নূতন রাজা নির্বাচন করিতে বসিল। শিশুনাগবংশেরই দূর-সম্পর্কিত সৌম্যকান্তি এক যুবা—নাম সেনজিৎ—মৃগয়া পক্ষিপালন ও সুরা আস্বাদন করিয়া সুখে ও তৃপ্তিতে কালযাপন করিতেছিল, রাজা হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা তাহার ছিল না—সকলে তাহাকে ধরিয়া সিংহাসনে বসাইয়া দিল। সেনজিৎ অতিশয় নিরহঙ্কার সরলচিত্ত ও ক্রীড়াকৌতুকপ্রিয় যুবা; নারীজাতি ভিন্ন জগতে তাহার শত্রু ছিল না; তাই নাগরিকগণ সকলেই তাহাকে ভালবাসিত। সেনজিৎ প্রথমটা রাজা হইতে আপত্তি করিল; কিন্তু তাহার বন্ধুমণ্ডলীকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া সে দীর্ঘশ্বাস মোচনপূর্বক সিংহাসনে গিয়া বসিল। একজন ভীমকান্তি কৃষ্ণকায় নাগরিক স্বহস্তে নিজ অঙ্গুলি কাটিয়া তাহার ললাটে রক্ত-তিলক পরাইয়া দিল।

সেনজিৎ করুণবচনে বলিল—'যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিব, কিন্তু আমাকে রাজ্য শাসন বা বংশরক্ষা করিতে বলিও না।'

তাহাই হইল। কয়েকজন বিচক্ষণ মন্ত্রী রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন; মহারাজ সেনজিৎ পূর্ববৎ মৃগয়াদির চর্চা করিয়া ও বটুকভট্টের সহিত রসালাপ করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। নানা কারণে কাশী কোশল লিচ্ছবি তখন যুদ্ধ করিতে উৎসুক ছিল না; ভিতরে যাহাই থাকুক, বাহিরে একটা মৌখিক মৈত্রী দেখা যাইতেছিল,—তাই মহারাজকে বর্ম-চর্ম পরিধান করিয়া শৌর্য প্রদর্শন করিতে হইল না। ওদিকে রাজ-অবরোধও শূন্য পড়িয়া

রহিল। কঞ্চুকী মহাশয় ছাড়া রাজ্যে আর কাহারও মনে খেদ রহিল না।

মগধের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন লিচ্ছবি রাজ্যের রাজধানী বৈশালীতেও ভিতরে ভিতরে অনেক কিছু ঘটিতেছিল। মহামনীষী কৌটিল্য তখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই, কিন্তু তাই বলিয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কূটনীতির অভাব ছিল না। বৈশালীতে বাহ্য মিত্রতার অন্তরালে গোপনে গোপনে মগধের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল।

শিবমিশ্র বৈশালীতে সাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন। লিচ্ছবিদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত—রাজা নাই। রাজার পরিবর্তে নির্বাচিত নায়কগণ রাজ্য শাসন করেন। শিবমিশ্রের কাহিনী শুনিয়া তাঁহারা তাঁহাকে সসম্মানে মন্ত্রণাদাতা সচিবের পদ প্রদান করিলেন।

কেবল শিবমিশ্রের নামটি ঈষৎ পরিবর্তিত হইয়া গেল। তাঁহার গণ্ডের শৃগালদংশন-ক্ষত শুকাইয়াছিল বটে, কিন্তু ক্ষত শুকাইলেও দাগ থাকিয়া যায়। তাঁহার মুখখানা শৃগালের মত হইয়া গিয়াছিল। জনসাধারণ তাঁহাকে শিবামিশ্র বলিয়া ডাকিতে লাগিল। শিবমিশ্র তিক্ত হাসিলেন, কিন্তু আপত্তি করিলেন না। শৃগালের সহিত তুলনায় যে ধূর্ততার ইঙ্গিত আছে, তাহা তাঁহার অরুচিকর হইল না। ঐ নামই প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।

দিনে দিনে বৈশালীতে শিবামিশ্রের প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। ওদিকে তাঁহার গৃহে সেই শ্মশানলব্ধ অগ্নিকণা সাগ্নিকের যত্নে বর্ধিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

চণ্ড ও মোরিকার কন্যা উল্কাকে একমাত্র অগ্নির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যতই তাহার বয়স বাড়িতে লাগিল, জ্বলন্ত বহ্নির মত রূপের সঙ্গে সঙ্গে ততই তাহার দুর্জয় দুর্বশ প্রকৃতি পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ করিল। শিবামিশ্র তাহাকে নানা বিদ্যা শিক্ষা দিলেন, কিন্তু তাহার প্রকৃতির উগ্রতা প্রশমিত করিবার চেষ্টা করিলেন না। মনে মনে বলিলেন—'শিশুনাগবংশের এই বিষকণ্টক দিয়াই শিশুনাগবংশের উচ্ছেদ করিব।'

তীক্ষ্ণ-মেধাবিনী উল্কা চতুঃষষ্টি কলা হইতে আরম্ভ করিয়া ধনুর্বিদ্যা, অসিবিদ্যা পর্যন্ত সমস্ত অবলীলাক্রমে শিখিয়া ফেলিল। কেবল নিজ উদ্দাম প্রকৃতি সংযত করিতে শিখিল না।

মগধের প্রজাবিদ্রোহের সংবাদ যেদিন বৈশালীতে পৌঁছিল, সেদিন শিবামিশ্র গূঢ় হাস্য করিলেন। এই বিদ্রোহে তাঁহার কতখানি হাত ছিল, কেহ জানিত না। কিন্তু কিছুদিন পরে যখন আবার সংবাদ আসিল যে, শিশুনাগবংশেরই আর একজন যুবা রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছে, তখন তাঁহার মুখ অন্ধকার হইল। এই শিশুনাগবংশ যেন সর্পবংশেরই মত—কিছুতেই নিঃশেষ হইতে চায় না।

তার পর আরও কয়েক বৎসর কাটিল; শিবামিশ্র উল্কার দিকে চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

যেদিন উল্কার বয়স ষোড়শ বৎসর পূর্ণ হইল, সেই দিন শিবামিশ্র তাহাকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন—'বৎসে, তুমি আমার কন্যা নহ। তোমার জীবন-বৃত্তান্ত বলিতে চাহি, উপবেশন কর।'

ভাবলেশহীন কণ্ঠে শিবামিশ্র বলিতে লাগিলেন, উল্কা করলগ্নকপোলে বসিয়া সম্পূর্ণ কাহিনী শুনিল; তাহার স্থির চক্ষু নিমেষের জন্য শিবামিশ্রের মুখ হইতে নড়িল না। কাহিনী সমাপ্ত করিয়া শিবামিশ্র বলিলেন—'প্রতিহিংসা-সাধনের জন্য তোমায় ষোড়শ বর্ষ পালন করিয়াছি। চণ্ড নাই, কিন্তু শিশুনাগবংশ অদ্যাপি সদর্পে বিরাজ করিতেছে। সময় উপস্থিত—তোমার মাতা মোরিকা ও পালক পিতা শিবামিশ্রের প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ কর।'

'কি করিতে হইবে?'

'শিশুনাগবংশকে উচ্ছেদ করিতে হইবে।'

'পন্থা নির্দেশ করিয়া দিন।'

'শুন, পূর্বেই বলিয়াছি, তুমি বিষকন্যা; তোমার উগ্র অলোকসামান্য রূপ তাহার নিদর্শন। পুরুষ তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইবে, পতঙ্গ যেমন অগ্নিশিখার দিকে আকৃষ্ট হয়। তুমি যে পুরুষের কণ্ঠলগ্না হইবে তাহাকেই মরিতে হইবে। এখন তোমার কর্তব্য বুঝিয়াছ? মগধের সহিত বর্তমানে লিচ্ছবিদেশের মিত্রভাব চলিতেছে, এ সময়ে অকারণে যুদ্ধঘোষণা করিলে রাষ্ট্রীয় ধনক্ষয় জনক্ষয় হইবে, বিশেষতঃ যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত। মগধবাসীরা নূতন রাজার শাসনে সুখে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আছে—রাজ্যে অসন্তোষ নাই। এরূপ সময় রাজ্যে রাজ্যে যুদ্ধ বাধানো সমীচীন নয়। কিন্তু শিশুনাগবংশকে মগধ হইতে মুছিয়া ফেলিতে হইবে, তাই এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছি। বর্তমান রাজা সেনজিৎ ব্যসনপ্রিয় যুবা, শুনিয়াছি রাজকার্যে তাহার মতি নাই;—সর্বপ্রথম তাহাকে অপসারিত করিতে হইবে।—পারিবে?'

উল্কা হাসিল। যাবক-রক্ত অধরে দশনদ্যুতি সৌদামিনীর মত ঝলসিয়া উঠিল। তাহার সেই হাসি দেখিয়া শিবামিশ্রের মনে আর কোনও সংশয় রহিল না।

তিনি বলিলেন—'এখন সভায় কি স্থির হইয়াছে, বলিতেছি। মগধে কিছু দিন যাবৎ বৈশালীর প্রতিভূ কেহ নাই, কিন্তু মিত্ররাজ্যে প্রতিনিধি থাকাই বিধি, না থাকিলে সৌহার্দ্যের অভাব সূচনা করে। এজন্য সঙ্কল্প হইয়াছে, তুমি লিচ্ছবি-রাষ্ট্রের প্রতিভূ-স্বরূপ পাটলিপুত্রে গিয়া বাস করিবে। প্রতিভূকে সর্বদা রাজ-সন্নিধানে যাইতে হয়, সুতরাং রাজার সহিত দেখা-সাক্ষাতে কোনও বাধা থাকিবে না। অতঃপর তোমার সুযোগ!'

উল্কা উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—'ভাল। কিন্তু আমি নারী, এজন্য কোনও বাধা হইবে না?'

শিবামিশ্র বলিলেন—'বৃজির গণরাজ্যে নারী-পুরুষে প্রভেদ নাই, সকলের কক্ষা সমান।'

'কবে যাইতে হইবে?'

'আগামী কল্য তোমার যাত্রার ব্যবস্থা হইয়াছে। তোমার সঙ্গে দশ জন পুরুষ পার্শ্বচর থাকিবে, এতদ্ব্যতীত সখী পরিচারিকা তোমার অভিরুচিমত লইতে পার।'

উল্কা শিবামিশ্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, অকম্পিত স্বরে বলিল—'পিতা, আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিব। যে দুর্গ্রহের অভিসম্পাত লইয়া আমি জন্মিয়াছি, তাহা আমার জননীর নিষ্ঠুর হত্যার প্রতিশোধ লইয়া সার্থক হইবে। আপনি যে আমাকে কন্যার ন্যায় পালন করিয়াছেন, সে ঋণও এই অভিশপ্ত দেহ দিয়া প্রতিশোধ করিব।'

শিবামিশ্রের কণ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইল, তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন—'কন্যা, আশীর্বাদ করিতেছি, লব্ধকামা হইয়া আমার ক্রোড়ে প্রত্যাগমন কর। দধীচির মত তোমার কীর্তি পুরাণে অবিনশ্বর হইয়া থাকিবে।'

পাটলিপুত্রের উপকণ্ঠে রাজার মৃগয়া-কানন। উল্কা ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া, এই বহু যোজনব্যাপী অটবীর ভিতর দিয়া অশ্বারোহণে চলিয়াছিল। তাহার সঙ্গী কেহ ছিল না, সঙ্গী সহচরদিগকে সে রাজপথ দিয়া প্রেরণ করিয়া দিয়া একাকী বনপথ অবলম্বন করিয়াছিল, পুরুষ রক্ষীরা ইহাতে সসম্ভ্রমে ঈষৎ আপত্তি করিয়াছিল কিন্তু উল্কা তীব্র অধীর স্বরে নিজ আদেশ জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছিল—'আমি আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ। তোমরা নগরতোরণে পৌঁছিয়া আমার জন্য প্রতীক্ষা করিবে। আমি একাকী

চিন্তা করিতে চাই।'

স্থির অচপল দৃষ্টি সম্মুখে রাখিয়া উল্কা অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া ছিল, অশ্বও তাড়নার অভাবে ময়ূরসঞ্চারী গতিতে চলিয়াছিল; পাছে আরোহিণীর চিন্তাজাল ছিন্ন হইয়া যায় এই ভয়ে যেন গতিছন্দ অটুট রাখিয়া চলিতেছিল! শষ্পের উপর অশ্বের খুরধ্বনিও অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

ছায়া-চিত্রিত বনের ভিতর দিয়া কৃষ্ণ বাহনের পৃষ্ঠে যেন সঞ্চারিণী আলোকলতা চলিয়াছে—বনের ছায়ান্ধকার ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। উল্কার বক্ষে লৌহজালিক, পার্শ্বে তরবারি, কটিতে ছুরিকা, পৃষ্ঠে সংসর্পিত কৃষ্ণ বেণী; কর্ণে মাণিক্যের অবতংস অঙ্গারবৎ জ্বলিতেছে। এই অপূর্ব বেশে উল্কার রূপ যেন আরও উন্মাদকর হইয়া উঠিয়াছে।

কাননপথ অর্ধেক অতিক্রান্ত হইবার পর সহসা পশ্চাতে দ্রুত-অস্পষ্ট অশ্বখুরধ্বনি শুনিয়া উল্কার চমক ভাঙিগল। সে পিছু ফিরিয়া দেখিল, একজন শূলধারী অশ্বারোহী সবেগে অশ্ব চালাইয়া ছুটিয়া আসিতেছে; তাহার কেশের মধ্যে কঙ্কপত্র, পরিধানে শবরের বেশ। উল্কাকে ফিরিতে দেখিয়া সে ভল্ল উত্তোলন করিয়া সগর্জনে হাঁকিল—'দাঁড়াও।'

উল্কা দাঁড়াইল। ক্ষণেক পরে অশ্বারোহী তাহার পার্শ্বে আসিয়া কর্কশ স্বরে বলিল—'কে তুই?—রাজার মৃগয়া-কাননের ভিতর দিয়া বিনা অনুমতিতে চলিয়াছিস্? তোর কি প্রাণের ভয় নাই?' এই পর্যন্ত বলিয়া পুরুষ সবিস্ময়ে থামিয়া গিয়া বলিল—'এ কী! এ যে নারী!'

উল্কা অধরোষ্ঠ ঈষৎ সঙ্কুচিত করিয়া বলিল—'নারীই বটে! তুমি কে?'

পুরুষ ভল্ল নামাইল। তাহার কৃষ্ণবর্ণ মুখে ধীরে ধীরে হাসি ফুটিয়া উঠিল, চোখে লালসার তীক্ষ্ণ আলোক দেখা দিল। সে কণ্ঠস্বর মধুর করিয়া বলিল—'আমি এই বনের রক্ষী। সুন্দরি, এই পথহীন বনে একাকিনী চলিয়াছ, তোমার কি দিগ্‌ভ্রান্ত হইবার ভয় নাই?'

উল্কা উত্তর দিল না; বল্গার ইঙ্গিতে অশ্বকে পুনর্বার সম্মুখদিকে চালিত করিল।

রক্ষী সনির্বন্ধ স্বরে বলিল—'তুমি কি পাটলিপুত্র যাইবে? চল, আমি তোমাকে কানন পার করিয়া দিয়া আসি!' বলিয়া সে নিজ অশ্ব চালিত করিল।

উল্কা এবারও উত্তর দিল না, অবজ্ঞাস্ফুরিত-নেত্রে একবার তাহার দিকে চাহিল মাত্র। কিন্তু রক্ষী কেবল নেত্রাঘাতে প্রতিহত হইবার পাত্র নয়, সে লুব্ধ নয়নে উল্কার সর্বাঙ্গ দেখিতে দেখিতে তাহার পাশে পাশে চলিল।

ক্রমে দুই অশ্বের ব্যবধান কমিয়া আসিতে লাগিল। উল্কা অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে দেখিল, কিন্তু কিছু বলিল না।

রক্ষী আবার মধু-ঢালা সুরে বলিল—'সুন্দরি, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? তোমার এরূপ কন্দর্প-বিজয়ী বেশ কেন?'

উল্কা বিরস-স্বরে বলিল—'সে সংবাদে তোমার প্রয়োজন নাই।'

রক্ষী অধর দংশন করিল; এ নারী যেমন রূপসী, তেমনই মদগর্বিতা! ভাল, তাহার মদগর্ব লাঘব করিতে হইবে; এ বনের অধীশ্বর কে তাহা জানাইয়া দিতে হইবে।

রক্ষী আরও নিকটে সরিয়া আসিয়া হস্তপ্রসারণ পূর্বক উল্কার হাত ধরিল। উল্কার দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, সে হাত ছাড়াইয়া লইয়া সর্প-তর্জনের মত শীৎকার

করিয়া বলিল—'আমাকে স্পর্শ করিও না—অনার্য!'

রক্ষীর মুখ আরও কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। সম্পূর্ণ অনার্য না হইলেও সে আর্য-অনার্যের মিশ্রণজাত অম্বষ্ঠ বটে, তাই এই হীনতা-জ্ঞাপক সম্বোধন তাহাকে অংকুশের মত বিদ্ধ করিল। দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া সে বলিল—'অনার্য! ভাল, আজ এই অনার্যের হাত হইতে তোমাকে কে রক্ষা করে দেখি।'—বলিয়া বাহু দ্বারা কটি বেষ্টন করিয়া উল্কাকে আকর্ষণ করিল।

উল্কার মুখে বিষ-তীক্ষ্ম হাসি ক্ষণেকের জন্য দেখা দিল।

'আমি বিষকন্যা—আমাকে স্পর্শ করিলে মরিতে হয়।' বলিয়া সে রক্ষীর পঞ্জরে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া দিল, তার পর উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে হাসিতে বায়ুবেগে অশ্ব ছুটাইয়া দিল।

পাটলিপুত্রের দুর্গতোরণে যখন উল্কা পেীঁছিল, তখন বেলা দ্বিপ্রহর। শান্তির সময় দিবাভাগে তোরণে প্রহরী থাকে না, নাগরিকগণও মধ্যাহ্নের খর রৌদ্রতাপে স্ব স্ব গৃহচ্ছায়া আশ্রয় করিয়াছে; তাই তোরণ জনশূন্য। কেবল উল্কার পথশ্রান্ত সহচরগণ উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা করিতেছে।

উল্কা উন্নত তোরণ-সম্মুখে ক্ষণেক দাঁড়াইল। একবার উত্তরে দূর-প্রসারিত শূল-কণ্টকিত শ্মশানভূমির দিকে দৃষ্টি ফিরাইল, তার পর নিবদ্ধ ওষ্ঠাধরে তোরণ-প্রবেশ করিল।

কিন্তু তোরণ উত্তীর্ণ হইয়া কয়েক পদ যাইতে না যাইতে আবার তাহার গতি রুদ্ধ হইল। সহসা পার্শ্ব হইতে বিকৃতকণ্ঠে কে চীৎকার করিয়া উঠিল—'জল! জল! জল দাও!'

রুক্ষ উগ্রকণ্ঠের এই প্রার্থনা কানে যাইতেই উল্কা অশ্বের মুখ ফিরাইল। দেখিল, তোরণপার্শ্বস্থ প্রাচীরগাত্র হইতে লৌহবলয়-সংলগ্ন স্থূল শৃঙ্খল ঝুলিতেছে, শৃঙ্খলের প্রান্ত এক নরাকার বীভৎস মূর্তির কটিতে আবদ্ধ। মূর্তির করপত্র নাই, পদদ্বয়ও জঙ্ঘাসন্ধি হইতে বিচ্ছিন্ন—জটাবদ্ধ দীর্ঘ কেশে মুখ প্রায় আবৃত। সে তপ্ত পাষাণ-চত্বরের উপর কৃষ্ণকায় কুম্ভীরের মত পড়িয়া আছে এবং লেলিহ রসনায় অদূরস্থ জলকুণ্ডের দিকে তাকাইয়া মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে—'জল! জল!' মাধ্যন্দিন সূর্যতাপে তাহার রোমশ দেহ হইতে স্বেদ নির্গত হইয়া চত্বর সিক্ত করিয়া দিতেছে।

উল্কা উদাসীনভাবে সেই দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার মনে করুণার উদ্রেক হইল না। শুধু সে মনে মনে ভাবিল—এই মগধবাসীরা দেখিতেছি নিষ্ঠুরতায় অতিশয় নিপুণ।

শৃঙ্খলিত ব্যক্তি জন-সমাগম দেখিয়া জানুতে ভর দিয়া উঠিল, রক্তিম চক্ষে চাহিয়া বন্য জন্তুর মত গর্জন করিল—'জল! জল দাও!'

উল্কা একজন সহচরকে ইঙ্গিত করিল; সে জলকুণ্ড হইতে জল আনিয়া তাহাকে পান করাইল। শৃঙ্খলিত ব্যক্তি উত্তপ্ত মরুভূমির মত জল শুষিয়া লইল। তার পর তৃষ্ণা নিবারিত হইলে অবশিষ্ট জল সর্বাঙ্গে মাখিয়া লইল।

উল্কা জিজ্ঞাসা করিল—'কোন্ অপরাধে তোমার এরূপ দণ্ড হইয়াছে?'

গত তিন বৎসর ধরিয়া বন্দী প্রতিনিয়ত বিদ্রূপকারী নাগরিকদের নিকট এই একই প্রশ্ন শুনিয়া আসিতেছে। সে উত্তর দিল না—হিংস্রদৃষ্টিতে উল্কার দিকে তাকাইয়া পিছু ফিরিয়া বসিল।

উল্কা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—'কে তোমার এরূপ অবস্থা করিয়াছে? শিশুনাগ-বংশের রাজা?'

শ্বাপদের মত তীক্ষ্ম দন্ত বাহির করিয়া বন্দী ফিরিয়া চাহিল। তাহার ভঙ্গী দেখিয়া

মনে হইল, একবার মুক্তি পাইলে সে উল্কাকে দুই বাহুতে পিষিয়া মারিয়া ফেলিবে। উল্কা যে তাহাকে এইমাত্র পিপাসার পানীয় দিয়াছে, সে জন্য তাহার কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা নাই।

সে বিকৃত মুখে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিল—'পথের কুক্কুর সব, দূর হইয়া যা। লজ্জা নাই? একদিন আমি তোদের পদতলে পিষ্ট করিয়াছি, আবার যেদিন এই শৃঙ্খল ছিঁড়িব, সেদিন আবার পদদলিত করিব। এখন পলায়ন কর—আমার সম্মুখ হইতে দূর হ।'

উল্কার চোখের দৃষ্টি সহসা তীব্র হইয়া উঠিল; সে অশ্বপৃষ্ঠে ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'কে তুমি? তোমার নাম কি?'

ক্ষিপ্তপ্রায় বন্দী দুই বাহু দ্বারা নিজ বক্ষে আঘাত করিতে করিতে বলিল—'কে আমি? কে আমি? তুই জানিস্ না? মিথ্যাবাদিনি, আমাকে কে না জানে? আমি চণ্ড—আমি মহারাজ চণ্ড! তোর প্রভু। তোর দণ্ডমুণ্ডের অধীশ্বর! বুঝিলি? আমি মগধের ন্যায্য অধিপতি মহারাজ চণ্ড।'

উল্কা ক্ষণকালের জন্য যেন পাষাণে পরিণত হইয়া গেল। তার পর তাহার সমস্ত দেহ কম্পিত হইতে লাগিল, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিল, নাসা স্ফুরিত হইতে লাগিল। তাহার এই পরিবর্তন বন্দীরও লক্ষ্যগোচর হইল, উন্মত্ত প্রলাপ বকিতে বকিতে সে সহসা থামিয়া গিয়া নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া রহিল।

উল্কা কথঞ্চিৎ আত্মসম্বরণ করিয়া সহচরদের দিকে ফিরিল, ধীরস্বরে কহিল—'তোমরা ঐ পিপ্পলীবৃক্ষতলে গিয়া আমার প্রতীক্ষা কর, আমি এখনই যাইতেছি।'

সহচরগণ প্রস্থান করিল।

তখন উল্কা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া বন্দীর সম্মুখীন হইল। চত্বরের উপর উঠিয়া একাগ্রদৃষ্টিতে বন্দীর মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিল—'তুমিই ভূতপূর্ব রাজা চণ্ড।'

চণ্ড সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল—'ভূতপূর্ব নয়—আমিই রাজা। আমি যত দিন আছি, তত দিন মগধে অন্য রাজা নাই।'

'তোমাকে তবে প্রজারা হত্যা করে নাই?'

'আমাকে হত্যা করিতে পারে, এত শক্তি কাহার?'

রক্তহীন অধরে উল্কা জিজ্ঞাসা করিল—'মহারাজ চণ্ড, মোরিকা নাম্নী জনৈকা দাসীর কথা মনে পড়ে?'

চণ্ডের জীবনে বহুশত মোরিকা ক্রীড়াপুত্তলীর মত যাতায়াত করিয়াছে, দাসী মোরিকার কথা তাহার মনে পড়িল না।

উল্কা তখন জিজ্ঞাসা করিল—'মোরিকার এক বিষকন্যা জন্মিয়াছিল, মনে পড়ে?'

এবার চণ্ডের চক্ষুতে স্মৃতির আলো ফুটিল, সে হিংস্রহাস্যে দন্ত নিষ্ক্রান্ত করিয়া বলিল—'মনে পড়ে, সেই বিষকন্যাকে শ্মশানে প্রোথিত করাইয়াছিলাম। শিবমিশ্রকেও শ্মশানের শৃগালে ভক্ষণ করিয়াছিল।' অতীত নৃশংসতার স্মৃতির মধ্যেই এখন চণ্ডের একমাত্র আনন্দ ছিল।

উল্কা অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল—'সে বিষকন্যা মরে নাই, শিবমিশ্রকেও শৃগালে ভক্ষণ করে নাই। মহারাজ, নিজের কন্যাকে চিনিতে পারিতেছেন না?'

চণ্ড চমকিত হইয়া মুণ্ড ফিরাইল।

উল্কা তাহার কাছে গিয়া কর্ণকুহরে বলিল—'আমিই সেই বিষকন্যা। মহারাজ, শিশুনাগবংশের চিরন্তন রীতি স্মরণ আছে কি? এ বংশের রক্ত যাহার দেহে আছে,

সেই পিতৃহন্তা হইবে।—তাই বহুদূর হইতে বংশের প্রথা পালন করিতে আসিয়াছি।'

চণ্ড কথা কহিবার অবকাশ পাইল না। উদ্যতফণা সর্প যেমন বিদ্যুদ্বেগে দংশন করে, তেমনই উল্কার ছুরিকা চণ্ডের কণ্ঠে প্রবেশ করিল। সে ঊর্ধ্বমুখ হইয়া পড়িয়া গেল, তাহার প্রকাণ্ড দেহ মৃত্যু-যন্ত্রণায় ধড়ফড় করিতে লাগিল। দুইবার সে বাক্য-নিঃসরণের চেষ্টা করিল কিন্তু বাক্যস্ফূর্তি হইল না—মুখ দিয়া গাঢ় রক্ত নির্গলিত হইয়া পড়িল। শেষে কয়েকবার পদপ্রক্ষেপ করিয়া চণ্ডের দেহ স্থির হইল।

উল্কা কটিলগ্ন হস্তে দাঁড়াইয়া দেখিল। তার পর ধীরপদে গিয়া নিজ অশ্বে আরোহণ করিল, আর পিছু ফিরিয়া তাকাইল না। তাহার ছুরিকা চণ্ডের কণ্ঠে আমূল বিদ্ধ হইয়া রহিল। নির্জন তোরণপার্শ্বে মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে ষোল বৎসরের পুরাতন নাট্যের শেষ অঙ্কে যে দ্রুত অভিনয় হইয়া গেল, জনপূর্ণ পাটলিপুত্রের কেহ তাহা দেখিল না।

এইরূপে শোণিতপঙ্কে দুই হস্ত রঞ্জিত করিয়া মগধের বিষকন্যা আবার মগধের মহাস্থানীয়ে পদার্পণ করিল।

মদন-মহোৎসবের পূর্বেই এবার গ্রীষ্মের আবির্ভাব হইয়াছে। বিজিগীষু নিদাঘের জয়পতাকা বহিয়া যেন অশোক, কিংশুক, কৃষ্ণচূড়া দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তবু, কুসুম্ভ ও রঙ্গনের শোণিমা প্রত্যাসন্ন বসন্তোৎসবের বর্ণ-বিলাস বক্ষে ধারণ করিয়া উৎসুক নাগরিকাদিগকে যেন জানাইতেছে—'ভয় নাই! মাধবের অরুণ নেত্র দেখিয়া শঙ্কা করিও না, এখনও মধুমাস শেষ হয় নাই।' তাহাদের সমর্থন করিয়াই যেন চূত-মুকুল-লোভী মদারুণিত-চক্ষু কোকিল বারম্বার কুহরিয়া উঠিতেছে—'কুহকের কাল সমাগত, কুহকিনীরা প্রস্তুত হও।'

মগধের রাজপ্রাসাদেও এই নব-বসন্তজাত মদালসতা অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল। প্রধান তোরণের প্রতীহার-ভূমিতে লৌহ-শিরস্ত্রাণ পরিহিত শূলহস্ত দ্বারী উন্মনভাবে এক প্রফুল্ল কর্ণিকার-বৃক্ষের পানে তাকাইয়া ছিল; বোধ করি, নির্জন কর্মহীন দ্বিপ্রহরে ঐ বৃক্ষের দিকে চাহিয়া কোনও তপ্তকাঞ্চনবর্ণা যবনী প্রতীহারীর নীলাব্জ-নয়নের কথা ভাবিতেছিল। তোরণের অভ্যন্তরে ভবনে ভবনে নারী-সৈন্যের পাহারা। মহারাজের অবরোধে মহাদেবী নাই বটে, কিন্তু চিরাচরিত প্রথা অনুসারে ধনুষ্পাণি যবনী সেনা পূর্ববৎ আছে। প্রাসাদের বিভিন্ন মহলে—মন্ত্রগৃহে, মল্লাগারে, কলাভবনে, কোষাগারে—সর্বত্র দ্বারে দ্বারে যবনী প্রহরিণী দ্বার রক্ষা করিতেছে। তাহাদের বক্ষে অতিপিনদ্ধ বর্ম, হস্তে ধনু, পৃষ্ঠে তূণীর। শ্রোণিভারমন্থর-গতিতে তাহারা দ্বারসম্মুখে পাদচারণ করিতেছে, কখনও অলস উৎসুক নেত্রে অলিন্দের বাহিরে সুদূর-দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছে। হয়তো তাহাদের মনেও দূরদূরান্তস্থিত জন্মভূমির দ্রাক্ষারস-মদির স্বপ্ন জাগিতেছে।

এই তন্দ্রালস ফাল্গুনের দ্বিপ্রহরে মন্ত্রগৃহের এক শীতলকক্ষে মহারাজ সেনজিৎ কয়েকজন বয়স্যের সহিত বিরাজ করিতেছিলেন। বিদূষক বটুকভট্টও ছিল, নিরুৎসুক-ভাবে রাজা ও বিদূষকে অক্ষক্রীড়া চলিতেছিল। প্রতি দ্বারে ও বাতায়নে জলসিক্ত উশীরগুচ্ছ ঝুলিতেছে, বাহিরের আতপ্ত বায়ু তাহার স্পর্শে স্নিগ্ধ-সুগন্ধ হইয়া মহারাজের চন্দনপঙ্কচর্চিত দেহ অবলেহন করিতেছিল। একজন বয়স্য অদূরে বসিয়া সপ্তস্বরার তন্ত্রী হইতে অতি মৃদুভাবে বসন্তরাগের ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

কিয়ৎকাল ক্রীড়া চলিবার পর মহারাজের চঞ্চল চিত্ত আর অক্ষবাটে নিবদ্ধ থাকিতে

চাহিল না; তিনি এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন। বাদ্যরত বয়স্য বসন্তের সহিত পঞ্চম মিশাইয়া ফেলিতেছিল, রাজা তাহার ভ্রম-সংশোধন করিয়া দিলেন। শেষে অক্ষ ফেলিয়া, পার্শ্বস্থিত কপিত্থ-সুরভিত তক্রের পাত্র নিঃশেষপূর্বক উঠিয়া দাঁড়াইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—'বসন্তোৎসবের আর বিলম্ব কত?'

বটুকভট্টের আকৃতি ও কণ্ঠস্বর পূর্ববৎ আছে, শুধু মস্তকশীর্ষে গ্রন্থিধৃত কেশ-গুচ্ছ একটু পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে অক্ষক্রীড়ায় জিতিতেছিল; মহারাজের পেশল দেহকান্তির দিকে এক ক্রুদ্ধ কটাক্ষপাত করিয়া বলিল—'মদনের সহিত যাহার মৌখিক পরিচয় পর্যন্ত নাই, সে বসন্তোৎসবের সংবাদ জানিয়া কি করিবে? বিল্বফল পাকিল কি না জানিয়া পরভৃতের কি লাভ?'

মহারাজ হাসিলেন। হাসিলে মহারাজকে বড় সুন্দর দেখাইত। তাঁহার তরুণ মুখের সদা-স্ফূর্ত হাসিতে যেন অন্তরের নিরভিমান অনাড়ম্বর সরলতা প্রতিবিম্বিত হইত।

তিনি সকৌতুকে বলিলেন—'বটুক, আমাকে কাক বলিলে না কোকিল বলিলে?'

বটুকভট্ট বলিল—'মহারাজের যেটা অভিরুচি স্বীকার করিয়া লইতে পারেন।'

মহারাজ বললেন—'তবে কোকিলই স্বীকার করিলাম। কোকিল অতি গুণবান পক্ষী; দোষের মধ্যে সে কাকের নীড়ে ডিম্ব প্রসব করে।'

বটুক বলিল—'এ বিষয়ে মহারাজ অপেক্ষা কোকিল শ্রেষ্ঠ।'

স্মিতমুখে সেনজিৎ প্রশ্ন করিলেন—'কিসে?'

'কোকিল তো তবু পরগৃহে বংশরক্ষা করে, মহারাজ যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন।'

মহারাজের মুখ ঈষৎ বিষণ্নভাব ধারণ করিল, তিনি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন—'দেখ বটুক, তোমাকে একটি গোপনীয় কথা বলি। নারীজাতিকে আমি বড় ভয় করি—এই জন্যই বসন্তোৎসবের সময় আমার প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। নারীজাতি এই সময় অত্যন্ত দুর্দমনীয় হইয়া উঠে।'

বটুকভট্টও বিষণ্নভাবে শির নাড়িয়া বলিল—'সে কথা সত্য। এই সময় স্ত্রীজাতি তাহাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র শাণিত করিয়া পুরুষের প্রতি ধাবিত হয়। আমার গৃহিণীর সাতটি সন্তান, বয়সেরও ইয়ত্তা নাই; কিন্তু কয়েক দিন হইতে লক্ষ্য করিতেছি, তিনি আমার প্রতি তীক্ষ্ম কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছেন।'

হাস্য গোপন করিয়া মহারাজ বলিলেন—'বড় ভয়ানক কথা বটুক, তবে আর তোমার গৃহে গিয়া কাজ নাই। আমার অন্তঃপুর শূন্য আছে, তুমি এইখানেই এ কয় দিন নিরাপদে যাপন কর। এ বয়সে গৃহিণীর কটাক্ষবাণ খাইলে আর প্রাণে বাঁচিবে না!'

বটুকভট্টের মুখ অধিকতর বিষণ্ন হইল, সে বলিল—'তাহা হয় না, মহারাজ। এই বসন্তকালে দেশসুদ্ধ কোকিল পরগৃহে ডিম্ব উৎপাদন করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াই-তেছে। এখন গৃহত্যাগ করিলে আবার অন্য বিপদ আসিয়া পড়িবে।'

বয়স্যেরা সকৌতুকে উভয়ের রসোক্তি-বিনিময় শুনিতেছিল, বটুকের কথার ভঙ্গীতে সকলে হাসিয়া উঠিল। একজন বয়স্য বলিল—'মহারাজ, বটুকভট্ট অকারণে আপনাকে নারীজাতি সম্বন্ধে বিতৃষ্ণ করিয়া তুলিতেছে। আমি অপরোক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, নারীজাতি—বিশেষতঃ সুন্দরী ও যৌবনবতী নারী—অবহেলার বস্তু নয়, পুরুষমাত্রেরই সাধনযোগ্যা। কণ্টকীফলের মত বাহিরে দুষ্প্রধর্ষা হইলেও অন্তরে তাহারা অতি কোমল ও সুস্বাদু।'

মহারাজ বলিলেন—'নারীজাতি তাহা হইলে কণ্টকীফলের সহিত তুলনীয়! ইহাই তোমার মত?'

'হাঁ মহারাজ। একমাত্র ভোক্তাই এই ফলের রসজ্ঞ, দূর হইতে যে ব্যক্তি কেবল

নিরীক্ষণ করিয়াছে, তাহার কাছে ইহার রস অব্যক্ত।'

'বটুক, তোমার কি অভিমত?'

বটুক গম্ভীরভাবে বলিল—'আমার অভিমত, নারীজাতি একমাত্র বিল্বফলের সহিত তুলনীয়। যে ক্ষৌরিত-চিকুর হতভাগ্য একবার বিল্বতলে গিয়াছে, সে আর দ্বিতীয়বার যাইবে না।'

এইরূপ রঙ্গপরিহাসে কিছুকাল অতীত হইবার পর একজন বয়স্য রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল—'মহারাজ, সত্য বলুন, স্ত্রীজাতির প্রতি আপনার বিরাগ কি জন্য? বিশেষ কোনও কারণ আছে কি?'

মহারাজ ঈষৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন—'রুচির অভাবই প্রধান কারণ। যদি এ কারণ যথেষ্ট মনে না কর, তবে বলিতে পারি, এই নারীজাতিই পুরুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের হন্তারক। ভাবিয়া দেখ শ্রীরামচন্দ্রের কথা, স্মরণ কর কুরু-পাণ্ডবের কাহিনী। যে ব্যক্তি সুখের অভিলাষী, সে এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া নারীজাতিকে দূরে রাখিবে।'

বয়স্য বলিল—'কিন্তু মহারাজ—বংশধর?'

সেনজিৎ সহসা শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখ হইতে পরিহাসের সমস্ত চিহ্ন লুপ্ত হইল। ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া তিনি বলিলেন—'বংশধর! ভানুমিত্র, শিশুনাগবংশে বংশধরের কথা চিন্তা করিতে তোমার ভয় হয় না? শুনিয়াছি, শিশুনাগবংশে আর কেহ জীবিত নাই, আমার ঐকান্তিক কামনা, আমার সঙ্গে যেন এই অভিশপ্ত বংশ লুপ্ত হয়।'

বয়স্য সকলে অধোমুখে নীরব রহিল; একটা প্রতিবাদ বাক্যও কাহারও মুখে যোগাইল না।

কিয়ৎকাল নীরবে কাটিল। তার পর সহসা এই কুণ্ঠিত নীরবতা ভেদ করিয়া মন্ত্রগৃহের প্রতীহার-ভূমিতে দ্রুতচ্ছন্দে পটহ বাজিয়া উঠিল।

বিস্মিতভাবে ভ্রূ তুলিয়া রাজা বলিলেন—'এ সময় পটহ কেন? বটুক, কে আসিল দেখ। বলিও, এখন আমি বিশ্রাম করিতেছি, কল্য প্রভাতে সভায় সাক্ষাৎ হইবে।'

মহারাজ সাধারণতঃ কোনও দর্শনপ্রার্থীকে ফিরাইতেন না, কিন্তু আজ উল্লিখিত আলোচনার পর তাঁহার মনের প্রসন্নতা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

বটুকভট্ট প্রস্থান করিল। সেনজিৎ ঈষৎ কুঞ্চিত ললাটে বাতায়নের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন।

অল্পক্ষণ পরেই বটুকভট্ট সবেগে প্রায় মুক্তকচ্ছ অবস্থায় কক্ষে পুনঃপ্রবেশ করিয়া একেবারে মহারাজের পদমূলে বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিল। মহারাজ বলিলেন—'বটুক, কি হইল?'

বটুক উন্মুক্ত বক্ত্রপথে ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বলিল—'মহারাজ, জঙ্ঘাবল প্রদর্শন করিয়াছি!'

'তাহা তো দেখিতেছি। কিন্তু পলাইয়া আসিলে কেন? কে আসিয়াছে?'

'ঠিক বলিতে পারি না। বোধ হয় দিব্যাঙ্গনা।'

'সে কি! স্ত্রীলোক?'

'কদাচ নয়। উর্বশী হইলেও হইতে পারে, নচেৎ নিশ্চয় তিলোত্তমা। কিন্তু বক্ষে কঞ্চুলী নাই, তৎপরিবর্তে লৌহজালিক—মহারাজ পলায়ন করুন।'

মহারাজ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বয়স্যদের দিকে চাহিলেন; তাঁহার তিন বৎসরব্যাপী রাজ্যকালে এরূপ কাণ্ড কখনও ঘটে নাই। তিনি বলিলেন—'নারী—আমার নিকট কি চায়?'

এই সময় যবনী প্রতীহারী প্রবেশ করিয়া জানাইল যে, বৈশালী হইতে এক নারী রাজকার্য উপলক্ষে মহারাজের সাক্ষাৎপ্রার্থিনী। মহারাজ ক্ষণেক স্তম্ভিত থাকিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—'লইয়া এস।'

প্রতীহারী নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। পরক্ষণেই চারিদিকে রূপলাবণ্যের স্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ করিয়া উল্কা কক্ষে প্রবেশ করিল।

মহারাজ সেনজিৎ দ্বারের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, উল্কা প্রবেশ করিতেই উভয়ের চোখাচোখি হইল। পাঁচ গণিতে যতক্ষণ সময় লাগে, উল্কা ও সেনজিৎ ততক্ষণ পরস্পর চোখের ভিতর চাহিয়া রহিলেন। উল্কার চোখে গোপন উৎকণ্ঠা, মহারাজের নয়নে প্রচ্ছন্ন বিস্ময়! তারপর দু'জনেই চক্ষু ফিরাইয়া লইলেন।

মহারাজ সেনজিৎ ভূমির দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—'ভদ্রে, শুনিলাম তুমি বৈশালী হইতে আসিতেছ; তোমার কি প্রয়োজন?'

উল্কার ওষ্ঠাধর বিভক্ত হইয়া দশনপংক্তি ঈষৎ দেখা গেল। সে গ্রীবা বাঁকাইয়া মহারাজের দিকে একটু অধীরভাবে তাকাইল, বলিল—'আমি পরমভট্টারক শ্রীমন্মহারাজ সেনজিতের দর্শনপ্রার্থিনী—তাঁহার নিকটেই আমার প্রয়োজন নিবেদন করিব।'

'আমিই সেনজিৎ।'

'মহারাজ! ক্ষমা করুন'—উল্কার বিস্ময়োৎফুল্ল নেত্র ক্ষণেকের জন্য অর্ধ-নিমীলিত হইয়া আসিল। তার পর সে দুই পদ অগ্রসর হইয়া মহারাজের পদপ্রান্তে নতজানু হইয়া বসিল; যুক্ত করপুট ললাটে স্পর্শ করিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিল।

মহারাজ অস্ফুটভাবে কালোচিত সম্ভাষণ করিলেন। তখন উল্কা নিজ অংগত্রাণের ভিতর হইতে জতুমুদ্রালাঞ্ছিত পত্র বাহির করিয়া মহারাজের হস্তে দিল।

জতুমুদ্রা ভাঙিয়া সেনজিৎ পত্র পড়িতে লাগিলেন। উল্কা নতজানু থাকিয়াই আর একবার মহারাজকে নয়নকোণে ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। তাহার মুখের ভাব বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত হইল না, কিন্তু সে মনে মনে ভাবিল—'ইনিই মগধের মহাপরাক্রান্ত প্রজা-পূজিত সেনজিৎ! ইঁহার চন্দন-চর্চিত সুকুমার দেহে বলবীর্যের তো কোনও লক্ষণই দেখিতেছি না। এই সুখলালিত পৌরুষহীন বিলাসীকে জয় করিতে কতক্ষণ সময় লাগিবে?' উল্কা মনে মনে অবজ্ঞার হাসি হাসিল।

পত্রপাঠ শেষ করিয়া সেনজিৎ চক্ষু তুলিলেন, দেখিলেন, উল্কা তখনও নতজানু হইয়া তাঁহার সম্মুখে বসিয়া আছে। তিনি শুষ্কস্বরে বলিলেন—'ভদ্রে, আসন পরিগ্রহ কর। দেখিতেছি, তুমি মিত্ররাজ্য লিচ্ছবির প্রতিনিধি—সুতরাং আমরা তোমাকে সাদরে সম্ভাষণ করিতেছি। বৈশালীর প্রজানায়কগণ যে একটি পুরাঙ্গনাকে প্রতিভূরূপে প্রেরণ করিয়াছেন ইহা তাঁহাদের প্রীতির প্রকৃষ্ট নিদর্শন বটে, অপিচ কিছু বিস্ময়করও বটে।'

উল্কা আস্তরণের উপর আসন গ্রহণ করিয়া ঈষৎ হাস্যে মহারাজের দিকে মুখ তুলিল, কিন্তু সে প্রত্যুত্তর দিবার পূর্বেই বটুকভট্ট তাহার অতি ক্ষীণ অথচ কর্ণবিদারী কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—'ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে? বৈশালীতে নিশ্চয় পুরুষের অভাব ঘটিয়াছে, তাই তাহারা এই সুন্দরীকে পুরুষবেশে সাজাইয়া প্রেরণ করিয়াছে। মহারাজ, বৈশালী যখন আপনার মিত্ররাজ্য তখন মিত্রতার নিদর্শনস্বরূপ আপনিও কিছু পুরুষ বৈশালীতে প্রেরণ করুন। এইভাবে মিত্রতার বন্ধন অতিশয় দৃঢ় হইয়া উঠিবে।'

উল্কা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। এতক্ষণ সে রাজা ভিন্ন অন্য কোনও দিকে দৃক্‌পাত করে নাই. এখন খর্বকায় বংশীকণ্ঠ বটুকভট্টকে দেখিয়া তাহার অধরে বিদ্রুপের হাসি ফুটিল। সে অবজ্ঞাপূর্ণ স্বরে বলিল—'মগধে পুরুষ প্রতিনিধির প্রয়োজন নাই বুঝিয়াই বোধ হয় মহামান্য কুলপতিগণ এই পুরকন্যাকে প্রেরণ করিয়াছেন। নচেৎ লিচ্ছবিদেশে

প্রকৃত পুরুষের অভাব নাই।'

ছদ্ম গাম্ভীর্যে শিরঃসঞ্চালন করিয়া বটুকভট্ট বলিল—'বৈশালিকে, লিচ্ছবিদেশে যদি প্রকৃত পুরুষ থাকিত, তবে তাহারা কখনই তোমাকে মগধে আসিতে দিত না।'

উল্কার গণ্ড আরক্তিম হইয়া উঠিল, সে চকিতে রাজার দিকে ফিরিয়া তীক্ষ্ণস্বরে বলিল—'মহারাজ, এই বিট কি আপনার বাক্-প্রতিভূ?'

সেনজিৎ উত্ত্যক্তভাবে বিদূষকের দিকে চাহিলেন, কহিলেন—'বটুক, চপলতা সংবরণ কর, এ চপলতার সময় নয়।'

বটুক ভীতভাব প্রদর্শন করিয়া জানু-সাহায্যে হাঁটিয়া একজন বয়স্যের পিছনে লুকাইল।

সেনজিৎ তখন বলিলেন—'ভদ্রে—'

উল্কার মুখ আবার প্রসন্ন হইল, সে হাস্য-মুকুলিত অধরে বলিল—'দেব, আমার নাম উল্কা।'

বটুকভট্ট অন্তরাল হইতে আতঙ্কের অভিনয় করিয়া মৃদু স্বরে বলিল—'উঃ!'

সেনজিৎ একবার সেদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন—'ভাল। উল্কা, পুনর্বার তোমাকে স্বাগত-সম্ভাষণ জানাইতেছি। বৈশালী রাষ্ট্রের মিত্রতার চিহ্ন নারী বা পুরুষ যে মূর্তিতেই আগমন করুক, আমাদের সমাদরের সামগ্রী। কল্য হইতে সভায় অন্যান্য মিত্রগণের মধ্যে তোমার আসন নির্দিষ্ট হইবে।'

উল্কা অকপট-নেত্রে চাহিয়া বলিল—'সভায় নিত্য নিয়ত উপস্থিত থাকা কি আমার অবশ্য-কর্তব্য? রাজকীয় সভার শিষ্টতা আমি কিছুই জানি না—এই আমার প্রথম দৌত্য।' বলিয়া একটু লজ্জিতভাবে হাসিল।

সেনজিৎ বলিলেন—'সভায় উপস্থিত থাকা না থাকা পাত্রমিত্রের প্রয়োজন ও অভিরুচির উপর নির্ভর করে। তুমি ইচ্ছা করিলে না আসিতে পার।'

উল্কা শুধু বলিল—'ভাল মহারাজ!'

উক্তরূপ কথোপকথন হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, মহারাজ সেনজিৎ রাজকার্য অমাত্যদের হস্তে অর্পণ করিলেও নিজে একান্ত অপটু ছিলেন না।

অতঃপর তিনি বলিলেন—'বহু দূর পথ অতিক্রম করিয়া তুমি ও তোমার পরিজন নিশ্চয় ক্লান্ত; সুতরাং সর্বাগ্রে তোমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু পূর্বাহ্ণে সময় না থাকায় তোমার সমুচিত আবাসগৃহের ব্যবস্থা হইতে পায় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে—'

বটুকভট্ট উঁকি মারিয়া বলিল—'কেন, মহারাজের অন্তঃপুর তো শূন্য আছে—সেইখানেই অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা হউক না।'

মহারাজ রুষ্টমুখে তাকাইলেন।

কিন্তু উল্কার চোখে গোপনে বিজলি খেলিয়া গেল; সে ভ্রূভঙ্গ করিয়া মহারাজের দিকে মুখ তুলিল—'মহারাজের অন্তঃপুর শূন্য! তবে কি মহারাজ অকৃতদার!'

অপ্রসন্ন ললাটে সেনজিৎ নীরব রহিলেন; কেবল বটুকভট্ট সশব্দ দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিল।

উল্কা তখন বলিল—'মহারাজ, সত্যই আমরা পথশ্রান্ত। যদি আপনার অপ্রীতিকর না হয়, তবে অবরোধেই আশ্রয় লইতে পারি। আমি নারী, সুতরাং অবরোধে মহারাজের আশ্রয়াধীনে থাকাই আমার পক্ষে সুষ্ঠু হইবে।'

ভ্রূবদ্ধ ললাটে মহারাজ কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন, তার পর বিরস স্বরে বলিলেন—'ভাল। আপাততঃ অন্তঃপুরেই বাস কর, আমি সেখানে পদার্পণ করি না।' তার পর প্রধানা যবনীকে ডাকিয়া তাহাকে যথোচিত উপদেশ দিয়া বলিলেন—'ইহাদের সুখ-

স্বাচ্ছন্দ্যের ত্রুটি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিও। পরে আমি অন্য ব্যবস্থা করিতেছি।'

উল্কা উঠিয়া দাঁড়াইল। 'জয়োস্তু মহারাজ!' বলিয়া সে যবনী সমভিব্যাহারে রাজ-সকাশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিল, এমন সময় বটুকের মুণ্ড আর একবার উঁচু হইয়া উঠিল। সে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল—'বৈশালিকে, রাজকার্য তো সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল, এখন একটি প্রশ্ন করিতে পারি? বৈশালীর সকল সীমন্তিনীই কি সদাসর্বদা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া থাকে? ভ্রূকুটির ভল্ল ও বক্ষের লৌহজালিক কি তাহারা উন্মোচন করে না?'

প্রস্থানোদ্যতা উল্কা ফিরিয়া দাঁড়াইল। অনুচ্চস্বরে বলিল—'তোমার মত কিম্পুরুষ দেখিলে বৈশালীর নারীরা অস্ত্র ত্যাগ করে।' বলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে যবনীর তূণীর হইতে একটি তীর তুলিয়া লইয়া নিক্ষেপ করিল। বটুকভট্ট আর্তনাদ করিয়া উঠিল; তীর তাহার মস্তকশীর্ষস্থ কুণ্ডলীকৃত কেশকলাপের মধ্যে প্রবেশ করিল।

উল্কা চকিতচপল নেত্রে একবার সেনজিতের মুখের দিকে চাহিয়া হাস্যবিম্বিত রক্তাধরে কৌতুক বিচ্ছুরিত করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

তীর জটা হইতে বাহির করিবার জন্য বটুক টানাটানি করিতে লাগিল। মহারাজ তাহার ভঙ্গী দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলেন; বলিলেন—'তোমার প্রগল্ভতার উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে—বৈশালিকার লক্ষ্যবেধ অব্যর্থ। তুমি আর উহার সহিত রসিকতা করিতে যাইও না।'

বটুক তীরফলক অতিকষ্টে কেশ হইতে মুক্ত করিয়া করুণ স্বরে বলিল—'না মহারাজ, আর করিব না। একাদশ রুদ্রের কোপ ও দ্বাদশ সূর্যের তাপ সহ্য করিতে পারি; কিন্তু আগুন লইয়া খেলা এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আর সহ্য হইবে না।'

মহারাজ বলিলেন—'এখন যাও, কঞ্চুকীকে ডাকিয়া আনো, তিনি আসিয়া অন্তঃপুরের সুব্যবস্থা করুন।'

বটুকভট্ট অমনই উঠিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল, বলিল—'তাহাই করি। তবু যদি দেবী আমার প্রতি প্রসন্না হন।'

'দেবী' শব্দের মধ্যে হয়তো একটা ব্যঙ্গার্থ ছিল, মহারাজের কর্ণে সেটা বিঁধিল; কিন্তু তিনি কোনও প্রকার প্রতিবাদ করিবার পূর্বেই ধূর্ত বটুকভট্ট কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

৪

কয়েক দিন কাটিয়া গেল। উল্কা সখীপরিজনবেষ্টিতা হইয়া অন্তঃপুরেই বাস করিতে লাগিল। পুরী পরিত্যাগ করিয়া যাইবার কোনও আগ্রহ সে প্রকাশ করিল না—মহারাজও অন্য বাসভবনের উল্লেখ করিলেন না। বৃদ্ধ কঞ্চুকী বহুদিন পরে নিজ কার্য ফিরিয়া পাইয়া মহা উৎসাহে উল্কার তত্ত্বাবধানে লাগিয়া গেলেন। কোথাও বিন্দুমাত্র ত্রুটির ছিদ্র রহিল না।

রাজসভাতেও উল্কা কয়েক দিন নিজ আসনে গিয়া বসিল। সূক্ষ্ম বস্ত্রাবরণের ভিতর উল্কার অলোকসামান্য রূপ যেন শারদ মেঘাচ্ছন্ন শশিকলার প্রভা বিকিরণ করিতে লাগিল। রাজসভা এই নবচন্দ্রোদয়ে কুমুদ্বতীর মত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ভিতরে ভিতরে সভাসদগণের মধ্যে নানা উৎসুক জল্পনা চলিতে লাগিল।

মহারাজ সেনজিৎ কিন্তু তাঁহার নিরুৎসুক নিস্পৃহতার মধ্যে অটল হইয়া রহিলেন। উল্কাকে তিনি পদোচিত মর্যাদা ও সমাদর প্রদর্শন করিতেন; কিন্তু তাহার বেশী কিছু

নয়। উল্কা বিস্মিত হইয়া লক্ষ্য করিল, মহারাজের আচরণে নারীজাতি সম্বন্ধে একটা নীরস ঔদাসীন্যের ভাব রহিয়াছে—রাজন্যবর্গের পক্ষে ইহা যেমন অসাধারণ, তেমনই বিস্ময়কর। উল্কা হতাশ হইল না, বরঞ্চ মহারাজকে কুহকমন্ত্রে পদানত করিবার সংকল্প তাহার কুলিশ-কঠিন হৃদয়ে আরও দৃঢ় হইল।

কিন্তু একদিন রাজসভায় একটি ঘটনা দেখিয়া উল্কা অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইল। মহারাজের ব্যবহারে অনাড়ম্বর মৃদুতা দর্শনে উল্কার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, সেনজিৎ স্বভাবতঃ দুর্বলপ্রকৃতি—চিত্তের দৃঢ়তা বা পুরুষোচিত সাহস তাঁহার নাই। এই ভ্রান্তি তাহার সহসা ভাঙ্গিয়া গেল।

মহারাজ সেনজিৎ সেদিন যথারীতি সিংহাসনে আসীন ছিলেন। সভামধ্যে চণ্ডের রহস্যময় মৃত্যু সম্বন্ধে নানা জল্পনা ও কৌতুককর অনুমান চলিতেছিল, উল্কা আকুঞ্চিত অধরে অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে শুনিতেছিল, এরূপ সময় রাজ-মহামাত্র দৌড়িতে দৌড়িতে সভায় প্রবেশ করিয়া বলিল—'আয়ুষ্মন্, সর্বনাশ উপস্থিত, পুষ্কর ক্ষিপ্ত হইয়াছে। সে শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া এই দিকেই ছুটিয়া আসিতেছে।'

'পুষ্কর' রাজার পট্ট হস্তীর নাম। এই সংবাদ শুনিয়া সভামধ্যে বিষয় চাঞ্চল্য ও গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। কিন্তু সেনজিৎ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—'তোমরা শান্ত হও, ভয় নাই—আমি দেখিতেছি।' বলিয়া তিনি বাহিরের দিকে চলিলেন।

মহামাত্র সভয়ে বলিল—'আয়ুষ্মন্, পুষ্কর তাহার রক্ষককে শুণ্ডাঘাতে বধ করিয়াছে, আমিও তাহাকে শাসন করিতে পারি নাই। এ অবস্থায় আপনি তাহার সম্মুখীন হইলে—'

মহারাজ তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না, বহু স্তম্ভযুক্ত উন্মুক্ত সভামণ্ডপের প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে উদ্যতশুণ্ড প্রকাণ্ড উন্মত্ত হস্তী বৃংহিতধ্বনি করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। হস্তীর গণ্ড হইতে মদবারি ক্ষরিত হইতেছে, চরণে ছিন্ন শৃঙ্খল, ক্ষুদ্র চক্ষুর্দ্বয় কষায়বর্ণ ধারণ করিয়া ঘূর্ণিত হইতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া সভাসদ্‌গণ কাষ্ঠপুত্তলীর ন্যায় হতগতি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। উল্কাও নিজ আসনে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে বিস্ফারিত-নয়নে স্পন্দিতবক্ষে চাহিয়া রহিল। কাহারও মুখে বাক্য সরিল না।

সেনজিৎ সভাচত্বর হইতে অবতরণ করিয়া হস্তীর আরও নিকটবর্তী হইলেন। মদ-স্রাবী মাতঙ্গ প্রহার-উদ্যমে শুণ্ড ঊর্ধ্বে তুলিল। তখন সেই রুদ্ধশ্বাস নীরবতার মধ্যে সেনজিৎ মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলিলেন— 'পুষ্কর! পুষ্কর!'

পুষ্করের শুণ্ড ঘোরবেগে অবতরণ করিতে করিতে অর্ধ-পথে থামিয়া গেল। মত্ত হস্তী রক্তনেত্রে মহারাজের দিকে চাহিয়া যেন বিদ্রোহ করিতে চাহিল, একবার দ্বিধাভরে তাহার করদণ্ড ঈষৎ আন্দোলিত হইল—তার পর ধীরে ধীরে শুণ্ড অবনমিত করিয়া সে নম্রভাবে দাঁড়াইল। কয়েক মুহূর্তমধ্যে ধ্বংসের মূর্তিমান বিগ্রহ যেন শান্তিময় তপোবনমৃগে পরিণত হইল।

মহারাজ সস্নেহে তাহার শুণ্ডে হাত বুলাইয়া তাহার কানে কানে কি বলিলেন; পুষ্করের প্রকাণ্ড দেহ লজ্জায় সংকুচিত হইয়া গেল, সে অধোবদনে ধীরে ধীরে পশুশালা অভিমুখে ফিরিয়া চলিল। মহারাজ তাহার সঙ্গে চলিলেন। এতক্ষণে হস্তিপক সাহস পাইয়া মহারাজের অনুবর্তী হইল।

এই ঘটনা উল্কার মনে গভীর রেখাপাত করিল। শত্রুর শক্তি সম্বন্ধে অন্ধ থাকিতে নাই; উল্কাও মহারাজ সম্বন্ধে সতর্ক ও অবহিত হইয়া তাঁহাকে জালবদ্ধ করিবার

উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

ওদিকে মহারাজ সেনজিৎ বর্মাচ্ছাদিত যোদ্ধার ন্যায় অক্ষতদেহে বিরাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তরে কন্দর্পজনিত কোনও বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে কি না কেহ অনুমান করিতে পারিল না।

একদা প্রাতঃকালে মহারাজ যথাবিহিত স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া পক্ষিভবনে গমন করিলেন। পক্ষিপালন মহারাজের অতি প্রিয় ব্যসন; বহুজাতীয় বিহঙ্গ তাঁহার পক্ষি-শালায় নিরন্তর কলরব করিত, তিনি প্রত্যহ প্রাতে স্বহস্তে তাহাদিগকে আহার করাইতেন।

একটি শুক স্বর্ণদণ্ডের উপর বসিয়াছিল, সেনজিৎ তাহার নিকটে যাইতেই সে ডানা ঝটপট করিয়া উড়িয়া গেল। তাহার চরণের সুবর্ণশৃঙ্খল কোনও উপায়ে কাটিয়া গিয়া-ছিল; মহারাজ দেখিলেন, শুক উড়িয়া অন্তঃপুরসংলগ্ন উপবনের এক আমলকীবৃক্ষের শাখায় গিয়া বসিল।

এই শুক মহারাজের অতি আদরের পক্ষী, বহুকাল শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিয়া ভাল উড়িতেও পারে না। তাহাকে ধরিবার জন্য কি করা যায়, মহারাজ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তিলক-পুণ্ড্রক-চিত্রিত ললাটে বটুকভট্ট আসিয়া স্বস্তিবাচন করিল। তাহাকে দেখিয়া মহারাজ বলিলেন—'ভালই হইল। বটুক, আমার শুকপাখীটা উড়িয়া গিয়া অন্তঃপুরের ঐ আমলকীবৃক্ষে বসিয়াছে। তুমি যাও, উহাকে ধরিয়া আন। উদ্যান-পালিকাকে বলিলেই সে ধরিয়া দিবে।'

বটুকভট্টের চক্ষু গোলাকৃতি হইল, সে বলিল—'রাজার আদেশ অলঙ্ঘনীয়, কিন্তু অনাহূতভাবে রাজ-অবরোধে প্রবেশ করা কি উচিত হইবে? লোকে যদি নিন্দা করে?'

'নিন্দা করিবে না—তুমি যাও।'

বটুক অতিশয় গম্ভীরমুখে বলিল—'অকলঙ্ক-চরিত্র ব্রাহ্মণ-সন্তানকে সর্বদাই সাবধানে থাকিতে হয়—'

মহারাজ শ্লেষ করিয়া বলিলেন—'এত ভয় কিসের?'

তখন সত্য কথা বাহির হইয়া পড়িল, বটুক কম্পিতস্বরে কহিল—'যদি আবার তীর ছোঁড়ে?'

মহারাজ হাসিয়া উঠিলেন—'ভয় নাই। রসিকতার চেষ্টা করিও না, তাহা হইলে আর কোনও বিপদ ঘটিবে না।'

ক্ষুব্ধস্বরে বটুক বলিল—'যাইতেই হইবে?'

তাহার কাতরভাব দেখিয়া মহারাজ স্মিতমুখে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—'হাঁ।'

সশব্দ দীর্ঘনিশ্বাস মোচনপূর্বক বটুক অনিচ্ছা-মন্থরপদে অন্তঃপুরের দিকে চলিল, মহারাজকে শুনাইতে শুনাইতে গেল—'এই জন্যই প্রজারা মাৎস্যন্যায় করে। সামান্য একটা পক্ষীর জন্য—'

কয়েক পদ গিয়া বটুক আবার ফিরিয়া আসিল, বলিল—'মহারাজ, আমি বলি, আপনিও আমার সঙ্গে চলুন না, দু'জন থাকিলে বিপদে আপদে পরস্পরকে রক্ষা করিতে পারিব।'

মহারাজ হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন—'মূর্খ, আমিই যদি যাইব, তবে তোমাকে পাঠাইতেছি কেন?'

বটুকভট্ট তখন জোড়করে করুণবচনে বলিল—'মহারাজ, রক্ষা করুন, আমাকে একাকী পাঠাইবেন না। ঐ বিদেশিনী যুবতীটাকে আমি বড় ভয় করি।'

মহারাজের স্মিতমুখে ক্ষণকালের জন্য ঈষৎ ভাবান্তর দৃষ্ট হইল; তিনি যেন

বিমনা হইয়া কি ভাবিলেন। তার পর বাহিরে দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া বলিলেন—'না, তুমি একাকী যাও, আমি যাইব না।'

এবার বটুকভট্ট প্রতিশোধ লইল, রাজার বাক্য ফিরাইয়া দিয়া বলিল—'কেন, আপনার এত ভয় কিসের?'

রুষ্ট বিস্ময়ে মহারাজ বলিলেন—'ভয়? আমি কি তোমার মত শিখা-সর্বস্ব ব্রাহ্মণ!' বটুক উত্তর দিল না, শুধু মিটিমিটি চাহিতে লাগিল। তখন মহারাজ অধীরভাবে বলিলেন—'ভাল, একাকী যাইতে ভয় পাও, চল, আমি রক্ষক হিসাবে যাইতেছি। নারী-ভয়ে ভীত ব্রাহ্মণকে রক্ষা করাও সম্ভবতঃ রাজধর্ম।'

রাজা অগ্রবর্তী হইয়া অন্তঃপুর অভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে বটুকভট্টের কণ্ঠ হইতে একবার একটা অবরুদ্ধ হাসির শব্দ বাহির হইল। রাজা সন্দিগ্ধভাবে তাহার দিকে ফিরিলেন; কিন্তু বটুকভট্টের মুখে দুর্জয় গাম্ভীর্য ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

সংকীর্ণ পরিখার ভিতর অনুচ্চ প্রাকার-বেষ্টনী—তন্মধ্যে রাজ-অবরোধের চক্রাকৃতি বিস্তীর্ণ ভূমি। ভূমির কেন্দ্রস্থলে সৌধ—চতুর্দিকে নানা বৃক্ষ-লতা-শোভিত উপবন।

উদ্যানে প্রবেশপূর্বক কয়েক পদ গমন করিবার পর মহারাজ সেনজিতের গতি ক্রমশ শ্লথ হইয়া শেষে থামিয়া গেল। যে আমলকীবৃক্ষটা তাঁহার লক্ষ্য ছিল, তাহার অনতি-দূরে এক পুষ্পিত রক্ত-কুরুবকের ছায়ায় তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনি দেখিলেন, সদ্যস্নাতা উল্কা একাকিনী বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া কর্ণে কুরুবক-কোরকের অবতংস পরি-তেছে! তাহার কটিতটে চম্পকবর্ণ সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র, বক্ষে কাশ্মীর-রঞ্জিত নিচোল—উত্তরীয় নাই। দর্পণের ন্যায় ললাটে কুঙ্কুম-তিলক, চরণপ্রান্তে লাক্ষারাগ, সিক্ত অবেণীবদ্ধ কুন্তলভার পৃষ্ঠে বিলম্বিত হইয়া যেন এই সম্মোহিনী প্রতিমার পটভূমিকা রচনা করিয়াছে।

মহারাজের উত্তরীয় আকর্ষণ করিয়া উত্তেজিত নিম্নস্বরে বটুকভট্ট বলিল—'মহা-রাজ, দেখুন, দেখুন, সাক্ষাৎ কন্দর্পের জয়শ্রী বৃক্ষতলে আবির্ভূতা হইয়াছে। হে কন্দ-র্পারি, এই দুরন্ত বসন্তকালে তুমি আমাদের রক্ষা কর।'

পরিপূর্ণ নারীবেশে মহারাজ ইতিপূর্বে উল্কাকে দেখেন নাই—আজ প্রথম দেখি-লেন। উল্কা যখনই প্রকাশ্যে বাহির হইয়াছে, নারীসুলভ প্রসাধন বর্জন করিয়া দৃপ্ত যোদ্ধৃবেশে দেখা দিয়াছে। তাই আজ তাহার সুকুমার নারীমূর্তি যেন দর্শকের চিত্তে বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া দিল।

উল্কাও দূর হইতে মহারাজকে দেখিতে পাইয়াছিল; সে রিমঝিম মঞ্জীর বাজাইয়া, অঙ্গসঞ্চালনে লাবণ্যের তরঙ্গ তুলিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইল। জঘনভারমন্থর মদালস গতি, যেন প্রতি পদক্ষেপে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। উত্তরীয়ের অভাবে ব্যক্ত দেহভাগ সুমধুর নির্লজ্জতায় নিজ গৌরব-গর্ব ঘোষণা করিতেছে। মন্ত্ররুদ্ধবীর্য সর্পের ন্যায় মহারাজ স্থির হইয়া রহিলেন।

উল্কা মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হইল। মুখে একটু ভঙ্গুর হাসি, আয়ত চক্ষু-পল্লবে শ্যামস্নিগ্ধ ছায়া। উল্কা মহারাজের পদপ্রান্তে জানু নত করিয়া বসিল, কূজন-মধুর স্বরে বলিল—'প্রভাতে উঠিয়া রাজদর্শন করিলাম, আজ আমার সুপ্রভাত। দেব-প্রিয়, দাসীর অর্ঘ গ্রহণ করুন।' বলিয়া কপোতহস্তে কয়েকটি কুরুবক-কলি তুলিয়া ধরিল।

মহারাজ মূক হইয়া রহিলেন।

বটুকভট্ট উল্কার আগমনে মহারাজের পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেখান হইতে

হস্ত উত্তোলন করিয়া বহু অলংকারযুক্ত ভাষায় সাড়ম্বরে আশীর্বচন উচ্চারণ করিতে লাগিল। তাহার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে মহারাজের চমক ভাঙিল।

আত্মবিস্মৃতির তন্দ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়াই মহারাজ মুখভাব কঠিন করিলেন, ললাটে ভ্রূকুঞ্চন দেখা দিল। তিনি ধীর-হস্তে উল্কার অঞ্জলি হইতে একটি পুষ্প তুলিয়া লইয়া সংক্ষিপ্ত স্বরে বলিলেন—'স্বস্তি!'

উল্কা চপলনেত্রে আনন্দ বিকীর্ণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কর্ণভূষণ দুলাইয়া পরিহাস্য-তরল-কণ্ঠে বলিল—'মহারাজ, এতদিনে বিদেশিনীকে স্মরণ হইল? রাজকার্য কি এতই গুরু?'

উল্কাকে এত হাস্যরহস্যময়ী মহারাজ পূর্বে দেখেন নাই; কিন্তু তিনি আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া বলিলেন—'আমার একটা শুকপক্ষী উড়িয়া ঐ আমলকীবৃক্ষে বসিয়াছে, তাহাকে ধরিতে আসিয়াছি।'

কলকণ্ঠে হাসিয়া উল্কা বলিল—'সত্য? কই, আসুন তো দেখি।'

ক্রীড়াচঞ্চলা বালিকা যেন নূতন খেলার উপাদান পাইয়াছে, এমনই ভাবে চটুলপদে উল্কা আগে আগে চলিল, মহারাজ তাহার অনুবর্তী হইলেন। যাইতে যাইতে গ্রীবা বাঁকাইয়া উল্কা জিজ্ঞাসা করিল—'মহারাজ, আপনার শুকের নাম কি?'

মহারাজ গম্ভীরমুখে বলিলেন—'বিম্বোষ্ঠ।'

'বিম্বোষ্ঠ! কি সুন্দর নাম!—কঞ্চুকী মহাশয় আমাকেও একটা শুকপক্ষী দিয়াছেন—সে ইহারই মধ্যে কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু এখনও তাহার নামকরণ হয় নাই। কি নাম রাখি বলুন তো?'

মহারাজ ললাটের উপর দিয়া একবার হস্তচালনা করিলেন, উল্কার পক্ষীর নামকরণ সহসা করিতে পারিলেন না।

ক্রমে উভয়ে আমলকীবৃক্ষতলে উপনীত হইলেন। রাজা পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, সাবধানী বটুক তাঁহার সঙ্গে আসে নাই, বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া আছে। তিনি মনে মনে ভীরু ব্রাহ্মণকে কটূক্তি করিলেন।

আমলকীবৃক্ষ বসন্ত ঋতুর সমাগমে নবপত্রে শোভিত হইয়াছে, তাহার ভিতরে হরিদ্বর্ণ পক্ষী সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। উল্কা ও মহারাজ ঊর্ধ্বমুখ হইয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

সহসা উল্কা সেনজিতের হাত ধরিয়া টানিয়া বলিয়া উঠিল—'ঐ দেখুন মহারাজ, ঐ দেখুন, আপনার ধূর্ত বিম্বোষ্ঠ পত্রান্তরালে বসিয়া ফল ভক্ষণ করিতেছে।'

মহারাজ ধীরে ধীরে হাত ছাড়াইয়া লইলেন, তারপর রুক্ষস্বরে কহিলেন—'বিম্বোষ্ঠ, নামিয়া আয়!'

মহারাজের কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র বিম্বোষ্ঠ নখধৃত ফল ফেলিয়া দিয়া সতর্কভাবে ঘাড় বাঁকাইয়া নীচের দিকে তাকাইল, কিন্তু নামিয়া আসিবার জন্য কোনও ব্যস্ততা প্রদর্শন করিল না।

মহারাজ আবার তর্জন করিলেন—'বিম্বোষ্ঠ, শীঘ্র নামিয়া আয়!'

কোনও ফল হইল না; বিম্বোষ্ঠ পাশের দিকে সরিয়া গিয়া এক শাখার আড়ালে লুকাইবার চেষ্টা করিল।

উল্কা বিভক্ত ওষ্ঠাধরে দেখিতেছিল, এবার সে পলাতক মুক্তিবিলাসী পক্ষীকে আহ্বান করিল; ভ্রূবিলাস করিয়া কপট ক্রোধমিশ্রিত কৌতুকের স্বরে বলিল—'ধৃষ্ট পাখী, মহারাজের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে তোর সাহস হয়? এখনও নামিয়া আয়, নচেৎ তোর দুই পায়ে শিকল দিয়া পিঞ্জরে বাঁধিয়া রাখিব।'

এত বড় শাসনবাক্যেও বিদ্রোহী পাখী অটল রহিল। তখন উভয়ে বহু প্রকারে তাহাকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন, উল্কা আরক্ত বিম্বাধর স্ফুরিত করিয়া, কর-কঙ্কণ ক্বণিত করিয়া তাহাকে তর্জন অনুনয় করিল; কিন্তু বিম্বোষ্ঠ গ্রাহ্য করিল না।

তখন সেনজিৎ হতাশ হইয়া বলিলেন—'এখন উপায়?'

উল্কা গণ্ডে তর্জনী রাখিয়া চিন্তা করিল। তার পর সহসা মুখ তুলিয়া বলিল—'উপায় আছে, মহারাজ! ক্ষণেক অপেক্ষা করুন, আমি আসিতেছি।' বলিয়া রহস্যময় হাসিয়া দ্রুতশিঞ্জিত-চরণে ভবন অভিমুখে প্রস্থান করিল। সেনজিৎ তাঁহার চঞ্চল নিতম্বলুণ্ঠিত কেশজালের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই চক্ষু ফিরাইয়া লইলেন।

কিয়ৎকাল পরে উল্কা ফিরিয়া আসিল। মহারাজ দেখিলেন, তাহার মণিবন্ধে একটি দীর্ঘপুচ্ছ শুক পক্ষী।

মহারাজ আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন—'পাখী দিয়া পাখী ধরিবে?'

উল্কা পূর্ণ-দৃষ্টিতে মহারাজের দিকে তাকাইল, বলিল—'হাঁ। কেন, তাহা কি অসম্ভব?'

মহারাজের গণ্ড ঈষৎ উত্তপ্ত হইল, তিনি পুনর্বার কণ্ঠস্বর নীরস করিয়া বলিলেন—'বলিতে পারি না। চেষ্টা করিয়া দেখিতে পার।'

উল্কা তখন মৃদুহাস্যে বাহু ঊর্ধ্বে তুলিয়া কুহক-মধুর স্বরে ডাকিল,—'আয়, আয় বিম্বোষ্ঠ! এই দ্যাখ, তোর সাথী তোর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। আয়!'

বিম্বোষ্ঠ কৌতূহলীভাবে নীচের দিকে তাকাইল, ঘাড় বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া নিরীক্ষণ করিল। তার পর উড়িয়া আসিয়া উল্কার অংসের উপর বসিল।

বিজয়োজ্জ্বল দৃষ্টিতে উল্কা বলিল—'দেখিলেন, মহারাজ?'

'দেখিলাম।'

দুই পক্ষী কিছুক্ষণ নীরবে পরস্পরের পরিচয় গ্রহণ করিল। তার পর বিম্বোষ্ঠ অবজ্ঞাসূচক একটা শব্দ করিয়া উল্কার কর্ণবিলম্বী রক্তবর্ণ কুরুবক-মুকুলে চঞ্চু বসা-ইয়া টান দিল।

উল্কা বিপন্নভাবের বিভ্রম করিয়া বলিয়া উঠিল—'মহারাজ, রক্ষা করুন, আপনার দস্যু পক্ষী আমার কর্ণভূষা হরণ করিতে চায়।'

সেনজিৎ পক্ষীকে ধরিতে গেলেন। পাখী ঝটপট করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিল, কিন্তু মহারাজ তাহার চরণবিলম্বিত স্বর্ণশৃঙ্খলের অংশ ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। পাখী পলাইতে পারিল না—মহারাজের উন্মুক্ত বক্ষের উপর গিয়া পড়িল। ভীত পক্ষীর তীক্ষ্ন নখ তাঁহার বক্ষে অবলম্বন অন্বেষণ করিতে গিয়া কয়েকটা আঁচড় কাটিয়া দিল।

দেখিতে দেখিতে নখচিহ্ন রক্তিম হইয়া উঠিল; তার পর দুই বিন্দু রক্ত ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইয়া গড়াইয়া পড়িল।

উল্কা সত্রাসে বলিয়া উঠিল—'সর্বনাশ! মহারাজ, এ কি হইল!—ওরে কে আছিস্, শীঘ্র আয়! বান্ধুলি! বিপাশা!—শীঘ্র অনুলেপন লইয়া আয়! মহারাজ আহত হইয়াছেন।'

মহারাজের মুখ লজ্জায় রক্তবর্ণ হইল, তিনি প্রায় রূঢ়স্বরে বলিয়া উঠিলেন—'এ কিছু নয়, সামান্য নখক্ষত মাত্র।'

'সামান্য নখক্ষত! মহারাজ কি জানেন না, পশু-পক্ষীর নখে বিষ থাকে?' ব্যাকুল-ভাবে গৃহের দিকে তাকাইয়া বলিল—'কই, কেহ আসে না কেন? বিলম্বে বিষ যে দেহে প্রবেশ করিবে। বান্ধুলি! সুজাতা!'

মহারাজ আবার আরক্তমুখে আপত্তি করিলেন। তখন উল্কা হঠাৎ যেন পথ খুঁজিয়া

পাইয়া বলিয়া উঠিল—'মহারাজ, আপনি স্থির হইয়া দাঁড়ান, আমি বিষ নিষ্কাশন করিয়া
:!'

উল্কার উদ্দেশ্য মহারাজ সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্বেই সে মহারাজের একেবারে নিকটে গিয়া দাঁড়াইল, তার পর দুই হাত তাঁহার স্কন্ধের উপর রাখিয়া ক্ষরণশীল ক্ষতের উপর তাহার কোমল অধরপল্লব স্থাপন করিল। মহারাজ ক্ষণকাল স্তম্ভিত অভিভূত হইয়া রহিলেন, তার পর সবলে নিজেকে উল্কার আশ্লেষমুক্ত করিয়া লইয়া পিছু সরিয়া দাঁড়াইলেন।

উল্কার অধরে মহারাজের বক্ষ-শোণিত। সে অর্ধস্ফুট বিস্ময়ে বলিল—'কি হইল!'

তিক্ত ঘৃণাজর্জরিতস্বরে সেনজিৎ বলিলেন—'নারীর পুরুষভাব আমি ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু নির্লজ্জতা অসহ্য!' বলিয়া উল্কার দিকে আর দৃক্‌পাত না করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

যতক্ষণ মহারাজকে দেখা গেল, উল্কা স্থিরনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চোখে ধিকি-ধিকি আগুন জ্বলিতে লাগিল। তার পর সে সজোরে দন্ত দিয়া অধর দংশন করিল। মহারাজের বক্ষোরুধিরে উল্কার রুধির মিশিল।

প্রত্যাখ্যাতা খণ্ডিতা নারীর চিত্ত-গহনে কে প্রবেশ করিবে? শিকার-বঞ্চিতা ব্যাঘ্রীর ক্ষুধিত জিঘাংসাই বা কে পরিমাপ করিতে পারে? উল্কার নয়নে যে বহ্নি জ্বলিতে লাগিল, তাহার অন্তর্গূঢ় রহস্য নির্ণয় করা মানুষের সাধ্য নয়। বোধ করি দেবতারও অসাধ্য।

সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে সেনজিৎ রাজোদ্যানে একাকী বিচরণ করিতেছিলেন। মধ্যাহ্নের তপ্ত বায়ু মন্দীভূত হইয়া অগ্নিকোণ হইতে মৃদু শীতল মলয়ানিল বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সুদূর চম্পারণ্যের চাঁপার বন হইতে সুগন্ধ আহরণ করিয়া মহারাজের আতপ্ত ললাট স্নিগ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

মহারাজের চক্ষের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি তাঁহার অশান্ত চিত্তের প্রতিচ্ছবি বহন করিতেছিল। পদাচারণ করিতে করিতে তিনি অন্যমনে যূথীগুল্ম হইতে পুষ্প তুলিয়া নখে ছিন্ন করিতেছিলেন, কখনও ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া আকাশে যেখানে সূর্যাস্তের বর্ণ-বিলাস চলিতেছিল সেই দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিতেছিলেন।

এই সময় রাজ্যের মহামাত্য ধীরপদে আসিয়া মহারাজকে আশীর্বাদ করিয়া দাঁড়াইলেন। অপ্রসন্ন সপ্রশ্ন মুখে মহারাজ তাঁহার প্রতি চাহিলেন। কোনও কথা হইল না; মন্ত্রী নীরবে একটি ক্ষুদ্র লিপি বাহির করিয়া তাঁহার হস্তে দিলেন।

ভূর্জপত্রে লিখিত লিপি; তাহাতে এই কয়টি কথা ছিল—

—'বৈশালিকা নারী সম্বন্ধে সাবধান। কোনও কুটিল উদ্দেশ্যে সে মগধে প্রেরিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ মহারাজকে রূপমোহে বশীভূত করিয়া লিচ্ছবির কার্যসিদ্ধি করা তাহার অভিপ্রায়।'

পত্র পাঠ করিয়া মহারাজ আরক্ত মুখ তুলিলেন; মন্ত্রী অন্য দিকে চাহিয়া ধীর স্বরে বলিলেন—'বৈশালী হইতে আমাদের গুপ্তচর অদ্য এই পত্র পাঠাইয়াছে।'

মহারাজ কথা কহিলেন না, লিপির দিকে কিছুক্ষণ বিরাগপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া ভূর্জপত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া বাতাসে উড়াইয়া দিলেন। মন্ত্রী অবিচলিত মুখচ্ছবি লইয়া পুনর্বার মহারাজকে আশীর্বাদপূর্বক প্রস্থান করিলেন।

ক্রমে রাত্রি হইল, আকাশের আভুগ্ন চন্দ্রকলা এতক্ষণ মলিন-মুখে ছিল, প্রতিদ্বন্দ্বীর তিরোভাবে এখন যেন বাঁকা হাসি হাসিয়া উঠিল। মহারাজের সন্নিধাতা স্বর্ণপাত্রে স্নিগ্ধ আসব লইয়া উপস্থিত হইলে মহারাজ একনিশ্বাসে সুরা পান করিয়া পাত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

তার পর একে একে বয়স্যরা আসিল। কিন্তু মহারাজের মুখে প্রকট বিরক্তি ও নির্জন-বাসের স্পৃহা লক্ষ্য করিয়া তাহারা সংকুচিতভাবে অপসৃত হইয়া গেল। বটুকভট্ট আসিয়া মহারাজের চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করিল, তাহার চটুলতা কিয়ৎকাল ধৈর্যসহকারে শ্রবণ করিয়া মহারাজ তাঁহার প্রকৃত মনোভাব ব্যক্ত করিলেন, বলিলেন—'বটুক, তোমাকে শূলে দিবার ইচ্ছা হইতেছে।'

বটুক দ্রুত পলায়ন করিতে করিতে বলিল—'মহারাজ, ও ইচ্ছা দমন করুন, আমি শয্যায় শুইয়া শুইয়া মরিতে চাই।'

রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হইতে লাগিল। উৎকণ্ঠিত সন্নিধাতা মহারাজের আশে পাশে ঘুরিতে লাগিল; কিন্তু কাছে আসিতে সাহস করিল না। সদা-প্রসন্ন মহারাজের এরূপ ভাবান্তর পূর্বে কেহ দেখে নাই, সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। রাজপুরীর সূপকার হইতে সম্বাহক পর্যন্ত সকলের মধ্যেই কানে কানে বার্তা প্রচারিত হইয়া গেল—দেবপ্রিয় মহারাজের আজ চিত্ত সুস্থ নাই। যবনী প্রতীহারীরা ঊর্ধ্ব-চোখে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল; তাহাদের বর্মাচ্ছাদিত বক্ষও মহারাজের জন্য ব্যথিত হইয়া উঠিল।

সেনজিতকে রাজ্যের আপামর সাধারণ সকলেই ভালবাসিত। বিশেষতঃ পুরপরিজন তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিত, তাঁহার অল্পমাত্র ক্লেশ দূর করিবার জন্য বোধ করি প্রাণ দিতেও কেহ পরাঙ্মুখ হইত না। রাজা যেখানে প্রজার বন্ধু সেখানে এমনই হয়। কিন্তু তবু আজিকার এই মধুর বসন্ত-রজনীতে মহারাজ বক্ষে অজ্ঞাত সন্তাপের অগ্নি জ্বালিয়া একাকী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, পাত্রমিত্র বয়স্য পরিজন কেহ সান্ত্বনা দিবার জন্যও তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইল না।

রাত্রি দ্বিপ্রহর হইতে যখন আর বিলম্ব নাই তখন মহারাজ দ্রুত পাদচারণ করিতে করিতে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। নিস্তব্ধ বাতাসে সুমধুর বীণা-ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। ধ্বনি অন্তঃপুরের দিক হইতে আসিতেছে। অতি মৃদু ধ্বনি, কিন্তু যেন প্রাণের দুরন্ত আক্ষেপভরে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

ব্যাধ-বংশী-আকৃষ্ট মৃগের মত মহারাজের পদদ্বয় অজ্ঞাতসারে ঐ বীণা-ধ্বনির দিকে অগ্রসর হইল, তিনি পরিখার প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

পরিখার পরপারে প্রাচীরের অন্তরালে বসিয়া কে বীণা বাজাইতেছে। ক্রমে বীণা-ধ্বনির সহিত একটি কণ্ঠস্বর মিশিল। তরল খেদ-বিগলিত কণ্ঠস্বর—মনে হয় যেন জ্যোৎস্না কুহেলির সহিত মিশিয়া মিলাইয়া যাইতেছে। মহারাজ তন্ময় একাগ্র হইয়া শুনিতে লাগিলেন। প্রথমে দুই একটি কথা, তার পর সম্পূর্ণ সংগীত তাঁহার শ্রুতি-গোচর হইল।

আধ-আধ প্রাকৃত ভাষায় গ্রথিত সংগীত, তাহার মর্ম—

হায় ধিক্ কন্দর্পদর্পাহতা!
মন্মথ তোমার মন মথন করিল,
প্রিয়জনকে নিকটে পাইয়া তুমি লজ্জা বিসর্জন দিলে।
হায়, কেন লজ্জা বিসর্জন দিলে?
প্রিয়জনের ঘৃণা তোমার অঙ্গ দহন করিল,
মদন তোমার অন্তর দহন করিল—

তুমি অন্তরে বাহিরে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইলে!
হায় ধিক্ কন্দর্পদর্পাহতা!

বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাসে সঙ্গীত মিলাইয়া গেল। মহারাজ কয়েক মুহূর্ত পাষাণ-মূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন, তার পর ঊর্ধ্বশ্বাসে সে স্থান ছাড়িয়া উদ্যান উত্তীর্ণ হইয়া নিজ শয়নভবনে প্রবেশ করিলেন।

শুষ্ক ইন্ধনে অগ্নি অধিক জ্বলে। সে রাত্রে মহারাজের নয়নে নিদ্রা আসিল না।

একে একে ফাল্গুনের মদোচ্ছ্বসিত দিনগুলি কাটিতে লাগিল। মহারাজের চিত্তে সুখ নাই, মুখে হাসি নাই—তিনি দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিলেন।

মহারাজের প্রকৃতি যেন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল। অকারণ ক্রোধ—যাহা পূর্বে কেহ দেখে নাই—তাঁহার প্রতি কার্যে প্রতি সম্ভাষণে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। মানুষের সাহচর্য বিষবৎ অসহ্য হইয়া উঠিল। প্রত্যহ সন্ধ্যা হইতে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত উদ্যানে উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় বিচরণ করা তাঁহার নিত্যকার্য হইয়া দাঁড়াইল।

একমাত্র বটুকভট্টই বোধ হয় মহারাজের চিত্তবিক্ষোভের যথার্থ কারণ অনুমান করিয়াছিল; কিন্তু ব্রাহ্মণ বাহিরে মূর্খতার ভান করিলেও ভিতরে তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন—সে ঘুণাক্ষরে কাহারও কাছে কোনও কথা প্রকাশ করিল না। নারীবিদ্বেষী মহারাজের এত দিনে চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়াছে, এ কথা তিনি স্বয়ং যখন গোপন করিতে চান তখন তাহা প্রকাশ করিয়া দিলে তাঁহার লজ্জা বৃদ্ধি পাইবে। এরূপ ক্ষেত্রে আপাততঃ এ কথা প্রচ্ছন্ন রাখাই শ্রেয়। মহারাজ যখন কন্দর্পের নিকট পরাভব স্বীকার করিবেন, তখন আপনিই সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

কিন্তু মহারাজের চিত্তে প্রফুল্লতা আনয়ন করিবার চেষ্টাও বটুকভট্টের সফল হইল না। সে সহজভাবে ইহাই বুঝিয়াছিল যে, মহারাজ যখন উল্কার প্রতি মনে মনে অনুরক্ত হইয়াছেন, তখন উভয়ের মিলন ঘটাইতে পারিলেই সব গণ্ডগোল চুকিয়া যাইবে। মহারাজের নারীবিদ্বেষ ও বিবাহে অনিচ্ছা যদি এইভাবে পরিসমাপ্তি লাভ করে, তবে তো সব দিক দিয়াই মঙ্গল। মগধের পট্টমহাদেবী হইতে উল্কার সমকক্ষ আর কে আছে?—এই ভাবিয়া বটুক তাহার সমস্ত ছলা-কলা ও রঙ্গভঙ্গ ঐ উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত করিয়াছিল। কিন্তু হায়, মহারাজের হৃদয় মন্থন করিয়া যে একই কালে অমৃত ও গরল উঠিয়াছে, তাহা অনুগত বটুক জানিতে পারে নাই।

এমনই ভাবে দিনগুলি ক্ষয় হইতে লাগিল, ওদিকে আকাশে চন্দ্রদেব পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। শেষে একদিন বসন্তোৎসবের মধুরাকা আসিয়া উপস্থিত হইল।

দেশসুদ্ধ নরনারী উৎসবে মাতিল। সকলেই মুখেই আনন্দের—তথা আসবের মদবিহ্বলতা। এমন কি যবনী প্রতীহারীরাও মাধ্বী পান করিয়া অরুণায়িত-নেত্রে পরস্পরের অঙ্গে কুঙ্কুম-পরাগ নিক্ষেপ করিয়া, বীণ বাজাইয়া, দ্রাক্ষাবনের গীত গাহিয়া উৎসবে মগ্ন হইল।

কেবল মহারাজ সেনজিৎ ভ্রূকুটি-ভয়াল মুখে সহচরহীন নিঃসঙ্গতার মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

সেদিন সন্ধ্যার পূর্বে তিনি ক্লান্তদেহে উদ্যানে গিয়া একটি মর্মরবেদীর উপর উপবেশন করিয়া শূন্যদৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিলেন। অমনি সম্মুখে পরিখার পরপারে অন্তঃপুর-ভবনের শুভ্রচূড়া চোখে পড়িল। মহারাজ সেদিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিলেন। উদ্যানে কেহ নাই, উদ্যান-পালিকারাও আজ উৎসবে গা ঢালিয়া দিয়াছে; মহারাজকে

কেহ বিরক্ত করিল না।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। পূর্ব-দিগন্তে পূর্ণিমার চাঁদ উঁকি মারিল। দিনের আলো সম্পূর্ণ নিভিয়া যায় নাই, অথচ চাঁদের কিরণ পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ করিয়াছে—দিবা-রাত্রির এই সন্ধিক্ষণে মহারাজের চিত্তও কোন্ ধূসর বর্ণপ্রলেপহীন অবসন্নতায় নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিল, এমন সময় অকস্মাৎ একটি তীর আসিয়া তাঁহার পাশে পড়িল। চকিতে মহারাজ তীরটি তুলিয়া লইলেন; তীরের অগ্রভাগে ধাতু-ফলকের পরিবর্তে অশোকপুষ্প গ্রথিত, তীরগাত্রে একটি লিপি জড়ানো রহিয়াছে। কম্পিত হস্তে লিপি খুলিয়া মহারাজ পড়িলেন—লাক্ষারাগ দিয়া লিখিত লিপি—

'আজ বসন্ত-পূর্ণিমার রাত্রে নির্লজ্জা উল্কা প্রার্থনা জানাইতেছে, মহারাজ একবার দর্শন দিবেন কি?'

মহারাজ পত্রখানি দুই হাতে ধরিয়া দুরন্ত আবেগে মুখের উপর চাপিয়া ধরিলেন। রুদ্ধ অস্ফুট স্বরে বলিলেন—'উল্কা মায়াবিনি—'

বাসনা প্রতিরোধেরও সীমা আছে! মহারাজ সেনজিতের অন্তর্দ্বন্দ্ব শেষ হইল।

সেদিন প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিবার পর হইতেই উল্কা মনে মনে মহারাজের আগমন প্রতীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এ কয় দিন মহারাজ তাহাকে দেখেন নাই, কিন্তু সে সৌধশীর্ষ হইতে লুকাইয়া মহারাজকে দেখিয়াছিল। তাই মদনোৎসবের প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইয়াছিল—আজ তিনি আসিবেন। পুরুষের মন এত কঠিন হইতে পারে না, আজ মহারাজ নিশ্চয় ধরা দিবেন।

কর্পূর-সুবাসিত জলে স্নান করিয়া সে প্রসাধন করিতে বসিয়াছিল। সখীরা তাহাকে অপরূপ সাজে সাজাইয়া দিয়াছিল; কিন্তু তবু তাহার মনঃপূত হয় নাই। বার বার কবরী খুলিয়া নূতন করিয়া কবরী বাঁধিয়াছিল—অঙ্গের পুষ্পাভরণ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল, চন্দনের পত্রলেখা মুছিয়া বক্ষে কুঙ্কুমের পত্রলেখা আঁকিয়াছিল, আবার তাহা মুছিয়া চন্দনের চিত্র লিখিয়াছিল। শেষে রাগ করিয়া সখীদের বলিয়াছিল—'তোরা কিছু জানিস্ না। আজ আমার জীবনের মহা সন্ধিক্ষণ, এমন করিয়া আমাকে সাজাইয়া দে—যাহাতে মহেশ্বরের মনও জয় করিতে পারি।'

সখীরা হাসিয়া বলিয়াছিল—'সেজন্য সাজিবার প্রয়োজন কি?'

কিন্তু প্রভাত বহিয়া গেল, মহারাজ আসিলেন না।

উল্কার পুষ্পাভরণ অঙ্গ-তাপে শুকাইয়া গেল, সে আবার নূতন পুষ্পভূষা পরিল। দ্বিপ্রহর অতীত হইল, অপরাহ্ণ ক্রমে সায়াহ্নে গড়াইয়া গেল, তবু মহারাজ দর্শন দিলেন না। সখীরা উল্কার চোখের দৃষ্টি দেখিয়া ভীত হইল।

সন্ধ্যার সময় প্রাসাদ-চূড়ে উঠিয়া উল্কা দেখিল—মহারাজ উদ্যানে বসিয়া আছেন, তাঁহার মুখ বিপরীত দিকে। তিক্ত অন্তঃকরণে উল্কা ভাবিল—'ধিক্ আমাকে!'

তার পর মহারাজের সমীপে তীর নিক্ষেপ করিয়া, বসন-ভূষণ ছিঁড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া উল্কা শয্যায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। উল্কার চোখে বোধ করি জীবনে এই প্রথম অশ্রু দেখা দিল।

রাত্রি হইল। নগরীর প্রমোদ-কলরব ক্রমশ মৌন রসনিমগ্ন হইয়া আসিতে লাগিল। চন্দ্র মধ্যগগনে আরোহণ করিলেন।

উল্কার সখীরা সপ্তপর্ণ-বৃক্ষের শাখায় হিন্দোলা বাঁধিয়াছিল। উল্কা যখন দেখিল মহারাজ সত্যই আসিলেন না, তখন সে বুকের কঞ্চুকী কবরীর মালা ফেলিয়া দিয়া কেশ

এলাইয়া সেই হিন্দোলায় গিয়া বসিল। তার পর শুষ্ক চোখে চাঁদের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল—'ব্যর্থ! ব্যর্থ! পারিলাম না! এত ছলনা চাতুরী সব মিথ্যা হইল। কোন্ দর্পে তবে মগধে আসিয়াছিলাম? এখন এ লজ্জা কোথায় রাখিব? উঃ—এত নীরস পুরুষের মন? ধিক্ আমার জীবনে? আমার মৃত্যু ভাল!'

'উল্কা!'

কে ডাকিল? কণ্ঠস্বর শুনিয়া চেনা যায় না। উল্কা গ্রীবা ফিরাইয়া দেখিল, বৃক্ষচ্ছায়ায় এক পুরুষ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

'উল্কা! রাক্ষসি! আমি আসিয়াছি।'

উল্কা চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তরুপত্রের ছায়ান্ধকারে ঐ মূর্তি দেখিয়া সে প্রতিহিংসা ভুলিয়া গেল, মগধ ভুলিয়া গেল, বৈশালী ভুলিয়া গেল। দুর্দমনীয় অভিমানের বন্যা তাহার বুকের উপর দিয়া বহিয়া গেল। এমন করিয়াই কি আসিতে হয়? সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা নির্মূল করিয়া, অভিমান-দর্প ধূলায় মিশাইয়া দিয়াই কি আসিতে হয়? নির্লজ্জার প্রগল্ভ লজ্জাহীনতার কি ইহার বেশী মূল্য নাই?

মহারাজ উল্কার অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, দুই হস্ত তাহার শ্লথবাস স্কন্ধের উপর রাখিয়া ক্ষুধিত নয়নে তাহার চক্ষের ভিতর চাহিয়া বলিলেন—'উল্কা, আর পারিলাম না। আমি তোমায় চাই। আমার রক্তের সঙ্গে তুমি মিশিয়া গিয়াছ, আমার হৃৎ-স্পন্দনে তোমার নাম ধ্বনিত হইতেছে—শুনিতে পাইতেছ না? এই শুন।' বলিয়া তিনি উল্কার মুখ নিজ বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

অভিমানও ভাসিয়া গেল। এই থরথর ব্যাকুলতার সম্মুখে মান-অভিমান বিলাস-বিভ্রম কিছুই রহিল না; শুধু রহিল চিরন্তন প্রেমলিপ্সু নারীপ্রকৃতি। উল্কা স্ফুরিত অধরোষ্ঠ সেনজিতের দিকে তুলিয়া ধরিয়া স্বপ্ন-বিজড়িত দৃষ্টিতে চাহিল, পাখীর তন্দ্রা-কূজনের ন্যায় অস্ফুটকণ্ঠে বলিল—'প্রিয়! প্রিয়তম—!'

মহারাজের তপ্ত অধর বারম্বার তাহার অধরপাত্রে মধু পান করিল। তবু পিপাসা যেন মিটিতে চায় না! শেষে মহারাজ উল্কার কানে কানে বলিলেন—'উল্কা, সত্য বল, আমাকে ভালবাস? এ তোমার ছলনা নয়?'

উল্কার শিথিল দেহ সুখ-তন্দ্রায় ডুবিয়া গিয়াছিল, মহারাজের এই কথায় সে ধীরে ধীরে সেই তন্দ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল। তাহার মুকুলিত নেত্র উন্মীলিত হইয়া ক্রমে বিস্ফারিত হইল; তার পর মহারাজের বাহুবন্ধনমধ্যে তাহার দেহ সহসা কঠিন হইয়া উঠিল।

অভিনয় করিতে করিতে নটীর আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে; ছলনা কখন সত্যে পরিণত হইয়াছে হতভাগিনী জানিতে পারে নাই।

কিন্তু এখন? কর্ণমধ্যে সে বজ্রনির্ঘোষ শুনিতে পাইল—তুমি বিষকন্যা!

সবলে নিজ দেহ মহারাজের বাহুমুক্ত করিয়া লইয়া সে সরিয়া দাঁড়াইল, ত্রাস-বিবৃত চক্ষে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না; শুধু তাহার কণ্ঠের শিরা দপ্ দপ্ করিয়া স্পন্দিত হইতে লাগিল।

মহারাজ দুই বাহু বাড়াইয়া অগ্রসর হইলেন—'প্রাণাধিকে—'

'না না রাজাধিরাজ, আমার কাছে আসিও না—।' উল্কা আবার সরিয়া দাঁড়াইল।

মৃদু ভর্ৎসনার সুরে মহারাজ বলিলেন—'ছি উল্কা! এই কি ছলনার সময়?'

উল্কা স্খলিতস্বরে বলিল—'মহারাজ ভুল বুঝিয়াছেন, আমি মহারাজকে ভালবাসি না।'

সেনজিৎ হাসিলেন—'আর মিথ্যা কথায় ভুলাইতে পারিবে না।—এস—কাছে এস।'

ব্যাকুল হৃদয়-ভেদী স্বরে উল্কা কাঁদিয়া উঠিল—'না না—প্রিয়তম, তুমি জানো না—তুমি জানো না—'.

সেনজিতের মুখ ম্লান হইল, তিনি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন—'বোধ হয় জানি। তুমি বৈশালীর কুহকিনী, আমাকে ভুলাইতে আসিয়াছিলে; কিন্তু এখন আর তাহাতে কি আসে যায় উল্কা?'

'কিছু জানো না; মহারাজ, আমাদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। তুমি ফিরিয়া যাও, আর আমার মুখ দেখিও না। মিনতি করিতেছি, তুমি ফিরিয়া যাও।'

তাহার ব্যাকুলতা দেখিয়া মহারাজ বিস্ময়ে তাহার দিকে আবার অগ্রসর হইলেন। তখন উল্কা ব্যাধ-ভীতা হরিণীর ন্যায় ছুটিয়া পলাইতে লাগিল; তাহার কণ্ঠ হইতে কেবল উচ্চারিত হইল—'না না না—'

সেনজিৎ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন, কিন্তু ধরিতে পারিলেন না। উল্কা গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

অধীর ক্রোধে মহারাজ দ্বারে সবেগে করাঘাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু দ্বার খুলিল না।

দ্বারের অপরদিক হইতে উল্কা বলিল—'রাজাধিরাজ, বিস্তীর্ণা ধরণীতে আপনার যোগ্যা নারীর অভাব হইবে না। আপনি উল্কাকে ভুলিয়া যান।'

তিক্ত বিকৃতকণ্ঠে মহারাজ বলিলেন—'হৃদয়হীনা, তবে কেন আমাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিলে?'

মিনতি-কাতরস্বরে উল্কা বলিল—'আর্য, বুদ্ধিহীনা নারীর প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করুন। আপনি ফিরিয়া যান—দয়া করুন। আমাদের মিলন অসম্ভব।'

'কিন্তু কেন—কেন? কিসের বাধা?'

দ্বারের অপর পার্শ্বে উল্কার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুর বন্যা নামিয়াছে, তাহা মহারাজ দেখিতে পাইলেন না; শুধু শুনিতে পাইলেন, অর্ধব্যক্ত স্বরে উল্কা কহিল—'সে কথা বলিবার নয়।'

দন্তে দন্ত চাপিয়া মহারাজ বলিলেন—'কেন বলিবার নয়? তোমাকে বলিতে হইবে, আমি শুনিতে চাই!'

'ক্ষমা করুন।'

'না, আমি শুনিব।'

দীর্ঘ নীরবতার পর উল্কা বলিল—'ভাল, কল্য প্রাতে বলিব।'

মহারাজ দ্বারে মুখ রাখিয়া কহিলেন—'উল্কা, আজিকার এই মধুযামিনী বিফল হইবে?'

'হাঁ মহারাজ।'

যেন বক্ষে আহত হইয়া মহারাজ ফিরিয়া আসিলেন। ক্লান্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—'ভাল। কল্য প্রভাতেই বলিবে?'

'বলিব।'

'তার পর তুমি আমার হইবে?'

উল্কা নীরব।

মহারাজ বলিলেন—'উল্কা, তুমি কি? তুমি কি নারী নও? আমাকে এমন করিয়া দগ্ধ করিতে তোমার দয়া হয় না?'

উল্কা এবারও নীরব।

অশান্ত হৃদয় লইয়া মহারাজ চলিয়া গেলেন। উল্কা তখন দ্বারসম্মুখে ভূমিতলে পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল, আর নিজ মনে বলিতে লাগিল—'ফিরিয়া গেলেন, মহারাজ ফিরিয়া গেলেন! প্রিয়তম, কেন তোমাকে ভালবাসিলাম? কখন বাসিলাম? যদি বাসিলাম তো আগে জানিতে পারিলাম না কেন? শ্মশানের অগ্নিশিখা আমি, কেমন করিয়া এই অভিশপ্ত দেহ তোমাকে দিব?'

শ্মাশনের প্রেত-পিশাচরা বোধ করি শ্মশান-কন্যার এই অরুন্তুদ ক্রন্দন শুনিয়া অলক্ষ্যে অট্টহাস্য করিয়া নিঃশব্দে করতালি দিয়া নাচিতে লাগিল।

হায় উল্কা, তোমার পাষাণ-হৃদয় পাষাণই থাকিল না কেন? কেন তুমি ভালবাসিলে?

৬

বিনিদ্র রজনীর গ্লানি-অরুণিত-নেত্রে উল্কা শয্যায় উঠিয়া বসিতেই একজন সখী আসিয়া বলিল—'বৈশালী হইতে পত্র আসিয়াছে'—বলিয়া লিপি হস্তে দিল।

জতুমুদ্রা ভাঙিগয়া ক্লান্ত চক্ষে উল্কা লিপি পড়িল। শিবামিশ্র লিখিয়াছেন—

'কন্যা, চণ্ডের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়াছি, তোমার মাতৃঋণ শোধ হইল। কিন্তু শিশুনাগবংশ এখনও নিঃশেষ হয় নাই। স্মরণ রাখিও।'

অন্যমনে পত্র ছিন্ন করিতে করিতে উল্কা পাংশু হাসিয়া বলিল—'সখি, জানিস, পিতা একটি কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। আমার দেহেও যে শিশুনাগবংশের রক্ত প্রবাহিত, এ কথা তাঁহার স্মরণ নাই।'

সকলে উল্কাকে শিবামিশ্রের কন্যা বলিয়া জানিত, এই রহস্যময় কথায় অর্থ বুঝিতে না পারিয়া সখী অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

উল্কা শয্যা ত্যাগ করিয়া বলিল—'ভাল, তাহাই হইবে। শেষ করিতে না পারি, শিশুনাগবংশকে ক্ষীণ করিয়া যাইব।' কল্য রজনী হইতে যে সংকল্প তাহার মনে ছায়ার মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, শিবামিশ্রের পত্রে তাহা দৃঢ় হইল।

স্নান সমাপন করিয়া উল্কা যথারীতি বেশভূষা পরিধান করিল। কিন্তু আজ তাহার প্রসাধনে উৎকণ্ঠা নাই, সখীরা যেমন সাজাইয়া দিল তেমনই সাজিল। একবার দর্পণে মুখ দেখিল—দেখিয়া নিজেই শিহরিয়া উঠিল। সে ভাবিয়াছিল, তাহার বুকের মধ্যে যে অগ্নি সারা রাত্রি জ্বলিয়াছে, তাহাতে তাহার রূপও পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কই—দেহে তো তাহার একবিন্দু আঁচ লাগে নাই। বরং নয়নের অলস অরুণ চাহনিতে, গণ্ডের হিমশুভ্র পাণ্ডুরতায়, সর্বাঙ্গের ঈষৎক্লান্ত শিথিলতায় যেন রূপ আরও অলৌকিক হইয়া উঠিয়াছে। বিষকন্যাদের বুঝি এমনই হয়, ভিতরের আগুনে রূপের বর্তিকা আরও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে।

প্রসাধন শেষ হইলে উল্কা একজন সখীকে দুইখানি তরবারি আনিতে আদেশ করিল। সখী বিস্মিতভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না, নিঃশব্দে প্রস্থান করিল।

তরবারি আসিলে উল্কা তাহাদের কোষমুক্ত করিয়া পরীক্ষা করিল। তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল খরধার অস্ত্র—উল্কা বাহুবল্লরী বিলোলিত করিয়া তাহাদের ঊর্ধ্বে তুলিল; মনে হইল, যেন কক্ষের ভিতর এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

এতক্ষণে একজন সখী সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'প্রিয় সখি, আমাদের বড় ভয় হইতেছে, তরবারি লইয়া কি করিবে?'

উল্কা অল্প হাসিল—'মহারাজের অস্ত্র-কৌশল পরীক্ষা করিব।' তার পর গম্ভীর-

মুখে বলিল—'আমি উদ্যানে যাইতেছি, তোমরা কেহ সেখানে যাইও না। যদি মহারাজ আসেন, তাঁহাকে বলিও আমি মাধবীকুঞ্জে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছি।' বলিয়া তরবারি হস্তে উদ্যান অভিমুখে প্রস্থান করিল।

সখীরা ভীতনির্বাক কাষ্ঠপুত্তলির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

মহারাজ সেনজিৎ মাধবীকুঞ্জের লতাবিতানতলে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, দুই হস্তে স্থির বিদ্যুতের মত দুইখানি তরবারি লইয়া উল্কা দাঁড়াইয়া আছে, তাহার চোখে নবীন আষাঢ়ের দলিতাঞ্জন মেঘ, আসন্ন মহাদুর্যোগের প্রতীক্ষায় দেহ স্থির।

তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন; উত্তপ্ত আরক্ত চক্ষু তরবারির প্রতি নিবদ্ধ হইল। বলিলেন—'উল্কা, এ কি?'

উল্কা রক্তাধরে ক্ষীণ হাসিল, বলিল—'এই আমার উত্তর।'

'কিসের উত্তর?'

'কাল যে কথা জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার উত্তর।'

সেনজিৎ অধীরপদে উল্কার দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন। তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বজ্রগর্ভকণ্ঠে বলিলেন—'উল্কা, আজ আবার এ কি নূতন ছলনা? হৃদয় লইয়া বার বার ক্রীড়া পরিহাস ভাল লাগে না—বল, কাল কেন আমাকে বঞ্চনা করিলে? আমাদের মিলনে কিসের বাধা?'

'তাহাই তো বলিতেছি মহারাজ। আমাদের দু'জনের মধ্যে এই তরবারি ব্যবধান।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ আমাকে অসিযুদ্ধে পরাজিত না করিলে লাভ করিতে পারিবেন না।'

মহারাজ যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, বলিলেন—'সে কি?'

উল্কা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—'ইহাই আমার বংশের চিরাচরিত প্রথা।'

এইবার মহারাজের মুখে এক অপূর্ব পরিবর্তন হইল; মুহূর্তমধ্যে ক্লেশ-চিহ্নিত রেখা অন্তর্হিত হইয়া মুখ আনন্দের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—'এই বাধা!—কিন্তু তুমি নারী, তোমার সহিত অস্ত্রযুদ্ধ করিব কিরূপে?'

উল্কা গ্রীবা বঙ্কিম করিয়া চাহিল—'মহারাজ কি আমাকে অস্ত্রবিদ্যায় সমকক্ষ মনে করেন না?'

সেনজিৎ হাসিলেন, বলিলেন—'তাহা নয়। তোমার অস্ত্রবিদ্যার পরিচয় পূর্বেই পাইয়াছি, এখনও এ বক্ষ তোমার অস্ত্রাঘাতে জর্জরিত। কিন্তু যদি আমি যুদ্ধ না করি?'

'তাহা হইলে আমাকে পাইবেন না।'

'যদি বলপূর্বক গ্রহণ করি?'

'তাহাও পারিবেন না, এই তরবারি বাধা দিবে।'

'ভাল—বাধা দিক'—বলিয়া মহারাজ সহাস্যমুখে বাহু প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হইলেন।

কম্পিত স্বরে উল্কা বলিল—'মহারাজ, কাছে আসিবেন না—নচেৎ—' বলিয়া তরবারি তুলিল।

'নচেৎ—?' মহারাজ অগ্রসর হইয়া চলিলেন। তরবারির অগ্রভাগ তাঁহার বক্ষস্থল স্পর্শ করিল, তথাপি তাঁহার গতি রুদ্ধ হইল না। তখন উল্কা ক্ষিপ্রপদে সরিয়া গিয়া তরবারি নিজ বক্ষে স্থাপন করিয়া বলিল—'আর অধিক কাছে আসিলে এই অসি নিজ বক্ষে বিঁধিয়া দিব।'

মহারাজ হাসিয়া বলিলেন—'আমি জানিতাম, তুমি আমার বক্ষে অসি হানিতে পারিবে না—সেজন্য অন্য অস্ত্র আছে—' বলিতে বলিতে বিদ্যুদ্বেগে তিনি উল্কার হস্ত হইতে তরবারি কাড়িয়া লইলেন, তাহার বাহু ধরিয়া কপট কঠোর স্বরে বলিলেন—'আজ তোমাকে কঠিন শাস্তি দিব।'

উল্কা কাঁদিয়া বলিল—'নিষ্ঠুর! অত্যাচারী! তোমার কি কলঙ্কের ভয় নাই? অসহায়া নারীর উপর পীড়ন করিতে তোমার লজ্জা হয় না?'

মহারাজ পরিতৃপ্ত হাস্যে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন—'না—হয় না। এবার এস, যুদ্ধ করি।' বলিয়া একখানি তরবারি তুলিয়া লইয়া তাহার হাতে দিলেন।

এইবার উল্কা বুদ্ধিভ্রষ্টের মত সজল বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। সেনজিৎ কহিলেন—'পাছে তুমি মনে কর, নারীর সহিত যুদ্ধ করিতেও আমি ভয় পাই—তাই অসি ধরিলাম।—এস।' দ্বিতীয় তরবারি তুলিয়া লইয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন—'কিন্তু উল্কা, যদি সত্যই তোমার হাতে পরাজিত হই? তবে আর তুমি আমার হইবে না?'

উল্কার অধর কাঁপিতে লাগিল, সে উত্তর দিতে পারিল না। মনে মনে বলিল—'আর না, আর না। এত লোভ আমি সম্বরণ করিতে পারিব না। আমাকে মরিতে হইবে—মরিতে হইবে—।—কিম্বা যদি পরাজিত করিতে পারি—পারিব কি?'

অসংযত কণ্ঠস্বর সবলে দৃঢ় করিয়া উল্কা বলিল—'প্রতিজ্ঞা করুন, পরাজিত হইলে আর আমাকে স্পর্শ করিবেন না?'

ঈষৎ গর্বের সহিত সেনজিৎ বলিলেন—'প্রতিজ্ঞা করিলাম, যদি পরাজিত হই কখনও স্ত্রীজাতির মুখ দেখিব না।'

তার পর সেই মাধবীবিতানতলে দুই প্রেমোন্মাদ নরনারীর অসিযুদ্ধ আরম্ভ হইল। পুরুষ যুদ্ধ করিল নারীকে লাভ করিবার জন্য, আর নারী যুদ্ধ করিল তাহাকে দূরে রাখিবার জন্য। উভয়ের হৃদয়েই দুর্দম ভালবাসা, উভয়েই জয়ী হইতে চায়। এরূপ যুদ্ধ জগতে বোধকরি আর কখনও হয় নাই।

অসিযুদ্ধ আরম্ভ করিয়া সেনজিৎ দেখিলেন, উল্কার অসি-শিক্ষা অতুলনীয়। তাহার হস্তে ঐ অসিফলক যেন জীবন্ত বিষধরের মূর্তি ধারণ করিয়াছে। সেনজিৎ সাবধানে সতর্কভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শুধু বিজয়ী হইলে চলিবে না, উল্কার বরতনু অনাহত অক্ষত রাখিয়া তাহাকে পরাস্ত করিতে হইবে।

কিন্তু উল্কার হাত হইতে ঐ বিদ্যুৎশিখাটাকে কাড়িয়া লওয়াও অসম্ভব। তিনি লক্ষ্য করিলেন, উল্কাও অপূর্ব নিপুণতার সহিত তাঁহার দেহে আঘাত না করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে; আঘাত করিবার সুযোগ পাইয়াও আঘাত করিতেছে না। বায়ু-কম্পিত পুষ্পের চারিপাশে লুব্ধ ভ্রমরের মত উল্কার অসি তাঁহার দেহের চতুর্দিকে গুঞ্জন করিয়া ফিরিতেছে।

এইভাবে কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলিল। সেনজিৎ বুঝিলেন, সহজ পন্থায় উল্কাকে পরাজিত করিতে সময় লাগিবে। তাহার দেহে এখনও ক্লান্তির চিহ্নমাত্র দেখা যাইতেছে না, নিশ্বাস স্বাভাবিকভাবে বহিতেছে; কেবল নাসাপুট অল্প স্ফুরিত হইতেছে মাত্র। তখন তিনি মনে মনে হাসিয়া এক কৌশল অবলম্বন করিলেন।

সহসা যেন অসাবধানশবতঃই তাঁহার একটু পদস্খলন হইল। উল্কার অসির নখ তাঁহার বক্ষের নিকট আসিয়াছিল, পদস্খলনের ফলে পঞ্জরে একটা আঁচড় লাগিল। উল্কা সত্রাসে নিশ্বাস টানিল, তাহার তরবারির বিদ্যুৎগতি সঙ্গে সঙ্গে শিথিল হইল। সেই মুহূর্তে মহারাজ সেনজিৎ এক অপূর্ব কৌশল দেখাইলেন, তাঁহার অসি উল্কার অসির সঙ্গে যেন জড়াইয়া গেল, তার পর তিনি ঊর্ধ্বদিকে একটু চাপ দিলেন। অমনি উল্কার

হস্তমুক্ত অসি উড়িয়া গিয়া দূরে পড়িল।

মহারাজ বলিলেন—'কেমন, হইয়াছে?'

বিস্ময়-বিমূঢ় মুখে সভয়ে দ্রুতস্পন্দিতবক্ষে উল্কা চাহিয়া রহিল; তারপর থরথর-দেহে কাঁপিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। এক দিকে নিজ দেহ-মন প্রিয়তমের বুকের উপর নিঃশেষে বিসর্জন করিবার দুর্নিবার ইচ্ছা, অপর দিকে প্রিয়তমের দৃষ্টির সম্মুখ হইতে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া ফেলিবার বাসনা—অন্তরের মধ্যে এই সুরাসুর দ্বন্দ্ব যখন চলিতে থাকে, তখন নারীর কাঁদিবার শক্তিও আর থাকে না। তখন গর্ব ও দীনতা, আকাঙ্খা ও নৈরাশ্য, চরম ব্যর্থতা ও পরম সিদ্ধি এক সঙ্গে মিশিয়া প্রেম-নির্মথিত নারীচিত্তে যে হলাহল উত্থিত হয়, তাহা বোধ করি এ জগতের বিষকন্যারাই আকণ্ঠ পান করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

উল্কা দুই বাহুতে ভর দিয়া নতমুখে বসিয়া রহিল। সেনজিৎ তরবারি ফেলিয়া তাহার পাশে নতজানু হইয়া বসিলেন, পৃষ্ঠে হস্ত রাখিয়া স্নেহ-ক্ষরিত কণ্ঠে বলিলেন—'উল্কা, আর তো বাধা নাই।'

শুষ্ক চক্ষু তুলিয়া উল্কা বলিল,—'না, আর বাধা নাই।'

দীর্ঘকাল সে অপলক দৃষ্টিতে মহারাজের মুখ নিরীক্ষণ করিল, যেন রাক্ষসীর মত তাঁহার প্রতি অবয়ব দুই চক্ষু দিয়া গিলিতে লাগিল। মহারাজও মুগ্ধ তন্ময় হইয়া উল্কাকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ হর্ষোৎফুল্ল--বক্ষে রোমাঞ্চ। তিনি ভাবিলেন—'প্রেম এত মধুর! এত দিন জানিতাম না, উল্কা, তুমি আমাকে ভালবাসিতে শিখাইলে! উল্কা—প্রেয়সী—'

উল্কার চোখের দৃষ্টিতে যে কত কি ছিল, মহারাজ তাহা দেখিতে পাইলেন না। উল্কা তখন ভাবিতেছিল—পাইলাম না—পাইলাম না! প্রিয়তম, তোমাকে পাইয়াও পাইলাম না!

কুঞ্জ-বাহিরে উৎকণ্ঠিতা সখীর কঙ্কণধ্বনি শুনিয়া দু'জনের বাহ্য চেতনা ফিরিয়া আসিল। উল্কা উঠিয়া দাঁড়াইল; চোখ দুটি মহারাজের মুখের উপর পাতিয়া একটু হাসিল। তার পর অনুচ্চ অতি অস্ফুট স্বরে বলিল—'আজ নিশীথে বাসকগৃহে আমি মহারাজের প্রতীক্ষা করিব।'

দীপের তৈল ফুরাইয়া আসিতেছে; আকাশে চন্দ্রও ক্ষয়িষ্ণু। বিষকন্যা উল্কার বিষ-দিগ্ধ কাহিনী শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই।

নিশীথ প্রহরে মহারাজ আসিলেন। উল্কা পুষ্প-বিকীর্ণ বাসকগৃহের মধ্যস্থলে একাকী দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার হস্তে এক গুচ্ছ কমল-কোরক।

সেনজিৎ তাহাকে দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া লইলেন। কমল-কোরকের গুচ্ছ উভয়ের বক্ষের মাঝখানে রহিল।

'উল্কা—প্রাণময়ি—' বিপুল আবেগে উল্কার বরতনু মহারাজ বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার বক্ষে ঈষৎ বেদনা অনুভূত হইল। ভাবিলেন—আনন্দ-বেদনা!

উল্কা তাঁহার বক্ষে এলাইয়া পড়িল, মধুর হাসিয়া বলিল—'প্রিয়তম, তোমার বাহু-বন্ধন শিথিল করিও না। এমনিভাবে আমায় মরিতে দাও।'

সেনজিৎ তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন; পূর্ণ মিলনের অন্তরায় কমল-কোরকগুলি ঝরিয়া পড়িল। তখন মহারাজ দেখিলেন, সূচীবৎ তীক্ষ্ন ছুরিকা উল্কার বক্ষে আমূল বিদ্ধ হইয়া আছে। তাঁহারই বক্ষ-নিষ্পেষণে ছুরিকা বক্ষে প্রবেশ করিয়াছে।

সেনজিৎ উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া উঠিলেন—'উল্কা! সর্বনাশী! এ কি করিলি?'

উল্কা তাঁহার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া অনির্বচনীয় হাসি হাসিল, বলিল—'এখন অন্য কথা নয়, শুধু ভালবাসা। প্রিয়তম, আরও কাছে এস, তোমাকে ভাল দেখিতে পাইতেছি না।'

সেনজিৎ তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া বলিলেন—'কিন্তু কেন—কেন উল্কা? কেন এমন করিলে?'

উল্কার মুখের হাসি ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আসিল, চোখ দিয়া দুই বিন্দু জল গড়াইয়া পড়িল:—সে অতি ক্ষীণ নির্বাপিত স্বরে বলিল—'প্রাণাধিক, আমি বিষকন্যা—'

সেবারে শিবামিশ্রের প্রতিহিংসা পূর্ণ সফলতা লাভ করিল না। সার্ধ শত বৎসর পরে আর একজন কুটিল ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রারব্ধ কর্ম সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

বহুদূরে অতীতের এই বিয়োগান্ত নাটিকায় আমি—এই জাতিস্মর—কোন্ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, তাহা উল্লেখ করি নাই; করিবার প্রয়োজনও নাই। হয়তো বিদূষক হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, হয়তো রাজটীকা ললাটে ধারণ করিয়াছিলাম, কিংবা হয়তো শৃগালের দংষ্ট্রাক্ষত গণ্ডে বহন করিয়াছিলাম। পাঠক যেরূপ ইচ্ছা অনুমান করুন, আমি আপত্তি করিব না।

শুধু একটা প্রশ্ন এই সংস্কার-বর্জিত বিংশ শতাব্দীতে বসিয়া মাঝে মাঝে মনে উদয় হয়। উল্কা যদি প্রিয়প্রাণহন্ত্রী বিষকন্যাই ছিল, তবে সেনজিৎ না মরিয়া সে নিজে মরিল কেন?

৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২

চন্দন-মূর্তি

বৌদ্ধ ভিক্ষু বলিতে যে-চিত্রটি আমাদের মনে উদয় হয়, একালের সাধারণ বাঙালীর চেহারার সঙ্গে সে-চিত্রের মোটেই মিল নাই। অথচ, যাঁহার কথা আজ লিখিতে বসিয়াছি সেই ভিক্ষু অভিরাম যে কেবল জাতিতে বাঙালী ছিলেন তাহাই নয়, তাঁহার চেহারাও ছিল নিতান্তই বাঙালীর মত।

আরম্ভেই বলিয়া রাখা ভাল যে ভিক্ষু অভিরামের আগাগোড়া জীবন-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা আমার অভিপ্রায় নয়, থাকিলেও তাহা সম্ভব হইত না। তাঁহার বংশ বা জাতি-পরিচয় কখনও শুনি নাই, তিনি বাঙালী হইয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গণ্ডীতে কি করিয়া গিয়া পড়িলেন সে ইতিহাসও আমার কাছে অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। কেবল এক বৎসরের আলাপে তাঁহার চরিত্রের যে-পরিচয়টি আমি পাইয়াছিলাম এবং একদিন অচিন্তনীয় অবস্থার মধ্যে পড়িয়া কিরূপে সেই পরিচয়ের বন্ধন চিরদিনের জন্য ছিন্ন হইয়া গেল, তাহাই সংক্ষেপে বাহুল্য বর্জন করিয়া পাঠকের সম্মুখে স্থাপন করিব। আমাদের দেশ ধর্মোন্মত্ততার মল্লভূমি, ধর্মের নামে মাথা ফাটাফাটি অনেক দেখিয়াছি। কিন্তু ভিক্ষু অভিরামের হৃদয়ে এই ধর্মানুরাগ যে বিচিত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছিল তাহা পূর্বে কখনও দেখি নাই এবং পরে যে আর দেখিব সে সম্ভাবনাও অল্প।

ভিক্ষু অভিরামের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীতে। বছর-চারেক আগেকার কথা, তখন আমি সবেমাত্র বৌদ্ধ যুগের ইতিহাস লইয়া নাড়াচাড়া আরম্ভ করিয়াছি। একখানা দুষ্প্রাপ্য বৌদ্ধ পুস্তক খুঁজিতে গিয়া দেখিলাম তিনি পূর্ব হইতে সেখানা দখল করিয়া বসিয়া আছেন।

ক্রমে তাঁহার সহিত আলাপ হইল। শীর্ণকায় মুণ্ডিতশির লোকটি, দেহের বস্ত্রাদি ঈষৎ পীতবর্ণ, বয়স বোধকরি চল্লিশের নীচেই। কথাবার্তা খুব মিষ্ট, হাসিটি শীর্ণ মুখে লাগিয়াই আছে; আমাদের দেশের সাধারণ উদাসী সম্প্রদায়ের মত একটি নির্লিপ্ত অনাসক্ত ভাব। তবু তাঁহাকে সাধারণ বলিয়া অবহেলা করা যায় না। চোখের মধ্যে ভাল করিয়া দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায়, একটা প্রবল দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা সদা-সর্বদা সেখানে জ্বলিতেছে। জটা কৌপীন কিছুই নাই, তথাপি তাঁহাকে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের 'পরশপাথরে'র সেই ক্ষ্যাপাকে মনে পড়িয়া যায়—

ওষ্ঠে অধরেতে চাপি অন্তরের দ্বার ঝাঁপি
রাত্রিদিন তীব্র জ্বালা জ্বেলে রাখে চোখে।
দুটো নেত্র সদা যেন নিশার খদ্যোত-হেন
উড়ে উড়ে খোঁজে কারে নিজের আলোকে।

বাঙালী বৌদ্ধ ভিক্ষু বর্তমান কালে থাকিতে পারে এ কল্পনা পূর্বে মনে স্থান পায় নাই, তাই প্রথম দর্শনেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম। ক্রমশ আলাপ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইল। তিনি সময়ে অসময়ে আমার বাড়িতে আসিতে আরম্ভ করিলেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান যেরূপ গভীর ছিল, বৌদ্ধ ইতিহাসে ততটা ছিল না। তাই বুদ্ধের জীবন সম্বন্ধে কোন নূতন কথা জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ আমাকে আসিয়া জানাইতেন। আমার ঐতিহাসিক গবেষণা সম্বন্ধেও তাঁহার ঔৎসুক্যের অন্ত ছিল না; ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্থির হইয়া বসিয়া আমার বক্তৃতা শুনিয়া যাইতেন, আর তাঁহার চোখে সেই খদ্যোত-আলোক জ্বলিতে থাকিত।

খাদ্যাদি বিষয়ে তাঁহার কোন বিচার ছিল না। আমার বাড়িতে আসিলে গৃহিণী প্রায়ই ভক্তিভরে তাঁহাকে খাওয়াইতেন; তিনি নির্বিবাদে মাছ মাংস সবই গ্রহণ করিতেন। আমি একদিন প্রশ্ন করায় তিনি ক্ষীণ হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি ভিক্ষু, ভিক্ষাপাত্রে যে যা দেবে তাই আমাকে খেতে হবে, বাছ-বিচার করবার তো আমার অধিকার নেই। তথাগতের পাতে একদিন তাঁর এক শিষ্য শূকর-মাংস দিয়েছিল, তিনি তাও খেয়েছিলেন।' ভিক্ষুর দুই চক্ষু সহসা জলে ভরিয়া গিয়াছিল।

প্রায় ছয়-সাত মাস কাটিয়া যাইবার পর একদিন তাঁহার প্রাণের অন্তরতম কথাটি জানিতে পারিলাম। আমার বাড়িতে বসিয়া বৌদ্ধ শিল্প আলোচনা হইতেছিল। ভিক্ষু

অভিরাম বলিতেছিলেন, 'ভারতে এবং ভারতের বাইরে কোটি কোটি বুদ্ধমূর্তি আছে। কিন্তু সবগুলিই তাঁর ভাব-মূর্তি। ভক্ত-শিল্পী যে-ভাবে ভগবান তথাগতকে কল্পনা করেছে, পাথর কেটে তাঁর সেই মূর্তিই গড়েছে। বুদ্ধের সত্যিকার আকৃতির সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল না।'

আমি বলিলাম, 'আমার তো মনে হয়, ছিল। আপনি লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয় যে, সব বুদ্ধমূর্তিরই ছাঁচ প্রায় এক রকম। অবশ্য অল্পবিস্তর তফাৎ আছে, কিন্তু মোটের উপর একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়—কান বড়, মাথায় কোঁকড়া চুল, ভারী গড়ন—এগুলো সব মূর্তিতেই আছে। এর কারণ কি? নিশ্চয় তাঁর প্রকৃত চেহারা সম্বন্ধে শিল্পীদের জ্ঞান ছিল, নইলে কেবল কাল্পনিক মূর্তি হলে এতটা সাদৃশ্য আসতে পারত না। একটা বাস্তব মডেল তাদের ছিলই।'

গভীর মনঃসংযোগে আমার কথা শুনিয়া ভিক্ষু অভিরাম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন, 'কি জানি। বুদ্ধদেবের জীবিতকালে তাঁর মূর্তি গঠিত হয়নি, তখন ভাস্কর্যের প্রচলন ছিল না। বুদ্ধমূর্তির বহুল প্রচলন হয়েছে গুপ্ত-যুগ থেকে, খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে, অর্থাৎ বুদ্ধ-নির্বাণের প্রায় সাত-শ' বছর পরে। এই সাত-শ' বছর ধরে তাঁর আকৃতির স্মৃতি মানুষ কি করে সঞ্জীবিত রেখেছিল? বৌদ্ধ শাস্ত্রেও তাঁর চেহারার এমন কোন বর্ণনা নেই যা থেকে তাঁর একটা স্পষ্ট চিত্র আঁকা যেতে পারে। আপনি যে সাদৃশ্যের কথা বলছেন, সেটা সম্ভবত শিল্পের একটা কনভেনশ্যন— প্রথমে একজন প্রতিভাবান্ শিল্পী তাঁর ভাব-মূর্তি গড়েছিলেন, তারপর যুগপরম্পরায় সেই মূর্তিরই অনুকরণ হয়ে আসছে।' ভিক্ষু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, 'না—তাঁর সত্যিকার চেহারা মানুষ ভুলে গেছে।—টুটেন-খামেন আমেন-হোটেপের শিলা-মূর্তি আছে, কিন্তু বোধিসত্ত্বের দিব্য দেহের প্রতি-মূর্তি নেই।'

আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ, মানুষের স্মৃতির ওপর যাদের কোন দাবি নেই তারাই পাথরে নিজেদের প্রতিমূর্তি খোদাই করিয়ে রেখে গেছে, আর যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা কেবল মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমর হয়ে আছেন। এই দেখুন না, যীশুখ্রীষ্টের প্রকৃত চেহারা যে কি রকম ছিল তা কেউ জানে না।'

তিনি বলিলেন, 'ঠিক। অথচ কত হাজার হাজার লোক তাঁর গায়ের একটা জামা দেখবার জন্য প্রতি বৎসর তীর্থযাত্রা করছে। তারা যদি তাঁর প্রকৃত প্রতিমূর্তির সন্ধান পেত, কি করত বলুন দেখি। বোধ হয় আনন্দে পাগল হয়ে যেত।'

এই সময় তাঁহার চোখের দিকে আমার নজর পড়িল। ইংরাজীতে যাহাকে ফ্যানা-টিক বলে, এ সেই তাহারই দৃষ্টি। যে উগ্র একাগ্রতা মানুষকে শহীদ করিয়া তোলে, তাঁহার চোখে সেই সর্বগ্রাসী তন্ময়তার আগুন জ্বলিতেছে। চক্ষু দুটি আমার পানে চাহিয়া আছে বটে, কিন্তু তাঁহার মন যেন আড়াই হাজার বৎসরের ঘন কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া এক দিব্য পুরুষের জ্যোতির্ময় মূর্তি সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে।

তিনি হঠাৎ বলিতে লাগিলেন, 'ভগবান বুদ্ধের দন্ত কেশ নখ দেখেছি; কিছু দিনের জন্য এক অপরূপ আনন্দের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে ছিলুম। কিন্তু তবু তাতে মন ভরল না। কেমন ছিল তাঁর পূর্ণাবয়ব দেহ? কেমন ছিল তাঁর চোখের দৃষ্টি? তাঁর কণ্ঠের বাণী—যা শুনে একদিন রাজা সিংহাসন ছেড়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছিল, গৃহস্থ-বধূ স্বামী-পুত্র ছেড়ে ভিক্ষুণী হয়েছিল—সেই কণ্ঠের অমৃতময় বাণী যদি একবার শুনতে পেতুম—'

দুর্দম আবেগে তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। দেখিলাম তাঁহার দেহ রোমা-

ণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে, অজ্ঞাতে দুই শীর্ণ গণ্ড বাহিয়া অশ্রুর ধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম; এত অল্প কারণে এতখানি ভাবাবেশ কখনও সম্ভব মনে করি নাই। শুনিয়াছিলাম বটে, কৃষ্ণনাম শুনিবামাত্র কোন কোন বৈষ্ণবের দশা উপস্থিত হয়, বিশ্বাস করিতাম না; কিন্তু ভিক্ষুর এই অপূর্ব ভাবোন্মাদনা দেখিয়া আর তাহা অসম্ভব বোধ হইল না। ধর্মের এ-দিকটা কোন দিন প্রত্যক্ষ করি নাই; আজ যেন হঠাৎ চোখ খুলিয়া গেল।

ভিক্ষু বাহ্যজ্ঞানশূন্য ভাবে বলিতে লাগিলেন, 'গৌতম! তথাগত! আমি অর্হত্ত্ব চাই না, নির্বাণ চাই না,—একবার তোমার স্বরূপ আমাকে দেখাও। যে-দেহে তুমি এই পৃথিবীতে বিচরণ করতে সেই দেব-দেহ আমাকে দেখাও। বুদ্ধ, তথাগত—'

বুঝিলাম বৌদ্ধ ধর্ম নয়, স্বয়ং সেই কালজয়ী মহাপুরুষ ভিক্ষু অভিরামকে উন্মাদ করিয়াছেন।

পা টিপিয়া টিপিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। এই আত্মহারা ব্যাকুলতা বসিয়া দেখিতে পারিলাম না, মনে হইতে লাগিল যেন অপরাধ করিতেছি।

ধর্মোন্মত্ততা বস্তুটা সংক্রামক। আমার মধ্যেও বোধ হয় অজ্ঞাতসারে সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাই, উল্লিখিত ঘটনার কয়েক দিন পরে একদিন ফা-হিয়ানের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হঠাৎ এক জায়গায় আসিয়া দৃষ্টি আটকাইয়া গেল; আনন্দ ও উত্তেজনায় একেবারে লাফাইয়া উঠিলাম। ফা-হিয়ান পূর্বেও পড়িয়াছি, কিন্তু এ-জিনিস চোখে ঠেকে নাই কেন?

সেইদিন অপরাহ্ণে ভিক্ষু অভিরাম আসিলেন। উত্তেজনা দমন করিয়া বইখানা তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি উৎসুক ভাবে বলিলেন, 'কি এ?'

'পড়ে দেখুন' বলিয়া একটা পাতা নির্দেশ করিয়া দিলাম। ভিক্ষু পড়িতে লাগিলেন, আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

"বৈশালী হইতে দ্বাদশ শত পদ দক্ষিণে বৈশ্যাধিপতি সুদত্ত দক্ষিণাভিমুখী একটি বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। বিহারের বামে ও দক্ষিণে স্বচ্ছ বারিপূর্ণ পুষ্করিণী বহু বৃক্ষ ও নানাবর্ণ পুষ্পে অপূর্ব শোভা ধারণ করে। ইহাই জেতবন-বিহার।

"বুদ্ধদেব যখন ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে গমন করিয়া তাঁহার মাতৃদেবীর হিতার্থে নব্বই দিবস ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন, তখন প্রসেনজিৎ তাঁহার দর্শনাভিলাষী হইয়া গোশীর্ষ চন্দনকাষ্ঠে তাঁহার এক মূর্তি প্রস্তুত করিয়া যে-স্থানে তিনি সাধারণত উপবেশন করিতেন তথায় স্থাপন করিলেন। বুদ্ধদেব স্বর্গ হইতে প্রত্যাগমন করিলে এই মূর্তি বুদ্ধদেবের সহিত সাক্ষাতের জন্য স্বস্থান পরিত্যাগ করিল। বুদ্ধদেব তখন মূর্তিকে কহিলেন, 'তুমি স্বস্থানে প্রতিগমন কর; আমার নির্বাণ লাভ হইলে তুমি আমার চতুর্বর্গ শিষ্যের নিকটে আদর্শ হইবে।' এই বলিলে মূর্তি প্রত্যাবর্তন করিল। এই মূর্তিই বুদ্ধদেবের সর্বাপেক্ষা প্রথম মূর্তি এবং ইহা দৃষ্টেই পরে অন্যান্য মূর্তি নির্মিত হইয়াছে।

"বুদ্ধ-নির্বাণের পরে এক সময় আগুন লাগিয়া জেতবন-বিহার ভস্মীভূত হয়। নরপতিগণ ও তাঁহাদের প্রজাবর্গ চন্দন-মূর্তি ধ্বংস হইয়াছে মনে করিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হন; কিন্তু চারি-পাঁচ দিন পরে পূর্বপার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র বিহারের দ্বার উন্মুক্ত হইলে চন্দন-মূর্তি দৃষ্ট হইল। সকলে উৎফুল্ল হৃদয়ে একত্র হইয়া বিহার পুনর্নির্মাণে ব্রতী হইল।

দ্বিতল নির্মিত হইলে তাহারা প্রতিমূর্তিকে পূর্বস্থানে স্থাপন করিল।...”

তন্দ্রামূঢ়ের ন্যায় চক্ষু পুস্তক হইতে তুলিয়া ভিক্ষু আমার পানে চাহিলেন, অস্পষ্ট স্খলিত স্বরে বলিলেন, ‘কোথায় সে মূর্তি?’

আমি বলিলাম, ‘জানি না। চন্দন-মূর্তির উল্লেখ আর কোথাও দেখেছি বলে তো স্মরণ হয় না।’

অতঃপর দীর্ঘকাল আবার দুই জনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। এই ক্ষুদ্র তথ্যটি ভিক্ষুর অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত নাড়া দিয়া আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে তাহা অনুমানে বুঝিতে পারিলাম। আমি বোধ হয় মনে মনে তাঁহার নিকট হইতে আনন্দের একটা প্রবল উচ্ছ্বাস প্রত্যাশা করিয়াছিলাম; এই ভাবে অভাবিতের সম্মুখীন হইয়া তিনি কি বলিবেন কি করিবেন তাহা প্রত্যক্ষ করিবার কৌতূহলও ছিল। কিন্তু তিনি কিছুই করিলেন না; প্রায় আধ ঘণ্টা নিশ্চল ভাবে বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চক্ষে সেই সদ্যনিদ্রোত্থিতের অভিভূত দৃষ্টি—কোন দিকে দৃক্‌পাত করিলেন না, নিশির ডাক শুনিয়া ঘুমন্ত মানুষ যেমন শয্যা ছাড়িয়া একান্ত অবশে চলিয়া যায়, তেমনি ভাবে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

তারপর তিন মাস আর তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম না।

হঠাৎ পৌষের মাঝামাঝি একদিন তিনি মূর্তিমান ভূমিকম্পের মত আসিয়া আমার স্থাবরতার পাকা ভিত এমনভাবে নাড়া দিয়া আল্‌গা করিয়া দিলেন যে তাহা পূর্বাহ্ণে অনুমান করাও কঠিন। অন্তত আমি যে কোন দিন এমন একটা দুঃসাহসিক কার্যে ব্রতী হইয়া পড়িব তাহা সন্দেহ করিতেও আমার কুণ্ঠা বোধ হয়।

তিনি বলিলেন, ‘সন্ধান পেয়েছি।’

আমি সানন্দে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলাম, ‘আসুন—বসুন।’

তিনি বসিলেন না, উত্তেজিত স্বরে বলিতে লাগিলেন, ‘পেয়েছি বিভূতিবাবু, সে মূর্তি হারায়নি, এখনও আছে।’

‘সে কি, কোথায় পেলেন?’

‘পাইনি এখনও। প্রাচীন বৈশালীর ভগ্নাবশেষ যেখানে পড়ে আছে সেই ‘বেসাড়ে’ গিয়েছিলুম। জেতবন-বিহারের কিছুই নেই, কেবল ইট আর পাথরের স্তূপ। তবু তারই ভেতর থেকে আমি সন্ধান পেয়েছি—সে মূর্তি আছে।’

‘কি করে সন্ধান পেলেন?’

‘এক শিলালিপি থেকে। একটা ভাঙা মন্দির থেকে একটা পাথর খসে পড়েছিল—তারই উল্টো পিঠে এই লিপি খোদাই করা ছিল।’ এক খণ্ড কাগজ আমাকে দিয়া উত্তেজনা-অবরুদ্ধ স্বরে বলিতে লাগিলেন, ‘জেতবন-বিহার ধ্বংস হয়ে যাবার পর বোধ হয় তারই পাথর দিয়ে ঐ মন্দির তৈরি হয়েছিল; মন্দিরটাও পাঁচ-ছ-শ’ বছরের পুরনো, এখন তাতে কোন বিগ্রহ নেই।—একটা বিরাট অশত্থ গাছ তাকে অজগরের মত জড়িয়ে তার হাড়-পাঁজর গুঁড়ো করে দিচ্ছে—পাথরগুলো খসে খসে পড়ছে। তারই একটা পাথরে এই লিপি খোদাই করা ছিল।’

কাগজখানা তাঁর হাত হইতে লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম; অনুমান দশম কি একাদশ শতাব্দীর প্রাকৃত ভাষায় লিখিত লিপি, ভিক্ষু অবিকল নকল করিয়া আনিয়াছেন। পাঠোদ্ধার করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না। শিলালেখের অর্থ এইরূপ—

“হায় তথাগত! সদ্ধর্মের আজ মহা দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে। যে জেতবন-বিহারে

তুমি পঞ্চবিংশ বর্ষ যাপন করিয়াছ তাহার আজ কি শোচনীয় দুর্দশা! গৃহিগণ আর তোমার শ্রমণদিগকে ভিক্ষা দান করে না; রাজগণ বিহারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। পৃথিবীর প্রান্ত হইতে শিক্ষার্থিগণ আর বিনয়-ধর্ম-সূত্ত অধ্যয়নের জন্য বিহারে আগমন করে না। তথাগতের ধর্মের গৌরব-মহিমা অস্তমিত হইয়াছে।

"তদুপরি সম্প্রতি দারুণ ভয় উপস্থিত হইয়াছে। কিছুকাল যাবৎ চারিদিক হইতে জনশ্রুতি আসিতেছে যে, তুরুস্ক নামক এক অতি বর্বর জাতি রাষ্ট্রকে আক্রমণ করিয়াছে। ইহারা বিধর্মী ও অতিশয় নিষ্ঠুর; ভিক্ষু-শ্রমণ দেখিলেই নৃশংসভাবে হত্যা করিতেছে এবং বিহার-সংঘাদি লুণ্ঠন করিতেছে।

"এই সকল জনরব শুনিয়া ও তুরুস্কগণ কর্তৃক আক্রান্ত কয়েক জন মুমূর্ষু পলাতক শ্রমণকে দেখিয়া জেতবন-বিহারের মহাথের বুদ্ধরক্ষিত মহাশয় অতিশয় বিচলিত হইয়াছেন। তুরুস্কগণ এই দিকেই আসিতেছে, অবশ্যই বিহার আক্রমণ করিবে। বিহারের অধিবাসিগণ অহিংসধর্মী, অস্ত্রচালনায় অপারগ। বিহারে বহু অমূল্য রত্নাদি সঞ্চিত আছে; সর্বাপেক্ষা অমূল্য রত্ন আছে, গোশীর্ষ চন্দনকাষ্ঠে নির্মিত বুদ্ধমূর্তি—যাহা ভগবান তথাগতের জীবিতকালে প্রসেনজিৎ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তুরুস্কের আক্রমণ হইতে এ সকল কে রক্ষা করিবে?

"মহাথের বুদ্ধরক্ষিত তিন দিবস অহোরাত্র চিন্তা করিয়া উপায় স্থির করিয়াছেন। আগামী অমাবস্যার মধ্যযামে দশ জন শ্রমণ বিহারস্থ মণিরত্ন ও অমূল্য গ্রন্থ সকল সহ ভগবানের চন্দন-মূর্তি লইয়া প্রস্থান করিবে। বিহার হইতে বিংশ যোজন উত্তরে হিমালয়ের সানু-নিষ্ঠ্যূত উপলা নদীর প্রস্রবণ মুখে এক দৈত্য-নির্মিত পাষাণ-স্তম্ভ আছে; এই গগনলেহী স্তম্ভের শীর্ষদেশে এক গোপন ভাণ্ডার আছে। কথিত আছে যে, অসুর-দেশীয় দৈত্যগণ দেবপ্রিয় ধর্মাশোকের কালে হিমালয়ের স্পন্দনশীল জঙ্ঘা-প্রদেশে ইহা নির্মাণ করিয়াছিল। শ্রমণগণ চন্দন-মূর্তি ও অন্যান্য মহার্ঘ বস্তু এই গুপ্ত স্থানে লইয়া গিয়া রক্ষা করিবে। পরে তুরুস্কের উৎপাত দূর হইলে তাহারা আবার উহা ফিরাইয়া আনিবে।

"যদি তুরুস্কের আক্রমণে বিহার ধ্বংস হয়, বিহারবাসী সকলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এই আশঙ্কায় মহাথের মহাশয়ের আজ্ঞাক্রমে পরবর্তীদিগের অবগতির জন্য অদ্য কৃষ্ণা-ত্রয়োদশীর দিবসে এই লিপি উৎকীর্ণ হইল। ভগবান বুদ্ধের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

এইখানে লিপি শেষ হইয়াছে। লিপি পড়িতে পড়িতে আমার মনটাও অতীতের আবর্তে গিয়া পড়িয়াছিল; আট শত বৎসর পূর্বে জেতবন-বিহারের নিরীহ ভিক্ষুদের বিপদ-ছায়াচ্ছন্ন ত্রস্ত চঞ্চলতা যেন অস্পষ্ট ভাবে চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছিলাম; বিচক্ষণ প্রবীণ মহাস্থবির বুদ্ধরক্ষিতের গম্ভীর বিষণ্ণ মুখচ্ছবিও চোখের উপর ভাসিয়া উঠিতেছিল। ভারতের ভাগ্যবিপর্যয়ের একটা ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ যেন ঐ লিপির সাহায্যে আমি কয়েক মুহূর্তের জন্য চলচ্ছায়ার মত প্রত্যক্ষ করিয়া লইলাম। দেশব্যাপী সন্ত্রাস! শান্তিপ্রিয় নির্বীর্য জাতির উপর সহসা দুরন্ত দুর্মদ বিদেশীর অভিযান! 'তুরুস্ক! তুরুস্ক! ঐ তুরুস্ক আসিতেছে!' ভীত কণ্ঠের সহস্র সমবেত আর্তনাদ আমার কর্ণে বাজিতে লাগিল।

তার পর চমক ভাঙিয়া গেল। দেখিলাম ভিক্ষু অভিরামের চোখে ক্ষুধিত উল্লাস। গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম, 'মহাস্থবির বুদ্ধরক্ষিতের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে—কিন্তু কত বিলম্বে!'

তিনি প্রদীপ্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'হোক বিলম্ব। তবু এখনও সময় অতীত হয়নি। আমি যাব বিভূতিবাবু। সেই অসুর-নির্মিত পাষাণ-স্তম্ভ খুঁজে বার করব। কিছু সন্ধানও পেয়েছি—উপলা নদীর বর্তমান নাম জানতে পেরেছি।—বিভূতিবাবু, দেড় হাজার বছর আগে চৈনিক পরিব্রাজক কোরিয়া থেকে যাত্রা শুরু করে গোবি মরুভূমি পার হয়ে দুস্তর হিমালয় লঙ্ঘন করে পদব্রজে ভারতভূমিতে আসতেন। কি জন্যে? কেবল বুদ্ধ তথাগতের জন্মভূমি দেখবার জন্যে! আর, আমাদের বিশ যোজনের মধ্যে ভগবান বুদ্ধের স্বরূপ-মূর্তি রয়েছে, জানতে পেরেও আমরা তা খুঁজে বার করতে পারব না?'

আমি বলিলাম, 'নিশ্চয় পারবেন।'

ভিক্ষু তাঁহার বিদ্যুদ্বর্হিপূর্ণ চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপন করিয়া এক প্রচন্ড প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, 'বিভূতিবাবু, আপনি আমার সঙ্গে যাবেন না?'

ক্ষণকালের জন্য হতবাক্ হইয়া গেলাম। আমি যাইব! কাজকর্ম ফেলিয়া পাহাড়ে-জঙ্গলে এই মায়ামৃগের অন্বেষণে আমি কোথায় যাইব!

ভিক্ষু স্পন্দিতস্বরে বলিলেন, 'আট-শ' বছরের মধ্যে সে দিব্যমূর্তি কেউ দেখেনি। ভগবান শাক্যসিংহ আট শতাব্দী ধরে সেই স্তম্ভশীর্ষে আমাদেরই প্রতীক্ষা করেছেন—আপনি যাবেন না?'

ভিক্ষুর কথার মধ্যে কি ছিল জানি না, কিন্তু মজ্জাগত বহির্বিমুখতা ও বাঙালী-সুলভ ঘরের টান যেন সঙ্গীতযন্ত্রের উচ্চ সপ্তকের তারের মত সুরের অসহ্য স্পন্দনে ছিঁড়িয়া গেল। আমি উঠিয়া ভিক্ষুকের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, 'আমি যাব।'

৩

এই আখ্যায়িকা যদি আমাদের হিমাচল-অভিযানের রোমাঞ্চকর কাহিনী হইত তাহা হইলে বোধ করি নানা বিচিত্র ঘটনার বর্ণনা করিয়া পাঠককে চমৎকৃত করিয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু এ-গল্পের ক্ষুদ্র পরিসরে অবান্তর কথার স্থান নাই। দৈত্য-নির্মিত স্তম্ভ অন্বেষণের পরিসমাপ্তিটুকু বর্ণনা করিয়াই আমাকে নিবৃত্ত হইতে হইবে।

কলিকাতা হইতে যাত্রা শুরু করিবার দুই সপ্তাহ পরে একদিন অপরাহ্নে যে ক্ষুদ্র জনপদটিতে পৌঁছিলাম তাহা মনুষ্য-লোকালয় হইতে এত ঊর্ধ্বে ও বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত যে হিমালয়-কুক্ষিস্থিত ঈগল পাখির বাসা বলিয়া ভ্রম হয়। তখনও বরফের এলাকায় আসিয়া পেঁছাই নাই; কিন্তু সম্মুখেই হিমাদ্রির তুষারশুভ্র দেহ আকাশের একটা দিক্ আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। আশেপাশে পিছনে চারিদিকেই নগ্ন পাহাড়, পায়ের তলায় পাহাড়ী কাঁকর ও উপলখন্ড। এই উপলাকীর্ণ কঠিন ভূমি চিরিয়া তন্বী উপলা নদী খরধারে নিম্নাভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। আকাশে বাতাসে একটা জমাট শীতলতা।

আমরা তিন জন—আমি, ভিক্ষু অভিরাম ও একজন ভুটিয়া পথপ্রদর্শক—গ্রামের নিকটবর্তী হইতেই গ্রামের সমস্ত স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকা আসিয়া আমাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বহির্জগতের মানুষ এখানে কখনও আসে না; ইহারা সুবর্তুল চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া আমাদের নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

চেহারা দেখিয়া মনে হইল ইহারা লেপ্চা কিংবা ভুটানী। আর্য রক্তের সংমিশ্রণও সামান্য আছে; দুই-একটা খড়্গের মত তীক্ষ্ম নাক চোখে পড়িল।

এইরূপ খড়্গ-নাসিক একজন প্রৌঢ়গোছের লোক আমাদের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়া নিজ ভাষায় কি বলিল, বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের ভুটানী সহচর

বুঝাইয়া দিল, ইনি গ্রামের মোড়ল, আমরা কি জন্য আসিয়াছি জানিতে চাহেন।

আমরা সরলভাবে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলাম। শুনিয়া লোকটির চোখে মুখে প্রথমে বিস্ময়, তারপর প্রবল কৌতূহল ফুটিয়া উঠিল। সে আমাদের আহ্বান করিয়া গ্রামে লইয়া চলিল।

মিছিল করিয়া আমরা অগ্রসর হইলাম। অগ্রে মোড়ল, তাহার পিছনে আমরা তিন জন ও সর্বশেষে গ্রামের আবালবৃদ্ধ নরনারী।

একটি কুটীরের মধ্যে লইয়া গিয়া মোড়ল আমাদের বসাইল, আমরা ক্লান্ত ও ক্ষুৎ-পীড়িত দেখিয়া আহার্য দ্রব্য আনিয়া অতিথিসৎকার করিল। অতঃপর তৃপ্ত ও বিশ্রান্ত হইয়া দোভাষী ভুটিয়া মারফৎ বাক্যালাপ আরম্ভ করিলাম। সূর্য তখন পাহাড়ের আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছে; হিমালয়ের সুদীর্ঘ সন্ধ্যা যেন স্বচ্ছ বাতাসে অলক্ষিত কুঙ্কুমবৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছে।

মোড়ল বলিল, গ্রাম হইতে চার ক্রোশ উত্তরে উপলা নদীর প্রপাত—ঐ প্রপাত হইতেই নদী আরম্ভ। ঐ স্থান অতিশয় দুর্গম ও দুরারোহ; উপলার অপর পারে প্রপাতের ঠিক মুখের উপর একটি স্তম্ভের মত পর্বতশৃঙ্গ আছে, উহাই বুদ্ধস্তম্ভ নামে খ্যাত। গ্রামবাসীরা প্রতি পূর্ণিমার রাত্রে বুদ্ধস্তম্ভকে উদ্দেশ করিয়া পূজা দিয়া থাকে। কিন্তু সে স্থান দুরধিগম্য বলিয়া সেখানে কেহ যায় না, গ্রামের নিকটে উপলা নদীর স্রোতে পূজা ভাসাইয়া দেয়।

ভিক্ষু জিজ্ঞাসা করিলেন, উপলা পার হইয়া স্তম্ভের নিকটবর্তী হইবার পথ কোথায়? মোড়ল মাথা নাড়িয়া জানাইল, পথ আছে বটে, কিন্তু তাহা এত বিপজ্জনক যে সে-পথে কেহ পার হইতে সাহস করে না। উপলার প্রপাতের নীচেই একটি প্রাচীন লৌহ শৃঙ্খলের ঝোলা বা দোদুল্যমান সেতু দুই তীরকে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু তাহা কালক্রমে এত জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে তাহার উপর দিয়া মানুষ যাইতে পারে না। অথচ উহাই একমাত্র পথ।

আমাদের গন্তব্য স্থানে যে পৌঁছিয়াছি তাহাতে সন্দেহ ছিল না। তবু নিঃসংশয় হইবার অভিপ্রায়ে মোড়লকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ওই স্তম্ভে কি আছে তাহা কেহ বলিতে পারে কি না। মোড়ল বলিল, কি আছে তাহা কেহ চোখে দেখে নাই, কিন্তু স্মরণাতীত কাল হইতে একটা প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে বুদ্ধদেব স্বয়ং সশরীরে এই স্তম্ভে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার দেহ হইতে নিরন্তর চন্দনের গন্ধ নির্গত হয়;— পাঁচ হাজার বৎসর পরে আবার মৈত্রেয়-রূপে ধারণ করিয়া তিনি এই স্থান হইতে বাহির হইবেন।

ভিক্ষু আমার পানে প্রোজ্জ্বল চক্ষে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'বুদ্ধদেব সশরীরে এই স্তম্ভে আছেন, তাঁহার দেহ থেকে চন্দনের গন্ধ নির্গত হয়—প্রবাদের মানে বুঝতে পারছেন? যে-শ্রমণরা বুদ্ধমূর্তি এনেছিল, তারা সম্ভবত ফিরে যেতে পারেনি—এই গ্রামেই হয়তো থেকে গিয়েছিল—'

ভিক্ষুর কথা শেষ হইতে পাইল না। এই সময় আমাদের কুটীর হঠাৎ একটা প্রবল ঝাঁকানি খাইয়া মড়মড় করিয়া উঠিল। আমরা মেঝের উপর বসিয়া ছিলাম, আমাদের নিম্নে মাটির ভিতর দিয়াও একটা কম্পন শিহরিয়া উঠিল। আমিও ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম—'ভূমিকম্প!'

আমরা উঠিয়া দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে ভূমিকম্পের স্পন্দন থামিয়া গিয়াছিল। মোড়ল নিশ্চিন্তমনে মেঝেয় বসিয়া ছিল, আমাদের ত্রাস দেখিয়া সে মৃদুহাস্যে জানাইল যে ভয়ের কোন কারণ নাই; এরূপ ভূমিকম্প এখানে প্রত্যহ চার-পাঁচ বার হইয়া থাকে, এ দেশের নামই ভূমিকম্পের জন্মভূমি।

আমরা অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। ভূমিকম্পের জন্মভূমি! এমন কথা তো কখনও শুনি নাই।—তখনও জানিতাম না কি ভীষণ দুর্দান্ত সন্তান প্রসব করিবার জন্য সে উদ্যত হইয়া আছে।

ভিক্ষু অভিরাম কিন্তু উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'ঠিক! ঠিক! শিলা-লিপিতে যে এ কথার উল্লেখ আছে—মনে নেই?'

শিলালিপিতে ভূমিকম্পের উল্লেখ কোথায় আছে স্মরণ করিতে পারিলাম না। ভিক্ষু তখন ঝোলা হইতে শিলালেখের অনুলিপি বাহির করিয়া উল্লসিত স্বরে কহিলেন, 'আর সন্দেহ নেই বিভূতিবাবু, আমরা ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছেছি।—এই শুনুন।' বলিয়া তিনি মূল প্রাকৃতে লিপির সেই অংশ পড়িয়া শুনাইলেন—কথিত আছে যে, অসুর-দেশীয় দৈত্যগণ দেবপ্রিয় ধর্মাশোকের কালে হিমালয়ের স্পন্দনশীল জঙ্ঘা-প্রদেশে ইহা নির্মাণ করিয়াছিল।

মনে পড়িয়া গেল। 'স্পন্দনশীল জঙ্ঘাপ্রদেশ' কথাটাকে আমি নিরর্থক বাগাড়ম্বর মনে করিয়াছিলাম, উহার মধ্যে যে ভূমিকম্পের ইঙ্গিত নিহিত আছে তাহা ভাবি নাই। বলিলাম, 'হ্যাঁ, আপনি ঠিক ধরেছেন, ও-কথাগুলো আমি ভাল ক'রে লক্ষ্য করিনি। এ জায়গাটাও বোধ হয় শিলঙের মত ভূমিকম্পের রাজ্য—'

এই সময় মোড়লের দিকে নজর পড়িল। সে হঠাৎ ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, ক্ষুদ্র তির্যক চক্ষু জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছে, ঠোঁট দুইটা যেন কি একটা বলিবার জন্য বিভক্ত হইয়া আছে। তারপর সে আমাদের ধাঁধা লাগাইয়া পরিষ্কার প্রাকৃত ভাষায় বলিয়া উঠিল, 'শ্রবণ কর। সূর্য যে-সময় উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের দ্বিতীয় পাদে পদার্পণ করি-বেন সেই সময় বুদ্ধস্তম্ভের রন্ধ্রপথে সূর্যালোক প্রবেশ করিয়া তথাগতের দিব্যদেহ আলো-কিত করিবে, মন্ত্রবলে স্তম্ভের দ্বার খুলিয়া যাইবে। উপর্যুপরি তিন দিন এইরূপ হইবে, তারপর এক বৎসরের জন্য দ্বার বন্ধ হইয়া যাইবে। হে ভক্ত শ্রমণ, যদি বুদ্ধের অলৌকিক মুখচ্ছবি দেখিয়া নির্বাণের পথ সুগম করিতে চাও, এ কথা স্মরণ রাখিও।' এক নিশ্বাসে এতখানি বলিয়া মোড়ল হাঁপাইতে লাগিল।

তীব্র বিস্ময়ে ভিক্ষু বলিলেন, 'তুমি—তুমি প্রাকৃত ভাষা জান?'

মোড়ল বুঝিতে না পারিয়া মাথা নাড়িল।

তখন ভুটানী সহচরের সাহায্য লইতে হইল। দোভাষী-প্রমুখাৎ মোড়ল জানাইল, ইহা তাহাদের কৌলিক মন্ত্র; পুরুষপরম্পরায় ইহা তাহাদের কণ্ঠস্থ করিতে হয়, কিন্তু মন্ত্রের অর্থ কি তাহা সে জানে না। আজ ভিক্ষুকে ঐ ভাষায় কথা কহিতে শুনিয়া সে উত্তেজিত হইয়া উহা উচ্চারণ করিয়াছে।

আমরা পরস্পরের মুখের পানে তাকাইলাম।

ভিক্ষু মোড়লকে বলিলেন, 'তোমার মন্ত্র আর একবার বল।'

মোড়ল দ্বিতীয় বার ধীরে ধীরে মন্ত্র আবৃত্তি করিল। ব্যাপারটা সমস্ত বুঝিতে পারিলাম। এ মন্ত্র নয়—বুদ্ধস্তম্ভে প্রবেশ করিবার নির্দেশ। বৎসরের মধ্যে তিন দিন সূর্যালোকের উত্তাপ রন্ধ্রপথে স্তম্ভের ভিতরে প্রবেশ করিয়া সম্ভবত কোন যন্ত্রকে উত্তপ্ত করে, ফলে যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত দ্বার খুলিয়া যায়। প্রাচীন মিশর ও আসীরিয়ায় এইরূপ কলকব্জার সাহায্যে মন্দিরদ্বার খুলিয়া মন্দিরের ভণ্ড পূজারিগণ অনেক বুজরুকি দেখাইত— পুস্তকে পড়িয়াছি স্মরণ হইল। এই স্তম্ভের নির্মাতাও অসুর—অর্থাৎ আসীরীয় শিল্পী; সুতরাং অনুরূপ কলকব্জার দ্বারা উহার প্রবেশদ্বারের নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব নয়। যে-শ্রমণগণ বুদ্ধমূর্তি লইয়া এখানে আসিয়াছিল তাহারা নিশ্চয় এ রহস্য জানিত; পাছে ভবিষ্য বংশ ইহা ভুলিয়া যায় তাই এই মন্ত্র রচনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

কিন্তু মোড়ল এ মন্ত্র জানিল কিরূপে?

তাহার মুখখানা ভাল করিয়া দেখিলাম। মুখের আদল প্রধানত মঙ্গোলীয় ছাঁদের হইলেও নাসিকা, ভ্রূ ও চিবুকের গঠন আর্য-লক্ষণযুক্ত। শ্রমণগণ ফিরিয়া যাইতে পারে নাই; তাহাদের দশ জনের মধ্যে কাহারও হয়তো পদস্খলন হইয়াছিল। এই মোড়ল সেই ধর্মচ্যুত শ্রমণের অধস্তন পুরুষ—পূর্বপুরুষের ইতিহাস সব ভুলিয়া গিয়াছে, কেবল শূন্যগর্ভ কবচের মত কৌলিক মন্ত্রটি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছে।

চমক ভাঙিয়া স্মরণ হইল বৎসরের মধ্যে মাত্র তিনটি দিন স্তম্ভের দ্বার খোলা থাকে, তারপর বন্ধ হইয়া যায়। সে তিন দিন কবে? কতদিন দ্বার খোলার প্রত্যাশায় বসিয়া থাকিতে হইবে?

ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের দ্বিতীয় পাদে সূর্য কবে পদার্পণ করবেন?'

ভিক্ষু ঝোলা হইতে পাঁজি বাহির করিলেন। প্রায় পনর মিনিট গভীর তন্ময়তার সহিত পাঁজি দেখিয়া মুখ তুলিলেন। দেখিলাম তাঁহার অধরোষ্ঠ কাঁপিতেছে, চক্ষু অশ্রুপূর্ণ। তিনি বলিলেন, 'কাল পয়লা মাঘ; সূর্য উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের দ্বিতীয় পাদে পদার্পণ করবেন—। কি অলৌকিক সংঘটন! যদি তিন দিন পরে এসে পেঁছতুম—' তাঁহার কণ্ঠস্বর থরথর করিয়া কাঁপিয়া গেল, অস্ফুট বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, 'তথাগত!'

কি সর্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণতার উপান্তে আসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে, ভাবিয়া আমার দেহও কাঁটা দিয়া উঠিল। মনে মনে বলিলাম, 'তথাগত, তোমার ভিক্ষুর মনস্কাম যেন ব্যর্থ না হয়।'

পরদিন প্রাতঃকালে আমরা স্তম্ভ-অভিমুখে যাত্রা করিলাম, মোড়ল স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের সঙ্গে চলিল।

গ্রামের সীমানা পার হইয়াই পাহাড় ধাপে ধাপে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্থানে স্থানে চড়াই এত দুরূহ যে হস্তপদের সাহায্যে অতি কষ্টে আরোহণ করিতে হয়। পদে পদে পা ফস্কাইয়া নিম্নে গড়াইয়া পড়িবার ভয়।

ভিক্ষুর মুখে কথা নাই; তাঁহার ক্ষীণ শরীরে শক্তিরও যেন সীমা নাই। সর্বাগ্রে তিনি চলিয়াছেন, আমরা তাঁহার পশ্চাতে কোনক্রমে উঠিতেছি। তিনি যেন তাঁহার অদম্য উৎসাহের রজ্জু দিয়া আমাদের টানিয়া লইয়া চলিয়াছেন।

তবু পথে দু-বার বিশ্রাম করিতে হইল। আমার সঙ্গে একটা বাইনকুলার ছিল, তাহারই সাহায্যে চারিদিক পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। বহু নিম্নে ক্ষুদ্র গ্রামটি খেলা-ঘরের মত দেখা যাইতেছে, আর চারিদিকে প্রাণহীন নিঃসঙ্গ পাহাড়।

অবশেষে পাঁচ ঘণ্টারও অধিক কাল হাড়ভাঙা চড়াই উত্তীর্ণ হইয়া আমাদের গন্তব্য স্থানে পেঁছিলাম! কিছুপূর্ব হইতেই একটা চাপা গম্ গম্ শব্দ কানে আসিতেছিল—যেন বহুদূরে দুন্দুভি বাজিতেছে। মোড়ল বলিল, 'উহাই উপলা নদীর প্রপাতের শব্দ।'

প্রপাতের কিনারায় গিয়া যখন দাঁড়াইলাম তখন সম্মুখের অপরূপ দৃশ্য যেন ক্ষণকালের জন্য আমাদের নিস্পন্দ করিয়া দিল। আমরা যেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম তাহার প্রায় পঞ্চাশ হাত ঊর্ধ্বে সংকীর্ণ প্রণালী-পথে উপলার ফেনকেশর জলরাশি

উগ্র আবেগভরে শূন্যে লাফাইয়া পড়িয়াছে; তারপর রামধনুর মত বঙ্কিম রেখায় দুই শত হাত নীচে পতিত হইয়া উচ্ছৃংখল উন্মাদনায় তীব্র একটা আবর্ত সৃষ্টি করিয়া বহিয়া গিয়াছে। ফুটন্ত কটাহ হইতে যেমন বাষ্প উত্থিত হয়, তেমনই তাহার শিলাহত চূর্ণ শীকরকণা উঠিয়া আসিয়া আমাদের মুখে লাগিতেছে।

এখানে দুই তীরের মধ্যস্থিত খাদ প্রায় পঞ্চাশ গজ চওড়া—মনে হয় যেন পাহাড় এই স্থানে বিদীর্ণ হইয়া অবরুদ্ধ উপলার বহির্গমনের পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছে। এই দুর্লঙ্ঘ খাদ পার হইবার জন্য বহুযুগ পূর্বে দুর্বল মানুষ যে ক্ষীণ সেতু নির্মাণ করিয়াছিল তাহা দেখিলে ভয় হয়। দুইটি লোহার শিকল—একটি উপরে, অন্যটি নীচে—সমান্তরাল ভাবে এ-তীর হইতে ও-তীরে চলিয়া গিয়াছে। ইহাই সেতু। গর্জমান প্রপাতের পটভূমিকার সম্মুখে এই শীর্ণ মরিচা-ধরা শিকল দুটি দেখিয়া মনে হয় যেন মাকড়সার তন্তুর চেয়েও ইহারা ভঙ্গুর, একটু জোরে বাতাস লাগিলেই ছিঁড়িয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়া যাইবে।

কিন্তু ওপারের কথা এখনও বলি নাই। ওপারের দৃশ্যের প্রকৃতি এপার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং এই ধাতুগত বিভিন্নতার জন্যই বোধ করি প্রকৃতিদেবী ইহাদের পৃথক করিয়া দিয়াছেন। ওপারে দৃষ্টি পড়িলে সহসা মনে হয় যেন অসংখ্য মর্মর-নির্মিত গম্বুজে স্থানটি পরিপূর্ণ। ছোট-বড়-মাঝারি বর্তুলাকৃতি শ্বেতপাথরের ঢিবি যত দূর দৃষ্টি যায় ইতস্ততঃ ছড়ানো রহিয়াছে। যাঁহারা সারনাথের ধামেক স্তূপ দেখিয়াছেন তাঁহারা ইহাদের আকৃতি কতকটা অনুমান করিতে পারিবেন। এই প্রকৃতি-নির্মিত স্তূপগুলিকে পশ্চাতে রাখিয়া গভীর খাদের ঠিক কিনারায় একটি নিটোল সুন্দর স্তম্ভ মিনারের মত ঋজুরেখায় ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে। দ্বিপ্রহরের সূর্যকিরণে তাহার পাষাণ গাত্র ঝকমক করিতেছে। দেখিয়া সন্দেহ হয়, ময়দানবের মত কোন মায়াশিল্পীই বুঝি অতি যত্নে এই অভ্রভেদী দেব-স্তম্ভ নির্মাণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

পৃথিবীর শৈশবকালে প্রকৃতি যখন আপন মনে খেলাঘর তৈয়ার করিত, ইহা সেই সময়ের সৃষ্টি। হয়তো মানুষ-শিল্পীর হাতও ইহাতে কিছু আছে। বাইনকুলার চোখে দিয়া ভাল করিয়া দেখিলাম, কিন্তু ইহার বহিরঙ্গে মানুষের হাতের চিহ্ন কিছু চোখে পড়িল না। স্তম্ভটা যে ফাঁপা তাহাও বাহির হইতে দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই; কেবল স্তম্ভের শীর্ষদেশে একটি ক্ষুদ্র রন্ধ্র চোখে পড়িল—রন্ধ্রটি চতুষ্কোণ, বোধ করি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে এক হাতের বেশী হইবে না। সূর্যকিরণ সেই পথে ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। ইহাই নিশ্চয় মন্ত্রোক্ত রন্ধ্র।

মগ্ন হইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিলাম। এতক্ষণে পাশে দৃষ্টি পড়িতে দেখিলাম, ভিক্ষু ভূমির উপর সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া বুদ্ধস্তম্ভকে প্রণাম করিতেছেন।

ভিক্ষু অভিরাম আমাদের নিষেধ শুনিলেন না, একাকী সেই শিকলের সেতু ধরিয়া ওপারে গেলেন। আমরা তিন জন এপারে রহিলাম। পদে পদে ভয় হইতে লাগিল, এবার বুঝি শিকল ছিঁড়িয়া গেল, কিন্তু ভিক্ষুর শরীর কৃশ ও লঘু, শিকল ছিঁড়িল না।

ওপারে পোঁছিয়া ভিক্ষু হাত নাড়িয়া আমাদের আশ্বাস জানাইলেন, তারপর স্তম্ভের দিকে চলিলেন। স্তম্ভ একবার পরিক্রমণ করিয়া আবার হাত তুলিয়া চীৎকার করিয়া কি বলিলেন, প্রপাতের গর্জনে শুনিতে পাইলাম না। মনে হইল তিনি স্তম্ভের দ্বার খোলা পাইয়াছেন।

তারপর তিনি স্তম্ভের অন্তরালে চলিয়া গেলেন, আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। চোখে বাইনকুলার লাগাইয়া বসিয়া রহিলাম। মানসচক্ষে দেখিতে লাগিলাম, ভিক্ষু চক্রাকৃতি অন্ধকার সোপান বাহিয়া ধীরে ধীরে উঠিতেছেন; কম্পিত অধর হইতে হয়তো অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারিত হইতেছে—তথাগত, তমসো মা জ্যোতির্গময়—

সেই গোশীর্ষ চন্দনকাষ্ঠের মূর্তি কি এখনও আছে? ভিক্ষু তাহা দেখিতে পাইবেন? আমি দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু সেজন্য ক্ষোভ নাই। যদি সে-মূর্তি থাকে পরে লোকজন আনিয়া উহা উদ্ধার করিতে পারিব। দেশময় একটা মহা হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে।

এইরূপ চিন্তায় দশ মিনিট কাটিল।

তারপর সব ওলট-পালট হইয়া গেল। হিমালয় যেন সহসা পাগল হইয়া গেল। মাটি টলিতে লাগিল; ভূগর্ভ হইতে একটা অবরুদ্ধ গোঙানি যেন মরণাহত দৈত্যের আর্তনাদের মত বাহির হইয়া আসিতে লাগিল। শিকলের সেতু ছিঁড়িয়া গিয়া চাবুকের মত দুই তীরে আছড়াইয়া পড়িল।

১লা মাঘের ভূমিকম্পের বর্ণনা আর দিব না। কেবল এইটুকুই জানাইব যে ভারতবর্ষের সমতলভূমিতে যাঁহারা এই ভূমিকম্প প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা সেই ভূমিকম্পের জন্মকেন্দ্রের অবস্থা কল্পনা করিতেও পারিবেন না।

আমরা মরি নাই কেন জানি না। বোধ করি পরমায়ু ছিল বলিয়াই মরি নাই। নৃত্যোন্মাদ মাটি—তাহারই উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ছিলাম। চোখের সম্মুখে বুদ্ধ-স্তম্ভ বাত্যাবিপন্ন জাহাজের মাস্তুলের মত দুলিতেছিল। চিন্তাহীন জড়বৎ মন লইয়া সেই দিকে তাকাইয়া ছিলাম।

মনের উপর সহসা চিন্তার ছায়া পড়িল—

ভিক্ষু! ভিক্ষুর কি হইবে?

ভূমিকম্পের বেগ একটু মন্দীভূত হইল। বোধ হইল যেন থামিয়া আসিতেছে। বাইনকুলারটা হাতেই মুষ্টিবদ্ধ ছিল, তুলিয়া চোখে দিলাম। পলায়নের চেষ্টা বৃথা, তাই সে-চেষ্টা করিলাম না।

আবার দ্বিগুণ বেগে ভূমিকম্প আরম্ভ হইল; যেন ক্ষণিক শিথিলতার জন্য অনুতপ্ত হইয়া শতগুণ হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে, এবার পৃথিবী ধ্বংস না করিয়া ছাড়িবে না।

কিন্তু ভিক্ষু—?

স্তম্ভ এতক্ষণ মাস্তুলের মত দুলিতেছিল, আর সহ্য করিতে পারিল না; মূলের নিকট হইতে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। অতল খাদের প্রান্তে ক্ষণকালের জন্য টলমল করিল, তারপর মরণোন্মত্তের মত খাদের মধ্যে ঝাঁপ দিল। গভীর নিম্নে একটা প্রকাণ্ড বাষ্পোচ্ছ্বাস উঠিয়া স্তম্ভকে আমার চক্ষু হইতে আড়াল করিয়া দিল।

স্তম্ভ যখন খাদের কিনারায় দ্বিধাভরে টলমল করিতেছিল, সেই সময় চকিতের ন্যায় ভিক্ষুকে দেখিতে পাইলাম। বাইনকুলারটা অবশে চোখের সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়াছিলাম। দেখিলাম, ভিক্ষু রন্ধ্রপথে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার মুখে রৌদ্র পড়িয়াছে। অনির্বচনীয় আনন্দে সে মুখ উদ্ভাসিত। চারিদিকে যে প্রলয়ংকর ব্যাপার চলিয়াছে সেদিকে তাঁহার চেতনা নাই।

আর তাঁহাকে দেখিলাম না; মরণোন্মত্ত স্তম্ভ খাদে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

একাকী গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছি।

তারপর কয়েক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু এ কাহিনী কাহাকেও বলিতে পারি নাই। ভিক্ষুর কথা স্মরণ হইলেই মনটা অপরিসীম বেদনায় পীড়িত হইয়া উঠে।

তবু এই ভাবিয়া মনে সান্ত্বনা পাই যে, তাঁহার জীবনের চরম অভীপ্সা অপূর্ণ নাই। সেই স্তম্ভশীর্ষে তিনি তথাগতের কিরূপ নয়নাভিরাম মূর্তি দেখিয়াছিলেন জানি না, কিন্তু তাঁহার জীবনব্যাপী অনুসন্ধান সফল হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মৃত্যুমুহূর্তে তাঁহার মুখের উদ্ভাসিত আনন্দ আজও আমার চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে।

২৮ আষাঢ় ১৩৪৩

সেতু

হঠাৎ সদ্যোজাত শিশুকণ্ঠের কান্নার শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল...পাশের ঘর হইতে কে যেন জলদমন্দ্র স্বরে বলিল, 'লিখে রাখ, ৩রা চৈত্র রাত্রি ১টা ১৭ মিনিটে জন্ম'...

রাত্রে এক স্বপ্ন দেখিয়াছি। কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না; এত স্পষ্ট, এত অদ্ভুত। আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অহিদত্ত রঞ্জুল, বৃদ্ধ অসিধাবক তণ্ডু, লালসাময়ী রল্লা—

এ কি স্বপ্ন? না আমারই মগ্নচৈতন্যের স্মৃতিকন্দর হইতে বাহির হইয়া আসিল আমার পূর্বতন জীবনের ইতিবৃত্ত! পূর্বতন জীবন বলিয়া কিছু কি আছে? মৃত্যু হয় জানি, কিন্তু সেইখানেই তো সব শেষ। আবার সেই শেষটাকে শুরু ধরিয়া নূতন কোনও জীবন আরম্ভ হয় নাকি?

আমার স্বপ্নটা যেন তাহারই ইঙ্গিত দিয়া গেল। একটা মানুষের জীবন—সে মানুষটা কি আমি?—উল্টা দিক দিয়া দেখিতে পাইলাম; এক মৃত্যু হইতে অন্য জন্ম পর্যন্ত। বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে ফুল ফল আবার বীজ—ইহাই জীব-জগতের পূর্ণ চক্র। কিন্তু এই চক্র পরিপূর্ণভাবে আমাদের দৃশ্যমান নয়, মাঝখানে চক্রাংশ খানিকটা অব্যক্ত। মৃত্যুর পর আবার জন্ম—মাঝ দিয়া বিস্মরণের বৈতরণী বহিয়া গিয়াছে। আমার স্বপ্ন যেন এই বৈতরণীর উপর সেতু বাঁধিয়া দিল।

সত্যই কি সেতু আছে? আমি বৈজ্ঞানিক, অলীক কল্পনার ধার ধারি না। আলোক-রশ্মি ঋজু রেখায় চলে কি না, এই বিষয় লইয়া গত তিন বৎসর গবেষণা করিতেছি। কঠিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোধ হয় সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। কাল আমার কাজ শেষ হইয়াছে। হালকা মন ও হালকা মস্তিষ্ক লইয়া শয়ন

করিতে গিয়াছিলাম। তারপর ঐ স্বপ্ন! ভাবিতেছি, এ-স্বপ্ন যদি অলীক কল্পনাই হয়, তবে সে এই সকল অদ্ভুত উপাদান সংগ্রহ করিল কোথা হইতে? আমার জাগ্রত চেতনার মধ্যে তো এ-সকল অভিজ্ঞতা ছিল না! কল্পনা কি কেবল শূন্যকে আশ্রয় করিয়া পল্লবিত হয়? রক্তের মধ্যে সামান্য একটু কার্বন-ডায়ক্সাইডের আধিক্য কি নিরবয়ব 'নাস্তি'কে মূর্ত বাস্তব করিয়া তুলিতে পারে?

জানি না। আমার যুক্তি-বিধিবদ্ধ বুদ্ধি এই স্বপ্নের আঘাতে বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে।

যে-শিশু কাঁদিয়া উঠিল, সে কে? আমি? আর সেই জলদমন্দ্র কণ্ঠস্বর!—পুরাতন ডায়েরী খুলিয়া দেখিতেছি, ৩৫ বৎসর পূর্বে ৩রা চৈত্র রাত্রি ১টা ১৭ মিনিটে আমার জন্ম হইয়াছিল।

দেখিতেছি, আমার সম্মুখে অত্যুজ্জ্বল অঙ্গার-পিণ্ড জ্বলিতেছে। বৃহৎ অঙ্গার-চুল্লী, ভস্ত্রার ফুৎকারে উগ্র নির্ধূম প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, আবার ভস্ত্রার বিরামকালে অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ রক্তিমবর্ণ ধারণ করিতেছে। এই অগ্নির মধ্যস্থলে প্রোথিত রহিয়াছে আমার অসি-ফলক।

কক্ষ ঈষদন্ধকার; চারিদিকে নানা আকৃতির লোহ-ফলক বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কোনটি খড়্গের আকার ধারণ করিতে করিতে সহসা থামিয়া গিয়াছে; কোনটি দণ্ডের আকারে শূল অথবা মুদ্গরে পরিণত হইবার আশায় অপেক্ষা করিতেছে। প্রাচীরগাত্রে সুসম্পূর্ণ ভল্ল অসি লৌহজালিক সজ্জিত রহিয়াছে। অঙ্গার-পিণ্ডের আলোকে ইহারা ঝলসিয়া উঠিতেছে, পুনরায় ম্লান অস্পষ্ট হইয়া যাইতেছে।

এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে স্বপ্নলোকে জাগিয়া উঠিলাম। জ্বলন্ত চুল্লীর অদূরে বেত্রাসনে বসিয়া আমি করলগ্ন-কপোলে দেখিতেছি, আর অসিধাবক তণ্ডু অগ্নির সম্মুখে বসিয়া ভস্ত্রা চালাইতেছে।

এই দৃশ্য আমার কাছে একান্ত পরিচিত, তাই বিস্মিত হইতেছি না। চেতনার মধ্যে ইহার সমস্ত পূর্ব-সংযোগ নিষ্ক্রিয় ভাবে সঞ্চিত রহিয়াছে। এই ছায়ান্ধকার কক্ষটি উজ্জয়িনীর প্রসিদ্ধ শস্ত্র-শিল্পী তণ্ডুর যন্ত্রাগার। আমি দক্ষিণ মণ্ডলে উপনিবিষ্ট শক-বাহিনীর একজন পত্তিনায়ক—আমার নাম অহিদত্ত রুঞ্জুল। আমি তণ্ডুর যন্ত্রাগারে বসিয়া আছি কেন? অসি সংস্কার করিবার জন্য? তণ্ডুর মত এত বড় অসি-শিল্পী শুনিয়াছি শক-মণ্ডলে আর নাই, সে অসিতে এমন ধার দিতে পারে যে, নিপুণ শস্ত্রী তাহার দ্বারা আকাশে ভাসমান কাশ-পুষ্পকে দ্বিখণ্ডিত করিতে পারে! কিন্তু এই জন্যই কি গত বসন্তোৎসবের পর হইতে বারবার তাহার গৃহে আসিতেছি?

চুল্লীর আলোকে তণ্ডুর মুখের প্রত্যেক রেখাটি দেখিতে পাইতেছি। শীর্ণ, রক্তহীন মুখ; গুম্ফ ও ভ্রূর রোম চুল্লীর দাহে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, গণ্ডের চর্ম কুঞ্চিত হইয়া হনু-অস্থিকে প্রকট করিয়া তুলিয়াছে। ললাটের দুই প্রান্ত নিম্ন। অস্থিসার বক্র নাসিকা এই জরাবিধ্বস্ত মুখের চর্মাবরণ ভেদ করিয়া বাহির হইবার প্রয়াস করিতেছে। মুখখানা দেখিলে মনে হয় মৃতের মুখ, শুধু সেই মৃত মুখের মধ্যে কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু দুটা অস্বাভাবিক রকম জীবিত,—ভগ্নমেরু মুমূর্ষু সর্পের চক্ষুর মত যেন একটা বিষাক্ত জিঘাংসা বিকীর্ণ করিতেছে।

তণ্ডু যন্ত্রচালিতের মত কাজ করিতেছে। আমার অসি-ফলক অঙ্গার হইতে বাহির করিয়া রসায়ন-মিশ্র জলে ডুবাইতেছে, সন্তর্পণে ফলকের ধার পরীক্ষা করিতেছে, আবার

তাহা অঙ্গারমধ্যে প্রোথিত করিতেছে। তাহার মুখে কথা নাই, কখনও সে সর্পচক্ষু আমার দিকে ফিরাইয়া অতর্কিতে আমাকে দেখিয়া লইতেছে, তাহার পীত-দন্ত মুখ ঈষৎ বিভক্ত হইয়া যাইতেছে, অধরোষ্ঠ একটু নড়িতেছে—যেন সে নিজ মনে কথা কহিল—তারপর আবার কর্মে মন দিতেছে।

আমিও তাহার পানে চাহিয়া বসিয়া আছি, কিন্তু আমার মন তাহাকে দেখিতেছে না। মন দেখিতেছে—কাহাকে?—রল্লা। লালসাময়ী কুহকিনী রল্লা! আমার ঐ উত্তপ্ত অসি-ফলকের ন্যায় কামনার শিখারূপিণী রল্লা!

একটা তীক্ষ্ম বেদনা সূচীর মত হৃদয়যন্ত্রকে বিদ্ধ করিল। তণ্ডুর দেহ ভাল করিয়া আপাদমস্তক দেখিলাম। এই জরাগলিত দেহ বৃদ্ধ রল্লার ভর্তা। রল্লা আর তণ্ডু! বুকের মধ্যে একটা ঈর্ষা-ফেনিল হাসি তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল—ইহাদের দাম্পত্য জীবন কি-রূপ? নিজের দেহের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলাম। বক্ষে বাহুতে উদ্ধত পেশী আস্ফালন করিতেছে—পঁচিশ বৎসরের দর্পিত যৌবন! তপ্ত শক-রক্ত যেন শুভ্র চর্ম ফাটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে।—আমি লোলুপ চোরের মত নানা ছলে তণ্ডুর গৃহে যাতায়াত করি-তেছি, আর তণ্ডু—রল্লার স্বামী!

রল্লা কি কুহক জানে? নারী তো অনেক দেখিয়াছি,—তীরনয়না গর্বিতা শক-দুহিতা, মদালসনেত্রা স্ফুরিতাধরা অবন্তিকা, বিলাসভঙ্গিমগতি রতিকুশলা হাস্যময়ী লাট-ললনা। কিন্তু রল্লা—রল্লার জাতি নাই। তাহার তাম্র-কাঞ্চন দেহে নারীত্ব ছাড়া আর কিছু নাই। সে নারী। আমার সমস্ত সত্তাকে সে তাহার নারীত্বের কুহকে জয় করিয়াছে।

একবার মাত্র তাহাকে দেখিয়াছি, মদনোৎসবের কুঙ্কুম-অরুণিত সায়াহ্নে। উজ্জয়িনীর নগর-উদ্যানে মদনোৎসবে যোগ দিয়াছিলাম। এক দিনের জন্য প্রবীণতার শাসন শিথিল হইয়া গিয়াছে। অবরোধ নাই, অবগুণ্ঠন নাই—লজ্জা নাই। যৌবনের মহোৎসব। উদ্যানের গাছে গাছে হিন্দোলা দুলিতেছে, গুল্মে গুল্মে চটুলচরণা নাগরিকার মঞ্জীর বাজিতেছে, অসম্বৃত অঞ্চল উড়িতেছে, আসব-অরুণ নেত্র ঢুলুঢুলু হইয়া নিমীলিত হইয়া আসিতেছে। কলহাস্য করিয়া কুঙ্কুমপ্রলিপ্তদেহা নাগরী এক তরুগুল্ম হইতে গুল্মান্তরে ছুটিয়া পলাইতেছে, মধ্যপথে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পিছু ফিরিয়া চাহি-তেছে, আবার পলাইতেছে। পশ্চাতে পুষ্পের ক্রীড়াধনু হস্তে শবরবেশী নায়ক তাহার অনুসরণ করিতেছে। নিভৃত লতানিকুঞ্জে প্রণয়ী মিথুন কানে কানে কথা কহিতেছে। কোনও মৃগনয়না বিভ্রমচ্ছলে নিজ চক্ষু মার্জনা করিয়া কহিতেছে—তুমি আমার চক্ষে কুঙ্কুম দিয়াছ! প্রণয়ী তরুণ সযত্নে তাহার চিবুক ধরিয়া তুলিয়া অরুণাভ নয়নের মধ্যে দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছে, তারপর ফুৎকার দিবার ছলে গূঢ়-হাস্য-মুকুলিত রক্তাধর সহসা চুম্বন করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মিলিত কণ্ঠের বিগলিত হাস্য লতামণ্ডপের সুগন্ধি বায়ুতে শিহরণ তুলিতেছে।

শত শত নাগর-নাগরিকা এইরূপ প্রমোদে মত্ত—নিজের সুখে সকলেই নিমজ্জিত, অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবসর নাই। যৌবন চঞ্চল—বসন্ত ক্ষণস্থায়ী; এই স্বল্পকাল মধ্যে বৎসরের আনন্দ ভরিয়া লইতে হইবে। বৃহৎ কিংশুক বৃক্ষমূলে বেদীর উপর স্নিগ্ধ সুরভিত আসব বিক্রয় হইতেছে—পৈষ্ঠী গৌড়ী মাধ্বক—নাগরিক-নাগরিকা নির্বিচারে তাহা পান করিতেছে; অবসন্ন উদ্দীপনাকে প্রজ্বলিত করিয়া আবার উৎসবে মাতিতেছে। কঙ্কণ, নূপুর, কেয়ূরের ঝনৎকার, মাদলের নিক্কণ, লাস্য-আবর্তিত নিচোলের বর্ণচ্ছটা, স্খলিত কণ্ঠের হাস্য-বিজড়িত সঙ্গীত;—নির্লজ্জ উন্মুক্ত ভাবে কন্দর্পের পূজা চলিয়াছে।

নগর-উপবনের বীথিপথে আমি একাকী ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। মনের

মধ্যে একটা নির্লিপ্ত সুখাবেশ ক্রীড়া করিতেছিল। এই সব রসোন্মত্ত নরনারী—ইহারা যেন নট-নটী; আমি দর্শক। সুরাপান করিয়াছিলাম, কিন্তু অধিক নয়। বসন্তের লঘু-আতপ্ত বাতাসের স্পর্শে বারুণী-জনিত উল্লাস যেন আমার চিত্তকে আত্মসুখলিপ্সার ঊর্ধ্বে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছিল। চারিদিকে অধীর আনন্দ-বিহ্বলতা দেখিতেছিলাম; মনে আনন্দের স্পর্শ লাগিতেছিল, আপনা আপনি উচ্চকণ্ঠে হাসিতেছিলাম, কিন্তু তবু এই ফেনোচ্ছল নর্ম-স্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিতেছিলাম না। আমি সৈনিক, নাগরিক সাধারণ আমাকে কেহ চিনে না; তাই অপরিচয়ের সঙ্কোচও ছিল; উপরন্তু এই অপরূপ মধু-বাসরে বোধ করি নিজের অজ্ঞাতসারেই গাঢ়তর রসোপলব্ধির আকাঙ্খা করিতেছিলাম।

উপবনের মধ্যস্থলে কন্দর্পের মর্মর-দেউল। স্মরবীথিকারা দেউল ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছে, বাহুতে বাহু শৃঙ্খলিত করিয়া লীলায়িত ভঙ্গিমায় উপাস্য দেবতার অর্চনা করিতেছে। তাহাদের স্বল্পবাস দেহের মদালস গতির সঙ্গে সঙ্গে বেণীবিসর্পিত কুন্তল দুলিতেছে, চপল মেখলা নাচিতেছে। চোখে চোখে মদসিক্ত হাসির গূঢ় ইঙ্গিত, বিদ্যুৎ-স্ফুরণের ন্যায় অতর্কিত ভ্রূবিলাস, যেন মদনপূজার উপচার রূপে উৎসৃষ্ট হইতেছে।

আমি তাহাদের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলাম। পুষ্পধন্বা মদনবিগ্রহকে প্রণাম করিয়া মদনের কিঙ্করীদের প্রতি সহাস্য দৃষ্টি ফিরাইলাম। আমাকে দেখিয়া তাহাদের নৃত্য বন্ধ হইল, তাহারা পুষ্প-শৃঙ্খলের মত আমাকে আবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। তারপর তাহাদের মধ্যে একটি বিম্বাধরা যুবতী দ্বিধা-মন্থর পদে আমার সম্মুখে আসিল। আমার মুখের পানে চাহিয়া সে চক্ষু নত করিল, তারপর আবার চক্ষু তুলিয়া একটি চম্পক-অঙ্গুলি দিয়া আমার উন্মুক্ত বক্ষ স্পর্শ করিল। দেখিলাম, তাহার কালো নয়নে কোন অজ্ঞাত আকাঙ্খার ছায়া পড়িয়াছে।

আমি কৌতুকভরে আমার কুঞ্চিত কেশ-বন্ধন হইতে একটি অশোক-পুষ্প লইয়া তাহার চূড়া-পাশে পরাইয়া দিলাম,—তারপর হাসিতে হাসিতে নগরবধূদের বাহুরচিত নিগড় ভিন্ন করিয়া প্রস্থান করিলাম।

ক্ষণকালের জন্য সকলেই মূক হইয়া রহিল। তারপর আমার পশ্চাতে বহু কলকণ্ঠের হাস্য বিচ্ছুরিত হইয়া উঠিল। আমিও হাসিলাম, কিন্তু পিছু ফিরিয়া দেখিলাম না।

ক্রমে দিবা নিঃশেষ হইয়া আসিল। পশ্চিম গগনে আবীর-কুঙ্কুমের খেলা আরম্ভ হইল। দিগ্বধূরাও যেন মদনমহোৎসবে মাতিয়াছে।

উদ্যানের এক প্রান্তে একটি মাধবীবিতানতলে প্রস্তরবেদীর উপর গিয়া বসিলাম। স্থান নির্জন; অদূরে একটি কৃত্রিম প্রস্রবণ হইতে বৃত্তাকার আধারে জল ঝরিয়া পড়িতেছে। মণি-মেখলাধৃত জলরাশি সায়াহ্নের স্বর্ণাভ আলোকে টলমল করিতেছে, কখনও রবিরশ্মি-বিদ্ধ চূর্ণ জলকণা ইন্দ্রধনুর বর্ণ বিকীর্ণ করিতেছে। যেন সুন্দরী রমণীর অধীর চঞ্চল যৌবন।

আলস্যস্তিমিত অন্যমনে আলোকের এই জলক্রীড়া দেখিতেছি, এমন সময় সহসা একটি কুঙ্কুম-গোলক আমার বক্ষে আসিয়া লাগিল; অভ্র-আবরণ ফাটিয়া সুগন্ধিচূর্ণ দেহে লিপ্ত হইল। সচকিতে মুখ তুলিয়া দেখিলাম, একটি নারী লতাবিতানের দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে।

তাহাকে দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য রুদ্ধবাক্ হইয়া গেলাম, বোধ করি হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দনও কয়েক মুহূর্তের জন্য থামিয়া গেল। তারপর হৃদয় উন্মত্তবেগে আবার স্পন্দিত হইতে লাগিল। চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বিস্ফারিত নেত্র তাহার দেহের উপর নিবদ্ধ রাখিয়া তাহার সম্মুখীন হইলাম।

তাম্রকাঞ্চনবর্ণা লোলযৌবনা তন্বী; কবরীতে মল্লীমুকুলের মালা জড়িত, মুখে চূর্ণ মনঃশিলার প্রলেপ, কিংশুক-ফুল্ল ওষ্ঠাধর হইতে যেন রতি-মাদকতার মধু ক্ষরিয়া পড়িতেছে। কর্ণে কর্ণিকার কলি গণ্ডের উত্তাপে ম্লান হইয়া গিয়াছে। পত্রলেখা-চিত্রিত উরসে লূতাজালের ন্যায় সূক্ষ্ম কঞ্চুকী, তদুপরি স্বচ্ছতর উত্তরীয় যেন কাশ্মীরবর্ণ কুহেলী দ্বারা অপূর্ণ চন্দ্রকলাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। নাভিতটে আকুঞ্চিত নিচোল; চরণ দুটি লাক্ষারস-নিষিক্ত।

এই বিমোহিনী মূর্তি কুটিল অপাঙ্গে চাহিয়া নিঃশব্দে মৃদু মৃদু হাসিতেছে। তাহাকে আপাদমস্তক দেখিয়া আমার বুকের মধ্যে ভয়ের মত একটা অনুভূতি গুরু গুরু করিতে লাগিল। সহসা আমার এ কি হইল? এই তো কিছুকাল পূর্বে মদন-পূজারিণীদের নীরব সঙ্কেত হাসিমুখে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি! কিন্তু এখন!

অবরুদ্ধ অস্পষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কে?'

তাহার অধরোষ্ঠ ঈষৎ বিভক্ত হইল, দশনপংক্তিতে বিজলী খেলিয়া গেল। বঙ্কিম কটাক্ষে ভ্রূ-ধনু বিলসিত করিয়া সে বলিল, 'আমি রল্লা।'

রল্লা! তাহার কণ্ঠস্বর ও নামোচ্চারণের ভঙ্গীতে আমার দেহে তীব্র বেদনার মত একটা নিপীড়ন অনুভব করিলাম। আমি তাহার দিকে আর এক পদ অগ্রসর হইয়া গেলাম। ইচ্ছা হইল—কি ইচ্ছা হইল জানি না। হাসিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু হাসি আসিল না।

মদনোৎসবে অপরিচিত তরুণ-তরুণীর সাক্ষাৎকার ঘটিলে তাহারা কি করে? হাসিয়া পরস্পরের দেহে কুঙ্কুম নিক্ষেপ করে, দুই-চারিটা রঙ্গ-কৌতুকের কথা বলে, তারপর নিজ পথে চলিয়া যায়। কিন্তু আমি—মূঢ় গ্রামিকের মত তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম। শেষে আবার প্রশ্ন করিলাম, 'কে তুমি?'

এবার সে ভঙ্গুর কণ্ঠে কৌতুক ভরিয়া হাসিল, হাসিতে হাসিতে বেদীর উপর আসিয়া বসিল, অধর নয়ন এবং ভ্রূর একটি অপূর্ব চটুল ভঙ্গিমা করিয়া বলিল, 'দেখিয়াও বুঝিতে পারিতেছ না? আমি নারী।'

কথাগুলি যেন দৈহিক আঘাতের মত আমার বুকে আসিয়া লাগিল। নারী—হাঁ, নারীই বটে। ইহা ভিন্ন তাহার অন্য পরিচয় নাই। পুরুষের অন্তর-গুহায় যে অনির্বাণ নারী-ক্ষুধা জ্বলিতেছে, এই নারীই বুঝি তাহাতে পূর্ণাহুতি দান করিতে পারে।

তারপর কতক্ষণ এই লতাবিতানতলে কাটিয়া গেল জানি না। রল্লার লালসাময় যৌবনশ্রী, তাহার মাদক দেহসৌরভ অগ্নিময় সুরার মত আমার রক্তে সঞ্চারিত হইল। আমি উন্মত্ত হইয়া গেলাম। কিন্তু তবু—তাহাকে ধরিতে পারিলাম না। ধনুকের গুণ যেমন বাণকে নিজ বক্ষে টানিয়া লইয়াই দূরে নিক্ষেপ করে, রল্লা তেমনি তাহার দেহের কুহকে বারবার আমাকে কাছে টানিয়া আবার দূরে ঠেলিয়া দিল। আমি তাহাকে স্পর্শ করিতে গেলাম, সে চপল চরণে সরিয়া গেল—

বলিল, 'তুমি বুঝি ব্যাধ? কিন্তু সুন্দর ব্যাধ, বল—হরিণীকে কি এত শীঘ্র ধরা যায়?'

তপ্তস্বরে বলিলাম, 'আমি ব্যাধ নই, তুমি নিষ্ঠুরা শবরী—আমাকে বধ করিয়াছ। তবু কাছে আসিতেছ না কেন?'

এবারে সে কাছে আসিল। আমার স্পন্দমান বক্ষের উপর একটি উষ্ণ রক্তিম করতল রাখিয়া ছদ্ম গাম্ভীর্যে বলিল, 'দেখি।' তারপর যেন ত্রস্তভাবে দ্রুত সরিয়া গিয়া কহিল 'কই, বধ করিতে তো পারি নাই! বোধ হয় সামান্য আহত হইয়াছ মাত্র। তোমার কাছে যাইব না, শুনিয়াছি আহত ব্যাঘ্রের নিকট যাইতে নাই।'

এই চটুলতার সম্মুখে আমি ব্যর্থ হইয়া রহিলাম।

তখন সে আবার আমার কাছে আসিল। কজ্জল-দূষিত চক্ষে আমার সর্বাঙ্গ লেহন করিয়া একটা অর্ধ-নিশ্বাস ত্যাগ করিল। অস্ফুট স্বরে কহিল, 'তুমি বোধ হয় ছদ্ম-বেশী কন্দর্প।'

আমি তাহার দুই বাহু চাপিয়া ধরিলাম; শরীরের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ শিহরিয়া গেল। তাহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া গাঢ় স্বরে বলিলাম, 'রল্লা—'

এই সময় যেন আমার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া লতাবিতানের বাহিরে কিয়দ্দূরে কর্কশ কণ্ঠে আহ্বান আসিল, 'রল্লা—! রল্লা—!'

উৎকণ্ঠ হইয়া রল্লা শুনিল; তারপর হাত ছাড়াইয়া লইল। আমার মুখের দিকে চাহিয়া এক অদ্ভুত হাসি তাহার কিংশুক-ফুল্ল অধরে খেলিয়া গেল। সে বলিল, 'আমার মদনোৎসব শেষ হইয়াছে। আমি গৃহে চলিলাম।'

'গৃহে চলিলে!—যে ডাকিল সে কে?'

রল্লা আবার নিদাঘ-বিদ্যুতের মত হাসিল, 'আমার—ভর্তা।'

অকস্মাৎ মুদ্গরাঘাতের মত প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া যেন বিমূঢ় হইয়া গেলাম—'ভর্তা!'

রল্লা লতাবিতানের দ্বারের দিকে চলিল। যাইতে যাইতে গ্রীবা ফিরাইয়া বলিল, 'আমার ভর্তাকে দেখিবে? লতার অন্তরালে লুকাইয়া দেখিতে পার।' তীক্ষ্ণ বঙ্কিম হাসিয়া রল্লা সহসা অদৃশ্য হইয়া গেল।

মূঢ়বৎ কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম; তারপর লতামণ্ডপের পত্রান্তরাল সরাইয়া বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম।

রল্লা আর তণ্ডু মুখোমুখি দাঁড়াইয়া আছে। বৃদ্ধ তণ্ডুর সর্পচক্ষু সন্দেহে প্রখর; রল্লার রক্তাধরে বিচিত্র হাসি।

তণ্ডু কর্কশকণ্ঠে বলিল, 'উৎসব শেষ হইয়াছে, গৃহে চল।'

রল্লা ক্লান্তিবিজড়িত ভঙ্গীতে দুই বাহু ঊর্ধ্বে তুলিয়া দেহের আলস্য দূর করিল, তারপর বৃদ্ধকে বলিল, 'চল।'

তণ্ডু একবার লতাবিতানের দিকে কুটিল দৃষ্টিপাত করিল, একবার যেন একটু দ্বিধা করিল, তারপর বৃদ্ধ ভল্লুকের মত বিপরীত মুখে চলিতে আরম্ভ করিল। রল্লা মন্থর পদে তাহার পশ্চাতে চলিল।

যাইতে যাইতে রল্লা একবার নিজের কবরীতে হাত দিল; কবরী হইতে একটি রক্ত কুরুবক খসিয়া মাটিতে পড়িল।

আমি বাহিরে আসিয়া কুরুবকটি তুলিয়া লইলাম। রল্লা তখন দূরে চলিয়া গিয়াছে, দূর হইতে ফিরিয়া চাহিল। প্রদোষের ছায়াম্লান আলোকে যেন তাহার সর্বাঙ্গ নিঃশব্দ সঙ্কেত করিয়া আমাকে ডাকিল।

আমি দূরে থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিলাম। জনাকীর্ণ নগরীর বহু সংকীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে রল্লা নগরপ্রান্তের এক দীন গৃহের অভ্যন্তরে অদৃশ্য হইয়া গেল। দেখিলাম, গৃহের প্রাচীরে দুইটি অসি চিত্রিত রহিয়াছে।

তারপর নানা ছুতা করিয়া অসিধাবক তণ্ডুর গৃহে আসিয়াছি। অধীর দুর্নিবার অন্তরে স্থির হইয়া বসিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিয়াছি। তণ্ডুর যন্ত্রাগারের পশ্চাতে তাহার বাসগৃহ; সেখানে রল্লা আছে, দূর হইতে ক্বচিৎ তাহার নূপুরশিঞ্জন শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়াছি; চোখে মুখে উগ্র কামনা হয়তো প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। তণ্ডু কুটিল বক্র কটাক্ষে আমাকে নিরীক্ষণ করিয়াছে। কিন্তু রল্লাকে দেখিতে পাই নাই—একটা তুচ্ছ

সঙ্কেত পর্যন্ত না।

তণ্ডুর কর্কশ নীরস কণ্ঠস্বরে স্মৃতিতন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। সচেতন হইয়া দেখিলাম, সে শীর্ণ অঙ্গুলির প্রান্তে আমার অসির ধার পরীক্ষা করিতেছে, আর কেশহীন ভ্রূ উত্থিত করিয়া শুষ্ক স্বরে কহিতেছে, 'অসির ধার আর বনিতার লজ্জা পরের জন্য, কি বলেন পত্তিনায়ক?'

বলিলাম, 'অসির ধার বটে। বনিতার লজ্জার কথা বলিতে পারি না, আমি অনূঢ়।'

'আমি বলিতে পারি, আমি অনূঢ় নহি—হা হা—' তণ্ডুর ওষ্ঠাধর তৃষ্ণার্ত বায়সের মত বিভক্ত হইয়া গেল—'কিন্তু আপনি যদি অনূঢ়, তবে এত তন্ময় হইয়া কাহার ধ্যান করিতেছিলেন? পরস্ত্রীর?'

আকস্মিক প্রশ্নে নির্বাক হইয়া গেলাম, সহসা উত্তর যোগাইল না। তণ্ডু কি সত্যই আমার মনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছে? আত্মসম্বরণ করিয়া তাচ্ছিল্যভরে বলিলাম, 'কাহারও ধ্যান করি নাই, তোমার শিল্প-নৈপুণ্য দেখিতেছিলাম।'

বিকৃত হাস্য করিয়া তণ্ডু পুনশ্চ অসি অঙ্গার মধ্যে প্রোথিত করিল, বলিল, 'অহিদত্ত রঞ্জুল, আপনি সুন্দর যুবাপুরুষ, এই দীন অসিধাবকের কারু-নৈপুণ্য দেখিয়া আপনার কি লাভ হইবে? বরং নগর-উদ্যানে গমন করুন, সেখানে বহু রসিকা নগর-নায়িকার কলা-নৈপুণ্য উপভোগ করিতে পারিবেন।'

আমার মনে একটু ক্রোধের সঞ্চার হইল। এই হীনজাত বৃদ্ধ আমাকে ব্যঙ্গ করিতেছে। ঈষৎ রুক্ষ স্বরে বলিলাম, 'আমি কোথায় যাইব না-যাইব তাহা আমার ইচ্ছাধীন। তুমি সেজন্য ব্যস্ত হইও না।'

তণ্ডু আমার পানে একটা চকিত-গুপ্ত চাহনি হানিয়া আবার কার্যে মন দিল। কিয়ৎকাল পরে বলিল, 'ভাল কথা, পত্তিনায়ক, আপনি তো যোদ্ধা; শত্রুর উপর অসির ধার নিশ্চয় পরীক্ষা করিয়াছেন?'

গম্ভীর হাসিয়া বলিলাম, 'তা করিয়াছি। দুই বৎসর পূর্বে দেবপাদ কণিষ্ক যখন তোমাদের এই উজ্জয়িনী নগরী অধিকার করেন, তখন নাগরিকের কণ্ঠে আমার অসির ধার পরীক্ষা করিয়াছি।'

তণ্ডুর চক্ষু দুটা ক্ষণেক আমার মুখের উপর নিষ্পলক হইয়া রহিল; তারপর শীৎকারের মত স্বর তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল. 'পত্তিনায়ক, আপনি বীর বটে। কিন্তু সেজন্য কৃতিত্ব কাহার?'

'কাহার?'

'আমার—এই হীনজন্মা অসিধাবকের। কে আপনার অসিতে ধার দিয়াছে? আমারই মার্জিত অস্ত্রের সাহায্যে আপনারা আমার ভ্রাতা-পুত্রকে হত্যা করিয়াছেন, স্ত্রী-কন্যাকে অপহরণ করিয়াছেন।'

আমার মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। বলিলাম, 'শকজাতি বর্বর নয়। তাহারা যুদ্ধ করিয়াছে কিন্তু নারীহরণ কদাপি করে নাই।'

তণ্ডু কণ্ঠে খলতার বিষ মিশাইয়া বলিল, 'বটে! তবে বোধ হয় শকজাতি পরস্ত্রীকে চুরি করিতেই পটু।'

ক্রোধের শিখা আমার মাথায় জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তণ্ডুর অভিপ্রায়ও বুঝিতে পারিলাম; সে আমার সহিত কলহ করিতে চাহে—যাহাতে আমি আর তাহার গৃহে না আসি। রল্লার লালসায় আমি তাহার গৃহে আসি—ইহা সে বুঝিয়াছে। কিন্তু

বুঝিল কি করিয়া?

কষ্টে ক্রোধ দমন করিয়া বলিলাম, 'তণ্ডু, তুমি বৃদ্ধ, তোমার সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে চাহি না। আমার অসি যদি তৈয়ার হইয়া থাকে, দাও।'

সে অসি জলে ডুবাইয়া আবার অঙ্গুলির সাহায্যে ধার পরীক্ষা করিল। বলিল, 'অসি তৈয়ার হইয়াছে।'

তণ্ডুর সহিত কলহ করিয়া আমার লাভ নাই। তাহাকে তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে আমি পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিলাম, 'এই লও পঞ্চ নাণক—তোমার পুরস্কার।'

তণ্ডুর চক্ষু সহসা তাহার অঙ্গারকুণ্ডের মতই জ্বলিয়া উঠিয়া আবার নিবিয়া গেল। সে চেষ্টাকৃত ধীর স্বরে বলিল, 'আমার পরিশ্রমের মূল্য এক নাণক মাত্র। বাকি চার নাণক আপনি রাখুন, অন্যত্র প্রমোদ ক্রয় করিতে পারিবেন।—কিন্তু অসির ধার পরীক্ষা করিবেন না?'

উদ্গত ক্রোধ গলাধঃকরণ করিয়া আমি বলিলাম, 'করিব, দাও।' বলিয়া হাত বাড়াইলাম।

তণ্ডু কিন্তু অসি দিবার কোনও চেষ্টাই করিল না, তির্যক চক্ষে চাহিয়া বলিল, 'পত্তি-নায়ক, নিজের উপর কখনও নিজের অসির ধার পরখ করিয়াছেন? করেন নাই! তবে এইবার করুন।'

বৃদ্ধের হস্তে আমার অসি একবার বিদ্যুতের মত ঝলসিয়া উঠিল। আমার শির-স্ত্রাণের উপর একটি শিখিপুচ্ছ রোপিত ছিল, দ্বিখণ্ডিত হইয়া তাহা ভূতলে পড়িল।

এইবার আমার অবরুদ্ধ ক্রোধ একেবারে ফাটিয়া পড়িল। এক লম্ফে প্রাচীর হইতে খড়্গ তুলিয়া লইয়া বলিলাম, 'তণ্ডু, বৃদ্ধ শৃগাল, আজ তোর কর্ণচ্ছেদন করিব।' জ্বলন্ত ক্রোধের মধ্যে একটা চিন্তা অকস্মাৎ সূক্ষ্ম সূচীর মত মস্তিষ্ককে বিদ্ধ করিল—তণ্ডুকে যদি হত্যা করি তাহাতেই বা দোষ কি? বরং আমার পথ পরিষ্কার হইবে।

কিন্তু তাহাকে আক্রমণ করিতে গিয়া দেখিলাম—কঠিন ব্যাপার। বিস্ময়ে আমার ক্রোধ ডুবিয়া গেল। জরা-শীর্ণ তণ্ডুর হস্তে অসি ঘুরিতেছে রথ-নেমির মত, অসি দেখা যাইতেছে না, কেবল একটা ঘূর্ণ্যমান প্রভা তাহাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। আমি হটিয়া গেলাম।

গরলভরা সুরে তণ্ডু বলিল, 'পত্তিনায়ক অহিদত্ত রঞ্জুল, লতামণ্ডপে লুকাইয়া চপলা পরস্ত্রীর অঙ্গস্পর্শ করা সহজ, পুরুষের অঙ্গ স্পর্শ করা তত সহজ নয়।'

আবার তাহাকে আক্রমণ করিলাম। বুঝিতে বাকী রহিল না, তণ্ডু আরম্ভ হইতেই আমার অভিপ্রায় জানে। লতাবিতানে চুরি করিয়া আমাদের দেখিয়াছিল। কিন্তু এতদিন প্রকাশ করে নাই কেন? আমাকে লইয়া খেলা করিতেছিল?

অসিতে অসি লাগিয়া স্ফুলিঙ্গ ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য বৃদ্ধের কৌশল, সে একপদ হটিল না। আমি যোদ্ধা, অসিচালনাই আমার জীবন, আমি তাহার অসি-নৈপুণ্যের সম্মুখে বিষহীন উরগের ন্যায় নির্বীর্য হইয়া পড়িলাম। অপ্রত্যাশিতের বিস্ময় আমাকে আরও অভিভূত করিয়া ফেলিল।

অকস্মাৎ বজ্র-নির্ঘোষের মত তণ্ডুর স্বর আমার কর্ণে আসিল, 'অহিদত্ত রঞ্জুল, শক-লম্পট, এইবার নিজ অসির ধার নিজবক্ষে পরীক্ষা কর—'

তার পর—কি যেন একটা ঘটিয়া গেল।

অবাক হইয়া নিজের দিকে তাকাইলাম। দেখিলাম, অসির শাণিত ফলক আমার বক্ষপঞ্জরে প্রোথিত হইয়া আছে!

তণ্ডু আমার পঞ্জর হইতে অসি টানিয়া বাহির করিয়া লইল। আমি মাটিতে পড়িয়া গেলাম। একটা তীব্র দৈহিক যন্ত্রণা যেন আমার চেতনাকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। আর কোনও ক্লেশ অনুভব করিলাম না। স্বপ্নাচ্ছন্নের মত অনুভব করিলাম, তণ্ডু কর্কশ উল্লাসে বলিতেছে, 'অহিদত্ত রঞ্জুল, রল্লা তোমাকে বধ করে নাই,—বধ করিয়াছে তণ্ডু—তণ্ডু—তণ্ডু—'

আমার দেহটার সহিত আমার যেন একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছে। সে আমাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে, আমি বায়ুহীন কারা-কূপে আবদ্ধ বন্দীর মত প্রাণপণে মুক্ত হইবার জন্য ছটফট করিতেছি। এই টানাটানি ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। তার পর হঠাৎ মুক্তিলাভ করিলাম।

প্রথমটা কিছুই ধারণা করিতে পারিলাম না। তণ্ডুর যন্ত্রগৃহে আমি দাঁড়াইয়া আছি, আমার পায়ের কাছে একটা বলিষ্ঠ রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়িয়া আছে। আর, তণ্ডু ঘরের কোণে খনিত্র দিয়া গর্ত খুঁড়িতেছে এবং ভয়ার্ত চোখে বারবার মৃতদেহটার পানে ফিরিয়া তাকাইতেছে।

ক্রমে মনন-শক্তি ফিরিয়া আসিল। বুঝিলাম, তণ্ডু আমাকে হত্যা করিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য! আমি তো মরি নাই! ঠিক পূর্বের মতই বাঁচিয়া আছি। অনির্বচনীয় বিস্ময় ও হর্ষে মন ভরিয়া উঠিল।

অনুভব করিলাম, আরও কয়েক জন ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কাহাকেও চিনিলাম, কাহাকেও বা চিনিতে পারিলাম না। একজন আমার কাছে আসিয়া মৃদুহাস্যে বলিল, 'চল, এখানে থাকিয়া আর লাভ নাই।'

রল্লার কথা মনে পড়িয়া গেল। মুহূর্তমধ্যে তাহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম। একটি বদ্ধ কক্ষে ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে সে বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে; শুষ্ক চোখে ছুরির ঝলক, ক্ষণে ক্ষণে তীক্ষ্ণ দশনে অধর দংশন করিতেছে। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া, তাহার অত্যন্ত কাছে দাঁড়াইয়াও আমার লেশমাত্র বিকার জন্মিল না। সেই তপ্ত লালসা-ফেনিল উন্মত্ততা আর নাই। দেহের সঙ্গে দেহ-জাত আবিলতাও যেন ঝরিয়া গিয়াছে।

অতঃপর আমার নূতন জীবন আরম্ভ হইল। পার্থিব সময়ের প্রায় দুই সহস্র বর্ষব্যাপী এই জীবন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করা সহজ নয়। আমার স্বপ্নে আমি এই দুই হাজার বৎসরের জীবন বোধ হয় দুই ঘণ্টা বা আরও অল্প সময়ের মধ্যে যাপন করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহা বর্ণনা করিতে গেলে দুই হাজার পৃষ্ঠাতেও কুলাইবে না।

জীবিত মানুষ স্থান এবং কালের আশ্রয়ে নিজের সত্তাকে প্রকট করে। কিন্তু প্রেতলোকে আত্মার স্থিতি কেবল কালের মধ্যে। নিরবয়ব বলিয়া বোধ করি তাহার স্থানের প্রয়োজন হয় না।

শরীর নাই; তাই রোগ কামনা ক্ষুধা তৃষ্ণাও নাই। দেহ-বোধ প্রথম কিছু দিন থাকে, ক্রমে ক্ষয় হইয়া যায়। গতির অবাধ স্বচ্ছন্দতা আছে, অভিলাষমাত্রেই যেখানে ইচ্ছা যাওয়া যায়। সূর্যের জ্বলন্ত অগ্নি-বাষ্পের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, লেশমাত্র তাপ অনুভব করি নাই। শৈত্য-উত্তাপের একান্ত অভাবই এ রাজ্যের স্বাভাবিক অবস্থা।

এখানকার কালের গতিও পার্থিব কালের গতি হইতে পৃথক। পৃথিবীর এক অহোরাত্রে এখানে এক অহোরাত্র হয় না; পার্থিব এক চান্দ্র মাসে আমাদের অহোরাত্র। এই কালের বিভিন্নতার জন্য পার্থিব ঘটনা আমাদের নিকট অতিশয় দ্রুত বলিয়া বোধ হয়।

অবাধ স্বচ্ছন্দতায় আমার সময় কাটিতে লাগিল। কোটি কোটি বিদেহ আত্মা এখানে আমারই মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নারী আছে, পুরুষ আছে; সকলেই স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিতেছে! আপাতদৃষ্টিতে কোনও প্রকার বিধি-নিষেধ লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু তবু, কোথায় যেন একটা অদৃশ্য শক্তি সমস্ত নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। সেই শক্তির আধার কে, জানি না; কিন্তু তাহার নিঃশব্দ অনুশাসন লঙ্ঘন করা অসাধ্য।

সময় কাটিয়া যাইতে লাগিল। এখানে জ্ঞানের পথে বাধা নাই; যাহার মন স্বভাবত জ্ঞানলিপ্সু সে যথেচ্ছ জ্ঞানলাভ করিতে পারে। মর্তলোকে যে-জ্ঞান বহু সাধনায় অর্জন করিতে পারা যায় না, এখানে তাহা সহজে অবলীলাক্রমে আসে। আমি আমার ক্ষুদ্র মানবজীবনে যে-সকল মানসিক সংস্কার ও সংকীর্ণতা সঞ্চয় করিয়াছিলাম তাহা ক্রমশ ক্ষয় হইয়া গেল। অকলঙ্ক জ্ঞান ও প্রীতির এক আনন্দময় অবস্থার মধ্যে উপনীত হইলাম।

রবি চন্দ্র গ্রহ তারা ঘুরিতেছে, কাল অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। শনৈশ্চর শনিগ্রহ বোধ করি ষাট বারেরও অধিক সূর্যমণ্ডলকে পরিক্রমণ করিল। তারপর একদিন আদেশ আসিল—ফিরিতে হইবে।

অদৃশ্য শক্তির প্রেরণায় চন্দ্রলোকে উপস্থিত হইলাম। সেখান হইতে সূক্ষ্ম চন্দ্রকর অবলম্বন করিয়া আলোকের বেগে ছুটিয়া চলিলাম।

পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিলাম। হরিৎবর্ণ বিপুল শস্য-প্রান্তর চন্দ্রকরে দুলিতেছে; পরমানন্দে তাহারই অঙ্গে মিলাইয়া গেলাম।

আমার সচেতন আত্মা কিন্তু অস্তিত্ব হারাইল না—একটি আনন্দের কণিকার মত জাগিয়া রহিল।

তারপর এক অন্ধকারলোকে প্রবেশ করিলাম। স্থাণুর মত নিশ্চল, আত্মস্থ—কিন্তু আনন্দময়।

সহসা একদিন এই যোগনিদ্রা ভাঙিয়া গেল। ব্যথা অনুভব করিলাম; দেহানুভূতির যে যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়াছিলাম তাহাই নূতন করিয়া আমাকে বিদ্ধ করিল!

যন্ত্রণা বাড়িতে লাগিল; সেই শ্বাসরোধকর কারাকূপের ব্যাকুল যন্ত্রণা! তারপর আমার কণ্ঠ বিদীর্ণ করিয়া এই যন্ত্রণা অভিব্যক্তি লাভ করিল—তীক্ষ্ণ ক্রন্দনের সুরে।

পাশের ঘর হইতে জলদমন্দ্র শব্দ শুনিলাম, 'লিখে রাখ, ৩রা চৈত্র রাত্রি ১টা ১৭ মিনিটে জন্ম।'

১৭ চৈত্র ১৩৪৩

মরু ও সঙ্ঘ

মধ্য-এশিয়ার দিক্‌সীমাহীন মরুভূমির মাঝখানে বালু ও বাতাসের খেলা। বিরামহীন অস্থির চঞ্চল খেলা। রাত্রি নাই, দিন নাই, সমগ্র মরুপ্রান্তর ব্যাপিয়া এই খেলা চলিতেছে।

খেলা বটে, কিন্তু নিষ্ঠুর খেলা; অবোধ শিশুর খেলার মত প্রাণের প্রতি মমতাহীন ক্রূর খেলা। ক্ষুদ্র মানুষের সৃষ্ট ক্ষুদ্র নিয়মের এখানে মূল্য নাই; জীবনের কোনও মূল্য নাই। দয়া করুণা এখানে আপন শক্তিহীন ক্ষুদ্রতায় ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

প্রকৃতির নিষ্ঠুরতায় কোনও বিধি-বিধান নাই। কখনও পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বায়ু ও বালুর দুর্লক্ষ্য ষড়যন্ত্রে একটি তৃণশ্যামল নির্ঝর-নিষিক্ত ওয়েসিস ধীরে ধীরে মরুভূমির জঠরস্থ হইতেছে; আবার কখনও একটি দিনের প্রচন্ড বালু-ঝটিকায় তেমনই শ্যামল লোকালয়পূর্ণ ওয়েসিস বালুস্তূপের গর্ভে সমাহিত হইতেছে। দূরে বহু দূরে হয়তো আর একটি নূতন ওয়েসিসের সূচনা হইতেছে। এমনই অর্থহীন প্রয়োজনহীন ধ্বংস ও সৃজনের লীলা নিরন্তর চলিতেছে।

এই মরু-সমুদ্রের মাঝখানে ক্ষুদ্র একটি হরিদ্বর্ণ দ্বীপ—একটি ওয়েসিস। দূর হইতে দেখিলে মনে হয়, তৃষ্ণাদীর্ণ ধূসর বালুপ্রান্তরের উপর এক বিন্দু নিবিড় শ্যামলতা আকাশ হইতে ঝরিয়া পড়িয়াছে। কাছে আসিলে দেখিতে পাওয়া যায়, শতহস্তব্যাসবিশিষ্ট একটি শষ্পাণ্ডিত স্থান কয়েকটি খর্জুর বৃক্ষের ধ্বজা উড়াইয়া এখনও মরুভূমির নির্দয় অবরোধ প্রত্যাহত করিতেছে। খর্জুর-ছায়ার অন্তরাল দিয়া একটি প্রস্তরনির্মিত সঙ্ঘারামের অর্ধপ্রোথিত ঊর্ধ্বাঙ্গ দেখা যায়। মধ্য-এশিয়ার মরুভূমিতে প্রাকৃতিক নির্মমতার কেন্দ্রস্থলে মহাকারুণিক বুদ্ধ তথাগতের সঙ্ঘারাম মাথা জাগাইয়া আছে।

একদিন এই স্থান জনকোলাহলমুখরিত সমৃদ্ধ জনপদ ছিল—দশ ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া নগর হাট উদ্যান চৈত্য বিরাজিত ছিল। শত ক্রোশ দূর হইতে সার্থবাহ বণিক উষ্ট্রপৃষ্ঠে পণ্য লইয়া মরুবালুকার উপর কঙ্কাল-চিহ্নিত পথ ধরিয়া এখানে উপস্থিত হইত। ক্ষুদ্র রাজ্যে একজন ক্ষুদ্র শাসনকর্তাও ছিল; কিন্তু এখন আর কিছু নাই। এমন কি, যে কঙ্কালশ্রেণী মরুপথে বহির্জগতের সহিত সংযোগ রক্ষা করিত, তাহাও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কিঞ্চিদূন পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বালু ও বাতাস এই স্থানটিকে লইয়া নৃশংস খেয়ালের খেলা আরম্ভ করিয়াছিল। মরু এবং ওয়েসিসের সীমান্ত চিহ্নিত করিয়া খর্জুর বৃক্ষের সারি চক্রাকার প্রাকারের মত ওয়েসিসকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে; এই সীমান্তভূমির উপর সূক্ষ্ম বালুকার পলি পড়িতে লাগিল। কেহ লক্ষ্য করিল না। দুই-তিন বৎসর কাটিল। সহসা একদিন একটি উৎসের জলধারা শুকাইয়া গেল। লক্ষ্য করিলেও কেহ গ্রাহ্য করিল না। আরও অনেক উৎস আছে।

দশ বৎসর কাটিল। তার পর একদিন সকলে সত্রাসে হৃদয়ঙ্গম করিল—ওয়েসিস সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে; অলক্ষিতে মরুভূমি অনেকখানি সীমানা গ্রাস করিয়া লইয়াছে।

অতঃপর ফাঁসীর দড়ি যে-ভাবে ধীরে ধীরে কণ্ঠ চাপিয়া প্রাণবায়ু রোধ করিয়া ধরে, তেমনই ভাবে মরুভূমি ওয়েসিসকে চারিদিক হইতে চাপিয়া ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর

করিয়া আনিতে লাগিল। প্রথমে আহার্য-পানীয়ের অপ্রতুলতা, তার পর বসবাসের স্থানাভাব হইল। যাহারা পারিল পলায়ন করিল; উষ্ট্র-গর্দভপৃষ্ঠে যথাসম্ভব ধনসম্পত্তি লইয়া অন্য বাসস্থানের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। যাহারা তাহা পারিল না, তাহারা শঙ্কাকুলচিত্তে মরুর পানে তাকাইয়া অনিবার্য পরিসমাপ্তির জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। জনপদের জনসংখ্যা অর্ধেকেরও অধিক কমিয়া গেল।

মরুভূমির ত্বরা নাই, ব্যস্ততা নাই। নাগ-কবলিত ভেকের ন্যায় ওয়েসিস অল্পে অল্পে মরুর জঠরস্থ হইতে লাগিল।

এক পুরুষ কাটিয়া গেল। যাহারা যুবক ছিল তাহারা এই অনির্বাণ আতঙ্ক বুকে লইয়া বৃদ্ধ হইল। কিন্তু সৃষ্টির বিরতি নাই; ধ্বংসের করাল ছায়ার তলে নবতর সৃষ্টি জন্মগ্রহণ করিয়া বর্ধিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

একদিন গ্রীষ্মের তাম্রতপ্ত দ্বিপ্রহরে দিগন্তরাল হইতে কৃষ্ণবর্ণ আঁধি উঠিয়া আসিল। মরুভূমির এই আঁধির সহিত তুলনা করিতে পারি পৃথিবীতে এমন কিছু নাই। মহাপ্রলয়ের দিনে শুষ্ক জীর্ণ পৃথিবী বোধ হয় এমনই উন্মত্ত বালু-ঝটিকার আবর্তে চূর্ণ হইয়া শূন্যে মিলাইয়া যাইবে।

দুই দিন পরে আকাশ পরিষ্কার হইয়া প্রখর সূর্য দেখা দিল। বিজয়িনী প্রকৃতির সগর্ব হাসির আলোয় ওয়েসিস উদ্ভাসিত হইল। দেখা গেল ওয়েসিস আর নাই, পর্বতপ্রমাণ বালুকার তলায় চাপা পড়িয়াছে; কেবল উচ্চ ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘারামের অর্ধনিমজ্জিত চূড়া ঘিরিয়া কয়েকটি খর্জুর বৃক্ষ শোকার্ত ভাবে দাঁড়াইয়া এই সমাধিস্থল পাহারা দিতেছে। মানুষের চিহ্নমাত্র কোথাও নাই।

দ্বিপ্রহরে সঙ্ঘের উপরিতলের একটি বালু-সমাহিত গবাক্ষ হইতে অতি কষ্টে বালুকা সরাইয়া বিবরবাসী সরীসৃপের ন্যায় দুইটি প্রাণী বাহির হইল। মানুষই বটে; একজন বৃদ্ধ, দ্বিতীয়টি বলিষ্ঠদেহ যুবা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যুবা বৃদ্ধকে টানিয়া বাহির করিয়া আনিল। তার পরে উভয়ে বহুক্ষণ গবাক্ষের বাহিরে বালুর উপর পড়িয়া দীর্ঘ শিহরিত প্রশ্বাসে মুক্ত আকাশের প্রাণদায়ী বায়ু গ্রহণ করিতে লাগিল। ক্রমে তাহাদের তৃষ্ণা-বিদীর্ণ অধরোষ্ঠে কালিমালিপ্ত মুখে মানুষী ভাব ফিরিয়া আসিল। চিনিবার মত কেহ থাকিলে চিনিতে পারিত, একজন সঙ্ঘ-স্থবির পিথুমিত্ত, দ্বিতীয় ভিক্ষু উচন্ড। বালু-ঝটিকা আরম্ভ হইবার সময় সঙ্ঘের অন্যান্য সকলেই ভীত হইয়া বাহিরে আসিয়াছিল, তাহারা কেহ বাঁচে নাই; কেবল এই দুই জন সঙ্ঘের দ্বিতলস্থ পরিবেণে অবরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, দৈবাক্রমে রক্ষা পাইয়াছেন।

বালুকার স্তূপ ঢালু হইয়া সঙ্ঘের গাত্র হইতে নামিয়া গিয়াছে। উভয়ের বায়ু-ক্ষুধা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে তাঁহারা টলিতে টলিতে নিম্নাভিমুখে অবতরণ করিতে লাগিলেন। বাঁচিতে হইলে জল চাই। সঙ্ঘের পাদমূলে খর্জুরকুঞ্জের মধ্যে একটি প্রস্তর-গুহা হইতে প্রস্রবণ নির্গত হইত, সেখানে দুই জনে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, প্রস্রবণের মুখ বুজিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু বালুবদ্ধ উৎসের স্বতঃপ্রবাহ রোধ করিতে পারে নাই; গুহামুখের বালুকা সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। আরও দেখিলেন, সেই সিক্ত সিকতার উপর—দুইটি মানবশিশু। প্রথমটি পাঁচ-ছয় বৎসরের বালক, নিদ্রিত অথবা মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে; তাহার মেরুসংলগ্ন জঠর ধীরে ধীরে উঠিতেছে পড়িতেছে! দ্বিতীয়টি অনুমান দেড় বৎসরের একটি বালিকা। শুভ্র নগ্নদেহে একাকিনী খেলা করিতেছে, খর্জুর বৃক্ষের চ্যুত পক্ক ফল কুড়াইয়া খাইতেছে, আর নীল নেত্র মেলিয়া আপন মনে কলস্বরে হাসিতেছে। মৃত বা জীবিত আর কেহ কোথাও নাই। প্রকৃতির দুরবগাহ রহস্য। প্রভঞ্জনের ধ্বংস-তান্ডবের মধ্যে এই দুইটি সুকুমার জীবন-কণিকা

কি করিয়া রক্ষা পাইল?

দুই ভিক্ষু প্রথমে বালু খনন করিয়া জল বাহির করিলেন। এক দণ্ড কাল অঙ্গুলি সাহায্যে গুহামুখ খনন করিবার পর উৎসের পথ মুক্ত হইল—উভয়ে অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিলেন।

প্রচণ্ড সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছে—খর্জুর বৃক্ষের ছায়া পূর্ব-দিগন্তের দিকে দীর্ঘতর অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কোন্ অনাদি রহস্যের ইঙ্গিত জানাই-তেছে। সঙ্ঘ-স্থবির পিথুমিত্ত একবার এই সমাধিস্তূপের চারিদিকে চাহিলেন; ঊর্ধ্বে সঙ্ঘের বালু-মগ্ন শিখর, নিম্নে তরঙ্গায়িত বালুকারাশি দিক্‌প্রান্তে মিশিয়াছে। তাঁহার শীর্ণ গণ্ড বাহিয়া অশ্রুর দুইটি ধারা গড়াইয়া পড়িল। শিশু দুটিকে নিজ ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া স্খলিত কণ্ঠে বলিলেন, 'তথাগত!'

অতঃপর মরুভূমির একান্ত নির্জনতার মাঝখানে, বুদ্ধ তথাগতের সঙ্ঘ-ছায়ায় এই চারিটি মানবজীবনের ক্রিয়া আবার নূতন করিয়া আরম্ভ হইল। স্থবির পিথুমিত্ত বালকের নাম রাখিলেন নির্বাণ। বালিকার নাম হইল—ইতি।

মাধবী পৌর্ণমাসীর প্রভাতে স্থবির পিথুমিত্ত সঙ্ঘের এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া পাতিমোক্ষ পাঠ করিতেছিলেন। সঙ্ঘের একমাত্র শ্রমণ, ভিক্ষু উচণ্ড তাঁহার সম্মুখে মেরু-যষ্টি ঋজু করিয়া স্থির ভাবে বসিয়াছিলেন। শ্রোতা কেবল তিনিই।

দীর্ঘ পঞ্চদশ বৎসর উভয়ের দেহেই কাল-করাঙ্ক চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে। সঙ্ঘ-স্থবিরের বয়স এখন ন্যূনকল্পে সত্তর বৎসর। মুণ্ডিত মস্তকে মেদহীন চর্মের আবরণ-তলে করোটির আকৃতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, দেখিয়া শুষ্ক দাড়িম্বফলের ন্যায় মনে হয়। চক্ষুতারকা বর্ণহীন, দৃষ্টি নিষ্প্রভ—যেন মরুভূমির উষ্ণ নিশ্বাসে চোখের জ্যোতি নির্বাপিত হইয়াছে। তবু, এই জরা-বিশীর্ণ মূর্তির চারি পাশে জীবনব্যাপী সচ্চিন্তা ও শুচিতার মাধুর্য একটি সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় শ্রী রচনা করিয়া রাখিয়াছে। ত্রিতাপ তাঁহার চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

ভিক্ষু উচণ্ডেরও যৌবন আর নাই; বয়ঃক্রম অনুমান প'য়তাল্লিশ বৎসর। কিন্তু দেহ এখনও সবল ও দৃঢ়। সমান্তরালরেখা-চিহ্নিত ললাট-তটে ঘন রোমশ ভ্রূ দুই-একটি পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। চোখের দৃষ্টি কঠোর ও বৈরাগ্যব্যঞ্জক। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হয়, প্রকৃতির সহিত নিরন্তর যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও তিনি পরাভব স্বীকার করেন নাই; বিদ্রোহীর সদা-জাগ্রত যুযুৎসা তাঁহার ছিন্ন গলিত চীবর ভেদ করিয়া বাহির হইতেছে।

পাতিমোক্ষ পাঠ শেষ হইল। নিদান হইতে অধিকরণ শমথ পর্যন্ত বিবৃত করিয়া পরিশেষে স্থবির বলিলেন, 'হে মাননীয় ভিক্ষু, আপনার নিকট পারাজিক সংঘাদিশেষ প্রভৃতি ধর্ম আবৃত্তি করিলাম। শেষবার প্রশ্ন করিতেছি, যদি কোনও পাপ করিয়া থাকেন খ্যাপন করুন, আর যদি পাপ না করিয়া থাকেন, নীরব থাকুন।'

দীর্ঘ পাতিমোক্ষ পাঠ শুনিতে শুনিতে ভিক্ষু উচণ্ড বোধ করি আত্মস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, অথবা বিষয়ান্তরে তাঁহার মন সংক্রামিত হইয়াছিল; স্থবিরের শেষ জিজ্ঞাসা কর্ণে যাইতেই তিনি চকিত হইয়া একবার নিজের উভয় পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার ললাটের ভ্রূকুটি যেন ঈষৎ গভীরতর হইল। ওষ্ঠাধর দৃঢ়বদ্ধ করিয়া তিনি মৌন হইয়া রহিলেন।

স্থবির তখন কহিলেন, 'হে মাননীয় ভিক্ষু, আপনার মৌনভাব দেখিয়া জানিলাম

আপনি পরিশুদ্ধ আছেন।' মনে হইল এই বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন।

অনুষ্ঠান শেষ হইল।

দিবা তখনও প্রথম প্রহর অতীত হয় নাই। অলিন্দপথে তির্যক সূর্যরশ্মি প্রবেশ করিয়া কক্ষের ম্লান ছায়াচ্ছন্নতা দূরে করিয়াছে। উভয়ে এই তরুণ রবিকর অনুসরণ করিয়া বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। স্বর্ণাভ সিকতার পটভূমিকায় কয়েকটি আন্দোলিত খর্জুরশীর্ষ চোখে পড়িল।

উভয়ে গাত্রোত্থান করিলেন।

সহসা উচণ্ড কহিলেন, 'থের, একটি কথা আপনাকে বলিবার অভিলাষ করিয়াছি। নির্বাণকে উপসম্পদা দান করা কর্তব্য; তাহার বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইয়াছে।'

স্থবির উচণ্ডের মুখের পানে চাহিলেন, তার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, 'নির্বাণের যথার্থ বয়ঃক্রম বিংশ বর্ষ কি না তাহা আমরা জ্ঞাত নহি।'

উচণ্ডের কণ্ঠস্বরে ঈষৎ অধীরতা প্রকাশ পাইল, তিনি কহিলেন, 'এস্থলে অনুমানই যথেষ্ট।'

স্থবির ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন, 'নির্বাণ কি উপসম্পদা লইতে ইচ্ছুক?'

উচণ্ড কহিলেন, 'অবশ্য ইচ্ছুক। সঙ্ঘের উপাসকরূপে সে এত কাল আমার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। সঙ্ঘেই সে পালিত ও বর্ধিত, সংঘ ভিন্ন তাহার স্থান কোথায়?'

স্থবির আবার রবিকরোজ্জ্বল বহিঃপ্রকৃতির পানে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, শেষে বলিলেন, 'ভাল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাউক।' আবার মনে হইল একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

উচণ্ড তীক্ষ্ন চক্ষে স্থবিরের পানে চাহিলেন; একবার যেন কিছু বলিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই বাক্ সংযত করিয়া বলিলেন, 'উত্তম! তাহাকে আপনার নিকট ডাকিয়া আনিতেছি।' বলিয়া তিনি সঙ্ঘের বাহিরে চলিলেন।

গত পঞ্চদশ বৎসরে বিহারের বহিরাকৃতির কোনও পরিবর্তন হয় নাই, বালু-ঝটিকার পর যেমন অর্ধপ্রোথিত ছিল তেমনই আছে। যে বিরাট বালুস্তূপ তাহাকে আবৃত করিয়াছিল তাহা হইতে মুক্ত করা দুই জন মানুষের সাধ্য নয়। উপরিতলের কয়েকটি প্রকোষ্ঠ কোনক্রমে পরিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহাতেই ভিক্ষুদ্বয় শিশু দুইটিকে লইয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। সঙ্ঘের নিম্নতল চিরতরে অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

সংঘ হইতে অবতরণ করিয়া উচণ্ড খর্জুরকুঞ্জের দিকে চলিলেন।

খর্জুরকুঞ্জের ছায়ায় গুহানিঃসৃত প্রস্রবণের মন্দ স্রোত স্বচ্ছ ধারায় বহিয়া গিয়াছে। কাকচক্ষু জল, মাত্র বিতস্তিপ্রমাণ গভীর, নিম্নে বালুকার আকুঞ্চিত স্তর দেখা যাইতেছে।

গুহামুখের সন্নিকটে নির্বাণ অধোমুখে শয়ান হইয়া মৃদুপ্রবাহিত জলধারার প্রতি চাহিয়া ছিল, দুই বাহুর উপর চিবুক ন্যস্ত করিয়া অন্যমনে কি জানি চিন্তা করিতেছিল। খর্জুরশাখার রন্ধ্রচ্যুত এক ঝলক রৌদ্র তাহার পৃষ্ঠের উপর পড়িয়া তাহার স্বর্ণাভ দেহবর্ণকে মার্জিত ধাতুফলকের ন্যায় উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিল। ঋজু নাতিমাংসল দেহে কেবল একটি শুভ্র বহির্বাস, কটি হইতে জানু পর্যন্ত আবৃত। উন্মুক্ত স্কন্ধ বাহু ও বক্ষ দৃঢ় পেশীবদ্ধ। মস্তকের কৃষ্ণ কেশ সর্পশিশুর মত মুখমণ্ডলকে বেষ্টন করিয়া আছে। যৌবনের নবারুণ ঊষালোকে নির্বাণের দেহকান্তি দেখিয়া গ্রীক ভাস্করের রচিত ভাস্কর-দেবতার মূর্তি মনে পড়ে। কিন্তু তাহার মুখে ভাস্কর-দেবতার বিজয়দৃপ্ত গর্বের ব্যঞ্জনা নাই; নবযৌবনের স্বাভাবিক পৌরুষের সহিত চিৎ-শক্তির এক অপরূপ

করুণ মাধুর্য মিশিয়াছিল, গ্রীক ভাস্কর এই অপূর্ব সংমিশ্রণ পরিকল্পনা করিতে পারিতেন না।

প্রস্রবণের দিকে চাহিয়া নির্বাণ চিন্তা করিতেছিল। কি গহন দুরবগাহ তাহার চিন্তা সে নিজেই জানে না। নিষ্পলক দৃষ্টি অগভীর জলের স্তর ভেদ করিয়া নিম্নে, আরও নিম্নে, পৃথিবীর কেন্দ্রগুহায় যেখানে কেবল নিরাসক্ত প্রাণধর্মের ক্রিয়া চলিতেছে—বোধ করি সেইখানেই উপনীত হইয়াছিল। বহিঃপ্রকৃতির প্রতি তাহার মন ছিল না। কিন্তু তথাপি, এই অন্তর্মুখী তন্ময়তার মধ্যেও তাহার চক্ষু এবং শ্রবণেন্দ্রিয় অলক্ষিতে সতর্ক উৎকর্ণ হইয়া ছিল।

সহসা তাহার বক্ষ বিস্ফারিত করিয়া একটা গভীর নিশ্বাস নির্গত হইল।

কিছু দিন যাবৎ নির্বাণের মনে এক ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। যাহারা শিশুকাল হইতে একসঙ্গে বর্ধিত হয়, তাহাদের মনে পরস্পর সম্বন্ধে প্রায় কোনও মোহ থাকে না; নির্বাণের মনেও ইতি সম্বন্ধে মোহ ছিল না। বরং ইতি স্ত্রীসুলভ নমনীয়তায় নির্বাণকে পুরুষত্ব ও বয়োজ্যেষ্ঠতার মর্যাদা দিয়া সসম্ভ্রমে তাহার পিছন পিছন ঘুরিয়াছে। দুজনে কলহ করিয়াছে, আবার গলা জড়াজড়ি করিয়া খেলা করিয়াছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ইতির দেহে যৌবনের মুকুলোদ্গম হইয়াছে, আয়ত নীল চোখে সৃষ্টির অনাদি কুহক ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু নির্বাণের মনে ভাবান্তর আসে নাই। ইতি যে নারী এ অনুভূতি তাহার অন্তরকে স্পর্শ করে নাই। এই ভাবে পঞ্চদশ বর্ষ কাটিয়াছে। তারপর সহসা একদিন নির্বাণের মনের কৌমার্য পরিণত ফলের প্রান্ত হইতে শীর্ণ পুষ্পদলের মত খসিয়া গেল।

সেদিন দ্বিপ্রহরে নির্বাণ একাকী খর্জুরকুঞ্জে দাঁড়াইয়া ঊর্ধ্বমুখে একটা ভ্রমরের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেছিল। ভ্রমরটা প্রতি বৎসর এই সময় কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়, বহু দূরান্তর হইতে বোধ হয় বাতাসের মুখে বার্তা পায়—মরুর খর্জুর-শাখায় ফুল ধরিয়াছে। কৃষ্ণকায় ভ্রমর, পাখায় রামধনুর বর্ণ; সে গভীর গুঞ্জন করিয়া এক পুষ্পমঞ্জরী হইতে অন্য পুষ্পমঞ্জরীতে উড়িয়া যাইতেছে, নিঃশব্দে পুষ্পপাত্রে সঞ্চিত রস পান করিতেছে, আবার উড়িয়া যাইতেছে। নির্বাণ উজ্জ্বল কৌতূহলী চক্ষে মুগ্ধ হইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল।

সহসা ইতি পিছন হইতে আসিয়া দুই বাহু দ্বারা নির্বাণের গলা জড়াইয়া ধরিল; উত্তেজনা-সংহত স্বরে তাহার কর্ণে বলিল, 'নির্বাণ, একটা জিনিস দেখিবে?'

ইতি স্বচ্ছন্দচারিণী, মরুভূমির যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়ায়; কোথায় বালুর তলে শাখাপত্র-হীন মূল বা কন্দ লুক্কায়িত আছে, আহরণ করিয়া আনে। মরুর নিষ্প্রাণ বক্ষে যাহা কাহারও চক্ষে পড়ে না, তাহা ইতির চক্ষে পড়ে।

নির্বাণ ভ্রমরের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বলিল, 'কি?'

ইতি দুই হস্তে সবলে তাহার মুখ নিজের দিকে ফিরাইল, বলিল, 'এস, দেখিবে এস।' বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া শবরীর মত নিঃশব্দ পদে লইয়া চলিল। নির্বাণ দেখিল, আনন্দ-উদ্দীপনায় তাহার দুই চক্ষু নৃত্য করিতেছে।

ওয়েসিসের সীমান্ত পার হইয়া তাহারা মরুভূমির উপর বহুদূর গমন করিল। মধ্যাকাশে জ্বলন্ত সূর্য, চারিদিকে কোটি কোটি বালুকণায় তাহার তেজ প্রতিফলিত হইতেছে। দুজনে নীরবে চলিয়াছে, মাঝে মাঝে ইতি নির্বাণের মুখের পানে প্রোজ্জ্বল চক্ষু তুলিয়া চুপি চুপি দু-একটি কথা বলিতেছে—যেন জোরে কথা বলিলেই তাহার রহস্যময় দ্রষ্টব্য বস্তু মায়ামৃগের ন্যায় মুহূর্তে অন্তর্হিত হইবে।

প্রায় এক ক্রোশেরও অধিক পথ চলিবার পর সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড বালিয়াড়ি

পড়িল। সেই বালিয়াড়ির কূর্মপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ঈতি দিগন্তের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, 'ঐ দেখ।'

অঙ্গুলির নির্দেশ অনুসরণ করিয়া নির্বাণ সহসা বিস্ময়ে নিস্পন্দ হইয়া গেল। দূরে দিগন্তরেখা যেখানে আকাশে মিশিয়াছে সেইখানে একটি হরিদ্বর্ণ উদ্যান—শ্যামল তরুশ্রেণী বাতাসে আন্দোলিত হইতেছে, তৃণপূর্ণ প্রান্তরে মেষ-ছাগ চরিতেছে; এমন কি, আকাশে নানা আকৃতির পাখি উড়িতেছে, তাহাদের ক্ষুদ্র দেহ সঞ্চরমান বিন্দুর মত দেখা যাইতেছে। একটি নদী এই নয়নাভিরাম শ্যামলতার বুক চিরিয়া খরধার তরবারির মত পড়িয়া আছে।

বিস্ময়ের প্রথম অভিভূতির পর প্রতিক্রিয়া আসিল, নির্বাণ উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। ঈতি অপেক্ষা তাহার জ্ঞান বেশী।

ঈতি কিন্তু উত্তেজনার আতিশয্যে নির্বাণের গলা বাহুবেষ্টিত করিয়া প্রায় ঝুলিয়া পড়িল, মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, 'দেখিতেছ? নির্বাণ, দেখিতেছ? কি সুন্দর! চল, আমরা দুইজনে ঐখানে চলিয়া যাই। আর কেহ থাকিবে না, শুধু তুমি আর আমি।—চল, চল নির্বাণ!'

স্মিতমুখে নির্বাণ তাহার পানে চাহিল। ঈতির পলাশরক্ত অধর নির্বাণের এত নিকটে আসিয়াছিল যে, কিছু না বুঝিয়াই সে নিজ অধর দিয়া তাহা স্পর্শ করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠিল। দেহের অভ্যন্তর হইতে স্নায়ুর সীমান্ত পর্যন্ত একটা অনির্বচনীয় তীক্ষ্ণ অনুভূতি অসহ্য হর্ষ-বেদনায় তাহাকে নিপীড়িত করিয়া তুলিল। সে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

প্রথম চুম্বনের স্পর্শে ঈতি দংশনোদ্যতা সর্পিণীর মত গ্রীবা পশ্চাতে আকর্ষণ করিয়া নির্বাণের মুখের পানে চাহিল। মনে হইল তাহার নীল নেত্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ হইতেছে। ক্ষণকাল এইভাবে থাকিয়া সে দুরন্ত ঝড়ের মত আবার নির্বাণের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। একবার দুইবার, অগণিত বার নির্বাণের অধর চুম্বন করিতে করিতে অবশেষে যেন নিজের দুর্জয় আবেগের নিকট পরাজিত হইয়া শিথিল দেহে অবনত মুখে বালুর উপর বসিয়া পড়িল। শ্রান্ত ঝড়ের অবসন্ন আক্ষেপের মত তাহার বক্ষ হইতে এক প্রকার অবরুদ্ধ আর্তশ্বাস বাহির হইতে লাগিল।

নির্বাণও জানু মুড়িয়া তাহার পাশে বসিয়া পড়িল। অকস্মাৎ এ কি হইয়া গেল! এই অজ্ঞাতপূর্ব অচিন্তনীয় আবির্ভাবের সম্মুখে উভয়ে যেন বিমূঢ় হইয়া রহিল।

বহুক্ষণ দুইজনে এই ভাবে অগ্নিবর্ষী আকাশের তলে বসিয়া রহিল। তারপর শুষ্ক তপ্ত চক্ষু তুলিয়া দিগন্তের পানে চাহিল। শ্যামল উপবন তখন অদৃশ্য হইয়াছে।

অস্ফুট স্বরে নির্বাণ বলিল, 'মরীচিকা।'

সেই দিন হইতে নির্বাণের সহিত ঈতির সহজ সরল সখ্যের অবসান হইল; নির্বাণ যেন ঈতিকে ভয় করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। তাহাকে দূর হইতে দেখিয়া সে সঙ্কুচিত হইয়া উঠে, তাহার সহিত কথা বলিতে রসনা জড়িত হয়, মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠে; অথচ অন্তরের অন্তস্তল হইতে একটা দুর্নিবার আকর্ষণ তাহাকে ঈতির দিকে টানিতে থাকে। ঈতির তপ্ত কোমল অধর স্পর্শের স্মৃতি মাদক সুরার মত তাহার চিত্তকে বিশৃঙ্খল করিয়া তোলে। সে এই সর্বগ্রাসী মোহের আক্রমণ হইতে দূরে নির্জনে পলায়ন করিতে চায়।

ঈতির মনোভাব কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত; এত দিন সে নির্বাণের খেলার সাথী ছিল, অনুজা সখী ছিল, আজ বিপুল নারীত্বের সঙ্গে সঙ্গে সে নির্বাণকেও যেন সম্পূর্ণ

নিজস্ব ভাবে পাইয়াছে। নির্বাণ তাহারই, আর কাহারও নয়—নিজ অধর, দেহ, নারীত্বের নিষ্ক্রয়ে সে নির্বাণকে আপন করিয়া লইয়াছে। এই চূড়ান্ত দাবির কাছে পৃথিবীর অন্য সমস্ত দাবী মাথা নীচু করিয়া থাকিবে।

তাহার আচরণে, এমন কি চাহনিতে ও দেহভঙ্গিমায় এই অবিসম্বাদী অধিকারের গর্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। নারী ও পুরুষের প্রভেদ বোধ করি এইখানে।

ইহাদের অন্তরের এই বিপ্লব অন্য দুইজনের কাছেও গোপন রহিল না। মনুষ্য-সমাজে যাহা লজ্জা নামে পরিচিত তাহা ইতি কোনও দিন শিখে নাই, তাই তাহার মনের কথাটি কুণ্ঠাহীন অলজ্জিত আনন্দে প্রকাশ পাইল। পিথুমিত্ত ও উচণ্ড সব দেখিলেন, বুঝিলেন। স্থবিরের বর্ণহীন চক্ষু করুণায় নিষিক্ত হইয়া উঠিল; এত দিন যাহা আশঙ্কিত সম্ভাবনা ছিল, আজ তাহা সত্য হইয়া উঠিয়াছে। হায় তথাগত, সঙ্ঘের বৈরাগ্যভস্মের মাঝখানে এ কোন ভঙ্গুর সুকুমার পুষ্প ফুটাইয়া তুলিলে! ভিক্ষু উচণ্ডের কঠোর ললাটে কিন্তু আঁধির অন্ধকার পুঞ্জিত হইয়া উঠিল। তিনি অন্তরমধ্যে গর্জন করিতে লাগিলেন, 'মার প্রবেশ করিয়াছে! সঙ্ঘে মার প্রবেশ করিয়াছে!'

প্রথম দিন হইতেই ক্ষুদ্র মানবিকা ইতির প্রতি ভিক্ষু উচণ্ডের মনে একটা বিমুখতা জন্মিয়াছিল। ভিক্ষুর মনে ভেদজ্ঞান থাকিতে নাই; কিন্তু ভিক্ষু উচণ্ড নির্বাণকে কাছে টানিয়া লইলেন, ইতিকে দূরে দূরে রাখিলেন। নির্বাণ ধর্ম-বিষয়ে শিক্ষা পাইতে লাগিল, ইতি মরুবিহারিণী প্রকৃতিকন্যা হইয়া রহিল। ইতির দেহে যখন প্রথম যৌবন-লক্ষণ প্রকাশ পাইল, সর্বাগ্রে উচণ্ডই তাহা লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার বিমুখতা গভীর আক্রোশে পরিণত হইল; ভিক্ষুর নিপীড়িত ব্যর্থ যৌবন যেন ইতির মূর্তি ধরিয়া নিরন্তর তাঁহাকে কশাঘাত করিতে লাগিল। জর্জরিত উচণ্ডের মস্তিষ্কে সঙ্গীতের ধ্রুবপদের ন্যায় কেবল ধ্বনিত হইতে লাগিল—মার প্রবেশ করিয়াছে! মার প্রবেশ করিয়াছে!

নির্বাণের প্রতিও তাঁহার আচরণ কঠোর হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, ইতি সর্বদা নির্বাণের সঙ্গে ঘুরিতেছে, এক দণ্ড উভয়ে পৃথক থাকে না। তাঁহার বক্ষে অগ্নিশলাকা বিদ্ধ হইতে লাগিল। মার প্রবেশ করিয়াছে—ইতি নির্বাণকে প্রলুব্ধ করিবে! তার পর? বুদ্ধের সঙ্ঘ ব্যভিচারের আগার হইয়া উঠিবে? কখনও না—কখনও না! উচণ্ড নির্বাণকে সুকঠিন ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। মনে হইতে লাগিল তিনি নির্বাণকে উপলক্ষ করিয়া ভিক্ষু-জীবনের পরুষ নির্মমতা নূতন করিয়া সঙ্ঘে প্রবর্তন করিতেছেন।

নিগৃহীত নিপীড়িত আকাঙ্খা যখন বিকলাঙ্গ মূর্তিতে বাহির হইয়া আসে, তখন তাহার স্বরূপ সকলে চিনিতে পারে না। সঙ্ঘে সত্যই মার প্রবেশ করিয়াছিল—কিন্তু কাহার দুর্বলতার ছিদ্রপথে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা ভিক্ষু উচণ্ড জানিতে পারেন নাই।

মরুভূমির স্বল্পায়ু বসন্ত এই ভাবে নিঃশেষ হইয়া আসিল। ইতিমধ্যে নির্বাণ ও ইতির মনোভাব প্রকট হইয়া পড়িল। তখন একদিন মাধবী পূর্ণিমার প্রভাতে উচণ্ড নির্বাণকে উপসম্পদা দান করিয়া পরিপূর্ণ রূপে সঙ্ঘের নিয়মাধীন করিবার প্রস্তাব করিলেন।

প্রস্রবণের মুকুরোজ্জ্বল জলে একটি চঞ্চল ছায়া পড়িল। দিবাস্বপ্ন ভাঙিয়া নির্বাণ উঠিয়া বসিল; ইতি আসিতেছে।

ইতির দেহে একটি মাত্র শ্বেতবস্ত্র। পঞ্চ হস্ত পরিমিত একটি দুকুলপট্ট কটি ও নিতম্ব বেষ্টন করিয়া সম্মুখে বক্ষ আবরণপূর্বক গ্রীবার পশ্চাতে গ্রন্থিবদ্ধ রহিয়াছে;

স্কন্ধ ও বাহুমূল উন্মুক্ত। তাহার রুক্ষ কেশভার সংবৃত নহে, রৌদ্ররশ্মি পড়িয়া অংগারাবৃত অগ্নিশিখার ন্যায় আরক্ত প্রভা বিকীর্ণ করিতেছে।

লঘুপদে সংকীর্ণ পয়োধারা উল্লঙ্ঘন করিয়া ইতি নির্বাণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; মুষ্টিবন্ধ হস্ত পশ্চাতে রাখিয়া বলিল, 'চক্ষু মুদিত কর।'।

নির্বাণ চক্ষু মুদিত করিল।

'হাঁ কর।'

নির্বাণ মুদিত চক্ষে মুখ ব্যাদান করিল।

ইতি তাহার মুখে মুষ্টিধৃত গুবাক ফলের মত একটি ক্ষুদ্র দ্রব্য পুরিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার পাশে বসিয়া পড়িল, বলিল, 'এখন বল দেখি, কি খাইতেছ?'

নির্বাণ চিবাইতে চিবাইতে চক্ষু মেলিয়া বলিল, 'শর্করা-কন্দ। কোথায় পাইলে?'

ইতি তখন নির্বাণের গা ঘেঁষিয়া বসিয়া কোথায় শর্করা-কন্দ পাইল তাহা বলিতে আরম্ভ করিল। বালুর নিম্নে মাটি আছে, নানা জাতীয় বিচিত্র বীজকণা সেখানে গিয়া সঞ্চিত হয়। তারপর একদিন প্রকৃতির মন্ত্র-কুহকে অংকুরিত হইয়া আলোকের সন্ধানে ঊর্ধ্বে উঠিতে আরম্ভ করে। কেহ বালু ভেদ করিয়া উঠিতে পারে, কেহ পারে না। বালুকার গর্ভে তাহাদের ফল-কন্দ বর্ধিত হইয়া প্রচ্ছন্ন জীবন যাপন করে। কিন্তু ইতির চক্ষে আবরণ পড়ে নাই। সে দেখিতে পায়। বালু খুঁড়িয়া এই সব রস-পরিপুষ্ট স্বাদু উদ্ভিজ্জ হরণ করিয়া আনে। খর্জুর ভিন্ন যাহাদের অন্য খাদ্য নাই, তাহাদের মুখে ইহা অমৃততুল্য বোধ হয়।

সানন্দে চর্বণ করিতে করিতে নির্বাণ বলিল, 'তুমি খাও নাই?'

ইতির চক্ষু অর্ধনিমীলিত হইয়া আসিল, সে অধরোষ্ঠের একটি বিমর্ষ ভঙ্গিমা করিয়া বলিল, 'আর কোথায় পাইব? একটিমাত্র পাইয়াছিলাম।'

নির্বাণের চর্বণক্রিয়া বন্ধ হইল; সে ইতির প্রতি বিস্মিত চক্ষু ফিরাইল। ইতিও চক্ষু পাতিয়া পরম তৃপ্তিভরে নির্বাণের বিস্ময়বিমূঢ় মুখ ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিয়া লইল, তারপর কৌতুকবিগলিত কলহাস্য করিয়া তাহার কোলের উপর লুটাইয়া পড়িল।

নির্বাণ এতক্ষণ যেন আত্মবিস্মৃত ছিল, এখন বিদ্যুদাহতের মত চমকিয়া শিহরিয়া উঠিল। ঠিক এই সময় পশ্চাৎ হইতে বজ্রগম্ভীর আহ্বান আসিল—'নির্বাণ!'

প্রথমে নির্বাণের মনে হইল, এই ধ্বনি যেন তাহার মস্তিষ্কের মধ্যেই মন্দ্রিত হইয়াছে। তারপর সে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, মূর্তিমান তিরস্কারের ন্যায় ভিক্ষু উচণ্ড বক্ষ বাহুবদ্ধ করিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া আছেন।

সভয়ে অপরাধ-কুণ্ঠিত দেহে নির্বাণ উঠিয়া দাঁড়াইল। উচণ্ড অঙ্গারগর্ভ চক্ষু তাহার উপর স্থাপন করিয়া গভীর কণ্ঠে একবার বলিলেন, 'ধিক্!'

নির্বাণের মুখ হইতে সমস্ত রক্ত নামিয়া গিয়া মুখ মৃতের মত পাণ্ডুর হইয়া গেল। সে আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

উচণ্ড সঙ্ঘের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, 'যাও! স্থবির তোমাকে আহ্বান করিয়াছেন।'

যন্ত্রচালিতের ন্যায় নির্বাণ প্রস্থান করিল।

ইতি এতক্ষণ নির্বাক বিভিন্ন-ওষ্ঠাধরে ভূমির উপর বসিয়া ছিল, এখন বিস্ফারিত নেত্রে উচণ্ডের মুখের উপর নিবদ্ধ রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

নির্বাণ সঙ্ঘমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেলে উচণ্ড প্রজ্বলিত চক্ষু ইতির দিকে ফিরাইলেন, তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কর্কশ কণ্ঠে কহিলেন, 'স্কন্ধ আবৃত কর।'

ইতি চকিতে নিজ অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইল, তারপর আবার উচণ্ডের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে কণ্ঠলগ্ন বস্ত্র স্কন্ধের উপর প্রসারিত করিয়া দিল।

ভীষণ ভ্রূকুটি করিয়া উচণ্ড প্রশ্ন করিলেন, 'সঙ্ঘের অলিন্দ পরিষ্কৃত করিয়াছ?'

'হাঁ অজ্জ, করিয়াছি।'

'জল সঞ্চয় করিয়াছ?'

'হাঁ অজ্জ, করিয়াছি।'

'ফল সংগ্রহ করিয়াছ?'

'হাঁ অজ্জ, করিয়াছি।'

উচণ্ড অধর দংশন করিলেন। ইতিকে শাসনাধীনে আনা অসম্ভব—সে নারী, ভিক্ষুসঙ্ঘে ভিক্ষুণীর স্থান নাই। উচণ্ড তাহার সর্বাঙ্গে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দ্রুত সঙ্ঘের অভিমুখে চলিলেন। ইতি দুই চক্ষে দুর্জ্ঞেয় দৃষ্টি লইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

ওদিকে নির্বাণ স্থবিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া বলিল, 'বন্দে।'

স্থবির তাহার পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া স্নেহার্দ্রস্বরে আশীর্বচন করিলেন—'আরোগ্য।'

নির্বাণের অপরাধ-সঙ্কুচিত চিত্ত বোধ হয় স্থবিরের নিকট তীব্র ভর্ৎসনা প্রত্যাশা করিতেছিল, তাই তাঁহার স্নেহসিক্ত বচনে তাহার হৃদয় সহসা দ্রবীভূত হইয়া গেল, চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। সে স্থবিরের পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িল।

স্থবির তখন ধীরে ধীরে বলিলেন, 'নির্বাণ, তোমার উপাধ্যায়ের নিকট জানিতে পারিলাম তুমি উপসম্পদা গ্রহণে অভিলাষী। ইহা সত্য?'

নির্বাণ যেন কূল পাইল, অবরুদ্ধ স্বরে বলিল, 'হাঁ ভদন্ত, আমাকে উপসম্পদা দান করিয়া সঙ্ঘে গ্রহণ করুন।'

স্থবির কিছুকাল নীরব রহিলেন; তারপর বলিলেন, 'নির্বাণ, তুমি সদ্ধর্মে শিক্ষা লাভ করিয়াছ; সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে হইলে নশ্বর আসক্তি কামনা ত্যাগ করিয়া আসিতে হয়, ইহা নিশ্চয় তোমার অপরিজ্ঞাত নহে। সঙ্ঘের বিধি-বিধান অতি কঠোর, তুমি পালন করিতে পারিবে?'

এই সময় উচণ্ড প্রবেশ করিয়া নীরবে এক পার্শ্বে দাঁড়াইলেন; নির্বাণ অবনত মস্তকে বলিল, 'হাঁ ভদন্ত, পারিব।'

'না পারিলে পাতিমোক্ষ দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে—বিনয়পাঠে অবশ্য তাহা অবগত আছ?'

'আছি, ভদন্ত।'

স্থবির তখন করুণ বচনে বলিলেন, 'বৎস, ব্যাধতাড়িত পশু গুহার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে, ত্রিতাপক্লিষ্ট মানব নিষ্কৃতির কামনায় ধর্মের অনুরাগী হয়। বুদ্ধের সঙ্ঘ সেরূপ স্থান নহে। যাহার অন্তরে বৈরাগ্য এবং নির্বাণ-তৃষ্ণা জন্মিয়াছে সে-ই সঙ্ঘের অধিকারী। তুমি এই সকল বিচার করিয়া উত্তর দাও।'

গলদশ্রু নির্বাণ যুক্তকরে বলিল, 'আমি সঙ্ঘের আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি—সংঘং শরণং গচ্ছামি। আমাকে উপসম্পদা দান করুন।'

গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্থবির বলিলেন, 'বুদ্ধের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।'

জলদগম্ভীর স্বরে উচণ্ড প্রতিধ্বনি করিলেন, 'বুদ্ধের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।'

অতঃপর বিধিমত প্রশ্নোত্তরদানপূর্বক ভিক্ষাপাত্র ও ত্রি-চীবর ধারণ করিয়া কেশ

মুণ্ডিত করিয়া নির্বাণ ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করিল। সংসারে আর তাহার অধিকার রহিল না।

ভিক্ষু উচণ্ডই নির্বাণের আচার্য রহিলেন; নাম পরিবর্তন প্রয়োজন হইল না। ছায়া পরিমাপ ইত্যাদি বিধি সমাপ্ত হইবার পর উচণ্ড বিজয়োদ্ধত কণ্ঠে কহিলেন, 'বুদ্ধ জয়ী হইয়াছেন, মার পরাভূত হইয়াছে। ভিক্ষু, নিজ পরিবেণে গমন কর। অদ্য হইতে নারীর মুখদর্শন তোমার নিষিদ্ধ।'

নতনেত্রে নির্বাণ নিজ পরিবেণে প্রবেশ করিল।

স্থবির নিজ মনে বলিতে লাগিলেন, 'হে শাক্য, হে লোকজ্যেষ্ঠ, আমাদের ভ্রান্তি অপনোদন কর, অজ্ঞানমসী দূর কর, সম্যক্ দৃষ্টি দান কর—'

তিন দিন নির্বাণ নিজ পরিবেণ হইতে বাহির হইল না। আর ইতি! দেহবিচ্ছিন্ন ছায়ার মত সে সংঘভূমির উপর দিবারাত্র বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সংঘের প্রত্যেক অধিবাসীর পরিবেণ স্বতন্ত্র। সংঘারামের উপরিতলে যে-কয়টি প্রকোষ্ঠ ছিল তাহার একটিতে ইতি রাত্রিযাপন করিত; অলিন্দের অন্য প্রান্তে তিনটি বিভিন্ন কক্ষে নির্বাণ, উচণ্ড ও স্থবির বাস করিতেন। স্থবিরের অনুমতি ব্যতীত একের প্রকোষ্ঠে অন্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।

নির্বাণের সহিত ইতির আর সাক্ষাৎ হয় না। ইতি সংঘের কাজ করে, আর নানা অছিলায় নির্বাণের পরিবেণের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করে। কখনও দেখে, নির্বাণ পুঁথি লইয়া নিমগ্নচিত্তে অধ্যয়ন করিতেছে; কখনও বা দেখিতে পায়, উচণ্ড তাহাকে উপদেশ দিতেছেন। কদাচিৎ নির্বাণ গবাক্ষের বাহিরে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া চিন্তায় নিমজ্জিত হইয়া থাকে। ইতির পদশব্দে তাহার চেতনা হয় না। ইতি নিশ্বাস ফেলিয়া সরিয়া যায়।

ভিক্ষু উচণ্ডের মন কিন্তু শান্ত হইতেছে না; কোথাও যেন একটা মস্ত ভ্রান্তি রহিয়া গিয়াছে। নির্বাণ যতই কঠোর ভাবে নিজেকে নিগৃহীত করিয়া সংঘ-ধর্মে আত্মনিয়োগ করিতেছে, তাঁহার অন্তরে সংশয় ও দ্বন্দ্ব ততই মাথা তুলিতেছে। নির্বাণকে সংঘের শাসনে আবদ্ধ করিয়াও তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না—ইতি ও নির্বাণের মধ্য-স্থিত আকর্ষণ-রজ্জু দূরত্বের ফলে দৃঢ়তর হইল মাত্র। কুশাগ্রবৎ সূক্ষ্ম ঈর্ষা ক্রমশ কণ্টক হইয়া উচণ্ডকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলিল। আপন অজ্ঞাতে নির্বাণকে তিনি নিবিড় ভাবে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিলেন।

একদিন মধ্যরাত্রে চন্দ্রের আলোক গবাক্ষপথে নির্বাণের পরিবেণে প্রবেশ করিয়াছিল; অন্ধকার কক্ষে শুভ্র সূক্ষ্ম চীনাংশুকের মত এক খণ্ড জ্যোৎস্না যেন আকাশ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল। নির্বাণের চোখে নিদ্রা নাই, সে ঐ গবাক্ষের দিকে চাহিয়া ভূ-শয্যায় শয়ান ছিল।

নিস্তব্ধ রাত্রি; সংঘের কোথাও একটি শব্দ নাই। নির্বাণ নিঃশব্দে শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; তারপর ছায়ামূর্তির মত অলিন্দ উত্তীর্ণ হইয়া সংঘের বাহিরে উপস্থিত হইল।

খর্জুরকুঞ্জতলে জ্যোৎস্না-তরলিত স্বল্পান্ধকার যেন ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া রাখিয়াছে। ঊর্ধ্বে খর্জুরশাখা ক্বচিৎ তন্দ্রালস মর্মরধ্বনি করিতেছে, নিম্নে প্রস্রবণের উৎসমুখে উদ্গত জলের মৃদু কলশব্দ। চারি দিকে অপার মরুভূমির উপর চন্দ্ররশ্মির শীতল প্রলেপ। নির্বাণের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস পড়িল। এই দৃশ্য তাহার চিরপরিচিত; কিন্তু আজ আর ইহার সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই—সে বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে।

'নির্বাণ!'

প্রস্রবণের কলধ্বনির মতই মৃদু কণ্ঠস্বর। চমকিয়া নির্বাণ ফিরিয়া চাহিল। শুভ্র বালুকার উপর বায়ুতাড়িত কাশপুষ্পের ন্যায় ইতি তাহার পানে ছুটিয়া আসিতেছে। তাহার চরণ যেন মৃত্তিকা স্পর্শ করিতেছে না; চন্দ্রকরকুহেলির ভিতর দিয়া স্মিত-ক্ষুধিত মুখখানি অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

'না—না—না' দুই হস্তে চক্ষু আবৃত করিয়া নির্বাণ পলায়ন করিল। ঊর্ধ্বশ্বাসে নিজ পরিবেণে প্রবেশ করিয়া অধোমুখে ভূতলে পড়িয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল।

ফিরিবার সময় নির্বাণের পদপাত সম্পূর্ণ নিঃশব্দ হয় নাই; অন্য পরিবেণে আর একজনের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল।

পরদিন মধ্যরাত্রে আবার চন্দ্ররশ্মি নির্বাণের গবাক্ষ-পথে প্রবেশ করিয়া দুর্নিবার শক্তিতে বাহিরের পানে টানিতে লাগিল। নির্বাণ অনেকক্ষণ নিজের সহিত যুদ্ধ করিল —কিন্তু পারিল না। মোহগ্রস্তের মত খর্জুরছায়াতলে গিয়া দাঁড়াইল।

'নির্বাণ!'

ইতি তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আজ আর নির্বাণ পলাইল না; সমস্ত দেহের স্নায়ুপেশী কঠিন করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

'নির্বাণ, আর তুমি আমার সহিত কথা কহিবে না?'

নির্বাণ উত্তর দিল না; কে যেন তাহার কণ্ঠ দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়াছে।

ইতি সশঙ্ক লঘু হস্তে তাহার বাহু স্পর্শ করিল।

'নির্বাণ, আর তুমি আমার মুখ দেখিবে না?'

ইতির কণ্ঠস্বরে শক্তি নাই—ভাঙা ভাঙা অর্ধোচ্চারিত উক্তি। নির্বাণের স্নায়ু-কঠিন দেহ অল্প অল্প কাঁপিতে লাগিল।

'নির্বাণ, একবার আমার পানে চাও'—ইতি চিবুক ধরিয়া নির্বাণের মুখ ফিরাইবার চেষ্টা করিল।

স্নায়ুপেশীর নিরুদ্ধ বন্ধন সহসা যেন ছিঁড়িয়া গেল; জ্যা-মুক্ত ধনুর ন্যায় নির্বাণের উৎক্ষিপ্ত একটা বাহু ইতির মুখে গিয়া লাগিল। ইতি অস্ফুট একটা কাতরোক্তি করিয়া অধরের উপর হাত রাখিয়া বসিয়া পড়িল।

নির্বাণ ব্যাকুল চক্ষে একবার তাহার পানে চাহিল। তারপর—'না না—আমি ভিক্ষু—আমি ভিক্ষু—আমি ভিক্ষু—'

অন্ধের মত, উন্মাদের মত নির্বাণ সে স্থান ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

একজন অলক্ষিতে থাকিয়া এই দৃশ্য দেখিলেন। কিন্তু তাঁহার অশান্ত চিত্ত আশ্বস্ত না হইয়া আরও দুর্বার ক্রোধে আলোড়িত হইয়া উঠিল। মার পরাভূত হয় নাই। সঙ্ঘ অশুচি হইয়াছে। এ-পাপ দূর করিতে হইবে—নচেৎ বুদ্ধের ক্রোধানলে সঙ্ঘ ভস্মীভূত হইবে।

কৃষ্ণাপঞ্চমীর ক্ষীয়মাণ চন্দ্র প্রায় মধ্যগগন অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

রাত্রি শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই।

সঙ্ঘ নিস্তব্ধ, কোথাও কোনও শব্দ নাই; বুঝি ব্রাহ্মমুহূর্তের প্রতীক্ষায় নির্বাণ-সমাধিতে নিমগ্ন।

ভিক্ষু উচণ্ড স্থবিরের পরিবেণে প্রবেশ করিয়া অন্ধকারে গাত্রস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে জাগরিত করিলেন। সর্পশ্বাসবৎ স্বরে তাঁহার কর্ণে বলিলেন, 'আমার সঙ্গে আসুন।'

নিঃশব্দে দুইজনে ইতির প্রকোষ্ঠের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ম্লান তির্যক কাক-জ্যোৎস্না কক্ষের মসৃণ ভূমির উপর প্রতিফলিত হইতেছে। সেই অস্পষ্ট আলোকে স্থবির দেখিলেন, ইতি একটি উচ্চ পীঠিকার উপর বসিয়া আছে; আর, বেদীমূলে প্রণতি-রত উপাসকের ন্যায় নির্বাণ নতদেহে তাহার জানুর উপর মস্তক রাখিয়া স্থির হইয়া আছে। ইতির কটি হইতে ঊর্ধ্বাঙ্গ কেবল বিস্রস্ত কেশজাল দিয়া আবৃত; শুভ্র মর্মরে রচিত মূর্তির ন্যায় তাহার যৌবন-কঠিন দেহ সগর্বে উন্নত হইয়া আছে; আর দুই চক্ষু হইতে বিজয়িনীর নির্বোধ উল্লাস ও অশ্রু একসঙ্গে ক্ষরিত হইয়া পড়িতেছে।

স্থবির ডাকিলেন, 'নির্বাণ!'

নির্বাণ ত্বরিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। দ্বার-সম্মুখে পিথুমিত্তকে দেখিয়া তাঁহার পদ-প্রান্তে পতিত হইয়া রুদ্ধস্বরে কহিল, 'থের, আমি সঙ্ঘের ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছি। আমার যথোপযুক্ত দণ্ড বিধান করুন।'

স্থবির কম্পিত স্বরে কহিলেন, 'নির্বাণ, তোমার অপরাধ গুরু। কিন্তু আমার অপরাধ তোমার অপেক্ষাও অধিক। আমি সব জানিয়া-বুঝিয়াও তোমাকে সঙ্ঘে গ্রহণ করিয়াছিলাম বৎস!'

উচণ্ডের উগ্র কণ্ঠস্বরে স্থবিরের করুণাবাণী ডুবিয়া গেল, তিনি কহিলেন, 'থের, এই পতিত ভিক্ষু নিজমুখে পাপ খ্যাপন করিয়াছে, আমরাও স্বচক্ষে উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এখন পাতিমোক্ষ অনুসারে উহার দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারণ করুন।'

স্থবির কোনও কথাই উচ্চারণ করিতে পারিলেন না, অপরিসীম করুণায় তাঁহার অধর থর থর কাঁপিতে লাগিল।

উচণ্ড তখন কহিলেন, 'উত্তম, আমি এই ভিক্ষুর উপাধ্যায় ছিলাম, আমিই তাহার দণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করিতেছি। ভিক্ষু, তুমি পারাজিক ও সঙ্ঘাদিশেষ পাপে অপরাধী হইয়াছ, এই জন্য তুমি সঙ্ঘ হইতে বিচ্যুত হইলে। অদ্য হইতে সঙ্ঘের সীমাভুক্ত ভূমির উপর বাস করিবার অধিকার তোমার রহিল না; সঙ্ঘাধিকৃত খাদ্য বা পানীয়ে তোমার অধিকার রহিল না। ইহাই তোমার দণ্ড—বহিষ্কার! তুমি এবং তোমার পাপের অংশ-ভাগিনী বুদ্ধের পবিত্র সঙ্ঘভুক্তি হইতে নির্বাসিত হইলে।'

এই দণ্ডাদেশের ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা ধীরে ধীরে সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইল। ইহা মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু তবু কেহ কোনও কথা কহিল না। নির্বাণ নতমস্তকে সঙ্ঘের অমোঘ দণ্ডাজ্ঞা স্বীকার করিয়া লইল। স্থবিরও মৌন রহিলেন। শুধু, পঞ্চদশ বৎসর পূর্বে নির্বাণ ও ইতিকে কোলে টানিয়া লইয়া তাঁহার শীর্ণ গণ্ডে যে অশ্রুর ধারা নামিয়াছিল, এতদিন পরে আবার তাহা প্রবাহিত হইল।

উষালোক ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গে ইতি ও নির্বাণ সঙ্ঘ হইতে বিদায় লইল। সঙ্ঘের পাদমূলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া দুইজনে হাত-ধরাধরি করিয়া নিরুদ্দেশের পথে বাহির হইয়া পড়িল। কোথায় যাইতেছে তাহারা জানে না; এ যাত্রা কি ভাবে শেষ হইবে তাহাও অজ্ঞাত। কেবল, উভয়ের বাহু পরস্পর দৃঢ়নিবদ্ধ হইয়া আছে, দুস্তর মরু-পথের ইহাই একমাত্র পাথেয়।

যত দূর দেখা গেল, প্রাচীন নির্বাপিত চোখে স্থবির সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে সূর্য উঠিল, দূরে দুইটি কৃষ্ণ বিন্দু আলোকের ধাঁধায় মিলাইয়া গেল। স্থবির

ভাবিতে লাগিলেন, এই সূর্য মধ্যাকাশে উঠিবে; তৃষ্ণা-রাক্ষসী প্রতীক্ষা করিয়া আছে—

উচণ্ড আসিয়া স্থবিরের পাশে দাঁড়াইলেন, বলিলেন, 'থের, আপনাকে উপদেশ দিবার স্পর্ধা আমার নাই। কিন্তু গৃহীজনোচিত মমত্ব কি নির্বাণ-লিপ্সু ভিক্ষুর সমুচিত?'

স্থবির কহিলেন, 'উচণ্ড, অদৃষ্টবিড়ম্বিতের প্রতি করুণা ভিক্ষুর পক্ষে নিন্দনীয় নহে। শাক্য সকল জীবের প্রতি করুণা করিতে বলিয়াছেন।'

'সত্য। কিন্তু সেই মহাভিক্ষু শাক্যই পাপীর দণ্ডবিধান পাতিমোক্ষ সৃজন করিয়াছেন। দণ্ডবিধির মধ্যে করুণার স্থান কোথায়? থের, এই সঙ্ঘ কেবল বাস্তব পাষাণ দিয়া গঠিত নয়, ভিক্ষুগণের নির্মমত্বের কঠিনতর মর্মর পাষাণে নির্মিত। তাই সংসারের শত ক্লেদ-পঙ্কিলতার মধ্যে প্রকৃতির রুদ্র বিক্ষোভ উপেক্ষা করিয়া সঙ্ঘ আজিও অটল হইয়া আছে। সঙ্ঘের ভিত্তিমূল যদি করুণার অশ্রুপঙ্কে আর্দ্র হইয়া পড়ে, তবে ধর্ম কয় দিন থাকিবে? করুণার যূপকাষ্ঠে নীতির বলিদান কদাপি মহাভিক্ষুর অভিপ্রেত ছিল না।'

স্থবির দীর্ঘকাল উত্তর দিলেন না; তারপর ক্লিষ্টস্বরে কহিলেন, 'উচণ্ড, মহাভিক্ষুর অভিপ্রায় দুর্জ্ঞেয়। আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়াছে; কর্তব্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছি।'

উচণ্ড প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি কি মনে করেন, পাতিমোক্ষ-মতে ভিক্ষুর দণ্ডদান অনুচিত হইয়াছে?'

'জানি না। বুদ্ধের ইচ্ছা দুরধিগম্য।'

'পাতিমোক্ষ কি বুদ্ধের ইচ্ছা নয়!'

'তাহাও জানি না।'

উচণ্ড তখন দুই হস্ত ঊর্ধ্বে তুলিয়া আকাশ লক্ষ্য করিয়া গভীরকণ্ঠে বলিলেন, 'তবে বুদ্ধ নিজ ইচ্ছা জ্ঞাপন করুন। গোতম, তুমি আমাদের সংশয় নিরসন কর। তোমার অলৌকিক শক্তির বজ্রালোকে সত্য পথ দেখাইয়া দাও।'

সেইদিন মধ্যাহ্নে বাতাস সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল; কেবল প্রজ্বলিত বালুকার উপর হইতে এক প্রকার শিখাহীন অগ্নিবাষ্প নির্গত হইতে লাগিল। পঞ্চাগ্নি-পরিবেষ্টিত সঙ্ঘ যেন উগ্র তপস্যারত বিভূতিধূসর কাপালিকের ন্যায় এই বহ্নিশ্মশানে বসিয়া আছে। আকাশের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত কোথাও একটি পক্ষী উড়িতেছে না। শব্দ নাই। চতুর্দিকে যেন একটা রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা।

মধ্যাহ্ন বিগত হইল; খর্জুর বৃক্ষের ছায়া সভয়ে মূল ছাড়িয়া নির্গত হইবার উপক্রম করিল।

'থের!'

স্থবির অলিন্দে আসিয়া দাঁড়াইলেন। উচণ্ড নীরবে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিয়া দিক্‌প্রান্ত দেখাইলেন।

তাম্রতপ্ত আকাশের এক প্রান্তে চক্রবালরেখার উপর মুষ্টিপ্রমাণ কজ্জলমসী দেখা দিয়াছে। চিনিতে বিলম্ব হইল না। পঞ্চদশ বৎসর পূর্বে এমনই মসী-চিহ্ন আকাশের ললাটে দেখা গিয়াছিল।

ভয়ার্ত কণ্ঠে উচণ্ড কহিলেন, 'থের, আঁধি আসিতেছে!'

স্থবিরের অধর একটু নড়িল, 'বুদ্ধের ইচ্ছা! বুদ্ধের ইচ্ছা!'

উন্মত্তের ন্যায় স্থবিরের স্কন্ধ আলিঙ্গন করিয়া উচণ্ড কহিলেন, 'থের, তবে কি

আমি ভুল করিয়াছি? তবে কি আমার পাপেই আজ সঙ্ঘ ধ্বংস হইবে? ইহাই কি বুদ্ধের অলৌকিক ইঙ্গিত!'

দেখিতে দেখিতে আঁধি আসিয়া পড়িল। মরুভূমি ঝঞ্ঝাবিমথিত সমুদ্রের ন্যায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল; গাঢ় অন্ধকারে চতুর্দিক আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

এই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে স্থবিরের কণ্ঠে উচ্চারিত হইতে লাগিল—'তমসো মা জ্যোতির্গময়! তমসো মা জ্যোতির্গময়!'

উচণ্ড চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'আমি যাইব। তাহাদের ফিরাইয়া আনিব—তাহাদের ফিরাইয়া আনিব—' ক্ষিপ্তের মত তিনি অলিন্দ হইতে নিম্নে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন; ঝড়ের হাহারবে তাঁহার চীৎকার ডুবিয়া গেল।

বালু ও বাতাসের দুর্মদ দুরন্ত খেলা চলিতে লাগিল। পৃথিবী প্রলয়ান্ত অন্ধকারে ছাইয়া গিয়াছে। সঙ্ঘ নিমজ্জিত হইল।

স্থবিরের শীর্ণ প্রাচীন কণ্ঠ হইতে তখনও আকুল প্রার্থনা উচ্চারিত হইতেছে, 'হে শাক্য, হে লোকজ্যেষ্ঠ, হে গোতম, অন্তিমকালে আমাকে চক্ষু দাও। তমসো মা জ্যোতির্গময়—তমসো মা জ্যোতির্গময়—'

মানবজাতির শমন-ধৃত কণ্ঠ হইতে আজিও ঐ আর্ত বাণীই নিঃসৃত
১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৪৪

প্রা গ্‌ জ্যো তি ষ

আর্য দ্রাবিড় হূণ মোঙ্গল—প্রত্যেক মৌলিক জাতির জীবনেই একটা সময় আসে যেটাকে তাহার নবীন যৌবন বলা চলে; যখন তপ্ত যৌবনের দুর্দমনীয় অপরিণামদর্শিতায় তাহারা বহু অসম্ভব ও হাস্যকর প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে এবং শেষ পর্যন্ত সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া ছাড়ে।

যাহাদের আমরা আর্যজাতি বলিয়া জানি, তাহাদের জীবনে এই নবীন যৌবন আসিয়াছিল বোধ হয় কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধেরও আগে। পাঁজিপুঁথি তখনও জন্মগ্রহণ করে নাই; আকাশের গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য স্বেচ্ছামত নিশ্চিন্ত মনে স্ব-স্ব কক্ষায় পরিভ্রমণ করিত—

মানুষ তাহাদের গতিবিধি ও কার্যকলাপের উপর কড়া নজর রাখিতে আরম্ভ করে নাই।

আর্য বীরপুরুষগণ ভারতভূমিতে পদার্পণ করিয়া আদিম অনার্যদিগকে বিন্ধ্যাচলের পরপারে খেদাইয়া দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, উপরন্তু তাহাদের রাক্ষস পিশাচ দস্যু প্রভৃতি নাম দিয়া কটূক্তি করিতেছিলেন। মনে হয়, সে-যুগেও শত্রুর বিরুদ্ধে দুর্নাম রটাইবার প্রথা পুরাদস্তুর প্রচলিত ছিল।

তারপর একদা অগস্ত্য মুনি কতিপয় সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া দক্ষিণাপথে অগস্ত্যযাত্রা করিলেন, আর ফিরিলেন না। রাক্ষস ও পিশাচগণ তাঁহাকে কাঁচা ভক্ষণ করিল কিনা পুরাণে তাহার উল্লেখ নাই। যা হোক, তদবধি অন্যান্য আর্য বীরগণও বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণ দিকে উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিলেন।

দুইজন নবীন আর্য যোদ্ধা সৈন্যসামন্ত লইয়া দক্ষিণাপথে বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছিলেন এবং দেখিয়া-শুনিয়া খানিকটা উর্বর ভূভাগ হইতে কৃষ্ণকায় দস্যু-তস্করদের তাড়াইয়া স্বরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই আর্য বীরপুরুষ দুটির নাম—প্রদ্যুম্ন এবং মঘবা। উভয়ের মধ্যে প্রচন্ড বন্ধুত্ব।

আজকাল বন্ধুত্ব বস্তুটার তেমন তেজ নাই; ইয়ারকি দিবার জন্য বন্ধুকে প্রয়োজন হয়। সেকালে দস্যু ও রাক্ষস দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বন্ধুত্ব পুরামাত্রায় বিস্ফুরিত হইবার অবকাশ পাইত।

দুই বন্ধুর যৌথ বাহুবলে রাজ্য স্থাপিত হইল। কিন্তু প্রশ্ন উঠিল—রাজা হইবে কে?

প্রদ্যুম্ন কহিলেন, 'মঘবা, তুই রাজা হ, আমি সেনাপতি হইব।'

মঘবা কহিলেন, 'উঁহু, তুই রাজা হ—আমি সেনাপতি।'

সমস্যার সমাধান হইল না; বন্ধুকে বঞ্চিত করিয়া রাজা হইতে কেহই ব্যগ্র নয়। এদিকে নবলব্ধ রাজ্যটি এতই ক্ষুদ্র যে ভাগাভাগি করিতে গেলে কিছুই থাকে না, চটকস্য মাংসং হইয়া যায়। প্রজা ভাগাভাগি করিলেও শক্তিক্ষয় অনিবার্য—চারিদিকে শত্রু ওৎ পাতিয়া আছে। বন্ধুযুগল বড়ই ভাবিত হইয়া পড়িলেন।

একদিন রাত্রিকালে আকাশে গোলাকৃতি চন্দ্র শোভা পাইতেছিল—অর্থাৎ পূর্ণিমার রাত্রি। প্রস্তরনির্মিত উচ্চ দুর্গের চূড়ায় দুই বন্ধু চিন্তাকুঞ্চিত ললাটে অবস্থান করিতেছিলেন। দুর্গটা অবশ্য বিতাড়িত অনার্য দস্যুদের নির্মিত; আর্যেরা আদৌ দুর্গ নির্মাণ করিতে জানিতেন না। রামচন্দ্র লঙ্কায় রাবণের দুর্গ দেখিয়া একেবারে নির্বাক্ হইয়া গিয়াছিলেন।

মঘবা তাঁহার পিঙ্গলবর্ণ দাড়ির মধ্যে ঘন ঘন অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে মুক্ত ছাদে পায়চারি করিতেছিলেন। প্রকান্ড ষন্ডা চেহারা, নীল চক্ষু; মুদ্গরের মত দৃঢ় ও নিরেট দেহ। চিন্তা করার অভ্যাস তাঁহার বিশেষ ছিল না, তাই দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইলেই তিনি নিজের দাড়ি ধরিয়া টানাটানি করিতেন।

প্রদ্যুম্নের চেহারাখানা অপেক্ষাকৃত লঘু কিন্তু সমধিক নিরেট ও দৃঢ়। মাথায় সোনালী চুল, চোখের মণি গাঢ় নীল। দাড়ি নাই; গলা চুলকাইত বলিয়া তিনি তরবারির অগ্রভাগ দিয়া দাড়ি কামাইয়া ফেলিতেন। কেবল এক জোড়া সূক্ষ্ম গোঁফ ছিল। এই গোঁফে অঙ্গুলি বুলাইতে বুলাইতে প্রদ্যুম্ন প্রাচীর-বেষ্টনীতে ঠেস দিয়া চাঁদের পানে ভ্রূকুটি করিতেছিলেন।

চাঁদ কিন্তু হাসিতেছিল। তাহার যে গুরুতর বিপদ আসন্ন হইয়াছে, পঞ্জিকা না থাকায় সে তার পূর্বাভাস পায় নাই।

সহসা মঘবা বলিলেন, 'একটা মতলব মাথায় আসিয়াছে। প্রদ্যুম্ন, আয় পাঞ্জা লড়ি—যে হারিবে তাহাকেই রাজা হইতে হইবে।'

প্রদ্যুম্ন গোঁফের আড়ালে শ্লেষ হাস্য করিলেন, 'জুচ্চুরির মতলব। গত যুদ্ধে আমার কব্জি মচকাইয়া গিয়াছে জানিস কি না!'

ব্যর্থ হইয়া মঘবা আবার দাড়ি টানিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, 'দু-জনে রাজা হইলে দোষ কি?'

প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'দু-জনে রাজা হইলে কে কাহার হুকুম মানিবে? কে প্রজাদের হুকুম দিবে?'

'তা বটে।'

'তবে দু-জনে রাজা হওয়া যায়। পর পর।'

'সে কি রকম?'

'তুই কিছুদিন রাজা হইলি, আমি সেনাপতি। তারপর আমি রাজা হইলাম। এই আর কি।'

মঘবা ভাবিয়া বলিলেন, 'মন্দ কথা নয়। একদিন তুই রাজা, একদিন আমি।'

'উহুঁ, অত তাড়াতাড়ি রাজা বদল করিলে গণ্ডগোল বাধিবে।'

'গণ্ডগোল কিসের?'

'মনে কর, আমি রাজা হইয়া তোকে হুকুম দিলাম—সেনাপতি, শুনিয়াছি দক্ষিণে লম্বোদর নামক রাক্ষসদের রাজ্যে রসাল নামক এক প্রকার অতি সুন্দর ফল পাওয়া যায়, তুমি দ্রুত গিয়া ঐ ফল আহরণ করিয়া আন—আমার খাইবার ইচ্ছা হইয়াছে।—তুই ফল লইয়া ফিরিতে দিন কাবার হইয়া গেল, তুই রাজা হইলি আমি সেনাপতি বনিয়া গেলাম। তখন কে ফল খাইবে?'

মঘবা বলিলেন, 'তাই তো। বড়ই ফ্যাসাদ দেখিতেছি।'

মনে রাখিতে হইবে, আর্যগণ তখনও স্থির হইয়া বসিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা আরম্ভ করেন নাই; দু-একজন ঋষি হঠাৎ মন্ত্রদ্রষ্টা হইয়া চকিতে বিদ্যুৎরেখাবৎ এক-আধটা সূত্র উচ্চারণ করিয়া ফেলিতেন এই পর্যন্ত। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা—এইরূপ ঋতু পরিবর্তনের কথা মোটামুটি জানা থাকিলেও, সময়কে সপ্তাহ মাস বৎসরে বিভাজিত করিবার বুদ্ধি তখনও গজায় নাই।

সুতরাং প্রদ্যুম্ন ও মঘবা বড়ই ফাঁপরে পড়িয়া গেলেন।

ওদিকে আকাশে চন্দ্রও ফাঁপরে পড়িয়াছিল। প্রদ্যুম্ন তাহার প্রতি ভ্রূকুটি করিবার জন্য চোখ তুলিয়াই সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, 'আরে আরে, একি!'

মঘবাও দৃষ্টি উৎক্ষিপ্ত করিলেন। দেখিলেন, আকাশ নির্মেঘ, কিন্তু চন্দ্রের শুভ্র মুখের উপর ধূম্রবর্ণ ছায়া পড়িয়াছে; করাল ছায়া ধীরে ধীরে চন্দ্রকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিতেছে।

দুই বন্ধুর মনে সশঙ্ক উত্তেজনার উৎপত্তি হইল। ব্যাপারটা পূর্বে কয়েক বার দেখা থাকিলেও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক একটা প্রাকৃতিক ঘটনা বলিয়া সাব্যস্ত হয় নাই, ভূকম্পের মত অপ্রত্যাশিত একটা মহাদুর্যোগ বলিয়াই বিবেচিত হইত। মঘবা দ্রুত আসিয়া প্রদ্যুম্নের হাত চাপিয়া ধরিলেন, গাঢ় স্বরে ফিসফিস করিয়া বলিলেন, 'চন্দ্রগ্রহণ!'

প্রদ্যুম্ন পাংশুমুখে বন্ধুকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 'হাঁ, কিন্তু ভয় নাই। চাঁদ আবার মুক্ত হইবে।—ছেলেবেলায় বুড়া অঙ্গিরা ঋষির কাছে বিদ্যা শিখিতে কয়েক বার গিয়াছিলাম, বুড়া একদিন বলিয়াছিল আকাশে রাহু নামে একটা অদৃশ্য রাক্ষস আছে, সে মাঝে মাঝে চন্দ্র-সূর্যকে ধরিয়া গিলিয়া ফেলে। কিন্তু বেশীক্ষণ চাপিয়া রাখিতে পারে না।'

'হাঁ, আমিও চার-পাঁচ বার দেখিয়াছি।'

'আমিও। মাঝে মাঝে এরূপ ঘটিয়া থাকে।'

দুই বন্ধু হাত-ধরাধরি করিয়া দেখিতে লাগিলেন, বিপন্ন ম্রিয়মাণ চন্দ্র যেন একটা তাম্রবর্ণ অর্ধস্বচ্ছ অজগরের পেটের ভিতর দিয়া পশ্চাদভিমুখে চলিয়াছে। দুর্গের নিম্নে ভয়ার্ত জনগণ সমবেত হইয়া চীৎকার ও নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল। দুষ্ট রাক্ষসগণ নাকি এইরূপ বিকট শব্দ শুনিলে ভয় পাইয়া পলায়ন করে।

দীর্ঘকাল পরে চাঁদের একটি চক্‌চকে কোণ বাহির হইয়া পড়িল। তারপর দেখিতে দেখিতে চন্দ্র সম্পূর্ণ অক্ষত দেহে সহাস্য মুখে রাক্ষসের কবল হইতে নির্গত হইয়া আসিলেন।

সকলে ঊর্ধ্বস্বরে মহা আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। মঘবা প্রদ্যুম্নের হাত ছাড়িয়া দিয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'যাক বাঁচা গেল।'

প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'শুধু তাই নয়, আমাদের সমস্যারও সমাধান হইয়াছে।'

'কিরূপ?'

'শুন। আজ হইতে তুমি রাজা হইলে। আবার যখন চন্দ্রে গ্রহণ লাগিবে তখন তোমার রাজত্বকাল শেষ হইবে, আমি রাজা হইব। এই ভাবে চলিতে থাকিবে।'

মঘবা ভাবিয়া বলিলেন, 'মন্দ কথা নয়।—কিন্তু প্রথমেই আমি রাজা হইব কেন?'

'যেহেতু বুদ্ধিটা আমি বাহির করিয়াছি। এখন চলিলাম, কাল সকালে সৈন্যসামন্ত লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিব—সেনাপতির আর কাজ কি? মহারাজ ইতিমধ্যে অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন করিতে থাকুন। মহারাজের জয় হোক।'

মুচকি হাসিয়া প্রদ্যুম্ন দুর্গশিখর হইতে নামিবার উপক্রম করিলেন। মঘবা অত্যন্ত মুষড়িয়া পড়িয়া দাড়ি টানিতে লাগিলেন।

মঘবার মাথায় বড় বেশী বুদ্ধি খেলে না, কিন্তু এখন সহসা তাহার মস্তিষ্করন্ধ্রে রাজবুদ্ধির উদয় হইল। তিনি গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন, 'সেনাপতি প্রদ্যুম্ন!'

প্রদ্যুম্ন ফিরিয়া আসিয়া জোড়করে দাঁড়াইলেন।

'আজ্ঞা করুন মহারাজ।'

মহারাজ মঘবা মেঘমন্দ্র স্বরে বলিলেন, 'আজ্ঞা করিতেছি, কল্য প্রাতে আমি সৈন্য-সামন্ত লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিব। যত দিন না ফিরি, তুমি অপত্যনির্বিশেষে প্রজা পালন করিতে থাক। রাত্রি গভীর হইয়াছে, এবার আমি রাজশয্যায় শয়ন করিতে চলিলাম।'

মুচকি হাসি হাসিতে মঘবা অভ্যস্ত নহেন, প্রদ্যুম্নের প্রতি একবার চোখ টিপিয়া অট্টহাস্য করিতে করিতে তিনি প্রস্থান করিলেন।

বোকা বনিয়া গিয়া প্রদ্যুম্ন বাম কর্ণের পশ্চাদ্ভাগ চুলকাইতে লাগিলেন।

নবযৌবনের প্রধান ধর্ম এই যে, সে জীবনটাকে গাম্ভীর্যের চশমার ভিতর দিয়া দেখে না; জগৎ তাহার কাছে খেলার মাঠ; যুদ্ধ একটা সরস কৌতুক; প্রেম একটা মাদক উত্তেজনা।

মহারাজ মঘবা মহানন্দে অর্ধেক সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে চলিয়া গেলেন। রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে কোদণ্ড নামে এক অনার্য জাতি আছে, উদ্দেশ্য তাহাদের উৎপীড়ন করা।

আধুনিক গণনায় যে-সময়টাকে তিন মাস বলা চলে, অনুমান তত দিন পরে মঘবা যুদ্ধযাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার পিঙ্গল কেশ রুক্ষ, দেহে পশুচর্মের আবরণ

ছিন্নভিন্ন, মুখে পরিতৃপ্ত বাসনার হাসি।

আসিয়াই তিনি প্রদ্যুম্নের পৃষ্ঠে বজ্রসম চপেটাঘাত করিলেন। বলিলেন, 'কি রে, কেমন আছিস?'

দুই বন্ধু নিবিড় ভাবে আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন। প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'রোগা হইয়া গিয়াছিস দেখিতেছি; রাক্ষসদের মুল্লুকে কিছু খাইতে পাস নাই বুঝি?' তারপর আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলেন, 'মহারাজের জয় হউক। আর্যের সমস্ত সংবাদ শুভ?'

মঘবা বলিলেন, 'মন্দ নয়। কোদণ্ড ব্যাটাদের খুব ঠুকিয়াছি। শুধু তাই নয়, একটা মজার জিনিস আনিয়াছি, দেখাইব চল।'

বিজিত জাতির নিকট হইতে অপহৃত বহু বিচিত্র বস্তু এক দল সৈনিকের রক্ষণায় ছিল, মঘবা তাহাদের ইঙ্গিত করিয়া রাজভবন অভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে প্রদ্যুম্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তারপর, রাজ্য কেমন চলিতেছে? প্রজারা আনন্দে আছে?'

'প্রজাদের আনন্দ সম্প্রতি বিলক্ষণ বাড়িয়া গিয়াছে।'

'কিরূপ?'

'আর্য যোদ্ধৃগণের প্রাণে রসের সঞ্চার হইয়াছে। তাহারা অনার্য মেয়ে ধরিয়া আনিয়া পটাপট বিবাহ করিয়া ফেলিতেছে।'

মঘবা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন, 'তাই নাকি?—রোগ ছোঁয়াচে দেখিতেছি।'

প্রদ্যুম্ন মঘবার প্রতি বক্র কটাক্ষ করিলেন। মঘবা বলিলেন, 'কিন্তু উপায় কি? এই দেশেই যখন বসবাস করিতে হইবে, তখন আর্য রক্ত নিষ্কলুষ রাখা অসম্ভব। আর্যাবর্ত হইতে এত মেয়ে আমদানি করা চলে না, অথচ বংশরক্ষাও না করিলে নয়। এই যে রাজ্য জয় করিলাম—কাহাদের জন্য?'

প্রদ্যুম্ন শুধু বলিলেন, 'হুঁ।'

রাজা ও সেনাপতি মন্ত্রগৃহে গিয়া বসিলেন। সামন্ত সচিব শ্রেষ্ঠী বিদূষক কিছুই নাই, সুতরাং মন্ত্রণাগৃহ শূন্য। চারি জন সৈনিক একটা বৃহৎ বেত্র-নির্মিত পেটারি ধরাধরি করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে রাখিল। পেটারির মুখ ঢাকা, ভিতরে গুরুভার কোনও দ্রব্য আছে মনে হয়।

বিস্মিত প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'কি আছে ইহার মধ্যে? অজগর সাপ নাকি?'

মঘবা হস্তসঞ্চালনে সৈনিকদের বিদায় করিয়া হাসিতে হাসিতে পেটারির ঢাকা খুলিয়া দিলেন।

সাপুড়ের ঝাঁপি খোলা পাইয়া কৃষ্ণকায় সর্পী যেমন ফণা তুলিয়া দাঁড়ায়, তেমনই একটি নারী পেটারির মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার নীলাঞ্জন চোখে ধিকি ধিকি বিদ্যুৎ।

প্রদ্যুম্ন হতভম্ব হইয়া গেলেন। তাঁহার ব্যাদিত মুখ হইতে বাহির হইল, 'আরে একি! এ যে একটি মেয়ে।'

মঘবা অট্টহাস্য করিলেন; তারপর বলিলেন, 'কেমন মেয়ে? সুন্দর নয়?'

প্রদ্যুম্ন নীরবে বন্দিনীকে নিরীক্ষণ করিলেন। মার্জিত তাম্রফলকের ন্যায় দেহের বর্ণ; দলিতাঞ্জন দুটি চোখ, দলিতাঞ্জন চুল। বস্ত্র-অলঙ্কারের বাহুল্য নাই; গলায় একটি বীজের মালা, বাহুতে শঙ্খের অঙ্গদ; কবরী ও কর্ণে পুষ্পভূষা শুকাইয়া গিয়াছে। কটি হইতে জানু পর্যন্ত একটি বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত পট্টাংশু। কৃশাঙ্গী যুবতীর যৌবন-মেদুর দেহের অভ্যন্তর হইতে যেন কৃশানুর দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইতেছে।

মঘবা পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি মনে হয়? সুন্দর নয়?'

প্রদ্যুম্ন চমকিয়া মঘবার দিকে ফিরিলেন, তারপর ভর্ৎসনাপূর্ণ স্বরে বলিলেন, 'তুই

একটা আস্ত গোঁয়ার। যুদ্ধ করিতে গিয়া মেয়ে ধরিয়া আনিলি। এখন ইহাকে লইয়া কি করিবি?'

ইহাকে দিয়া যে দাসীকিঙ্করীর কাজ চলিবে না, তাহা একবার দৃষ্টি করিয়াই আর সংশয় থাকে না।

মঘবা বলিলেন, 'ঠিক করিয়াছি বিবাহ করিব।'

প্রদ্যুম্ন সচকিতে বলিলেন, 'বিবাহ!'

'হাঁ। ও কে জানিস? কোদণ্ডরাজার মেয়ে।'

প্রদ্যুম্নের মুখ সহসা গম্ভীর হইল। মঘবা বলিতে লাগিলেন, 'কোদণ্ডদের রাজপুরী দখল করিয়া দেখিলাম সকলে পলাইয়াছে, কেবল মেয়েটা একা দাঁড়াইয়া আছে। ভারি ভাল লাগিল। ওকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিল না। তাই পেটারি বন্ধ করিয়া সঙ্গে আনিয়াছি। আর্য রাজার মহিষী হইবার যোগ্য মেয়ে বটে; কিন্তু উহাকে আগে আর্যভাষা শিখাইতে হইবে। তারপর আমার পট্টমহিষী করিব।'

প্রদ্যুম্ন আর একবার যুবতীর পানে ফিরিয়া দেখিলেন। সে তাহাদের কথাবার্তার মর্ম কিছুই বুঝিতে পারে নাই; কেবল তাহার চোখ দুটি একের মুখ হইতে অন্যের মুখে যাতায়াত করিতেছে। তাহার মুখে ভয় বা আশঙ্কার চিহ্ন কিছুই নাই; আছে কেবল এই বর্বরদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে ঘৃণাপূর্ণ গর্বিত জিজ্ঞাসা।

ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া প্রদ্যুম্ন মঘবার দিকে ফিরিলেন, 'অন্যায় করিয়াছ মঘবা। হাজার হোক রাজার মেয়ে, তাহাকে এ ভাবে ধরিয়া আনা আর্য শিষ্টতা হয় নাই।'

মঘবা বলিলেন, 'বিবাহ করিবার জন্য কন্যা হরণ করিলে আর্য শিষ্টতা লঙ্ঘন হয় না।'

'হয়। অরক্ষিতা মেয়েকে ধরিয়া আনা তস্করের কাজ। এই দণ্ডে এই কন্যাকে ফেরত পাঠানো উচিত।'

তপ্তকণ্ঠে মঘবা বলিলেন, 'কখনই না—!' তারপর আত্মসম্বরণ করিয়া অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরে বলিলেন, 'আমি মহারাজ মঘবা, তোমাকে আদেশ করিতেছি, সেনাপতি প্রদ্যুম্ন, তুমি এই কন্যার যোগ্য বাসস্থানের ব্যবস্থা কর—যাহাতে সুখে থাকে অথচ পলাইতে না পারে।—মনে থাকে যেন, কন্যা পলাইলে দায়িত্ব তোমার।'

প্রদ্যুম্ন একবার কয়েক মুহূর্তের জন্য বন্ধুর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর যুক্তকরে মস্তক অবনত করিয়া শুষ্কস্বরে কহিলেন, 'মহারাজের যেরূপ অভিরুচি।'

দুর্গচূড়ার কূটকক্ষে ভাবী রাজমহিষীর বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। কোদণ্ড-কন্যা দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধরে অকম্পিত পদে দুর্গ-শীর্ষের কারাগারে প্রবেশ করিলেন। কার্যতঃ কারাগার হইলেও স্থানটি প্রশস্ত অলিন্দযুক্ত একটি মহল। সকল সুবিধাই আছে, শুধু পলাইবার অসুবিধা।

মঘবা সহর্ষে প্রদ্যুম্নের পৃষ্ঠে একটি মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিলেন, 'রানীর মত রানী পাওয়া গিয়াছে—কি বলিস?'

প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'হুঁ।'

পরদিন প্রাতঃকালে কিন্তু গুরুতর সংবাদ আসিল। কোদণ্ডদেশ হইতে সদ্যপ্রত্যাগত নিরতিশয় নির্জীব একটি ভগ্নদূত জানাইল যে, রাজকন্যা-হরণের কথা জানিতে পারিয়া

পলাতক কোদণ্ড জাতি আবার কাতারে কাতারে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং একেবারে ক্ষেপিয়া গিয়াছে। মঘবা যে অল্পসংখ্যক আর্যকটক থানা দিবার জন্য রাখিয়া আসিয়াছিলেন, শত্রুর অতর্কিত ক্ষিপ্ততায় তাহারা কচুকাটা হইয়াছে—কেবল ভগ্নদূত পদদ্বয়ের অসাধারণ ক্ষিপ্রতাবশতঃ প্রাণ বাঁচাইতে সমর্থ হইয়াছে। পরিস্থিতি অতিশয় ভয়াবহ।

শুনিয়া প্রদ্যুম্ন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, 'মহারাজ, অনুমতি দিন শ্যালকদের ঢিট করিয়া আসি।'

মঘবা কিন্তু রাজী হইলেন না, বলিলেন, 'তাহা হয় না। ঢিট করিতে হয় আমি করিব।'

সৈন্য সাজাইয়া আবার মঘবা বাহির হইলেন। কিছু দূর গিয়া ফিরিয়া আসিয়া প্রদ্যুম্নকে বলিলেন, 'ইতিমধ্যে মেয়েটাকে তুই আর্যভাষা শেখাস্।'

মনের ক্ষুব্ধতা গোপন করিয়া প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'আচ্ছা।'

দু-এক দিনের মধ্যেই প্রদ্যুম্ন বুঝিতে পারিলেন, অনার্য মেয়েটি অতিশয় মেধাবিনী। অষ্টাহমধ্যে সে ভাঙা ভাঙা কথা কহিতে আরম্ভ করিল।

তাহার নাম এলা। অনার্য নাম বটে, কিন্তু শুনিতে ও বলিতে বড় মিষ্ট। প্রদ্যুম্ন কয়েক বার উচ্চারণ করিলেন, 'এলা! এলা! বাঃ! বেশ তো।'

কথা কহিতে শিখিয়াই এলা প্রথম প্রশ্ন করিল, 'ও লোকটা কে? যে আমাকে ধরিয়া আনিয়াছে?'

প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'আমার বন্ধু।'

বন্ধু শব্দের ভাবার্থ বুঝিতে এলার কিছু বিলম্ব হইল। অবশেষে বুঝিতে পারিয়া সে নাক সিঁটকাইল; তীব্র অবজ্ঞার কণ্ঠে বলিল, 'তোমরা বর্বর।'

প্রদ্যুম্ন অবাক হইয়া গেলেন; ভাবিলেন, কি আশ্চর্য! আমরা বর্বর!

ক্রমশ এলা আর্যভাষায় কথা কহিতে লাগিল—কোনও কথা বলিতে বা বুঝিতে তাহার বাধে না। একদিন জিজ্ঞাসা করিল, 'আমাকে এখানে ধরিয়া রাখিয়াছ কেন?'

প্রদ্যুম্ন ঢোক গিলিয়া বলিলেন, 'আর্যভাষা শিখাইবার জন্য।'

এলা বলিল 'ছাই ভাষা। ইহা শিখিয়া কি হইবে?'

প্রদ্যুম্ন একটু রসিকতা করিয়া বলিলেন, 'প্রেমালাপ করিবার সুবিধা হইবে। মহারাজ মঘবা তোমাকে বিবাহ করিবেন স্থির করিয়াছেন।'

এলা বসিয়া ছিল, ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল, কিছুক্ষণ অপলক নেত্রে প্রদ্যুম্নের পানে চাহিয়া রহিল। তারপর আবার বসিয়া পড়িয়া নিশ্চিন্ত স্বরে বলিল, 'উহাকে আমি বিবাহ করিব না। বর্বর!

প্রদ্যুম্ন স্তোক দিবার জন্য বলিলেন, 'মঘবা দাড়ি রাখে বটে, কিন্তু লোক খারাপ নয়—'

এলা শুধু বলিল, 'বর্বর!'

এমনি ভাবে দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু মঘবার দেখা নাই—তিনি কোদণ্ডদের ঢিট করিলেন অথবা কোদণ্ডেরা তাঁহাকে ঢিট করিল, কোনও সংবাদ নাই! প্রদ্যুম্ন উতলা হইয়া উঠিলেন।

দেখিতে দেখিতে তিন মাস অতীত হইয়া গেল।

একদিন প্রাতঃকালে প্রদ্যুম্ন এলার কুটগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন এলা বাতায়ন-

পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বেণী উন্মোচন করিতেছে। প্রদ্যুম্নকে দেখিয়া সে একবার ঘাড় ফিরাইল, তারপর আবার বাহিরের দূর দৃশ্যের পানে তাকাইয়া বেণীর বিসর্পিল বয়ন মোচন করিতে লাগিল।

প্রদ্যুম্ন গলা ঝাড়া দিলেন, কিন্তু কোনও ফল হইল না। তখন তিনি বাতায়ন-সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন; আকাশের দিকে তাকাইলেন, নিম্নে উঁকিঝুঁকি মারিলেন, তারপর পুনশ্চ গলাখাঁকারি দিয়া বলিলেন, 'শীত আর নাই; দিব্য গরম পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।'

এলা বলিল, 'হুঁ।'

উৎসাহ পাইয়া প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'আজকাল দক্ষিণ হইতে যে হাওয়া বহিতেছে, তাহাকেই বুঝি তোমরা মলয় সমীরণ বলিয়া থাক? আর্যাবর্তে এ হাওয়া নাই।'

এলা তাঁহার দিকে গম্ভীর চক্ষু তুলিয়া প্রশ্ন করিল, 'দু-দিন আসা হয় নাই কেন?'

প্রদ্যুম্ন থতমত খাইয়া বলিলেন, 'ব্যস্ত ছিলাম',—একটু থামিয়া—'তোমার তো আর আর্যভাষা শিখিবার প্রয়োজন নাই। যাহা শিখিয়াছ তাহাতেই আমাদের সকলের কান কাটিয়া লইতে পার।'

কিছুক্ষণ কোনও কথা হইল না; এলা নতনেত্রে মুক্ত বেণী আবার বিনাইতে লাগিল। শেষে প্রদ্যুম্ন পূর্ব কথার জের টানিয়া বলিতে লাগিলেন, 'মঘবা আসিয়া পড়িলে বাঁচা যায়। অনেক দিন হইয়া গেল, এখনও তাহার কোন খবর নাই।—দুর্ভাবনা হইতেছে।'

এলা তিলমাত্র সহানুভূতি না দেখাইয়া নির্দয়ভাবে হাসিল, বলিল, 'তোমার মঘবা আর ফিরিবে না, আমার স্বজাতিরা তাহাকে শেষ করিয়াছে।'

ক্রুদ্ধ চক্ষে চাহিয়া প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'মঘবাকে শেষ করিতে পারে এমন মানুষ দাক্ষিণাত্যে নাই। সে মহাবীর!'

তাচ্ছিল্যভরে এলা বলিল, 'বর্বর!'

অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'ঐ বর্বরকেই তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে।'

ভ্রূভঙ্গী করিয়া এলা বলিল, 'তাই নাকি! আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে?'

'তুমি তো বন্দিনী। তোমার আবার ইচ্ছা কি?'

প্রত্যেকটি শব্দ কাটিয়া কাটিয়া এলা উত্তর দিল, 'ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে বিবাহ করিতে পারে এমন পুরুষ তোমাদের আর্যাবর্তে জন্মে নাই—এই বীজের মালা দেখিতেছ?' এলা দুই আঙ্গুলে নিজ কণ্ঠের বীজমালা তুলিয়া দেখাইল, 'একটি বীজ দাঁতে চিবাইতে যেটুকু দেরি—আর আমাকে পাইবে না।'

প্রদ্যুম্ন সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, 'কি সর্বনাশ—বিষ!—দাও, শীঘ্র মালা আমায় দাও।'

এলা দূরে সরিয়া গিয়া বলিল, 'এত দিন তোমাদের বন্দিনী হইয়া আছি, ভাবিয়াছ, আমি অসহায়া? তোমাদের খেলার পুতুল? তাহা নহে। যখন ইচ্ছা আমি মুক্তি লইতে পারি।'

প্রদ্যুম্ন মূঢ়ের মত তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, 'তবে লও নাই কেন?'

এলা ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিল; তারপর গর্বিত স্বরে বলিল, 'সে আমার ইচ্ছা।'

এই সময় বাতায়নের বাহিরে দূর উপত্যকায় শঙ্খের গভীর নির্ঘোষ হইল। চমকিয়া প্রদ্যুম্ন সেই দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন। সীমান্তের বনানীর ভিতর হইতে ধ্বজকেতনধারী আর্যসেনা ফিরিয়া আসিতেছে। ললাটের উপর করতলের আচ্ছাদন দিয়া প্রদ্যুম্ন সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর গভীর নিশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, 'যাক, বাঁচা গেল—মঘবা ফিরিয়াছে!'

প্রদ্যুম্ন তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। পিছন হইতে এলার শান্ত

কণ্ঠস্বর আসিল, 'আমিও বাঁচিলাম, মুক্তির আর দেরি নাই।'

প্রদ্যুম্ন চকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, এলা তেমনি দাঁড়াইয়া বেণী বয়ন করিতেছে, তাহার মুখে সূচীবিদ্ধ মৃত প্রজাপতির মত একটুখানি হাসি।

প্রদ্যুম্ন তাহার কাছে ফিরিয়া গিয়া অনুনয়ের কণ্ঠে বলিলেন, 'এলা, ছেলেমানুষি করিও না। মঘবাকে বুঝিতে সময় লাগে, বিবাহের পর বুঝিতে পারিবে তাহার মত মানুষ হয় না—মিনতি করিতেছি, ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ একটা কিছু করিয়া বসিও না।'

এলা বলিল, 'হঠাৎ কোনও কাজ করা আমার অভ্যাস নয়; আমি কোদণ্ড-কন্যা, বর্বর নহি। যদি মঘবা বলপূর্বক আমাকে বিবাহ করিবার চেষ্টা করে, বিবাহের সভায় আমি মুক্তি লইব।'

৪

মঘবা বলিলেন, 'কোদণ্ডদের ভাল রকম কাবু করিতে পারিলাম না। ক্ষেপিয়া গেলে ব্যাটারা ভীষণ লড়ে। যা হোক, শেষ পর্যন্ত সন্ধি করিয়াছে।'

প্রদ্যুম্ন প্রশ্ন করিলেন, 'সন্ধির শর্ত কিরূপ?'

মঘবা উচ্চৈঃস্বরে হাসিলেন, 'চমৎকার। অদ্ভুত জাত এই কোদণ্ড, আশ্চর্য তাহাদের রীতিনীতি।—জানিস, ওদের জাতে মেয়ে বাপের উত্তরাধিকারিণী হয়, ছেলে মামার সম্পত্তি পায়! শুনিয়াছিস কখনও?'

মাথা নাড়িয়া প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'না। কিন্তু সন্ধির শর্ত কিরূপ?'

'শর্ত এই—কোদণ্ডের রাজকন্যা অপহরণ করাতে তাহাদের মর্যাদায় বড় আঘাত লাগিয়াছে; এই কলঙ্ক-মোচনের একমাত্র উপায় কন্যাকে বিবাহ করা। বিবাহ না করিলে তাহারা যুদ্ধ করিবে, কিছুতেই শুনিবে না। আর যদি বিবাহ করি, তবে উত্তরাধিকার-সূত্রে কোদণ্ডদের রাজা হইব। গুরুতর শর্ত নয়?' বলিয়া মঘবা গলা ছাড়িয়া হাসিতে লাগিলেন।

প্রদ্যুম্ন কিয়ৎকাল হেঁটমুখে রহিলেন, তারপর ঈষৎ হাসিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'গুরুতর বটে।'

মঘবা বলিলেন, 'সুতরাং আর বিলম্ব নয়, তাড়াতাড়ি কোদণ্ড-কন্যাকে বিবাহ করিয়া ফেলা দরকার।—মেয়েটা ঠিক আছে তো?'

'ঠিক আছে।'

'আর্যভাষা কেমন শিখিল?'

'বেশ।'

'তবে কালই বিবাহ করিব।'

কিছুকাল নীরব থাকিয়া প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'কন্যার মতামত জানিবার প্রয়োজন নাই?'

'কিছুমাত্র না। এ রাজকীয় ব্যাপার, কথার নড়চড় চলিবে না। সন্ধির শর্ত পালন করিতেই হইবে।'

সেই দিন গভীর রাত্রে প্রদ্যুম্ন চোরের মত এলার মহলে প্রবেশ করিলেন। আকাশে প্রায় পূর্ণাবয়ব চন্দ্র গবাক্ষপথে কিরণস্রোত ঢালিয়া দিতেছে; সেই জ্যোৎস্নার তলে মাটিতে পড়িয়া এলা ঘুমাইতেছে। ঘরে প্রদীপ নাই।

নিঃশব্দে প্রদ্যুম্ন তাহার কাছে গেলেন; হাঁটু গাড়িয়া তাহার পাশে বসিলেন; নিশ্বাস রোধ করিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গেলেন।

এলা ঘুমাইতেছে, কিন্তু তাহার চক্ষের কোণ বাহিয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। স্বপ্নে এলা গদগদ অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতেছে—'প্রদ্যুম্ন! প্রদ্যুম্ন! প্রদ্যুম্ন! .. আমি মরিতে চাহি না...তুমি কেমন মানুষ...কিছু বুঝিতে পার না?...বর্বর!... আমাকে উদ্ধার কর...প্রদ্যুম্ন! প্রদ্যুম্ন...'

যে-কার্য করিতে আসিয়াছিলেন তাহা করা হইল না, বীজের মালা এলার কণ্ঠেই রহিল। প্রদ্যুম্ন চোরের মত নিঃশব্দে ফিরিয়া গেলেন।

পরদিন সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাকাশে চন্দ্রোদয় হইল। মঘবা রাত্রির জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, বলিলেন, 'প্রদ্যুম্ন, এবার বিবাহের আয়োজন কর।'

রাজভবনের সম্মুখস্থ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ধুনির মত অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল; অগ্নি সাক্ষী করিয়া বিবাহ হইবে। হোমাগ্নির পুরোভাগে বরবধূর কাষ্ঠাসন-পীঠিকা সন্নিবেশিত হইল।

বিবাহের সংবাদ পূর্বাহ্ণেই প্রচারিত হইয়াছিল; উৎসুক জনমণ্ডলী প্রাঙ্গণে সমবেত হইতে লাগিল।

বক্ষ বাহুবদ্ধ করিয়া প্রদ্যুম্ন একদৃষ্টে অগ্নির পানে তাকাইয়া আছেন; একবার বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল।

মঘবা আসিয়া স্কন্ধে হাত রাখিতে তাহার চমক ভাঙিল, অগ্নি হইতে চক্ষু তুলিয়া সম্মুখে চাহিলেন। সম্মুখেই চন্দ্র; বৃক্ষশাখার অন্তরাল ছাড়াইয়া এইমাত্র ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে। প্রদ্যুম্ন সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

মঘবা বলিলেন, 'রাত্রি হইয়াছে, বিবাহের সময় উপস্থিত। তুই এবার গিয়া বধূকে লইয়া আয়।'

প্রদ্যুম্ন ধীরে ধীরে মঘবার দিকে ফিরিলেন; গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, 'সেনাপতি মঘবা!'

মঘবা ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেলেন! রাজা হওয়ার অভ্যাস তাঁর প্রাণে এমনই বসিয়া গিয়াছিল যে প্রথমটা কিছু বুঝিতেই পারিলেন না। তারপর প্রদ্যুম্নের দৃষ্টি অনুসরণ করিতেই চাঁদের প্রতি চক্ষু পড়িল।

আকাশ নির্মেঘ কিন্তু চন্দ্রের শুভ্র মুখের উপর ধূম্রবর্ণ ছায়া পড়িয়াছে; করাল ছায়া ধীরে ধীরে চন্দ্রকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিতেছে।

প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'সেনাপতি মঘবা, আমি বধূকে আনিতে যাইতেছি; সন্ধির শর্ত রক্ষার জন্য আমিই তাহাকে বিবাহ করিব। ইতিমধ্যে তুমি প্রজামণ্ডলকে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দাও।'

মঘবা কিয়ৎকাল স্তম্ভের মত নিশ্চল হইয়া রহিলেন। তারপর তাঁহার প্রচণ্ড অট্টহাস্যে আকাশ বিদীর্ণ হইয়া গেল।

সহসা হাস্য থামাইয়া মঘবা করজোড়ে বলিলেন, 'যে আজ্ঞা মহারাজ।'

এলা বাতায়নের পাশে বসিয়া ছিল, প্রদ্যুম্ন প্রবেশ করিতেই উঠিয়া দাঁড়াইল।

'আমাকে লইতে আসিয়াছ?'

'হাঁ রাজকুমারী। কোদণ্ডদের সহিত আমাদের সন্ধি হইয়াছে; তাহার শর্ত এই যে, আর্যরাজা কোদণ্ড-কন্যাকে বিবাহ করিবেন। আমরা ধর্মতঃ এই শর্ত পালন করিতে বাধ্য।'

'আর কিছু বলিবার আছে?'

'সামান্য। ঘটনাক্রমে আমি এখন আর্যরাজা, মঘবা আমার সেনাপতি। সুতরাং বিবাহ করিতে হইলে আমাকেই বিবাহ করিতে হইবে।'

এলা দীর্ঘকাল বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া স্থির হইয়া রহিল; শেষে ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করিল, 'কি বলিলে?'

প্রদ্যুম্ন রাজকীয় গাম্ভীর্যের সহিত বলিলেন, 'আমাকে বিবাহ করিতে হইবে। এখন চট্ করিয়া স্থির করিয়া ফেল, বিবাহ করিবে, না বীজ ভক্ষণ করিবে।'

স্বপ্নের অবরুদ্ধ আকুলতা এতক্ষণে বন্যার মত নামিয়া আসিল, দলিতাঞ্জন চক্ষু দুইটি ছাপাইয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

প্রদ্যুম্ন বাতায়নের উপর উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, 'গ্রহণ ছাড়িতে এখনও বিলম্ব আছে। ততক্ষণ তোমাকে বিবেচনা করিবার সময় দিলাম।'

বর্ষণের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ-চমকের মত হাসি হাসিয়া এলা বলিল, 'বর্বর!'

৯ আষাঢ় ১৩৪৬

তক্ত্ মোবারক

মুরশিদাবাদের প্রাচীন রাজপ্রাসাদের অনাবৃত চত্বরে বহুদিন ধরিয়া একখানি রাজসিংহাসন পড়িয়া থাকিত। ইহার নাম তক্ত্ মোবারক—মঙ্গলময় সিংহাসন। অতি সাধারণ প্রস্তরে নির্মিত অনতিবৃহৎ সিংহাসন, বোধকরি দেড় শত বৎসর এমনি অনাদরে অবহেলায় পড়িয়াছিল। যে বণিক-সম্প্রদায়ের তুলাদণ্ড সহসা একদিন রাজদণ্ডে পরিণত হইয়াছিল, তাঁহারা সুড়ঙ্গপথের অন্ধকারে আপন সিংহাসন লইয়া আসিয়াছিলেন, এই পুরাতন সিংহাসন ব্যবহার করেন নাই। তক্ত্ মোবারকে শেষ উপবেশন করিয়াছিলেন প্রভুদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর।

পরবর্তী কালে লর্ড কার্জন প্রত্নরক্ষায় তৎপর হইয়া এই সিংহাসন কলিকাতায় আনয়ন করেন, পরে উহা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লে রক্ষিত হয়।

তক্ত্ মোবারক—মঙ্গলময় সিংহাসন! কথিত আছে, এখনও গ্রীষ্মকালে এই সিংহাসনের পাষাণগাত্র বহিয়া রক্তবর্ণ স্বেদ ঝরিতে থাকে, যেন বিন্দু বিন্দু রক্ত ক্ষরিত হইতেছে। সেকালে মুরশিদাবাদের মুসলমানদের মধ্যে বিশ্বাস ছিল, বাদশাহীর অতীত গৌরবগরিমা স্মরণ করিয়া তক্ত্ মোবারক শোণিতাশ্রু বিসর্জন করে। কিন্তু তাহা ভ্রান্ত বিশ্বাস। তক্ত্ মোবারকের শোণিত-ক্ষরণের ইতিকথা আরও নিগূঢ়, আরও মর্মান্তিক।

তক্ত্ মোবারকের মত এমন অভিশপ্ত সিংহাসন বোধকরি পৃথিবীতে আর নাই। সুবা বিহারের অন্তর্ভুক্ত মুঙ্গের শহরে এই সিংহাসন নির্মিত হইয়াছিল, সম্রাট সাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজা আদেশ দিয়া উহা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। জন্মক্ষণ হইতেই অভিশাপের কালকূট যে এই সিংহাসনের প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ডটি নিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছে সুজা তাহা জানিতেন না, বোধহয় শেষ পর্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই; এই বিশেষত্বহীন স্থূল কারুকার্য-খচিত সিংহাসনটির প্রতি তাঁহার অহেতুক মোহ জন্মিয়াছিল।

তখন সাজাহানের রাজত্বশেষে ভ্রাতৃযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। ঔরংজেবের নিকট পরাভূত হইয়া সুলতান সুজা পলায়নের পথে কিছুকাল মুঙ্গেরে অবস্থান করিয়াছিলেন; তারপর ঔরংজেবের সেনাপতি মীরজুম্‌লার তাড়া খাইয়া সেখান হইতে রাজমহলে পলায়ন করেন। তক্ত্ মোবারক তাঁহার সঙ্গে ছিল। কিন্তু রাজমহলেও বেশী দিন থাকা চলিল না, তিনি সিংহাসন লইয়া ঢাকায় গেলেন।

মীরজুম্‌লা যখন তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ঢাকায় উপস্থিত হইলেন তখন সুজার শোচনীয় অবস্থা; তিনি তক্ত্ মোবারক ঢাকায় ফেলিয়া আরাকানে পলায়ন করিলেন। অতঃপর যে রক্ত-কলুষিত স্বখাত-সলিলে তাঁহার সমাধি হইল তাহার বহু কিম্বদন্তী আছে, কিন্তু জীবিতলোকে আর তাঁহাকে দেখা যায় নাই। শাহেনশা বাদশার পুত্র এবং ময়ূর সিংহাসনের উমেদার সুজার ইতিবৃত্ত এইখানেই শেষ। অভিশাপ কিন্তু এখনই শেষ হইল না।

পরিত্যক্ত সিংহাসন মীরজুম্‌লার কবলে আসিল। মীরজুম্‌লা অন্তরে অন্তরে দুরন্ত উচ্চাভিলাষী ছিলেন; সুবা বাংলার সিংহাসনের উপর তাঁহার লোভ ছিল। তক্ত্ মোবারক হাতে পাইয়া তাঁহার লোভ আরও বাড়িল। কিন্তু ঔরংজেবকে তিনি যমের মত ভয় করিতেন। একদিন গোপনে তিনি নিজ শিবিরে তক্ত্ মোবারকের উপর মসলন্দ পাতিয়া বসিলেন এবং আলবোলায় অম্বুরী তামাকু সেবন করিতে করিতে প্রভু-দ্রোহিতার স্বপ্ন দেখিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল।

অতঃপর তক্ত্ মোবারক কি করিয়া ঢাকা হইতে আবার পশ্চিম বঙ্গে ফিরিয়া আসিল তাহার কোন ইতিহাস নাই। নবাবী আমলে মুরশিদকুলি খাঁর জামাতা সুজা খাঁ এই সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। শীঘ্রই তাঁহার মৃত্যু হইল।

তাঁহার পুত্র সরফরাজ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। সরফরাজকেও বেশী দিন রাজ্য ভোগ করিতে হয় নাই। গিরিয়ার প্রান্তরে বিদ্রোহী ভৃত্য আলিবর্দির সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হইলেন। আলিবর্দি শূন্য সিংহাসন দখল করিলেন।

আলিবর্দির পালা শেষ হইলে আসিলেন সিরাজদ্দৌলা। তাঁহার পর মীরজাফরও এই সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। তারপর যবনিকা পড়িল।

তক্ত্ মোবারকের রক্তক্ষরণ শোকাশ্রু নয়! ইহার মূল উৎস অন্বেষণ করিতে হইলে তক্ত্ মোবারকের রচয়িতা মুঙ্গের নিবাসী খাজা নজর বোখারী নামক জনৈক প্রস্তর-

শিল্পীর জীবন কাহিনী অনুসন্ধান করিতে হয়। কে ছিল এই খ্বাজা নজর বোখারী?

তক্ত্ মোবারকের গায়ে পারস্য ভাষায় নিম্নোক্ত কথাগুলি খোদিত আছে—'এই পরম মঙ্গলময় তক্ত্ মোবারক সুবা বিহারের মুঙ্গের শহরে ১০৫২ সালের ২৭ শাবান তারিখে দাসানুদাস খ্বাজা নজর বোখারী কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল।'

এই পরম মঙ্গলাস্পদ তক্ত্ মোবারকের প্রত্যেকটি প্রস্তরখণ্ডে শিল্পী খ্বাজা নজর বোখারী তাহার পিতৃহৃদয়ের জ্বলন্ত রক্তাক্ত অভিশাপ ঢালিয়া দিয়াছিল। যতদিন সিংহাসনের অস্তিত্ব থাকিবে ততদিন এই অভিশাপের বিষক্রিয়া শান্ত হইবে না। শুধু সুলতান সুজার বিরুদ্ধেই নয়, এ অভিশাপ গর্বান্ধ উচ্ছৃঙ্খল রাজশক্তির বিরুদ্ধে, মানুষের মনুষ্যত্বকে যাহারা শক্তির দর্পে অপমান করে তাহাদের বিরুদ্ধে। তাই বোধহয় ইহার ক্রিয়া এখনও শেষ হয় নাই।

মুঙ্গেরের উত্তরবাহিনী গঙ্গা প্রাচীন কেল্লার কোল দিয়া বহিয়া গিয়াছে। আজ হইতে তিন শত বছর আগেকার কথা; কিন্তু তখনই মুঙ্গেরের কেল্লা পুরাতন বলিয়া পরিগণিত হইত। তাহারও শতাধিক বর্ষ পূর্বে লোদি বংশের এক নরপতি বিহার পুনরধিকার করিতে আসিয়া মুঙ্গেরে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তখনও এই কেল্লা দণ্ডায়মান ছিল। কোন্ স্মরণাতীত যুগে কাহার দ্বারা এই দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল কেহ জানে না। হিন্দুরা বলিত, জরাসন্ধের দুর্গ।

মুঘল বাদশাহীর আমলে মুঙ্গের শহরের বিশেষ প্রাধান্য ছিল না; ইতিহাসের পাকা সড়ক হইতে শহরটি দূরে পড়িয়া গিয়াছিল। যে সময়ের কথা, সে সময় একজন মুঘল ফৌজদার কিছু সৈন্য সিপাহী লইয়া এই দুর্গে বাস করিতেন বটে কিন্তু দীর্ঘ শান্তির যুগে দুর্গটিকে যত্নে রাখিবার কোনও সামরিক প্রয়োজন কেহ অনুভব করে নাই; প্রাকারের পাথর খসিয়া পড়িতেছিল, চারিদিকের পরিখা প্রায় ভরাট হইয়া গিয়াছিল।

দুর্গের পূর্ব দক্ষিণ ও উত্তরে তিনটি দ্বার; তিনটি সেতু পরিখার উপর দিয়া বহির্ভূমির সহিত দুর্গের সংযোগ রক্ষা করিয়াছে। পরিখা পরপারের দুর্গকে বেষ্টন করিয়া অর্ধচন্দ্রাকার শহর। শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানের বাস। হিন্দুরা প্রাতঃকালে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিত, তারপর ঘৃত, তিসি ও তেজারতির ব্যবসা করিত; মুসলমানেরা প্রতি শুক্রবারে দুর্গমধ্যস্থ 'পীর শাণফা' নামক পীরের দরগায় শিরনি চড়াইত। তাহাদের জীবনযাত্রায় অধিক বৈচিত্র্য ছিল না।

একদিন ফাল্গুন মাসের মধ্যাহ্নে কেল্লার দক্ষিণ দরজার বাহিরে, পরিখার অগভীর খাত যেখানে গঙ্গার স্রোতের সহিত মিলিয়াছে সেইখানে বসিয়া একটি যুবক মাছ ধরিতেছিল। অনেকগুলি নামগোত্রহীন গাছ হলুদবর্ণ ফুলের ঝালর ঝুলাইয়া স্থানটিকে আলো করিয়া রাখিয়াছে; সম্মুখে বিপুলবিস্তার গঙ্গার বুকে দুই একটি চর জাগিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সময় প্রায় প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে পশ্চিম হইতে বাতাস ওঠে, চরের বালু উড়িয়া আকাশ কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন হইয়া যায়। গৃহবাসী মানুষ ঝরোখা বন্ধ করিয়া ঘরের অন্ধকারে আশ্রয় লয়, কেবল বহিঃপ্রকৃতির কবোষ্ণ শূন্যতায় বসন্তের বিদায়-বার্তাবহ পাখি গাছের বিরল পত্রান্তরাল হইতে ক্লান্ত-স্তিমিত কণ্ঠে ডাকিয়া ওঠে—পিউ বহুৎ দূর! আজও পাখি থাকিয়া থাকিয়া ডাকিতেছিল—পিউ বহুৎ দূর।

হলুদবর্ণ ফুলের ভারে অবনম্র একটি নামহীন গাছ গঙ্গার স্রোতের উপর ঝুঁকিয়া

পড়িয়া যেন দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল। চারিদিক নির্জন, আকাশে বালু উড়িতেছে, পিছনে ভীমকান্তি দুর্গের উত্তুঙ্গ প্রাকার বহু ঊর্ধ্বে মাথা তুলিয়াছে—এইরূপ পরিবেশের মধ্যে ঐ পীত-পুষ্পিত গাছের ছায়ায় বসিয়া যুবকটি নিবিষ্টমনে ছিপ দিয়া মাছ ধরিতেছিল।

যুবকের নাম মোবারক। সে কান্তিমান পুরুষ, বলিষ্ঠ চেহারায় একটি উচ্চ আভিজাত্যের ছাপ আছে। তাহার বয়স বড় জোর কুড়ি একুশ, গায়ের বর্ণ পাকা খরমুজার মত; ঈষৎ গোঁফের রেখা ও চিবুকের উপর কুঞ্চিত শ্মশ্রুর আভাস তাহার মুখে একটি তীক্ষ্ণ মাধুর্য আনিয়া দিয়াছিল। তাহার উপর চোখে সুর্মা, পরিধানে ঢিলা পায়জামা ও ঢিলা আস্তিনের ফেন-শুভ্র মল্‌মলী কুর্তা। মেয়েদের তো কথাই নাই, পুরুষেরাও মোবারককে একবার দেখিলে ঘাড় ফিরাইয়া আবার তাকাইত।

মোবারক মাছ ধরিতে ভালবাসে, মাছ ধরা তাহার নেশা; তবু আজ যে এই বালু-বিকীর্ণ মধ্যাহ্নে সে ঘরের আকর্ষণ উপেক্ষা করিয়া মাছ ধরিতে আসিয়াছে তাহার অন্য কারণও ছিল। পরীবানুর সহিত তাহার বাজি লাগিয়াছিল। পরীবানু মোবারকের বধূ, নববধূও বলা চলে, কারণ বিবাহ যদিও কয়েক বছর আগে হইয়াছে, মিলন হইয়াছে সম্প্রতি। পরীর বয়স সতেরো বছর, রূপে সে মোবারকের যোগ্যা বধূ—অনিন্দ্য-সুন্দরী; বাদশাহের হারেমেও এমন সুন্দরী দেখা যায় না। মাত্র ছয় মাস তাহারা একত্র ঘর করিতেছে; নব অনুরাগের মদবিহ্বলতায় দুজনেই ডুবিয়া আছে।

পরী তামাসা করিয়া বলিয়াছিল, 'ভারি তো রোজ রোজ তালাওয়ে মাছ ধরো। দরিয়ায় মাছ ধরতে পারো তবে বুঝি বাহাদুরী।'

মোবারক বলিয়াছিল, 'কেন, দরিয়ায় মাছ ধরা এমন কি শক্ত কাজ?'

'শক্ত নয়? ধরেছ কোনও দিন?'

'যখন ইচ্ছে ধরতে পারি।'

'ধরো না দেখি। পুকুরের পোষা মাছ সবাই ধরতে পারে। গঙ্গার মাছ ধরা অত সোজা নয়।'

'বেশ, রাখো বাজি।'

'রাখো বাজি।'

মোবারক ওড়না ধরিয়া পরীকে কাছে টানিয়া লইয়াছিল; কানে কানে বাজির শর্ত স্থির হইয়াছিল। শর্ত বড় মধুর। অতঃপর মোবারক ছিপ এবং আনুষঙ্গিক উপকরণ লইয়া মহোৎসাহে দরিয়ায় মাছ ধরিতে বাহির হইয়াছিল।

মাছ কিন্তু ধরা দেয় নাই, একটি পুঁটিমাছও না। যবের ছাতু, পিঁপড়ার ডিম, পনির প্রভৃতি মুখরোচক টোপ দিয়াও গঙ্গার মাছকে প্রলুব্ধ করা যায় নাই। দীর্ঘকাল ছিপ হাতে বসিয়া থাকিয়া মোবারক বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে, গাছের ছায়া গাছের তলা হইতে সরিয়া যাইতেছে। অন্য দিন হইলে মোবারক বাড়ি ফিরিয়া যাইত, কিন্তু আজ এত শীঘ্র শূন্য হাতে বাড়ি ফিরিলে পরী হাসিবে। সে বড় লজ্জা। মোবারক বঁড়শির টোপ বদলাইয়া বঁড়শি জলে ফেলিল এবং দৃঢ় মনোযোগের সহিত ফাৎনার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

গাছের উপর হইতে একটা পাখি বিরস স্বরে বলিল, 'পিউ বহুৎ দূর!'

মোবারকের অধর কোণে চকিত হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে উপর দিকে চোখ তুলিয়া মনে মনে বলিল, 'সাবাস পাখি! তুই জান্‌লি কি করে?'

এই সময় গঙ্গার দিক হইতে দূরাগত তূর্য ও নাকাড়ার আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেই মোবারক চমকিয়া সেই দিকে চাহিল। গঙ্গার কুঞ্চিত জলের উপর সূর্যের আলো

ঝলমল করিতেছে। দূরে দক্ষিণদিকে অসংখ্য নৌকার পাল দেখা দিয়াছে, বোধ হয় দুই শত রণতরী। ঐ তরণীপুঞ্জের ভিতর হইতে গভীর রণবাদ্য নিঃস্বনিত হইতেছে।

স্রোতের মুখে অনুকূল পবনে তরণীগুলি রাজহংসের মত ভাসিয়া আসিতেছে। মোবারক লক্ষ্য করিল, তরণীব্যূহের মাঝখানে চক্রবাকের মত স্বর্ণবর্ণ একটি পাল রহিয়াছে। সেকালে সম্রাট ভিন্ন আর কেহ রক্তবর্ণ শিবির কিম্বা নৌকার পাল ব্যবহার করিবার অধিকারী ছিলেন না; কিন্তু সম্রাট-পদ-লিপ্সুরা নিজ নিজ গৌরব গরিমা বাড়াইবার জন্য পূর্বাহ্নেই এই রাজকীয় প্রতীক ধারণ করিতেন। মোবারকের বুঝিতে বিলম্ব হইল না, কে আসিতেছে। সে অস্ফুট স্বরে বলিল, 'ঐ রে সুলতান সুজা ফিরে এল।'

কয়েক মাস পূর্বে সাজাহানের মৃত্যুর জনরব শুনিয়া সুলতান সুজা এই মুঙ্গের শহর হইতেই মহা ধুমধামের সহিত পাল উড়াইয়া আগ্রা যাত্রা করিয়াছিলেন। যে ঘাটে নৌবহর সাজাইয়া তিনি যাত্রা করিয়াছিলেন তাহার নাম দিয়াছিলেন সুজাই ঘাট*। এখন খাজুয়ার যুদ্ধে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঔরংজেবের হাতে পরাজিত হইয়া তিনি আবার সুজাই ঘাটে ফিরিয়া আসিতেছেন।

মোবারক অবশ্য যুদ্ধে পরাজয়ের খবর জানিত না। কিন্তু মুঙ্গেরের মত ক্ষুদ্র শহরে সাম্রাজ্যগৃধ্নু যুবরাজ ও বিপুল সৈন্যবাহিনীর শুভাগমন হইলে সাধারণ নাগরিকের মনে সুখ থাকে না। সৈন্যদল যতই শান্ত সুবোধ হোক, অসামরিক জনমণ্ডলীর নিগ্রহ ঘটিয়া থাকে। গতবারে ঘটিয়াছিল, এবারও নিশ্চয় ঘটিবে। তাই মোবারক মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

দুর্গমধ্যেও নৌবহরের আগমন লক্ষিত হইয়াছিল। ফৌজদার মহাশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি শান্তিপ্রিয় প্রৌঢ় ব্যক্তি; সাজাহানের নিরুপদ্রব দীর্ঘ রাজত্বকালে নিশ্চিন্তে ফৌজদারী ভোগ করিয়া তিনি কিছু অলস ও অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজ-দরবারের সমস্ত খবরও তাঁহার কাছে পেঁীছিত না; ভায়ে ভায়ে সিংহাসন লইয়া লড়াই বাধিয়াছে এইটুকুই তিনি জানিতেন। কয়েক মাস পূর্বে সুজা আগ্রার পথে যাত্রা করিলে তিনি বেশ উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন; হয়তো আশা করিয়াছিলেন তক্ত্ তাউস্ সুজারই কবলে আসিবে। তাই তাঁহাকে আবার ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া তিনি বিব্রত হইয়া পড়িলেন। যাহোক, সুলতান সুজাকে অমান্য করা চলে না, সিংহাসন পান বা না পান তিনি শাহজাদা। উপরন্তু তাঁহার সঙ্গে অনেক সৈন্য সিপাহী রহিয়াছে।

দুর্গের দক্ষিণ দ্বার হইতে সুজাই ঘাট মাত্র দুইশত গজ দূরে। ফৌজদার মহাশয় কয়েকজন ঘোড়সওয়ার লইয়া ঘাটে সুজার অভ্যর্থনা করিতে গেলেন।

দেখিতে দেখিতে নৌবহর আসিয়া পড়িল। মোবারক যেখানে মাছ ধরিতে বসিয়াছিল সেখান হইতে বাঁদিকে ঘাড় ফিরাইলেই সুজাই ঘাট দেখা যায়। ঘাটটি আয়তনে ছোট; সব নৌকা ঘাটে ভিড়িতে পারিল না, ঘাটের দুইপাশে কিনারায় নঙ্গর ফেলিতে লাগিল। চারিদিকে চেঁচামেচি হুড়াহুড়ি, মাঝিমাল্লার গালাগালি; গঙ্গার তীর দুর্গের কোল পর্যন্ত তোলপাড় হইয়া উঠিল। মোবারক দেখিল এখানে মাছ ধরার চেষ্টা বৃথা! সে ছিপ গুটাইয়া বাড়ি ফিরিয়া চলিল। বিরক্তির মধ্যেও তাহার মনে এইটুকু সান্ত্বনা জাগিতে লাগিল, পরীবানুর কাছে কৈফিয়ৎ দিবার মত একটা ছুতা পাওয়া গিয়াছে।

* অদ্যাপি এই ঘাট 'সুজি ঘাট' নামে পরিচিত।

৩

কেল্লার পূর্বদ্বার হইতে যে রাজপথ আরম্ভ হইয়াছে তাহা শহরকে দুই সমানভাগে বিভক্ত করিয়া বাংলার রাজধানী রাজমহলের দিকে গিয়াছে। এই পথের দুই পার্শ্ব, দুর্গমুখ হইতে প্রায় অর্ধক্রোশ পর্যন্ত গিয়া, ক্রমে গৃহবিরল হইতে হইতে অবশেষে নিরবচ্ছিন্ন মাঠ-ময়দানে পরিণত হইয়াছে। এইখানে নগর-সীমান্তে একটি ক্ষুদ্র চটি আছে—চটির নাম পূরব সরাই। পূর্ব হইতে সমাগত যাত্রীদল এই চটিতে রাত্রির মত আশ্রয় পায়, পরদিন শহরে প্রবেশ করে।

চটি হইতে কিছুদূরে একটি পাকাবাড়ি, ইহা মোবারকের পিতৃভবন। কাছাকাছি অন্য কোনও গৃহ নাই, বাড়িটি রাজপথের ধারে নিঃসঙ্গ দাঁড়াইয়া আছে; আকারে ক্ষুদ্র হইলেও তাহার যেন একটু আভিজাত্যের অভিমান আছে। পূরব সরাই চটি ও তাহার আশেপাশে যে দু'চারিটি দীনমূর্তি গৃহ দেখা যায় সেগুলি যেন ঐ বাড়িখানি হইতে সসম্ভ্রমে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

চুনকাম-করা সুশ্রী বাড়ি; সম্মুখের বারান্দা জাফ্‌রিকাটা পাথরের অনুচ্চ আলিসা দিয়া ঘেরা। বাড়ি এবং পথের মধ্যস্থলে খানিকটা মুক্ত অঙ্গন, সেখানে নানা আকৃতির ছোটবড় পাথরের পাটা পড়িয়া আছে—পাশে একটি খাপরা-ছাওয়া ক্ষুদ্র চালা। চালার ভিতরেও নানা আকৃতির পাথর রহিয়াছে, কিন্তু সেগুলি বাটালির ঘায়ে রূপ পরিগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান হয়, গৃহস্বামী একজন প্রস্তর-শিল্পী।

প্রস্তর-শিল্পী গৃহস্বামীর নাম খ্বাজা নজর বোখারী। ইনিই মোবারকের পিতা। বয়স পঁয়তাল্লিশ পার হয় নাই, দেহ এখনও দৃঢ় ও কর্মপটু; কিন্তু এই বয়সেই ইঁহার মুখমণ্ডল হইতে যৌবনের উন্মাদনা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। সুন্দর পৌরুষ-বলিষ্ঠ অবয়বে জরার চিহ্নমাত্র নাই, তবু মনে হয় তিনি বৃদ্ধত্বের নিষ্কাম তৃপ্তলোকের সন্ধান পাইয়াছেন। মুখে একটি শান্ত দীপ্তি। যাহারা স্থূল ইন্দ্রিয়সুখ ও ভোগলিপ্সা কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছে তাহাদের মুখেই এমন সৌম্য জ্যোতি দেখিতে পাওয়া যায়।

খ্বাজা নজর বোখারী ধনী ব্যক্তি নহেন, প্রস্তর-শিল্প তাঁহার জীবিকা। যাহারা নূতন গৃহ নির্মাণ করায় তাহারা তাঁহাকে দিয়া পাথরের স্তম্ভ খিলান জাফ্‌রি প্রভৃতি তৈয়ার করাইয়া লয়। তবু শহরের ইতর ভদ্র সকলেই তাঁহার চরিত্রগুণে এবং পূর্ব-ইতিহাস স্মরণ করিয়া তাঁহাকে সম্ভ্রম করিয়া চলে। সাধারণের নিকট তিনি মিঞা সাহেব নামে পরিচিত।

এইখানে খ্বাজা নজরের পূর্বকথা সংক্ষেপে ব্যক্ত করা প্রয়োজন।

খ্বাজা নজরের পিতা বোখারা হইতে হিন্দুস্থানে আসিয়াছিলেন। সে-সময় দিল্লীর দরবারে গুণের আদর ছিল, দেশদেশান্তর হইতে জ্ঞানী গুণী আসিয়া বাদশাহের অনুগ্রহ লাভ করিতেন। বোখারা একে পর্বত-বন্ধুর দরিদ্র দেশ, উপরন্তু তখন পারস্যের অধীন। সেখানে ভাগ্যোন্নতির আশা নাই দেখিয়া খ্বাজা নজরের পিতা বালকপুত্র সমভিব্যাহারে দিল্লী উপনীত হইলেন।

তিনি পরম সুপুরুষ ছিলেন, উত্তম যোদ্ধা বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল। শীঘ্রই তিনি সাজাহানের নজরে পড়িলেন। তারপর একদিন মুঙ্গেরের ফৌজদার পদের সনদ পাইয়া বিহার-প্রান্তের এই প্রাচীন দুর্গে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন। ইহা সাজাহানের রাজত্বকালের গোড়ার দিকের কথা।

তারপর দশ বৎসর নিরুপদ্রবে কাটিয়া গেল। বিশাল সাম্রাজ্যের এপ্রান্তে যুদ্ধ-

বিগ্রহের হাঙ্গামা নাই তাই ফৌজদার নিজের শৌর্যবীর্য দেখাইয়া আরও অধিক পদোন্নতির সুযোগ পাইলেন না, তিনি ফৌজদারই রহিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে এক সৈয়দবংশীয়া কন্যার সহিত খ্বাজা নজরের বিবাহ হইল।

খ্বাজা নজর তখন ভাবপ্রবণ কল্পনাবিলাসী যুবক। তিনি পারসীক ভাষায় শয়ের লিখিতেন; ভাস্কর্য এবং স্থপতি-শিল্পের উপরও তাঁহার গাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছিল। পিতৃসৌভাগ্যের ছায়াতলে বসিয়া তিনি পরম নিশ্চিন্ত মনে শিল্পকলার চর্চা করিতে লাগিলেন। যোদ্ধার তরবারির পরিবর্তে ভাস্করের ছেনি ও বাটালি তাঁহার অস্ত্র হইয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু এই নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রা তাঁহার রহিল না। মোবারক জন্মিবার কিছুদিন পরে সহসা একদিন খ্বাজা নজরের জীবনযাত্রা ওলট-পালট হইয়া গেল। ফৌজদার অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। খ্বাজা নজরের সুখের দিন ফুরাইল।

হিন্দুস্থানের অধীশ্বর শাহেনশাহ বাদশাহ সাজাহান বাহ্যতঃ বিলাসী ও বহুব্যয়ী প্রতীয়মান হইলেও অন্তরে কৃপণ ছিলেন। এই জন্যই বোধ করি তিনি বহু ধনরত্ন সঞ্চয় করিয়া তাজমহল এবং ময়ূর সিংহাসন নির্মাণ করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে নিয়ম ছিল, কোনও ওমরাহ বা রাজকর্মচারীর মৃত্যু হইলে মৃতের সঞ্চিত ধনসম্পত্তি তৎক্ষণাৎ সরকারে বাজেয়াপ্ত হইত। আমীর-ওমরাহেরা এই ব্যবস্থায় মনে মনে সন্তুষ্ট ছিলেন না; সকলেই ধনরত্ন লুকাইয়া রাখিতেন কিম্বা মৃত্যুর পূর্বেই ওয়ারিশদের মধ্যে চুপি চুপি বণ্টন করিয়া দিতেন। গল্প আছে, এক ওমরাহ* দীর্ঘকাল রাজসরকারে কার্য করিয়া বহু ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ ওমরাহের মৃত্যু হইলে সাজাহান তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য রাজপুরুষদের পাঠাইলেন। ওমরাহের বাড়িতে কিন্তু একটি তালাবন্ধ সিন্দুক ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া গেল না; রাজ-পুরুষেরা সিন্দুক সাজাহানের সম্মুখে উপস্থিত করিল। সাজাহান তালা ভাঙ্গিয়া দেখিলেন সিন্দুকের মধ্যে কেবল ছেঁড়া জুতা ভরা রহিয়াছে। সম্রাট লজ্জা পাইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার স্বভাব পরিবর্তিত হয় নাই।

ফৌজদারের বেলায় নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না। তিনি যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন পাটনা হইতে সুবেদারের লোক আসিয়া তুলিয়া লইয়া গেল। দুর্গে নূতন ফৌজদার আসিল। খ্বাজা নজর রিক্তহস্তে পথে দাঁড়াইলেন।

যাহার রণশিক্ষা নাই সে কোন্ কাজ করিবে? শেষ পর্যন্ত শিল্পবিদ্যাই তাঁহার জীবিকা হইয়া দাঁড়াইল। ঘরানা ঘরের সন্তান, অবস্থা বিপাকে দুর্দশায় পতিত হইয়াছেন —তাই শহরের গণ্যমান্য সকলেই তাঁহাকে সাধ্যমত সাহায্য করিল।

গত বিশ বছরে খ্বাজা নজরের অবস্থা কিছু সচ্ছল হইয়াছে। তিনি এখন সাধারণ গৃহস্থ, শহরের প্রান্তে ক্ষুদ্র বাড়ি করিয়াছেন। সুখে দুঃখে জীবন চলিতেছে। পত্নীর মৃত্যু হইয়াছে, মোবারকের বিবাহ হইয়াছে। খ্বাজা নজরের জীবনে বড় বেশী উচ্চাশা নাই, কেবল একটি আকাঙ্ক্ষা অহরহ তাঁহার অন্তরে জাগিয়া থাকে। মোবারক বড় হইয়া উঠিয়াছে, এইবার একদিন তাহাকে দিল্লী পাঠাইবেন। মোবারক বাদশাহের নিকট হইতে আবার ফৌজদারীর সনদ লইয়া আসিবে।

মোবারককে বালককাল হইতে খ্বাজা নজর সৎশিক্ষা দিয়াছেন, কুসঙ্গ হইতে সযত্নে দূরে রাখিয়াছেন। আরবী ও পারসী ভাষায় সে পারদর্শী হইয়াছে। যুদ্ধবিদ্যায় যদিও

* নেকনাম খাঁ। (বার্ণিয়ার)

তাহার বিশেষ রুচি নাই—সেও তাহার পিতার মত কল্পনাপ্রবণ—তবু তাহাকে যথারীতি অস্ত্রবিদ্যা শিখানো হইয়াছে। তাহার উপর অমন সুন্দর চেহারা! সে যদি একবার বাদশাহের সিংহাসনতলে গিয়া দাঁড়াইতে পারে, বাদশাহ তাহার আশা পূর্ণ না করিয়া পারিবেন?

এই আকাঙ্ক্ষা বুকে লইয়া খ্বাজা নজর পুত্রকে বড় করিয়া তুলিয়াছেন—ইহা ভিন্ন তাঁহার জীবনে অন্য কামনা নাই। মোবারকের কুড়ি বছর বয়স পূর্ণ হইবার পর তিনি তাহার দিল্লী গমনের উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সহসা বাদশাহের পীড়া ও ভ্রাতৃযুদ্ধের সংবাদ আসিয়া চারিদিকে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। মোবারকের দিল্লী গমন আপাততঃ স্থগিত আছে।

সেদিন অপরাহ্ণে মোবারক রিক্তহস্তে গঙ্গাতীর হইতে বাড়ি ফিরিয়া দেখিল, তাহার পিতা কারখানার চালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একব্যক্তির সহিত কথা কহিতেছেন। শহরের ধনী বেনিয়া দুনীচন্দের পুত্রের বড় অসুখ, সে মিঞাসাহেবের কাছে মন্ত্রপড়া জল লইতে আসিয়াছে। মিঞাসাহেবের জলপড়ার ভারি গুণ, কখনও ব্যর্থ হয় না। তিনি মন্ত্রপূত জলের বাটি দুনীচন্দের হাতে দিয়া বলিলেন, 'যাও। ছেলে আরাম হলে পীর শাণফার দরগায় শিরনি চড়িও।' বলিয়া দুনীচন্দকে বিদায় দিলেন।

মোবারক এই ফাঁকে অলক্ষিতে গৃহে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছিল, খ্বাজা নজর ডাকিলেন, 'মোবারক!'

মোবারক ফিরিয়া আসিয়া পিতার সম্মুখে দাঁড়াইল। তিনি স্নিগ্ধচক্ষে একবার তাহার মুখের পানে চাহিলেন; রৌদ্রে ধূলায় মোবারকের মুখখানি আরক্ত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিলেও সে-কথার উল্লেখ না করিয়া বলিলেন, 'কিছু খবর শুনলে? শহরে নাকি আবার ফৌজ এসেছে?'

মোবারক বলিল, 'হ্যাঁ, সুলতান সুজা ফিরে এসেছে।'

খ্বাজা নজর একটু বিমনা ভাবে আকাশের পানে চাহিলেন, ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হইল। কিন্তু তিনি আর কোনও প্রশ্ন না করিয়া কারখানার চালার ভিতর প্রবেশ করিলেন। চালার ভিতর হইতে তাঁহার অন্যমনস্ক কণ্ঠস্বর আসিল, 'যাও, তুমি স্নান কর গিয়ে।'

মোবারক তখন বাড়িতে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিবার পূর্বেই দেখিতে পাইল, দ্বারের আড়ালে পরী দাঁড়াইয়া আছে এবং অপূর্ব সুন্দর চোখ দুটিতে দুষ্টামি ভরিয়া হাসিতেছে। মোবারকও হাসিয়া ফেলিল। পরী আজ কোনও ছলছুতা মানিবে না, বাজির পণ পুরামাত্রায় আদায় করিয়া লইবে।

৪

সুলতান সুজার নৌবহর গঙ্গার স্রোত বাহিয়া আসিয়াছিল; তাঁহার স্থলসৈন্য—পিয়াদা ও সওয়ার গঙ্গার তীর ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিল। নৌকায় স্বয়ং সুজা ছিলেন, তাঁহার অগণিত নারীপূর্ণ হারেম ছিল, আর ছিল বড় বড় কামান গোলা বারুদ। যে কয়জন আমীর এখনও তাঁহার সংসর্গ ত্যাগ করেন নাই তাঁহারাও নৌকায় ছিলেন।

মুঙ্গেরে অবতীর্ণ হইয়া সুজা কেল্লার মধ্যে ফৌজদারের বাসভবনে অধিষ্ঠিত হইলেন। দুর্গের পশ্চিমভাগে উচ্চভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত দুইটি বড় বড় মহল; একটিতে সুজার হারেম রহিল, অপরটি তাঁহার দরবার ও মন্ত্রণাগৃহে পরিণত হইল। সুজার

প্রধান উজির আলিবর্দি খাঁর জন্যও উৎকৃষ্ট বাসভবন নির্দিষ্ট হইল। আলিবর্দি খাঁ সুজার অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন, সুজা আদর করিয়া তাঁহাকে 'খান্ ভাই' বলিয়া ডাকিতেন। তিনি 'করণ-চূড়া' নামক কেল্লার উত্তরভাগের একটি সুন্দর শৈলগৃহ অধিকার করিলেন। সৈন্যদল মাঠে ময়দানে তাম্বু ফেলিল; কতক নৌকায় রহিল।

মুঙ্গেরে পেঁৗছিয়া সুলতান সুজা একদণ্ডও বৃথা কালক্ষয় করিলেন না, প্রবল উৎসাহে দুর্গসংস্কার আরম্ভ করিয়া দিলেন। পাটনা হইতে আসিবার পথে তিনি স্থির করিয়াছিলেন, মুঙ্গেরের দুর্ধর্ষ দুর্গেই তাঁহার শক্তির কেন্দ্র রচনা করিবেন। যদিও রাজমহল তাঁহার রাজধানী, তবু রাজমহল আগ্রা হইতে অনেক দূর; মুঙ্গের অপেক্ষাকৃত নিকট। যাঁহার দৃষ্টি ময়ূর সিংহাসনের উপর নিবদ্ধ তাঁহার পক্ষে রাজমহল বা ঢাকা অপেক্ষা মুঙ্গেরে ঘাঁটি তৈয়ার করিবার ইচ্ছাই স্বাভাবিক। সুজার আদেশে ও তত্ত্বাবধানে কেল্লার প্রাকার মেরামত হইতে লাগিল, পরিখা আরও গভীরভাবে খনন করিয়া গঙ্গার ধারার সহিত তাহার নিত্যসংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা হইল। দুর্গপ্রাকারের বুরুজের উপর বড় বড় কামান বসিল। সুজা অশ্বপৃষ্ঠে চারিদিকের বিপুল কর্মতৎপরতা তদারক করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সুজার সঙ্গী-সাথীরা তাঁহার এই অপ্রত্যাশিত কর্মোৎসাহ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। যাঁহারা বুদ্ধিমান তাঁহাদের সন্দেহ দূর হইল, সুজা কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঔরংজেবকে অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

একচল্লিশ বছর বয়সে সুজার চরিত্র সংশোধনের আর উপায় ছিল না। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান ছিলেন, কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী ব্যসনাশক্তি তাঁহার বুদ্ধি ও দেহের উপর জড়তার প্রলেপ মাখাইয়া দিয়াছিল। তৈমুরবংশের রক্তে তিনটি প্রধান উপাদান—বিবেকহীন উচ্চাশা, অদম্য ভোগলিপ্সা এবং কুটিল নৃশংসতা। সকল মোগল সম্রাটের মধ্যেই এই প্রবৃত্তিগুলি অল্পাধিক অনুপাতে বিদ্যমান ছিল। সুজার জীবনে ভোগ-লিপ্সাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু তাই বলিয়া উচ্চাশাও তাঁহার কম ছিল না। মাঝে মাঝে তাহা খড়ের আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিত; তীব্র সর্পিল বুদ্ধি জড়ত্বের খোলস ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিত। কিন্তু তাহা ক্ষণিক। ঔরংজেবের ন্যায় লৌহদৃঢ় চিত্তবল তাঁহার ছিল না। আবার তিনি আলস্যে বিলাসে গা ভাসাইয়া দিতেন।

কিন্তু মুঙ্গেরে পেঁৗছিয়া তিনি এমন বিপুল উদ্যমে কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন যে সাতদিনের মধ্যে দুর্গের জীর্ণ সংস্কার শেষ হইল। কেবল দুর্গ মেরামত করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, শত্রু যাহাতে দুর্গের কাছে না আসিতে পারে তাহার ব্যবস্থাও করিলেন। জলপথে অবশ্য সুজার কোনও ভয় ছিল না, কারণ সে-সময় বাংলার অধীশ্বর সুজা ভিন্ন আর কাহারও নৌবহর ছিল না। স্থলপথে মুঙ্গের আক্রমণের পথ পূর্ব ও দক্ষিণ হইতে; তাহাও গিরিশ্রেণীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। কিন্তু গিরিশ্রেণীর ফাঁকে ফাঁকে সৈন্য চালনার উপযোগী রন্ধ্র আছে। সুজা এই রন্ধ্রগুলি বড় বড় বাঁধ তুলিয়া বন্ধ করিয়া দিবার বন্দোবস্ত করিলেন। সুজা সত্যই রণপণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং মুঙ্গের কেল্লা ও পারিপার্শ্বিক ভূমি সংরক্ষণের কোনই ত্রুটি রহিল না।

হাজার হাজার মজুর লাগিয়া গেল। পাহাড়ের ব্যবধানস্থলে উচ্চ জাঙ্গাল খাড়া হইল, তাহার মাথার উপর কামান বসিল। সুজা ঘোড়ার পিঠে সমস্ত পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বন্ধু এবং উজির খান্ ভাই আলিবর্দি খাঁ সর্বদা তাঁহার সঙ্গে রহিলেন।

সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার সময় সুজার মহলে দরবার বসিত। দরবার অবশ্য পাকা দরবার নয়, আদব কায়দার কড়াকাড়ি ছিল না; অনেকটা মজলিসের মত

আসর বসিত, আলিবর্দি খাঁ, মির্জা জান বেগ প্রমুখ কয়েকজন অন্তরঙ্গ পারিষদ আসিয়া বসিতেন। মখমল বিছানো বৃহৎ কক্ষে বহু তৈলদীপের আলোতে শিরাজি চলিত, হাস্য পরিহাস চলিত, ক্বচিৎ মন্ত্রণা পরামর্শও হইত। রাত্রি যত গভীর হইত সুজা ততই মাতাল হইয়া পড়িতেন, কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে আবার তিনি অশ্বপৃষ্ঠে বাহির হইতেন। পারিষদেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া ভাবিতেন, এভাবে আর কতদিন চলিবে।

এইভাবে একপক্ষ কাটিল।

একদিন সন্ধ্যার পর মজলিস বসিয়াছিল। সুজার হাতে শিরাজির পাত্র ছিল, তিনি ফৌজদারের পানে চাহিয়া বলিলেন, 'পীর পাহাড়ের দিকে কাজ কেমন চলছে?'

ওদিকের কার্য-তত্ত্বাবধানের ভার ফৌজদার মহাশয়ের উপর ছিল, তিনি বলিলেন, 'ভালই চলছে জাঁহাপনা, ঘাঁটি প্রায় তৈরি হয়ে গেছে।'

সুজা বলিলেন, 'বেশ, কাল ওদিকে তদারক করতে যাব।'

স্ফটিকের পানপাত্র নিঃশেষ করিয়া তিনি বাঁদীর হাতে ফেরৎ দিলেন। কয়েকজন যুবতী বাঁদী শরাবের পাত্র, তাম্বুলের পেটি ও গোলাপজল ভরা গুলাবপাশ লইয়া মজলিসের পরিচর্যা করিতেছিল। সুজার ইঙ্গিতে একটি বাঁদী ফৌজদারের সম্মুখে পানের বাটা ধরিল। সম্মানিত ফৌজদার তস্লিম করিয়া একটি তবক্-মোড়া পান তুলিয়া লইলেন।

শরাবের আর একটি পাত্র হাতে লইয়া সুজা বলিলেন, 'আমার শরাবের পুঁজি তো প্রায় ফুরিয়ে এল। ফৌজদার সাহেব, আপনাদের দেশে মদ পাওয়া যায় না?'

ঈষৎ হাসিয়া ফৌজদার বলিলেন, 'পাওয়া যায় হজরৎ—তাড়ি।'

সুজা প্রশ্ন করিলেন, 'তাড়ি? সে কি রকম জিনিস?'

ফৌজদার বলিলেন, 'মন্দ জিনিস নয়। গ্রীষ্মকালে এদেশের ইতর-ভদ্র সকলেই খায়। স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশ ভাল। কিন্তু বড় দুর্গন্ধ।'

সুজা হাসিয়া বলিলেন, 'আন্দাজ হচ্ছে ফৌজদার সাহেব তাড়ি চেখে দেখেছেন!'

ফৌজদার কহিলেন, 'জী। পুদিনার আরক একটু মিশিয়ে দিলে গন্ধ চাপা পড়ে—তখন মন্দ লাগে না।'

ক্রমে রাত্রি হইল। সুজা কিংখাপের তাকিয়ার উপর এলাইয়া পড়িলেন, তাহার কথা জড়াইয়া আসিতে লাগিল। বাঁদীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল।

আলিবর্দি খাঁ বুঝিলেন, আজ রাত্রে সুজা হারেমে ফিরিবেন না। তিনি অন্য পারিষদবর্গকে চোখের ইসারা করিলেন, সকলে কুরনিশ করিয়া বিদায় হইলেন।

দরবারকক্ষের পর্দা-ঢাকা দ্বারের বাহিরে হাব্সী খোজারা লাঙ্গা তলোয়ার লইয়া পাহারা দিতেছে। তাহারা আমীরগণকে এত শীঘ্র বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়া নিঃশব্দে দাঁত বাহির করিয়া হাসিল। তাহারা পুরাতন ভৃত্য, প্রভুর স্বভাব চরিত্র ভাল করিয়াই জানে।

৫

পরদিন আমাদের আখ্যায়িকার একটি স্মরণীয় দিন; যদিও ইতিহাস উহা স্মরণ করিয়া রাখে নাই।

পূর্বাহ্ণে সুজা আলিবর্দি খাঁকে সঙ্গে লইয়া ঘোড়ার পিঠে পীর পাহাড় পরিদর্শনে বাহির হইলেন। পরিদর্শন কার্যে সুজা সাধারণ বেশবাস পরিয়াই বাহির হইতেন,

সঙ্গে রক্ষী থাকিত না। কেবল খান্ ভাই আলিবর্দি খাঁ এই সকল অভিযানে তাঁহার নিত্যসঙ্গী ছিলেন।

আলিবর্দি খাঁ একজন অতি মিষ্টভাষী চাটুকার ছিলেন; তাঁহার চাটুকথার বিশেষ গুণ এই ছিল যে উহা সহসা চাটুকথা বলিয়া চেনা যাইত না। সুজা আখেরে দিল্লীর সম্রাট্ হইবেন এই আশায় তিনি সুজার সহিত যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু পরে যখন সে আশা আর রহিল না তখন তিনি সুজার সৈন্য ভাঙাইয়া লইয়া পালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুজা তাঁহাকে ধৃত করিয়া প্রকাশ্যে তাঁহার মুণ্ডচ্ছেদ করাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা আরও কিছুদিন পরের কথা।

দ্বিপ্রহরে পীর পাহাড় পেঁৗছিয়া সুজা কার্যাদি তদারক করিলেন। পীর পাহাড় শহরের পূর্বদিকে গঙ্গার সন্নিকটে গম্বুজাকৃতি একটি টিলা; স্বভাবতই সুরক্ষিত। তাহার শীর্ষদেশে সমতল করিয়া তাহার উপর আর একটি গম্বুজের মত মহল উঠিতেছে। ইহা সুজার আতিস্-খানা হইবে—গোলাবারুদ প্রভৃতি এখানে সঞ্চিত থাকিবে। টিলার চূড়া হইতে একটি কূপও খনিত হইতেছে; গঙ্গার স্রোতের সহিত তাহার যোগ থাকিবে।

আত্মরক্ষার বিপুল আয়োজন। শত শত মজুর রাজমিস্ত্রি ছুতার কাজ করিতেছে।

পরিদর্শন শেষ করিতে অপরাহ্ণ হইয়া গেল। সুজা ও আলিবর্দি খাঁ ফিরিয়া চলিলেন। ভাগ্যক্রমে আজ বালি উড়িতেছে না, খর রৌদ্রতাপে বাতাস স্তব্ধ হইয়া আছে।

অর্ধেক পথ অতিক্রম করিতে সুজা ঘর্মাক্ত কলেবর হইলেন. সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়াছে, মুখের উপর রৌদ্র পড়িয়া মুখ রক্তবর্ণ হইল। শহরের উপকণ্ঠে যখন পেঁৗছিলেন তখন তৃষ্ণায় তাঁহার গলা শুকাইয়া গিয়াছে।

একটি নিম্নশ্রেণীর লোক অপর্যাপ্ত তাড়ি সেবন করিয়া মনের আনন্দে পথের এধার হইতে ওধার পরিভ্রমণ করিতে করিতে চলিয়াছিল। সুজা ঘোড়া থামাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখানে কোথায় পানীয় পাওয়া যায় বলতে পার?'

পথিক হাস্যবিম্বিত মুখে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, 'ঐ যে পূরব সরাই, ঐখানে ঢুকে পড়ুন, দেদার তাড়ি পাবেন।' বলিয়া প্রসন্ন একটি হিক্কা তুলিয়া প্রস্থান করিলেন।

আলিবর্দি খাঁ ও সুজা দৃষ্টি বিনিময় করিলেন। সুজা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'আসুন খান্ ভাই, এদেশের খাঁটি জিনিস চেখে দেখা যাক।'

পূরব সরাই নেহাৎ নিম্নশ্রেণীর পানশালা নয়; তবে গ্রীষ্মকালে এখানে তাড়ি বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। সত্বাধিকারী একজন মুসলমান: দুইজন ফৌজী সওয়ারকে পাইয়া সে সাদরে তাহাদের অভ্যর্থনা করিল। সুজা পুদিনার আরক-সুরভিত তাড়ি ফরমাস দিলেন।

নূতন মাটির ভাঁড়ে শুভ্রবর্ণ পানীয় আসিল। উভয়ে পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন। শুষ্ককণ্ঠে নূতনতর পানীয় মন্দ লাগিল না। তারপর সরাইওয়ালা যখন এক রেকাবি ঝাল-মটর আনিয়া উপস্থিত করিল, তখন সুজা আবার পানীয় ফরমাস করিলেন।

ঝাল-মটর সুজার বড়ই মুখরোচক লাগিল। এরূপ প্রাকৃতজনোচিত আহার্য পানীয়ের আস্বাদ সুজা পূর্বে কখনও গ্রহণ করেন নাই, তিনি খুব আমোদ অনুভব করিলেন। পানীয়ের দ্বিতীয় পাত্রও ঝাল-মটর সহযোগে শীঘ্রই নিঃশেষিত হইল।

কোমরবন্ধের তরবারি আল্‌গা করিয়া দিয়া সুজা তৃতীয় কিস্তি পানীয় হুকুম

করিলেন। আলিবর্দি খাঁর দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন, 'কী খান্ ভাই, কেমন লাগছে?'

খান্ ভাই মাথা নাড়িয়া মোলায়েম ভর্ৎসনার সুরে বলিলেন, 'হজরৎ, আপনি গরীবের ফুর্তির দাম বাড়িয়ে দিলেন।'

এক ঘড়ি সময় কাটিবার পর সুজা ও আলিবর্দি যখন সরাইখানা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন তখন তাহাদের মনের বেশ আনন্দঘন অবস্থা। উভয়ে আবার ঘোড়ার উপরে উঠিয়া যাত্রা করিলেন।

কিন্তু বেশী দূর যাইবার আগেই তাঁহাদের গতি ভিন্নমুখী হইল। আরোহীদ্বয়ের তৃষ্ণা নিবারণ হইয়াছিল বটে কিন্তু ঘোড়া দুটি তৃষ্ণার্তই ছিল; তাই চলিতে চলিতে পথের অনতিদূরে একটি জলাশয় দেখিতে পাইয়া তাহারা হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল এবং বল্‌গার শাসন উপেক্ষা করিয়া সেই দিকে চলিল। সুজা ঘোড়ার মুখ ফিরাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ঘোড়া বাগ মানিল না। তখন তিনি আর চেষ্টা না করিয়া লাগাম আলগা করিয়া ধরিলেন।

কিন্তু দীঘির তীরে পৌঁছিয়া আবার তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে রাশ টানিতে হইল। দীঘির পাড় বড় বেশী ঢালু, ঘোড়া নামিবার সুবিধা নাই; একটি সংকীর্ণ ঘাট আছে বটে কিন্তু তাহার ধাপগুলি এতই সরু এবং উঁচু যে ঘোড়া সেপথে অতিকষ্টে নামিতে পারিলেও উঠিতে পারিবে না। সুজা ও আলিবর্দি খাঁ দ্বিধায় পড়িলেন। ঘোড়া দুটি জলের সান্নিধ্যে আসিয়া আরও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া একপ্রকার অসম্ভব।

একটি লোক জলের কিনারায় বসিয়া নিবিষ্টমনে ছিপ দিয়া মাছ ধরিতেছিল; ঘাটে বা দীঘির আশেপাশে আর কেহ ছিল না। তাহার পিছনে পাড়ের উপর সুজা ও আলিবর্দি খাঁ উপস্থিত হইলে সে একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিয়া আবার মাছ ধরায় মন দিয়াছিল; ফৌজী সওয়ার সম্বন্ধে তাহার মনে কৌতূহল ছিল না।

এদিকে সুজার মনের প্রসন্নতাও আর ছিল না। ঘোড়ার ব্যবহারে তিনি বিরক্ত হইয়াছিলেন; পুকুর পাড়ে ঘোড়ার জলপানের কোনও সুবিধাই নাই দেখিয়া তাঁহার বিরক্তি ক্রমে ক্রোধে পরিণত হইতেছিল। তার উপর ঐ লোকটা নির্বিকারচিত্তে বসিয়া মাছ ধরিতেছে, তাঁহাকে সাহায্য করিবার কোনও চেষ্টাই করিতেছে না। দিল্লীর ভবিষ্যৎ বাদশাহ শাহজাদা আলমের ধৈর্য আর কতক্ষণ থাকে? তিনি কর্কশকণ্ঠে মৎস্য-শিকাররত লোকটিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, 'এই বান্দা, পুকুরে ঘোড়াকে জল খাওয়াবার কোনও রাস্তা আছে?'

মৎস্যশিকারী মোবারক। সম্বোধন শুনিয়া তাহার রক্ত গরম হইয়া উঠিল। কিন্তু এই অশিষ্ট দায়িত্বহীন সিপাহীগুলার সহিত কলহ করিয়া লাভ নাই, তাহাতে নিগ্রহ বাড়িবে বৈ কমিবে না। বিশেষতঃ মোবারক নিরস্ত্র। সে আর-একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিয়া আবার ফাৎনার উপর চোখ রাখিল।

সুজা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। অবহেলায় তিনি অভ্যস্ত নন; তাই তিনি যে ছদ্মবেশে আছেন সেকথা ভুলিয়া গিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'আরে বাঁদীর বাচ্চা! তুই কানে শুনতে পাস না? বদ্‌তমিজ, এদিকে আয়।'

ইহার পর আর চুপ করিয়া থাকা যায় না। মোবারক আরক্ত মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল, ছিপটা হাতে তুলিয়া পাড় বাহিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। ঘোড়ার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে সুজার পানে চাহিয়া রহিল, তারপর অর্ধাবরুদ্ধ ক্রোধের স্বরে বলিল, 'বাঁদির বাচ্চা তুমি। তোমার শরীরে ভদ্র-রক্ত থাকলে ভদ্রভাবে কথা বলতে।'

আলিবর্দি একেবারে হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিলেন, 'বেয়াদব যুবক। তুমি কার সঙ্গে কইছ জানো? উনি সুলতান সুজা।'

নাম শুনিয়া মোবারকের বুকে মুগুরের ঘা পড়িল। সে বুঝিল তাহার জীবনে এক ভয়ঙ্কর মুহূর্ত উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু তবু এখন ভয়ে পিছাইয়া যাইতে সে ঘৃণাবোধ করিল। অকারণ লাঞ্ছনার গ্লানি তাহার আরও বাড়িয়া গেল; নীচ শ্রেণীর লোকের মুখে ইতর ভাষা বরং সহ্য হয় কিন্তু বড়'র মুখে ছোট কথা দ্বিগুণ পীড়াদায়ক। মোবারকের মুখে একটা ব্যঙ্গ-বঙ্কিম বিকৃতি ফুটিয়া উঠিল, সে বলিল, 'সুলতান সুজা ছোট ভাইয়ের কাছে যুদ্ধে মার খেয়ে এখন নিরস্ত্রের ওপর বাহাদুরী দেখাচ্ছেন!'

সুজার অন্তরে যে-গ্লানি প্রচ্ছন্ন ছিল, যাহার ইঙ্গিত পর্যন্ত করিতে ওমরাহেরা সাহস করিতেন না, তাহাই যেন শ্লেষের চাবুক হইয়া তাঁহার মুখে পড়িল। আর তাঁহার দিগ্‌বিদিক জ্ঞান রহিল না, উন্মত্ত রোষে তরবারি বাহির করিয়া তিনি মোবারকের পানে ঘোড়া চালাইলেন।

'গোস্তাক্। বদ্‌বখ্‌ত—।'

ইতিমধ্যে ভোজবাজির মত কোথা হইতে অনেকগুলি লোক আসিয়া জুটিয়াছিল, তাহারা সমস্বরে হৈ হৈ করিয়া উঠিল। কেহ বা মোবারককে পলায়ন করিবার উপদেশ দিল; মোবারক কিন্তু এক পা পিছু হটিল না। ঘোড়া যখন প্রায় তাহার বুকের উপর আসিয়া পড়িয়াছে তখন সে একবার সজোরে ছিপ চালাইল। ছিপের আঘাত শপাৎ করিয়া সুজার গালে লাগিল।

সুজাও বেগে তরবারি চালাইলেন। মোবারকের গলদেশে তরবারির ফলা বসিয়া গেল। সে বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া মাটিতে পড়িল।

কয়েক মুহূর্ত পূর্বে যাহা চিন্তার অতীত ছিল, অতি তুচ্ছ কারণে অকস্মাৎ তাহাই ঘটিয়া গেল।

৬

দিন শেষ হইয়া আসিতেছে।

খ্বাজা নজর বোখারী তাঁহার কারখানা ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুনীচন্দ্ বেনিয়ার সহিত হাসিমুখে কথা বলিতেছিলেন। দুনীচন্দের পুত্র আরোগ্যলাভ করিয়াছে, তাই সে মিঞা সাহেবকে কৃতজ্ঞতা জানাইতে আসিয়াছে।

সহসা রাজপথের উপর অনেকগুলি মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। খ্বাজা নজর চোখ তুলিয়া দেখিলেন একদল লোক একটি মৃতদেহ বহন করিয়া আনিতেছে, তাহাদের পশ্চাতে দুইজন সওয়ার। খ্বাজা নজর শঙ্কিত হইয়া ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিলেন।

মৃতদেহ বাহকগণ খ্বাজা নজরের অঙ্গনে প্রবেশ করিল। খ্বাজা নজর নিশ্চল মূর্তির মত দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। বাহকেরা মোবারকের রক্তাক্ত মৃতদেহ আনিয়া খ্বাজা নজরের সম্মুখে একটি পাথরের পাটার উপর শোয়াইয়া দিল। কেহ কথা কহিল না। খ্বাজা নজর নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার রক্তহীন অধর একটু নড়িল, 'মোবারক—'

যাহারা বহন করিয়া আনিয়াছিল তাহারা নিঃশব্দে অশ্রুমোচন করিয়া সরিয়া গেল। কেবল অশ্বারোহী দুইজন গেল না। সুজার মুখে ক্রোধের অন্ধকার এখনও দূর হয় নাই, চোখে জিঘাংসা ধিকিধিকি জ্বলিতেছে। তাঁহার গালে ছিপের আঘাত চিহ্নটা ক্রমে বেগুনী বর্ণ ধারণ করিতেছে। তিনি মাঝে মাঝে তাহাতে হাত বুলাইতেছেন এবং

তাঁহার চক্ষু হিংস্রভাবে জ্বলিয়া উঠিতেছে।

সহসা সুজা খ্বাজা নজরকে উদ্দেশ করিয়া কঠোর কণ্ঠে বলিলেন, 'তুমি এর বাপ?'

খ্বাজা নজর সুজার দিকে শূন্য দৃষ্টি তুলিলেন, কথা কহিলেন না। মোবারক তো বন্‌সী তালাওয়ে মাছ ধরিতে গিয়াছিল...!

উত্তর না পাইয়া আলিবর্দি খাঁ বলিলেন, 'ইনি মালিক উল্‌মুল্‌ক সুলতান সুজা। তোমার ছেলে এর অমর্যাদা করেছিল তাই তার এই দশা হয়েছে।'

খ্বাজা নজর এবারও উত্তর দিলেন না, ভাবহীন নিস্তেজ চক্ষু অশ্বারোহীদের উপর হইতে সরাইয়া মোবারকের উপর ন্যস্ত করিলেন। দেখিলেন পাথরের পাটা মোবারকের কণ্ঠ-ক্ষরিত রক্তে ভিজিয়া উঠিয়াছে। মোবারক বাঁচিয়া নাই.........ইহারা তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে—

সুজা মুখের একটা বিকৃত ভঙ্গী করিলেন। এই সামান্য প্রস্তর-শিল্পীর পুত্রকে হত্যা করিবার পর ইহার অধিক কৈফিয়ৎ বা দুঃখ প্রকাশের প্রয়োজন নাই। সুজা আলিবর্দিকে ইঙ্গিত করিলেন; উভয়ে ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

এই সময় বাড়ির ভিতর হইতে তীব্র আর্তোক্তি আসিল, সঙ্গে সঙ্গে পরীবানু ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। তাহার কেশ বিস্রস্ত, বোধকরি ভয়ংকর সংবাদ শুনিবার সময় সে কেশ প্রসাধন করিতেছিল; অঙ্গে ওড়্‌নি নাই, কেবল চোলি ও ঘাঘ্‌রি। সে ছুটিয়া আসিয়া মোবারকের মৃতদেহের পাশে ক্ষণেক দাঁড়াইল, ব্যাকুল বিস্ফারিত নেত্রে মোবারকের মৃত্যুস্থির মুখের পানে চাহিল, তারপর ছিন্নলতার মত তাহার বুকের উপর আছড়াইয়া পড়িল। খ্বাজা নজর মোহগ্রস্ত মূকের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সুজা ঘোড়ার পৃষ্ঠ হইতে ঘাড় ফিরাইয়া এই দৃশ্য দেখিলেন; কিছুক্ষণ নিষ্পলক নেত্রে পরীবানুর পানে চাহিয়া রহিলেন। সামান্য মানুষের গৃহেও এমন স্ত্রীলোক পাওয়া যায়? পানাপুকুরে মরালী বাস করে?

সুজার সমসাময়িক ইতিকার লিখিয়াছেন, চামেলির মত ক্ষুদ্র বস্তু সুজার চোখে পড়িত না। আজ কিন্তু এই শিশির-সিক্ত চামেলি ফুলটি ভাল করিয়াই তাঁহার চোখে পড়িল। সন্ধ্যার ছায়ালোকে তিনি যখন দুর্গের দিকে ফিরিয়া চলিলেন, তখনও ঐ শোক-নিপীড়িতার যৌবনোচ্ছল লাবণ্য তাঁহার চিত্তপটে ফুটিয়া রহিল।

দুর্গের সিংহদ্বারে প্রবেশ করিতে সুজা বলিলেন, 'বুড়ো বান্দাটা পাথরের কারিগর মনে হল।'

আলিবর্দি বলিলেন, 'হাঁ হজরৎ, আমারও তাই মনে হল।' বলিয়া সুজার পানে অপাঙ্গে চাহিলেন।

সুজা চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া গণ্ডের স্ফীত কৃষ্ণবর্ণ আঘাত চিহ্নটার উপর অঙ্গুলি বুলাইলেন।

তাঁহার দৃষ্টি ছুরির নখাগ্রের মত ঝিলিক দিয়া উঠিল।

পরদিন সন্ধ্যাকালে খ্বাজা নজরের গৃহে অনৈসর্গিক নীরবতা বিরাজ করিতেছিল। অন্তঃপুরে শব্দমাত্র নাই, যেন সেখানে মানুষ বাস করে না; পরীবানু শোকের কোন্ নিগূঢ় গর্ভগৃহে আশ্রয় লইয়াছে। বাহিরের অঙ্গনও শূন্য নিস্তব্ধ; কেবল মোবারকের রক্তচর্চিত প্রস্তরপট্টের পানে চাহিয়া খ্বাজা নজর একাকী বসিয়া আছেন।

মোবারকের কফন দফন আজ প্রভাতেই হইয়া গিয়াছে। খ্বাজা নজর ভাবিতেছেন

মোবারক নাই...কাল যে সুস্থ প্রাণপূর্ণ ছিল আজ সে নাই। বর্ষ কাটিবে, যুগ কাটিবে, পৃথিবী জীর্ণ হইয়া যাইবে, সূর্য ম্লান হইবে, চন্দ্র ধূলা হইয়া খসিয়া পড়িবে তবু মোবারক ফিরিয়া আসিবে না। এমন নিশ্চিহ্ন হইয়া কোথায় গেল সে? না, একবোরে নিশ্চিহ্ন নয়, ঐ যে পাথরের উপর তাহার শেষ মোহর-ছেপ্‌ৎ রাখিয়া গিয়াছে...শুষ্ক রক্ত...পাথরে রক্তের দাগ কতদিন থাকে? ঘোড়ার খুরের শব্দে চোখ তুলিয়া খ্বাজা নজর দেখিলেন, কল্যকার একজন অশ্বারোহী আসিতেছে। তিনি ভাবিলেন, এ কে? সুলতান সুজা? মোবারক তাঁহার সহিত ধৃষ্টতা করিয়াছিল, সে ধৃষ্টতার ঋণ এখনও শোধ হয় নাই? তবে তিনি আবার কেন আসিলেন?

অশ্বারোহী কিন্তু সুজা নয়, আলিবর্দি খাঁ। আলিবর্দি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া খ্বাজা নজরের পাশে আসিয়া বসিলেন এবং এমনভাবে তাহার সহিত কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন যেন তিনি খ্বাজা নজরকে নিজের সমকক্ষ মনে করেন। সহানুভূতিতে বিগলিত হইয়া তিনি জানাইলেন, সুলতান সুজা কল্যকার ঘটনায় বড়ই মর্মাহত হইয়াছেন। অবশ্য তিনি যেভাবে অপমানিত হইয়াছিলেন তাহাতে অপরাধীকে সবংশে বধ করিয়া তাহাদের দেহ কুকুর দিয়া খাওয়াইলেও অন্যায় হইত না; কিন্তু সুজার হৃদয় বড় কোমল, তিনি অন্যায় করেন নাই জানিয়াও কিছুতেই মনে শান্তি পাইতেছেন না। শোক-তপ্ত পরিবারের দুঃখ মোচন না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার বুকের দরদও দূর হইবে না। সুলতান সুজা খবর পাইয়াছেন যে খ্বাজা নজর একজন প্রসিদ্ধ শিল্পী। সুজার ইচ্ছা সম্রাট হইবার পর নূতন সিংহাসনে বসেন; তাই তিনি অনুরোধ জানাইয়াছেন, খ্বাজা নজর যদি একটি মঙ্গলময় সিংহাসন তৈয়ারের ভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে সুজা নিরতিশয় প্রীত হইবেন। পরম পরিমার্জিত ভাষায় এই কথাগুলি বলিয়া আলিবর্দি খাঁ এক মুঠি মোহর খ্বাজা নজরের পাশে রাখিলেন।

খ্বাজা নজরের মন তিক্ত হইয়া উঠিল; তিনি ভাবিলেন, ইহারা কি মানুষ! মোবারকের অভাব একমুঠি সোনা দিয়া পূর্ণ করিতে চায়! মুখে বলিলেন, 'শাহজাদার ইচ্ছাই আদেশ, সিংহাসন তৈরি করে দেব।'

অতঃপর আরও কিছুক্ষণ মিষ্টালাপ করিয়া, তখ্‌ত যত শীঘ্র তৈয়ারি হয় ততই ভাল, এই অনুজ্ঞা জানাইয়া আলিবর্দি খাঁ প্রস্থান করিলেন।

আসন্ন রাত্রির ঘনায়মান অন্ধকারে খ্বাজা নজর একাকী বসিয়া রহিলেন। কী নিষ্ঠুর ইহারা। অথচ ইহারাই শক্তিমান, ইহারাই সিংহাসনে বসে। ঈশ্বর ইহাদের এত শক্তি দিয়াছেন কেন? মোবারকের রক্তে যাহার হাত রাঙ্গা হইয়াছে আমি তাহারই জন্য মঙ্গলময় সিংহাসন তৈয়ার করিব! মঙ্গলময় সিংহাসন—তক্ত্ মোবারক—!

ভাবিতে ভাবিতে খ্বাজা নজর রক্তলিপ্ত পাথরের দিকে চাহিলেন। মনে হইল, শ্বেত পাথরের উপর গাঢ় রক্তের দাগ যেন প্রায়ান্ধকারে জ্বলিতেছে। খ্বাজা নজরের দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, সূক্ষ্ম নাসাপুট ঘন ঘন স্ফুরিত হইতে লাগিল। তিনি অস্ফুট স্বরে আবৃত্তি করিলেন, 'তক্ত্ মোবারক—তক্ত্ মোবারক—তক্ত্ মোবারক—'

ইহাই তক্ত্ মোবারকের ইতিহাস। কিন্তু আর একটু আছে। শুধুই রক্তমাখা পাথর এবং পিতার অভিশাপ লইয়া তক্ত্ মোবারক জন্মগ্রহণ করে নাই, তাহার উপর আরও গাঢ় পাপের প্রলেপ পড়িয়াছিল।

৭

তিন দিন পরে আলিবর্দি খাঁ আবার আসিলেন। খাজা নজর অপরাহ্ণে কারখানায় চালার নীচে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন; সিংহাসন প্রায় তৈয়ার হইয়াছে দেখিয়া আলিবর্দি খুশী হইলেন। কিন্তু আজ তিনি অন্য কাজে আসিয়াছিলেন, দুই চারিটি অবান্তর কথার পর কাজের কথা আরম্ভ করিলেন।

সুজার মনস্তাপ এখনও নিবৃত্ত হয় নাই। বস্তুতঃ মোবারকের বিধবা কবিলার কথা স্মরণ করিয়া তিনি মনে বড় কষ্ট পাইতেছেন; বিধবার মনে সুখ শান্তি ফিরাইয়া আনা তিনি অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেছেন। জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু প্রজাকে সুখী করাই রাজার ধর্ম। সুজা সদয় মনে ইচ্ছা করিয়াছেন যে মোবারকের কবিলা তাঁহার হারেমে আসিয়া বাস করুক; আরাম ও ঐশ্বর্যের মধ্যে থাকিয়া সে শীঘ্রই শোক ভুলিতে পারিবে। ইহাতে খাজা নজরের আনন্দ হওয়া উচিত, এরূপ সম্মান অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। ইত্যাদি।

খাজা নজরের বুকে বিষের প্রদাহ জ্বলিতে লাগিল। রাক্ষস—রাক্ষস এরা! মোবারককে লইয়াছে, এখন আমার ইজ্জত লইতে চায়। আমি কি করিতে পারি? 'না' বলিলে জোর করিয়া লইয়া যাইবে। যাক—পরীকে লইয়া যাক। পরী আমার ঘরে কতদিনই বা থাকিবে? সে যুবতী, দু'মাসে হোক ছ'মাসে হোক আর কাহাকেও নিকা করিয়া চলিয়া যাইবে। তার চেয়ে এখনই যাক—

মুখে বলিলেন, 'আমি দাসানুদাস—রাজার যা ইচ্ছা তাই হোক।'

আলিবর্দি অশ্বারোহণে ফিরিয়া গেলেন। সন্ধ্যার পর তিনটি ডুলি আসিয়া খাজা নজরের বাড়ির সদরে থামিল। সঙ্গে কয়েকজন বরকন্দাজ। দুইটি ডুলি হইতে চারিজন বাঁদী নামিয়া খাজা নজরের অন্দরে প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ পরে পরীবানু কাঁদিতে কাঁদিতে, চোখ মুছিতে মুছিতে বাঁদীদের সহিত বাহির হইয়া আসিল এবং ডুলিতে গিয়া বসিল। কানাৎ-ঢাকা তিনটি ডুলি বরকন্দাজ পরিবেষ্টিত হইয়া চলিয়া গেল।

রাত্রি হইল। খাজা নজর কারখানা ঘরে আলো জ্বালিয়া কাজ করিতেছেন। তাঁহার দেহ নুইয়া পড়িয়াছে। বাটালি দিয়া সিংহাসনের গায়ে নাম খোদাই করিতেছেন আর মনে মনে চিন্তার অবশ ক্রিয়া চলিয়াছে—

মোবারকের বিবাহ...কতদিনের কথা? এইতো সেদিন...মুঙ্গের শহরে ১০৫২ সালের ২৭ শাবান তারিখে...দাসানুদাস খাজা নজর বোখারী কর্তৃক...

ঠক্ ঠক্ করিয়া বাটালির উপর হাতুড়ির ঘা পড়িতেছে; খাজা নজরের মন কখনও অতীতের স্মৃতিতে ডুবিয়া যাইতেছে, কখনও কঠিন নির্মম বর্তমানে ফিরিয়া আসিতেছে—মোবারকের বিবাহের তারিখের সহিত তাহার মৃত্যুর তারিখ মিশিয়া যাইতেছে—

মধ্যরাত্রি পর্যন্ত খাজা নজর এইভাবে কাজ করিয়া চলিয়াছেন। যেমন করিয়া হোক আজই এই অভিশপ্ত সিংহাসন শেষ করিয়া দিতে হইবে। আর সহ্য হয় না—আর শক্তি নাই—

সিংহাসন দেখিয়া সুজা প্রীত হইলেন। দেখিতে খুব সুশ্রী নয়, কিন্তু কি যেন একটা অনৈসর্গিক আকর্ষণ উহাতে আছে। সুজা সিংহাসন লইয়া গিয়া দরবার কক্ষে বসাইলেন।

সন্ধ্যার সময় সভা বসিল। সুজা সিংহাসনের উপর মসলন্দ বিছাইয়া দুইপাশে

মখমলের তাকিয়া লইয়া তাহাতে উপবেশন করিলেন। সভাসদেরা সহর্ষে কেরামৎ করিলেন। বাঁদীদের হাতে হাতে শরাবের পেয়ালা চলিতে লাগিল।

হাস্য পরিহাস রসালাপ চলিতেছে এমন সময় গুরুতর সংবাদ আসিল। পাটনা হইতে জলপথে দূত আসিয়াছে; সে সংবাদ দিল, মীরজুম্‌লা ত্রিশ হাজার সৈন্য লইয়া স্থলপথে আসিতেছেন, শীঘ্রই মুঙ্গের অবরোধ করিবেন।

শরাবের পাত্র হাতে লইয়া সুজা দীর্ঘকাল নীরব হইয়া রহিলেন। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'আমি রাজমহলে ফিরে যাব। এখানে যুদ্ধ দেব না।'

সকলে বিস্ময়াহত হইয়া চাহিয়া রহিলেন। এত আয়োজন এত পরিশ্রম করিয়া এ দুর্গ অজেয় করিয়া তোলা হইয়াছে, তাহা ছাড়িয়া পলায়ন করিতে হইবে?

সুজা কহিলেন, 'আমার মন বলছে বাংলা দেশে ফিরে যেতে। আপনারা বাড়ি যান, আজ রাত্রিটা বিশ্রাম করুন। কাল সকাল থেকেই রাজমহল যাত্রার আয়োজন শুরু করতে হবে।'

সকলে অন্তরে ধিক্কার বহন করিয়া নীরবে প্রস্থান করিলেন। যাঁহারা সুজার বুলন্দ্ ইক্‌বালের উপর এখনও আস্থাবান ছিলেন তাঁহারাও বুঝিলেন সুজার পুরুষকার মহত্তর পুরুষকারের নিকট পরাস্ত হইয়াছে।

সুজাও অবসাদগ্রস্ত মনে আবার সিংহাসনে বসিলেন। কক্ষে বাঁদীর দল ছাড়া আর কেহ ছিল না; তাহারা কেহ তাঁহার সম্মুখে পানপাত্র ধরিল, কেহ ময়ূরপঙ্খী পাখা দিয়া ব্যজন করিল, কেহ বা পদমূলে বসিয়া তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিল।

সুজা ভাবিতে লাগিলেন, ঔরংজেব আর মীরজুম্‌লা! এই দুটা মানুষ তাঁহার জীবনের দুর্গ্রহ। ইহাদের নাম শুনিলেই তাঁহার মন সঙ্কুচিত হয়, নিজেকে ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হয়, শক্তি অবসন্ন হয়। মীরজুম্‌লার বিশ মণ হীরা আছে, সে যুদ্ধ করিতে আসে কেন? ঔরংজেব তাঁহার ছোট ভাই হইয়াও তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার করে কেন?

সুজার মনের আত্মগ্লানি ক্রমে জিঘাংসায় পরিণত হইতে লাগিল। কাহাকেও আঘাত হানিতে পারিলে গ্লানি কতকটা দূর হয়। চিন্তা-কুণ্ঠিত মুখে বসিয়া তিনি নিজ গণ্ডস্থল অঙ্গুলি দিয়া স্পর্শ করিলেন। গণ্ডের আঘাত চিহ্নটা প্রায় মিলাইয়া গিয়াছে, তবু একটু কালো দাগ এখনও আছে। মোবারকের ছিপের দাগ। বাঁদীর বাচ্চা! বদ্‌জাৎ কুত্তা! তাহার প্রতি সুজার আক্রোশ এখনও সম্পূর্ণ নির্বাপিত হয় নাই—প্রতিহিংসার আগুনে পূর্ণাহুতি পড়ে নাই।

সুজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কাল যে নূতন বাঁদীটা এসেছে তার কান্না থেমেছে?'

একটি বাঁদী বলিল, 'এখনও থামেনি হজরৎ, তেম্‌নি কেঁদে চলেছে।'

নিরানন্দ হাস্যে সুজার দন্তপংক্তি প্রকট হইল। তিনি বলিলেন, 'তার কান্না আমি থামিয়ে দিচ্ছি। তোরা যা, তাকে এখানে পাঠিয়ে দে।'

বাঁদীরা চলিয়া গেল। তক্ত্ মোবারকের উপর অঙ্গ এলাইয়া দিয়া সুজা অর্ধশয়ান হইলেন, গালের চিহ্নটার উপর অঙ্গুলি বুলাইতে বুলাইতে নূতন বাঁদী পরীবানুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চোখে কুটিল আনন্দ নৃত্য করিতে লাগিল।

পরীবানু সামান্যা নারী, খুাজা নজর বোখারী সাধারণ মানুষ, মোবারক হতভাগ্য স্বল্পায়ু যুবক; তাহাদের জীবন-মৃত্যু নিগ্রহ-নিপীড়ন হাসি-অশ্রুর মূল্য কতটুকু? কেহ কি তাহা মনে করিয়া রাখে?

হে অতীত, তুমি মনে করিয়া রাখিয়াছ। যাহাদের কথা সকলে ভুলিয়াছে তুমি

তাহাদের কিছু ভোল নাই, তোমার ভাণ্ডারে মানুষের সব কথা সঞ্চিত হইয়া আছে। তাই বুঝি বর্তমানের ললাটে তোমার অভিশাপের ভস্মটিকা দেখিতে পাইতেছি।

২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪

ইন্দ্রতুলক

পণ্ডিত বলিলেন, 'গল্প শোনো। কাল রাত্রে প্রাচীন ইতিহাসের এক পুঁথি পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম—'

খুবই স্বাভাবিক। ইতিহাসের পুঁথি পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়ে না এমন মানুষ আমি দেখি নাই।

পণ্ডিত বলিতে লাগিলেন, 'ঘুমিয়ে এক স্বপ্ন দেখলুম। আশ্চর্য স্বপ্ন। আমি যেন ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ, শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছি, আর আমার চোখের সামনে যুগের পর যুগ কেটে যাচ্ছে। আট হাজার বছরের পুরানো ইতিহাস চোখের সামনে দেখতে পেলুম।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কাল রাত্রে কি খেয়েছিলেন?'

পণ্ডিত বলিলেন, 'মনে নেই। গিন্নী বলতে পারেন।'

গৃহিণী বলিলেন, 'কাঁকড়ার ঝোল আর ভাত।'

বলিলাম, 'বুঝেছি, ইংরেজিতে যাকে বলে নাইট্ মেয়ার আপনি তাই দেখেছেন। আমি এবার উঠি।'

পণ্ডিত বলিলেন, 'আরে বোসো, চা খেয়ে যাও।—ভূগোল পড়েছ?'

বলিলাম, 'ভূগোল? ইতিহাসের স্বপ্ন দেখলেন, তার মধ্যে ভূগোল। ইস্কুলে পড়েছিলুম বটে।'

পণ্ডিত বলিলেন, 'বেশ, এখন একটা দেশ মনে মনে কল্পনা কর, বেলুচিস্থান থেকে ইরাণের দক্ষিণভাগ পর্যন্ত। কল্পনায় দেখতে পাও?'

মনের মধ্যে ম্যাপ আঁকিবার চেষ্টা করিলাম; পূর্বদিকে সিন্ধু নদ, পশ্চিমে পারস্য উপসাগরের মুখ, দক্ষিণে সমুদ্র, মাঝখানে পাহাড় ও মরুভূমিতে ভরা একটা দেশ।

পণ্ডিত বলিলেন, 'আট হাজার বছর আগে সিন্ধু নদ ছিল না। বর্তমানে যে দেশটা পাঞ্জাব নামে পরিচিত সেটা ছিল ধু ধু মরুভূমি। আর কাশ্মীর ছিল প্রকাণ্ড একটা মিঠে জলের হ্রদ। এখন কল্পনা কর, পূর্বদিকে দুস্তর মরুভূমি, উত্তরে দুর্ভেদ্য পাহাড়, দক্ষিণে সমুদ্র—মাঝখানে সরু এক ফালি দেশ। কোনও দিক দিয়েই বেরুবার রাস্তা নেই। আট হাজার বছর আগে এই দেশে একটা জাতি বাস করত।

'বর্বর জাতি; কিন্তু গায়ের চামড়া কটা, চোখের মণি নীল, চুল সোনালি। পরবর্তী কালে যারা আর্য বলে পরিচিত হয়েছিল এরা তারাই। এই দেশই তাদের আদিম বাস-ভূমি। পাহাড় এবং মরুভূমির পরপারে কালো মেটে পাঁশুটে নানা রঙের মানুষ বাস করত বটে, কিন্তু তাদের সঙ্গে এই আর্যদের মেলামেশার কোনও উপায় ছিল না। সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গভাবে এই জাতি বহুকাল বাস করেছিল। নিঃসঙ্গতার মধ্যেই তাদের ভাষা এবং সংস্কৃতি পরিপুষ্ট হয়েছিল।

'শুকনো দেশ, তার ওপর ওরা তখন চাষবাস করতেও জানত না। গরু, ছাগল পুষতে শিখেছিল, কিন্তু ঘোড়া কি জন্তু তা কখনও চোখে দেখেনি। দেশের পূর্ব-সীমায় বেলুচিস্থানের পাহাড়ে একরকম ঘাস জন্মাত, তার বীজ তারা গুঁড়ো করে খেতো। এই পাহাড়ী ঘাসের বীজ আধুনিক গমের পূর্বপুরুষ। কিন্তু তাতে তাদের পেট ভরত না; এই জাতির প্রধান জীবিকা ছিল সমুদ্রে মাছ ধরা।

'ছোট ছোট নৌকায় চড়ে তারা সমুদ্রের কিনারে কিনারে মাছ ধরে বেড়াত। মাছ তাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন, তাই মাছকেই তারা দেবতা মনে করত। মৎস্য ছিল তাদের অবতার।

'তাদের অবশ্য একজন রাজা ছিল। রাজার নাম মনু। তখনকার বর্বরতার যুগে সকল জাতিরই একটা totem থাকত; এই জাতির totem ছিল সূর্য। মনু দাবী করতেন সাক্ষাৎ বিবস্বান তাঁর আদি পুরুষ।

'সমুদ্রে পুরুষানুক্রমে মাছ ধরার ফলে এই জাতি নৌ-বিদ্যা বেশ আয়ত্ত করেছিল। মনুর কয়েকটা বড় বড় নৌকা ছিল, তিনি তাইতে চড়ে মাছ ধরে বেড়াতেন। তিনি ভারি বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, সমুদ্রের জল-বাতাস লক্ষ্য করে আসন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বুঝতে পারতেন।

'একদিন মনু সমুদ্রে মাছ ধরছেন, তাঁর জালে এক অদ্ভুত চেহারার মাছ উঠল। মাছের নাকের কাছে এক শিং। মনু পঞ্চাশ বছর এই সমুদ্রে মাছ ধরেছেন, কিন্তু এমন মাছ কখনও চোখে দেখেননি। মাছটা ধড়ফড় করল না, নির্জীব হয়ে পড়ে রইল। মনু বুঝলেন, এ মাছ অজানা কোনও সমুদ্র থেকে এসেছে। তিনি আকাশের দিকে তাকালেন, মনে হল আকাশ বাতাস যেন এক মহা দুর্যোগের প্রতীক্ষায় থমথম করছে।

'মনু তাড়াতাড়ি তীরে ফিরে এলেন, প্রজাদের জড়ো করে বললেন, 'আমি জানতে পেরেছি এক মহাপ্লাবন আসছে, পৃথিবী ডুবে যাবে। তোমরা যদি বাঁচতে চাও যে-যার নৌকায় ওঠো।'

'মনুর কথায় অনেকেই নৌকায় গিয়ে উঠল। মনু তাঁর স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-পরিজন গরু ছাগল নিয়ে নিজের বড় বড় নৌকা ভরতি করলেন। যারা মনুর কথা বিশ্বাস করল না কিংবা যাদের নৌকা ছিল না তারা মাটিতেই রইল।

'সন্ধ্যাবেলা সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে, সমুদ্র থেকে হুহুঙ্কার শব্দ শোনা গেল। দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে তালগাছের মত উঁচু ঢেউ ছুটে আসছে, তার সঙ্গে ঝড়-তুফান। দেখতে দেখতে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।

'পরদিন সকালবেলা দেখা গেল চারিদিক জলে জলময়, কোথাও মাটির চিহ্নমাত্র নেই। ছোট নৌকাগুলো ঢেউয়ের ঝাপটে সব ডুবে গেছে, কেবল মনুর কয়েকটা বড় নৌকা প্রলয়পয়োধি জলে বটপত্রের মত ভাসছে।'

পণ্ডিতকে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এরকম একটা রসাতল কাণ্ড কেন হল আপনি জানতে পেরেছিলেন?' 'পেরেছিলাম। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করতে পারবে?' 'বলুন, চেষ্টা করে দেখি।'

'পারস্য উপসাগর তখন হ্রদ ছিল, সমুদ্রের সঙ্গে যোগ ছিল না। ম্যাপ দেখলে তার কতকটা আন্দাজ পাবে। হ্রদের উত্তর দিকে দুটো বড় বড় নদী—টাইগ্রিস আর য়ুফ্রেটিস—ক্রমাগত হ্রদের মধ্যে জল ঢালছিল, হ্রদের জল বেড়ে বেড়ে তীর ছাপিয়ে যেতে লাগল। তারপর একদিন জলের চাপে সমুদ্রের দিকের বাঁধ ভেঙ্গে গেল, হ্রদ সমুদ্রে মিশল। হু হু শব্দে জল বেরিয়ে সমুদ্র তোলপাড় করে ছুটতে লাগল। সেই তোড়ে আশপাশের তীরভূমি ডুবে গেল। এই হচ্ছে মহাপ্লাবনের কারণ। মহাপ্লাবনের যত প্রাচীন গল্প আছে সব ঐ পারস্য উপসাগরকে কেন্দ্র করে। ঘটনাটা ঐখানেই ঘটেছিল কি না।'

আমি গুম হইয়া গেলাম। কিন্তু তর্ক করা বৃথা, স্বপ্নের বিরুদ্ধে তর্ক নিষ্ফল। বলিলাম, 'বুঝেছি। তারপর মনুর কথা বলুন।'

পণ্ডিত বলিলেন. 'সাত দিন সাত রাত মনু নৌকায় ভাসতে লাগলেন। রাজ্যের উত্তর সীমানা ঘিরে যে পাহাড় ছিল তার নাম সুমেরু, মনুর নৌকা ঢেউয়ের ধাক্কা খেয়ে সেইদিকে ভেসে চল্‌ল।

'সাত দিন পরে জল নামতে আরম্ভ করল; বানের জল যেমন জোরে আসে তেমনি জোরে নেমে যায়। মনু তখন সুমেরুর গায়ে গিয়ে ঠেকেছেন, একটা চূড়ায় নৌকা বেঁধে ফেললেন।

'ক্রমে সমুদ্রের জল সমুদ্রে ফিরে গেল, আবার ডাঙ্গা জেগে উঠ্‌ল। দেশ যেমন ছিল প্রায় তেমনি আছে, কিন্তু মানুষ সব শেষ হয়ে গেছে। বেঁচে আছেন শুধু মনু আর তাঁর জ্ঞাতিগোষ্ঠী। আর কয়েকটি ছাগল গরু।

'মনু তাই নিয়ে আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করলেন—যাকে বলে কেঁচে গণ্ডূষ।'

এই সময় চা আসিয়া পড়িল। পণ্ডিত পেয়ালা তুলিয়া লইয়া চুমুক দিলেন।

বলিলাম, 'আপনার স্বপ্ন এইখানেই শেষ তো?'

পণ্ডিত বলিলেন, 'আরে রামঃ, আরো অনেক আছে। তুমি ব্যস্ত হয়ে পড়েছ, সংক্ষেপে বলছি। মনুর পর আন্দাজ পাঁচশ' বছর কেটে গেল। মনু দেহরক্ষা করলেন, কিন্তু তাঁর বংশধরেরা আবার দলে ভারী হয়ে উঠল।'

প্রশ্ন করিলাম, 'পাঁচশ' বছর কেটে গেল বলছেন, তার মানে সাড়ে সাত হাজার বছর আগেকার কথা?'

পণ্ডিত বলিলেন, 'মোটামুটি। তখন আকাশে ধ্রুবতারা ছিল না। ধ্রুবতারা এসেছিল আরও দু'হাজার বছর পরে। কিন্তু সে অন্য ধ্রুবতারা, জ্যোতিষে তার নাম Alpha Draconis। বেদে তার উল্লেখ আছে। আজকাল যাকে আমরা ধ্রুবতারা বলি সে অন্য তারা।'

'সর্বনাশ! ধ্রুবতারা আবার কটা আছে?'

'অনেক। কিন্তু জ্যোতিষের জটিল তত্ত্ব তুমি বুঝবে না, সে যাক। মহাপ্লাবনের পর দেশের আবহাওয়া কিছু বদ্‌লেছিল, মাটির ওপর পলি পড়েছিল। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের দু'একটা রাস্তাও খুলে গিয়েছিল।

'মহাপ্লাবনের পর আর্যদের নতুন দেবতা হলেন—বরুণ। তিনি জলের দেবতা, রাখলে রাখতে পারেন, মারলে মারতে পারেন, সুতরাং তাঁকে তুষ্ট করা আগে দরকার। এই বরুণকে কেন্দ্র করে আর্যদের আদিম দেবতা গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। আর্যদের ভাষা তখন বেশ দানা বেঁধেছে কিন্তু তারা লিখতে জানে না। সবই কানে শোনা কথা—শ্রুতি।

'আর্যরা সংখ্যায় বেশ বেড়ে উঠল। তাদের মধ্যে তুক-তাক মারণ উচাটন প্রভৃতি দৈবক্রিয়ার উদ্ভব হল; তারা রোজা হয়ে ভূত ঝাড়ে, ওঝা হয়ে সাপের বিষ নামায়। এটা

অথর্ব বেদের প্রথম যুগ। অথর্ব বেদ নামেও অথর্ব কাজেও অথর্ব, সবচেয়ে পুরোনো; আর্যদের প্রাচীনতম শ্রুতি ওতে ধরা আছে।

'সে যাক। বাইরে যাবার রাস্তা খোলা পেয়ে দু'চার জন উৎসাহী লোক দেশের বাইরে যেতে আরম্ভ করেছিল। বেশীর ভাগই যেত উত্তরদিকে, কারণ পূর্বদিকে পাঞ্জাবের মরুভূমি তখনও শত যোজন জুড়ে পড়ে আছে, তাকে অতিক্রম করা অসাধ্য। যাহোক, বহির্জগতের সঙ্গে আর্যদের অল্প-স্বল্প মেলামেশা আরম্ভ হল; সুমেরু পর্বতের ওপারে কৃষ্ণচক্ষু কৃষ্ণকেশ একজাতীয় মানবের সঙ্গে আলাপ হল।

'এইভাবে আরও কয়েক শতাব্দী কেটে গেল। ইতিমধ্যে আর্যরা কৃষিকার্য শিখে ফেলেছিল, বুনো গমের বীজ বুনে শস্য ফলাতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু তবু দেশের খাদ্যের অনুপাতে মানুষের সংখ্যা এত বেড়ে গিয়েছিল যে, খাদ্যের অনটন দেখা দিল। মৎস্য এবং গোধূম পর্যাপ্ত নয়।

'কিন্তু পুরুষানুক্রমে মৎস্যভোজনের ফলে আর্যদের বুদ্ধি খুব ধারালো হয়েছিল; তারা দলে দলে খাদ্য অন্বেষণে বিদেশে যেতে লাগল। কিন্তু বিদেশে যাবার দুটি মাত্র পথ; এক সমুদ্র, দ্বিতীয় উত্তর দিক। আর্যদের মধ্যে যারা মৎস্যজীবী, তারা নৌকা নিয়ে সমুদ্রে বেরিয়ে পড়ল। এরাই পরে পাণি বা ফিনিশিয়ান নামে পরিচিত হয়েছিল, দক্ষিণে লঙ্কা এবং উত্তরে ইংলন্ড পর্যন্ত উপনিবেশ স্থাপন করেছিল।

'দ্বিতীয় দল গেল সুমেরুর গিরিসঙ্কট পার হয়ে মাটির পথে। আর্যদের উত্তরাভিযান আরম্ভ হল। এই অভিযান তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে পারস্য গ্রীস রাশিয়া পার হয়ে স্কাণ্ডিনেভিয়া পর্যন্ত পৌঁছেছিল।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ আপনি স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলছেন, না ইতিহাস বলছেন?'

পণ্ডিত বলিলেন, 'ইতিহাসে অন্য কথা আছে, আমি যা স্বপ্ন দেখেছি তাই বলছি। কিন্তু সাহেবের লেখা ইতিহাসই সত্য আর আমার স্বপ্ন মিথ্যা, তার প্রমাণ কি?'

পণ্ডিতকে ঘাঁটাইয়া লাভ নাই, বলিলাম, 'কোনও প্রমাণ নেই। তারপর বলুন।'

'তারপর আমার স্বপ্নের ক্লাইম্যাক্স।'

'যাক, স্বপ্ন তাহলে শেষ হয়ে আসছে? কিন্তু কই, আর্যরা ভারতবর্ষে তো এল না!'

'এইবার আসছে। সেইখানেই ক্লাইম্যাক্স।'

পণ্ডিত আবার আরম্ভ করিলেন, 'উত্তরদিকে যারা অভিযান করল তারা অধিকাংশই ফিরে এল না, দু'চার জন ফিরে এল। যারা ফিরে এল তাদের মধ্যে একজনের নাম —ইন্দ্র।

'ইন্দ্র গোড়ায় মানুষ ছিলেন; সাধারণ মানুষ, একজন যোদ্ধা। কিন্তু অসাধারণ তাঁর বুদ্ধি, দুর্দম সাহস। যুগে যুগে যে-সব মানুষ জাতিকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে, ইন্দ্র তাদেরই একজন। যুগাবতার বলতে পার। ইন্দ্র দলবল নিয়ে উত্তরদিকে গিয়েছিলেন, অনের বছর পরে যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর সঙ্গে একপাল ঘোড়া! দেশের লোক আগে কখনও ঘোড়া দেখেনি, ঘোড়া দেখে চমৎকৃত হয়ে গেল। উচ্চৈঃশ্রবার নাম শুনেছ বোধ হয়। দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রের কেবল ঘোড়া ছিল আর কারুর ছিল না।

'ইন্দ্র ঘোড়া নিয়ে দেশে ফিরে এলেন, কিন্তু বেশী দিন চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। চুপ করে বসে থাকার লোক তিনি নন। আবার সদলবলে অভিযানে বেরুলেন। এবার পূর্বদিকে। ইন্দ্র স্থির করলেন, পূর্বদিকে কতদূর যাওয়া যায় তিনি পরীক্ষা করে দেখবেন। মরুভূমির পরপারে কী আছে? মরুভূমি কি পার হওয়া যায় না?

'ইন্দ্রের অশ্বারোহীর দল পূর্বদিকে চলল। বেলুচিস্থানের পূর্ব সীমানা থেকে মরুভূমি আরম্ভ হয়েছে। ইন্দ্র বারবার মরুভূমি উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। মরুভূমি তো নয়, জ্বলন্ত দাবানল। ব্যর্থ হয়ে ইন্দ্র মরুভূমির কিনারা ধরে উত্তরে মুখে চললেন। হয়তো উত্তরে মরু পার হবার পথ আছে।

'কুটিল কর্কশ পথ; জলের বড় কষ্ট। তবু ইন্দ্র নিরস্ত হলেন না। মাসের পর মাস কেটে গেল, বছর কেটে গেল, ইন্দ্র পাহাড়-মরুর সন্ধিরেখা ভেদ করে চলেছেন। ঘোড়া ছিল বলেই পেরেছিলেন, পদব্রজে পারতেন না।

'কিন্তু পথ যত দুর্গমই হোক, কোথাও তার শেষ আছে। একদিন ইন্দ্র কাশ্মীর প্রান্তে গিয়ে পৌঁছুলেন। কাশ্মীর তখন ভূস্বর্গ নয়, প্রকাণ্ড একটি হ্রদ। ইন্দ্র দেখলেন হ্রদের জল কানায় কানায় টলমল করছে, তাকে সাপের মত বৃত্তাকারে ঘিরে রেখেছে কৃষ্ণবর্ণ পাহাড়ের শ্রেণী। ইন্দ্র অঞ্জলি ভরে জল পান করলেন; দেখলেন মিষ্টি জল।

'হ্রদের দিকে চেয়ে চেয়ে ইন্দ্রের মস্তিষ্কে একটা প্রচণ্ড আইডিয়া খেলে গেল। আজ-কালকার দিনেও কোনও আমেরিকান বা রুশ ইঞ্জিনীয়ারের মাথায় এতবড় দুঃসাহসিক আইডিয়া সহজে আসে না। ইন্দ্র ভাবলেন, সিন্ধুকে অর্থাৎ সমুদ্রকে যদি কোনও মতে পর্বতরূপী বৃত্রাসুরের নাগপাশ থেকে মুক্তি দিতে পারি, তাহলে এই সিন্ধু নিম্নাভিমুখে মরুভূমির উপর দিয়ে ধাবিত হবে, যা এখন ঊষর মরুভূমি আছে তা জলসিক্ত হয়ে শ্যামল ভূমি হবে, মরুর উপর পথ তৈরি হবে...

'ইন্দ্র শুধু ভাবুক নয়, কর্মীপুরুষ! তিনি তাঁর ভাবনাকে কার্যে পরিণত করবার জন্যে মহা উদ্যমে লেগে গেলেন।

'কাজটি কিন্তু সহজ নয়, অনেক দিন লাগল। হ্রদের কিনারে কিনারে বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর ইন্দ্র একটা জায়গা পেলেন যেখানে পাহাড়ের বাঁধ কিছু দুর্বল, দু'-চারটি বড় বড় পাথরের চাঁই সরাতে পারলেই জল নিকাশের একটা রাস্তা হয়। একবার একটা রাস্তা পেলে জল নিজের জোরেই রাস্তা প্রশস্ত করে নেয়, তখন আর তাকে ঠেকায় কে?

'ইন্দ্র ঐ পাথরগুলো সরাবার উদ্যোগ করলেন।

'কিন্তু মানুষের দৈহিক শক্তিতে ও পাথর সরানো সম্ভব নয়। ইন্দ্র ঘোড়া লাগালেন; চর্মরজ্জু দিয়ে পাথর বেঁধে ঘোড়ারা টানতে লাগল। প্রথমে পাথর কিছুতেই নড়ে না, তারপর অনেক টানাটানির পর হঠাৎ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল।

'সঙ্গে সঙ্গে প্রবল তোড়ে জল বেরুতে লাগল। এত তোড় ইন্দ্রও আশা করেননি, রন্ধ্র পথে জলের উত্তাল ধারা সগর্জনে ছুটল। অন্য ঘোড়াগুলো রক্ষা পেল বটে কিন্তু ইন্দ্রের নিজস্ব ঘোড়াটা এই দুর্বার স্রোতের আঘাতে চূর্ণ হয়ে ভেসে গেল। ইন্দ্রের ঘোড়ার নাম ছিল—দধীচি।'

পণ্ডিত চুপ করিলেন। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিলাম, 'তারপর?'

পণ্ডিত বলিলেন, 'এইখানেই আমার স্বপ্ন শেষ। কিন্তু মন থেকে আরও কিছু জুড়ে দিতে পারি। সিন্ধুকে প্রবাহিত করার ফলে একদিকে যেমন পাঞ্জাব থেকে সিন্ধু পর্যন্ত সঞ্জীবিত হয়ে উঠল, অন্যদিকে তেমনি কাশ্মীর জলের তলা থেকে উঠে এল। ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে যে অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক ব্যবধান ছিল তা ভেঙে পড়ল। স্থলপথে বহির্জগতের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হল। ইন্দ্র এই কীর্তির কর্তা; তাই ইন্দ্র দেবরাজ।'

আমি বলিলাম, 'একটা কথা। আপনার হিসেবে এই ব্যাপার ঘটেছিল আজ থেকে সাত হাজার বছর আগে। কিন্তু ইন্দ্র কি অত পুরোনো দেবতা?'

পণ্ডিত বলিলেন, 'ইন্দ্র মানুষটা সাত হাজার বছরের পুরোনো বটে কিন্তু দেবত্ব লাভ করতে তাঁর আরও দু'হাজার বছর লেগেছিল। আজকাল মানুষের দেবত্ব লাভ যত সহজ, তখন তত সহজ ছিল না। সিন্ধু নদ এবং আরও অনেকগুলি নদী বেরিয়ে পাঞ্জাবকে শস্যশ্যামল করে তোলবার পর আর্যরা অনেকে এসে সপ্তসিন্ধুর তীরে উপনিবেশ স্থাপন করলেন। নূতন দেশের সতেজ জল-হাওয়ায় আর্যদের এক নূতন সংস্কৃতি জন্মলাভ করল। পাঞ্জাবের এই নূতন আর্যরাই বরুণ দেবতাকে সরিয়ে ইন্দ্রকে প্রধান দেবতার পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। ইন্দ্রপূজার প্রথম দেশ হল সেই দেশ, যাকে ইন্দ্র মরুভূমির বুক থেকে টেনে তুলেছিলেন।

'দেশটা ইন্দ্রের দেশ বলে পরিচিত হল; প্রাচীন দেশ অবশ্য বরুণের দেশই রইল। ইন্দ্রের দেশে যারা বাস করতে লাগল, তাদের নাম হল ইন্দু। কালক্রমে ইন্দু অপভ্রংশ হয়ে দাঁড়াল হিন্দু। এখনও সেই নাম চলে আসছে। আমরা হিন্দু, অর্থাৎ ইন্দ্রপূজক।'

'তারপর?'

'তারপর ইতিহাস পড়। সূর্যবংশে সগর নামে এক রাজা ছিলেন শুনেছ বোধ হয়। কিন্তু তিনি ভারতবর্ষের লোক নন, সুমেরু দেশের রাজা প্রথম সারগণ, খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার অব্দের কথা। আর্যরা তখন সুমেরু পর্বতের উত্তরে অনেক রাজ্য স্থাপন করেছেন, আবার ভারতবর্ষেও তাঁদের উপনিবেশ পূর্বদিকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। সারগণ বা সগর রাজার এক পুত্র ষাট হাজার প্রজা নিয়ে কোনও কারণে আদিম জন্মভূমি ছেড়ে ভারতবর্ষে অভিযান করেছিল। শেষ পর্যন্ত তারা অযোধ্যায় এসে রাজ্য স্থাপন করেছিল।

'সেই থেকে সূর্যবংশের একটা শাখা ভারতবর্ষেই আছে। রামচন্দ্র হলেন সগর রাজার অধস্তন নবম পুরুষ; তিনি ভারতবর্ষেই জন্মেছিলেন। এসব নেহাত হালের কথা।'

পণ্ডিত বোধ করি আরও কিছুক্ষণ তাঁহার স্বপ্নাদ্য ইতিহাস শুনাইতেন, কিন্তু এই সময় পণ্ডিতগৃহিণী আসিয়া বলিলেন, 'রবিবার বলে কি আজ নাওয়া খাওয়ারও ছুটি? যাও, স্নান করগে।'

পণ্ডিত স্নান করিতে চলিয়া গেলেন। আমি পণ্ডিতগৃহিণীকে বলিলাম, 'বৌদি, আপনার কর্তার পেট গরম হয়েছে। ওঁকে আর কাঁকড়া খাওয়াবেন না। বরং রাত্রে শোবার সময় একটু ত্রিফলার জল দেবেন।'

১৮ আষাঢ় ১৩৫৫

শঙ্খ-কঙ্কণ

প্রথম আবর্ত

এক

দিল্লী দখল করিবার পর মুসলমান সুলতানেরা দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্যের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করেন নাই। বিন্ধ্য গিরিমালা এবং নর্মদা নদী যেন প্রাকার-পরিখা রচনা করিয়া তাঁহাদের নিরস্ত করিয়াছিল।

প্রথম প্রাকার-পরিখা লঙ্ঘন করিলেন আলাউদ্দিন খিলজি। তিনি পরে অন্নদাতা পিতৃব্যকে হত্যা করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রণপাণ্ডিত্য ছিল, আর ছিল অনির্বাণ নারীতৃষ্ণা। এই দুই মিলিয়া তাঁহার চরিত্র পিশাচতুল্য করিয়া তুলিয়াছিল। ভারতের অন্ধকার মধ্যযুগেও তাঁহার সমান বিশ্বাসঘাতক নৃশংস ইন্দ্রিয়-পরায়ণ সুলতান বোধহয় বেশী ছিল না।

দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিয়া আলাউদ্দিন বেশীদূর অগ্রসর হন নাই, দেবগিরির রাজ্য ছলনার দ্বারা জয় করিয়া প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠনপূর্বক স্বরাজ্যে ফিরিয়া গিয়াছিলেন; তারপর পিতৃব্যকে হত্যা করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তঃপুরে সুন্দরী যুবতীর অভাব ছিল না, তবু তিনি গুজরাতের রানী কমলাকে কাড়িয়া আনিয়া নিজের অঙ্কশায়িনী করিয়াছিলেন।

সুন্দরী নারী, রাজরানী হোক বা পথের ভিখারিনী হোক, আলাউদ্দিনের চোখে পড়িলে আর তার নিস্তার নাই। তিনি একবার চিতোরের পদ্মিনীর দিকেও হাত বাড়াইয়াছিলেন, কিন্তু সেই জ্বলন্ত অনলশিখাকে স্পর্শ করিতে পারেন নাই। নারী-বিজয়-ক্ষেত্রে দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিনের ইহাই একমাত্র ব্যর্থতা।

কিন্তু দিল্লী বহুত দূর। দিল্লী হইতে দুই শত ক্রোশ দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরির ক্রোড়ে সাতপুরা শৈলমালার জটিল আবর্তের মধ্যে এই কাহিনীর সূত্রপাত।

দুই

সাতপুরা শৈলমালার জটিল আবর্তের মধ্যে এই সময় সাতটি ছোট ছোট রাজ্য ছিল। হয়তো সাতপুরা পর্বতের নাম এই সাতটি রাজ্য হইতে আসিয়াছে। অতি ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি; কবে তাহাদের জন্ম হইয়াছিল এবং কবে তাহারা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে ইতিহাস তাহা লক্ষ্য করে নাই। কিন্তু সুলতান আলাউদ্দিনের কালে তাহারা জীবিত ছিল এবং পরস্পরের সহিত কলহ না করিয়া পরম শান্তিতে বাস করিতেছিল। রাজ্য-গুলির মাঝখানে পর্বতের ব্যবধান থাকায় লড়াই ঝগড়ার উপলক্ষ্য ছিল না।

একদিন ভাদ্রমাসের দ্বিপ্রহরে এক পথভ্রান্ত পথিক এই জটিলকুটিল গিরিসঙ্কটের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আকাশে মেঘ নাই। এখানে অল্পই বৃষ্টি হয়, যেটুকু হয় পাহাড় তাহা গায়ে মাখে না; বৃষ্টির জল সহস্র প্রণালীপথে নামিয়া উপত্যকাগুলিতে সঞ্চিত হয়। এই উপত্যকাগুলিতে মানুষের বাস।

পথিক এক গুহায় রাত্রি কাটাইয়া প্রভাতে লোকালয়ের সন্ধানে বাহির হইয়াছে,

কিন্তু এখনও লোকালয় খুঁজিয়া পায় নাই। সে এ অঞ্চলের মানুষ, নয়, দক্ষিণ দিক হইতে আসিয়াছে। দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড সূর্যতাপ চারিদিকের উলঙ্গ পর্বতে প্রতিফলিত হইয়া বহ্নিকলাপের মত জ্বলিতেছে। কিন্তু সেদিকে পথিকের ভ্রূক্ষেপ নাই।

পথিকের বয়স অনুমান বাইশ-তেইশ বছর। সুঠাম বেত্রবৎ দেহ, দেহের বর্ণও বেত্রবৎ। মুখের গঠন খড়্গের ন্যায় শাণিত, কিন্তু মুখের ভাব শান্ত ও সহিষ্ণু। চোখের দৃষ্টি শ্যেনপক্ষীর ন্যায় সুদূরপ্রসারী, কিন্তু তাহাতে শ্যেনপক্ষীর হিংস্রতা নাই। মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত পড়িয়াছে; ঠোঁটের উপর অল্প গোঁফ। পরিধানে একখণ্ড বস্ত্র কটি হইতে জঙ্ঘা পর্যন্ত আবৃত করিয়াছে, দ্বিতীয় একখণ্ড বস্ত্র উত্তরীয়ের আকারে স্কন্ধের উপর ন্যস্ত। হাতে ধনু এবং তিনটি বাণ।

পথিক দুইটি শৈলের মধ্যবর্তী লম্বা খাঁজের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিল; কোথাও জনবসতির চিহ্ন নাই, যেদিকে সে চলিয়াছে সেদিকে কোথাও নির্গমনের পথ আছে কিনা তাহাও দেখা যায় না। সে তখন আকাশের দিকে চোখ তুলিল।

আকাশ শূন্য, কেবল বহু ঊর্ধ্বে বায়ু-কোণে এক জোড়া নিরালম্ব গুম্ফ উড়িতেছে। চিল কিংবা শকুন। পথিক অনুমান করিল, ঐদিকে চিল যেখানে উড়িতেছে তাহার নিম্নে লোকালয় থাকিতে পারে। সে অগ্রসর হইয়া চলিল।

ক্রোশেক পথ চলিবার পর হঠাৎ পাশের দিকে পাহাড়ের গায়ে একটি সংকীর্ণ ফাটল মিলিল। উপলবিকীর্ণ নিম্নাভিমুখী রন্ধ্র, এই পথে জল বাহির হইয়া নিম্নতর স্তরে গিয়াছে। দেখা যাক। পথিক রন্ধ্রমধ্যে প্রবেশ করিল।

আঁকাবাঁকা রন্ধ্রপথে কিছু দূর চলিবার পর এক ঝলক হরিদাভা পথিকের চোখের উপর দিয়া খেলিয়া গেল। তারপর সে রন্ধ্রমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে ঈষৎ নিম্ন-ভূমিতে ক্ষুদ্র একটি উপত্যকা; তাহার মাঝখানে শষ্পশয্যার উপর দর্পণের মত জল সূর্যকিরণ প্রতিফলিত করিতেছে। এই তড়াগের চারিপাশে কয়েকটি তালবৃক্ষ শীর্ণ প্রহরীর ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে; কিছু ঝোপঝাড়ও আছে। মানুষ দেখা যাইতেছে না বটে, কিন্তু অদূরে কয়েকটি ভগ্নপ্রায় শিলাকুটির দৃষ্টিগোচর হয়।

পথিক দ্রুত জলের কিনারায় নামিয়া গেল, নতজানু হইয়া গণ্ডূষ ভরিয়া জল পান করিল। জলপানে শরীর স্নিগ্ধ করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। এবার কিছু খাদ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন, তাহার সঙ্গে যে সামান্য খাদ্য ছিল তাহা ফুরাইয়া গিয়াছে। কিন্তু গ্রামবাসীরা অতিথিবৎসল হইয়া থাকে, খাদ্য সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না।

সে এদিক-ওদিক চাহিয়া পাড়ের উপর নিকটতম শৈল-কুটিরের দিকে পা বাড়াইল। কুটিরের তালপাতার ছাউনি অদৃশ্য হইয়াছে, কেবল দেওয়ালগুলা দাঁড়াইয়া আছে। তবু ভিতরে নিশ্চয় মানুষ পাওয়া যাইবে।

দুই পা অগ্রসর হইয়া পথিক সহসা দাঁড়াইয়া পড়িল; দেখিল, একটি ঝোপের অভ্যন্তর হইতে জনৈক শীর্ণকায় ব্যক্তি হামাগুড়ি দিয়া বাহির হইতেছে। চোখাচোখি হইতেই লোকটি বলিয়া উঠিল—'ওহে, তোমার কাছে খাদ্যদ্রব্য কিছু আছে?'

পথিক নিকটে গেল, শীর্ণকায় লোকটি উঠিয়া দাঁড়াইল। পথিক দেখিল, লোকটির বয়স অনুমান পঞ্চাশ, বেশভূষা ভদ্র, পায়ে পাদুকা, মাথায় উষ্ণীষ। সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল—'আমার সঙ্গে তো খাদ্যদ্রব্য নেই, কেবল তীরধনুক আছে।'

'তীরধনুক তো খাওয়া যাবে না। হা হতোস্মি! এখন উপায়?' বলিয়া শীর্ণ ব্যক্তি বুক চাপড়াইল। তাহার ভাবভঙ্গী ও বাচনশৈলীতে হতাশার সহিত ঈষৎ হাস্যরস মিশ্রিত আছে।

ধনুর্ধর যুবক একটু কৌতুক অনুভব করিয়া বলিল—'আপনি কে?'

প্রৌঢ় ব্যক্তি বলিলেন—'আমার নাম ভট্ট নাগেশ্বর, আমি পঞ্চমপুরের রাজা শ্রীমৎ ভূপ সিংহের বয়স্য। রাজা আমাকে গোপনীয় দূতকার্যে সপ্তমপুরে পাঠিয়েছিলেন, একাই গিয়েছিলাম। সপ্তমপুরে কাজ সেরে ফেরার পথে এখানে দুপুর হয়ে গেল; ভাবলাম, মধ্যাহ্নভোজনটা এখানে সেরে নিয়ে ঝোপঝাড়ের ছায়ায় একটু বিশ্রাম করে বেলা তৃতীয় প্রহরে আবার যাত্রা করব; তাহলে সন্ধ্যার আগেই গৃহে ফিরতে পারব। জলের ধারে গিয়ে খাবারের পুঁটুলি খুলে বসেছি, মাত্র এক গ্রাস মুখে দিয়েছি, এমন সময়—হা হতোস্মি! কোথাকার এক ম্লেচ্ছপুত্র চিল ছোঁ মেরে খাবারের পুঁটুলি নিয়ে উড়ে গেল। সেই থেকে ঝোপের ছায়ায় বসে আছি, ক্ষুধায় পেট জ্বলে যাচ্ছে।'

যুবক বলিল—'কিন্তু গ্রামে লোক আছে, তাদের কাছে খাদ্য সংগ্রহ করা কি সম্ভব নয়?'

ভট্ট নাগেশ্বর চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন—'গ্রাম! গ্রাম কোথায়? হা হতোস্মি, বহু বৎসর আগে গ্রাম ছিল বটে, কিন্তু ম্লেচ্ছপুত্র আলাউদ্দিন সব শেষ করে দিয়ে গিয়েছে। এখানে আর মানুষের বাস নেই।'

আলাউদ্দিনের নাম শুনিয়া যুবক একটু চকিত হইল। নামটা তাহার অপরিচিত নয়। সে বলিল—ম্লেচ্ছপুত্র আলাউদ্দিন!'

নাগেশ্বর বলিলেন—'নাম শোনোনি? দিল্লীর ম্লেচ্ছ রাজা। সতেরো বছর আগে সে এই পথে দাক্ষিণাত্যে অভিযান করেছিল, তার সেনা-বাহিনীর পথে যেসব নগর জনপদ পড়েছিল সব শূন্য হয়ে গিয়েছে। পঞ্চমপুরেও এই মহাপিশুন পদার্পণ করেছিল—। কিন্তু যাক, শূন্য উদরে ম্লেচ্ছ-প্রসঙ্গ ভাল লাগে না। এস, ঝোপের ছায়ায় বসা যাক।'

যুবক বলিল—'কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের কী হবে?'

নাগেশ্বর বলিলেন—'কি আর হবে। আপাতত পেটে মুষ্ট্যাঘাত করে ক্ষুধা নিবারণ করা ছাড়া গতি নেই।—এখন তোমার পরিচয় দাও। কে তুমি, কোথায় যাচ্ছ?'

প্রশ্নের উত্তর না দিয়া যুবক ঊর্ধ্বে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। একটি তালগাছের শীর্ষে কিছুক্ষণ চক্ষু নিবদ্ধ রাখিয়া বলিল—'তাল পেকেছে মনে হচ্ছে।'

নাগেশ্বর বলিলেন—'তা পেকেছে, আমি দেখেছি। কিন্তু তাল পাকলে আমার কী? আমি তালগাছে চড়তে জানি না, তালগাছও আমার প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে ফল বিসর্জন দেবে না। আমি সবগুলো তালগাছের গোড়া খুঁজে দেখেছি, একটিও তাল নেই।'

যুবক তালগাছের নিকটে গিয়া পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে বলিল—'তালগাছের ডগা ষাট হাতের বেশী হবে না। তাল পাড়া যেতে পারে।'

নাগেশ্বর উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন—'পাড়া যেতে পারে! বল কি! তুমি তালগাছে উঠতে পারো নাকি?'

যুবক বলিল—'না, তীরধনুক দিয়ে তাল পাড়ব।'

যুবক একটি তীর বাছিয়া লইয়া বাকি দুইটি তীর মাটিতে রাখিল, ধনুতে শর-যোজনা করিয়া সাবধানে লক্ষ্য স্থির করিল, আকর্ণ ধনুর্গুণ টানিয়া ঊর্ধ্বদিকে তীর ছাড়িয়া দিল। টঙ্কার শব্দে তীর ছুটিয়া গেল, মুহূর্তমধ্যে তীরবিদ্ধ পাকা তাল ধপ্ করিয়া মাটিতে পড়িল।

নাগেশ্বর ছুটিয়া গিয়া বৃহৎ তালটিকে কোলে তুলিয়া লইলেন, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন—'চমৎকার! তুমি দেখছি অর্জুনের চেয়ে বড় ধনুর্ধর। অর্জুন মৎস্যচক্ষু বিদ্ধ করে পেয়েছিলেন এক নারী, আর তুমি আকাশ থেকে আহরণ করে এনেছ সুপক্ক

তালফল। ক্ষুধার সময় নারীর চেয়ে তালফল অনেক বেশী মুখরোচক।—এস এস, আর দেরি নয়, বসে যাওয়া যাক।'

দুইজনে এক গুল্মের ছায়াতলে গিয়া বসিলেন। তাল হইতে শর বাহির করিয়া তালটি ভাগাভাগি করা হইল। উভয়ে আহার আরম্ভ করিলেন।

পেট কথঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হইলে নাগেশ্বর বলিলেন—'তোমার পরিচয় তো বললে না!'

যুবক বলিল—'আমার নাম ময়ূর।'

'ময়ূর! ময়ূর সিংহ, না ময়ূর বর্মা, না ময়ূর ভট্ট?'

'শুধু ময়ূর।'

'তা ভাল। ময়ূর যখন, তখন নামের পিছনে পুচ্ছের কী প্রয়োজন।—তোমার দেশ কোথায়?'

'তাপ্তি নদীর দক্ষিণে।'

'কোথায় চলেছ?'

'শুনেছিলাম ওদিকে সাতটি রাজ্য আছে। তাই এসেছিলাম যদি কাজ পাই।'

'ভাল ভাল। বৎস ময়ূর, তুমি ঠিকই শুনেছ, এই পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে সাতটি রাজ্য আছে; প্রথমপুর থেকে আরম্ভ করে সপ্তমপুর পর্যন্ত। কিন্তু এই গোলকধাঁধার মধ্যে তুমি খুঁজে পাবে না। খোঁজাখুঁজির প্রয়োজনও নেই। তুমি আমার সঙ্গে চল, কাজ পাবে! তুমি যে-রকম অব্যর্থ তীরন্দাজ, মহারাজ নিশ্চয়ই তোমাকে অনুগ্রহ করবেন।'

ময়ূর শান্তস্বরে বলিল—'ভাল।'

তালফল যখন শেষ হইল তখন দেখা গেল দুইটি ক্ষুধিত মানুষের পেট ভরিয়াছে। তাঁহারা জলাশয়ে গিয়া হাত-মুখ ধুইলেন। ইতিমধ্যে সূর্য অনেকখানি পশ্চিমে ঢলিয়াছে, রৌদ্রের তেজ কমিয়াছে। ভট্ট নাগেশ্বর ময়ূরকে লইয়া পঞ্চমপুরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি গোলকধাঁধার পথ চেনেন, কুটিল গিরি-বর্ত্ম ধরিয়া পথ দেখাইয়া চলিলেন।

ভট্ট নাগেশ্বর অতি সহৃদয় ব্যক্তি; কিন্তু তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, উপরন্তু রাজবয়স্য; তাই বাক্-বাহুল্যের দিকে তাঁহার স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। সুবিধা পাইলেই তিনি কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া দিতেন, একটি শ্রোতা থাকিলেই হইল।

চলিতে চলিতে তিনি হা হতোস্মি করিয়া আরম্ভ করিলেন—'সপ্তপুরের আর বেশীদিন নয়। রক্তপিপাসু ম্লেচ্ছ জাতি দাক্ষিণাত্যের স্বাদ পেয়েছে, তারা আবার এই পথে আসবে। তখন সপ্তপুর ধুলো হয়ে উড়ে যাবে। এতদিন তারা আসেনি কেন এই আশ্চর্য। প্রথমবার ম্লেচ্ছ এসেছিল ঘূর্ণিবাত্যার মত; এবার আসবে মহাপ্লাবনের মত, সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।'

ময়ূর জিজ্ঞাসা করিল—'প্রথমবার কী হয়েছিল?'

ভট্ট নাগেশ্বর তখন মহা উৎসাহে গল্প বলিতে লাগিলেন—

সপ্তদশ বৎসর আগে নর্মদা ও তাপ্তি নদীর মধ্যবর্তী এই ভূখণ্ডে পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতেছিল। সাতটি রাজ্যের সাত রাজা পরম সুখে প্রজাদের শাসন-পালন করেন, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ নাই, বরং কুটুম্বিতা আছে। বহির্জগতের সহিত সম্পর্ক নামমাত্র; জিগীষু রাজারা এই শুষ্ক দেশের দিকে লুব্ধ কটাক্ষপাত করেন না। সাতটি রাজ্যের নামকরণেও অভিমানের চিহ্ন নাই; প্রথমপুর, দ্বিতীয়পুর ইত্যাদি নামেই তাঁহারা সন্তুষ্ট। যেন সাতটি কপোত-মিথুন পর্বতের খোপেখোপে সাতটি নিভৃত নীড় রচনা করিয়াছে।

হঠাৎ একদিন ঈশান কোণে মেঘ দেখা দিল। ম্লেচ্ছ সেনাপতি আলাউদ্দিন দক্ষিণ-বিজয়ে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে বহু সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য। আলাউদ্দিন সসৈন্যে বিন্ধ্যগিরি উত্তীর্ণ হইলেন, নর্মদার উত্তাল তরঙ্গমালা তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না। তিনি দাক্ষিণাত্যের দ্বারমুখে উপস্থিত হইলেন।

আলাউদ্দিনের যাত্রাপথ পূর্ব হইতে নির্ণীত ছিল; তিনি পঞ্চমপুরের উপত্যকায় প্রবেশ করিয়া শিবির ফেলিলেন। এখানে কিছুদিন সৈন্যদলকে বিশ্রাম দিয়া আবার অগ্রসর হইলেন।

পঞ্চমপুর আলাউদ্দিনের যাত্রাপথে পড়িয়াছিল, ইহা পঞ্চমপুরের দুর্ভাগ্য। অন্য ছয়টি রাজ্য বাঁচিয়া গিয়াছিল। আলাউদ্দিনকে প্রতিরোধ করিবার শক্তি পঞ্চমপুরের রাজা ভূপ সিংহের ছিল না; এমনকি সাত জন রাজা একজোট হইলেও আলাউদ্দিনের কোনও ক্ষতি করিতে পারিতেন না। তাই ভূপ সিংহ নতমস্তকে আলাউদ্দিনের দুরভিযান সহ্য করিলেন।

পঞ্চমপুর রাজ্য একটি বিস্তীর্ণ উপত্যকায় অবস্থিত; উপত্যকার মাঝখান দিয়া ক্ষুদ্র নদী বহিয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্র রাজ্যের ক্ষুদ্র রাজধানী, ক্ষুদ্র রাজপুরী, আশেপাশে গ্রাম জনপদ শস্যক্ষেত্র। আলাউদ্দিন পঞ্চমপুর জয় করিতে আসেন নাই, ইহা তাঁহার পথি-পার্শ্বস্থ পান্থশালা মাত্র। ভূপ সিংহ নিরুপায়ভাবে দিন গণিতে লাগিলেন, কতদিনে আপদ দূর হইবে।

ম্লেচ্ছ সৈন্যদল অবাধে গৃহলুণ্ঠন করিল, নারীধর্ষণ করিল, অকথ্য অত্যাচার করিতে লাগিল। এদেশের লোক পূর্বে কখনও ম্লেচ্ছ দেখে নাই, তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল। মানুষ যে এমন হইতে পারে তাহা তাহাদের ধারণার অতীত।

তারপর একদিন আলাউদ্দিনের শিবিরে ভূপ সিংহের তলব হইল। না যাইলে গলায় দড়ি দিয়া টানিয়া লইয়া যাইবে; ভূপ সিংহ ম্লেচ্ছের দরবারে গেলেন। আলাউদ্দিন বলিলেন, তিনি জানিতে পারিয়াছেন রাজার একটি সুন্দরী কন্যা আছে, সেই কন্যাকে সেনাপতির কাছে সওগাত পাঠাইতে হইবে।

বক্ষে তুষানল জ্বালিয়া রাজা ফিরিয়া আসিলেন। রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন প্রবীণ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি, তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া রাজা এক চাতুরী অবলম্বন করিলেন; রাজপুরীতে সীমন্তিনী নামে এক নবযৌবনা রূপসী দাসী ছিল, তাহাকে রাজকন্যা সাজাইয়া দোলায় তুলিয়া শিবিরে পাঠাইয়া দিলেন। আসল রাজকন্যাকে পুরীর এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে লুকাইয়া রাখা হইল।

কিন্তু আলাউদ্দিনের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করা সহজ নয়। সপ্তাহকাল পরে তিনি দাসী সীমন্তিনীকে ফেরত দিলেন এবং রাজপুরী তল্লাস করিয়া রাজকন্যাকে ধরিয়া লইয়া গেলেন। রাজকন্যার নাম ছিল শিলাবতী।

অতঃপর যবন সৈন্য বিশ্রাম শেষ করিয়া দক্ষিণ দিকে চলিয়া গেল। শিলাবতীকে আলাউদ্দিন সঙ্গে লইয়া গেলেন। তিনি আর এ পথে আসেন নাই, অন্য পথে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন; পিতৃব্যকে হত্যা করিয়া সুলতান হইয়াছিলেন। শিলাবতীর কি হইল কেহ জানে না। হয়তো তিনি বিষপান করিয়াছিলেন, হয়তো বা দিল্লীর হারেমে আলাউদ্দিনের অসংখ্য উপপত্নীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া এখনও বাঁচিয়া আছেন।

সে-সময় ভূপ সিংহের পরিবারে ছিলেন তাঁহার রানী ঊষাবতী, ষোড়শী কন্যা শিলাবতী, দ্বাদশ বর্ষীয় বালকপুত্র রামরুদ্র এবং সদ্যোজাত কন্যা সোমশুক্লা। আলাউদ্দিন যখন শিলাবতীকে হরণ করিয়া লইয়া যান তখন রানী ঊষাবতী সূতিকাগৃহে ছিলেন। তিনি এই দারুণ আঘাত সহ্য করিতে পারিলেন না, প্রসূতিগৃহেই তাঁহার মৃত্যু

হইল। দাসী সীমন্তিনী শিশু সোমশুক্লাকে নিজের বুকে তুলিয়া লইল।

সীমন্তিনীর গর্ভাধান হইয়াছিল; যথাকালে সে একটি কন্যা প্রসব করিল। সে নুন খাওয়াইয়া কন্যাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু ভূপ সিংহ নিষেধ করিলেন—'না, আলাউদ্দিনের কন্যাকে বাঁচিয়ে রাখো, হয়তো পরে প্রয়োজন হবে।'

আলাউদ্দিনের কন্যা বাঁচিয়া রহিল, মাতার বিষদৃষ্টির সম্মুখে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। তার নাম হইল—চঞ্চরী।

ভূপ সিংহের বুকে যে শেল বিঁধিয়াছিল তাহা বিঁধিয়া রহিল। তিনি উদার ও মহৎ চরিত্রের পুরুষ ছিলেন, এখন তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত মূর্তি ধারণ করিল। অপমান ও লাঞ্ছনায় জর্জরিত হৃদয়ে তিনি কেবল প্রতিহিংসা সাধনের জন্য জীবিত রহিলেন। কিন্তু দিল্লীর সুলতানের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা সাধন সামান্য ভূস্বামীর পক্ষে সহজ নয়। দিন কাটিতে লাগিল।

আট বৎসর পরে ভূপ সিংহ পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন—'রামরুদ্র, তোমার বয়স বিশ বৎসর পূর্ণ হয়েছে। কলঙ্কমোচনের সময় উপস্থিত।'

রামরুদ্র বলিলেন—'আমি প্রস্তুত আছি।'

ভূপ সিংহ পুত্রের হস্তে ছুরিকা দিয়া বলিলেন—'দিল্লী যাও, এই ছুরি দিয়ে নর-পিশাচকে গুপ্তহত্যা কর।'

পরদিন রামরুদ্র পাঁচজন সঙ্গী লইয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন। দীর্ঘ পথ; ভূপ সিংহের দীর্ঘ প্রতীক্ষা আরম্ভ হইল।

এক বৎসর পরে দুইজন সঙ্গী ফিরিয়া আসিল। জল্লাদের হাতে রামরুদ্রের মৃত্যু হইয়াছে। একদিন আলাউদ্দিন রক্ষীপরিবৃত হইয়া অশ্বারোহণে দিল্লীর রাজপথ দিয়া যাইতেছিলেন, রামরুদ্র ছুরিকা হস্তে তাঁহার দিকে ধাবিত হন; কিন্তু আলাউদ্দিনের কাছে পেঁছিবার পূর্বেই ধরা পড়েন। তাঁহার আক্রমণ ব্যর্থ হয়।—

এইবার ভূপ সিংহের চরিত্রে এক বিচিত্র পরিবর্তন দেখা দিল। পঞ্চাশোর্ধ বয়সে একমাত্র পুত্রকে হারাইয়া তিনি শোক করিলেন না। তাঁহার প্রকৃতি যেন দ্বিধাভিন্ন হইয়া গেল; একদিকে শুষ্ক কঠিন কুটিলতা, অন্য দিকে নির্বিকার ঔদাসীন্য। রানী ঊষাবতীর মৃত্যুর পর তিনি দারান্তর গ্রহণ করেন নাই, এখনও করিলেন না; কিন্তু কন্যা সোমশুক্লাকে তিনি জন্মাবধি অবহেলা করিয়াছিলেন, এখন তাহার প্রতি নির্লিপ্তভাবে ঈষৎ স্নেহশীল হইলেন। সপ্তপুরীর বাকি ছয়জন রাজার সহিত তাঁহার সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন হইয়াছিল, এখন তিনি দূত পাঠাইয়া পূর্বতন প্রীতির সম্বন্ধ পুনঃস্থাপন করিলেন। মন্ত্রীর সহিত বসিয়া কখনও মন্ত্রণা করেন, কখনও বা বয়স্যদের সঙ্গে চতুরঙ্গ খেলেন। সপ্তমপুরের অধিপতি সূর্যবর্মা ভূপ সিংহের সমবয়স্ক মিত্র, তাঁহার সহিত দূর হইতে চতুরঙ্গের চাল চালেন। কখনও তিনি গম্ভীর কুটিল সন্দিগ্ধ, কখনও দায়িত্বহীন ক্রীড়াচটুল প্রগল্‌ভ। সকলে তাঁহার কাছে সশঙ্ক হইয়া থাকে, কখন তাঁহার কোন্ রূপ প্রকাশ পাইবে কেহই বলিতে পারে না।

এইভাবে আরও নয় বৎসর কাটিয়াছে। কুমারী সোমশুক্লা এখন সপ্তদশী যুবতী। প্রথমপুরের যুবরাজ হিরণ্যবর্মার সঙ্গে তাঁহার বিবাহের একটা প্রসঙ্গ উঠিয়াছে; কিন্তু কোনও পক্ষেই ত্বরা নাই। হিরণ্যবর্মার দুইটি পত্নী বর্তমান, তাঁহারা পুরাতন না হওয়া পর্যন্ত যুবরাজ নূতন বিবাহ সম্বন্ধে নিরুৎসুক।

সীমন্তিনীর কন্যা চঞ্চরী এখন ষোড়শী। তাহার বুদ্ধি বেশী নাই, কিন্তু রূপের ছটায় চোখে ধাঁধা লাগে। সে রাজপুরীতে কুমারী সোমশুক্লার কিঙ্করীর কাজ করে। তাহার মা তাহার পানে মুখ ফিরাইয়া চাহে না, কিন্তু ভূপ সিংহ আলাউদ্দিনের কন্যার

প্রতি বিশ্বেষভাবাপন্ন নয়। কেবল, কদাচিৎ যখন চণ্ডরীর উপর রাজার দৃষ্টি পড়ে তখন তাঁহার চোখে একটা ক্রূর অভিসন্ধি খেলা করিয়া যায়। তিনি যেন প্রতীক্ষা করিয়া আছেন; কিন্তু কিসের প্রতীক্ষা তাহা কেহ জানে না।—

ভট্ট নাগেশ্বরের মুখে রাজকাহিনী শুনিতে শুনিতে ময়ূর যেন আচ্ছন্নের মত হইয়া পড়িয়াছিল, মনে হইয়াছিল সেও এই কাহিনীর সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত। সুলতান আলাউদ্দিনের নামটাই সে জানিত, এখন একটা বিকৃত মনুষ্যমূর্তি চোখের সামনে দেখিতে পাইল। রাজা ভূপ সিংহের নিদারুণ ভাগ্যবিপর্যয় তাহার অন্তরে অঙ্গারের মত জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু তাহার প্রকৃতি স্বভাবতই অন্তর্মুখী, বাহিরে তাহার মনের উষ্মা প্রকাশ পাইল না।

কাহিনী শেষ করিয়া ভট্ট নাগেশ্বরও নীরবে চলিলেন। আর কোনও কথা হইল না। সূর্যাস্তের সময় তাঁহারা রাজধানীতে উপনীত হইলেন। নাগেশ্বর বলিলেন—'আজ আর রাজার সঙ্গে দেখা হবে না। তুমি চল, রাত্রে আমার গৃহে থাকবে। কাল প্রাতঃকালে তোমাকে রাজার কাছে নিয়ে যাব।'

তিন

ভট্ট নাগেশ্বরের গৃহ ক্ষুদ্র কিন্তু পাষাণনির্মিত। মাত্র দুইটি ঘর, তৈজসপত্র বেশী নাই। ব্রাহ্মণ অকৃতদার, গৃহ গৃহিণীহীন; নিজেই গৃহকর্ম করেন, নিজেই রন্ধন করেন। তাঁহার গৃহদ্বার সর্বদাই খোলা থাকে; দেশে চোর বেশী নাই, যাহারা আছে তাহারা নাগেশ্বরের শূন্য গৃহে চুরি করিতে আসে না।

হস্তমুখ প্রক্ষালনের পর নাগেশ্বর রন্ধনকার্যে লাগিয়া গেলেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাক্যস্রোত আবার প্রবাহিত হইল। তিনি রাজ্য ও রাজপুরীর বহু কৌতুককর ঘটনা বিবৃত করিলেন। ময়ূর তাঁহার বিবৃতি হইতে অনেক কথা জানিতে পারিল।

নৈশাহার সমাধা হইলে নাগেশ্বর ঘরের কোণ হইতে গোল করা শয্যা আনিয়া দুই ভাগ করিয়া মাটিতে পাতিলেন; তারপর প্রদীপ নিভাইয়া শয়ন করিলেন। উভয়েই ক্লান্ত ছিলেন, অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

পরদিন প্রভাতে নাগেশ্বর ময়ূরকে লইয়া রাজভবনে উপনীত হইলেন। প্রতীহার ময়ূরের হাতে ধনুর্বাণ দেখিয়া ভ্রূ তুলিল, কিন্তু রাজবয়স্যের সঙ্গীকে বাধা দিল না, হাস্যমুখে পথ ছাড়িয়া দিল।

প্রাসাদের একটি নিভৃত কক্ষে ভূপ সিংহ মসৃণ পাষাণকুট্টিমের উপর একাকী বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে পাষাণে ক্ষোদিত চতুরঙ্গ খেলার চতুষ্কোণ ছক পাতা রহিয়াছে; বলগুলির বিন্যাস দেখিয়া মনে হয় খেলা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু খেলার প্রতিপক্ষ উপস্থিত নাই।

ভট্ট নাগেশ্বর স্বস্তিবাচন করিলেন—'বয়স্যের জয় হোক। সপ্তমপুর থেকে একটি শুক্তি এনেছি, গ্রহণ করুন আর্য।' বলিয়া কটিবস্ত্র হইতে একটি শ্বেতবর্ণ ক্ষুদ্র বস্তু বাহির করিলেন।

রাজা ভূপ সিংহ খেলার ছক হইতে অন্যমনস্ক চক্ষু তুলিলেন। শীর্ণ দীর্ঘ অগ্নিদগ্ধ আকৃতি, মুখমণ্ডল বলিরেখাঙ্কিত; মাথার আস্কন্ধ কেশ পক্ক, ভ্রূ ও গুম্ফ পক্ক, কেবল চক্ষুতারকা ঘন কৃষ্ণবর্ণ। তিনি ময়ূরকে দেখিতে পাইলেন না, নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলিলেন—'শুক্তি!'

'হাঁ মহারাজ। সপ্তমপুরে এক যাযাবর সমুদ্রবণিকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তার

কাছ থেকে এই শুক্তি কিনেছি। দেখুন মহারাজ, কী অপূর্ব শুক্তি!' বলিয়া নাগেশ্বর করতলে শুক্তিটি লইয়া রাজার সম্মুখে ধরিলেন।

ভূপ সিংহ নির্লিপ্তভাবে শুক্তি তুলিয়া লইলেন, নাড়িয়া চাড়িয়া বলিলেন—'একটি ক্ষুদ্র শঙ্খ। এর অপূর্বত্ব কোথায়?'

সত্যই শম্বুকের ন্যায় ক্ষুদ্র একটি শঙ্খ। নাগেশ্বর উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—'হা হতোস্মি, দেখছেন না মহারাজ, দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ। মহাভাগ্যদাতা দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ। এ শঙ্খ যার কাছে থাকে তার কখনো অমঙ্গল হয় না।'

ভূপ সিংহ কিয়ৎকাল শূন্যে চাহিয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন—'আমার একটি দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ ছিল। একদিন রানীর হাত থেকে স্খলিত হয়ে মণিকুট্টিমে পড়ল, শত খণ্ডে চূর্ণ হয়ে গেল। আজ থেকে সতরো বছর আগে।' তিনি ক্ষুদ্র শঙ্খটি নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—'হ্যাঁ, দক্ষিণাবর্তই বটে। কিন্তু এ নিয়ে আমি কি করব বয়স্য? আমার আর সৌভাগ্যের কী প্রয়োজন।'

নাগেশ্বর কুণ্ঠিত মুখে নীরব রহিলেন। রাজা শঙ্খটিকে কিছুক্ষণ মুষ্টিতে আবদ্ধ রাখিয়া চিন্তা করিলেন, শেষে বলিলেন—'সোমশুক্লাকে ডেকে পাঠাও। সে এই শঙ্খ ধারণ করুক, হয়তো তার মঙ্গল হতে পারে।'

'সেই ভাল, সেই ভাল মহারাজ। আমি নিজেই কুমারী শুক্লাকে ডেকে আনছি।' বলিয়া নাগেশ্বর দ্রুত অন্তঃপুর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এতক্ষণে ময়ূরের প্রতি ভূপ সিংহের দৃষ্টি পড়িল। সে ধনুর্বাণ হস্তে দ্বারের নিকট নিশ্চল দাঁড়াইয়া ছিল, রাজা মৃদু বিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন—'তুমি কে?'

ময়ূর সসম্ভ্রমে শির নত করিয়া বলিল—'ভট্ট নাগেশ্বর আমাকে সঙ্গে এনেছেন। আমি বিদেশী, আমার নাম ময়ূর।'

রাজা বলিলেন—'তোমার হাতে আটবিক জাতির ধনুর্বাণ, কিন্তু আকৃতি দেখে আর্য মনে হয়।'

ময়ূর বলিল—'মহারাজ, আমি আটবিক নাগ জাতির মধ্যে পালিত হয়েছি, কিন্তু জাতিতে ক্ষত্রিয়।'

'তোমার বংশপরিচয় কি?'

'বংশপরিচয় জানি না আর্য।'

ময়ূরের পানে চাহিয়া চাহিয়া রাজার মুখ-ভাব পরিবর্তিত হইল, মেরুদণ্ড ঋজু হইল। মনে হইল, একটা মানুষ অন্তর্হিত হইয়া অন্য একটি মানুষ আবির্ভূত হইতেছে। তিনি দৃঢ় আদেশের স্বরে বলিলেন, 'কাছে এস। উপবিষ্ট হও। তোমার ইতিহাস শুনতে চাই।'

ময়ূর আসিয়া রাজার সম্মুখে জানু মুড়িয়া বসিল; মাঝখানে দাবার ছকের ব্যবধান রহিল।

তারপর ময়ূর নিজ জীবনের ইতিহাস বলিল।

তাপ্তি নদীর দক্ষিণে দেবগিরি রাজ্যে তাহার বাস ছিল, তাহার পিতা দেবগিরি রাজ্যের একজন যোদ্ধা ছিলেন। রাজ্যের উত্তর সীমান্তে একটি সেনা-গুল্মে তাহারা থাকিত। ময়ূরের বয়স যখন পাঁচ-ছয় বছর তখন উত্তরাপথ হইতে আলাউদ্দিন নামে এক যবন সেনাপতি দেবগিরি আক্রমণ করেন। সীমান্ত রক্ষা করিতে গিয়া এক খণ্ডযুদ্ধে ময়ূরের পিতা হত হন। তাহার মাতা তাহার প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তাহাকে লইয়া জঙ্গলের মধ্যে পলায়ন করেন। জঙ্গল ও পর্বতের ভিতর দিয়া বহুদূর পথ অতিক্রম করিবার পর তাহারা এক বন্য জাতির গ্রামে আশ্রয় পায়। মাতা কিন্তু বেশীদিন বাঁচিলেন

না. দু'চার দিনের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ময়ূরের গোত্র-পরিচয় দিয়া যান নাই, কেবল বলিয়াছিলেন—'তুমি ক্ষত্রিয়।'

অতীতের কাহিনী শেষ করিয়া ময়ূর বলিল—'তারপর আমার জীবনের ষোল বছর নাগজাতির গ্রামে কেটেছে; তারা আমাকে স্নেহ করেছে, আমি তাদের ভালবেসেছি। কিন্তু কয়েকমাস আগে গ্রামবৃদ্ধেরা আমাকে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে আদেশ দিলেন। তাই আমি গ্রাম ছেড়ে বেরিয়েছি; অনেক নদী-পর্বত পার হয়ে এখানে এসেছি।'

রাজা ময়ূরের মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া শুনিতেছিলেন, প্রশ্ন করিলেন—'গ্রামবৃদ্ধেরা তোমাকে তাড়িয়ে দিল কেন?'

ময়ূর অধোবদন হইল, তাহার মুখ ধীরে ধীরে অরুণাভ হইয়া উঠিল। রাজা বলিলেন, 'কোনো দুষ্কৃতি করেছিলে?'

ময়ূর আহত মুখ তুলিল—'আমার কোনো দোষ ছিল না মহারাজ!' সে লজ্জা-জড়িত স্বরে থামিয়া বলিতে লাগিল—'গ্রামের যুবতী মেয়েরা সকলে—কেবল আমার পিছনেই ঘুরে বেড়াতো—আমার জন্যে নিজেদের মধ্যে চুলোচুলি করত—যুবকেরাও আমার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না—আমি মেয়েদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতাম, তবু যুবকেরা আমাকে ঈর্ষা করত—একজন তীর ছুঁড়ে আমাকে মারবার চেষ্টা করেছিল—তাই গ্রাম-বৃদ্ধেরা বললেন, তোমার জন্যে গ্রামের শান্তিভঙ্গ হচ্ছে, তুমি চলে যাও।'

রাজার মুখে শুষ্ক হাসির রেখাঙ্ক পড়িল, কিন্তু চক্ষু ময়ূরের মুখ হইতে অপসৃত হইল না। তিনি বলিলেন—'তুমি মেয়েদের ভয় কর?'

ময়ূর বলিল—'ভয় করি না মহারাজ, কিন্তু—ওদের এড়িয়ে চলতে চাই।'

এই সময় কুমারী সোমশুক্লা কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার পশ্চাতে ভট্ট নাগেশ্বর!

সপ্তদশ বর্ষীয়া যুবতী সোমশুক্লাকে দেখিলে দর্শকের মন স্নিগ্ধ আনন্দে পূর্ণ হইয়া ওঠে। দীর্ঘাঙ্গী কন্যা, দেহবর্ণের শুচিশুভ্রতা সোমশুক্লা নাম সার্থক করিয়াছে; মুখখানি লাবণ্যে টলমল। তিনি কক্ষে আসিলেন, তাঁহার গতিভঙ্গীতে পাল-তোলা তরণীর অবলীলা। পিতার পাশে নতজানু হইয়া তিনি স্মিতমুখে বলিলেন—'আর্য! আমাকে ডেকেছেন?'

রাজার মন কোন্ গভীরতর স্তরে নিমজ্জিত ছিল, তিনি শূন্যদৃষ্টিতে কন্যার পানে চাহিলেন—'ডেকেছি!'

ভট্ট নাগেশ্বর কুমারীর পিছনে দণ্ডায়মান ছিলেন, বলিয়া উঠিলেন—'হা হতোস্মি! দক্ষিণাবর্ত শঙ্খের কথা ভুলে গেলেন মহারাজ!'

'ও—হাঁ'—মহারাজ মুষ্টি খুলিয়া শঙ্খটি দেখিলেন, কন্যার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন—'বয়স্য আমার জন্য শঙ্খটি এনেছিল। সুলক্ষণ শঙ্খ, তুমি এটি নাও। স্বর্ণকারকে ডেকে পাঠাও, এই শঙ্খ দিয়ে অলঙ্কার গড়িয়ে নাও। সর্বদা অঙ্গে রেখো, মঙ্গল হবে।'

কুমারী সোমশুক্লার শান্ত চোখে আনন্দ ফুটিয়া উঠিল। তিনি শঙ্খটি কপোতহস্তে লইয়া কপালে স্পর্শ করিলেন, বলিলেন—'ধন্য পিতা। আমি এখনি স্বর্ণকারকে ডেকে পাঠাচ্ছি।—অনুমতি করুন আর্য।'

তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা বলিলেন—'এস কন্যা।'

প্রস্থান করিবার সময় কুমারী সোমশুক্লার দৃষ্টি ময়ূরের উপর পড়িল, ক্ষণকালের জন্য ময়ূরের মুখের উপর সংলগ্ন হইয়া রহিল। তারপর তিনি পাল-তোলা তরণীর ন্যায় কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

চার

ময়ূর এতক্ষণ চতুরঙ্গ বলের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বসিয়া ছিল, ভট্ট নাগেশ্বর তাহার নিকটে উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন—'মহারাজ, এই যুবককে আমি আপনার কাছে এনেছিলাম—'

ভূপ সিংহ বলিলেন—'জানি।' নাগেশ্বরের বাগ্‌বিস্তার থামাইয়া তিনি ময়ূরের উপর চক্ষু নিবদ্ধ করিলেন—'তুমি আমার অধীনে কর্ম চাও?'

ময়ূর বলিল—'হ্যাঁ মহারাজ।'

রাজা বলিলেন—'তোমার হাতে ধনুঃশর দেখে অনুমান করছি তুমি ধনুর্বিদ্যা জানো।'

ময়ূর সবিনয়ে বলিল—'সামান্য জানি। নাগজাতির কাছে শিখেছি।'

নাগেশ্বর মুখ খুলিয়া আবার বন্ধ করিলেন। রাজা ময়ূরকে প্রশ্ন করিলেন—'তুমি ঘোড়ায় চড়তে জানো?'

ময়ূর বলিল—'না মহারাজ।'

'অসি চালনা?'

'না মহারাজ।'

'শুধুই তীর ছুঁড়তে জানো?'

নাগেশ্বর আর নীরব থাকিতে পারিলেন না, বলিয়া উঠিলেন—'শুধুই কি তীর ছুঁড়তে জানে বয়স্য! এই যুবক অতি ধুরন্ধর তীরন্দাজ, একটি তীর ছুঁড়ে তালগাছের ডগা থেকে পাকা তাল পেড়ে আনতে পারে। বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করে দেখুন।'

'অবশ্য পরীক্ষা করে দেখব। এস আমার সঙ্গে।' রাজা উঠিয়া দ্বারের দিকে চলিলেন।

রাজপুরী দ্বি-ভূমক হইলেও আকারে ক্ষুদ্র এবং ঘন-সম্বন্ধ; তাহার পশ্চাৎভাগ অন্তঃপুর, স্বতন্ত্র অবরোধ নাই। অন্তঃপুরের পশ্চাতে উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত বিস্তীর্ণ বিহারভূমি; দুই-চারিটি বৃক্ষ ও লতামণ্ডপশোভিত শষ্পাকীর্ণ অঙ্গন। ভূপ সিংহ এই অঙ্গনের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন—'এবার তোমার ধনুর্বিদ্যা দেখাও।'

ভট্ট নাগেশ্বর ময়ূরকে উৎসাহ দিয়া বলিলেন—'দেখাও, দেখাও।'

ময়ূর ঊর্ধ্বে আকাশের পানে চোখ তুলিল, সযত্নে ধনুকে গুণ পরাইল; তিনটি শরের মধ্যে একটি হাতে রাখিয়া বাকি দুইটি মাটিতে ফেলিল, তারপর ধীরে ধীরে ধনুকে শরযোজন করিয়া ধনু ঊর্ধ্বে তুলিল।

প্রাসাদের দ্বিতলে বাতায়ন সম্মুখে দাঁড়াইয়া কুমারী সোমশুক্লা চম্পাকলির ন্যায় ক্ষুদ্র শঙ্খটি দেখিতেছিলেন; পাশের অন্য একটি বাতায়নে চঞ্চরী বাহিরের দিকে মুখ বাড়াইয়া চাহিয়া ছিল। সে হঠাৎ কলস্বরে বলিয়া উঠিল—'দেখ দেখ, রাজকুমারি, অঙ্গনে কী হচ্ছে!'

সোমশুক্লা চকিতে চক্ষু তুলিলেন। প্রাঙ্গণের মাঝখানে দাঁড়াইয়া সেই যুবক, যাহাকে তিনি ক্ষণেকের জন্য পিতার সম্মুখে দেখিয়াছিলেন। যুবক ঊর্ধ্বদিকে ধনু তুলিয়া গুণ আকর্ষণ করিল; ধনু হইতে বাণ ছুটিয়া গেল, আকাশের ঊর্ধ্বলোকে উঠিয়া প্রায় অদৃশ্য হইয়া গেল। ইতিমধ্যে যুবক ক্ষিপ্র হস্তে মাটি হইতে অন্য একটি বাণ তুলিয়া লইয়া ধনুতে জুড়িয়াছে। প্রথম বাণটি, বেগ নিঃশেষিত হইলে, পাক খাইয়া নীচে নামিতে আরম্ভ করিল। যুবক তখন দ্বিতীয় বাণ মোচন করিল। দুই বাণ মধ্যপথে ফলকে ফলকে চুম্বন করিয়া একসঙ্গে মাটিতে পড়িল।

ভট্ট নাগেশ্বর দুই বাহু আস্ফালন করিয়া হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বলিলেন—'সাধু, সাধু!'

রাজা কিছু বলিলেন না, কিন্তু তাঁহার কুঞ্চিত চক্ষে গোপন অভিসন্ধি ক্ষণেকের জন্য ফুটিয়া উঠিল। তিনি হস্তের ইঙ্গিতে ময়ূরকে ডাকিয়া পুরীর দিকে ফিরিয়া চলিলেন। নাগেশ্বর উচ্ছ্বসিত স্বরে 'অদ্ভুত অদ্ভুত' বলিতে বলিতে তাঁহার অনুগামী হইলেন।

দ্বিতলের বাতায়নে চঞ্চরী ছুটিয়া গিয়া সোমশুক্লার নিকটে দাঁড়াইল, তাঁহার অঞ্চল টানিয়া দীপ্ত চক্ষে বলিল—'রাজকুমারি! কী সুন্দর যুবাপুরুষ!'

রাজকুমারীও চমৎকৃত হইয়াছিলেন, উৎফুল্ল মুখে বলিলেন—'অপূর্ব শরসন্ধান।'

বিহ্বলা চঞ্চরী তাঁহার হস্ত আকর্ষণ করিয়া বলিল—'ও কে রাজকুমারী!'

সোমশুক্লা চঞ্চরীর মুখে উত্তপ্ত অভীপ্সা দেখিলেন; চঞ্চরীর বহ্নিশিখার মত রূপ যেন আরও তীব্র-সুন্দর দেখাইতেছে। তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া নীরস কণ্ঠে বলিলেন—'জানি না।'

এই সময় সীমন্তিনী প্রবেশ করিল।

সীমন্তিনীর বয়স এখন পঁয়ত্রিশ বছর। শীর্ণ তপঃকৃশ আকৃতি, মুখের উপর দুরপনেয় তিক্ততা স্থায়ী আসন পাতিয়াছে; তবু তাহার মুখাবয়ব হইতে বিগত লাবণ্যের চিহ্ন সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যায় নাই।

চঞ্চরীকে সোমশুক্লার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সীমন্তিনীর দুই চক্ষু প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, সে কাছে আসিয়া কঠিন স্বরে কন্যাকে বলিল—'চঞ্চরি! কুমারীর অঙ্গ স্পর্শ করেছিস্ কোন স্পর্ধায়! যা—চলে যা এখান থেকে।'

চঞ্চরী মাতাকে যমের মত ভয় করিত, সে কুমারীর হাত ছাড়িয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইল। সীমন্তিনী তখন শান্ত স্বরে বলিল—'নন্দিনি, স্বর্ণকার এসেছে, নীচে অপেক্ষা করছে।'

সীমন্তিনী কুমারীকে নন্দিনী বলিয়া ডাকে, সে তাঁহার ধাত্রীমাতা। সোমশুক্লা তাহাকে জিজি বলেন; শৈশবকালের আদরের ডাক।

সোমশুক্লা বলিলেন—'তুমিও আমার সঙ্গে এস জিজি।'

সীমন্তিনীর তিক্ত মুখ ক্ষণেকের জন্য কোমল হইল; দুইজনে নীচে নামিয়া গেলেন।

নারী-চরিত্রের জটিলতা কে উন্মোচন করিবে? সীমন্তিনীর জীবনে যে মহাদুর্যোগ আসিয়াছিল তাহার জন্য রাজা ভূপ সিংহের দায়িত্ব কম নয়। অথচ রাজার কন্যাকেই সে নিজের কন্যা বলিয়া বুকে টানিয়া লইয়াছে, নিজের গর্ভজাতা কন্যাকে সহ্য করিতে পারে না।

রাজা ফিরিয়া গিয়া নিভৃত কক্ষে বসিয়াছিলেন; ময়ূর ও নাগেশ্বরকে উপবেশন করিতে বলিলেন। সকলে উপবিষ্ট হইলে রাজা ময়ূরকে বলিলেন—'তোমাকে আমি কর্ম দেব। তুমি রাজভবনেই অন্যান্য পরিচরের ন্যায় থাকবে। তোমাকে অশ্বারোহণ শিখতে হবে, অসিবিদ্যা শিখতে হবে।

ময়ূর বলিল—'শিখব মহারাজ। আমাকে কোন কর্ম করতে হবে?'

রাজা বলিলেন—'এখন তোমার কোনো কর্ম নেই। যখন সময় হবে আমি তোমার কর্মনির্দেশ করব। আজ থেকে তুমি আমার আজ্ঞাধীন, আমি যা আদেশ করব তাই করবে।'

ময়ূর যুক্তকরে বলিল—'যথা আজ্ঞা মহারাজ।'

রাজার অধরপ্রান্তে হাসির মত একটা ব্যঞ্জনা দেখা দিল, তিনি কতটা নিজ মনেই বলিলেন—'অনেকদিন থেকে প্রতীক্ষা করছি।'

তারপর তাঁহার মধ্যে অন্য মানুষের আবির্ভাব হইল, তিনি নাগেশ্বরের দিকে

কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন—'তোমার দূতকর্মের কী হল?'

নাগেশ্বর বলিলেন—'দূতকর্ম সম্পন্ন হয়েছে বয়স্য। মহারাজ সূর্যবর্মাকে আপনার বলক্ষেপ জানিয়েছি।'

রাজা বলিলেন—'কী জানিয়েছ আমার কাছে পুনরাবৃত্তি কর। তোমাকে বিশ্বাস নেই, আগের বার তুমি ভুল বলক্ষেপ জানিয়ে অনর্থ ঘটিয়েছিলে।'

নাগেশ্বর ললাটে করাঘাত করিয়া বলিলেন—'হা হতোস্মি! একবার ভুল করেছি বলে কি বার বার ভুল করব। আমি তাঁকে জানিয়েছি যে আপনি বাম দিকের নৌ-বলকে সম্মুখের তৃতীয় কোষ্ঠে সঞ্চারিত করেছেন! ঠিক বলেছি কিনা?'

রাজা সম্মুখে চতুরঙ্গ ছকের দিকে দৃষ্টি নমিত করিলেন। ময়ূর এতক্ষণ ইঁহাদের কথার তাৎপর্য বুঝিতে পারে নাই, এখন বুঝিল ভট্ট নাগেশ্বর কিরূপ গোপনীয় দূতকার্যে সপ্তমপুরে গিয়াছিলেন। দুই রাজা নিজ নিজ রাজ্যে বসিয়া দাবার চাল দিয়া দূতমুখে বার্তা পাঠাইতেছেন। এই খেলাটি বোধহয় দুই বছর আগে আরম্ভ হইয়াছিল, আরও দুই বছর চলিবে।

ভূপ সিংহ মুখ তুলিয়া বলিলেন—'ঠিকই বলেছ। সূর্যবর্মা কি বললেন?'

'তিনি আপনার চাল নিজের ছকে বসিয়েছেন। বললেন, মাসেক কালের মধ্যে পাল্‌টা চাল দূতমুখে জানাবেন।'

'ভাল। বন্ধু সূর্যবর্মা কুশলে আছেন তো?'

'শারীরিক কুশলেই আছেন, কিন্তু মনের কুশল কোথায়? অনেক খেদ প্রকাশ করলেন, বললেন—আমি অপুত্রক, আমার বন্ধু ভূপ সিংহ ভাগ্যদোষে পুত্রহীন; আমাদের মৃত্যুর পর রাজ্যের কী দশা হবে কে জানে! হয়তো শৃগালের বাসভূমি হবে।'

ভূপ সিংহ উদ্‌গত নিশ্বাস চাপিয়া বলিলেন—'ওকথা যাক, আমাদের মৃত্যুর পর যা হবার হবে। কিন্তু যতদিন বেঁচে আছি—' তারপর সন্নিহিত ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন—'বজ্রবাহু, এর নাম ময়ূর। আজ থেকে আমি একে আমার দেহরক্ষী নিযুক্ত করেছি। একে সঙ্গে নিয়ে যাও, রাজভবনে যথাযোগ্য স্থান এবং অশন-বসনের নির্দেশ কর।'

বজ্রবাহু ময়ূরকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেল। রাজা গাত্রোত্থান করিলেন, ভট্ট নাগেশ্বরকে বলিলেন—'বয়স্য, চল তোমাকে মিষ্টান্ন ভোজন করাই।'

সে-রাত্রে ভূপ সিংহের চক্ষে নিদ্রা আসিতেছিল না। যথাকালে আহার করিয়া তিনি দ্বিতলে শয়নকক্ষে শয্যা আশ্রয় করিয়াছিলেন, ভৃত্য বজ্রবাহু পদ-সংবাহন করিয়া দিয়াছিল। অভ্যাসমত তাঁহার একটু তন্দ্রাকর্ষণও হইয়াছিল। কিন্তু বজ্রবাহু চলিয়া যাইবার পর তিনি আবার জাগিয়া উঠিয়াছিলেন, চিন্তাতপ্ত মস্তিষ্ক তাঁহাকে ঘুমাইতে দেয় নাই।

শয্যায় শুইয়া তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, তারপর উঠিয়া কক্ষে পাদচারণ আরম্ভ করিলেন। আজ পূর্বাহ্ণে যে কয়টি ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাই তাঁহার চিন্তার বস্তু।—সতেরো বছর পূর্বে রানীর হস্তচ্যুত দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; তারপরেই আসিল সর্বনাশা বিপর্যয়। আজ আবার অযাচিতভাবে দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেই সঙ্গে আসিয়াছে এক অজ্ঞাতকুলশীল যুবক; অদ্ভুত তীরন্দাজ, অথচ শান্ত নিরভিমান দৃঢ়চরিত্র। দীর্ঘকাল তিনি এমনি একটি মানুষের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; চঞ্চরীর যৌবনপ্রাপ্তির সন্ধিক্ষণে সে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এ এক

অপূর্ব যোগাযোগ। এ কি নিয়তির ইঙ্গিত? তবে কি সত্যই শুভকাল ফিরিয়া আসিয়াছে? তাঁহার জীবনে অন্য শুভ নাই, একমাত্র শুভ প্রতিহিংসাসাধন। তাহা কি সফল হইবে? মহাপাপিষ্ঠ আলাউদ্দিনকে যুদ্ধে পরাভূত করার সামর্থ্য তাঁহার নাই, গুপ্তহত্যার আশাও তিনি ত্যাগ করিয়াছেন। এখন কেবল একটি মাত্র প্রতিহিংসার অস্ত্র তাঁহার হাতে আছে। বৃহতের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্রের প্রতিহিংসা; ক্ষুদ্র বৃশ্চিক হস্তীকে দংশন করিয়া বিষে জর্জরিত করিতে পারে। তিনি তাহাই করিবেন। আলাউদ্দিন তাঁহার কুমারী কন্যাকে অপহরণ করিয়া তাঁহার মুখ কালিমালিপ্ত করিয়াছিল, তিনি সেই কালিমা চতুর্গুণ ফিরাইয়া দিবেন। কামকুক্কুর আলাউদ্দিন জানিতে পারিবে না, তারপর তিনি তাহাকে জানাইয়া দিবেন। সমস্ত যবনরাজ্য জানিতে পারিবে।...এই কার্যের জন্য ময়ূরের ন্যায় যুবক চাই, যে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না, যে চঞ্চরীর রূপের মোহে ভুলিয়া তাহাকে আত্মসাৎ করিতে চাহিবে না। ময়ূর উত্তম উপাদান, কিন্তু তাহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

এই চিন্তাগুলি বারংবার ভূপ সিংহের মস্তিষ্কে আবর্তিত হইয়া বিষাক্ত পতঙ্গের ন্যায় তাঁহার চেতনাকে দংশন করিতেছিল। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইল, তবু চোখে নিদ্রা নাই—নিদ্রার ইচ্ছাও নাই—

'আর্য!'

ভূপ সিংহ চমকিয়া দ্বারের পানে চাহিলেন। ম্লান দীপালোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন না, দ্রুত আসিয়া দেখিলেন, দ্বারের কবাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন কুমারী সোমশুক্লা। রাজা বলিলেন, 'শুক্লা!'

সোমশুক্লা হ্রস্বস্বরে বলিলেন—'পিতা, আপনার কি নিদ্রা আসছে না?'

ভূপ সিংহ কন্যার প্রতি স্নেহশীল হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে মনের ঘনিষ্ঠতা জন্মে নাই। এখন রাজা যেন কন্যাকে অত্যন্ত নিকটে পাইলেন। তিনি বলিলেন— 'না বৎসে, ঘুম আসছে না। কিন্তু রাত্রি অনেক হয়েছে, তোমার চোখে ঘুম নেই কেন?'

সোমশুক্লা ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—'আমি ঘুমিয়েছিলাম পিতা, কিন্তু ঘুম ভেঙে গেল। তারপর পাশের ঘরে আপনার পদশব্দ শুনে উঠে এলাম।'

রাজা বলিলেন—'তুমি আবার শয়ন কর গিয়ে। আমার ঘুম কখন আসবে ঠিক নেই।'

সোমশুক্লা বলিলেন—'না পিতা, আপনি শয়ন করুন, আমি আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। এখনি ঘুম আসবে।'

রাজা শয্যায় শয়ন করিলেন, সোমশুক্লা শিয়রে দাঁড়াইয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। অপরিসীম প্রশান্তিতে রাজার দেহমন ভরিয়া উঠিল। তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন।

পাঁচ

রাজভবনে ময়ূরের প্রথম রাত্রিটা সুখনিদ্রায় কাটিল। যে ঘরটি তাহার জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা রাজভবনের নিম্নতলে পশ্চাদ্দিকের এক কোণে। অঙ্গনের দিকে তাহার দ্বার, রাজভবনে প্রবেশ না করিয়াও ঘরে প্রবেশ করা যায়। ঘরের মধ্যে একটি খট্টাঙ্গ পাতা হইয়াছে, তদুপরি নব শয্যা। নূতন বস্ত্রাদিও উপস্থিত। রাজার রন্ধনশালা হইতে সুপক্ক খাদ্য আসিয়াছে, তাহাই সেবন করিয়া দ্বার-গবাক্ষ খোলা রাখিয়া ময়ূর শয়ন করিয়াছিল, একেবারে ঘুম ভাঙিল পাখির ডাকে। পঞ্চমপুরে তাহার কর্মজীবন আরম্ভ হইল।

কর্মজীবনের প্রথম অধ্যায় প্রায় দুই মাসব্যাপী।

অশ্বারোহণ বিদ্যা শিখিতে ময়ূরের তিনদিন লাগিল। তাহার শোণিতে অশ্ববিদ্যার বীজ নিহিত ছিল, অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া সে অপূর্ব হর্ষ অনুভব করিল। রাজভবনের পশ্চাৎভাগে বিহারভূমির প্রাচীরের পাশ দিয়া অশ্ব ছুটাইয়া দিয়া সে দেখিতে পাইত কুমারী সোমশুক্লা দ্বিতলের বাতায়ন হইতে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছেন। আনন্দের আতিশয্যে সে এক হাত তুলিয়া হাসিত, দেখিতে পাইত কুমারীর সুন্দর মুখেও স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়াছে।

অশ্ববিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিবার পরও ময়ূর রাজ-মন্দুরা হইতে প্রত্যহ নূতন অশ্ব লইয়া অভ্যাস করিত। একদিন সায়াহ্নে বিহারভূমির একপ্রান্তে রাজকন্যার সহিত তাহার দেখা হইয়া গেল! বিহারভূমিতে এক জোড়া ক্ষুদ্রাকৃতি হরিণ ও কয়েকটি শশক ছিল; কুমারী মাঝে মাঝে আসিয়া তাহাদের খাইতে দিতেন। কুমারীকে বিহারভূমিতে দেখিলেই তাহারা ছুটিয়া আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইত।

সেদিনও তাহারা কুমারীকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল। কুমারী চারিদিকে শস্য ছড়াইয়া দিতেছিলেন, তাহারা কাড়াকাড়ি করিয়া খাইতেছিল। সহসা অদূরে অশ্বের দড়বড় শব্দ শুনিয়া তাহারা ভয় পাইয়া পলায়ন করিল।

ময়ূর লতাবিতানের অন্তরালে সোমশুক্লাকে দেখিতে পায় নাই, দেখিতে পাইয়া ত্বরিতে অশ্ব থামাইয়া তাঁহার কাছে আসিল, জোড়হস্তে বলিল—'রাজনন্দিনি, আমাকে ক্ষমা করুন।'

সোমশুক্লা একটু হাসিলেন, শুচিস্মিত মুখের উপর একটু অরুণাভা দেখা দিল। তিনি বলিলেন—'ওরা বনের প্রাণী, বড় ভীরু। কিন্তু আপনি বিব্রত হবেন না, ওরা এখনি ফিরে আসবে।'

ময়ূর লক্ষ্য করিল, রাজকুমারী তাহাকে সমকক্ষের ন্যায় সম্বোধন করিলেন, ভৃত্য-পরিজনের মত নয়। তাহার আর কিছু বলিবার ছিল না, তবু সে একটু ইতস্তত করিল। তাহাকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখিয়া সোমশুক্লা বলিলেন—'আপনি তো অশ্ববিদ্যা শীঘ্র অধিগত করেছেন।'

ময়ূর একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল, বলিল—'কি জানি। সত্যিই কি শীঘ্র? আমার ধারণা ছিল সকলেই অতি সহজে ঘোড়ায় চড়া শিখতে পারে।'

রাজকুমারী শুধু হাসিলেন, তারপর অন্য কথা বলিলেন—'আপনার অসিশিক্ষা কতদূর?'

ময়ূর অবাক হইয়া চাহিল, রাজকুমারী তাহার সব খবর রাখেন! একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল—'অসিশিক্ষা এখনো চলছে। অস্ত্রগুরু বলেছেন আরও দুই-তিন সপ্তাহ লাগবে।'

ইতিমধ্যে হরিণ মিথুন আবার গুটিগুটি কুমারীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল। তাই দেখিয়া ময়ূর আর সেখানে দাঁড়াইল না, ঘোড়ার রাশ ধরিয়া মন্দুরার দিকে চলিয়া গেল।

তারপর আরও কয়েকবার রাজকুমারীর সহিত দেখা হইল; দুই-চারিটি সামান্য বাক্যালাপ হইল। একদিন সে দেখিল কুমারীর মণিবন্ধে একটি নূতন কঙ্কণ শোভা পাইতেছে। চম্পাকলির ন্যায় সুন্দর ক্ষুদ্র শঙ্খটি এই কঙ্কণের মধ্যমণি। ময়ূর উৎসুক নেত্রে সেই দিকে চাহিল।

কুমারী বলিলেন—'শঙ্খটি আপনার চেনা, আপনার সামনেই পিতা এটি আমাকে দিয়েছিলেন।—অলঙ্কার কেমন হয়েছে?' বলিয়া তিনি মৃণালবাহু তুলিয়া দেখাইলেন।

'ভাল।' ময়ূর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আরও অনেক কথা বলিতে চাহিল, কিন্তু তাহার

মুখ দিয়া বাক্য সরিল না। রাজকুমারী মৃদু হাসিলেন।

দিন কাটিতেছে। অশ্বারোহণ ও অসিবিদ্যা অভ্যাস করা ছাড়াও ময়ূর রাজার কাছে যাতায়াত করে, রাজা যে কক্ষে থাকেন সেই কক্ষদ্বারে ধনুর্বাণ হস্তে দাঁড়াইয়া থাকে। রাজা মাঝে মাঝে তাহার প্রতি দীর্ঘ দৃষ্টিপাত করেন, যেন চক্ষু দিয়া তাহার যোগ্যতার পরিমাপ করেন। ভট্ট নাগেশ্বরের সঙ্গেও প্রত্যহ দেখা হয়; ব্রাহ্মণ দুদণ্ড দাঁড়াইয়া তাহার সহিত বাক্যালাপ ও রঙ্গ-রসিকতা করেন।

এই তো গেল দিনচর্যা। রাত্রিকালেও ময়ূরের কক্ষে কিছু ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল; কিন্তু শঙ্কা ও সংকোচে সে কাহাকেও কিছু বলিতে পারিতেছিল না।

রাত্রিকালে সে ঘরের দ্বার-গবাক্ষ উন্মুক্ত করিয়া শয়ন করিত, আবদ্ধ ঘরে শয়ন করা তাহার অভ্যাস নাই। প্রথম কয়েক রাত্রি নির্বিঘ্নে কাটিয়াছিল, তারপর একদা গভীর রাত্রে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে দীপ নিভাইয়া শুইয়াছিল, সুতরাং ঘর অন্ধকার; কিন্তু ঘরের বাহিরে মুক্ত দ্বারপথে নক্ষত্রের আলোকবিদ্ধ তমিস্রা ঈষৎ তরল। জাগিয়া উঠিয়া ময়ূর পঞ্চেন্দ্রিয় সজাগ করিয়া শুইয়া রহিল। ঘরের অভ্যন্তরে অতি লঘু পদপাতের শব্দ আসিতেছে। সে সহসা উঠিয়া বসিয়া তীব্র স্বরে বলিল—'কে ?'

প্রশ্নের উত্তর আসিল না। কে যেন ভয় পাইয়া দ্রুত চরণে ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

ময়ূর ভাবিল, হয়তো বিড়াল। তারপর সে অনুভব করিল, ঘরের বাতাসে কেশতৈলের মৃদু গন্ধ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সে বিস্মিত হইয়া ভাবিল, স্ত্রীলোক তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল! কে সে? রাজপুরীতে দাসী-কিঙ্করী আছে, তাহাদের মধ্যে কেহ? কিন্তু কেন ?

সে-রাত্রে ময়ূর অনেকক্ষণ জাগিয়া রহিল, কিন্তু আর কিছু ঘটিল না। কয়েকদিন কাটিয়া গেল, কৃষ্ণপক্ষ গিয়া শুক্লপক্ষের তিথি আসিল। একদিন ময়ূর দ্বার খুলিয়া ঘুমাইতেছিল, ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল। চাঁদ তখনও অস্ত যায় নাই, ঘরের বাহিরে আবছায়া আলো। ময়ূর চক্ষু মেলিয়া অস্পষ্টভাবে দেখিল, তাহার শিয়রে কেহ তাহার পানে চাহিয়া আছে। মুখ দেখা গেল না, কিন্তু কেশতৈলের গন্ধ নাকে আসিল। ময়ূর গম্ভীর স্বরে কহিল—'কে তুমি ?'

শীৎকারের ন্যায় নিশ্বাস টানার শব্দ হইল, তারপর ছায়ামূর্তি দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল। পলকের জন্য একটা আকৃতির ছায়াচিত্র বাহিরের স্বল্পালোকে দেখা দিয়াই অন্তর্হিত হইল। আগে যদি বা সন্দেহ ছিল এখন আর সন্দেহ রহিল না। তাহার অদৃশ্য অভিসারিকা নারীই বটে।

ময়ূর শয্যা হইতে নামিল না, মাথায় হাত দিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। নারীর হাত হইতে তাহার নিস্তার নাই। নারীর জন্য তাহাকে গ্রাম ছাড়িতে হইয়াছে, এখন কি রাজ-আশ্রয় ছাড়িতে হইবে! কিন্তু কে এই নারী? রাজপুরীর দাসী-কিঙ্করীদের সকলকেই সে দেখিয়াছে; তাহাদের মধ্যে কয়েকটি নববয়স্কা যুবতী আছে। তাহারা তাহার পানে সাভিলাষ কটাক্ষ হানিয়াছে, কিন্তু সে দূরে সরিয়া গিয়া তাহাদের এড়াইয়া গিয়াছে। তাহাদেরই মধ্যে কেহ কি? কিন্তু যদি দাসী-কিঙ্করী না হয়! যদি—ময়ূর শিহরিয়া উঠিল—যদি রাজকুমারী হয়!

এখন সে কী করিবে! রাজাকে বলিবে? কিন্তু তিনি যদি বিশ্বাস না করেন! ভট্ট নাগেশ্বরকে বলিবে? না, বাচাল ব্রাহ্মণ এই কথা সর্বত্র রাষ্ট্র করিবেন; তাহাতে

সুফল অপেক্ষা কুফলই অধিক ফলিতে পারে। অনেক চিন্তা করিয়া ময়ূর স্থির করিল, অভিসারিণী যদি আবার আসে তাহাকে ধরিতে হইবে, তারপর অবস্থা বুঝিয়া কার্য করিতে হইবে।

তৃতীয়বার অভিসারিকা আসিল আরও চার-পাঁচ দিন পরে। এবার ময়ূর প্রস্তুত ছিল। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সে এক লাফে উন্মুক্ত দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইল। নারী হঠাৎ ভয় পাইয়া ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া তাহার পাশ কাটাইয়া পলাইবার চেষ্টা করিল। ময়ূর তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল। পুষ্টাঙ্গ চাঁদের আলোয় চিনিতে কষ্ট হইল না, কুমারী সোমশুক্লার পরিচারিকা চঞ্চরী।

ময়ূর চঞ্চরীকে আগে কয়েকবার দেখিয়াছে, কিন্তু তাহার উগ্র রূপ ময়ূরকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই, বরং প্রতিহত করিয়াছে। বিশেষত সে ভট্ট নাগেশ্বরের মুখে চঞ্চরীর জন্মবৃত্তান্ত শুনিয়াছিল, দুর্বৃত্ত ম্লেচ্ছ রাজার জারজ কন্যা। ইহাতে তাহার মন আরও বিমুখ হইয়াছিল।

ময়ূর চাপা তর্জন করিয়া বলিল—'তুমি কেন আমার ঘরে এসেছিলে?'

চঞ্চরী উত্তর দিল না, আঁকিয়া-বাঁকিয়া ময়ূরের হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল। সে কেন ময়ূরের ঘরে আসিয়াছিল নিজেই বোধহয় জানে না; সে অনূঢ়া অনভিজ্ঞা, কেবল অন্ধ প্রকৃতির তাড়নায় ময়ূরের সংসর্গ কামনা করিয়াছিল। তাহার বুদ্ধি বেশী নাই, কিন্তু যৌবনের ক্ষুধা-তৃষ্ণা পূর্ণমাত্রায় দেখা দিয়াছে।

ময়ূর বলিল—'চল, তোমাকে রাজার কাছে নিয়ে যাই।'

এই সময় পিছন হইতে কণ্ঠস্বর আসিল—'ময়ূরভদ্র!'

ময়ূর ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল অচ্ছাভ চাঁদের আলোয় দু'টি নারীমূর্তি অদূরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। একজন রাজকন্যা সোমশুক্লা, অন্যজন দাসী সীমন্তিনী। ময়ূর চঞ্চরীর হাত ছাড়িয়া দিল, চঞ্চরী অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

চঞ্চরী রাত্রে তাহার মাতার কক্ষে শয়ন করে। আজ রাত্রে সীমন্তিনী হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া দেখিল চঞ্চরী শয্যায় নাই। সে ছুটিয়া রাজকুমারীর কক্ষে গিয়াছিল, রাজকুমারীও জাগিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু চঞ্চরী সেখানে নাই। তখন দুইজনে চুপি চুপি চঞ্চরীকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিলেন।

সীমন্তিনী অগ্রসর হইয়া আসিয়া চঞ্চরীর চুলের মুঠি ধরিল, অনুচ্চস্বরে ময়ূরকে বলিল—'ভদ্র, এবার চঞ্চরীকে ক্ষমা করুন। ও আমার কন্যা। আমি ওকে শাসন করব। আর কখনো ও আপনাকে বিরক্ত করবে না।'

ময়ূর স্থির দৃষ্টিতে রাজকন্যার পানে চাহিয়া ছিল, সেইভাবে থাকিয়াই বিরসকণ্ঠে বলিল—'ভাল।'

সীমন্তিনী চঞ্চরীর চুলের মুঠি ধরিয়া নির্মমভাবে টানিয়া লইয়া গেল। সোমশুক্লা দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ময়ূর মুখ তুলিয়া চাঁদের পানে চাহিল। চাঁদ হাসিতেছে, চারিদিকে শারদ রাত্রির স্নিগ্ধ শীতলতা। একটি গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ময়ূর মুখ নামাইল, দেখিল কুমারী তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহার উস্মিত মুখে বিচিত্র হাসি। তিনি লঘু স্বরে বলিলেন—'ময়ূরভদ্র, আপনার জীবনে এরূপ অভিজ্ঞতা বোধ হয় নূতন নয়।'

ময়ূর চকিত হইয়া বলিল—'না। আমার জীবনকথা আপনি জানেন?'

শুক্লা বলিলেন—'ভট্ট নাগেশ্বরের মুখে শুনেছি।'

ময়ূর প্রশ্ন করিল—'সব কথা শুনেছেন? আমি অজ্ঞাতকুলশীল তা জানেন?'

শুক্লা বলিলেন—'জানি। আপনি স্ত্রীজাতির প্রতি বিরূপ, তাও জানি।'

ময়ূর ব্যস্ত স্বরে বলিল—'বিরূপ নয় দেবি! আমি—আমি—'

'স্ত্রীজাতিকে এড়িয়ে চলেন। তা চলুন, কিন্তু কাজটি সহজ নয়।' কুমারীর কণ্ঠে অতি মৃদু হাসির মূর্ছনা উত্থিত হইয়াই মিলাইয়া গেল। তাঁহার দেহটিও যেন চন্দ্রকিরণে গলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

ময়ূর অনিমেষ চক্ষে চাহিয়া রহিল।

ছয়

পঞ্চমপুরের রাজসংসারে আশ্রয়লাভ করিবার পর ময়ূরের জীবনযাত্রায় একটি মন্দ-মন্থর ছন্দ আসিয়াছিল, দুই মাস পরে সেই ছন্দের যতিভঙ্গ হইল। রাজা ভূপ সিংহ তাহাকে নিভৃত কক্ষে আহ্বান করিয়া বলিলেন—'উপবেশন কর। তোমার প্রকৃত কর্মের সময় উপস্থিত।'

ময়ূর রাজার সম্মুখে বসিল। ভূপ সিংহ কিয়ৎকাল গম্ভীর দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া ধীরস্বরে বলিলেন—'ময়ূর, গত দুই মাস ধরে আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমার গতিবিধি লক্ষ্য করেছি। আমার বিশ্বাস জন্মেছে, যে-কাজের ভার আমি তোমাকে দেব তা তুমি পারবে।'

ময়ূর জোড়হস্তে বলিল—'আজ্ঞা করুন আর্য।'

রাজা বলিলেন—'তোমাকে দিল্লী যেতে হবে। কিন্তু একা নয়, তোমার সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক থাকবে।'

রাজা সপ্রশ্ন নেত্রে ময়ূরের পানে চাহিলেন, ময়ূর তিলমাত্র বিচলিত না হইয়া নিষ্পলকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—'তারপর আজ্ঞা করুন আর্য।'

রাজা সন্তোষের নিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন—'দিল্লী এখান থেকে বহুদূর, পথও অতি দুর্গম। দিল্লী ম্লেচ্ছ জাতির রাজধানী, সেখানকার ম্লেচ্ছগণ ঘোর দুর্বৃত্ত এবং দুর্নীতিপরায়ণ, সেখানে হিন্দুর জীবনের কোনো মূল্য নেই। তোমাকে এই শত্রুপুরীতে যেতে হবে একটি সুন্দরী নারীকে নিয়ে। তোমার দায়িত্ব কতখানি বুঝতে পারছ?'

'পারছি মহারাজ। তারপর আদেশ করুন।'

'তুমি যাকে নিয়ে যাবে তার নাম চঞ্চরী। তাকে বোধহয় দেখেছ, সে সুন্দরী। কোনো বিশেষ কারণে আমি তাকে আলাউদ্দিনের কাছে উপঢৌকন পাঠাতে চাই।'

রাজা ক্ষণেকের জন্য নীরব হইলেন, ময়ূরও চুপ করিয়া রহিল; সে যে ভট্ট নাগেশ্বরের মুখে চঞ্চরীর জন্মবৃত্তান্ত শুনিয়াছে তাহার আভাসমাত্র দিল না।

রাজা আবার আরম্ভ করিলেন—'কেন আমি চঞ্চরীকে আলাউদ্দিনের কাছে পাঠাচ্ছি তা জানতে চেয়ো না, গূঢ় রাজনৈতিক কারণ আছে। তুমি কেবল চঞ্চরীকে দিল্লীতে নিয়ে যাবে, সেখানে পৌঁছে চেষ্টা করবে চঞ্চরী যাতে আলাউদ্দিনের দৃষ্টিপথে পড়ে, সুন্দরী নারী দেখলেই সে তাকে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাবে। তুমি প্রতিরোধ করবে না, আলাউদ্দিনকে মারবার চেষ্টা করবে না। তারপর সাতদিন অতীত হলে এই পত্রটি কোনো উপায়ে তার কাছে পৌঁছে দেবে।'

জতুমুদ্রানিবন্ধ একটি ক্ষুদ্রাকৃতি পত্র তিনি ময়ূরের হাতে দিলেন। সে দেখিল রাজার কপালের শিরা-উপশিরা স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, চক্ষুর্দ্বয় রক্তাভ। কিন্তু তিনি ধীরভাবে বলিলেন—'এই তোমার কাজ। তুমি অশ্বপৃষ্ঠে যাবে, চঞ্চরী দোলায় থাকবে। দশজন সশস্ত্র বাহক তোমাদের সঙ্গে থাকবে, তারা দোলা বহন করবে, যদি পথে দস্যু-তস্কর আক্রমণ করে তারা লড়াই করবে। দস্যু-তস্কর সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখলে অপহরণের

চেষ্টা করতে পারে, তুমি সর্বদা সতর্ক থাকবে।'

রাজা বক্তব্য শেষ করিলে ময়ূর জিজ্ঞাসা করিল—'কবে যাত্রা করতে হবে?'

রাজা বলিলেন—'কাল প্রত্যূষে। সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন প্রস্তুত আছে। তুমি আমার আদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করবে।'

ময়ূর শুধু বলিল—'হাঁ মহারাজ।'

রাজা বলিলেন—'বৎসরাবধি কাল আমি তোমার জন্য প্রতীক্ষা করব। যদি কার্যসিদ্ধি করে ফিরে আসতে পারো, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই থাকবে না। আশীর্বাদ লও বৎস।'

সে-রাত্রে ময়ূর ঘুমাইতে পারিল না, শয্যায় শুইয়া আসন্ন যাত্রা সম্বন্ধে নানা কথা চিন্তা করিতে লাগিল। কি করিয়া কোন্ কার্য করিবে, বিপদে পড়িলে কী ভাবে আচরণ করিবে, তাহার ধনুর্বিদ্যা কোন্ কাজে লাগিবে, এই সব চিন্তা। চঞ্চরীর ভাগ্যের কথা সে অধিক চিন্তা করিল না, চঞ্চরী এই চতুরঙ্গ খেলার ক্রীড়নক, অদৃষ্ট তাহাকে নিয়ন্ত্রিত পথে লইয়া যাইতেছে। ময়ূর নিমিত্ত মাত্র।

এইসব ভাবনার মধ্যে রাত্রি তিন প্রহর কাটিয়া গেল। ঘরের বাহিরে অনিমেষ জ্যোৎস্না, যেন প্রকৃতির অঙ্গে রূপালী তবক মুড়িয়া দিয়াছে। ময়ূর শয্যায় উঠিয়া বসিল। রাত্রি শেষ হইতে বেশী বিলম্ব নাই।

দ্বারের বাহিরে একটি নিঃশব্দ মূর্তি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। চন্দ্রালোকে মুখাবয়ব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ময়ূরের হৃদ্‌যন্ত্র দুন্দুভির ন্যায় ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সে ত্বরিতে উঠিয়া মূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইল।

'রাজনন্দিনি।'

সোমশুক্লা স্থিরায়ত নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন, কথা বলিলেন না। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর ময়ূর হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—'ভেবেছিলাম যাত্রার আগে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না।'

সোমশুক্লা এবার কথা বলিলেন, তাঁহার কণ্ঠ একটু কাঁপিয়া গেল,—'ময়ূরভদ্র, আমার এই শঙ্খ-কঙ্কণ আপনি গ্রহণ করুন। এটি সঙ্গে রাখবেন, আপনার কল্যাণ হবে।'

ক্ষণকাল নিশ্চল থাকিয়া ময়ূর সোমশুক্লার সম্মুখে নতজানু হইল, অঞ্জলিবদ্ধ হস্ত তাঁহার দিকে প্রসারিত করিল। সোমশুক্লা মণিবন্ধ হইতে কঙ্কণ খুলিয়া তাহার অঞ্জলিতে রাখিলেন। ময়ূর রুদ্ধ স্বরে কহিল—'দেবি, আমি আর কী বলব? আমি—আমি—'

সোমশুক্লা অঙ্গুলি দিয়া তাহার ললাট স্পর্শ করিলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন—'এখন কিছু বলবেন না। আপনি ফিরে আসুন, তারপর আপনার কথা আপনি বলবেন, আমার কথা আমি বলব।'

উদ্বেল হৃদয়ে ময়ূর মস্তক নত করিল।

সোমশুক্লা প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। নিজ কক্ষে গেলেন না, ক্ষণেক ইতস্তত করিয়া সীমন্তিনীর কক্ষের বাহিরে দ্বারের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন।

ঘরে দীপ জ্বলিতেছে। চঞ্চরী উত্তেজিত হাসিমুখে মায়ের সম্মুখে বসিয়া আছে, সীমন্তিনী তাহাকে বস্ত্র-অলঙ্কারে সাজাইয়া দিতেছে। সীমন্তিনীর মুখ কঠিন কিন্তু তাহার দুই চক্ষু দিয়া অবশে অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। রাজকুমারী ছায়ার মত দ্বারের নিকট হইতে সরিয়া গেলেন।—

উষাকালে ক্ষুদ্র যাত্রীদলের দুরূদুর্গম যাত্রা আরম্ভ হইল।

দ্বিতীয় আবর্ত

এক

দুই মাস পরে একটি শীতের অপরাহ্ণে ময়ূর চঞ্চরীকে লইয়া দিল্লীর উপকণ্ঠে পেণীছিল।

পথে কোনও বিপদ আপদ ঘটে নাই। ভাগ্যক্রমে তাহারা মথুরাযাত্রী একদল হিন্দু বণিকের সঙ্গ পাইয়াছিল; বণিকদের সঙ্গে সশস্ত্র রক্ষী ছিল। তিনদিন পূর্বে বণিকদল মথুরায় নামিয়া গেল; বাকি পথটুকু ময়ূর নিঃসঙ্গভাবেই অতিক্রম করিয়াছে, কিন্তু কোনও উপদ্রব হয় নাই। চঞ্চরীও কোনও প্রকার গণ্ডগোল করে নাই; সেই রাত্রে ধরা পড়িবার পর হইতে সে মনে মনে ময়ূরকে ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে, প্রগল্ভতা করিবার সাহস আর নাই। ময়ূর যখন যে আদেশ করে সে নির্বিচারে তাহা পালন করে।

দিল্লীর দক্ষিণ তোরণদ্বার হইতে অর্ধ-ক্রোশ দূরে একটি হিন্দু পান্থশালা পাইয়া ময়ূর এখানেই যাত্রা স্থগিত করিল। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে নগরদ্বার বন্ধ হইয়া যায়, সুতরাং আজ রাত্রিটা পান্থশালায় কাটাইয়া কাল প্রভাতে নগরে প্রবেশ করাই ভাল।

পান্থশালাটি সুপরিসর; মাঝখানে পট্টাবৃত উঠান, চারিদিক ঘিরিয়া ছোট ছোট কুঠুরি। ময়ূর একটি কুঠুরি ভাড়া লইল। তাহাতে চঞ্চরী থাকিবে, অন্য সকলে কুঠুরির দ্বার ঘিরিয়া উঠানে শয়ন করিবে।

হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া ময়ূর পান্থপালকে ডাকিল, রাত্রির আহারের নির্দেশ দিয়া পান্থশালার বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। কাল দিল্লী প্রবেশ করিতে হইবে, কিছুক্ষণ নির্জনে চিন্তা করা প্রয়োজন।

সূর্যাস্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু শীতের দীর্ঘ সন্ধ্যা এখনও নির্বাপিত হয় নাই। পান্থশালার সম্মুখের পথটি জনশূন্য, আশেপাশে বেশী লোকালয় নাই, ইতস্তত দুই-একটি কুটির দেখা যায়। উত্তর দিকে অর্ধ-ক্রোশ দূরে দিল্লীর কৃষ্ণবর্ণ প্রাকার ঘনায়মান অন্ধকারে অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে; যেন একটা বিপুলকায় হস্তী ভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া শুণ্ড ঊর্ধ্বে তুলিয়া আছে। ময়ূর জানে না যে ওই ঊর্ধ্বোত্থিত শুণ্ডই জগৎ-বিখ্যাত কুতবমিনার।

চিন্তাক্রান্ত মুখে পান্থশালার সম্মুখে পাদচারণ করিতে করিতে ময়ূরের চোখে পড়িল, পান্থশালার প্রাচীরগাত্রে সংলগ্ন একটি অতি ক্ষুদ্র বিপণি রহিয়াছে। ফলের ও শাকসব্জির দোকান। একটি স্ত্রীলোক মঞ্চের উপর বসিয়া আছে। পান্থশালায় যাহারা আসে তাহাদের মধ্যে স্বপাকভোজী কেহ থাকিলে বোধ করি এই দোকান হইতে ফলমূল শাকপত্র ক্রয় করে।

নিতান্ত কৌতূহলবশেই ময়ূর দোকানের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। মঞ্চের উপর শুষ্ক এবং তাজা দুই প্রকার ফলই সাজানো রহিয়াছে; ডালিম, দ্রাক্ষা, খেজুর এবং আরও অনেক জাতের অপরিচিত ফল। সে একটি সুপক্ক ডালিম তুলিয়া লইয়া পসারিনীর মুখের পানে চোখ তুলিল।

রমণীর মুখের উপর হইতে ময়ূরের দৃষ্টি যেন প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিল। মুখখানা অস্বাভাবিক রকম কৃষ্ণবর্ণ; বরং কৃষ্ণবর্ণ না বলিয়া নীলবর্ণ বলিলেই ভাল হয়। ময়ূর ক্ষণিক বিস্ময় সংবরণ করিয়া বলিল—'এই ডালিমের দাম কত?'

রমণীও একদৃষ্টে ময়ূরের পানে চাহিয়া ছিল। তাহার মুখ দেখিয়া বয়স অনুমান করা যায় না, তবে বৃদ্ধা নয়। সে বলিল—'ফলের দাম এক দ্রম্ম। তুমি দক্ষিণ থেকে আসছ, তোমার দেশ কোথায়?'

নবাগত যাত্রীকে এরূপ প্রশ্ন করা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু ময়ূর সতর্ক হইল; রমণীকে এক দ্রম্ম দিয়া তাচ্ছিল্যভরে বলিল—'নর্মদার পরপারে।' তারপর সুন্দর পাকা ফলটি দুই হাতে লোফালুফি করিতে করিতে পাদচারণ করিতে লাগিল।...সোমশুক্লা যে শঙ্খ-কঙ্কণ দিয়াছিলেন তাহা সে সুতা দিয়া গলায় ঝুলাইয়া রাখিয়াছে, আঙরাখার তলায় কঙ্কণ দেখা যায় না; কিন্তু ময়ূর বক্ষের উপর তাহার স্পর্শ অনুভব করে। কুমারী সোমশুক্লা—

সন্ধ্যা ঘন হইয়া আসিল। পসারিনী রমণী দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেছে, ময়ূর পান্থশালার কোণ পর্যন্ত গিয়া ফিরিবার উপক্রম করিল। বাহিরে বেশ ঠাণ্ডা, এবার পান্থশালার মধ্যে আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে। এই সময় সে লক্ষ্য করিল, উত্তর দিক হইতে একটি লোক আসিতেছে। ছায়ান্ধকারে লোকটির অবয়ব ভাল দেখা গেল না; কিন্তু সে খঞ্জ, লাঠিতে ভর দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিতেছে। আরও কাছে আসিলে ময়ূর দেখিল লোকটির মুখে প্রচুর দাড়িগোঁফ রহিয়াছে, সম্ভবত মুসলমান। সে ফিরিয়া যাইতেছিল, পিছন হইতে আহ্বান আসিল—'দয়ালু শ্রেষ্ঠি, বিকলাঙ্গ অক্ষমকে দয়া কর।'

ময়ূর আবার ফিরিল। সঙ্গে সঙ্গে খঞ্জ ভিক্ষুকটা লাঠি হাতে লইয়া দুই পায়ে দাঁড়াইল এবং ক্ষিপ্রহস্তে লাঠি তুলিয়া ময়ূরের মস্তকে সজোরে আঘাত করিল। ময়ূর আত্মরক্ষার সময় পাইল না; জ্ঞান হারাইবার পূর্বে সে রমণীকণ্ঠের একটি তীব্র চীৎকার শব্দ শুনিতে পাইল। তারপর আর কিছু তাহার মনে রহিল না।

জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া ময়ূর দেখিল সে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে শুইয়া আছে, ঘরের কোণে দীপ জ্বলিতেছে। একটি স্ত্রীলোক তাহার পাশে বসিয়া মাথায় ও কপালে জলের প্রলেপ দিতেছে। সে চিনিল, ফলের দোকানের পসারিনী।

প্রথমেই ময়ূর বুকে হাত দিয়া দেখিল, কঙ্কণ যথাস্থানে আছে। তখন সে বলিল—'খঞ্জ লোকটা কে?'

পসারিনী দ্বারের দিকে চাহিল। পান্থপাল সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলিল—'ওর নাম মামুদ, দিল্লীর দস্যু। ও সত্যই খঞ্জ নয়, খঞ্জের ভান করেছিল। দিল্লীর বাইরে পান্থশালার আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। নূতন মুসাফিরকে একলা পেলে মাথায় লাঠি মেরে যথাসর্বস্ব কেড়ে নিয়ে পালায়। দিল্লীতে এরকম ঠক্ রাহাজান অনেক আছে।'

পসারিনী বলিল—'ভাগ্যে আমি দেখতে পেয়েছিলাম, কাটারি নিয়ে ছুটে গেলাম। আমাকে দেখে মামুদ পালালো, নইলে তোমার সর্বস্ব কেড়ে নিত।'

ময়ূর শয্যায় উঠিয়া বসিল। মাথাটা টন্‌টন্ করিতেছে বটে, কিন্তু গুরুতর কিছু নয়। সে মুখ তুলিয়া দেখিল দ্বারের কাছে তাহার সঙ্গীরাও উৎকণ্ঠিত মুখে দাঁড়াইয়া আছে। সে হাসিমুখে হাত নাড়িয়া বলিল—'ভয় নেই, আমি অক্ষত আছি।' তাহারা নিশ্চিত হইয়া চলিয়া গেল।

ময়ূর পসারিনীকে বলিল—'এটি কি তোমার ঘর?'

পসারিনী বলিল—'হাঁ, আমি এই পান্থশালায় থাকি।' ময়ূর উঠিয়া দাঁড়াইবার উপক্রম করিলে সে বলিল,—'উঠো না উঠো না, আরও খানিক শুয়ে থাকো, শরীর সুস্থ হবে।'

ময়ূর বসিল, কৃতজ্ঞ স্বরে বলিল—'তুমি আজ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ।'

পসারিনী বলিল—'তুমি হিন্দু, আমার দেশের লোক। তোমার প্রাণ বাঁচাব না?'

ময়ূর কিছুক্ষণ পসারিনীর নীলবর্ণ মুখের পানে চাহিয়া রহিল, শেষে বলিল—'তুমি দক্ষিণ দেশের মানুষ?'

পসারিনী যেন একটু বিচলিত হইয়া পড়িল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল—'হাঁ। অনেক দিন দেশছাড়া। এই পান্থশালায় দোকান করেছি, দক্ষিণ দেশ থেকে যারা আসে তাদের কাছে দেশের খবর পাই—'

এই সময় পান্থপাল এক পাত্র গরম দুধ আনিল; পসারিনী বলিল—'গরম দুধটুকু খাও, শরীর সুস্থ হবে।'

ময়ূর দুগ্ধ পান করিয়া শরীরে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিল। পান্থপাল শূন্য পাত্র লইয়া যাইবার পর পসারিনী বলিল—'তুমি নর্মদার ওপার থেকে আসছ, কিন্তু রাজ্যের নাম তো বললে না।'

ময়ূর একটু ইতস্তত করিল। কিন্তু প্রাণদাত্রীর কাছে মিথ্যা বলা চলে না, সে বলিল—'পঞ্চমপুরের নাম শুনেছ?'

পসারিনীর চক্ষু ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ময়ূর এবার পসারিনীর মুখ ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল। মুখের বর্ণ নীল বটে, কিন্তু গঠন অতি সুন্দর, আভিজাত্য-ব্যঞ্জক। এই গঠনের মুখ সে যেন কোথায় দেখিয়াছে।

পসারিনী যখন কথা বলিল তখন তাহার কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন উত্তেজনার ঝঙ্কার শোনা গেল—'পঞ্চমপুরের নাম শুনেছি। তুমি পঞ্চমপুর থেকে আসছ?'

ময়ূর বলিল—'হাঁ।'

'পঞ্চমপুরের সকলকে চেনো?'

'সকলকে চিনি না। ভট্ট নাগেশ্বরকে চিনি।'

'ভট্ট নাগেশ্বর!' নামটি পসারিনী পরম স্নেহভরে আস্বাদন করিয়া উচ্চারণ করিল—'আর কাকে চেনো?'

ময়ূর বলিল—'আমার অন্তরাত্মা বলছে তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি।—আমি রাজপুরীর সকলকে চিনি, রাজা ভূপ সিংহ আমার প্রভু।'

পসারিনীর চক্ষু দুইটি অন্তর্বাষ্পে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অতঃপর ময়ূর সসম্ভ্রমে বলিল—'আপনাকে সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলা মনে হচ্ছে। কিন্তু—আপনার—'

'মুখ কালো?' পসারিনী হাসিল! সুন্দর দন্তপংক্তির রেখা ঈষৎ দেখা গেল।

ময়ূর বিস্ফারিত চক্ষে কিয়ৎকাল চাহিয়া থাকিয়া করজোড়ে বলিল—'আপনাকে চিনেছি।'

পসারিনী বলিল—'চিনেছ! কি করে চিনলে?'

ময়ূর বলিল—'আপনার হাসি দেখে। রাজকন্যা সোমশুক্লার হাসি ঠিক আপনার মত।'

'সোমশুক্লা! ওঃ, তার বয়স এখন সতরো বছর।' পসারিনী সহসা দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ কাটিবার পর ময়ূর স্খলিত স্বরে বলিল—'কিন্তু দেবি, আপনি এখানে—এভাবে—'

চক্ষু মুছিয়া পসারিনী বলিল—'আমার কথা পরে হবে। আগে তুমি সব কথা বল। কুমার রামরুদ্র ভাল আছেন?'

ময়ূর হেঁটমুখে বলিল—'কুমার রামরুদ্র বেঁচে নেই। নয় বছর আগে রাজা তাঁকে দিল্লী পাঠিয়েছিলেন বংশের কলঙ্কমোচনের জন্য, আলাউদ্দিনের জল্লাদের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।'

পসারিনী কপালে করাঘাত করিয়া আবার কাঁদিল। শেষে অশ্রু সংবরণ করিয়া বলিল—'হায়, রামরুদ্রের সঙ্গে যদি আমার দেখা হ'ত। নয় বছর আগে আমি এখানেই ছিলাম। সবই বিধিলিপি। কিন্তু এখন রাজা তোমাকে কি জন্য পাঠিয়েছেন তাই বল।'

আর গোপনতার প্রয়োজন ছিল না, ময়ূর যাহা যাহা জানিত সব বলিল। পসারিনী সর্বগ্রাসী চক্ষু মেলিয়া শুনিতে লাগিল; শুনিতে শুনিতে কখনও তাহার চক্ষু উদ্দীপনায় স্ফুরিত হইল, কখনও হিংসায় প্রখর হইল। বিবৃতির অন্তে সে দীর্ঘকাল করলগ্ন কপোলে বসিয়া থাকিয়া শেষে বলিল—'পিতা প্রতিহিংসার উত্তম উপায় উদ্ভাবন করেছেন। ম্লেচ্ছ রাক্ষস ভোগের জন্য পাগল, কিন্তু তার মনে একটিমাত্র বাধা আছে; নিজের কন্যা—। এখনো আলাউদ্দিনের ভোগক্ষুধা মেটেনি।—যাক্, দৈব অনুকূল, তাই আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে। তুমি একা এ কার্য সাধন করতে পারতে না।'

ময়ূর নিজ বক্ষস্থিত শঙ্খ-কঙ্কণটি একবার স্পর্শ করিল, মনে মনে বলিল—সত্যই দৈব অনুকূল, এই শঙ্খ আমার ভাগ্যদাতা। মুখে বলিল—'দেবি, ভাগ্যবশে আপনার সাক্ষাৎ পেয়েছি। কিন্তু এবার আপনার কথা বলুন।'

শিলাবতী তখন ভূমিসংলগ্ন নেত্রে ধীরে ধীরে নিজের মর্মন্তুদ কাহিনী বলিলেন—

আলাউদ্দিনের সঙ্গে সাত-আট হাজার অশ্বারোহী সৈন্য এবং দশ-বারোটা হাতী ছিল। শিলাবতীকে হাতীর পিঠে তুলিয়া সে সসৈন্যে দক্ষিণ দিকে চলিল। দেবগিরির উত্তুঙ্গ দুর্গের সম্মুখে দুইবার ভীষণ যুদ্ধ হইল; হাতীর পিঠে বসিয়া শিলাবতী যুদ্ধ দেখিলেন। এমন বীভৎস দৃশ্য পৃথিবীতে আর নাই। তারপর বহু ধনরত্ন হাতীর পিঠে তুলিয়া ম্লেচ্ছরা ফিরিয়া চলিল। প্রথমে তাহারা গেল প্রয়াগের নিকট কারা-মানিকপুর নামক স্থানে। সেখানে আলাউদ্দিনের প্রধানা বেগম এবং অন্যান্য বহু স্ত্রীলোক ছিল; শিলাবতীও হারেমে স্থান পাইলেন।

এই কারা-মানিকপুরেই আলাউদ্দিন বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা তাহার পিতৃব্য সুলতান জালালউদ্দিনকে হত্যা করে, তারপর পিতৃব্যের মুণ্ড বর্শাফলকে তুলিয়া দিল্লী যাত্রা করে এবং সিংহাসন অধিকার করে।

শিলাবতীও আসিয়া দিল্লীর হারেমে রহিলেন। সেখানে নিত্য নবযৌবনা সুন্দরীর আবির্ভাব। যাহারা পুরাতন হইয়াছে তাহারা সহসা কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে কেহ জানে না। হারেমে ক্ষুন্নযৌবনার স্থান নাই।

হারেমে একটি দাসী ছিল, তাহার নাম ছিল কপোতী। সে অনেক শিল্পবিদ্যা জানিত—পান সাজা, মালা গাঁথা, অলকা-তিলক আঁকা, আরও কত কি। সে আদৌ হিন্দু ছিল, তাহাকে গো-মাংস খাওয়াইয়া মুসলমান করা হইয়াছিল। কিন্তু মনে মনে সে হিন্দু ছিল। হারেমের মেয়েরা তাহাকে কবুতর বিবি বলিয়া ডাকিত। এই কবুতর বিবি প্রথম হইতেই শিলাবতীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, সুযোগ পাইলেই আসিয়া দু'দণ্ড গল্প করিত; শিলাবতীর দুঃসহ জীবন এই বিগতযৌবনা দাসীর সাহচর্যে কিঞ্চিৎ সহনীয় হইয়াছিল।

দুই বৎসর কাটিবার পর হারেমে প্রবেশ করিলেন গুর্জরের রানী কমলা। তিনি অলৌকিক রূপবতী এবং রতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা ছিলেন; অল্পকাল মধ্যেই তিনি আলাউদ্দিনকে বশীভূত করিলেন। তারপর কমলার কটাক্ষ ইঙ্গিতে হারেম হইতে উপপত্নীরা একে একে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। একদিন কবুতর বিবি চুপি চুপি আসিয়া শিলাবতীকে জানাইল—'খবর পেয়েছি তোমাকে সরাবার চেষ্টা হচ্ছে। ঘোড়াশালের সর্দার-সাহিসের ওপর সুলতান খুশী হয়েছেন, তোমাকে তার হাতে দান করবেন।'

শুনিয়া ঘৃণায় শিলাবতীর দেহ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি কবুতর বিবির পদতলে

পাড়িয়া বলিলেন—'আমাকে বাঁচাও। আমি হারেম থেকে পালিয়ে যেতে চাই।'

কবুতর বিবি বলিল—'পালানো কি সহজ? হারেমের ফটকে কড়া পাহারা।'

শিলাবতী বলিলেন—'তুমি উপায় কর, আমি তোমার কেনা হয়ে থাকব।'

কবুতর বিবি তখন বলিল—'আমি এক বিদ্যা জানি, তার জোরে তুমি পালাতে পারবে, রক্ষীরা তোমাকে হাবসি দাসী ভেবে পথ ছেড়ে দেবে।'

সেই রাত্রে কবুতর বিবি শিলাবতীর মুখে ও হাতে সূচী ফুটাইয়া ফুটাইয়া উল্কি কাটিয়া দিল, অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া শিলাবতী উল্কি পরিলেন, তাঁহার মুখ ও হাতের শুভ্রতা উল্কির নীলবর্ণে ঢাকা পড়িল।

পরদিন তিনি মাথায় জলের কলস লইয়া হারেম হইতে বাহির হইলেন। হারেমের হাবসি দাসীরা অন্দরে-বাহিরে নিত্য যাতায়াত করে; শিলাবতীর স্ফীত কৃষ্ণবর্ণ মুখের পানে রক্ষীরা তাকাইল না, পথ ছাড়িয়া দিল।

হারেমের বাহিরে কিয়দ্দূর আসিয়া তিনি কলস ফেলিয়া দিয়া নগরের দক্ষিণ দ্বারের দিকে চলিলেন; তোরণ পার হইয়া সিধা পথ ধরিয়া চলিলেন। কোথায় যাইতে হইবে তাহা জানেন না, কেবল দক্ষিণ দিকে চলিয়াছেন।

এই পান্থশালা পর্যন্ত আসিয়া তাঁহার আর চলৎশক্তি রহিল না। পান্থপাল তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেল। তদবধি শিলাবতী এই পান্থশালায় আছেন। পান্থপাল পঞ্চমপুরের লোক, সে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় জানে। সে তাঁহাকে পঞ্চমপুরে ফিরিয়া যাইবার জন্য নির্বন্ধ করিয়াছিল, কিন্তু তিনি যান নাই। কোন্ মুখ লইয়া পিতার সম্মুখে দাঁড়াইবেন?

অনন্তর চৌদ্দ বৎসর এই পান্থশালায় ফল বিক্রয় করিয়া কাটিয়াছে। কেহ তাহাকে চিনিতে পারে নাই। শিলাবতী নাম্নী হতভাগিনী রাজকন্যা মরিয়া গিয়াছে।

তারপর আজ—

আত্মকাহিনী শেষ করিয়া শিলাবতী অঙ্গারের ন্যায় চক্ষু তুলিলেন, বলিলেন—'না, শিলাবতী এখনো মরেনি।'

তারপর তিনি উঠিয়া ঘরের বাহিরে গেলেন। অল্পকাল পরে তিনি ও পান্থপাল ময়ূরের রাত্রির আহার লইয়া উপস্থিত হইলেন। শিলাবতী বলিলেন—'তুমি আহার কর। তোমার সঙ্গীরা নৈশাহার শেষ করে শয়ন করেছে, চঞ্চরীও ঘুমিয়েছে। তুমি আহার করে নাও, তারপর পরামর্শ হবে।'

ময়ূর বলিল—'আপনি আহার করবেন না?'

শিলাবতী বলিলেন—'না, ময়ূর ভাই, আজ আমার গলা দিয়ে অন্ন নামবে না।'

পান্থপাল আসন পাতিয়া, জলের ঘটি রাখিয়া চলিয়া গেল। পান্থপালটি অতি স্বল্পবাক্ মানুষ, নীরবে কাজ করিয়া যায়। ময়ূর আহারে বসিল।

আহারান্তে মন্ত্রণা আরম্ভ হইল। অনেক রাত্রি পর্যন্ত মন্ত্রণা চলিল।

দুই

পরদিন প্রাতঃকালে ময়ূর, চঞ্চরী ও শিলাবতী সাজসজ্জা করিয়া বাহির হইলেন। অদ্ভুত তাঁহাদের পরিচ্ছদ; ময়ূরের পরিধানে পায়জামা, মাথায় টোপ, হাতে ধনুর্বাণ; শিলাবতী কৃষ্ণবস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া মাথায় ফলের ঝুড়ি লইয়াছেন; চঞ্চরীর শরীর আপাদমস্তক বোরকায় ঢাকা। তিনজনে পদব্রজে দিল্লীর দিকে চলিলেন। সঙ্গীরা পান্থশালায় রহিল; তাহাদের কাজ আপাতত শেষ হইয়াছে।

দিল্লীর দক্ষিণ দ্বারে মানুষ গরু গাধা উটের ভিড়। অধিকাংশ প্রবেশ করিতেছে, কিছু বাহিরে আসিতেছে। দিল্লীর প্রাকারচক্রের বাহিরে মানুষের বসতি কম নয়।

দিল্লী নগরী প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে হিন্দু রাজার রাজধানী ছিল, কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পূর্বে মুসলমানেরা তাহা অধিকার করিয়াছে। স্থাপত্য শিল্পে দুই জাতীয় শিল্পকলার নিদর্শন পাওয়া যায়। বড় বড় অট্টালিকা ও মসজিদ আছে, কিন্তু পথগুলি সংকীর্ণ। নগরের আনাচে-কানাচে নিম্নতন শ্রেণীর মানুষের বাস। কোনোটি হিন্দু-পল্লী, কোনোটি মুসলমান-মহল্লা। রাজভবনের চারিপাশে অনেকখানি উন্মুক্ত স্থান, এখানে অহোরাত্র অশ্বারোহী রক্ষীর দল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সর্বোপরি কুতবমিনারের অভ্রংলিহ শিখর নগরীর শিয়রে দাঁড়াইয়া ইসলামের জয় ঘোষণা করিতেছে।

তিনজনে নগরে প্রবেশ করিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইল; দূর হইতে রাজপ্রাসাদ দেখিল। প্রাসাদের শীর্ষে বহু পারাবত উড়িতেছে। সুলতান আলাউদ্দিনের পায়রা পোষার শখ আছে, বিশেষত দূত-পারাবত। শত ক্রোশ দূরে ছাড়িয়া দিলেও তাহারা স্বস্থানে ফিরিয়া আসে।

নগরদর্শন শেষ করিতে দ্বিপ্রহর হইল। তখন ময়ূর দরিদ্র হিন্দুপল্লীতে গিয়া বাসা ভাড়া লইল। দুইটি ক্ষুদ্র ঘর, সম্মুখে সংকীর্ণ দালান; দুইটি ঘরের একটিতে ময়ূর থাকিবে, অন্যটিতে থাকিবে শিলাবতী ও চঞ্চরী। চাল-ডাল, হাঁড়ি-কলসী কিনিয়া তিনজনে সংসার পাতিয়া বসিল। কতদিন থাকিতে হইবে তাহার স্থিরতা নাই।

আজ সকালে শিলাবতীর কালো মুখ দেখিয়া চঞ্চরী ভয় পাইয়াছিল, ক্রমে ভয় কাটিয়াছে। সে ঘরে আসিয়া বোরকা খুলিয়া ফেলিল। উচ্ছলিত কণ্ঠে বলিল—'কী সুন্দর নগর! কত মানুষ, কত বাড়ি। কী উঁচু স্তম্ভ! আমি আর ফিরে যাব না, এখানেই থাকব।'

শিলাবতী শুষ্ক স্বরে বলিলেন—'সেই চেষ্টাই হচ্ছে।'

অপরাহ্ণে তাঁহারা আবার বাহির হইলেন। ময়ূর রাস্তার একটা চৌমাথায় তীর-ধনুকের খেলা দেখাইল। শূন্যে তীর ছুঁড়িয়া দ্বিতীয় তীর দিয়া ফিরাইয়া আনিল। চঞ্চরীর বোরকা-ঢাকা মাথায় ডালিম রাখিয়া তীর দিয়া ডালিম বিদ্ধ করিল। অনেকগুলি দর্শক জুটিয়া গিয়াছিল, ময়ূর কিছু পয়সা পাইল।

পরদিন সকালে তাহারা আবার বাহির হইল। এবার ময়ূর নগরের অন্যদিকে গিয়া খেলা দেখাইল। ধীরে ধীরে তাহারা রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

অপরাহ্ণে তাহারা প্রাসাদের আরও নিকটস্থ হইল। এখানে সিপাহী দর্শকেরা সংখ্যাই বেশী, কিছু সাধারণ নাগরিকও আছে। দুই-একটি প্রৌঢ়া বৃদ্ধা স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া খেলা দেখিতেছে।

খেলা দেখাইতে দেখাইতে ময়ূর লক্ষ্য করিল, ভিড়ের মধ্যে একজন লোক আছে যাহাকে সে পূর্বে দেখিয়াছে; খঞ্জ সাজিয়া যে তাহার মাথায় লাঠি মারিয়াছিল সেই মামুদ। মামুদকে সে চিনিতে পারিলেও মামুদ তাহাকে নূতন বেশভূষায় চিনিতে পারে নাই; শিলাবতীর গুণ্ঠন-ঢাকা মুখও দেখিতে পায় নাই। মামুদের খঞ্জভাব এখন আর নাই, সে একাগ্র চক্ষে খেলা দেখিতেছে। ময়ূর নির্বিকার মুখে খেলা দেখাইয়া চলিল।

ভিড়ের মধ্যে একটি স্থূলকায়া প্রৌঢ়া রমণী নিষ্পলক নেত্রে শিলাবতীর অর্ধাবগুণ্ঠিত মুখ দেখিতেছিল; ক্রমে শিলাবতীর দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল। দুইজনের চক্ষু অনেকক্ষণ পরস্পরের মুখে সংবদ্ধ হইয়া রহিল।

তীর-ধনুকের খেলা শেষ হইলে দর্শকের দল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ময়ূর মাটি হইতে পয়সা কুড়াইতেছে এমন সময় মামুদ আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল। মামুদের

আকৃতি সরীসৃপের ন্যায়, চিবুকের নীচে চুটকি দাড়ি; পান চিবাইতে চিবাইতে দন্ত নিষ্ক্রান্ত করিয়া বলিল—'খাসা খেলা দেখিয়েছ। তুমি তো দিল্লীর লোক নও, মুলুক কোথায়?'

ময়ূর উত্তর দিল না, পয়সা কুড়াইয়া কোমরে রাখিল। মামুদ বলিল—'তা তুমি পাঠান মোগল উজবুক যে হও, আমার কি। কাছেই শরাবখানা আছে, চল না সেখানে খেলা দেখাবে। অনেক পয়সা পাবে।'

ময়ূর এবারও কথা বলিল না, শিলাবতীর দিকে তাকাইল। দেখিল, তিনি সেই স্থূলকায়া প্রৌঢ়া রমণীর সহিত কথা কহিতেছেন। দুই-চারিটি কথা বলিয়াই তিনি মুখ ফিরাইলেন, রমণী চলিয়া গেল।

মামুদ কিন্তু দমিবার পাত্র নয়, সে চঞ্চরীর দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিল—'বোরকা-ঢাকা ওটি বুঝি তোমার বিবি? বিবি নিয়ে দিল্লীতে এসেছ, খুব সাবধান। এখানে খুব-সুরৎ বিবি বেবাক চুরি যায়। তবে যদি ভাল মুসাফিরখানায় থাকো তাহলে ভয় নেই। আমি একটি ভাল মুসাফিরখানা জানি—'

ময়ূর ধনুতে শর-যোজনার ভান করিয়া বলিল—'বেশী কথা বললে পেট ফুটো করে দেব।'

মামুদ লাফাইয়া পশ্চাৎপদ হইল এবং দূরে দাঁড়াইয়া গলার মধ্যে গজগজ করিয়া বোধ করি তুর্কী ভাষায় খিস্তিখেউড় গাহিতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, শিলাবতী ও চঞ্চরীকে লইয়া ময়ূর ফিরিয়া চলিল। কিছু-দূর গিয়া ময়ূর ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল মামুদ দূরে থাকিয়া তাহাদের অনুসরণ করিতেছে। সে একটু বিমনা হইল। মামুদ অতি নিম্নশ্রেণীর দুর্বৃত্ত, দিল্লীতে নবাগত ব্যক্তিদের ঠকাইয়া কিংবা সুবিধামত রাহাজানি করিয়া উদরপূর্তি করে; সে ময়ূরকে চিনিতে পারে নাই তাহা নিঃসন্দেহ, চিনিতে পারিলে তাহার কাছে ঘেঁষিত না। কিন্তু মামুদ ক্ষুদ্রপ্রাণী হইলেও তাহার সম্বন্ধে সাবধান থাকা আবশ্যক। ক্ষুদ্র প্রাণী অনেক সময় বৃহৎ কার্য ভ্রষ্ট করিয়া দিতে পারে।

গৃহে ফিরিয়া চঞ্চরী বোরকা খুলিবার জন্য ঘরে প্রবেশ করিলে ময়ূর চুপিচুপি শিলা-বতীকে জিজ্ঞাসা করিল—'যে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে কথা বলছিলেন সে কে?'

শিলাবতী মুখ টিপিয়া হাসিলেন—'কবুতর বিবি।'

রাত্রির আহারের পর চঞ্চরী ঘুমাইয়া পড়িলে শিলাবতী নিঃশব্দে ময়ূরের ঘরে আসিলেন, বলিলেন—'ময়ূর ভাই, আমি আবার বেরুব, কবুতর বিবির সঙ্গে দেখা করতে হবে। আজ তুমি যেখানে খেলা দেখিয়েছিলে সেখানে সে আসবে।'

ময়ূর বলিল—'যাওয়া প্রয়োজন?'

শিলাবতী বলিলেন—'নিতান্ত প্রয়োজন!'

ময়ূর উদ্বিগ্ন স্বরে বলিল—'কিন্তু আপনি একা যাবেন, চলুন, আমি সঙ্গে যাই।'

শিলাবতী বলিলেন—'না, চঞ্চরীকে একা রেখে যাওয়া নিরাপদ নয়। তুমি চিন্তা করো না, চাঁদের আলো আছে, আমি পথ চিনে যেতে পারব।'

শিলাবতী কৃষ্ণ বস্ত্রে অঙ্গ ঢাকিয়া চলিয়া গেলেন। কবুতর বিবি হারেমের পুরাতন দাসী, যখন ইচ্ছা অন্দরে-বাহিরে যাতায়াত করে, কেহ তাহাকে বাধা দেয় না। শিলাবতী নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া দেখিলেন এক দেবদারু বৃক্ষের ছায়ায় কবুতর বিবি অপেক্ষা করিতেছে।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরে শিলাবতী ফিরিলেন। ময়ূর ধনুর্বাণ লইয়া দালানে বসিয়া ছিল; হ্রস্বস্বরে দুইজনের কথা হইল। তারপর উভয়ে আশঙ্কিত মনে নিজ নিজ কক্ষে

শয়ন করিতে গেলেন।

তিন

পরদিন সকালে ময়ূর খেলা দেখাইতে বাহির হইল না। বিকালে সাজসজ্জা করিয়া চঞ্চরী ও শিলাবতীকে লইয়া রাজপ্রাসাদের অভিমুখে চলিল। চঞ্চরীর দেহ বোরকায় ঢাকা, শিলাবতীর মাথায় ফলের ঝুড়ি।

প্রাসাদের পশ্চাদ্ভাগে হারেম, প্রাকারবেষ্টিত মহলের কোলে প্রশস্ত অঙ্গন। অঙ্গনের দ্বারে কয়েকজন রক্ষী দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের কোমরে তরবারি, হাতে বল্লম। ময়ূরকে দেখিয়া একজন রক্ষী চিনিতে পারিল, সে পূর্বে ময়ূরের খেলা দেখিয়াছে। ময়ূর অগ্রবর্তী হইয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল এবং নত হইয়া সেলাম করিল। সর্দার-রক্ষী বলিল—'কি চাও?'

ময়ূর সবিনয়ে বলিল—'যদি অনুমতি হয়, বেগম সাহেবাদের তীর-ধনুকের খেলা দেখাব।'

রক্ষীরা মুখ তাকাতাকি করিল, তারপর নিম্ন স্বরে পরামর্শ করিতে লাগিল। তীর-ধনুকের খেলা দেখিবার ঔৎসুক্য তাহাদের নিজেদেরই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এই বাজিকরকে অঙ্গনে আসিতে দেওয়া উচিত হইবে কি না এই লইয়া তাহাদের মধ্যে তর্ক উঠিল। শেষে সর্দার-রক্ষী ময়ূরকে বলিল—'ভিতরে আসার হুকুম নেই, তুমি ফটকের সামনে খেলা দেখাও।'

ময়ূর মনে মনে একটু নিরাশ হইল, কিন্তু দ্বিরুক্তি না করিয়া ধনুকে গুণ পরাইতে প্রবৃত্ত হইল।

এই সময় এক অতি সুন্দরকান্তি যুবাপুরুষ রক্ষিদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রক্ষীরা সসম্ভ্রমে তসলিম্ করিল, একজন অস্ফুট স্বরে বলিল—'হজরৎ মালিক কাফুর।'

মালিক কাফুরকে আলাউদ্দিন বহু বর্ষ পূর্বে খোজা ক্রীতদাসরূপে ক্রয় করিয়াছিলেন; এক হাজার স্বর্ণদীনার দিয়া ক্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে কাফুরকে হাজার-দীনারী খোজা বলিত। তারপর যুদ্ধে রণপাণ্ডিত্য দেখাইয়া তিনি সুলতানের প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন; আলাউদ্দিনের শেষ বয়সে কাফুর তাঁহার দক্ষিণহস্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বর্তমানে তাঁহার বয়স চল্লিশের ঊর্ধ্বে, কিন্তু দেখিলে যুবক বলিয়া মনে হয়।

ময়ূরও মালিক কাফুরকে তস্‌লিম্ করিল, তারপর খেলা দেখাইতে আরম্ভ করিল। প্রথমে সে শূন্যে তীর ছুড়িয়া দ্বিতীয় তীর দিয়া প্রথম তীর ফিরাইয়া আনিল। মালিক কাফুর খেলা দেখিয়া বলিলেন—'এই খেলা আবার দেখাও।'

ময়ূর আবার খেলা দেখাইল। কাফুর তখন সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—'তোমরা অঙ্গনে এস, বেগম সাহেবারা খেলা দেখবেন।'

তখন চঞ্চরী ও শিলাবতীকে সঙ্গে লইয়া ময়ূর হারেমের প্রাঙ্গণে গিয়া দাঁড়াইল। মালিক কাফুর অন্দরমহলে প্রবেশ করিলেন। তিনি খোজা, অন্দরে তাঁহার অবাধ গতিবিধি।

ময়ূর দ্বিতীয় খেলা দেখাইল, চঞ্চরীকে বিশ হাত দূরে দাঁড় করাইয়া তাহার মাথায় ডালিম রাখিয়া তীর দিয়া ডালিম বিদ্ধ করিল। এই সময় হারেমের দ্বিতলের অলিন্দে বাতায়নে সূক্ষ্ম মলমলে ঢাকা রমণীমুখের আবির্ভাব হইতে লাগিল। অন্তরীক্ষে রূপের হাট বসিয়া গেল; নির্মেঘ আকাশে বিদ্যুৎ-বিলাস।

দ্বিতীয় খেলা শেষ করিয়া ময়ূর গুপ্ত কটাক্ষে দেখিল, একটি গবাক্ষে দুইজন পুরুষ দাঁড়াইয়াছে—একজন মালিক কাফুর, অন্যজন নিশ্চয় সুলতান আলাউদ্দিন। গবাক্ষপথে তাঁহাকে আবক্ষ দেখা যাইতেছে; বৃদ্ধ ছাগের মত একটা মুখ, কিন্তু চক্ষে লালসার ধূমকলুষিত অগ্নি।

এইবার সময় উপস্থিত। ময়ূর শিলাবতীকে ইঙ্গিত করিল, শিলাবতী চঞ্চরীর বোরকা খুলিয়া লইলেন। চঞ্চরীর দেহে সূক্ষ্ম মলমলের বস্ত্র, সে রূপের পসরা উদ্ঘাটিত করিয়া দাঁড়াইল। দর্শকেরা নিশ্বাস ফেলিতে ভুলিয়া গেল।

ময়ূর নির্লিপ্ত মুখে আরও দুই-একটা খেলা দেখাইল। শিলাবতী ঝুড়ি হইতে তিনটি ডালিম লইয়া সে চঞ্চরীর মাথায় ও দুই হাতে রাখিল, তারপর তাহাকে হারেমের দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড় করাইল। চঞ্চরী দুই হাত স্কন্ধের দুই পাশে রাখিয়া দাঁড়াইল। ময়ূর তাহার পিছনে বিশ হাত দূরে গিয়া ধনুতে তিনটি শর একসঙ্গে যোজনা করিল। একসঙ্গে তিনটি শরই ছুটিয়া গেল, তিনটি ডালিম একসঙ্গে তীরবিদ্ধ হইয়া মাটিতে পড়িল।

দ্বিতলের অলিন্দ বাতায়ন হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার বৃষ্টি হইল। ময়ূর সেলাম করিতে করিতে মুদ্রাগুলি কুড়াইতেছে এমন সময় মালিক কাফুর নামিয়া আসিলেন। ময়ূরের পানে অবহেলাভরে কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন—'এই বিবিকে সুলতান দেখতে চান। তুমি অপেক্ষা কর।' চঞ্চরীর হাত ধরিয়া কাফুর হারেমে লইয়া চলিলেন। চঞ্চরী আপত্তি করিল না, কাফুরের সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া তাহার অধরে হাসির বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতে লাগিল।

ময়ূর যেন হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছে এমনিভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর শিলাবতীর পাশে গিয়া বসিল। শিলাবতীর মুখ অর্ধাবগুণ্ঠিত, তিনি খর্বকণ্ঠে বলিলেন—'ওষুধ ধরেছে।'

ময়ূর জিজ্ঞাসা করিল—'ওই বৃদ্ধই আলাউদ্দিন?'

শিলাবতী বলিলেন—'হাঁ।'

ময়ূর আর-একবার আলাউদ্দিনের দিকে তাকাইল। ইচ্ছা করিলেই সে আলাউদ্দিনকে হত্যা করিতে পারে, বিদ্যুদ্বেগে তীর-ধনুক লইয়া লক্ষ্যবেধ করা, কেবল একটি টঙ্কার শব্দ। আলাউদ্দিন নড়িবার সময় পাইবে না—

খেলা শেষ হইয়াছে দেখিয়া বাতায়ন হইতে সুন্দর মুখগুলি অপসৃত হইল, রক্ষীরা স্বস্থানে ফিরিয়া গেল। দ্বারের বাহিরে রাস্তার উপর কিছু নাগরিক তামাসা দেখিবার জন্য জমা হইয়াছিল, তাহারা অধিকাংশ ইতস্তত ছড়াইয়া পড়িল; দুই-চারি জন নিষ্কর্মা লোক আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

শিলাবতী বলিলেন—'তুমি থাকো, আমি ফিরে যাই। আজ রাত্রে কবুতর বিবির সঙ্গে আবার দেখা করতে হবে।' ফলের ঝুড়ি মাথায় লইয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

ময়ূর আরও কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিবার পর মালিক কাফুর ফিরিয়া আসিলেন, ময়ূরের হাতে এক মুঠি মোহর দিয়া সদয় কণ্ঠে বলিলেন—'এই নাও তোমার বক্‌শিস্। বিবির জন্যে ভেবো না, সে সুলতানের কাছে সুখে থাকবে।'

মালিক কাফুর চলিয়া গেলেন। ময়ূর মোহরগুলির পানে তাকাইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর সেগুলি কোমরে রাখিয়া ধনুর্বাণ হাতে নতমুখে হারেমের দেউড়ি পার হইয়া গেল।

সে পথে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছে, পিছন হইতে কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল—'কী দোস্ত। বলেছিলাম কিনা, দিল্লীতে বৌ চুরি যায়।' মামুদ পিছন হইতে আসিয়া তাহার

সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল, সহানুভূতিসিক্ত কণ্ঠে বলিল—'দুঃখ কোরো না, যা বক্‌শিস্ পেয়েছ তাতে চারটে বিবি কিনতে পারবে। এখন চল শরাবখানায়, দু' পেয়ালা টানলেই মেজাজ দুরস্ত হয়ে যাবে।'

ময়ূরের একবার ইচ্ছা হইল চঞ্চরীর দেহের মূল্য মোহরগুলো মামুদের হাতে দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দেয়। সে তো এইজন্যই পিছনে লাগিয়া আছে। কিন্তু তাহা করিলে দুর্জনকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ময়ূর রুখিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'আমার মেজাজ ভাল নেই। বিরক্ত কোরো না, বিপদে পড়বে।'

মামুদ অমনি পিছাইয়া গেল। সে অত্যন্ত ভীরু, ময়ূরের মত তীরন্দাজকে বেশী ঘাঁটাইতে সাহস করে না। কিন্তু সে ময়ূরের হাতে সোনা দেখিয়াছে, সহজে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়াও মামুদের পক্ষে অসম্ভব।

রাত্রে আহারাদি সমাপ্ত হইলে শিলাবতী বলিলেন—'অর্ধেক কাজ শেষ হয়েছে, এখনো অর্ধেক কাজ বাকি।'

ময়ূর প্রশ্ন করিল—'কবুতর বিবি পায়রা ধরতে পারবে তো?'

'প্রাসাদের ছাদে পায়রার খোপ, রাত্রে সহজেই ধরা যাবে।'

রাত্রি গভীর হইলে শিলাবতী বাহির হইলেন। আজ আর ময়ূরের গৃহে থাকিয়া পাহারা দিবার প্রয়োজন নাই, সেও তীরধনুক লইয়া শিলাবতীর সঙ্গে চলিল। চঞ্চরীর কথা ভাবিয়া তাহার একটা নিশ্বাস পড়িল। চঞ্চরীর ভাগ্যে কি আছে কে জানে। তাহার বুদ্ধি বেশী নাই, হয়তো বেশী দুঃখ পাইবে না।

পথ জনহীন, আকাশে আধখানা চাঁদ। দুইজনে পথ চলিতে চলিতে অনুভব করিলেন, কেহ দূরে থাকিয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছে। ময়ূরের মুখে ক্রোধের ভ্রূকুটি দেখা দিল, সে চাপা গলায় বলিল—'হতভাগা মামুদ।'

শিলাবতী বলিলেন—'ও যদি জানতে পারে হারেমের দাসীর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে, কবুতর বিবি বিপদে পড়তে পারে।'

ময়ূর বলিল—'আমি ব্যবস্থা করছি।'

সে পিছন ফিরিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না; কিন্তু নিস্তব্ধ বাতাসে সন্তর্পণ পদশব্দ শুনিতে পাইল। তখন সে শিলাবতীর হাত ধরিয়া টানিয়া একটি গৃহের ছায়াতলে লুকাইল। চাঁদের আলোয় ছায়া বড় গাঢ় হয়; ময়ূর ধনুকে শরসংযোগ করিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে দূরে একটি মানুষ আসিতেছে দেখা গেল। আরও কাছে আসিলে ময়ূর দেখিল মামুদই বটে। তখন সে আকর্ণ ধনু টানিয়া শর নিক্ষেপ করিল।

মরণাহত কুক্কুরের মত একটা বিকট চীৎকার। মামুদ রাস্তায় পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিল।

শিলাবতী বলিলেন—'মরে গেল নাকি?'

ময়ূর বলিল—'না, উরুতে মেরেছি। ওকে সত্যসত্যই খোঁড়া করে দিলাম। কিন্তু এখানে আর নয়, হয়তো লোকজন এসে পড়বে।'

কিন্তু দিল্লীর অধিবাসীরা বুদ্ধিমান, দ্বিপ্রহর রাত্রে অতিবড় বিকট শব্দ শুনিলেও ঘরের বাহির হয় না। ময়ূর ও শিলাবতী মামুদের বিলীয়মান কাতরোক্তি শুনিতে শুনিতে চলিলেন। দেবদারু বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন কবুতর বিবি হইয়া আছে।

চুপিচুপি কথা হইল। কবুতর বিবি কোঁচড় হইতে একটি ধূম্রবর্ণ কপোত বাহির করিয়া দিল। একটু পাখার ঝটপট শব্দ, শিলাবতী কপোতটিকে নিজ বস্ত্রমধ্যে লুকাইলেন। ময়ূর মালিক কাফুরের নিকট যত স্বর্ণমুদ্রা পাইয়াছিল সমস্ত কবুতর বিবির হাতে দিল। শিলাবতী কবুতর বিবির গণ্ডে চুম্বন করিলেন, উভয়ের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল। তারপর কবুতর বিবি ছায়ার মত হারেমের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বৃক্ষচ্ছায়াতলে দাঁড়াইয়া ময়ূর বলিল—'আর বাসায় ফিরে গিয়ে কাজ নেই। চলুন, নগরের দক্ষিণ দরজার কাছে লুকিয়ে থাকি, দরজা খুললে বেরিয়ে যাব। দিল্লীতে আমাদের কাজ শেষ হয়েছে।'

পরদিন পান্থশালায় ফিরিয়া গিয়া ময়ূর আরও সাতদিন সেখানে রহিল; তারপর কপোতের পায়ে জতুনিবদ্ধ পত্র বাঁধিয়া কপোতকে উড়াইয়া দিল। অভ্রান্ত কপোত একবার চক্রাকারে ঘুরিয়া দিল্লীর দিকে উড়িয়া চলিল। ময়ূর মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইল, কপোত রাজপ্রাসাদের চূড়ায় গিয়া বসিয়াছে, কোনও পরিচারিকা তাহার পায়ে পত্র বাঁধা আছে দেখিয়া সুলতানকে খবর দিল। তারপর সুলতান আলাউদ্দিন সেই পত্র পড়িলেন।

দুরাচারীর পাপজর্জরিত জীবনের চরম পরিণাম।

ইহার পর আলাউদ্দিন বিকৃত মস্তিষ্ক ও ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া তিন বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। ইহাই ইতিহাসের সাক্ষ্য।

চার

চৈত্র মাসের শেষে একদা রাত্রিকালে রাজা ভূপ সিংহ প্রাসাদের ছাদে উঠিয়া একাকী পাদচারণ করিতেছিলেন। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি চন্দ্রহীন; পঞ্চমী তিথির চাঁদ বিলম্বে উঠিবে। নক্ষত্র-বিকীর্ণ স্বল্পান্ধকারে পরিক্রমণ করিতে করিতে রাজা চিন্তা করিতেছিলেন।

মাত্র কয়েক মাস পূর্বে চঞ্চরীকে লইয়া ময়ূর দিল্লী গিয়াছে, এখনও তাহার ফিরিবার সময় হয় নাই। কিন্তু সকলের মনেই উদ্বেগপূর্ণ প্রতীক্ষা, সকলেই যেন অন্যমনস্ক। রাজসংসারের ভৃত্যপরিজন নিঃশব্দে কাজ করিয়া যায়, কাহারও মুখে হাসি নাই। সীমন্তিনীর মুখে শীর্ণ কঠিনতা; রাজকুমারী সোমশুক্লা দিন দিন যেন শুকাইয়া যাইতেছেন। রাজা মনে মনে ভাবিতেছেন—এই তাঁহার শেষ চেষ্টা, এ চেষ্টা যদি নিষ্ফল হয়, আর কিছু করিবার নাই। ময়ূর কি পারিবে? যদি না পারে—

সম্প্রতি রাজার মনে একটু নির্বেদের ভাব আসিয়াছে। প্রতিহিংসা কি এতই বড়! যদি তাঁহার প্রতিহিংসা চরিতার্থ না হয় তাহাতেই বা কি? সূর্য-চন্দ্রের গতি রুদ্ধ হইবে না। তিনি একদিন মরিবেন, মহাপাপী আলাউদ্দিনও মরিবে; তখন প্রতিহিংসা কোথায় থাকিবে? জীবন অনিত্য, হিংসাদ্বেষ অনিত্য; মৃত্যুই পরম অবসান।

পূর্বাকাশে পীতাভ খণ্ডচন্দ্র উদয় হইল। রাজপুরী সুপ্ত, নগর সুপ্ত, পৃথিবীও সুপ্ত। এই সুপ্ত পৃথিবীর শিয়রে মহাপ্রকৃতি যেন দীপ জ্বালিয়া দিয়াছে। এই পরম মুহূর্তেও কি মানুষের মনে হিংসাদ্বেষ আছে! হায়, সংসারে যদি হিংসাদ্বেষ না থাকিত!

ময়ূর কি ফিরিয়া আসিবে? তাহার প্রতি ভূপ সিংহের স্নেহ জন্মিয়াছিল, বিশ্বাস জন্মিয়াছিল; সে যদি ফিরিয়া না আসে, যদি রামরুদ্রের মত সেও ঘাতকের হস্তে হত হয়—

নিস্তব্ধ বাতাসে অশ্বের ক্ষীণ হ্রেষাধ্বনি শুনিয়া রাজা সেই দিকে চক্ষু ফিরাইলেন। রাজপুরীর সম্মুখ পথ দিয়া একদল লোক আসিতেছে। রাজার চোখের দৃষ্টি এখনও তীক্ষ্ন আছে, তিনি দেখিলেন যাহারা আসিতেছে তাহাদের মধ্যে একটি দোলা এবং এক-

জন অশ্বারোহী রহিয়াছে। রাজা রুদ্ধশ্বাসে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর দ্রুত ছাদ হইতে নামিতে লাগিলেন। নিশ্চয় ময়ূর ফিরিয়াছে। কিন্তু সঙ্গে দোলা কেন? তবে কি চণ্ডরীকে ফিরাইয়া আনিয়াছে!

দ্বিতলে অবতরণ করিলে কুমারী সোমশুক্লা পিছন হইতে চকিতস্বরে ডাকিলেন —'পিতা?' কিন্তু রাজা শুনিতে পাইলেন না।

ময়ূর প্রাসাদ সম্মুখে অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। রাজা একাকী দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহার পদপ্রান্তে নতজানু হইয়া বলিল—'আর্য, আমি ফিরে এসেছি। কার্যসিদ্ধি হয়েছে।'

কার্যসিদ্ধির কথা রাজার কানে পৌঁছিল কিনা সন্দেহ; তিনি কম্পিত স্বরে বলিলেন —'দোলায় কে?'

ময়ূর বলিল—'একটি স্ত্রীলোক আপনার দর্শন চায়, তাকে সঙ্গে এনেছি। মহারাজ, আপনি নিজ কক্ষে গিয়ে বসুন, আমি এখনি দর্শনপ্রার্থিনীকে নিয়ে আসছি।'

রাজা কক্ষে গিয়া স্বয়ং দীপ জ্বালিলেন, তারপর ভূমিতলে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার দেহমনের সমস্ত শক্তি যেন ফুরাইয়া গিয়াছে, স্নায়ুমণ্ডল আলোড়িত হইতেছে। ময়ূর কাহাকে সঙ্গে আনিয়াছে? কে তাঁহার দর্শনপ্রার্থিনী?

ময়ূর দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, সঙ্গে কৃষ্ণাননা একটি স্ত্রীলোক। দ্বারের কাছে ক্ষণকাল ন যযৌ ন তস্থৌ থাকিয়া স্ত্রীলোকটি ছুটিয়া আসিয়া রাজার পদপ্রান্তে পড়িল, অবরুদ্ধস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—'পিতা, আমাকে কি গৃহে স্থান দেবেন? আমি দাসী হয়ে থাকব, আমার পরিচয় কেউ জানবে না—'

রাজা পক্ষাঘাতগ্রস্তের ন্যায় ক্ষণেক নিশ্চল রহিলেন, তারপর উন্মত্তবৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—'শিলা! শিলা!'

ময়ূর দ্বারের কাছে প্রহরীর ন্যায় ঋজুদেহে দাঁড়াইয়া রহিল। শিলাবতী প্রথমে ময়ূরের সঙ্গে পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিতে চাহেন নাই, বলিয়াছিলেন—'আমি ভ্রষ্টা ধর্মচ্যুতা, আমাকে গৃহে স্থান দিলে পিতার কলঙ্ক হবে। তিনি যদি আমাকে গ্রহণ না করেন?' ময়ূর বলিয়াছিল—'যদি গ্রহণ না করেন আমরা দুই ভাই-বোন অন্য কোথাও চলে যাব। বিস্তীর্ণা পৃথিবীতে কি দু'টি মানুষের স্থান হবে না?' তখন শিলাবতী সম্মত হইয়াছিলেন।

ময়ূর চাহিয়া দেখিল, রাজার বাহ্যজ্ঞান নাই, তিনি কন্যাকে শিশুর মত আদর করিতেছেন—'মা আমার! মা আমার! কন্যা! কন্যা! কন্যা!'

ময়ূর একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। এই হৃদয়াবেগ হইতে দূরে সরিয়া যাওয়াই ভাল। সে দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে, আবার ইতস্তত করিতেছে, এমন সময় কেহ তাহার হস্ত স্পর্শ করিল। ময়ূর ফিরিয়া দেখিল, সোমশুক্লা!

সোমশুক্লার মুখ ঈষৎ কৃশ, চোখের কোলে ছায়া, কিন্তু তাঁহার হাসি দেখিয়া ময়ূরের মনে হইল ইহার অধিক পুরস্কার বুঝি পৃথিবীতে আর নাই। সে কুমারীর হাত ধরিয়া উদ্যানে লইয়া গেল।

চাঁদ আর একটু উপরে উঠিয়াছে, আর একটু উজ্জ্বল হইয়াছে। চন্দ্রালোকে দুই-জনে পরস্পরের মুখ দেখিলেন, তারপর সোমশুক্লা ভঙ্গুর কণ্ঠে বলিলেন—'ভাল ছিলে?'

এই কয়েক মাসের অদর্শন যেন তাঁহাদের মনের ব্যবধান সরাইয়া দিয়াছে, প্রকৃত সম্বন্ধ জানাইয়া দিয়াছে। ময়ূর বলিল—'তোমার শঙ্খ আমার সমস্ত বিঘ্ন দূর করেছে, অতি সহজে কার্যসিদ্ধি হয়েছে। এবার তোমার শঙ্খ তুমি ফিরিয়ে নাও।'

ময়ূর বক্ষ হইতে শঙ্খ লইয়া শুক্লার সম্মুখে ধরিল। শুক্লা হস্ত প্রসারিত করিয়া

বলিলেন—'তুমি পরিয়ে দাও।'

তারপর কতক্ষণ কাটিয়া গেল কেহ জানিল না। একটি বৃক্ষশাখায় একদল পাখি সমস্বরে কলকূজন করিয়া আবার নীরব হইল। রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে।

ময়ূর বলিল—'আমি যাই।'

শুক্লা জিজ্ঞাসা করিলেন—'কোথায় যাবে?'

ময়ূর বলিল—'রাজার কাছে। তিনি বলেছিলেন যদি কার্যসিদ্ধি হয়, আমাকে অদেয় তাঁর কিছুই থাকবে না। তাই পুরস্কার চাইতে যাচ্ছি।'

রাজা আপন কক্ষে ঋজু দেহে বসিয়া ছিলেন। তাঁহার মুখ প্রফুল্ল, মনে হয় দশ বছর বয়স কমিয়া গিয়াছে। ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র শান্ত হইয়াছে। ময়ূর প্রবেশ করিতেই তিনি অধরে অঙ্গুলি রাখিয়া ইঙ্গিত করিলেন, পাশের দীপহীন কক্ষে ভূমিশয্যায় পড়িয়া শিলাবতী ঘুমাইতেছেন, যেন সতেরো বছরের পুঞ্জীভূত গ্লানি নিদ্রার কোলে নামাইয়া দিয়াছেন।

রাজা চুপিচুপি বলিলেন—'শিলা ঘুমিয়ে পড়েছে। ও আমার কাছে এই রাজ-ভবনেই থাকবে। সাবধান, ওর প্রকৃত পরিচয় যেন কেউ জানতে না পারে। তুমি ওকে দিল্লী থেকে এনেছ এই ওর একমাত্র পরিচয়।'

ময়ূর বলিল—'তাই হবে আর্য। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরা।'

রাজা তখন ময়ূরের স্কন্ধে হাত রাখিয়া গভীর প্রীতিভরে বলিলেন—'বৎস, তুমি আমার পুত্রের তুল্য। তোমাকে যে কাজ দিয়েছিলাম তার শতগুণ কাজ তুমি করেছ। কি পুরস্কার চাও বল।'

ময়ূর ধীরে ধীরে বলিল—'মহারাজ, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে আমি আপনার কাছে কুমারী সোমশুক্লার পাণি প্রার্থনা করি।'

রাজা ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, শেষে বলিলেন—'সোমশুক্লা, কিন্তু—কিন্তু—'

ময়ূর বলিল—'তিনি আমার উচ্চাকাঙ্খা জানেন। তাঁর অমত নেই।'

রাজা বলিলেন—'কিন্তু—তুমি অজ্ঞাতকুলশীল। তোমার সঙ্গে শুক্লার বিবাহ দিলে সপ্তমপুরের রাজাদের কাছে তোমার কী পরিচয় দেব?'

ময়ূর নীরব রহিল। রাজা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া আকাশপাতাল ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র নাই, তাঁহার মৃত্যুর পর জামাতাই রাজ্য পাইবে। ময়ূরের মত যোগ্য উত্তরাধিকারী কোথায় পাওয়া যাইবে? কিন্তু তবু—অজ্ঞাতকুলশীল—। শীল রক্ষা করা রাজার কর্তব্য। উচ্চকুলশীল দুরাচার লম্পটের সহিত রাজকন্যার বিবাহ হইলে কেহ নিন্দা করে না—কিন্তু—

রাজা বলিলেন—'অন্য কোনো পুরস্কার চাও না?'

'না আর্য।'

রাজা গুম্ফ আকর্ষণ করিতে করিতে আবার চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

কক্ষের বাহিরে তখন প্রভাত হইয়াছে। ঘরের প্রদীপ ম্লান হইয়াছে, রাজপুরী যে জাগিয়া উঠিতেছে তাহার শব্দ আসিতেছে।

সহসা ভট্ট নাগেশ্বর দ্বারের কাছে আবির্ভূত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—'হা হতোস্মি। একি বয়স্য, রাত্রে কি নিদ্রা যাননি?' বলিয়াই ময়ূরকে দেখিয়া থামিয়া গেলেন। পাশের ঘরে সুপ্তা শিলাবতীকে তিনি দেখিতে পাইলেন না।

রাজা যেন অকূলে কূল পাইলেন, হাত বাড়াইয়া বলিলেন—'এস বয়স্য।—ময়ূর, যাও বৎস, তুমি নাগেশ্বরের গৃহে গিয়ে বিশ্রাম কর। সন্ধ্যার পর এস।'

ময়ূর প্রস্থান করিলে রাজা গাত্রোত্থান করিয়া ভট্ট নাগেশ্বরকে বলিলেন—'চল বয়স্য, ছাদে যাওয়া যাক, তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে। তুমি অবশ্য ঘোর মূর্খ, তোমার পরামর্শের কোনো মূল্য নেই, কিন্তু মূর্খের মুখ থেকেও কদাচ জ্ঞানের কথা বাহির হতে পারে।' বলিয়া তিনি উচ্চহাস্য করিলেন।

দুই দিন পরে ভূপ সিংহ সাজসজ্জা করিয়া বিদেশ যাত্রা করিলেন। তাঁহার গন্তব্য-স্থান সপ্তমপুর।

বয়স্যকে লইয়া রাজা চতুর্দোলায় উঠিলেন। সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে ময়ূর ও দশজন রক্ষী।

সপ্তমপুরের অপুত্রক রাজা সূর্যবর্মা বন্ধুকে পাইয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। ভূপ সিংহ তাঁহার আলিঙ্গনমুক্ত হইয়া বলিলেন—'ভাই, আমার কন্যা সোমশুক্লার সঙ্গে একটি যুবকের বিবাহ স্থির করেছি। যুবকটি অতি সৎপাত্র, কিন্তু নামগোত্রহীন; তুমি তাকে দত্তক নেবে এই প্রস্তাব নিয়ে তোমার কাছে এসেছি। চল, অন্তরালে তোমাকে সব কথা বলি।'—

দু'মাস পরে সপ্তমপুরের যুবরাজ ময়ূরবর্মার সহিত পঞ্চমপুরের রাজকন্যা সোমশুক্লার বিবাহ হইল।

রেবা রোধসি

শেষ পর্যন্ত রাজপুত্র তূণীরবর্মাকে রাজ্য হইতে নির্বাসন দিতে হইল। রাজা শিববর্মা তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ ইন্দ্রবর্মাকে ডাকিয়া বলিলেন—'তূণীর যে অপরাধ করেছে তাতে মৃত্যুই তার একমাত্র দণ্ড। কিন্তু সে আমার পুত্র, তাকে চরম দণ্ড দিতে আমার হৃদয় ব্যথিত হচ্ছে। তুমি তাকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত পেঁাছে দিয়ে এসো। তাকে বলে দিও, আমি তার মুখদর্শন করতে চাই না, সে যেন আর কখনো এ রাজ্যে পদার্পণ না করে।'

যুবরাজ ইন্দ্রবর্মা বিষণ্ণ মুখে বলিলেন—'যথা আজ্ঞা আর্য।'

ন্যূনাধিক সাত শত বছর পূর্বে নর্মদার উত্তর তীরে মহেশগড় নামে এক রাজ্য ছিল। রাজ্য আকারে বৃহৎ নয়, কিন্তু সমৃদ্ধিশালী। কয়েক বছর আগে আলাউদ্দিন খিলজি যখন দেবগিরি রাজ্য লুণ্ঠনের জন্য দাক্ষিণাত্যে গমন করেন তখন তিনি মহেশগড় রাজ্যের পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, রাজ্যে প্রবেশ করেন নাই; কিন্তু তদবধি নর্মদা অববাহিকার রাজ্যগুলিতে শঙ্কা ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি হইয়াছিল। যবন জাতি অতি কপট ও নিষ্ঠুর; তাহারা বিশ্বাসঘাতক, বন্ধুত্বের ভান করিয়া সদ্ভাব-প্রতিপন্নকে হত্যা করে। যবন সম্বন্ধে সর্বদা সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

মহেশগড় রাজ্যেও এই সন্ত্রাসের ছোঁয়াচ লাগিয়াছিল। রাজশক্তি সৈন্যদল গঠন করিয়া আততায়ীর আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু বছরের পর বছর কাটিয়া গেল, যবনেরা ফিরিয়া আসিল না। ধীরে ধীরে অলক্ষিতে সতর্কতাও শিথিল হইতে লাগিল। সৈন্যদল হ্রাস পাইল, রাজপুরুষেরা বাহিরের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া আভ্যন্তরীণ ক্ষুদ্র কূটনৈতিক খেলায় মনোনিবেশ করিলেন।

ভারতের ইতিহাসে এইরূপ ঘটনা বারংবার ঘটিয়াছে। শত্রু চোখের আড়াল হইলেই মনের আড়াল হইয়া যায়। আবার যখন শত্রু আচম্বিতে ফিরিয়া আসে তখন তাহা অপ্রত্যাশিত উৎপাত বলিয়া মনে হয়। আমরা অতীতকে বড় সহজে ভুলিয়া যাই, তাই বোধহয় আমাদের ইতিহাসের প্রতি আসক্তি নাই।

মহেশগড়ের রাজা শিববর্মার বয়স হইয়াছে। সেকালে রাজাদের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল, যিনি যতগুলি রাজকন্যা ঘরে আনিলেন তাঁহার মর্যাদা তত বেশী। শিববর্মার সাতটি মহিষী, পুত্রসংখ্যা ত্রিশের ঊর্ধ্বে। তন্মধ্যে কেবল জ্যেষ্ঠপুত্র সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, অন্য রাজকুমারদের কোনও কর্ম নাই। তাঁহারা আহার বিহার মৃগয়া এবং প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিয়া জীবনযাপন করেন। পুরুষানুক্রমে এই উদ্বৃত্ত রাজপুত্রেরা এবং তাঁহাদের পুত্র-পৌত্রেরা রাজপুত জাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সহজাত ক্ষাত্রতেজ ছিল; তাই অদ্যাপি রাজপুত পুরুষের শৌর্যবীর্য বাহুবল ভুবনবিখ্যাত এবং রাজপুত রমণীর গতিছন্দে রাজরানীর গর্ব সুপরিস্ফুট।

তূণীরবর্মা রাজা শিববর্মার তৃতীয় মহিষীর গর্ভজাত চতুর্থ পুত্র। তিনি কোনোকালে রাজা হইবেন সে সম্ভাবনা নাই। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার স্বভাব দুরন্ত ও দুঃশীল, কেহ তাঁহাকে শাসন করিতে পারিত না। তারপর তিনি যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন তখন তাহার স্বভাব আরও প্রচণ্ড ও দুর্দমনীয় হইয়া উঠিল। তাঁহার আকৃতি যেমন সুন্দর, দেহ তেমনই বলশালী, তাঁহার প্রতিকূলতা করিতে কেহ সাহস করে না; উৎসর্গীকৃত বৃষের ন্যায় তিনি স্বচ্ছন্দচারী হইয়া উঠিলেন। ভোগব্যসনে তাঁহার রুচি রাজকবি ভর্তৃহরির পন্থা অবলম্বন করিল। জীবনে ভোগ্যবস্তু যদি কিছু থাকে তবে তাহা মৃগয়া এবং নারীর যৌবন। যৌবনং বা বনং বা।

রাজপুত্রেরা কেহই শান্তশিষ্ট মিতাচারী হন না; কিন্তু তাঁহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা মাত্রা অতিক্রম করিলে প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা যায়। তূণীরবর্মার আচার-আচরণ লইয়া রাজার নিকট নিত্য অনুযোগ অভিযোগ আসিতে লাগিল। রাজা পুত্রকে সংযত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনও ফল হইল না। অবশেষে তূণীরবর্মা এক অমার্জনীয় অপরাধ করিয়া বসিলেন; এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের তরুণী ভার্যাকে অপহরণ করিলেন।

মহাপাতকের মার্জনা নাই। রাজা পুত্রকে কারারুদ্ধ করিলেন, তারপর তাহার নির্বাসনের আদেশ দিলেন।

কারাগার হইতে তূণীরবর্মাকে মুক্ত করিয়া যুবরাজ তাঁহাকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিতে আদেশ করিলেন, স্বয়ং অন্য অশ্বে আরোহণ করিয়া নগরদ্বারের অভিমুখে

চলিলেন। আগে পিছে দুই দল ধনুর্ধর রক্ষী চলিল।

রাজপথের দুই পাশে নাগরিকের ভিড় জমিয়াছে। অধিকাংশই নীরব, ক্বচিৎ কেহ ধিক্ ধিক্ বলিয়া তিরস্কার জানাইতেছে। তুণীরবর্মার মুখে কখনও হিংস্র ভ্রূকুটি, কখনও খরশান ব্যঙ্গহাস্য। তিনি পাশে মুখ ফিরাইয়া যুবরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন— 'আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ—বধ্যভূমিতে?'

ইন্দ্রবর্মা ধীর স্বরে বলিলেন—'না। মহারাজ তোমাকে নির্বাসন দণ্ড দিয়েছেন।'

তুণীরবর্মার অধর বিদ্রূপে বঙ্কিম হইয়া উঠিল, তিনি বিকৃত হাস্য করিয়া বলিলেন— 'অসীম করুণা মহারাজের। তোমার যদি অধিকার থাকত তুমি বোধহয় আমার প্রাণদণ্ড দিতে।'

ইন্দ্রবর্মা ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলিলেন, উত্তর দিলেন না।

নগর হইতে রাজ্যের সীমান্ত বহু দূরে। নগর ছাড়াইয়া তাঁহারা নর্মদার তীর ধরিয়া পূর্বমুখে চলিলেন। বেলা তৃতীয় প্রহরে রাজ্যের সীমান্তস্তম্ভ দেখা গেল। সীমান্ত-স্তম্ভের নিকট আসিয়া ইন্দ্রবর্মা অশ্ব স্থগিত করিলেন, একটি কোষবন্ধ তরবারি তুণীরবর্মার হাতে দিলেন, স্নেহার্দ্র স্বরে বলিলেন—'ভাই, এই অশ্ব এবং এই তরবারি মাত্র এখন তোমার সম্পত্তি। রাজার আদেশে তুমি নির্বাসিত হয়েছ; কিন্তু তুমি ক্ষত্রিয়, তোমার ভুজবলই তোমার ভাগ্য। যাও, আর কখনো এ রাজ্যে ফিরে এসো না। কিন্তু মাঝে মাঝে মাতৃভূমিকে স্মরণ কোরো।'

তুণীরবর্মা তীব্রতিক্ত ব্যঙ্গহাস্য করিয়া বলিলেন—'মাতৃভূমি! মহেশগড় আমার মাতৃভূমি নয়, বিমাতৃভূমি। এখানে সবাই আমার শত্রু। যদি কোনো দিন ফিরে আসি, একা ফিরব না, এই তরবারি হাতে নিয়ে ফিরে আসব।'

ইন্দ্রবর্মা জানিতেন ইহা ক্রোধের আস্ফালন মাত্র, তিনি দুর্মদ সাহসী ও হঠকারী, কিন্তু সৈন্যদল গঠন করিয়া তাহার নেতৃত্ব করা তুণীরবর্মার সাধ্যাতীত। ইন্দ্রবর্মা শান্ত ভর্ৎসনার কণ্ঠে বলিলেন—'ছিঃ তুণীর ভাই, তুমি রাজপুত্র, নিজের বংশে কলঙ্কারোপ কোরো না।'

তুণীরবর্মা চীৎকার করিয়া উঠিলেন—'আমার বংশ নাই, মাতৃভূমি নাই। পৃথিবীতে আমি একা।' বলিয়া তিনি ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া পূর্বদিকে ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন।

সে-রাত্রি তুণীরবর্মা নর্মদাতীরের এক বৃক্ষতলে কাটাইলেন, পরদিন আবার পূর্ব-মুখে চলিলেন। নর্মদার তীর কখনও সমতল, কখনও শৈলবন্ধুর। কদাচিৎ দুই-একটি আরণ্যক জাতির গ্রাম। গ্রাম হইতে খাদ্য মিলিল।

দ্বিতীয় দিন সূর্যাস্তের প্রাক্কালে তুণীরবর্মা একটি গ্রামের নিকটবর্তী হইলেন; দেখিলেন, নদীসৈকতে কয়েকটি আটবিক জাতীয়া যুবতী গান গাহিয়া গাহিয়া নৃত্য করিতেছে। তাহাদের নিরাবরণ বক্ষে বনজ ফুলের মালা, কেশকুণ্ডলিতে শিখিচূড়া।

তুণীরবর্মা অশ্ব দাঁড় করাইয়া দেখিতে লাগিলেন, তারপর অশ্ব হইতে নামিয়া যুবতীদের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলেন। যুবতীরা ভয় পাইল না, খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

একটি যুবতী হাসিল না, কাছে আসিয়া তুণীরবর্মাকে প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিতে লাগিল। তারপর নিজের গলার মালা খুলিয়া তাঁহার গলায় পরাইয়া দিল।

অন্য যুবতীরা কলহাস্য করিতে করিতে ছুটিয়া গ্রামের দিকে চলিয়া গেল।

তুণীরবর্মা যুবতীকে হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া লইলেন, স্মিতহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার নাম কি?'

যুবতী স্নিগ্ধ চক্ষু দুটি তাঁহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিল—'রেবা।'

কিছুক্ষণ পরে একদল আটবিক পুরুষ ভল্ল লইয়া উপস্থিত হইল, তূণীরবর্মাকে নিরীক্ষণ করিয়া যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিল—'এ কে?'

যুবতী বলিল—'ওর গলায় আমি মালা দিয়েছি, ও আমার পুরুষ।'

পুরুষেরা তখন তূণীরবর্মাকে প্রশ্ন করিল—'তুমি কে?'

তূণীরবর্মা তরবারির মুষ্টিতে হাত রাখিয়া বলিলেন—'আমি রাজপুত্র।'

পুরুষদের মধ্যে যে সর্বাধিক বয়স্ক সে বলিল—'রাজপুত! এখানে এসেছ কেন?'

তূণীরবর্মা বলিলেন—'আমাকে কেউ ভালবাসে না, তাই রাজ্য ছেড়ে এসেছি।'

পুরুষ জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি আমাদের গ্রামে থাকবে?'

তূণীরবর্মা বলিলেন—'থাকব।'

গ্রামের একান্তে নর্মদার তীরে কুটির বাঁধিয়া তূণীরবর্মা রহিলেন। রেবা এই নূতন ঘরের ঘরনী।

রেবার শ্যামল দেহটি যেমন পরম কমনীয়, তাহার মনও তেমনি শান্ত-স্নিগ্ধ প্রসন্ন। তূণীরবর্মা এমন রমণী পূর্বে দেখেন নাই; নাগরিকা রমণীদের অন্তরে ক্ষুধা অধিক, তৃপ্তি কম। তূণীরবর্মা রেবাকে লইয়া সুখের সলিলে নিমজ্জিত হইলেন।

আটবিকদের জীবনে অধিক বৈচিত্র্য নাই; তাহারা অল্প চাষবাস করে, নদীতে মাছ ধরে, ধনুর্বাণ লইয়া বনে শিকার করে। মহুয়া এবং বনমধু হইতে আসব প্রস্তুত করিয়া তাহারা পান করে, নেশায় মত্ত হইয়া নৃত্যগীতে মাতামাতি করিতে করিতে কে কাহার স্ত্রী, কে কাহার পুরুষ ভুলিয়া যায়। আদিম অনিরুদ্ধ তাহাদের জীবন, সংস্কারের বন্ধনে তাহাদের মন পঙ্গু হইয়া যায় নাই।

তূণীরবর্মার মনে চিন্তা নাই; তিনি যখন ইচ্ছা নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতার কাটেন, তাঁহার বলিষ্ঠ বাহুক্ষেপে নর্মদার জল তোলপাড় হয়। কখনও তিনি তীরে বসিয়া অলসভাবে মাছ ধরেন। কখনও বা গ্রামের যুবকদের সঙ্গে বনে গিয়া ময়ূর হরিণ বরাহ শিকার করিয়া আনেন। আটবিকদের সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছেন, তাহারাও রাজপুতকে আপন করিয়া লইয়াছে। তূণীরবর্মা উপলব্ধি করিয়াছেন যে, অন্তরে তিনি বন্য আটবিক মানুষ, এই জীবনই তাঁহার প্রকৃত জীবন; এতদিনে তিনি স্বক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছেন। নাগরিক জীবনযাত্রার জন্য তাঁহার অন্তরে বিন্দুমাত্র পিপাসা নাই।

ক্বচিৎ সূর্যাস্তকালে নর্মদাসৈকতে একাকী বসিয়া নানা জল্পনা তাঁহার মনে উদয় হয়। নদীর স্রোত পশ্চিম দিকে বহিয়া চলিয়াছে; এখন যে-জল এখানে বহিতেছে সেই জল হয়তো কাল প্রাতঃকালে মহেশগড় নগরের পাশ দিয়া বহিয়া যাইবে। মহেশগড়ের কথা স্মরণ হইলেই তাঁহার মন বিমুখ হয়। তিনি ভাবেন, মহেশগড় আমার জন্মভূমি নয়, মহেশগড়ের মানুষ আমার আপনজন নয়। এই নদীতীরস্থ ক্ষুদ্র গ্রাম তাঁহার আপন স্থান, এই বন্য অর্ধনগ্ন মানুষগুলি তাঁহার পরমাত্মীয়, রেবা নাম্নী ওই শ্যামলী মেয়েটি তাঁহার অন্তরতমা। জীবনে তিনি আর কিছু চাহেন না।

এইভাবে দিন কাটিতে থাকে। বৎসরাধিক কাল অতীত হইয়া যায়।

একদিন হেমন্তের দ্বিপ্রহরে তূণীরবর্মা রেবাকে বলিলেন—'চল রেবা, বনে শিকার করতে যাই।'

রেবা উল্লসিত হইয়া বলিল—'আমাকে নিয়ে যাবে?'

তূণীরবর্মা বলিলেন—'হ্যাঁ, আজ আর কেউ নয়, শুধু তুই আর আমি।'

'বেশ, চল!' বলিয়া রেবার মুখে একটু শঙ্কার ছায়া পড়িল—'ফিরতে যদি রাত হয়ে যায়? বনে নেকড়ে বাঘ, বুনো কুকুর আছে।'

তুণীরবর্মা বলিলেন—'যদি রাত হয়ে যায়, দু'জনে গাছের ডালে উঠে রাত কাটিয়ে দেব। আয়।'

নদীর ধারে অশ্বটি চরিতেছিল, তুণীরবর্মা তাহার মুখে রজ্জুর বল্‌গা পরাইলেন, লাফাইয়া তাহার পিঠে উঠিয়া বসিলেন, রেবাকে টানিয়া নিজের সম্মুখে বসাইয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন।

গ্রাম হইতে ক্রোশেক দূর পশ্চিমে শাল পিয়াল মধুক তিন্তিড়ির বন। বনের কিনারে ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া তুণীরবর্মা রেবার সহিত বনে প্রবেশ করিলেন। তুণীর-বর্মার হাতে ধনুর্বাণ আছে বটে, কিন্তু মৃগয়ার দিকে মন নাই। ছুটোছুটি লুকোচুরি খেলা; বালক-বালিকার কৌতুক-কৌতূহলের সহিত যুবক-যুবতীর রতিরঙ্গ মিশিয়া বনবিহার পরম রমণীয় হইয়া উঠিল। তুণীরবর্মা যখন সময় সম্বন্ধে সচেতন হইলেন তখন প্রণয়িযুগল বনের পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছিয়াছেন এবং সূর্যাস্ত হইতেও বিলম্ব নাই।

তুণীরবর্মা বলিলেন—'চল্ চল্, এখনো বেলা আছে, অন্ধকার হবার আগে বন পেরিয়ে যেতে পারব।' তিনি রেবার হাত ধরিয়া আবার বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু কয়েক পদ যাইবার পর তাঁহাদের গতিরোধ হইল। উত্তর দিক হইতে গম্ভীর শব্দ শুনিয়া তুণীরবর্মা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। দূরে যেন দুন্দুভি বাজিতেছে, তাহার সহিত শৃঙ্গনিনাদ। এ শব্দ তুণীরবর্মার অপরিচিত নয়—রণবাদ্য। তাঁহার নাসাপুট স্ফুরিত হইল, তিনি শ্যেনচক্ষু ফিরাইয়া সেই দিকে চাহিলেন।

দূরে এক সারি ভল্লের ফলক দেখা গেল; তারপর দেখা গেল অসংখ্য অশ্বারোহীর দল। তাহারা এই বনের দিকেই অগ্রসর হইতেছে।

রেবা ভীতভাবে তুণীরবর্মার হাত টানিয়া বলিল—'ওরা কারা? আমার ভয় করছে, চল্ পালিয়ে যাই।'

তুণীরবর্মা বলিলেন—'সৈন্যদল আসছে, বোধহয় এই বনে রাত্রি যাপন করবে।—কিন্তু পালাব না। দেখতে হবে ওরা কারা।' তিনি একবার চারিদিকে চক্ষু ফিরাইয়া একটি বৃহৎ পত্রবহুল শালবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন, বলিলেন—'চল্, ওই গাছে উঠে লুকিয়ে থাকি।'

দুইজনে শালবৃক্ষের উচ্চ শাখায় উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ঘন পত্রের অন্তরাল হইতে তুণীরবর্মা দেখিতে লাগিলেন, সৈন্যদল বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। বিচিত্র তাহাদের লৌহ শিরস্ত্রাণ, মুখমণ্ডল শ্মশ্রুমণ্ডিত। তিনি অস্ফুট স্বরে রেবাকে বলিলেন—'ম্লেচ্ছ সৈন্য!'

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বনভূমি তমসাচ্ছন্ন হইল। ম্লেচ্ছ সৈন্যদল বনের মধ্যে রাত্রি যাপনের আয়োজন করিতেছে। কয়েক স্থানে আগুনের চুল্লী জ্বলিয়া উঠিল। যে বৃক্ষে তুণীরবর্মা রেবাকে লইয়া লুকাইয়া ছিলেন সেই বৃক্ষতলে একদল নিম্নতন সেনানী আগুন জ্বালিয়া আহার্যদ্রব্য সিদ্ধপক্ক করিতে লাগিল। তাহাদের শূলপক্ক মাংসের পোড়া গন্ধ তুণীরবর্মার নাকে আসিতেছে। তাহারা বাক্যালাপ করিতেছে; তাহাদের ভাষা অধিকাংশ দুর্বোধ্য, তুণীরবর্মা কান পাতিয়া শুনিতে শুনিতে যাহা বুঝিলেন তাহার মর্মার্থ এই: মালিক কাফুর নামক এক সেনাপতি এই ম্লেচ্ছ বাহিনীর অধিনায়ক; তাহারা দাক্ষিণাত্যে অভিযান করিয়াছে, কিন্তু নর্মদা নদী পার হইবার পূর্বে নর্মদার

উত্তর তীরে যত হিন্দু রাজ্য আছে, সমস্ত বিধ্বস্ত করিয়া যাইবে, যাহাতে পশ্চাৎ হইতে শত্রু আক্রমণ করিতে না পারে।

রাত্রি গভীর হইল। সৈন্যদল আহারাদি সম্পন্ন করিয়া ভূমিশয্যায় ঘুমাইয়া পড়িল, আগুন নিভিয়া গেল, বন আবার নিস্তব্ধ হইল। বৃক্ষশাখায় তূণীরবর্মা বৃক্ষের কান্ডে পৃষ্ঠার্পণ করিয়া নিঃশব্দে রেবাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। রেবা যদি ঘুমের ঘোরে বৃক্ষ হইতে পড়িয়া যায় কিংবা চীৎকার করিয়া ওঠে, তবেই সর্বনাশ।

রাত্রি শেষ হইল। দুন্দুভি ও শিঙা বাজিয়া উঠিল। ম্লেচ্ছ সৈন্যদল ঘোড়ায় চড়িয়া পশ্চিমদিকে চলিয়া গেল।

তূণীরবর্মা বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন। তাঁহার মুখে নিদ্রাহীন রাত্রির ক্লান্তি-রেখা, কিন্তু আরক্ত নেত্রে চিন্তার আলোড়ন চলিতেছে। রেবা তাঁহার হাত ধরিয়া বনের ভিতর দিয়া পূর্বদিকে লইয়া চলিল। রেবার চক্ষু সতর্কভাবে চারিদিকে ফিরিতেছে, তূণীরবর্মা চিন্তায় আচ্ছন্ন। বন হইতে নির্গত হইয়া রেবা বলিয়া উঠিল—'কই, আমাদের ঘোড়া কোথায়?'

তূণীরবর্মা চকিত হইয়া চারিদিকে চাহিলেন—'ঘোড়া নেই! বনের মধ্যেও নেই?'

রেবা বলিল—'না! থাকলে দেখতে পেতাম।'

তূণীরবর্মার মুখ কঠিন হইল, তিনি বলিলেন—'ম্লেচ্ছ তস্করগুলো চুরি করে নিয়ে গেছে।'

কুটিরে ফিরিয়া তূণীরবর্মা উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিলেন। তারপর নর্মদার তীরে গিয়া বসিলেন। রেবা তাঁহার সঙ্গে আসিয়া পাশে বসিল।

নর্মদার স্রোত কলকল শব্দ করিয়া চলিয়াছে; যেদিকে তূণীরবর্মার মাতৃভূমি সেই-দিকে চলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে তূণীরবর্মার চক্ষু বাষ্পাকুল হইল, হৃদয়ে অসহ্য আবেগ উন্মথিত হইয়া উঠিল। তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া দাঁড়াইলেন, গভীর স্বরে বলিলেন—'রেবা!'

রেবা তাঁহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিতেছিল, শঙ্কিতকন্ঠে বলিল—'কি?'

তূণীরবর্মা বলিলেন—'আমি চললাম। মহেশগড়ে সংবাদ দিতে হবে, শত্রু আসছে।'

রেবা কাঁদিয়া উঠিল—'তুমি চলে যাবে!'

তূণীরবর্মা বলিলেন—'আমাকে যেতেই হবে। আমার শরীরের সমস্ত নাড়ী আমাকে টানছে, না গিয়ে উপায় নেই।'

রেবা গলদশ্রুনেত্রে চাহিয়া বলিল—'কিন্তু তুমি যাবে কি করে? তোমার ঘোড়া নেই, শত্রু অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। তুমি কি ওদের আগে পৌঁছুতে পারবে?'

'পারব।' তূণীরবর্মা নদীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন—'ওই নদী আমাকে পৌঁছে দেবে। রেবা, কেঁদো না, যদি বেঁচে থাকি, আবার আমি তোমার কাছে ফিরে আসব।'

তিনি রেবাকে একবার দৃঢ়ভাবে বুকে চাপিয়া লইলেন, তারপর তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া হাসিমুখে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

সেদিন সূর্যাস্ত কালে ম্লেচ্ছবাহিনী নর্মদার তীরে একটি অটবিতে আশ্রয় লইয়া-ছিল। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন নদীতে জল আনিতে গিয়া দেখিল, স্রোতের মাঝখান দিয়া একটা মানুষ ভাসিয়া যাইতেছে। তাহারা নিরুৎসুক চক্ষে দেখিল, গ্রাহ্য করিল না। একটা কাফের যদি ডুবিয়া মরে, মন্দ কি?

রাত্রি তৃতীয় প্রহরে মহেশগড় রাজপুরীর পশ্চাতে বাঁধানো ঘাটে একটি মানুষ জল হইতে বাহির হইয়া আসিল। চাঁদের আলোয় তাহার সিক্ত দেহ ঝিক্‌ঝিক্ করিয়া উঠিল।

ঘাটে প্রহরী নাই, রাজপ্রাসাদ দ্বার বন্ধ করিয়া ঘুমাইতেছে।

কিন্তু তূণীরবর্মা জানিতেন কী করিয়া রুদ্ধ প্রাসাদে প্রবেশ করা যায়; তিনি গুপ্ত পথে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তারপর যুবরাজ ইন্দ্রবর্মার মহলে গিয়া দ্বারে করাঘাত করিলেন—'দ্বার খোলো—দ্বার খোলো—'

ইন্দ্রবর্মা নিদ্রাকষায় নেত্রে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলেন, তূণীরবর্মাকে দেখিয়া বলিলেন—'একি! তূণীর—তুমি!'

তূণীরবর্মার দেহ এতক্ষণে অবশ হইয়া আসিতেছিল, তিনি বলিলেন—'শত্রু আসছে —ম্লেচ্ছ শত্রু মহেশগড় আক্রমণ করতে আসছে—তোমরা প্রস্তুত হও'—এই পর্যন্ত বলিয়া তিনি জ্ঞান হারাইয়া সহসা ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন।

সেবার মালিক কাফুরের সৈন্যদল মহেশগড় রাজ্য জয় করিতে পারে নাই।

দৈ বা ৎ

পরিচয়

পরিতোষবাবু—ভদ্রলোক, অবস্থাপন্ন, বিপত্নীক, নিঃসন্তান।

শৈলেন—যুবক, উচ্চশিক্ষিত, মাতৃপিতৃহীন, মাতুল পরিতোষবাবু কর্তৃক পুত্রবৎ পালিত।

ঊষা—শৈলেনের কনিষ্ঠা ভগিনী।

ফটিক—বালক ভৃত্য।

ভাগিনেয়—আগন্তুক।

সকলেই বায়ু পরিবর্তনের জন্য দেওঘরে আসিয়াছেন।

প্রথম দৃশ্য

জসিডি জংশন। দিঘড়িয়া পাহাড়ের প্রায় পাদমূলে। সন্ধ্যা হইয়াছে; বৃষ্টি হইতেছে, জোরে ঝড় বহিতেছে। কিছুই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। কেবল স্থানে স্থানে

বৃষ্টির জল জমিয়া একটা মলিন শ্বেতাভার সৃষ্টি করিয়াছে।

ঊষা অতি সাবধানে পা ফেলিয়া পাহাড়ের দিক হইতে প্রবেশ করিল। তাহার গা ওয়াটার-প্রুফে ঢাকা, পায়ের সাদা চামড়ার জুতা জল ও কাদায় অত্যন্ত ভারী হইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া মোটেই ভীত বা উৎকণ্ঠিত বোধ হইতেছে না। বরং সে যেন এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে পথ হারাইয়া যাওয়ার ব্যাপারটাকে বেশ উপভোগ করিতেছে।

বিদ্যুৎ চমকিল এবং পরক্ষণেই বজ্রের একটা বিকট আর্তনাদ উঠিল।

ঊষা হঠাৎ ভয় পাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, 'মামা—মামা—'

পাহাড়ের দিক হইতে সাহেব বেশধারী এক ব্যক্তি প্রবেশ করিল। পিচ্ছিল জমির উপর পা হড়্কাইয়া পড়িতে পড়িতে দু'বার সামলাইয়া লইল। কিন্তু তৃতীয়বার আর পারিল না—হঠাৎ চার হাত দূর পর্যন্ত পিছলাইয়া গিয়া কাদার মধ্যে উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল। সেই সঙ্গে তাহার মাথার টুপিটা দম্কা হাওয়ায় উড়িয়া ব্যোমপথে অদৃশ্য হইল।

ঊষা অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করিতে না পারিয়া ছুটিয়া কাছে আসিয়া ডাকিল, 'মামা—'

সে ব্যক্তি উঠিয়া বসিল। নাসিকার অগ্রভাগ হইতে কর্দম মুছিয়া ঝাড়িয়া ফেলিল। তারপর বলিল, 'আমি মামা নই—আমি ভাগ্নে।'

ঊষা অবাক হইয়া গেল।

ঊষা। ভাগ্নে?

ব্যক্তি। হ্যাঁ—ভাগ্নে। কিন্তু মামা আমার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেননি। আমাকে এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ফেলে তাঁর অস্ত যাওয়া মোটেই উচিত হয়নি।

ঊষা। আপনার মামা কে?

সে ব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব্যক্তি। আমার মামা—সূয্যি মামা।

কিছুক্ষণ অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকিয়া ঊষা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ঊষা। সূয্যি মামা—(হাসি)

সূয্যি মামার ভাগ্নে ঘাড় বাঁকাইয়া বীরদর্পে দাঁড়াইল; চক্ষু পাকাইয়া বলিল, 'হাসি! এই ঝড় বৃষ্টির সময় হাসি! আমি পা পিছলে কাদার মধ্যে হেঁডেড়ুডু খেল্ছি আর হাসি!' (পদদাপ)

পদদাপ করিতে গিয়া আবার পদস্খলন ও চিৎ হইয়া পতন। ঊষার উচ্চ হাস্য। সে ব্যক্তি শয়ান অবস্থাতেই হস্তভঙ্গী করিয়া ক্রুদ্ধভাবে কহিল, 'ফের হাসি! আমি পড়ে গেছি তাই—তুম্ কোন্ হ্যায়? কে তুমি? তোমার বাড়ি কোথায়? তুমি বাঙালী কি বেহারী কি মারাঠী কি গুজরাটী কি ওড়িয়া—'

ঊষা। আমি বাঙালী।

সে ব্যক্তি অর্ধোপবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিল।

ব্যক্তি। বাঙালী? ঠিক! বেহারী কিম্বা ওড়িয়া হলে 'মামা' না বলে 'মামু' বলত। —কিন্তু তোমার অত হাসি কিসের? তুমি কি জাতি?

ঊষা। আমি স্ত্রীজাতি।

সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব্যক্তি। স্ত্রীজাতি? আপনি বাঙালী স্ত্রীজাতি! (টুপি তুলিবার জন্য মাথায় হাত দিয়া) আমার টুপি কোথায়?

ঊষা। আমি তাকে উড়ে যেতে দেখেছি।

সহসা সে ব্যক্তি ভীষণ চটিয়া উঠিল।

ব্যক্তি। কি! আমার টুপি উড়ে যেতে দেখেছ? (আত্মসম্বরণ করিয়া) ওঃ, আপনি বাঙালী স্ত্রীজাতি। তা—ইয়ে হয়েছে—আপনি এখানে কি মনে করে?

ঊষা। আমি আর আমার মামা পাহাড়ে বেড়াতে এসেছিলুম। তারপর এই দুর্যোগে মামাকে আর খুঁজে পাচ্ছি না।

ব্যক্তি। আপনার মামা—ইয়ে—তাঁকে আর খুঁজে পাবেন না।

ঊষা। অ্যাঁ! সে কি!

ব্যক্তি। দিঘড়িয়া পাহাড়ে ভয়ানক বাঘ—আপনার মামা বোধ হয় তাদের সঙ্গেই রাত্রি যাপন করবেন।

ঊষা [ব্যাকুলভাবে চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া] অ্যাঁ—না না—মামা মামা—

ব্যক্তি। [নিজ মনে] হাসি! হাসি! আমি কাদায় আছ্‌ড়া পিছ্‌ড়ি খাচ্ছি আর হাসি! [ঊষার নিরুপায় ভাব লক্ষ্য করিয়া] না—এটা উচিত হচ্ছে না—নেহাৎ বর্বরতা হচ্ছে।—[প্রকাশ্যে] ইয়ে—তা কোনো ভয় নেই। বাঘেরা আপনার মামার সন্ধান নাও পেতে পারে।

ঊষা নীরব মিনতির চক্ষে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

ব্যক্তি। দেখছেন না এই পেছলে বাঘ কখনো বেরুতে পারে? আর যদি বা বেরোয় আর কোথাও যেতে পারবে না, সড়াৎ করে এইখানে এসে হাজির হবে।

ঊষা। কিন্তু কৈ, এসে হাজির হচ্ছে না তো।

ব্যক্তি। তার মানে তারা বেরোয়নি। আমাদের চেয়ে তাদের অভিজ্ঞতা বেশী।

ঊষা। কিন্তু মামা—

ব্যক্তি। তিনিও নিশ্চয় বেরোননি, নিরাপদেই আছেন। অথবা হয়তো আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেছেন।

ঊষা। স্টেশন কোন্ দিকে?

ব্যক্তি। সেটা দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের অভাবে বলা শক্ত। খুঁজে নিতে হবে।

ঊষা। তাহলে—

ব্যক্তি। হ্যাঁ—দিঘড়িয়া পাহাড়কে পেছনে রেখে যেদিকে হোক এগোনই ভাল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজলে নিউমোনিয়া হতে পারে, হাঁটলে সে ভয় কম।

সে ব্যক্তি অগ্রসর হইল। একাকিনী দাঁড়াইয়া থাকা অপেক্ষা ইহার সঙ্গে যাওয়া শ্রেয় বিবেচনা করিয়া ঊষা তাহার অনুসরণ করিল।

ব্যক্তি। [যাইতে যাইতে সহসা থামিয়া] মাফ কর্‌বেন—[ইতস্ততঃ] ওর নাম কি—

ঊষা। আমার নাম ঊষারানী দত্ত।

ব্যক্তি। না না, সে কথা নয়। আপনি কি জংশনেই থাকেন?

ঊষা। না। দেওঘরে বম্পাস টাউনে। আপনি?

ব্যক্তি। আমিও।

ঊষা। [সাগ্রহে] বম্পাস টাউনে!

ব্যক্তি। হুঁ।

ঊষা। আপনার নাম—?

ব্যক্তি। আমার নাম [মাথা চুলকাইয়া] শ্রীভাগিনেয় বসু।

এই বলিয়া বড় বড় পা ফেলিয়া প্রস্থান। ঊষার অনুগমন—উভয়ে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

পাহাড়ের দিক হইতে সাহেব বেশধারী আর একজনের প্রবেশ। প্যাণ্টালুন কর্দমাক্ত, মাথার টাকের উপর হইতে বৃষ্টির জল চারিদিকে গড়াইয়া পড়িতেছে। ইনি ঊষার মামা

পরিতোষবাবু।

পরি। ঘোড়ার ডিম! ভারী পেছল। [পা পিছলাইয়া] উঃ, ঘোড়ার ডিম—গিয়েছিলুম আর একটু হলে। ঊষা—ঊষা! [হতাশভাবে] ঘোড়ার ডিম! [দাঁড়াইয়া টাক হইতে জল মুছিলেন] কোথায় গেল মেয়েটা! কেন তাকে একলা ছেড়ে দিলুম! ঘোড়ার—[উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন] ঐ যে কে 'মামা' 'মামা' করে ডাকছে! কিন্তু ওতো ঊষার গলা নয়। ঘোড়ার ডিম—আরও মামা এখানে আছে নাকি!

দূর হইতে শব্দ হইল—'মামা'—'মামা'—।

পরি। ঐ যে ঊষার গলা! ঊষা—ঊষা! কিছু দেখবার যো নেই। ঘোড়ার ডি—[বিদ্যুৎ চমকিল]

পরি। ঐ যে সামনে কিছু দূরে দু'জন লোক দেখলুম না! একজন ওয়াটার-প্রুফ পরা, ঊষা বলেই বোধ হল। ঘোড়ার ডিম—বিদ্যুৎ আর একবার চম্‌কালে হত যে। একে পেছল তায় অন্ধকার, ঘোড়ার ডিম—(নিষ্ক্রান্ত হইলেন)

দ্বিতীয় দৃশ্য

দেওঘর। বম্পাস টাউনে একটি সুদৃশ্য কুটির। নাম—প্রেম কুটির। তাহার পাঁচিল-ঘেরা বাগানের মধ্যে বাঁধানো চাতালের উপর টেবিল চেয়ার প্রভৃতি সজ্জিত। সূর্য এইমাত্র অস্ত গিয়াছে—আকাশে বৃষ্টির কোনও লক্ষণ নাই। হাওয়া ঝরঝরে।

পরিতোষবাবু একটি বেতের মোড়ায় বসিয়া একটি চুরোটের অতি ক্ষুদ্র শেষাংশ চুষিতেছিলেন। পরিধানে কোঁচানো ধুতি ও পিরান কিন্তু গলায় উলের গলাবন্ধ, পায়ে মোজা এবং চটিজুতা।

পরিতোষবাবুর মোড়ার পিছনে দাঁড়াইয়া তাঁহার বালক ভৃত্য ফটিক নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছে।

সে কিছু হৃষ্টপুষ্ট—গাল দুটি উঁচু হইয়া নাসিকার বিশেষ খর্বতা সাধন করিয়াছে। কপাল নাই বলিলেই হয়। বর্ণ নিকষকৃষ্ণ।

অন্য কেদারায় বসিয়া একটি যুবক,—সান্ধ্য ভ্রমণের উপযুক্ত সাজ—চেহারা সুশ্রী ও গম্ভীর কিন্তু অধরোষ্ঠ ঈষৎ চপলতার পরিচায়ক। সে নিবিষ্টমনে সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিল। সে ঊষার দাদা শৈলেন।

বাড়ির ভিতর হইতে বাদ্য সংযোগে সঙ্গীতের আওয়াজ আসিতেছিল। ঊষা গাহিতেছিল,—

'আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ'

পরিতোষবাবু চুরোটের দগ্ধাবশেষ হইতে আর কিছুমাত্র ধূম বাহির করিতে না পারিয়া বিরক্ত হইয়া সেটা ফেলিয়া দিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া শেষে বলিলেন, 'আজকের খবর পড়লে!'

শৈলেন। (কাগজখানা মুড়িয়া রাখিয়া) হ্যাঁ।

পরি। জাপানের ব্যাপারখানা দেখেছ?

শৈলেন। (একটু হাসিয়া) হ্যাঁ।

পরি। এমন ফন্দিবাজ জাত আর পৃথিবীতে নেই—ঘোড়ার ডিম—ওরা ভয়ানক ধূর্ত। এই যে জাহাজের পর জাহাজ তৈরী করছে সে কি মিছিমিছি? ঘোড়ার ডিম—মোটেই নয়। ভারতবর্ষ যদি না জাপানীরা আক্রমণ করে তো বোলো তখন। ওই যে সব জাপানী ফিরিওয়ালা বস্তা ঘাড়ে করে দেশময় ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা কি সাধারণ লোক

মনে করেছ? ওরা সব ঘোড়ার ডিম—স্পাই স্পাই—দেশের প্ল্যান করে বেড়াচ্ছে, সুবিধে পেলেই আক্রমণ করবে।

শৈলেন। তা যদি করে আমাদের বেশ সুবিধে আছে—ওদের বস্তাগুলো কেড়ে নিলেই হবে।

পরি। তারা কি ঘোড়ার ডিম—বস্তা নিয়ে লড়াই করতে আসবে? সঙ্গীন উঁচিয়ে —কামান দাগতে দাগতে এসে হাজির হবে।

'ওঃ' বলিয়া শৈলেন এমনভাবে স্তব্ধ হইয়া রহিল যেন এ সম্ভাবনা সে কল্পনাই করে নাই।

(উষার প্রবেশ)

উষা। কৈ, মিঃ বোস এখনো এলেন না?

পরি। ফটিক! ফটিক! ঘোড়ার ডিম ঘুমিয়ে পড়েছে। (উচ্চ কণ্ঠে) ফটিক!

জাগরণের চিহ্ন স্বরূপ ফটিক প্রথমে বাম চক্ষু পরে দক্ষিণ চক্ষু সাবধানে উন্মীলন করিল এবং পরক্ষণেই কাঁদিয়া ফেলিল।

পরি। গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াগে যা। একটি বাবু আসবেন, এইখানে নিয়ে আস্‌বি।

(চক্ষু মুছিতে মুছিতে ফটিকের প্রস্থান)

উষা অন্যমনস্কভাবে আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল; একটা স্ফুটনোন্মুখ গোলাপের কুঁড়ি ছিঁড়িয়া একবার তাহাকে আঘ্রাণ করিয়া চুলের মধ্যে গুঁজিয়া রাখিল। শৈলেন আড়চোখে তাহাকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া খুব গাম্ভীর্যের ভান করিয়া বলিল, 'উষা, কালকের ঘটনাটা কবিতায় লিখে ফেল—তারপর সেটা 'মন্দাকিনী'তে পাঠিয়ে দিলেই হবে। একে তোমার লেখা, তার ওপর নায়কের নামটি যে রকম চিত্তাকর্ষ[illegible]

উষা দাদাকে লক্ষ্য করিয়া ভ্রূকুটি করিল। তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

পরি। কেন শৈলেন, তুমি ওকে ক্ষেপাও? ওর বাস্তবিক লেখবার ক্ষমতা আছে—তুমি ঘোড়ার ডিম—তার বুঝবে কি? তুমি ওর 'অস্ফুট' পড়ে যতই হাসো না কেন, তার মধ্যে বাস্তবিক ভাল কবিতা আছে। এই ধর না কেন, 'প্রার্থনা', 'আশ্রয় যাচ্ঞা'—এগুলো ঘোড়ার ডিম উৎকৃষ্ট রচনা। ওইটুকু মেয়ের হাত থেকে অমন লেখা বেরোন কি যে-সে কথা। তুমি হাজার চেষ্টা করলেও অমন একটা পদ্য লিখতে পারবে না।

শৈলেন। 'মন্দাকিনী'তে তার যে রকম প্রশংসা বেরিয়েছিল তাতে সে রকম লেখিকার উচ্চাশা আমার বড় একটা—

উষা আসিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। ছেলেবেলার প্রথম লেখা ছাপানোর লজ্জাকর অধ্যায়টা এমনই উষাকে ত্রস্ত-সঙ্কুচিত করিয়া রাখিত,—তার উপর শৈলেন যখন সেই কথা লইয়া তাহাকে বিঁধিতেও ছাড়িত না তখন তাহার দাদার প্রতি রাগ ও নিজের বিগত নির্বুদ্ধিতার জন্য লজ্জার সীমা-পরিসীমা থাকিত না। এক এক সময় শৈলেনের জ্বালায় সত্য সত্যই তাহার লোক-সমাজে মুখ দেখানো ভার হইয়া উঠিত।

উষার বয়স এখন উনিশ; তাই সে পনেরো বছর বয়সে লেখা নিজের কবিতার মধ্যে অক্ষমতা ও ছেলেমানুষী ভিন্ন আর কিছুই খুঁজিয়া পায় না, এবং লজ্জায় মরিয়া গিয়া ভাবে—কেন মরিতে এগুলোকে ছাপিতে গিয়াছিলাম।

ভাগিনেয় বোসের প্রবেশ ও সকলের অভিবাদন।

পরিতোষবাবু মোড়া ছাড়িবার উদ্যোগ করিয়া আবার বসিয়া পড়িলেন। শৈলেন আগন্তুককে কিছুক্ষণ বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া কি একটা বলিতে গিয়া

থামিয়া গেল। ঊষা পূর্বদিনের সেই কাদা মাখা অদ্ভুত জীবটির পরিবর্তে এই সুবেশ সুশ্রী অতিথিটিকে দেখিয়া সহসা সম্ভাষণ করিবার মত উপযুক্ত কথা খুঁজিয়া পাইল না এবং মনে মনে চঞ্চল হইয়া উঠিল। সকলে উপবিষ্ট হইলেন।

ভাগিনেয়। আপনাদের গেটের কাছে একটি বালক দেখলাম যার প্রকৃতি কিছু অস্বাভাবিক বলে বোধ হল। আমাকে দেখেই সে কেঁদে ফেল্‌লে; তাই দেখে আমার মনে দয়া হল, আমি তার পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম। পরক্ষণেই দেখি সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

পরি। ওটি আমার বেয়ারা ফটিক!

ভাগি। ভারি আশ্চর্য! বাস্তব জগতে ফ্যাট বয় এবং যব ট্রটারের এমন অপূর্ব সংমিশ্রণ বোধ হয় আর কোথাও নেই। ওকে যাদুঘরে পাঠিয়ে দিন।—(ঊষার দিকে ফিরিয়া) কাল আপনার সঙ্গে আমি সদ্‌ব্যবহার করিনি। সে জন্যে মাফ চাইছি। মনুষ্য সমাজে যে ব্যবহার একেবারে অমার্জনীয়, দিঘড়িয়া পাহাড়ের ধারে হয়তো ততদূর নাও হতে পারে এই মনে করে এই দুষ্প্রাপ্য জিনিস চাইতে সাহস করছি!

ঊষা। (সুস্মিত মৃদুস্বরে) সাহসের বলে মানুষ অনেক জিনিস লাভ করে—আপনিও করলেন।

ভাগি। আমাকে বেশী সাহসী মনে করবেন না। প্রথমতঃ আমি বাঙালী, সুতরাং বিখ্যাত সাহিত্যিকদের মতে আমার ভীরু হওয়া একটা জাতীয় কর্তব্য, দ্বিতীয়তঃ—

শৈলেন। কিন্তু আপনার নামটি অসমসাহসিকতার পরিচয় দিচ্ছে।

ভাগি। কি ভাবে?

শৈলেন। নামকরণ সম্বন্ধে সামাজিক বিধিবাঁধনগুলোর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করে।

ভাগি। (কিয়ৎকাল ভাবিয়া) দেখুন—আমার নামটা একটা মহামুহূর্তের প্রেরণার ফল। ওটির জন্য আমাকে ঈর্ষা করবেন না।

ঊষা। আচ্ছা ভাগিনেয়বাবু, এ নামটি আপনার কে রেখেছিল?

ভাগি। আমি স্বয়ং। ছেলেবেলা থেকেই মামাদের প্রতি আমার একটু পক্ষপাত আছে।

শৈলেন। তাই নিঃসংশয়ে পৃথিবীসুদ্ধ লোকের ভাগ্নে হয়ে বসে আছেন। কিন্তু এতে কোনও লোকের কিছু অসুবিধা হওয়া সম্ভব।

ভাগি। কি করে?

শৈলেন। (ইতস্ততঃ করিয়া) আপনার মহিলা বন্ধুরা সকলে এ সম্বন্ধ স্বীকার করতে রাজী না হতে পারেন।

ভাগি। আমার জানিত একটি লোক আছেন—তাঁর নাম প্রাণেশ্বর! তাঁর বান্ধবীরা তাঁকে প্রাণেশ্বর বলে ডাকতে দ্বিধা করেন না।

সকলে স্তব্ধ। পরিতোষবাবু অভিভূত। শৈলেন পরাজিত, ঊষা লজ্জাহত।

সন্ধ্যা হইয়াছিল। পরিতোষবাবু দু'একবার কাশি চাপিবার চেষ্টা করিয়া শেষে বলিলেন, 'ঘোড়ার ডিম—কাল জলে ভিজে ঠাণ্ডা লেগে গেছে। আর বাইরে থাকা ঠিক নয়। ঊষা, তোমারও তো—'

ঊষা। না মামা, আমার কিছু হয়নি। তুমি বরং ভেতরে যাও, আমরা আর একটু পরে—

পরি। আচ্ছা। ভাগিনেয়বাবুকে ছেড়ে দিও না। আমি তোমাদের জন্যে ড্রইং-রুমে অপেক্ষা করব। ঊষা, একবারটি শুনে যাও। (উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

শৈলেন। (উত্তেজিতভাবে) বিজন, তুমি—?

ভাগি। চুপ—ব্যস। আমি ভাগিনেয়। সব মাটি করে দিও না। পরিতোষবাবু তোমার—?

শৈলেন। মামা।

ভাগি। মেয়েটি?

শৈলেন। বোন।

ভাগি। (উৎকণ্ঠিত) 'অস্ফুট'এর—?

শৈলেন। লেখিকা।

ভাগি। (মাথায় হাত দিয়া) উঃ—চুপ!

(উষার প্রবেশ)

উষা। মামা বললেন আজ আমাদের সঙ্গে ডিনার খেয়ে তবে বাড়ি যেতে পাবেন। কিন্তু ডিনারের এখনো ঢের দেরী আছে। ততক্ষণ না হয় এখানে বসে—

শৈলেন। কাব্য আলোচনা করা যাক। কি বলেন ভাগিনেয়বাবু? আপনি বোধ হয় জানেন না, আমার ভগিনী খুব একজন উঁচুদরের—

উষা। আঃ দাদা—চুপ কর।

শৈলেন। কবি। বাঙলা ভাষার সঙ্গে যদি আপনার পরিচয় থাকে, এমন কি মুখ দেখাদেখিও থাকে তাহলে নিশ্চয় আপনি 'অস্ফুট' নামক অপূর্ব কাব্যগ্রন্থের নাম শুনেছেন। তার মধ্যে 'প্রার্থনা', 'আশ্রয় যাচ্ঞা' প্রভৃতি যে সব উচ্চ অঙ্গের কবিতা আছে তা পড়লে চোখের জল সজোরে বেরিয়ে পড়ে। আপনি বল্‌বেন ভগিনীর কাব্য সম্বন্ধে ভ্রাতার মনে একটু দুর্বলতা থাকা সম্ভব। প্রত্যুত্তরে আমিও বলতে পারি যে ফটিক উষার ভাই নয়, তথাপি সেও কেঁদে ফেলেছিল।

উষা। দাদা, তুমি—

শৈলেন। আমি কিছুমাত্র অত্যুক্তি করছি না। দরকার হয় আমি এখনি ফটিকের ঘুম ভাঙিয়ে তার সামনে তোমার একটা কবিতা আবৃত্তি করে একথা প্রমাণ করে দিতে পারি। তাছাড়া 'মন্দাকিনী'র সম্পাদক বিজন বোস এই কাব্যখানির যে মর্মস্পর্শী সমালোচনা করেছিলেন—

উষা। তবে যাও—(প্রস্থানোদ্যতা)

ভাগি। ওর নাম কি—যাবেন না। দশানন সীতাহরণ করেছিলেন সেই অপরাধে সাগরের বন্ধন হল। আপনার দাদার ধৃষ্টতার জন্যে আপনি আমাকে শাস্তি দিয়ে চলে যাচ্ছেন কেন?

উষা। (ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিয়া) বেশ, যত ইচ্ছে বলে যাও। আমি ওসব গ্রাহ্য করি না।

ভাগি। এই তো চাই। সমালোচনা গায়ে মাখতে নেই; সমালোচককে জব্দ করবার ঐ একমাত্র উপায়।—আমার যখন বয়স অত্যন্ত কম তখন একবার নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে একটা আস্ত ডিম খোলাসুদ্ধ কচমচিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছিলাম। তার পর থেকে আমার সামনে ডিমের নাম উচ্চারণ করলেই আমার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করত এবং নিজের মাথাটা দেয়ালে ঠুকতে ইচ্ছে করত। কিন্তু এখন দেখুন, আমার চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ মুর্গী এবং হাঁস অনবরত ডিম পাড়তে থাকলেও আমি অবিচলিত হয়ে তা দেখতে পারি। আমার মনে কোনও বিকার উপস্থিত হয় না।

শৈলেন। আচ্ছা উষা, বিজন বোসের সঙ্গে যদি তোমার দেখা হয় তাহলে তুমি

কি কর?

উষা কুঞ্চিতভ্রূ, নীরব।

ভাগি। একথা আমি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি যে সে ব্যক্তি যতবড় দুর্বৃত্তই হোক না কেন উনি তাকে ক্ষমা করবেন।

উষা। কখ্খনো না—কখ্খনো না। আমি আপনাকে বলছি ভাগিনেয়বাবু, দাদা যদি রাতদিন এই কথা নিয়ে আমাকে জ্বালাতন না করতেন তাহলে হয়তো আমি এই বিজনবাবুকে ক্ষমা করতে পারতুম। কিন্তু—শুনেছি বিজনবাবু দাদার বন্ধু—এ'রা দু'জনে মিলে আমাকে পাগল করে দেবেন।

(উষা রোদনোন্মুখী)

ভাগি। (উষার পাশে চেয়ার টানিয়া লইয়া) আপনার দাদা যখন সেই নরাধমের বন্ধু তখন আপনার দাদার সম্বন্ধেও আমার ধারণা বদলে গেল। বুঝলাম, উনিও একজন পাষণ্ড। কিন্তু পাপী এবং পাষণ্ডদের ক্ষমা করাই হচ্ছে ধর্ম। ভেবে দেখুন, ইংরেজদের যীশুখ্রীস্ট পর্যন্ত ঐ কথা বলে গেছেন।

উষা। যীশুর উপদেশ ইংরেজরা যেমন মানে আমিও তেমনি মান্‌ব।

ভাগি। সেটা কি ভাল দেখাবে? আপনি একজন খাঁটি আর্যনারী, নিমাই নিতাই শুক সনকের দেশে আপনার জন্ম। আপনিও যদি কতকগুলো অস্পৃশ্য কদাকার ইংরেজের দেখাদেখি যীশুকে অবহেলা করেন—তাহলে প্রভু নিত্যানন্দ কি মনে করবেন এবং আমাদের এই সনাতন উদার হিন্দুধর্মেরই বা কি গতি হবে?

উষা। হয়তো সদ্‌গতি হবে না; কিন্তু সেজন্য আমি চিন্তিত নই। আমি চিন্তিত হচ্ছি আপনি এ'দের জন্য এত ওকালতি কচ্ছেন কেন?

ভাগি। নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার করার যে মহৎ আনন্দ আমি তাই উপভোগ করছি। যে হতভাগা নরপিশাচ আপনার কবিতার নিন্দা করে তার লেখনীর মুখ কালিমালিপ্ত করেছে তার ইহকাল এবং পরকালে অসীম দুর্গতির কথা ভেবে আমি আপনাকে সদয় হতে অনুরোধ করছি।

উষা। ভাগিনেয়বাবু, আপনার অনুরোধ এক্ষেত্রে নিষ্ফল। এতখানি বাগ্মিতা অনর্থক অপব্যয় করলেন।

ভাগি। আচ্ছা, সে ব্যক্তি অর্থাৎ সেই বিজনবাবু যদি স্বয়ং এসে আপনার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করে—তাহলে কি—?

উষা। তাহলেও না। বিজনবাবুকে আমি কখনো দেখিনি আর দেখতেও চাইনে। —আসুন, ভেতরে যাই। ফটিক বোধ হয় আমাদের ডাকতে আস্‌ছিল, রাস্তার মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়েছে।

উষা নিষ্ক্রান্ত।

ভাগিনেয় কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

শৈলেন। কি ভাবছ?

ভাগি। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) ভাবছি যীশুর কথা— Repent! For the kingdom of Heaven is at hand.

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

তৃতীয় দৃশ্য

প্রেম কুটিরের সম্মুখ। কাল—অপরাহ্ণ। ফটকের একপাশে টুলের উপর বসিয়া ফটিক নিদ্রামগ্ন। আর কেহ কোথাও নাই।

পথ দিয়া একটি চীনা ফেরিওয়ালার প্রবেশ। তাহার পিঠে বস্তা; ফটিককে নিদ্রিত অবস্থায় দেখিয়া সে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল—ফটিকের মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া নিরীক্ষণ করিল। তারপর বলিল,—গুট মর্নিং স্যাল্, লিট্ল বয়।

ফটিক তথাপি নিদ্রিত। চীনাম্যান তখন নিজের ভাষায় কি বলিয়া হি হি করিয়া হাসিল। তারপর পকেট হইতে একটি কাঠি বাহির করিয়া ফটিকের নাকে দিল। ফটিক হাঁচিয়া ফেলিল এবং পরক্ষণেই জাগিয়া উঠিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

চীনা। নো ক্রাই—গুটম্যান চায়নাম্যান।

ফটিক। হু—হু—হু—(ক্রন্দন)

চীনা। (বিস্মিত ও বিপন্ন) নো ক্রাই লিত্ল্ বয়—নো ক্রাই—লাফ্। আই ফানি চায়নাম্যান—হি হি হি হি—লাফ্।

ফটিক। (পূর্ববৎ) হু—হু—হু—

(ক্রন্দন)

চীনা। (ঝুলি হইতে চুষিকাঠি বাহির করিয়া) তেক—গুট বয়—নো ফিয়াল, আই ফানি চায়নাম্যান—

ফটিক। (চুষিকাঠি গ্রহণ ও ক্রন্দন) হু—হু—হু—

পরিতোষবাবু। (নেপথ্যে) ফটিক! ফটিক!

পরিতোষবাবু প্রবেশ করিলেন। সম্মুখে চীনাম্যান দেখিয়া স্তম্ভিত।

চীনা। গুট মর্নিং স্যাল—আই চিনী হকার গুট ম্যান—

ফটিক। হু—হু—

পরি। ঘোড়ার ডিম—এ যে ভীষণ ব্যাপার। ফটিক, তোকে মারপিট করছে নাকি?

চীনা। নো স্যাল, আই নো বিট লিতল বয়। আই কম—হি শ্লীপ, আই ওয়েক হিম—হি ক্লাই হু হু হু;—আই গিফ হিম নাইছ তয়, হি ক্লাই হু হু হু; আই পুয়োল চায়নাম্যান—হেলপ-লেছ! (হতাশ মুখভঙ্গী করিল)

পরি। হুঁ। ঘোড়ার ডিম ব্যাপার বড় সুবিধের বোধ হচ্ছে না। একেবারে খাঁটি জাপানী স্পাই। ঘোড়ার ডিম—কি করা যায়! ফটিক, তুই যা, চট করে আমার লাঠিটা নিয়ে আয়।

(ফটিকের প্রস্থান)

চীনা। বয় ভেলি সরি স্যাল—ক্লাই, আই গিব হিম তয়—নাউ হি প্লে, হ্যাপি—লাফ্ হি হি হি—

পরি। হুঁ—লাফ হি হি হি ঘোড়ার ডিম। তোমার মতলব কি আর আমি বুঝিনি? চুষিকাঠি ঘুষ দিয়ে ঘোড়ার ডিম বাড়ির মধ্যে ঢোকবার ফিকির করেছিলে!

চীনা। ইয়েস স্যাল—আই ব্রিং ভেলি নাইছ টিংস—সিল্ক, তয়, লিবন—ভেলি চীপ—

পরি। (দৃঢ়ভাবে) জাপানী সায়েব, তুমি ঘোড়ার ডিম সটান হিঁয়াসে চলা যাও। হিঁয়া ওসব চালাকি নেই চলেগা—

চীনা। ভেলি গুট স্যাল, আই গট জাপানী সিল্ক—

(বস্তা নামাইল)

পরি। নো নো সায়েব, তুম ন্যাকা সাজতা হায় কাহে? ঘোড়ার ডিম, তুম শীগ্‌গির চলা যাও—নেই তো ঘোড়ার ডিম—

চীনা। ভেলি গুট স্যাল—(বস্তা তুলিয়া) আই গো ইন স্যাল—শো বিউটিফুল টিংস—সিল্ক, তয়, লুকিং গ্লাস—(ফটকের ভিতর প্রবেশের উদ্যোগ)

পরি। (চীৎকার করিয়া) ওরে ফটিক। শীগ্‌গির লাঠি নিয়ে আয়—ঘোড়ার ডিম—জাপানীটা ঘরে ঢুকতে চায়, এখনি বাড়ির প্ল্যান তৈরী করে ফেলবে ঘোড়ার ডিম—

(ঊষা ও লাঠি হস্তে ফটিকের প্রবেশ)

ঊষা। কি হয়েছে মামা—

পরি। (লাঠি হাতে লইয়া) ঘোড়ার ডিম একটা জাপানী স্পাই জোর করে বাড়ি ঢুকতে চায়। শৈলেনটাও যে ছাই এই সময় বেড়াতে গেল। নাউ—ঘোড়ার ডিম—গো—

চীনা। (টুপিতে হাত দিয়া সহাস্যে) গুট মর্নিং ম্যাদাম্। আই নো জ্যাপ, আই চায়নাম্যান—ভেলি গুট চায়নাম্যান—হংকং চায়নাম্যান—(খানিকটা চীনাভাষায় কথা কহিল) আই নো দালতি (dirty) জ্যাপ, ব্যাড ম্যান জ্যাপ (নাক সিঁটকাইল)

ঊষা। মামা, ও জাপানী হতে যাবে কেন? ও তো চীনে ফেরিওয়ালা।

পরি। না না, তুমি বোঝ না ঊষা। ঘোড়ার ডিম একেবারে খাঁটি জাপানী গুপ্তচর। গোঁফ দেখছ না, একদম পুরোদস্তুর সমুরাই প্যাটার্ণের—জেনারেল নোগুচির মত।

ঊষা। সব চীনেম্যানেরই তো ঐ রকম গোঁফ হয়।

পরি। ঘোড়ার ডিম তুমি কিছু জানো না। সব চীনেম্যানের গোঁফ তুমি দেখেছ?

চীনা। লিবন ম্যাদাম, ভেলি গুট্ লিবন—লেদ্ ব্লু গ্লীন—সিল্ক লিবন ভেলি চীপ্।

ঊষা। আসুক না মামা, ভেতরে, রিবন আছে বল্‌ছে—আমার কিছু রিবনের দরকার, আর যদি পছন্দসই ব্লাউজের সিল্ক থাকে—

পরি। ঘোড়ার ডিম, মেয়েমানুষের কাছে সিল্ক আর গয়নার নাম করলে আর তাদের জ্ঞান থাকে না। তুমি কি ভেবেছ ওর ওই বস্তায় সিল্ক আর রিবন আছে। মোটেই নয় ঘোড়ার ডিম।

ঊষা। তবে কি আছে?

পরি। গোলা বারুদ বোমা, ঘোড়ার ডিম আরো কত কি।

ঊষা। (হাসিয়া ফেলিয়া) তা ও গোলা বারুদ ঘাড়ে করে বেড়াচ্ছে কেন?

পরি। তা কি ঘোড়ার ডিম বলা যায়? ওর মতলব হচ্ছে বাড়িতে ঢুকে বাড়ির প্ল্যান তৈরী করা।

ঊষা। সে কি! কেন?

পরি। তাই যদি বুঝতে পারবে ঘোড়ার ডিম তবে আর ভাবনা কি! জাপানী গভর্নমেণ্ট কি ঘোড়ার ডিম ঘাস খায়! তারা ভীষণ ষড়যন্ত্র আঁটছে। আজ নয় কাল তারা ভারতবর্ষ আক্রমণ করবেই।

ঊষা। তা করুক, কিন্তু তাই বলে মামা, চীনে ফেরিওয়ালা বাড়ি ঢুকতে পাবে না?

পরি। না না, ঘোড়ার ডিম ঊষা, তুমি বাড়ির ভেতরে যাও, আমি ব্যাটাকে বিদেয় করছি। (লাঠি নাড়িয়া) জাপানী সাহেব, আমি তোমার সব ফন্দি বুঝে নিয়েছি, তুমি ঘোড়ার ডিম চট্‌পট্ সরে পড়।

চীনা। (লাঠি নিরীক্ষণ করিয়া) স্তিক্? আই গট্ নো স্তিক্। বট গুট দ্যাগাল্, সোল্‌দ্ দ্যাগাল্,—নাইছ—সি?

পরি। শুনলে তো? ঘোড়ার ডিম তলোয়ার ছোরা ছুরি নিয়ে বেড়াচ্ছে, সাংঘাতিক ব্যাপার ঘোড়ার ডিম; তাড়ালেও যায় না যে!

চীনা। কম্ সি, ভেলি নাইছ দ্যাগাল্—বিউটিফুল।

(ভেতরে প্রবেশের উদ্যোগ)

পরি। ওরে ঘোড়ার ডিম। এ যে নাছোড়বান্দা স্পাই; ভেতরে ঢুকবেই। সায়েব,

হাম বুড়া আদমি হ্যায়, তার ওপর কোমরে ব্যথা কিন্তু যদি জবরদস্তি কর তাহলে এই লাঠি ঘোড়ার ডিম মাথায় বসিয়ে দেব। (লাঠি ঘুরাইতে লাগিলেন)

চীনা। হোয়াৎ! বিৎ মি? (বস্তা ফেলিয়া) কামান (মুষ্টি ঘুরাইতে লাগিল)

পরি। ঘোড়ার ডিম!

ফটিক উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল, পরিতোষবাবু লাঠি ঘুরাইতে লাগিলেন, চীনাম্যান মুষ্টি ঘুরাইয়া নাচিতে লাগিল। ঊষা স্তম্ভিতবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। ভাগিনেয় প্রবেশ করিল।

ভাগি। এ কি! ব্যাপার কি! Open air vaudeville হচ্ছে নাকি?—ফটিক, স্তব্ধ হও। (ফটিক নীরব হইল) এটা কি হচ্ছে বলুন দেখি!

ঊষা। মামা চীনাম্যানকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছেন।

ভাগি। আরে তাইতো। এ যে ফিচিং সায়েব দেখছি।—ওহে ফিচিং, নিরস্ত হও। পরিতোষবাবু, লাঠি নামান।

পরি। ঘোড়ার ডিম ভাগিনেয়, লোকটা দুর্দান্ত গুপ্তচর। জোর করে বাড়ি ঢুকতে চায়।

ভাগিনেয়কে দেখিয়া চীনাম্যানের মুখ প্রশান্ত হাসিতে আরো থ্যাবড়া হইয়া গেল।

চীনা। গুট মর্নিং পীজনবাবু, আই লিংচু, নো ফিচিং—

ভাগি। হ্যাঁ হ্যাঁ লিংচু। তুমি ক্রোধ সম্বরণ কর। (হস্ত উত্তোলন, লিংচু মুষ্টি নামাইল, পরিতোষবাবু লাঠি নামাইল) এইবার ঘটনাটা বলুন তো, আপনাদের মনোমালিন্য কিসের জন্য? ফিচিং সাহেব কি আরসোলা দাবী করেছে? তা যদি করে থাকে—

পরি। ঘোড়ার ডিম আরসোলা নয়, ও আমার বাড়ির প্ল্যান তৈরী করতে চায়।

ভাগি। প্ল্যান! কি উদ্দেশ্যে? ফিচিং, তুমি কি সরকারী সারভেয়র হয়েছ? প্ল্যান তৈরী করতে চাও কেন?

চীনা। পীজনবাবু, হি ট্রাই বিৎ মি, স্তিক: আই সে—কামান! (হস্ত ঘূর্ণন)

ভাগি। বেশ বেশ, তুমি বীরপুরুষ। এখন ঠাণ্ডা হও।

ঊষা। ও আপনাকে পীজনবাবু বলে ডাকছে কেন?

ভাগি। (ঘাড় চুলকাইয়া) মানে ফিচিং সায়েব আমাকে বড় ভালবাসে। ওর কাছ থেকে একটা সিগারেট কেস কিনেছিলুম, সেই থেকে প্রণয়।

ঊষা। কিন্তু তাই বলে পীজনবাবু বলবে?

ভাগি। তা জানেন না? চীনেরা যাকে ভালবাসে তাকে পীজন বলে ডাকে। প্রেমের পায়রা আর কি।

চীনা। ইয়েছ, পীজনবাবু ভেরি গুটম্যান্—

ভাগি। (অস্ফুট স্বরে) নাঃ তোমাকে বিদেয় করতে হচ্ছে, তুমি এখনি সব মাটি করবে। চল ফিচিং, আমার বাড়ি; অনেক জিনিস কেনবার আছে—

পরি। হ্যাঁ হ্যাঁ ভাগিনেয়, তুমি ওকে তাড়াও নইলে ঘোড়ার ডিম ভীষণ গোলমাল বাধাবে।

ঊষা। কিন্তু আমি যে রিবন কিনব মামা—আর, কিছু সিল্ক—

চীনা। ইয়েছ, লিবন ভেরি ফাইন্ লিবন, লেদ্ ব্লু গ্রীন্—

ভাগি। তাইতো। এখন কি করা যায়? তাড়াবো কি তাড়াবো না? (চিন্তা) আচ্ছা, ঠিক হয়েছে—চল চিংফু তুমি আমার বাসায়; তারপর তোমার ঝোলায় কত রিবন আর সিল্ক আছে দেখা যাবে।

পরি। সাবধান! ওর ঝোলায় ঘোড়ার ডিম স্রেফ গোলা আর বারুদ আছে।

ভাগি। কুছ্ পরোয়া নেই। গোলা বারুদ সব আমি বাজেয়াপ্ত করে কেল্লায় পাঠিয়ে দেব।

উষা। কিন্তু—

ভাগি। আপনি ভাববেন না। চিংফুর ঝোলায় যতক্ষণ এক টুকরো রিবন আছে ততক্ষণ আমার হাতে ওর নিস্তার নেই—ঝোলা উজোড় করে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। (লিংচু'র গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া) চিংফু, চল তো যাদু—

চীনা। (প্রসন্ন হাস্যে) পীজনবাবু গুটম্যান—বাই সিগালেট্ কেস—পীজনবাবু—

ভাগি। চোপ রও। ফের পীজনবাবু বলেছ তো ঘাড় মটকে দেব।

পরি। কিন্তু ভাগিনেয়, সাবধানে থেকো ঘোড়ার ডিম—

ভাগি। আজ্ঞে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—গোলা বারুদ আমার কিছু করতে পারবে না। চিংফুর পায়রা-প্রণয়কেই ভয় বেশী। চল চিংফু—আর নয় (লিংচুকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া প্রস্থান)

পরি। নাঃ ঘোড়ার ডিম, ভাগিনেয় কাজের লোক আছে। উষা, তোমাকে ঘোড়ার ডিম সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যাবার অনুমতি চাইছিল, না? তা তুমি যেতে পার। ছোকরা তালেবর আছে—ও না এসে পড়লে ঘোড়ার ডিম জাপানীটা প্ল্যান তৈরী করে তবে ছাড়ত।

উষা। হ্যাঁ মামা।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

পরিতোষবাবু ও শৈলেন ড্রয়িং-রুমে আসীন। দু'জনের হাতে চায়ের বাটি। কাল প্রভাত। উষা একটু বেলা পর্যন্ত ঘুমায় তাই এখনো যোগ দিতে পারে নাই।

পরি। এ ক'দিন ঘোড়ার ডিম তোমার ভাব দেখে তো এমন কিছু বোধ হল না যে তুমি ওকে আগে থাক্‌তেই চেন।—তা কথাবার্তা যদিও একটু অদ্ভুত রকমের তবু ছোকরাটি মন্দ বোধ হল না। বিশেষত জাপানীটাকে সেদিন যেভাবে তাড়ালে। বড়ঘরের ছেলে, পয়সা আছে বলছ। বদ্‌খেয়ালের মধ্যে বাঙলা কাগজ চালায়। তা—সে ঘোড়ার ডিম বড়মানুষের ছেলেদের একটা বাতিক না থাকলে সময় কাটবে কি করে? আমি 'জাপানী গুপ্তচর' বলে যে প্রবন্ধটা লিখছি সেটা না হয় ওর কাগজেই দেব। কি নাম বললে কাগজখানার?

শৈলেন। উষার কাছে এখন ফাঁস করে দিও না—'মন্দাকিনী'।

পরি। তা দেব না। কিন্তু তোমরা দুই বন্ধুতে মিলে ঘোড়ার ডিম—মেয়েটার বিরুদ্ধে কোন রকম ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছ না তো?

শৈলেন। তুমি কি পাগল হয়েছ মামা! আসল কথা, বিজন ভয় কচ্ছে যে, উষা যদি আগে জানতে পারে যে ও-ই বিজন বোস তাহলে হয়তো—যাক, তোমার অমত নেই তো?

পরি। ছোকরা দেখতে শুনতে তো মন্দ নয়—তা উষার যদি ওকে পছন্দ হয় তাহলে—

শৈলেন। থামো—উষা আসছে।

দু'জনে চায়ের বাটিতে মনোনিবেশ করিলেন।

(উষার প্রবেশ)

উষা। বড্ড দেরী হয়ে গেছে, না? কি যে আমার ঘুম, সাতটার আগে কিছুতেই

ভাঙে না। ফটিক কৈ?

শৈলেন। তাকে পাঠিয়েছি ভাগিনেয়বাবুকে ডেকে আনতে। ওর পাগলাটে ধরণের কথাবার্তা আমার বেশ লাগে।

উষা। (ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া) পাগলাটে ধরণের!

শৈলেন। তা নয় তো কি! আমার বোধ হয় লোকটির মাথায় একটু ছিট্ আছে।

উষা। (মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া) ভারি তো জানো তুমি! তোমার—তোমার বন্ধু ঐ অজিত গুহর চেয়ে ঢের ভাল।

শৈলেন। (চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া) অজিতের চেয়ে ভাল। কিসে শুনি? রূপে, না গুণে, না বিদ্যায়!

উষা। সব তাতেই। তোমার বন্ধুদের মধ্যে এমন একটাও নেই—(বলিতে বলিতে হঠাৎ মহা লজ্জায় থামিয়া গেল)

পরি। কি বলে ভাল, যদি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে তুলনায় সমালোচনাই করতে হয় শৈলেন, তাহলে ঘোড়ার ডিম এ কথা না মেনে উপায় নেই যে ঐ অজিত গুহটা আস্ত জিরাফ, অশোক সাণ্ডেলটা নিরেট গুণ্ডা, অসিত সামন্তটার যেমন ভাল্লুকের মত চেহারা তেমনি উল্লুকের মত বুদ্ধি—আর ঐ কিংশুক গুপ্তটা—ওটাকে দেখলে আমার গা জ্বলে যায়।

উষা। (সোৎসাহে) আমারও—

শৈলেন। আসল কথা, তোমরা আমার বন্ধুদের দেখতে পারো না।

উষা। আর মামা—সেই মীনধ্বজ হালদার—!

পরি। সেটাকে ঘোড়ার ডিম শিম্পাঞ্জি বললে শিম্পাঞ্জির মানহানি করা হয়।

উষা। আর জানো মামা, এ'রা সব কেউ এক বর্ণ বাঙলা লিখতে জানেন না।

পরি। সব ঘোড়ার ডিম আন্‌কোরা গোরার বাচ্চা কিনা!

শৈলেন। ওরা সব ইংরিজী শিক্ষা পেয়েছে—তাই—

পরি। আমরাও তো ইংরিজী শিক্ষাটা—আসটা পেয়েছি রে বাপু; উষাও তো ঘোড়ার ডিম জুতোটা মোজাটা পরে, চা বিস্কুটও খায় আর ইংরিজীতে তোমার ঐ সবকটা বন্ধুর ঘোড়ার ডিম কান কেটে নিতে পারে। কিন্তু কই, অমন ট্যাঁশফিরিঙ্গি তো হয়ে যায়নি। তুমিও তো ঘোড়ার ডিম টেবিলে বসে খানা ডিনার খেয়ে থাকো, কিন্তু তাই বলে কি বাঙলা কথা ভুলে গেছ?

উষা দাদার বন্ধুদের এই লাঞ্ছনা খুব উপভোগ করিতেছিল। দাদার উপর প্রতিশোধ তুলিবার এত বড় সুযোগ সে বড় পায় না। তাই তার এত আমোদ।

সে গম্ভীর মুখে বলিল, 'এক কথায় দাদার বন্ধুগুলো সব একদম রদ্দি।'

শৈলেন। সব বন্ধু—একটাও বাদ নয়?

উষা। একটাও বাদ নয়।

শৈলেন। (দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া) আচ্ছা বেশ, এর বিচার পরে হবে।

(ভাগিনেয় বোসের প্রবেশ)

ভাগি। মাফ করবেন, আপনারা বোধ হয় আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন?

শৈলেন। বোধ হয় কি রকম—নিশ্চয়ই ডেকে পাঠিয়েছিলুম।

ভাগি। ঠিক ধরেছি তাহলে। চা খাবার আগে একটু বেড়িয়ে আসব বলে বেরুচ্ছি দেখি আপনার ফটিক আমার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ঘুমুচ্ছে। আন্দাজে ব্যাপারটা বুঝে নিলুম। পাশ কাটিয়ে সটান এখানে চলে এসেছি। তার কাঁচা ঘুম ভেঙে দেবার আর প্রবৃত্তি হল না। সে বোধ হয় নিদ্রিত অবস্থায় এখনো আমার সিংহদ্বারে পাহারা দিচ্ছে।

পরি। বোসো বোসো ভাগিনেয়; ঊষা, চা দাও।

ভাগিনেয় উপবিষ্ট হইল।

শৈলেন। (সহসা) আপনি বাঙলা জানেন?

ভাগি। (অবাক হইয়া কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া) ওর নাম কি, এতক্ষণ কি আমি না জেনে চীনে ভাষায় কথা কইলাম!

ঊষা। দাদার যত সব অদ্ভুত কথা।

শৈলেন। অর্থাৎ আমি জানতে চাই আপনি বাঙলায় পদ্য লিখতে পারেন কিনা?

ভাগি। একবার এক বন্ধুর বিয়েতে লিখেছিলাম কিন্তু ছাপা হয়নি।

ঊষা। (সাগ্রহে) কি পদ্য বলুন না!

ভাগি। তার প্রথম দু'ছত্র কেবল মনে আছে—

'গজুর অদ্য বিবাহ।
পদ্মবনে ঢুকিবে একটি বরাহ—'

(পদ্য শুনিয়া ঊষা মুষড়িয়া গেল)

শৈলেন। (খুশী হইয়া) খাসা পদ্য তো! আপনিও দেখছি তাহলে একজন কবি। অবশ্য ঠিক ঊষার সঙ্গে এক শ্রেণীর না হলেও—

ঊষা। দাদা—ফের—

শৈলেন। না না, তোমার সঙ্গে যে ভাগিনেয়বাবুর তুলনাই হয় না। সে আমি জানি—

ঊষা। দাদার কথা শুনবেন না, খালি আমাকে জ্বালাতন করবার চেষ্টা। আপনি নিশ্চয় ভাল কবিতা লিখতে পারেন। দাদার বন্ধুরা কেউ এক অক্ষর বাঙলা লিখতে জানে না। আচ্ছা, আপনার লেখা একটা ভাল পদ্য বলুন না।

ভাগি। দেখুন, আমি যে ভাল পদ্য লিখতে পারি এটা আপনার মুখ থেকে শুনলাম বলেই সত্য বলে বিশ্বাস হচ্ছে। এবং আপনার দাদার বন্ধুরা যা পারে না আমি তাই পারি, এ কথা প্রমাণ করবার জন্যে যদি আমাকে আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে হয় তাতেও আমি প্রস্তুত আছি—পদ্য লেখা তো দূরের কথা।

ঊষা। (সোল্লাসে) আচ্ছা, বেশ। তাহলে একটা বেশ ভাল—এই ভালবাসার পদ্য বলুন।

শৈলেন। ভাগিনেয়বাবু, কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আপনি যদি আর কোনও কবির কাব্য নিজের বলে এখানে চালিয়ে দেন, তাহলে তস্কর বলে আপনাকে সনাক্ত করবার ক্ষমতা আমাদের কারুর নেই—এক ঊষা ছাড়া, কিন্তু ঊষার ভাবগতিক দেখে বোধ হচ্ছে সে আপনাকে ধরিয়ে দেবে না।

ভাগি। কি করতে হবে বলুন? সকল রকম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্যে আজ আমি বদ্ধপরিকর।

শৈলেন। আপনাকে একটি ইংরিজী কবিতা তর্জমা করতে হবে।

ভাগি। বেশ কথা। কবিতা বলুন।

শৈলেন। ঊষা, বিষয় নির্বাচনের ভার তোমার ওপর। তুমি একটা কবিতা বল।

ঊষা। (কিছুক্ষণ ভাবিয়া তারপর লজ্জিত নতমুখে)

When we two parted
In silence and tears
Half broken-hearted
To sever for years—

তারপর আর—তারপর আর মনে পড়ছে না—

শৈলেন। Pale grew thy cheek and cold
Colder thy kiss
Truly that hour foretold
Sorrow to this!

ভাগি। কঠিন পরীক্ষা। আচ্ছা, কাগজ-কলম দিন।

পরি। ঘোড়ার ডিম। এইখানে বসে বসেই পদ্য লিখবে নাকি?

ভাগি। আজ্ঞে হ্যাঁ। ফটিক যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমুতে পারে তখন আমি বসে বসে পদ্য লিখব এ আর বিচিত্র কি?

ঊষা কাগজ পেন্সিল আনিয়া দিল ও উৎসুক হইয়া লিখনরত ভাগিনেয়ের প্রতি চাহিয়া রহিল...

ভাগি। হয়েছে। ঠিক যে বায়রণের যোগ্য হয়েছে তা বলতে পারি না—তবু, আচ্ছা শুনুন—

যখন মোরা দোঁহে বিদায় নিয়েছিনু
নীরব নীর-নত চোখে,
আধেক ভাঙা বুকে সুখের স্মৃতি লয়ে
সাঁঝের ম্লান দিবালোকে;
কপোল হল তব পাংশু হিমবৎ
অধর হল হিমতর,
তখনি জানিলাম সুখের বিভাবরী
পোহাবে ব্যথা জরজর।

ঊষা। (মুগ্ধভাবে ক্ষণকাল নীরব) চমৎকার হয়েছে। এমন কি ছন্দটি পর্যন্ত!

শৈলেন। ও কিছুই হল না,
Truly that hour foretold
Sorrow to this—ওর কি এই তর্জমা!

ঊষা। আপনি দাদার কথা শুনবেন না, সত্যিই ভারী সুন্দর হয়েছে।

ভাগি। (পরিতোষবাবুর দিকে ফিরিয়া) আপনি কি বলেন?

পরি। ও ইংরিজী বাঙলা কোনটারই ঘোড়ার ডিম কিছু মানে হয় না।

ভাগি। যাক, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সমালোচনা দুই ভাগে বিভক্ত, একজন বলছেন চমৎকার হয়েছে আর একজন বলছেন কিছুই হয়নি। এক্ষেত্রে যিনি কবি আমি তাঁর মন্তব্যটি গ্রহণ করলাম। কারণ শাস্ত্রে বলেছে, 'কবিতারসমাধুর্য্যং কবির্বেত্তি'—

শৈলেন। ঊষার মন্তব্য কিন্তু অন্য রকম হত যদি আপনি না লিখে আমার কোনো বন্ধু ঐ কবিতাটি লিখতেন।

ঊষা। (আরক্তিম হইয়া) তার মানে?

ভাগি। মানে অতি সহজ—কবিকে না জানলে তাঁর কাব্য বোঝবার সুবিধা হয় না। আপনি আমাকে জানেন বলেই এত সহজে আমার কবিতাটি উপভোগ করতে পারলেন। ধরুন, আপনাকে জানবার আগে যদি আমি আপনার 'অস্ফুট' নামক ঐ অপূর্ব কাব্য-গ্রন্থটি পড়তাম; হয়তো ভাল না বুঝতে পেরে, সম্যক রসগ্রহণ না করে আমি ওটির নিন্দা করতাম। কিন্তু সে সমালোচনা কি যথার্থ হত? কখনই না!

শৈলেন। আপনার যুক্তির মধ্যে একটুখানি গলদ রয়ে গেল। তা থাক, আমাকে এবার একবার উঠতে হবে, গোটা কয়েক চিঠি লেখা দরকার। মামা, তুমিও উঠছ নাকি?

পরি। ঘোড়ার ডিম হ্যাঁ। কোমরটাতে মালিশ করাতে হবে, সেই ব্যথাটা এখনো গেল না। দেখি ফটিক এলো কিনা।

(প্রস্থান করিলেন)

শৈলেন। ঊষা, ভাগিনেয়বাবু তাহলে তোমার জিম্মায় রইলেন। দুই কবিতে যত ইচ্ছা কাব্য-চর্চা হোক কিন্তু আমার বন্ধু বাঙলা লিখতে পারে না একথাটা ভবিষ্যতে আর বোলো না।

(নিষ্ক্রান্ত)

ঊষা ও ভাগিনেয় কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিল। ঊষার বুকের ভিতরটা দুরদুর করিতে লাগিল। এই লোকটির সহিত একলা থাকিলেই ঊষার ঐ রকম হয়।

ভাগি। কাল-পরশুর মত চলুন আজ বিকেলেও কোনও দিকে বেড়িয়ে আসা যাক।

ঊষা। (নিম্নস্বরে) আজ কোন্ দিকে যাবেন?

ভাগি। যেদিকে হয়। সোজা একটা রাস্তা ধরে শহর-বাজার পার হয়ে এমন কোথাও গিয়ে পৌঁছনো যাক যেখানে মানুষ নেই, গরু-ভেড়া নেই, শুধু আমি আর—শুধু দু'জন পথিক—

ঊষা। আর যদি বাঘ থাকে?

ভাগি। থাকুক বাঘ। বাঘ না থাকলে পথিক দু'জনের আনন্দ-যাত্রাপথে বৈচিত্র্য আসবে কোথা থেকে? বাঘ থাকাই চাই।

ঊষা। সেদিন দিঘড়িয়া পাহাড়ে বাঘের নামে কিন্তু বৈচিত্র্যের বদলে আতঙ্কই এসেছিল।

ভাগি। (কিছুক্ষণ সুখ-চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া) ওঃ—দিঘড়িয়া পাহাড়! চলুন, আজ সেইখানেই যাওয়া যাক।—আচ্ছা ঊষা—(বলিয়াই সহসা থামিয়া গিয়া) রাগ করলে নাকি? (ঊষা মাথা নাড়িল) আমি তোমার চেয়ে বয়সে অন্তত সাত আট বছরের বড়, তার ওপর তোমার দাদার—ইয়ে—সমবয়সী। আর আমাদের আলাপও হল প্রায়—ক'দিন হল ঊষা?

ঊষা। (মৃদুস্বরে) আজ নিয়ে ন'দিন।

ভাগি। ন'দিন! দু'দিন নয়, চারদিন নয়; এক হপ্তা নয়—পুরো ন'দিন! সুতরাং তোমাকে আমি ঊষা বলেই ডাকবো, আর 'আপনি' বলতে পারব না।—হ্যাঁ, কি কথা হচ্ছিল?

ঊষা। দিঘড়িয়া পাহাড়।

ভাগি। হ্যাঁ দিঘড়িয়া পাহাড়। চল, আজ সেখানেই যাওয়া যাক।

ঊষা। এত জায়গা থাকতে আজ সেখানে কেন?

ভাগি। সেখানে—আমার টুপি হারিয়ে গেছে খুঁজে দেখতে হবে।

ঊষা। (হাসিয়া) আপনার টুপি আর খুঁজে পাবেন না।

ভাগি। পাব না? বেশ, কিন্তু আর কিছু যদি হারিয়ে থাকে সেটা তো খোঁজা দরকার।

ঊষা। (আরক্তিম নতমুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) না, আমি ওখানে যাব না। আমার বড্ড ভয় করবে। কি জানি যদি ফের কোনও রকম দুর্ঘটনা হয়?

ভাগি। (অনেকক্ষণ ঊষার মুখের পানে তাকাইয়া থাকিয়া) সম্প্রতি তোমার ভাগ্যে একটা গুরুতর দুর্ঘটনা ছাড়া আর কোনও আশু বিপদ তো আমি দেখছি না?

ঊষা। (সকৌতুকে) আপনি হাত গুণতেও জানেন নাকি?

ভাগি। জানি বৈকি।

ঊষা। (করতল প্রসারিত করিয়া) কৈ, গুণুন দেখি আমার হাত। কি দুর্ঘটনা হবে শুনি!

ভাগি। (ঊষার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া পরীক্ষা করিয়া গম্ভীর ভাবে) শীগ্‌গির তোমার বিয়ে হবে—

ঊষা। (হাত টানিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া) যান!

ভাগি। তোমার দাদার এক বন্ধুর সঙ্গে—

ঊষা। (রাগ করিয়া) ছেড়ে দিন—আমার হাত দেখতে হবে না।

ভাগি। বেশ, ছেড়ে দিচ্ছি—(ঊষার করতলে একটি চুম্বন করিয়া হাত ছাড়িয়া দিল)

ঊষা। (ক্রন্দনোন্মুখী হইয়া) আর আমি আপনার সঙ্গে কখ্‌খনো—

ভাগি। কখ্‌খনো ছেলেমানুষী কোরো না। যেটা নিলাম ওটা গণৎকারের দক্ষিণা। —ঊষা, একটা ভারী গোপনীয় কথা তোমায় বলব?

ঊষা। আমি শুনতে চাই না—

ভাগি। তুমি না চাইলেও আমি বলবই।—ঊষা, আমাকে বিয়ে করবে?

ঊষা। যাও!

(ঊষা দু'হাতে মুখ ঢাকিল)

ভাগি। ঊষা—

ঊষা। যাও।

ভাগি। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) বারবার যাও বলছ? বেশ, চললাম। (দ্বার পর্যন্ত গিয়া) একটা গুরুতর অপরাধ স্বীকার করবার ছিল—তা আর হল না।

ঊষা। কি অপরাধ শুনি!

ভাগি। (ফিরিয়া আসিয়া) আগে বল আমায় বিয়ে করবে?

ঊষা। না।

ভাগি। করবে না?

ঊষা। না।

ভাগি। দু'বার না বললে। বারবার তিন বার বললেই বুঝব মনের কথা বলছ। বিয়ে করবে না?

(ঊষা নীরব। ভাগিনেয় দু'হাত ধরিয়া ঊষাকে জোর করিয়া তুলিল)

ভাগি। ঊষা—

ঊষা। আগে শুনি কি অপরাধ।

ভাগি। আগে বল রাগ করবে না।

ঊষা। আগে শুনি।

ভাগি। আচ্ছা বলছি। রাগ করলেও এখন তো আর কথা ফিরিয়ে নিতে পারবে না—বিয়ে করতেই হবে। ঊষা, আমার নাম ভাগিনেয় নয়, আমার নাম—বিজন বোস।

ঊষা। (বিস্ফারিত নেত্রে) তুমি—আপনি—তুমি আপনি—

ভাগি। তুমি—তুমি। 'আপনি' নয়।

ঊষা। তুমি—দাদার বন্ধু—

বিজন। হ্যাঁ। বলেছিলাম কিনা গণনা করে যে তোমার দাদার বন্ধুর সঙ্গে শীগ্‌গির তোমার বিয়ে হবে?

ঊষা। তুমি 'মন্দাকিনী'র—

বিজন। হতভাগ্য সম্পাদক।

ঊষা। যাও, তোমার সঙ্গে আর একটি কথাও কইব না।

বিজন। কথা কইবে না? তুমি জানো এই ক'দিনে আমি 'অস্ফুট' থেকে সমস্ত কবিতা আগাগোড়া মুখস্থ করে ফেলেছি। সত্যি বলছি ঊষা, তোমাকে যতদিন না চিনতাম ততদিন তোমার কাব্যের সৌরভ আমার প্রাণে গিয়ে পেঁছোয়নি। এখন বুঝতে পেরেছি, আধফুটন্ত অপরিণত প্রাণের কী তরল মধুর সীধু ঐ বইখানির মধ্যে ভরা আছে। শুনবে? আচ্ছা—'আশ্রয় যাচ্ঞা' কবিতাটি আবৃত্তি করছি—

ঊষা। (বিজনের মুখ চাপিয়া ব্যাকুলভাবে) না—না তুমি থামো—

(সহসা শৈলেনের প্রবেশ। ঊষা লজ্জায় জড়সড়)

শৈলেন। এ কি! কবি আর সমালোচকে দিব্যি ভাব হয়ে গেছে দেখছি যে!

বিজন। কবি এবং সমালোচকে যেখানে মিলন হয়, সে স্থান মহাপুণ্যতীর্থে পরিণত হয়—মানো কি না?

শৈলেন। নিশ্চয় মানি।

বিজন। ব্যস। আজ থেকে দেওঘরও এক মহাতীর্থ হল।

ঊষা। দাদা, কি দুষ্টু তুমি! আগে যদি জানতে পারতুম—তাহলে কিন্তু—

শৈলেন। (ঊষার গালে আঙুলের টোকা মারিয়া) আগে জানলে সমস্ত ভেস্তে যেত—না?—ঊষা, আমার সব বন্ধুরাই একদম রদ্দি—কি বলিস্?

ঊষা। (বিনতভুবনবিজয়ীনয়না) একদম রদ্দি!

শৈলেন। আমাকে একবার পোস্ট-অফিস যেতে হবে। বিজন, আসছ নাকি?

বিজন। তুমি এগোও। সামান্য একটু কাজ সেরে আমি এই এলাম বলে।

(শৈলেন প্রস্থান করিল)

বিজন। (ঊষার খুব কাছে গিয়া) সামান্য কাজটুকু সেরে নিতে পারি।

ঊষা। (বুকে মুখ গুঁজিয়া) না—

বিজন দুই আঙুলে দিয়া ঊষার চিবুক তুলিয়া ধরিয়া গভীর স্নেহদৃষ্টিতে ক্ষণকাল তাকাইয়া রহিল।

বিজন। পারি?

ঊষা চোখ খুলিল না, অনুমতিও দিল না। সহসা পরিতোষবাবু ঘরে প্রবেশ করিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া আবার দ্রুতবেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। অস্ফুটস্বরে কহিলেন—ঘোড়ার ডিম!

১৩৩৭

বিজয়ী

ননীগোপালের অন্তর্জীবনের গোপন ইতিহাসটি উদ্ঘাটিত করিতে গিয়া কেবলি ভয় হইতেছে, তাহার ভিতর ও বাহিরের এই বৈষম্য লোকের বিশ্বাসযোগ্য হইবে কিনা। প্রসন্ন হ্রদের গূঢ় তলদেশে যে সকল ভীষণ নক্র ঘুরিয়া বেড়ায় তীরে দাঁড়াইয়া তাহাদের কোনও সন্ধানই পাওয়া যায় না। ননীগোপালের সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ ও সুশ্রী কিশোর মুখখানা দেখিয়াও কেহ সন্দেহ করিত না যে কি দুর্জ্জয় দুর্বলতার সহিত সে অহরহ যুদ্ধ করিতেছে।

যে নক্রটি ননীগোপালের দেহ-মনের মধ্যে অটল আসন গাড়িয়া বসিয়াছিল তাহার নাম—ভয়। আহার, নিদ্রা, ভয় ইত্যাদি কয়েকটা বৃত্তি জীবমাত্রের পক্ষেই স্বাভাবিক বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাদের কবল হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পাইতে বড় একটা কাহাকেও দেখা যায় না। কিন্তু ননীগোপালকে ঐ ভয় বস্তুটি ছেলেবেলা হইতে একটু বিশেষ করিয়া চাপিয়া ধরিয়াছিল।

কি করিয়া কখন ইহার প্রথম উন্মেষ হইল তাহা বলা শক্ত। শিশু কখন তাহার একান্ত সহজ নির্ভীকতা বিসর্জন দিয়া বিড়াল দেখিয়া বা অন্ধকারে ভয় পাইতে আরম্ভ করে তাহা বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা নিশ্চয় বলিতে পারিবেন। আমার বিশ্বাস ননী মাতৃস্তন্য ও পিতৃরক্তের সহিত এই পরম পদার্থটি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিল। সে যাক্। শুধু ননীর মাতাপিতার অকারণ গ্লানি করিলে চলিবে কেন?

ননীর যখন সাত বৎসর বয়স তখন তাহাদের শহরে একটা সার্কাস আসিয়াছিল। ননীর পরম বন্ধু বিশু আসিয়া চুপিচুপি বলিল, ‘ননে, বাঘ দেখতে যাবি? সার্কাসে অনেক বাঘ এসেছে। এক পয়সা দিলেই দেখতে দেয়। তোর মা’র কাছ থেকে দুটো পয়সা নিয়ে আয়—দু’জনে দেখব।’

ননী উৎসাহে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, ‘আচ্ছা, এক্ষুণি আন্‌ছি।’

বিশু সাবধান করিয়া দিল, ‘বাঘের নাম করিসনি, তাহলে যেতে দেবে না। বলিস কাটি-বরফ খাব।’

পয়সা লইয়া দুই বন্ধু বাহির হইল। তারপর যথাসময়ে কাঁদিতে কাঁদিতে ননী একাকী বাড়ি ফিরিয়া আসিল। জননী ননীর কাপড়-চোপড়ের অবস্থা দেখিয়া প্রথমটা তাহাকে খুব ঠেঙাইলেন, তারপর সেই সন্ধ্যাবেলা স্নান করাইয়া দিলেন। জেরায় প্রকাশ পাইল যে একটা বাঘ ননীকে দেখিয়া গাঁক্ করিয়া শব্দ করিয়াছিল—তাহাতেই এই বিপত্তি।

ননীর জীবনে এই শেষ প্রকাশ্য লাঞ্ছনা, ইহার পর সে ভয় গোপন করিতে শিখিল।

কিন্তু ননীর প্রাণে আর সুখ রহিল না। যত তাহার বয়স বাড়িতে লাগিল ভীতিপ্রদ বস্তুর সংখ্যাও জগতে ততই অগণ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে এমনি হইল যে গুরুজনের সম্মুখে যাইতে তাহার পা কাঁপে, হেডমাস্টার মহাশয়ের মুখের পানে চোখ তুলিতে প্রাণ শুকাইয়া যায়। যে দিকে সে চোখ ফিরায় সেইদিকেই যেন একটা বিভীষিকা হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

যখন তাহার বয়স দশ বৎসর তখন একদিন সে স্কুল হইতে একাকী বাড়ি ফিরিতেছিল, এমন সময় পিছন হইতে কে তাহাকে ডাকিল। ননী ফিরিয়া দেখিল রতন। রতন ছেলেটা ননীর অপেক্ষা উঁচু ক্লাসে পড়ে বটে, কিন্তু সে প্যাঁকাটির মত রোগা এবং

অত্যন্ত পাজী। ননীর সহিত তাহার বড় সদ্ভাব ছিল না, তাহাকে আসিতে দেখিয়া তাহার বুকের ভিতরটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। একবার ভাবিল দৌড়িয়া পালায়। কিন্তু ভয়ের বাহ্য বিকাশ সে অনেকটা দমন করিয়াছিল, তাই পালাইল না, কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রতন কোনও প্রকার ভণিতা না করিয়া সটান বলিল, 'তোর এরোপ্লেনটা দে।'

ননী অনেক পরিশ্রম করিয়া বিস্তর মাথা খাটাইয়া একটি পিজ-বোর্ডের ছোট্ট এরোপ্লেন তৈয়ার করিয়াছিল। সেটিকে ছুঁড়িয়া দিলে ঘুরিতে ঘুরিতে উপরে উঠিত. আবার চক্রাকারে নামিয়া আসিত। এটির নির্মাণকার্য শেষ করিয়া আজ প্রথম সে স্কুলে আনিয়াছিল এবং চমৎকৃত বন্ধুবর্গের সম্মুখে এই অদ্ভুত যন্ত্রটির অত্যাশ্চর্য ক্রিয়া-কলাপ দেখাইয়া নিরতিশয় ঈর্ষা ও প্রশংসার পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল।

ননীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া রতন দাঁতমুখ খিঁচাইয়া বলিল, 'দিবিনে? শীগ্গির দে বল্‌ছি।

প্রবল রোদনোচ্ছ্বাস সম্বরণ করিয়া ননী বলিল, 'আমি তৈরী করেছি, আমি তোমাকে দোব কেন?'

'দিবিনে? আচ্ছা, দাঁড়া তবে—' বলিয়া রাস্তা হইতে একমুঠা ধুলা তুলিয়া লইয়া বলিল, 'এক্ষুণি চোখে ধুলো দিয়ে দোব, কানা হয়ে যাবি। ভাল চাস তো দে বল্‌ছি।'

ননী এরোপ্লেনটা রাস্তাব উপব ফেলিয়া দিয়া বিকৃত কণ্ঠে কহিল, 'এই নে—ভারী তো জিনিস! আবার আমি আর একটা তৈরী করে নোব।'

সেটা তুলিয়া লইয়া দাঁত বাহির করিয়া রতন বলিল, 'খবরদার বল্‌ছি, জিভ টেনে বার করব ফের যদি এরোপ্লেন তৈরী করিস। আমি একলা এরোপ্লেন ওড়াব আর কাউকে ওড়াতে দোব না!'—এই বলিয়া কাটির মত হাত-পা অঙ্গভঙ্গী সহকারে নাড়িতে নাড়িতে শিস্ দিতে দিতে রতন চলিয়া গেল।

ননী বাড়ি ফিরিয়া বইগুলা ফেলিয়া দিয়া বিছানায় মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল। শুধু যে এরোপ্লেনের শোকেই সে কাতর হইয়া পড়িয়াছিল তাহা নয়, দুর্বৃত্তের হাত হইতে নিজের সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য অন্যান্য ছেলের মত লড়াই করিবার ক্ষমতাও যে তাহার নাই, এই লজ্জাটাই তাহাকে সবচেয়ে বেশী পীড়া দিতে লাগিল।

এই সমস্ত ছোটখাটো ব্যাপার ছাড়াও ননীর পক্ষে সবচেয়ে ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইয়া-ছিল—সাহেব। কি করিয়া এই ভয়ের সৃষ্টি হইল বলা যায় না কিন্তু লাল মুখ কিম্বা সাদা চামড়া দেখিলেই ননীর মুখ শুকাইয়া তুলসীপাতা হইয়া যাইত, অকারণে বুকের ভিতর দুরদুর করিতে থাকিত। ননী নিজেকে বুঝাইবার চেষ্টা করিত ভয়ের কিছু নাই—সাহেব তাহাকে খাইয়া ফেলিবে না, কিন্তু কোনই ফল হইত না। কোন্ নীল-করের আমলের পূর্বপুরুষের রক্ত তাহার সমস্ত যুক্তিতর্ক ও বুদ্ধিবিবেচনাকে ভাসা-ইয়া দিত।

স্কুলের হেডমাস্টার যখন ননীর বাবাকে লিখিলেন,—ননীর মত শান্ত শিষ্ট নিরীহ ছেলে আমার স্কুলে আর নাই—আমি এ বৎসর উহাকে গুডকন্ডক্ট প্রাইজ দিব,—তখন ননী লজ্জায় ও আত্মগ্লানিতে যেন মরিয়া গেল। এই প্রাইজ যে তাহার আন্তরিক শিষ্টতার জন্য নয়, তাহার ভীরুতার, দুষ্কৃতি করিবার অক্ষমতার পুরস্কার, তাহা পরিষ্কার করিয়া না বুঝিলেও উহার সুতীক্ষ্ম লজ্জা তাহার বুকের মধ্যে বিঁধিয়া রহিল। নিজের যে দুর্বলতাকে সে অতিযত্নে লোকচক্ষু হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে, এই পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে উহা সকলের কাছে প্রকট হইয়া পড়িবে, কাহারও

জানিতে বাকী থাকিবে না, তাহা ভাবিয়া তাহার নিজের মাথাটা দেয়ালে ঠুকিয়া ছেঁচিয়া ফেলিবার ইচ্ছা হইল। সহিংসভাবে একটা কথা কেবলি তাহার মনে আনাগোনা করিতে লাগিল যে, প্রাইজ না পেয়ে যদি রত্নার মত মিশন স্কুলের ছেলেদের ঢিল মারার জন্যে বেত খেতুম তাহলে কত ভালই না হত?

এইভাবে ভয়সঙ্কুল ম্রিয়মাণ দিনগুলি ননীর কাটিতে লাগিল।

ননীর ষোল বছর বয়সে এমন একটা ঘটনা ঘটিল যাহাতে তাহার জীবনের উপর ধিক্কার জন্মিয়া গেল। আবার শহরে সার্কাস আসিয়াছে। এবার আর বাঘ দেখা নয়, স্কুলের ছেলেরা মিলিয়া আসল সার্কাস দেখিতে গেল। সেদিন ম্যাটিনে, স্কুলের ছেলেদের কনশেসন্ ছিল, তাই ননীরা কয়েকজন আট আনার টিকিট কিনিয়া এক টাকার চেয়ারে গিয়া বসিল। ননী একটা ভাল জায়গা দেখিয়া দল ছাড়িয়া একটু আলাদা হইয়া বসিল।

সার্কাস আরম্ভ হইতে আর দেরী নাই, দর্শকদের বসিবার স্থান সব ভরিয়া গিয়াছে, এমন সময় একজন ছোকরা সাহেব প্যাণ্টালুনের পকেটে দুই হাত পুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ননীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'এই, ওঠ। এটা আমার জায়গা।'

ননী ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। সাহেব চেয়ারের পিঠে একটা নাড়া দিয়া বলিল, 'শুনতে পাচ্ছ? এটা আমার চেয়ার—ওঠ।'

ননীর মুখে তবু কথা নাই; তাহার গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে।

সাহেব তখন ঘাড়ের জামা ধরিয়া ননীকে তুলিয়া দিয়া নিজে চেয়ারটা অধিকার করিয়া বসিল।

সমস্ত পৃথিবী ননীর চক্ষে অন্ধকার হইয়া গেল। আচ্ছন্নভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে হোঁচট খাইতে খাইতে বাহিরের দিকে চলিল।

সার্কাসসুদ্ধ লোক চক্ষু মেলিয়া এই দৃশ্যাভিনয় দেখিতেছিল। বিশু ননীর কামিজ ধরিয়া টানিয়া চাপা গলায় বলিল, 'ছেড়ে দিলি—কিছু বল্লি নে? আমি হলে—'

বিমল নিজের চেয়ারের একপাশে সরিয়া বসিয়া বলিল, 'আয় ননী, এইখানে বস।'

ননী অতিকষ্টে গলা হইতে আওয়াজ বাহির করিল, 'না, আমি বাড়ি যাই।'

সে-রাত্রে ননী ঘুমাইতে পারিল না। গভীর রাত্রে একবার তাহার ইচ্ছা হইল, চীৎকার করিয়া কাঁদে। কিন্তু বালিশ কামড়াইয়া অনেক কষ্টে সে ইচ্ছা রোধ করিল। হঠাৎ একবার বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া ঘরের কোণ হইতে হকি-স্টিকখানা তুলিয়া লইয়া দুই হাতে মড়াৎ করিয়া ভাঙিয়া দু'খানা করিয়া ফেলিল। নিজের মনে পাগলের মত বলিতে লাগিল, 'কেন আমি এমন—কেন আমি এমন? ভীতু—ভীতু!' উঃ! সবাই দেখলে। সবাই হাসলে! কাল স্কুলে যাব কি করে?'

এই ঘটনার পর ননী যেন কেমন এক রকম হইয়া গেল, যেন কচ্ছপের মত নিজেকে নিজের মধ্যে গুটাইয়া ফেলিল। বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তা হাসি-গল্প প্রায় বন্ধ করিয়া দিল। সর্বদা একলা ঘুরিয়া বেড়ায় এবং নিজের মনে বিজবিজ করিয়া কি বকে!

বিমল একদিন লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'দ্যাখ্, ননেটা কি রকম হয়ে গেছে—কথাও কয় না।'

বিশু বিজ্ঞভাবে বলিল, 'একজামিনের পড়া পড়ছে, তোর মত ফাঁকিবাজ তো নয়! ওর বাবা বলেছেন ফার্স্ট হয়ে সেণ্ট আপ্ হতে পারলে একটা সোনার রিস্ট ওয়াচ দেবেন।'

বিশুর অনুমান কিন্তু সর্বৈব ভুল। ননী রিস্ট ওয়াচের লোভে পড়া মুখস্থ করিত না। সে বিড়বিড় করিয়া কেবলি বকিত—আমি ভীতু নই! আমার সাহস আছে! আমি

কাউকে ভয় করি না। এবার যে আমার সঙ্গে চালাকি করবে তাকে দেখে নেব। ইত্যাদি। যেন খাঁচার পাখি। নিরন্তর ব্যগ্র ব্যাকুল হইয়া খোলা আকাশের মুক্তি-মন্ত্র জপ করিতেছে।

মাসখানেক পরে একদিন বিশু আসিয়া বলিল, 'ননী, মাঠে চল্, আজ মিশন স্কুলের সঙ্গে আমাদের ম্যাচ আছে।'

জনসঙ্ঘ বা যেখানে অনেক লোকের সমাবেশ সেখানে যাইতেও ননী মনে মনে ভয় পাইত। তাই সে জোর করিয়া বলিল, 'আচ্ছা, চল।'

মাঠে ভীষণ ভিড়। অন্যান্য দর্শক ছাড়াও দুই স্কুলের ছেলেরা দলে দলে আসিয়া মাঠ ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। ফুটবল খেলায় এই দুই স্কুলে চিরদিন ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়া আসিতেছে। কোন্ স্কুল বেশী ভাল খেলে তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আজ পর্যন্ত হয় নাই এবং শেষ পর্যন্ত কবে হইবে তাহা বলিবার ক্ষমতা বোধ করি ত্রিকালজ্ঞ মুনি ঋষিদের পর্যন্ত নাই।

খেলা আরম্ভ হইল। দুই পক্ষের দর্শকই নিজ নিজ খেলোয়াড়দের কখনো ভৎর্সনা-পূর্ণ উগ্রকণ্ঠে, কখনো মিনতিভরা করুণস্বরে উৎসাহিত করিতে লাগিল। কিন্তু যুযুৎসু দুই দলই সমান দুর্ধর্ষ—কেহই গোল দিতে পারিল না। খেলা দেখিতে দেখিতে দর্শকবৃন্দ ভীষণ উত্তেজিত ও ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিল।

শেষে খেলা সমাপ্ত হইতে যখন আর মিনিট পাঁচেক বাকী আছে তখন ননীদের স্কুল একটা গোল দিল। 'গোল' 'গোল' শব্দে আকাশ বিদীর্ণ করিয়া ছাতা জুতা প্রভৃতির উৎক্ষেপ দ্বারা এই বিজয় কাণ্ডের আনন্দ নির্ঘোষিত হইল।

ননী যেখানে দাঁড়াইয়া খেলা দেখিতেছিল, তাহারই পাশে একটা বছর আটেকের ছেলে লাফাইয়া নাচিয়া ডিগ্‌বাজী খাইয়া চীৎকার করিতেছিল,—'গোল! গোল! হুররে! আমার দাদা গোল দিয়েছে। হুররে! গোল! গোল! খেলা আবার আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, তখনো ছেলেটা অক্লান্তভাবে চেঁচাইয়া চলিয়াছে।

তাহার কাছে দাঁড়াইয়া মিশন স্কুলের একটি ফিরিঙ্গি ছেলে খেলা দেখিতেছিল। গোল খাইবার পর সে বিশেষ একটু মুষড়িয়া গিয়াছিল, তাহার উপর এই পুঁটে ছেলেটার উৎকট আনন্দ তাহার অসহ্য বোধ হইল। সে ছেলেটার চুলের মুঠি ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া বলিল, 'এই, চুপ কর্—পাজী কোথাকার!'

ছেলেটা তাহার উদ্দাম উল্লাসে হঠাৎ বাধা পাইয়া আরও জোরে চেঁচাইয়া উঠিল, 'অ্যাঁ—অ্যাঁ—আমায় মারছে—'

ফিরিঙ্গি ছেলেটি আচ্ছা করিয়া তাহার কান মলিয়া দিয়া বলিল, 'চুপ কর্—নইলে এক কিক্ মেরে তোকে ঐ গাছের ডগায় তুলে দেব।'

পুঁটে ছেলেটার সাঙ্গোপাঙ্গ বোধ হয় সেখানে কেহ ছিল না, তাই সে ননীকে দেখিতে পাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'ও ননীদা, দেখ না, আমায় মারছে—'

ননীর মনে হইল, তাহার গলাটা যেন কে চাপিয়া ধরিয়াছে—বুকের ভিতর অসম্ভব রকম ধড়ফড় করিতে লাগিল। মুখ একেবারে ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল।

সে কম্পিতস্বরে বলিল, 'ওকে ছেড়ে দাও—ঐটুকু ছেলেকে মারছ কেন?'

ফিরিঙ্গি ছেলেটি মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, 'ঐটুকু ছেলে? পাজী বজ্জাত রাস্কেল কোথাকার!' বলিয়া ছেলেটার মাথায় এক গাঁট্টা বসাইয়া দিল। ছেলেটা তারস্বরে কান্না জুড়িয়া দিল।

খেলার দিকেই তখন সকলের বাহ্যেন্দ্রিয় নিবিষ্ট হইয়াছিল, এদিকের এই পার্শ্বা-ভিনয় কেহ লক্ষ্য করিল না।

ননী অস্বাভাবিক একটা তর্জন করিয়া কহিল, 'ছেড়ে দাও বলছি, নইলে ভাল হবে না।'

রোদন-রত ছেলেটাকে ছাড়িয়া দিয়া ফিরিঙ্গি ছেলেটি ননীর মুখের খুব কাছে মুখ আনিয়া বলিল, 'লড়তে চাও? আচ্ছা—চলে এস!'

কি করিয়া যে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল তাহা ননীর ঠিক মনে নাই। হঠাৎ সে দেখিল সে ফিরিঙ্গি ছেলেটির সহিত দারুণ লড়াই শুরু করিয়া দিয়াছে।

মুহূর্ত মধ্যে তাহাদের ঘিরিয়া একটা চক্র রচনা হইয়া গেল এবং যাহারা ফুটবল খেলা দেখিতেছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে এই নূতন খেলা দেখিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

ফিরিঙ্গি ছেলেটি বোধ হয় মুষ্টিযুদ্ধ কিছু কিছু জানিত, তাই প্রথম হইতেই ঘুষি চালাইয়া ননীর নাক মুখ ভাঙ্গিয়া দিবার উপক্রম করিল। ননী কিন্তু মরিয়া হইয়া লাগিয়া রহিল। দু'জনের বয়স প্রায় সমান—শরীরও সমান বলবান বলিয়া বোধ হয়। লড়াই বেশ জমিয়া উঠিল।

ননী একবার লেঙ্গি দিয়া প্রতিপক্ষকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিল এবং তাহার মুখে মাথায় অপটু হস্তে কিল মারিয়া তাহাকে কাবু করিবার চেষ্টা করিল। ফিরিঙ্গি ছেলেটি কিন্তু ননীকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাতে ঘুষি চালাইয়া ননীর পেট ও মুখ থেঁতো করিয়া দিতে লাগিল। ননীর অবস্থা যায় যায় হইয়া উঠিল!

কিন্তু ননীর মনে ভয়ের লেশমাত্র নাই— সে তখন যুদ্ধের উল্লাসে মাতিয়া উঠিয়াছে! হারজিত যে অতি গৌণ ব্যাপার,—যুদ্ধটাই যে চরম সার্থকতা—এই মহৎ সত্য ননীর শিরায় শিরায় তখন নৃত্য শুরু করিয়া দিয়াছে।

হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড লাফ দিয়া ননী ফিরিঙ্গি ছেলেটির একেবারে ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িল এবং দুই হাতে তাকে ভাল্লুকের মত চাপিয়া ধরিয়া পিষিতে আরম্ভ করিল। ধৃতরাষ্ট্র যেমন করিয়া লৌহভীম চূর্ণ করিয়াছিল এ যেন কতকটা তাই!

ফিরিঙ্গি ছেলেটি আর ঘুষি চালাইতে না পারিয়া প্রাণপণে ননীর আলিঙ্গনমুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ননী তখন তাহার সর্বাঙ্গে আঠার মত লেপ্‌টাইয়া গিয়াছে। তাহার বাহুবন্ধন ক্রমেই দৃঢ়তর হইতেছে।

ক্রমশ ফিরিঙ্গি ছেলেটির মুখ নীলবর্ণ হইয়া উঠিল। সে বন্ধনমুক্ত হইবার একটা শেষ চেষ্টা করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, 'হয়েছে, এবার ছেড়ে দাও—pax—শান্তি!'

ননী ছাড়িয়া দিতেই দু'জনে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিল।

প্রথমে ফিরিঙ্গি ছেলেটি হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল, 'তোমার গায়ে খুব জোর তো! বক্সিং জান্‌লে কোন্ কালে তুমি আমায় হারিয়ে দিতে।'

ননী তাহার সহিত শেকহ্যাণ্ড করিয়া উৎফুল্ল ভাবে বাংলা ইংরাজীতে মিশাইয়া বলিল, 'তুমি খুব ভাল বক্সিং জানো—না? উঃ, কি কিলটাই মেরেছ—এই দেখ ঠোঁট কেটে গেছে।'

ফিরিঙ্গি ছেলেটি হাসিয়া বলিল, 'তুমি শিখবে? আমি ভাল জানি না বটে কিন্তু তোমাকে শেখাতে পারব।'

ননী মহা আগ্রহে বলিল, 'হ্যাঁ, শিখব। কাল থেকেই তাহলে—হ্যাঁ—কি বল?'

'আচ্ছা।'

'তোমার নাম কি? আমার নাম ননী—ননী গাঙ্গুলী।'

'আমার নাম ডিক্—ডিকি ফ্রাঙ্ক্‌লিন।'

ডিক্ চলিয়া গেলে পর ননীর বন্ধুবান্ধব ননীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ফুটবল ম্যাচ তখন শেষ হইয়া গিয়াছে।

বিশু সগর্বে তাহার পিঠ ঠুকিয়া বলিল, 'সাবাস খলিফা, হিম্মৎ দেখিয়েছিস বটে! আমি বরাবরই জানি ননেটা চুপচাপ থাকে বটে কিন্তু তেতরে ভেতরে ও একটা আসল গুণ্ডা! এঃ—ননী, চোখটা একেবারে বুজে গেছে যে!'

ননী একটিমাত্র দৃষ্টিক্ষম চক্ষু ও পটলের মত স্ফীত ওষ্ঠপুট লইয়া একগাল হাসিয়া বলিল, 'ও কিছু নয়— কালই সেরে যাবে। ডিক্ কিন্তু বেশ ছেলে—না?'

সেদিন হল্লা করিতে করিতে, গান গাহিতে গাহিতে বাড়ি ফিরিবার পথে ননী জীবনে প্রথম পরিপূর্ণ মুক্তির আস্বাদ পাইল। যে রাক্ষসটা এতদিন তাহাকে মুঠির মধ্যে পিষিয়া মারিবার উপক্রম করিয়াছিল, আজ স্বহস্তে সেই রাক্ষসকে বধ করিয়া যেন বিজয়ীর ললাটিকা পরিয়া সে বাড়ি ফিরিল।

১৩৩৮

দুই দিক্

তিন বন্ধুতে রাত্রির আহার শেষ করিয়া বৈঠকখানার ফরাসের উপর গড়াইতেছিলেন। মস্ত ধুনুচির মত একটা কলিকায় সুগন্ধি খাম্বিরা তামাক বাতাসকে সুরভিত করিয়া তুলিতেছিল। যদিও তিন বন্ধুর মধ্যে দুইজন কায়স্থ এবং একজন ব্রাহ্মণ, তবু একই গড়গড়ায় সকলের ধূমপান চলিতেছিল।

তিনজনেরই বয়স হইয়াছে—চল্লিশের কাছাকাছি। সকলেই কলিকাতার বাসিন্দা। বিনোদ একজন বড় ডাক্তার—গত দশ বৎসরে বেশ পসার জমাইয়া তুলিয়াছেন। অতুল ও শরৎ উকিল; অতুল আলিপুরে এবং শরৎ হাইকোর্টে প্র্যাক্‌টিস করেন। ইঁহারাও স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে বেশ নাম করিয়াছেন। যে যাহার কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকেন, তাই কাছাকাছি থাকিয়াও সচরাচর দেখাসাক্ষাৎ ঘটিয়া উঠে না। আজ স্ত্রীর কি একটা ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষে শরৎ দুই বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। দিনের বেলা আসিবার সুবিধা হয় নাই বলিয়া দুইজনেই সন্ধ্যার পর অবসরমত আসিয়া জুটিয়াছেন।

নানারকম কথাবার্তার ভিতর দিয়া নিজ নিজ কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার কথা অজ্ঞাতসারে উঠিয়া পড়িয়াছিল। অতুল তাকিয়ার উপর কনুইটা ভাল করিয়া স্থাপন করিয়া মুদ্রিত-নেত্রে গড়াগড়ার নলে লম্বা একটা টান দিয়া বলিলেন, "যতই এই পেশার

ভেতর ঢুকছি, ততই যেন মনে হচ্ছে, দয়া মায়া ধর্ম—এ সব পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেছে। শুধু কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছিঁড়ি। বেশী দিন এ পথে থাকলে বোধ হয় অন্যায়-ন্যায়ের প্রভেদটাও মন থেকে মুছে যায়। খালি কি করে মকদ্দমা জিতব, সেই চিন্তাই সব চেয়ে বড় হয়ে ওঠে।"

শরৎ ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, "তা ঠিক, আদালতে মনুষ্য-প্রকৃতির মন্দ দিক্-টাই বেশী চোখে পড়ে। ভাল যে থাকতে পারে, এ বিশ্বাসটা ভালর অসাক্ষাতে কম-জোর হয়ে আসে। মনে হয় ঠগ বাছতে বুঝি গাঁ উজোড় হয়ে যাবে।"

অতুল বলিলেন, "শুধু মনে হওয়া নয়, সত্যিই তাই। তোমাদের কি ধারণা জানি না, আমার তো বিশ্বাস, কৃতজ্ঞতা বলে যে একটা সদ্‌গুণের কথা কাব্যে-উপন্যাসে পড়া যায়, সেটা পৃথিবী থেকে বেবাক্ লুপ্ত হয়ে গেছে।"

বিনোদ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমরা সব বেজায় সিনিক হয়ে পড়েছ, ওটা ঠিক নয়। মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো ভাল নয়, তাতে নিজেরই বেশী লোকসান।"

অতুল বলিলেন, "লাভ-লোকসান বুঝি না ভাই—যা দেখেছি, তাই বল্লুম। কৃতজ্ঞতা পাই না বলে আজকাল আর রাগও হয় না। ম্যামথ হাতীর জাত ধ্বংস হয়ে গেছে বলে যেমন শোক করা বৃথা, এও তাই। সত্যটাকে সহজ ভাবে স্বীকার করে নেওয়া মাত্র—"

শরৎ হঠাৎ বলিলেন, "একটা গল্প মনে পড়ল। এমন তো কতবারই হয়েছে, যার উপকার করেছি, সে জবাবে বেশ একটু খোঁচা দিয়ে গেছে। কিন্তু এই ঘটনাটা কি জানি কেন প্রাণের মধ্যে বিঁধে আছে।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "মাঝে আমার চরিত্র খারাপ হয়েছিল, জানো বোধ হয়?"

অতুল বলিলেন, "হুঁ, শুনেছিলাম বটে। কে যেন বল্লে—আজকাল শরৎবাবু যে খুব উড়ছেন। আমি বল্লুম, আজকাল তো ওড়ারই যুগ, শরৎ অন্যায় কি করেছে? তোমার পয়সা থাকে, তুমি ওড়ো।"

বিনোদ হাসিয়া বলিলেন, "আমার কানেও এসেছিল কথাটা। নাম করব না, কিন্তু এমন পারিপাট্য বর্ণনাটি দিলে যে, বিশ্বাস না করা কঠিন। নেহাত আমি বলেই—"

শরৎ বলিলেন, "তোমরা দু'জন আর আমার স্ত্রী ছাড়া বোধ হয় এমন আর কেউ নেই যে কথাটা ধ্রুবজ্ঞান করেনি; এমন কি, অনেক পেশাদার ইয়ারও স্ফূর্তির লোভে আমার দলে ভিড়ে যাবার মতলবে ছিল। ভাবলে, একটা শাঁসালো নতুন কাপ্তেন পাক্ড়েছি।"

অতুল জিজ্ঞাসা করিলেন, "হয়েছিল কি?"

শরৎ একটু হাসিয়া বলিলেন, "একজনের উপকার করেছিলুম। ব্যাপারটা খুবই তুচ্ছ—শুনে হয়তো হাসবে।

"অতুল, তুমি তো নিতাইকে চেন। আলিপুর বারে প্র্যাক্টিস করে—জুনিয়ার উকিল। নেহাত জুনিয়ারও বলা চলে না, বছর দশ-বারো ধরে প্র্যাক্টিস করছে। নিতাই আমার দূরসম্পর্কে আত্মীয় হয়।

"নিতাইদের অবস্থা আগে ভালই ছিল—তার বাপ মোটা মাইনের চাকরি করতেন। কিন্তু তিনি মারা যাবার পর থেকেই ওদের দৈন্যের দশা ধরল। সংসারে উপার্জনক্ষম লোকের মধ্যে ঐ এক নিতাই—সে সবে ওকালতীতে ঢুকেছে। কাজেই আর্থিক অবস্থাটা যে কি রকম দাঁড়াল, তা না বল্লেও বুঝতে পারছ।

"আত্মীয়তা থাকলেও ওদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বেশী ছিল না, ক্বচিৎ কখনো

বিয়ে-পৈতেয় দেখাশুনো হত, এই পর্যন্ত। বছর তিনেক আগে আমার বোন শান্তার ছেলের অন্নপ্রাশনে শালকেয় গিয়েছিলুম, সেখানে নিতাইয়ের সঙ্গে দেখা হল। অনেক দিন দেখিনি, হঠাৎ দেখে যেন চমকে উঠলুম। নিতাইয়ের মুখে দারিদ্র্যের একটা ছাপ পড়ে গেছে। ছোকরা দেখতে বেশ সুপুরুষ, রং ফরসা—কিন্তু দারুণ অর্থের অনটন যেন তার মুখময় কালি আঁচড় টেনে দিয়েছে। চোখে সর্বদাই একটা ত্রস্ত সঙ্কোচের ভাব—লজ্জাকর কোনও কথা যেন লোকের কাছ থেকে লুকোতে চায়।

"আমাকে এসে প্রণাম করলে। জিজ্ঞেস করলুম, 'কি রে, কেমন আছিস?' বল্লে, 'ভাল আছি।' আমি বল্লুম, 'ওকালতী চলছে কেমন—' সে চুপ করে রইল।

"মনে বড় অনুশোচনা হল। সম্পর্ক যতই দূর হোক, নিতাই আমার আত্মীয় তো বটে। চেষ্টা করলে তার কিছু উপকার কি করতে পারতুম না? এই ছেলেটা সংসার-যুদ্ধে অভিমন্যুর মত একলা লড়াই করে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়েছে, আর আমি নিজের কাজে এতই মত্ত যে, তার দিকে একবার ফিরে তাকাবার ফুরসৎ নেই?

"মনে মনে ঠিক করলুম, নিতাইয়ের জন্যে একটা কিছু করতে হবে। কিন্তু তার আগে কোথায় তার সব চেয়ে বেশী ব্যথা, সেটা জানা দরকার। ফস্ করে উপকার করতে গেলেই তো আর হবে না। মান-সম্ভ্রম বজায় রেখে যাতে তার সত্যিকারের সাহায্য হয়, এমন কাজ করা চাই।

"সেখানে আর কেউ ছিল না; কৌশলে নিতাইকে জেরা করতে আরম্ভ করলুম। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দু'চারটে কথা জিজ্ঞেস করতে না করতে নিতাই তার অভাব-অনটনের সব কথা প্রকাশ করে ফেললে। খুব জোর করে চেপে রাখতে চেয়েছিল বলেই বোধ হয় হঠাৎ ফেটে বেরিয়ে পড়ল।

"শেষে বল্লে, 'আর কিছু নয় শরৎদা—মক্কেলও মাঝে মাঝে আসে, কাজও যে নেহাৎ মন্দ করি, তা নয়। কিন্তু একটা জিনিসের অভাবে সব যেন নষ্ট হয়ে যায়। বই নেই! তুমিই বল, নিজের বই না থাক্‌লে কি ওকালতী করা চলে? প্রত্যেক রুলিংএর জন্যে যদি বার-লাইব্রেরীতে দৌড়ুতে হয়, তাহলে ওকালতী করা বিড়ম্বনা নয় কি? যে মক্কেল একবার আসে, আমার অবস্থা দেখে আর দ্বিতীয়বার আসে না। বেশী আর কি বলব তোমাকে, একখানা ভাল সিভিল প্রসিডিওর যে কিনব, সে ক্ষমতা নেই—এক দমে ৩০/৩৫ টাকা কোত্থেকে খরচ করব? পেটে খেতে হবে তো!'

"আমি বল্লুম, 'বই পেলেই তুই চালিয়ে নিতে পারবি?'

"উৎসুক হয়ে সে বল্লে, 'মনে তো হয় পারব, তবে বলতে পারি না, আমার যা পাথর-চাপা কপাল।'

"আমি বল্লুম, 'আচ্ছা, কি কি বই তোর চাই, একটা লিস্ট করে দিস, আমি পাঠিয়ে দেব।'

"তার চোখে জল এসে পড়ল, কাঁদো কাঁদো হয়ে বল্লে, 'শরৎদা, এ উপকার যদি তুমি কর—কখনো ভুলব না।'

"সেদিন ঐ পর্যন্ত হয়ে রইল।

"পরদিন নিতাইয়ের কাছ থেকে মস্ত এক বইএর তালিকা এসে হাজির। Eastern Law House এর দোকানে লিস্টখানা পাঠিয়ে দিলুম, আর উপদেশ দিয়ে দিলুম, বইগুলো নিতাইয়ের নামে পাঠিয়ে দিয়ে আমার নামে বিল করতে। প্রায় আটশ' টাকার বিল হল।

"তার পর কাজের ঠেলায় নিতাইয়ের কথা একদম ভুলে গেছি। হঠাৎ দিন পনেরো পরে একদিন মনে পড়ল, কৈ, নিতাইয়ের কাছ থেকে বইগুলোর প্রাপ্তিসংবাদ তো

পাইনি। Eastern Law House কে ফোন করলুম—তাঁরা উত্তরে জানালেন যে, বই অনেক দিন আগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে—নিতাইবাবু তার রসিদ পর্যন্ত দিয়েছেন। আধঘণ্টা পরেই দোকানের চাকর এসে নিতাইয়ের রসিদ দেখিয়ে গেল।

"ভাবলুম কি হল! নিতাই নিশ্চয়ই চিঠি দিয়েছে—তবে কি চিঠি ডাকে আসতে মারা গেল? যা হোক নিতাই যখন বই পেয়েছে, তখন ও নিয়ে আর বেশী মাথা ঘামালুম না!

"এর মাস দুই পর থেকে নানা রকম কানাঘুষা বাঁকা-ইসারা আমার কানে আসতে লাগল। প্রথমটা গ্রাহ্য করিনি, কিন্তু ক্রমে আন্দোলনের মাত্রাটা এতই বেড়ে উঠল যে, আমার স্ত্রী একদিন হাসতে হাসতে আমায় বল্লেন—'হ্যাঁগো, এ সব কি শুনছি—তুমি নাকি বুড়ো বয়সে বাগানবাড়ি যেতে আরম্ভ করেছ?'

"—'তুমি কোত্থেকে শুনলে?'

'আজ সন্ধ্যেবেলা হীরালালবাবুর স্ত্রী বেড়াতে এসেছিলেন; কত সহানুভূতি জানিয়ে গেলেন।'

"স্থির করলুম, আর উপেক্ষা করা নয়, কোথা থেকে এই কুৎসার উৎপত্তি তার সন্ধান নিতে হবে। মনে মনে ভারি একটা বিতৃষ্ণা অনুভব করতে লাগলুম। আমি তো কারুর সাতেও নেই পাঁচেও নেই, জ্ঞানতঃ কারুর ইষ্ট বৈ অনিষ্ট করিনি, তবে আমার নামে এই সব মিথ্যে কলঙ্ক রটিয়ে লোকের লাভ কি?

"পরদিন বিকেলবেলা ঘটনাচক্রে নিতাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সেই শালকেয় শান্তার বাড়ির পর আর তাকে দেখিনি। ফুটপাথ দিয়ে যাচ্ছিল, আমাকে সামনে দেখে যেন ভূত দেখার মত চমকে উঠল। তার পর আমি কোন কথা বলবার আগেই হঠাৎ পিছু ফিরে যেন আমার সামনে থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।

"কিছুই বুঝতে বাকী রইল না। বুকের ভেতরটা যেন বিষিয়ে উঠল। বাড়ি ফিরে এলুম।

"কি মজা দেখ! যতদিন নিতাইয়ের কোন উপকার করিনি, ততদিন সে আমার সম্বন্ধে ভাল-মন্দ কোন কথাই বলেনি, আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন নির্লিপ্ত ছিল, কিন্তু যেই আমি তার এতটুকু উপকার করেছি, অমনি সে আমার নামে কলঙ্ক রটাতে শুরু করেছে।

"সে যাক। নিতাই যে এ কাজ করেছে, তাতে আর সন্দেহ ছিল না, কিন্তু তবু সাক্ষাৎ প্রমাণ না নিয়ে শুধু তার ডিমিনারের ওপর নির্ভর করে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা চলে না। আমি রীতিমত অনুসন্ধান আরম্ভ করলুম।

"জানতে পারলুম, এই রটনা সম্বন্ধে একজন ছোকরা-উকিলের উৎসাহ সব চেয়ে বেশী—তার নাম কেশব মিত্তির। কেশবকে একদিন বার-লাইব্রেরীতে ধরলুম। আরো অনেকেই সেখানে ছিল, আমি বল্লুম, 'কি হে, কাজটা কি ভাল হচ্ছে? ওকালতী করতে ঢুকেছ, পেনাল কোডের শেষের দিকে পাতা কটা কি উল্টে দেখনি?'

"কেশব ফ্যাকাসে মুখ করে বল্লে, 'কি......কি বলছেন?'

"আমি বল্লুম, 'বলছি আমার নামে যে কুৎসা করে বেড়াচ্ছ, এর পরিণাম কি হতে পারে, তা কি ভেবে দেখনি?'

"কেশব রীতিমত ভয় পেয়ে বল্লে, 'তা আমি কি করব? আপনার নিজের আত্মীয় যদি বলে, আমার কি দোষ? আমি তো নিজের চোখে কিছু দেখিনি।'

"আমি তাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'নিতাই বলেছে?'

"সে বল্লে, 'হ্যাঁ।'

"—'শুধু শুধু বল্লে, না কোনও উপলক্ষ হয়েছিল?'

"কেশব বল্লে, 'নিতাই আমার বন্ধু। সেদিন তার বাড়ি গিয়ে দেখলুম, আপনি কতকগুলো বই তাকে উপহার দিয়েছেন। আমার সামনেই বইগুলো দোকান থেকে এলো। নিতাই হেসে বল্লে, 'বইগুলো ঘুষ।' সে না কি আপনাকে কোথায় যেতে দেখেছে, তাই আপনি তার মুখ বন্ধ করবার জন্যে—'

"এই তো ব্যাপার! কেশবকে আর কিছু বলতে পারলুম না। আমি শুধু নিতাইয়ের কথা ভাবতে ভাবতে ফিরে এলুম।"

অনেকক্ষণ তিনজনেই চুপ করিয়া রহিলেন।

শেষে বিনোদ একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন "হুঃ! দুনিয়ায় কত রকম বিচিত্র জীবই আছে! আমি একটা ঘটনা বলি শোন। অনেক দিনের কথা, তখন সবে ডাক্তারি আরম্ভ করেছি।

"মেছোবাজার আর বাদুড়বাগানের মোড়ে একটা ছোট ডিস্‌পেন্সারী খুলেছিলুম, নীচের তলায় ডিস্‌পেন্সারী আর উপরে দুটো ঘর নিয়ে আমি থাকি। তখনও বিয়ে করিনি। সমস্ত দুনিয়াটা পায়ের কাছে পড়ে আছে। আমি যেন রূপকথার এক রাজপুত্র, কোথাকার ঘুমনগরীর রাজপ্রাসাদে ঢুকে কোন্ রাজকন্যাকে বুকে তুলে নেব কে জানে? অজানা ভবিষ্যের কুয়াসায় ঢাকা একটা মনোহর রহস্য যেন কৌতুকবশেই ধরা দিচ্ছে না! ছলনাময়ী তরুণী প্রিয়ার মত ধরতে গেলেই হেসে পালিয়ে যাচ্ছে। সে এক দিন ছিল, কি বল অতুল—অ্যাঁ?

"সে যা হোক। দিনগুলো দিব্যি কেটে যাচ্ছে। ডিস্‌পেন্সারীও মন্দ চলছে না, এমন সময় একদিন মাড়োয়ারীদের সঙ্গে মুসলমানদের দাঙ্গা বেধে গেল। বলা নেই কওয়া নেই, হিন্দু-মুসলমান একদিন সকালবেলা উঠে পরস্পরের গলা কাটতে শুরু করে দিল।

"সে বীভৎসতার সবিস্তার বর্ণনা করবার কোনও দরকার দেখি না, তোমরাও তো সে সময় কলকাতায় ছিলে, অল্প-বিস্তর দেখেছ। আমার ডিস্‌পেন্সারীর সামনে গোটা তিনেক খুন হয়ে গেল, চোখে চেয়ে দেখলুম, কিন্তু কিছু করতে পারলুম না। মুসলমানের পাড়া—আমি হিন্দু; এ রকম অবস্থায় নিজের হিন্দুত্বকে যথাসাধ্য অস্পষ্ট করে ফেলাই একমাত্র নিরাপদ পন্থা।

"আমি তবু ডাক্তারখানা খুলে রেখে হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে ওষুদ-বিষুদ দিয়ে কিছু সাহস দেখিয়েছিলুম। নইলে নিজের কাছে নিজে মুখ দেখাতে পারতুম না।

"ঐ পাড়ার একটা গুন্ডা ছিল, তার নাম নূর মিঞা। পুলিস থেকে আরম্ভ করে পাড়ার কুকুর-বেড়াল পর্যন্ত তাকে জানত, এত বড় দুর্ধর্ষ গুন্ডা বোধ হয় কলকাতা শহরে আর দুটো ছিল না। তার গোটাতিনেক উপপত্নী ছিল—সব কটাই গেরস্তর ঘর থেকে কেড়ে আনা। প্রকাশ্যভাবে কোকেনের ব্যবসা করত, কিন্তু কারো সাহস ছিল না যে নূর মিঞাকে ধরিয়ে দেয়।

"দাঙ্গার সময় নূর মিঞা আমার ডাক্তারখানার কাছাকাছি একটা গলির মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকত। রাস্তা নির্জন দেখে কোন হিন্দু একলা সে পথ দিয়ে গেলেই নূর মিঞা দেড় ফুট লম্বা একটা ছুরি নিয়ে নিঃশব্দে এসে তার পিঠে কিম্বা পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিত। ছুরি মেরেই নূর মিঞা অদৃশ্য। তারপর কিছুক্ষণ চেঁচামেচি,

হাঁকাহাঁকি, পুলিসের হুইসল, অ্যাম্বুলেন্স গাড়ির শব্দ। আবার আহত ব্যক্তি স্থানান্তরিত হবার পর—সব চুপচাপ।

"এই রকম গোটাকয়েক অতর্কিত খুন হবার পর ওপথে লোক-চলাচল একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। নূর মিঞা তার গলির মধ্যে ওৎ পেতে বসে আছে, কিন্তু শিকার আসে না। যখন আসে, তখন লাঠি-তলোয়ার নিয়ে দলবদ্ধ হয়ে শিকারী সেজে আসে। কাজেই সে-সময় নূর মিঞা ও তাঁর স্বধর্মীরা যে-যার কোটরে প্রবেশ করেন। তারা চলে গেলে আবার গর্ত থেকে বার হন।

"এমনিভাবে দুটো দিন গেল। দাঙ্গা সমভাবে চলছে, দূর থেকে তার হৈ হৈ সোরগোল শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু আমাদের পাড়া চুপচাপ। নূর মিঞার হাতে একেবারে কাজ নেই। আমিও সেদিন ভর সন্ধ্যাবেলা ঘরের জানালার কাছে চুপটি করে বসে আছি, এমন সময় বাইরে ফুটপাথের ওপর খট্ খট্ শব্দ শুনে গলা বাড়িয়ে দেখি, ভারী নাগরা পায়ে দিয়ে এক পশ্চিমী খোট্টা হন্ হন্ করে আসছে। তার গায়ে দোলাইএর মত কি জড়ানো, ন্যাড়া মাথার উপর প্রকাণ্ড টিকি—যেন পতাকার মত পতপত করে উড়ছে। দেখেই তো আমার প্রাণ উড়ে গেল। এই রে! এল বুঝি নূর মিঞা তার দেড় ফুট লম্বা ছুরি নিয়ে!

"হলও তাই। লোকটা আমার বাড়ির সামনে পর্যন্ত আসতে না আসতে নূর মিঞা পিছন থেকে নেকড়ে বাঘের মত এসে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। তারপর মুহূর্তের মধ্যে কি যেন একটা কাণ্ড হয়ে গেল। টিকিধারী খোট্টা হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে দোলাইএর ভেতর থেকে দুটো হাত বার করলে—দু'হাতে দুটো ছুরি! নূর মিঞার হাতের ছুরি হাতেই রইল—খোট্টা বিদ্যুদ্বেগে একখানা ছোরা তার বুকে আর একখানা তার পেটে বসিয়ে দিলে। তারপর যেমন এসেছিল, সেই ভাবে হাত ঢেকে বেরিয়ে গেল।

"নূর মিঞা ফুটপাথের উপর পড়ে গোঙাতে লাগল। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে নিজেকে টান্তে টান্তে আমার দরজা পর্যন্ত এসে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। রক্তে কাদায় দরজার চৌকাঠ মাখামাখি হয়ে গেল।

"আমি আর আমার কম্পাউন্ডার ধরাধরি করে তাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলুম। মনে হচ্ছিল, ঐখানে পড়ে মরে থাকুক ব্যাটা—যেমন কর্ম, তেমনি ফল! ঐ কাদার মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুক!—কিন্তু ডাক্তার হয়ে সেটা আর কিছুতেই পারলুম না।

"ক্ষত পরীক্ষা করে দেখলুম, বুকের জখম তত ভয়ানক নয়, কিন্তু পেটের আঘাত সাংঘাতিক। যা হোক, তখনকার মত ফার্স্ট্ এড্ দিয়ে অ্যাম্বুলেন্সকে ফোন করতে যাচ্ছি, নূর মিঞা চোখ চেয়ে ভাঙ্গা গলায় বল্লে, 'ডাগদর সাহেব!'

"তার কাছে যেতেই বল্লে, 'জান্ বচা দিজিয়ে, আপকো লাখ রুপা দুঙ্গা।'

"বিরক্ত হয়ে বল্লুম, 'সেই চেষ্টাই তো করছি রে বাপু! মেডিকেল কলেজে যাও—দেখ যদি বাঁচাতে পারে।'

"নূর মিঞা মিনতি করে বল্লে, 'মিটিয়া কলেজ মৎ ভেজিয়ে বাবু, হিন্দু ডাগদর লোগ জহর পিলাকে—মার ডালেগা।'

"আমি বিদ্রূপ করে বল্লুম, 'তা তো বটেই। মিটিয়া কলেজের ডাক্তাররা সব তোমার মত কি না। কিন্তু আমিই কি তোমাকে জহর খাইয়ে মেরে ফেলে দিতে পারি না? আমিও তো হিন্দু!'

"—'আপ্ অ্যায়সা কাম নহি কিজিয়ে গা'—বলে নূর মিঞা অজ্ঞান হয়ে পড়ল। এত

বেশী রক্তক্ষয় হয়েছিল যে, আর কথা কইবার সামর্থ্য রইল না।

"আমিও ভেবে দেখলুম, নাড়াচাড়া করবার চেষ্টা করলে হয়তো রাস্তাতেই মরে যাবে। নিরুপায় হয়ে, হাসপাতালে খবর পাঠিয়ে দিয়ে, তাকে নিজের বাড়িতেই রাখলুম।

"মানুষের মনের মত এমন আশ্চর্য জিনিস বোধ হয় দুনিয়ায় আর নেই। যে লোকটার ওপর আমার ঘৃণা আর বিদ্বেষের অন্ত ছিল না, যাকে আমি নিজের চোখে তিন-চারটে খুন করতে দেখেছি, তাকেই যে কেন রাত্রি-দিন নিজের কাছে রেখে চিকিৎসা করে সারিয়ে তুললুম, তা আজও আমি জানি না। আমার মন যখন তাকে বিষ খাওয়াতে চেয়েছে, তখন আমি তাকে বেদানার রস খাইয়েছি। পূর্ণ বিকারের ঝোঁকে যখন সে 'মারো মারো হিন্দু মারো!' বলে চেঁচিয়েছে, আমি তখন তার মাথায় আইস-ব্যাগ ধরেছি। মানুষের মনস্তত্ত্ব নিয়ে তোমরা ঘাঁটাঘাঁটি কর, হয়তো এর একটা সদুত্তর দিতে পারবে; স্থূল শরীরটা নিয়ে আমার কারবার, তাই আমার কাছে এ একটা অদ্ভুত প্রহেলিকাই রয়ে গেছে।

"যেদিন তার প্রথম জ্বর ছাড়ল, সেদিন সে বিছানায় উঠে বসে প্রথম কথা কইলে, 'আমাকে একটু কোকেন দিন।'

"তার পর থেকে প্রত্যহ কোকেন নিয়ে ঝুলোঝুলি আরম্ভ হল, আমিও দেব না, সেও ছাড়বে না।

"একদিন সে বল্লে, 'ডাগদর সাহেব, দশ হাজার রুপা দুঙ্গা, এক পুরিয়া কোকেন দিজিয়ে।"

"আমি বল্লুম, 'তা তো দেব, কিন্তু টাকাটা তোমার দেখি আগে!'

"সে বল্লে, 'ইমান কস্‌ম, ভেজ্ দুঙ্গা।'

"আমি বল্লুম, 'ঢের হয়েছে আর রসিকতা করতে হবে না। জেনে রাখ যে, এক রতি কোকেন একলাখ টাকার বদলেও তোমাকে দেব না।'

"আর একদিন এমনি কোকেনের জন্য খাই-খাই করছে, আমি তাকে বল্লুম, 'আচ্ছা নূর মিঞা, আমি তো স্বচক্ষে তোমায় তিনটে খুন করতে দেখেছি, এখন যদি তোমাকে পুলিসে ধরিয়ে দিই?'

"সে মুখ সিঁটকে বল্লে, 'কুছ নহি হোগা। আমার সাবুদ তৈরি আছে। মাঝ থেকে আপনি ফেঁসে যাবেন।'

"আমি বল্লুম, 'কি রকম?'

"সে বল্লে, 'দাঙ্গার সময় আমি হাজতে ছিলুম। বিশ্বাস না হয় থানায় গিয়ে দেখে আসতে পারেন, সেখানে আমার টিপ সই পর্যন্ত মজুত আছে।'

"লোকটার শয়তানী দেখে নতুন করে অবাক হয়ে গেলুম। নিজের অকাট্য অ্যালি-বাই তৈরি করে—আটঘাট বেঁধে তবে দাঙ্গা করতে নেমেছিল।

"তার পর একদিন, তখনো তার গায়ে ভাল জোর হয়নি, চেহারা প্রেতের মত, আমি তাকে বল্লুম, 'তোমার ঘা সেরে গেছে, ইচ্ছে কর তো তুমি এখন যেতে পার।'

"সে কোন কথা না বলে বিছানা থেকে উঠে টল্‌তে টল্‌তে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় নিচু হয়ে আমাকে একটা সেলাম করে গেল।

"প্রায় তিন মাস আর নূর মিঞার দেখা নেই। একদিন আমার কম্পাউন্ডারকে বল্লুম, "ওহে, সে লোকটা তো আর এলো না।'

"কম্পাউন্ডারটি তোমাদের মত একজন সিনিক। সে বল্লে, 'আবার কি করতে আসবে? আপনি কি ভেবেছেন, সে লাখ টাকা নিয়ে আপনাকে দিতে আসবে? মনেও

করবেন না। বরং সুবিধে পেলে আপনার গলায় ছুরি বসিয়ে দিতে পারে বটে।'

"কথাটা নেহাত অসঙ্গত মনে হল না। নরহন্তা গুণ্ডাটার প্রাণ বাঁচানর জন্য নতুন করে অনুতাপ হতে লাগল।

"সেই দিন দুপুরবেলা একলা বসে আছি, হঠাৎ নূর মিঞা এসে হাজির। রুগ্ন-ভাব আর নেই, প্রকাণ্ড ষণ্ডা, লম্বা এক সেলাম করে বল্লে, 'হুজুর!'

"আমি বল্লুম, 'কি নূর মিঞা, কি মনে করে? তোমার লাখ রুপেয়া নিয়ে এলে নাকি?"

"সে লুঙ্গির ভেতরে থেকে পুরুষ্ট একটি নোটের তাড়া বার করে বল্লে, 'মালিক, লাখ রুপা দেবার আমার ওকাত নেই, কিন্তু পাঁচ হাজার টাকা এনেছি—এই নিয়ে আমাকে ঋণমুক্ত করুন।'

"আমি অবাক হয়ে বল্লুম, 'পাঁচ হাজার টাকা কি হবে?'

"সে বল্লে, 'হুজুর, এ টাকা আমার নজরানা। ইমানসে বলছি, এর বেশী দেবার এখন আমার ক্ষমতা নেই।'

"আমি হেসে বল্লুম, 'নূর মিঞা, তুমি কি ভেবেছ, তোমার টাকাব লোভে আমি তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলুম?'

"নূর মিঞা চুপ করে রইল।

"আমি আবার বল্লুম, 'তোমার কোকেন-বেচা মানুষের রক্ত-শোষা টাকা তুমি নিয়ে যাও, ও আমার দরকার নেই। তোমার মত লোকের প্রাণ বাঁচিয়ে যে পাপ করেছি, ভগবান আমাকে তাব শাস্তি দেবেন।'

"টাকা গছাবার জন্য সে ধস্তাধস্তি করতে লাগল। আমি নিলুম না। সে অনেক কাকুতি-মিনতি করলে, কিন্তু আমি অটল হয়ে রইলুম। তখন সে নোটের তাড়াটা তুলে নিয়ে এক রকম রাগ করেই উঠে চলে গেল।

"সাতদিন পরে নূর মিঞা আবার ফিরে এসে বল্লে, 'মালিক, আপনি হিন্দু হয়ে জেনে শুনে আমার মত দুশমনের প্রাণ বাঁচিয়েছেন, এ কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। বেশ, টাকা না হয় নেবেন না, আমাকে আপনার গোলাম করে রাখুন। যা হুকুম করবেন, তাই করব।'

"আমার মাথার মধ্যে একটা আইডিয়া খেলে গেল। বল্লুম, 'যা হুকুম করব, তাই করবে? ঠিক বল্‌ছ?'

"সে বল্লে, 'জান কবুল, ইমান কবুল—তাই করব।'

"আমি আবার বল্লুম, 'নূর মিঞা, ঠিক করে ভেবে বল, ঝোঁকের মাথায় দিব্যি গেলে বস না।'

"সে থমকে গিয়ে বল্লে, 'ধর্ম ছাড়তে পারব না। আর যা বলবেন তাই করব। খোদা কসম।'

"আমি বল্লুম, 'না, ধর্ম তোমাকে ছাড়তে বলব না। কিন্তু এ তার চেয়েও শক্ত কাজ নূর মিঞা।'

"সে বল্লে, 'তা হোক, হুকুম করুন।'

"আমি বল্লুম, 'বেশ, আমি হুকুম করছি, তোমাকে কোকেন ছাড়তে হবে, কোকেনের ব্যবসা ছাড়তে হবে, আর গুণ্ডামি ছাড়তে হবে। কেমন পারবে?'

"নূর মিঞা পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। তার পর আস্তে আস্তে চেয়ারে বসে পড়ল। অনেকক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে কি যে ভাবলে, সেই জানে। শেষে প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লে, 'বাবুজী, আমার দুনিয়া আপনি কেড়ে নিলেন। বহুত

আচ্ছা, তাই হবে। কোকেন ছাড়বো, গুণ্ডামিও ছাড়বো। কিন্তু এতে আপনার কি নফা হল, মালিক?'

"আমি তার কাঁধে হাত রেখে বল্লুম, 'যদি সত্যই ছাড়তে পার নূর মিঞা, তাহলে আমার কি লাভ হল, তা আর একদিন তোমাকে বল্‌ব।'

"গুণ্ডামি নূর মিঞা সহজে ছেড়ে দিলে। কিন্তু কোকেন ছাড়া নিয়ে যে কি কাণ্ড করতে লাগল তা বর্ণনা করা অসম্ভব। প্রথম প্রথম সন্ধ্যাবেলা এসে আমার পায়ে মাথা কুট্‌তে আরম্ভ করলে। কোকেনের ক্ষুধা যে কি পৈশাচিক ক্ষুধা, তা যে কোকেন খায়নি তাকে বোঝান যায় না। প্রত্যহ আমার পায়ে মুখ ঘষতে ঘষতে বল্‌ত, 'মালিক, একবার হুকুম দাও, একটিবার। ছুঁচের আগায় যতটুকু ওঠে, ততটুকু খাব, বেশী নয়।

"এক এক সময় আমারই মায়া হত, জোর করে নিজেকে শক্ত করে রাখতুম।

"কিন্তু আশ্চর্য মনের বল ঐ গুণ্ডার। আর কেউ হলে কোন্‌কালে প্রতিজ্ঞা উড়িয়ে দিয়ে বসে থাকত। নূর মিঞা বুলডগের মত প্রতিজ্ঞা কাম্‌ড়ে পড়ে রইল।

"পুরো এক বছর লাগল তার কোকেনের ক্ষুধা জয় করতে। বছরের শেষে একদিন সে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরলে। বল্লে, 'মালিক, আজ বুঝেছি, কেন আমাকে কোকেন ছাড়তে বলেছিলে। তুমি মানুষ নয়, তুমি পীর নবী।'

"নূর মিঞা এখন বিড়ি-তামাকের দোকান করেছে।

"ভোরবেলা আমার ডিস্‌পেন্সারীতে কখনো যদি যাও, দেখবে নূর মিঞা সর্ব-প্রথম এসে আমাকে সেলাম করে যায়।"

১৩৩৮

শীলা-সোমেশ

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নামক সর্ববিদিত পথটি সাঁওতাল পরগণার ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে যে ক্ষুদ্র শহরটিকে দ্বিধা ভিন্ন করিয়া দিয়া ঊর্ধ্বমুখে চলিয়া গিয়াছে সেই শহর হইতে প্রায় দশ-এগারো মাইল উত্তরে পথের ধারেই একটা বাংলো বাড়ি দেখা যায়। ঘন সন্নিবিষ্ট শালবনের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া দিয়া প্রায় বিঘা দুই জমি ঘেরা, তাহারই মধ্যস্থলে উচ্চ ভিত্তির উপর বাড়িখানি প্রতিষ্ঠিত। আশেপাশে দু'দশ মাইলের মধ্যে কোথাও জনমানবের বাস নাই।

সন্ধ্যার পর নিবিড় জঙ্গলের ছায়ায় যখন পথের শুভ্র রেখাটি মুছিয়া মিলাইয়া

যায় এবং বাংলোটির ঘরে ঘরে আলো জ্বলিয়া উঠে তখন দিগ্‌ব্যাপী স্তব্ধতার মধ্যে জঙ্গলের নানাপ্রকার শব্দ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে থাকে। শালের পাতায় পাতায় ঘষিয়া যে মর্মর ধ্বনি উত্থিত হয় তাহার সহিত সহসা খট্টাসের অট্টহাসি মিশিয়া বিশ্রব্ধ মনকে চমকিত সন্ত্রস্ত করিয়া দেয়। কখনও বা গভীর রাত্রে অতি সন্নিকটে ব্যাঘ্রের আকস্মিক গর্জন নিদ্রিত গৃহবাসীকে শয্যার উপর উঠিয়া বসাইয়া দেয়। তখন বাড়ির রক্ষক কুকুরগুলোর ঘেউ ঘেউ শব্দের সদম্ভ আস্ফালন যেন মার খাইয়া থামিয়া যায়।

চন্দ্রনাথ রায়, ফরেস্ট অফিসার, এই বাংলোতে বাস করেন। বাড়ির পশ্চাতে তারের বেড়ার ধারে যে একসারি ছোট ছোট কুঠুরী আছে তাহার একপ্রান্তের কয়েকটি ঘরে তাঁহার অফিস বসে ও দুটি তিন-চার কর্মচারী বাস করে। অপর দিকে আস্তাবল ও সহিসের ঘর। চন্দ্রনাথবাবুর একটি ঘোড়া ও টম্‌টম্‌ আছে, ঘোড়াটি সোয়ারী ও টম্‌টম্‌ দুই কার্যেই ব্যবহৃত হয়। সাঁওতাল সহিস সপরিবারে এইখানেই থাকে। বাড়ির যৎসামান্য কাজের জন্য একটি দাই ও একজন বেয়ারা আছে। বেয়ারা একাধারে ভৃত্য এবং পাচক।

এ সকল ছাড়াও চন্দ্রনাথবাবুর একটি কন্যা আছে—তাহার নাম শীলা। সে-ই সংসারের কর্ত্রী, কারণ চন্দ্রনাথবাবু বিপত্নীক। শীলার বয়স আঠারো বৎসর। মেয়েটি দেখিতে সুন্দর, ছোটখাটো, ক্ষীণাঙ্গী, সহসা দেখিলে নেহাৎ বালিকা বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে মুখের কোমল সৌকুমার্যের ভিতর দিয়া বয়সোচিত দৃঢ় চিত্তবল ও স্বনির্ভরতা ধরা পড়ে।

কন্যাটিকে লইয়া চন্দ্রনাথবাবু নিশ্চিন্তমনে অরণ্যবাস করিতেছেন। চিরজীবন এই-ভাবেই কাটিয়াছে; তাই মানুষের সঙ্গের প্রতি বড় একটা লিপ্সা নাই। শীলাও তাঁহার মত— একলা থাকিতে ভালবাসে। কদাচ দু'মাস ছ'মাসে পিতাপুত্রী টম্‌টম্‌ আরোহণে শহরে গিয়া বন্ধু-বান্ধবের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া আসেন। তারপর আবার নিরবচ্ছিন্ন বনপর্ব চলিতে থাকে।

ভাদ্র মাস কাটিয়া গিয়াছে, আশ্বিনের আরম্ভ। সন্ধ্যার পর হিম পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, শেষরাত্রিতে একটু গা শীত-শীত করে। দিনের বেলাটি শীত-গ্রীষ্ম বিবর্জিত একটি মনোরম সন্ধিকাল। নির্মল আকাশ ও ঝরঝরে বাতাস যেন প্রকৃতির সমস্ত আসবাব ঝাড়িয়া মুছিয়া একেবারে ক্লেদমুক্ত করিয়া দিয়াছে—গাছের পাতায় কি আকাশের লঘু মেঘে কোথাও এতটুকু মলিনতার চিহ্ন পর্যন্ত নাই।

বাংলোর সম্মুখে খানিকটা স্থান লইয়া গোলাপের বাগান। বৈকালী সূর্যের সঙ্কুচিত রশ্মি বাগানটিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। হাতে একটা খুরপী লইয়া শাড়ীর আঁচলটা গাছ-কোমর করিয়া বাঁধিয়া শীলা গোলাপ গাছের তত্ত্বাবধান করিতেছিল। যে গাছে তখনও ফুল ধরে নাই তাহার গোড়া খুঁড়িয়া দিতেছিল, আবার যে গাছটি ফুলে মুকুলে ভরিয়া উঠিয়াছে, একটি ক্ষুদ্র জল ঢালিবার ঝাঁঝরিদার পাত্র হইতে তাহার পাতায় ও মূলে জল দিতেছিল। মালী নাই, এ বাগানটি শীলার নিজের হাতে তৈয়ারী—নিজস্ব। তাই ইহার প্রতি তাহার যত্ন ও মমতার অন্ত ছিল না। একটি ফুলও সে প্রাণ ধরিয়া কাহাকেও ছিঁড়িতে দিতে পারিত না।

শীলা মন দিয়া বাগানের সেবা করিতেছিল বটে কিন্তু তাহার একটি চোখ ও একটি কান পথের পানে পড়িয়াছিল! মাঝে মাঝে যেন পরিশ্রমের পর বিশ্রাম করিবার উদ্দেশ্যেই গেটের কাছে গিয়া দাঁড়াইতেছিল এবং কাঠের ফটকের উপর ভর দিয়া পথের যে প্রান্তটা শহরের দিকে গিয়াছে, সেইদিকে উৎসুক চোখে চাহিয়া দেখিতেছিল।

চন্দ্রনাথবাবু বেলা দ্বিপ্রহরে ঘোড়ায় চড়িয়া বন্দুক ঘাড়ে করিয়া বাহির হইয়া-

ছিলেন, এখনও ফিরিয়া আসেন নাই। কিন্তু ইহা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, রোজই চন্দ্রনাথবাবুর ফিরিতে সন্ধ্যা হয় সুতরাং সেজন্য উৎকণ্ঠার কোনও হেতু নাই। শীলার চিত্তচাঞ্চল্যের অন্য কারণ ছিল। আসল কথা আজ শনিবার।

আষাঢ় মাসে আকাশে নবীন মেঘোদয় দেখিয়া তরুণীদের মন উন্মনা হয়, এ দেশের প্রাচীন কবিরা এরূপ একটা কথা লিখিয়া গিয়াছেন বটে, তাহাও পথিক-বধূ জাতীয় বিশেষ এক শ্রেণীর তরুণীদের সম্বন্ধে! কিন্তু শনিবারে, আকাশ একান্ত নির্মেঘ থাকা সত্ত্বেও এরূপ ব্যাপার ঘটিতে পারে তাহা কোন কাব্যে দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। কবিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিন্দক ভর্ত্তৃহরি কবিও শনিবারের নামে এমন একটা অভিযোগ আনিতে সাহস করেন নাই। তবে আজ কেবলমাত্র শনিবার বলিয়া একটি অনূঢ়া তরুণী গোলাপ গাছের পরিচর্যা করিতে করিতে তৃষিত নয়নে বনপথের পানে চাহিয়া থাকিবে কেন?

গত কয়েকটি শনিবার হইতেই এই ব্যাপার ঘটিতেছিল। মাস দুয়েক পূর্বে চন্দ্রনাথবাবু সকন্যা শহরে গিয়াছিলেন, সেখানে এক পুরাতন বন্ধুর গৃহে একটি নূতন লোকের সহিত তাঁহাদের পরিচয় হয়। লোকটি শহরে নবাগত, বিধবা জ্যেষ্ঠা ভগিনীর স্বাস্থ্যের জন্য হাওয়া বদলাইতে আসিয়া মস্ত একখানা কম্পাউণ্ডযুক্ত বাড়ি ভাড়া লইয়া বাস করিতেছিল। পুরাতন বন্ধুটি পরিচয় করাইয়া দিলেন, ইনি সোমেশ বসু, ধনীর সন্তান, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী এবং অতিশয় সজ্জন। অধিকন্তু লোকটি যে বিশেষ সুপুরুষ তাহা চন্দ্রনাথবাবু ও তাঁহার কন্যা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিলেন। শীলা মনে মনে বয়স আন্দাজ করিল—ছাব্বিশ সাতাশ।

সোমেশ বসুর সহিত আলাপে আরও একটা জিনিস প্রকাশ পাইল, সে অতি শীঘ্র আবালবৃদ্ধবনিতার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে পারে। ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে সে এতই ভাব জমাইয়া তুলিল, এবং এমনভাবে আচরণ করিতে লাগিল যেন চন্দ্রনাথবাবু তাহার খুড়া-জ্যাঠা জাতীয় একজন নিকট আত্মীয় এবং শীলা তাহার শৈশবের সহচরী—কেন যে তাহাকে এখনও 'সোমেশদা' বলিয়া বিগলিত কণ্ঠে ডাকিতেছে না ইহাই যেন ভারী আশ্চর্যের বিষয়!

সেইদিন সায়াহ্নে সোমেশ বসুর বাড়িতে চা পান করিয়া তাহার বড় দিদির নির্মিত অপূর্ব জিভে-গজার স্বাদ মুখে লইয়া শীলা ও তাহার পিতা বাড়ি ফিরিলেন। বিদায়কালে সোমেশ আশ্বাস দিয়া বলিল, 'কিছু ভাববেন না, শনিবারে শনিবারে গিয়ে আমি আপনাদের নির্জন বাসের ক্লেশ লাঘব করে দিয়ে আসব।'

এই আত্মপ্রত্যয়শীল যুবকের কথা বলিবার গম্ভীর ভঙ্গী দেখিয়া শীলার বড় হাসি পাইয়াছিল।

তাহার পর হইতে প্রতি শনিবারে সোমেশ বাইসিক্‌ল আরোহণে চন্দ্রনাথবাবুর বাংলোতে আসিয়াছে এবং ঘণ্টা দুই থাকিয়া চা সেবন ও শীলার স্বহস্ত প্রস্তুত কেক্ ভক্ষণ করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে ফিরিয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি শীলার মনে একটা গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে। সোমেশের স্বাস্থ্যপূর্ণ দৃঢ় শরীর, তাহার সুশিক্ষা-মার্জিত তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তাহার কথা বলিবার হাল্‌কা অথচ গম্ভীর ভঙ্গী সবই শীলার ভাল লাগে এবং লোকটি যে খুব ভাল এ বিষয়েও তাহার মনে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার সকল কথাবার্তা আচরণের অন্তরালে যে একটি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় অজ্ঞাতসারে পরিস্ফুট হইয়া উঠে তাহা শীলার ভাল লাগে না। ইহা যদি অহমিকা বা আত্মম্ভরিতা হইত তাহা হইলে দু'চারিটি তীক্ষ্ণ কথার বাণে শীলা তাহাকে ধূলিসাৎ করিয়া দিতে পারিত। কিন্তু ইহা সে বস্তু নহে, প্রকৃতপক্ষে ইহার

কতখানি ঠাট্টা এবং কতখানি সত্য মনোভাব তাহাই শীলা অনেক সময় বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সে নিজে শৈশব হইতে আত্মনির্ভরশীলা, সর্ববিষয়ে নিজেকে রক্ষা করিতে সমর্থা, কাহারও মুরুব্বিয়ানা বা পৃষ্ঠপোষকতা সে আদৌ সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু সোমেশের ভাবে-ইঙ্গিতে যেন ঐ বস্তুটারই সে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পায়। এবং এই আত্ম-পরিতোষ যতই তাহার মর্যাদায় আঘাত করিয়া যায়, আঘাত ফিরাইয়া দিতে না পারিয়া ততই সে উৎপীড়িত হইয়া উঠে।

তাছাড়া, বাড়িতে চন্দ্রনাথবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া চাকরানীটা পর্যন্ত সোমেশের গুণগানে এমনি মুক্তকণ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন যে, একজন কেহ প্রতিবাদ না করিলে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা বৈচিত্র্যহীন বন্দনা-গীতি হইয়া দাঁড়ায়। তাই সুযোগ পাইলেই সে পিতার সহিত তর্ক করে যে, সোমেশবাবু লোকটি অতিশয় অহংকারী। এবং উচ্চনীচ সকলকেই পিঠ ঠুকিয়া পেট্রনাইজ করা তাঁহার স্বভাব।

প্রত্যুত্তরে চন্দ্রনাথবাবু বলেন যে, যুবকদের নিরীহ অতিবিনয়ী ভাব তিনি সহ্য করিতে পারেন না এবং আজকালকার ছেলেরা অতিশয় শিষ্ট ও মিষ্টভাষী হইয়া একবারে উৎসন্নে যাইতে বসিয়াছে।

শীলা তর্ক করে যে, সোমেশবাবু সকলকেই মনে মনে তাচ্ছিল্য করিয়া ক্ষুদ্র করিয়া দেখেন। চন্দ্রবাবু বলেন, না, সে নিজেকে সকলের সমান করিয়া দেখে।

সুতরাং তর্কের নিষ্পত্তি হয় না। নিজের যুক্তির প্রভাবে শীলা সোমেশের প্রতি বিমুখ হইয়া বসিতে চাহে, তাহাকে অবহেলা করিয়া মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে চায়। কিন্তু পারে না, অদৃশ্য আকর্ষণ দৃঢ়তর হইতে থাকে। এইরূপ দোটানার মধ্যে তাহার রাত ও দিনগুলা কাটিতেছে।

নিস্তব্ধ বাতাসে বহুদূর হইতে সুমিষ্ট কিড়িং কিড়িং শব্দ ভাসিয়া আসিল। শীলা সচকিত হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল তখনও পথের উপর সাইক্‌ল বা তাহার আরোহীকে দেখা যাইতেছে না। সে বাগানে ফিরিয়া গিয়া পীতপুষ্পভারনম্র একটি গোলাপলতার মণ্ডমূলে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া গভীর মনসংযোগে তাহার পরিচর্যা করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে সোমেশ আসিয়া ফটকের সম্মুখে অবতরণ করিল; ফটকের গায়ে বাইসিক্‌ল হেলাইয়া রাখিয়া হাতার ভিতর প্রবেশ করিল। শীলা একমনে এতই কাজ করিতেছিল যে, তাহার অভ্যাগম জানিতে পারিল না।

সোমেশের পায়ে রবার-সোল্‌ জুতা ছিল, তাই সে যখন নিঃশব্দে শীলার পিছনে গিয়া দাঁড়াইল, তখনও শীলা মুখ তুলিয়া চাহিল না। কিন্তু হেঁট হইয়া কাজ করিতেছিল বলিয়াই বোধ হয় তাহার ঘাড় ও কর্ণমূল ধীরে ধীরে লাল হইয়া উঠিল।

মিনিট দুই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া সোমেশ মৃদুকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। শীলা যেন চমকিয়া মুখ তুলিয়া তাহাকে দেখিতে পাইল; সেও একটুখানি স্বাগত হাসি হাসিয়া বলিল, 'এই যে! কতক্ষণ এসেছেন?'

সোমেশের অধরোষ্ঠ একবার প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হইল। সে বলিল, 'প্রশ্নের উত্তর নিষ্প্রয়োজন। কতক্ষণ এসেছি তা তুমি বিলক্ষণ জান।'

শীলা আবার ঘাড় গুঁজিয়া গোলাপ গাছে মন দিল, যেন সোমেশের কথা শুনিতেই পায় নাই। কিন্তু তাহার মুখ পূর্বাপেক্ষা আরও লাল ও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। এই লোকটি কথায় কথায় মানুষকে এমন অপ্রস্তুত করিয়া দিতে পারে যে সহসা মুখে কথাই যোগায় না। তাছাড়া, এতদিন সে শীলাকে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিতে-ছিল, আজ হঠাৎ কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়াই 'তুমি' বলিতে আরম্ভ করিয়া দিল দেখিয়া শীলার বুকের ভিতরটা তোলপাড় করিয়া উঠিল।

শীলার মুখ সোমেশ দেখিতে পাইতেছিল না শুধু তাহার মাথার ঘন চুলের মধ্যে সিঁথির ঋজু রেখাটি সোমেশের চোখের নীচে একটি কাননমধ্যবর্তী সুন্দর বীথিপথের মত জাগিয়া ছিল। সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া সোমেশ মুখ টিপিয়া একটু হাসিল, তারপর গম্ভীর হইয়া বলিল, 'এলো খোঁপা বাঁধ্‌লে তোমাকে বেশ দেখায়।'

এবার শীলা মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, কিন্তু কোন কথা না বলিয়া গাছ হইতে শুষ্ক পাতাগুলা ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল।

সোমেশ হাত বাড়াইয়া একটি আধ-ফুটন্ত ফুল বোঁটাসুদ্ধ ছিঁড়িয়া লইল। শীলা এতক্ষণে একটা সত্যকার সুযোগ পাইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া তাহার দিকে ভ্রূকুটিপূর্ণ দৃষ্টি হানিয়া বলিল, 'আমার গাছ থেকে ফুল ছিঁড়লেন যে?'

সে কথার উত্তর না দিয়া, ফুলের দীর্ঘ আঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া সোমেশ বলিল, 'আঃ! চমৎকার গন্ধ! মার্শালনীল বুঝি?—একবার উঠে দাঁড়াও তো, তোমার খোঁপায় গুঁজে দি।'

বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া শীলা বলিল, 'সোমেশবাবু!'

মৃদু বিস্ময়ের দৃষ্টিতে সোমেশ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'কি হল?'

ক্রুদ্ধস্বরে শীলা বলিল, 'আজ এ সব আপনি কি বলছেন? জানেন বাবা বাড়ি নেই?'

সোমেশ সহজভাবে বলিল, 'জানি। তিনি ডন্‌কুইক্সোটের মত সাজ করে বেরিয়েছেন, পথে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। মাইলখানেক পথ তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে এলুম—তারপর তিনি আবার অশ্বপৃষ্ঠে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তোমাকে খবর দিতে বললেন, আজ তাঁর ফিরতে দেরী হবে। কোথায় নাকি একটি বাঘের সন্ধান পেয়েছেন।'

রাগে শীলা একেবারে নির্বাক হইয়া গেল। ডন্‌কুইক্সোটের মত!

সোমেশ পূর্ববৎ বলিতে লাগিল, 'তোমার বাবার সঙ্গে গল্প করতে করতে একটা মজার ইতিহাস বেরিয়ে পড়ল; আমার বাবা এবং তিনি ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে একসঙ্গে ইডেন হিন্দু হোস্টেলে ছিলেন,—দু'জনের মধ্যে ঘোর বন্ধুত্ব ছিল। ঠিক করেছি, তোমার বাবাকে এবার থেকে 'কাকাবাবু' বলে ডাকব। ইতিমধ্যে একবার ডেকেও নিয়েছি।'

কথা কহিবার ধরণ যাহার এইরূপ তাহার প্রতি কতক্ষণ রাগ করিয়া থাকা যায়? কিন্তু শীলা তাহার পুরাতন অভিযোগ উপস্থিত করিয়া বলিল, 'আপনি কেন আমার গাছের ফুল তুললেন? জানেন, আমরা গাছে কেউ হাত দেয় আমি ভালবাসি না?'

সোমেশ কহিল, 'তুললুম, কারণ গাছের চেয়ে তোমার চুলে এ ফুল ঢের বেশী মানাবে!'

শীলা বলিল, 'আবার ঐ কথা! দিন্ আমার ফুল আমাকে।'

'তাইতো দিতে চাইছি। পেছন ফিরে দাঁড়াও।'

না, হাতে দিন্। ওটাকে আমি দূর করে ফেলে দেব।'

সোমেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'কখনই হতে পারে না। হয় তোমার চুলে, নয় আমার বুকে। ফেলে দেওয়া অসম্ভব।'

'বেশ, দরকার নেই আমার।' বলিয়া শীলা হাতের খুরপী ফেলিয়া দিয়া বাড়ির দিকে যাইতে লাগিল। এত বিরক্ত সে আর কখনও হয় নাই। তাহার বোধ হইল, সোমেশ তাহাকে ইচ্ছা করিয়া রাগাইবার চেষ্টা করিতেছে। একবার তাহার মনে এরূপ সন্দেহও হইল যে, চন্দ্রনাথবাবু বাড়ি নাই জানিয়াই সোমেশ এমন স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে সাহস করিতেছে। ইহাতে তাহার রাগ আরও বাড়িয়া গেল।

'দাঁড়াও, একটা কথা আছে।'

শীলা থমকিয়া দাঁড়াইয়া অন্ধকার মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'কি কথা?'

সযত্নে গোলাপ ফুলটি নিজের এণ্ডির কোটের বটন্‌হোলে আটকাইয়া সোমেশ বলিল, 'তুমি না নাও, আমিই পরলুম। কিন্তু কি সুন্দর ফুলটি দেখ, কেবলি নুয়ে পড়ছে, নরম বোঁটা তার মুখখানি তুলে ধরে রাখতে পারছে না। ঠিক যেন স্নেহভারনত সুকোমল নারী-প্রকৃতি! পুরুষের বুকেই এর যথার্থ স্থান।' এই কবিত্বপূর্ণ পুষ্পবাণটি নিক্ষেপ করিয়া সোমেশ শীলার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, সহজভাবে বলিল, 'এগারো মাইল পথ সাইক্‌ল চালিয়ে এবং তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে তৃষিত হয়ে পড়েছি। সুতরাং কেক এবং চা দিয়ে অতিথির সংবর্ধনা যদি করতে চাও তো এই সুযোগ! অয়মহং ভোঃ!'

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া শুষ্কস্বরে একটা 'আসুন' বলিয়া শীলা বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল। সোমেশ তাহার সঙ্গে যাইতে যাইতে বলিল, 'পুরাকালে দুষ্মন্ত বলে এক পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন বোধ হয় শুনেছ। মৃগয়া করতে বেরিয়ে তিনি একদিন এমনি একটি তপোবনে এসে উপস্থিত হন। শকুন্তলা তখন তরু আলবালে জলসেচন করছিলেন। অবশ্য, তাঁর সঙ্গে দু'জন সখী ছিলেন—'

উত্ত্যক্ত হইয়া শীলা কহিল, 'আমি আপনার উপকথা শুনতে চাই না।'

উদারভাবে হাত নাড়িয়া সোমেশ বলিল, 'আচ্ছা বেশ, তাই হোক্‌! উপকথা শোন-বার এটা সময় নয় বটে।' তারপর এদিক-ওদিক চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কিন্তু তোমার সেই পোষা মৃগশিশুটিকে দেখছি না।'

অধর দংশন করিয়া শীলা চুপ করিয়া রহিল, উত্তর দিল না।

পশ্চিম দিকের ঘন শালবনের অন্তরালে সূর্য ঢাকা পড়িল। শালবন হইতে একটি সুমিষ্ট নির্যাসগন্ধ উত্থিত হইয়া বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বাংলোর খোলা বারান্দার উপর বেতের চেয়ারে বসিয়া দুই জনে চা-পান সমাপ্ত করিল। শীলা মুখ গম্ভীর করিয়া রহিল। সোমেশ রুমালে মুখ মুছিয়া পকেট হইতে সিগার বাহির করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিতেই শীলা বলিয়া উঠিল, 'ঐ পোড়া গন্ধটা আমি সইতে পারি না।'

সোমেশ তৎক্ষণাৎ মুখের সিগারটা বারান্দার নীচে ফেলিয়া দিল। তারপর পকেট হইতে কুমীরের চামড়ার সিগার-কেসটা লইয়া একে একে সিগারগুলা বাহির করিতে লাগিল। প্রত্যেকটা সিগার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল। শেষে যখন সবগুলা নিঃশেষ হইয়া গেল, তখন কেস-টা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া সেটাও ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চেয়ারে হেলান দিয়া বসিল।

শীলা বিস্মিত চোখে তাহার কার্যকলাপ দেখিতেছিল, বলিল, 'সব ফেলে দিলেন যে!'

অন্যমনস্কভাবে ঊর্ধ্বদিকে চোখ তুলিয়া সোমেশ বলিল, 'আর খাব না।—ভাল কথা, তোমার বাবার সঙ্গে আর একটা কথা হয়েছিল সেটা বলতে ভুলে গেছি—'

শীলা উঠিয়া গিয়া বারান্দার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইল। তখন সন্ধ্যার ছায়া ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল, শীলা উদ্বিগ্নস্বরে কহিল, 'সোমেশবাবু, আজ কি আপনি বাড়ি ফিরবেন না? সন্ধ্যা হয়ে গেল যে।'

সোমেশ সেকথা কানে না তুলিয়া বলিল, 'তোমার বাবার কাছে আমি আজ প্রস্তাব একটা করেছিলুম; তার উত্তরে তিনি বললেন—'

অধীর হইয়া শীলা বলিল, 'কিন্তু এদিকে যে রাত্রি হয়ে যাচ্ছে, এতটা পথ অন্ধকারে যাবেন কি করে? দু'দিকে জঙ্গল, রাস্তাও নিরাপদ নয়।'

সোমেশ উঠিয়া শীলার পাশে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'আজ রাত্রে আমি এই-খানেই থাকব স্থির করেছি। চন্দ্রনাথবাবু নিমন্ত্রণ করেছেন, বাড়িতে দিদিকেও বলা আছে। সে যাক। তোমার বাবার কাছে আমি আজ যে প্রস্তাব করেছিলুম তার উত্তরে তিনি বললেন, শীলার যদি অমত না থাকে তাঁরও অমত নেই।'

সোমেশের কথার ভংগীতে প্রস্তাবটা যে কি তাহা বুঝিতে শীলার দেরী হইল না। এক ঝলক রক্ত আসিয়া তাহার মুখখানা আরক্ত করিয়া দিল, কিন্তু সংগে সংগে তাহার মনও বিরূপ হইয়া বসিল। জোর করিয়া যথাসাধ্য সহজ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি প্রস্তাব আপনি করেছিলেন শুনি?'

তাহার একখানা হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া সোমেশ বলিল, 'এই পাণি গ্রহণ করবার আবেদন জানিয়েছিলুম।'

তাচ্ছিল্যভরে হাসিয়া শীলা হাত ছাড়াইয়া লইল, বলিল, 'ওঃ এই প্রস্তাব। তা বাবা ঠিকই জবাব দিয়েছেন; আমার মত তো তিনি জানেন না।'

অবিচলিতভাবে সোমেশ বলিল, 'আমি তাঁকে জানিয়ে দিয়েছি যে তোমার অমত নেই।'

'কি! আপনি বাবাকে বলেছেন—' ক্রোধে, বিরক্তিতে শীলার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। সে অধর দংশন করিয়া বলিল, 'আপনি অনধিকার চর্চা করেছেন। কোন্ সাহসে আমার সম্বন্ধে এ ধৃষ্টতা প্রকাশ করলেন?'

সোমেশ গম্ভীরভাবে বলিল, 'এই সাহসে যে আমি তোমায় ভালবাসি আর তুমিও আমায় ভালবাস!'

তীব্র অবজ্ঞার স্বরে শীলা বলিয়া উঠিল, 'আপনি ভুল করেছেন। নিজের সম্বন্ধে আপনার ধারণা খুব উচ্চ হতে পারে, কিন্তু আমি আপনাকে সাধারণ পাঁচজনের সংগে সমান করেই দেখি।'

সোমেশ বলিল, 'মিথ্যে কথা। আমি জানি তুমি আমাকে ভালবাস।'

শীলা উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। বিদ্রূপভরা সুরে বলিল, 'আচ্ছা সোমেশবাবু, আপনার কি বিশ্বাস আপনার মত যোগ্য ব্যক্তি পৃথিবীতে আর নেই?'

সোমেশ বলিল, 'তুমি যদি অমন করে হাস তাহলে আমি লোভ সামলাতে পারব না।'

ভ্রূভংগী করিয়া শীলা বলিল, 'তার মানে?'

'তার মানে—এই।' বলিয়া হঠাৎ শীলার দুই হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া সোমেশ তাহার অধরে চুম্বন করিয়া ছাড়িয়া দিল।

ক্ষণকালের জন্য শীলা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তারপর বাঁ হাতের পিঠ দিয়া ঠোঁট দুটা মুছিতে মুছিতে, ডান হাতে সজোরে সোমেশের গালে এক চড় বসা-ইয়া দিয়া পিছু সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার দুই চোখ দিয়া যেন আগুন ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল।

চড় খাইয়া সোমেশের গালে চারি আঙ্গুলের দাগ লাল হইয়া ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু সে হাসিমুখেই বলিল, 'আমি অহিংসা ব্রতধারী—গান্ধীজীর শিষ্য। বাঁ গালে চড় মার্‌লে ডান গাল ফিরিয়ে দিতে—'

চাপা গর্জনে শীলা বলিয়া উঠিল, 'আপনি যান্—যান্ এখান থেকে। ভদ্রমহিলার সংগে কথা কইবার যোগ্য নন্ আপনি। এই দন্ডে এই বাড়ি থেকে বিদায় হোন।'

এবার সোমেশের কণ্ঠস্বরে একটু পরিবর্তন হইল। সে যেন ভিতরের আঘাত গোপন করিতে করিতে বলিল, 'কিন্তু বলেছি তো, আজ রাত্রে আমি এখানেই থাকব,

চন্দ্রবাবু নিমন্ত্রণ করেছেন—'

শীলা ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, 'তিনি না জেনে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, নইলে আপনার মত লোককে কেউ জেনেশুনে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে না।'

সোমেশ চুপ করিয়া অনেকক্ষণ বাহিরের অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর আস্তে আস্তে বলিল, 'কিন্তু এদিকেও রাত হয়ে গেছে। পথও বলছিলে নিরাপদ নয়—'

কণ্ঠস্বরে তীব্র গরল ভরিয়া শীলা বলিল, 'আপনি খাঁটি বাঙালী বটে। অসহায়া স্ত্রীলোককে অপমান করতে পারেন কিন্তু শেয়ালের ভয়ে পথে বার হতে পারেন না।'

কথাগুলা সাঁওতালী তীরের মত সোমেশের বুকে গিয়া বিঁধিল। অন্ধকারে তাহার মুখ ভাল দেখা গেল না, কিন্তু তাহার গলার পরিবর্তন এবার শীলার কানেও ধরা পড়িল। তথাপি সোমেশ হাল্‌কা ভাবেই কথা বলিতে চেষ্টা করিল, 'আমি খাঁটি বাঙালী তা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু শেয়ালের অপবাদটা ভিত্তিহীন, কোনো খাঁটি বাঙালীই শেয়ালকে ভয় করে না। সে যাক্‌। এখন তাহলে বেরিয়ে পড়ি, এগারোটার মধ্যেই বোধ হয় বাড়ি পেঁছতে পারব। তোমার বাবাকে বলে দিও আজ থাকতে পারলুম না।' একটু থামিয়া বলিল, 'আর,— যদি ভুল বুঝে অপমান করে থাকি মাপ করো।' বলিয়া সোমেশ ধীরে ধীরে নামিয়া গেল।

অন্ধকারে একাকী দাঁড়াইয়া শীলা শুনিতে পাইল, ফটক খুলিয়া সোমেশ বাহিরে গেল, বাহির হইতে ফটক বন্ধ করিয়া দিল, তারপর সাইক্‌লখানা হাতে করিয়া লইয়া একবার ঘণ্টি বাজাইয়া তাহাতে আরোহণ করিয়া চলিয়া গেল। সাইক্‌লের সঙ্গে বাতি ছিল না।

শীলা আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে গিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া আটটা বাজিল।

গালে হাত দিয়া বসিয়া বাহিরের অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া শীলা একবার শিহরিয়া উঠিল। এগারো মাইল পথ! সঙ্গে একটা দেশলাই পর্যন্ত নাই।

ঘরের ভিতর চাকর আলো দিয়া গিয়াছিল, দাসীটা আসিয়া একবার জিজ্ঞাসা করিয়া গেল, শীলা কাপড় ছাড়িবে কিনা। কিন্তু শীলা কিছুই শুনিতে পাইল না। দৃষ্টিহীন চক্ষু বাহিরের দিকে মেলিয়া পাষাণ মূর্তির মত বসিয়া রহিল।

বাহিরে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনা গেল এবং পরক্ষণেই হাঁকডাক করিয়া চন্দ্রনাথবাবু বাড়ি ফিরিলেন। সহিস আসিয়া ঘোড়া লইয়া গেল। হ্যাট কোট ইত্যাদি খুলিয়া চাকরের হাতে দিয়া চন্দ্রনাথবাবু বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। চায়ের গরম জল তৈয়ার ছিল, শীলা নীরবে চা প্রস্তুত করিতে লাগিল।

মুখহাত ধুইয়া চা পান করিতে করিতে চন্দ্রনাথবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সোমেশ এসেছিল—চলে গেছে?'

শীলা নতনেত্রে বলিল, 'হ্যাঁ।'

চন্দ্রনাথবাবু কন্যার মুখের দিকে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন কিন্তু ও-বিষয়ে আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। একথা-সেকথা আলোচনা করিতে করিতে বলিলেন, 'একটা ম্যান্‌ইটার বেরিয়েছে। মাইল বারো চৌদ্দ দূরে সাঁওতালদের গাঁয়ে উৎপাত করছিল, কয়েকটা লোককে নিয়েও গিয়েছিল। এখন সাঁওতালদের তাড়া খেয়ে এদিকে পালিয়ে এসেছে। রাস্তার ধারে ধারে অনেকদূর পর্যন্ত তার থাবার দাগও দেখলুম, কিন্তু বাঘটার সন্ধান পাওয়া গেল না। কাল জঙ্গল বীট্‌ করিয়ে তাকে বার করতে হবে।'

ঠিক এই সময়ে বহুদূরে দক্ষিণ হইতে ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট শব্দ আসিল—'ফেউ! ফেউ!'

ফেউয়ের ডাক যে পূর্বে শুনে নাই সে কল্পনাও করিতে পারে না যে একটা দুর্দান্ত বাঘের পশ্চাতে একপাল শৃগাল ল্যাজ উঁচু করিয়া যাইতে যাইতে এমন মানুষের মত গলা বাহির করিয়া চীৎকার করে। শীলা এ ডাক বহুবার শুনিয়াছে, তাই তাহার সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া কাঁপিয়া উঠিল! সোমেশ যে ঐ পথেই গিয়াছে! সে ভয়-ব্যাকুল স্বরে বলিয়া উঠিল, 'বাবা, ঐ শোন!'

চন্দ্রনাথবাবু তাহার বিবর্ণ মুখ লক্ষ্য না করিয়া সহজভাবে বলিলেন, 'হ্যাঁ, আমি ঠিকই আন্দাজ করেছিলুম, বাঘটা ঐ দিকেই আছে।' তিনি সহিসকে ডাকিয়া পালিত পশুগুলোকে সাবধানে রাখিতে হুকুম করিয়া দিলেন।

সমস্ত দিন অশ্বপৃষ্ঠে ঘুরিয়া চন্দ্রনাথবাবু ক্লান্ত হইয়াছিলেন, সকাল সকাল আহারাদি শেষ করিয়া শুইয়া পড়িলেন। শীলাও শুইতে গেল।

ঘরের ঘড়িতে যখন রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গেল, তখন শীলা নিঃশব্দে নিজের বিছানা হইতে উঠিল। পিতার ঘরের দ্বারের কাছে গিয়া শুনিল, তিনি গভীর নিদ্রায় নাসিকাধ্বনি করিতেছেন। সাবধানে দরজা খুলিয়া শীলা বাহিরে আসিল। ঊর্ধ্বে তখন এক আকাশ নক্ষত্র দপ্‌দপ্‌ করিতেছে, তাহারই অস্পষ্ট আলোতে সে বাংলো হইতে নামিয়া সহিসের ঘরের দিকে গেল। সহিসের ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছিল এবং ভিতর হইতে একটা অস্ফুট কাতরোক্তির শব্দ আসিতেছিল। শীলা আস্তে আস্তে কবাটে টোকা মারিয়া ডাকিল, 'ঝিমন!'

ঝিমন জাগিয়াছিল, বাহিরে আসিয়া শীলাকে দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেল, 'দিদি, তুমি এত রাত্রে এখানে!'

শীলা চুপিচুপি বলিল, 'ঝিমন, তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। এখান টম্‌টম্‌ জুতে আমাকে নিয়ে শহরে যেতে হবে।'

ঝিমন ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া শেষে বলিল, 'কি বলছ দিদি! এই রাত্তিরে—'

শীলা বলিল, 'হ্যাঁ, এই রাত্রে, এখনি। তোমাকে দশটাকা বখশিশ্‌ দেব। আর দেরী করো না, এখনি যেতে হবে।'

ঝিমন ব্যাকুল হইয়া বলিল, 'কিন্তু কেন, দিদি, কেন? এত রাত্রে শহরে কি এমন দরকার?'

শীলা কম্পিতস্বরে কহিল, 'সে কথায় কাজ নেই, ঝিমন; কিন্তু আজ আমাকে যেতেই হবে। জানি না শহর পর্যন্ত যাবার দরকার হবে কিনা।'

ঝিমন চিন্তা করিয়া কহিল, 'ঘোড়া যে ভারী থকে আছে, দিদি, সে কি যেতে পারবে?'

'পারবে। তাকে এক বোতল মদ খাইয়ে দাও।'

ঝিমন তখন বলিল, 'কিন্তু আমি যে কিছুতেই যেতে পারব না, দিদি। নুনুয়ার মা'র ব্যথা উঠেছে, আজ রাত্রেই ছেলে হবে। তাকে একলা ফেলে কি করে যাব?' ঝিমন কাতর দৃষ্টিতে শীলার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

পাঁচ মিনিট স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে শীলা বলিল, 'বেশ, তোমাকে যেতে হবে না। তুমি কেবল টম্‌টম্‌ জুতে রাস্তায় এনে দাও--আমি একাই যাব। কিন্তু দেখো শব্দ করো না। বাবা জেগে উঠ্‌লে আর যাওয়া হবে না।'

ভোর হইতে আর বিলম্ব নাই;—পূর্বদিকে একটা পাংশু শ্বেতাভা ক্রমশঃ পরি-

স্ফুট হইয়া উঠিতেছে, গাছপালার অস্ফুট মূর্তি পারিপার্শ্বিক স্বচ্ছতার মধ্যে জমাট অন্ধকারের মত দেখাইতেছে। সোমেশ নিজের বাড়ির গাড়ি-বারান্দার নীচে ক্যাম্প খাট পাতিয়া ঘুমাইতেছিল, পায়ের দিকে একপ্রকার অস্বস্তি অনুভব করিয়া জাগিয়া উঠিল। তারপর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া চক্ষু মুছিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার হৃৎস্পন্দন প্রায় স্তব্ধ হইয়া গেল।

সে দেখিল, মাটির উপর নতজানু হইয়া বসিয়া, তাহার পায়ের উপর উপুড় হইয়া মাথা রাখিয়া, পায়ের একটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া শীলা ঘুমাইতেছে।

অতি সন্তর্পণে পা ছাড়াইয়া লইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ শীলার ঘুমন্ত মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বিপুল স্নেহে তাহাকে বুকের কাছে তুলিয়া আনিয়া কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল, 'শীলা! শীলা!'

ঘুমন্ত শীলা চোখ না খুলিয়াই উত্তর দিল, 'উঁ।'

বাড়ির দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল না, ভেজানো ছিল মাত্র। সোমেশ শীলাকে লইয়া নিজের ঘরে বিছানার উপর শোয়াইয়া দিল। তারপর দিদির ঘরে গিয়া দিদির গা ঠেলিয়া চুপিচুপি বলিল, 'দিদি, ওঠ। শীলা এসেছে—আমার ঘরে ঘুমুচ্ছে। তুমি তাকে দেখো। আমি চন্দ্রনাথবাবুকে খবর দিতে চললুম।' বলিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া বাহির হইয়া গেল।

১৪ ভাদ্র ১৩৩৮

কুলপ্রদীপ

ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ মণিকারের একমাত্র মেয়ের সঙ্গে কলকাতার প্রসিদ্ধ কাঞ্চন ব্যবসায়ীর একমাত্র ছেলের বিয়ে। মণিকাঞ্চন সংযোগ।

জ্যোতিষী বলেন, 'রাজযোটক। এর ফলে যে সন্তান জন্মাবে সে হবে কুলপ্রদীপ।'

কুলপ্রদীপ পৌত্রের আশায় কাঞ্চন ব্যবসায়ী হারাধনবাবু হর্ষান্বিত; তাঁর কুমিরের মত মুখে হাসি এবং দাঁতের যেন অন্ত নেই।

মেয়েটির নাম ছবি। ভাল নামও আছে, কিন্তু সে-নামে দরকার নেই। ইয়মধিক মনোজ্ঞা। ছবি বেশী কথা কয় না, সব কথাতেই হাসে। এমন কি যখন চোখে জল তখনও হাসে। ষোলটি শরতের সোনালী কমল তার সর্বাঙ্গে। যেন একটি পাকা রসে-ফেটে-পড়া ডালিম।

ছেলের নাম ভোম্বল। পোশাকী নামও আছে—গজেন্দ্র। কোন্ নামটি বেশী

উপযোগী বোঝা যায় না। তরমুজের মত মুখের ওপর পাঁড় শসার মত একটি নাক। গ্রীবা নেই। রঙীন পাঞ্জাবি পরা দেহটি ফানুসের মত। মেদ-সুকোমল। ভয় হয় টুস্‌কি দিলেই ফেঁসে যাবে, আর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে একরাশ ধোঁয়া—

ভোম্বল শীতকালেও গরম জামা পরে না—শুধু ঢিলে হাতের পাঞ্জাবি। বন্ধুরা বলে, ভোম্বল যোগী, তাই তার শীত করে না। শত্রুরা বলে—ভোম্বলেরও শত্রু আছে—হবে না কেন? ভগবান ওকে দেড় ইঞ্চি পুরু ওভারকোট পরিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন—ওর গরম জামার দরকার কি? শুনে ভোম্বল বোকার মত হাসে, তার গলা থেকে নিতম্ব পর্যন্ত চর্বির ওভারকোট নেচে নেচে উঠতে থাকে।

বিয়ের রাত্রে শুভদৃষ্টির সময় চারিচক্ষের মিলন হল। ভোম্বল একগাল হাসে; মনে হয় যেন তরমুজে টাঁকি পড়ল। ভেতর থেকে লাল লাল শাঁস আর কালো কালো বিচি দেখা যায়।

ছবিও হেসে ফেলে, বরের চেহারা দেখে। তারপরই চোখ ছলছল করে ওঠে। কান্নাহাসি একসঙ্গে—রোদ আর বৃষ্টি।

যেন শ্যাল-কুকুরের বিয়ে।

২

এক বছর কেটে যায়। তারপর আরও ছ'মাস। ছবি শ্বশুর-ঘর করে। 'বন্ধ কারায় গন্ধক ধোঁয়া অ্যাসিড পটাশ মোনছাল।' ঐশ্বর্য আছে, কিন্তু সুখ? যৌবনের সুখ? শতদলের মত তার নবযৌবন মর্মের কোষ মেলে থাকে; পরাগ উড়ে যায়, রস ঝরে পড়ে। কিন্তু ভোমরা কৈ? তার বদলে কোলা ব্যাং—ড্যাব্‌ডেবে চোখ, পেট মোটা কোলা ব্যাং। ছবি তবু হাসে—মেঘে ঘেরা তৃতীয়ার চন্দ্রকলার মত, ফ্যাকাসে হাসি—তৃষ্ণাতুর।

কুলপ্রদীপের দেখা নেই; ডিস্‌টাণ্ট সিগ্‌নাল পর্যন্ত না।

হারাধনবাবু বিপত্নীক; বাড়ি দূরসম্পর্কীয়া কুটুম্বিনীতে ভরা। তারা হা হুতাশ করে—ছেলে হল না, রাজ-ঐশ্বর্য ভোগ করবে কে!

হারাধনবাবুর মুখভরা দাঁত ধারালো এবং হিংস্র হয়ে ওঠে। ভোম্বল বোকাটে হাসি হাসে, মেদ তরঙ্গিত দুল্‌কি হাসি।

বৌ বাঁজা। নইলে কুলপ্রদীপ আসতে এত বিলম্ব হয় কেন?

ঘটা করে বধূর চিকিৎসা আরম্ভ হয়। প্রথমে কবিরাজী। কবিরাজ ওষুধের ব্যবস্থা করেন। এমন তেজালো ওষুধ যে ঘটিবাটিতে পড়লে ঘটিবাটির গর্ভসঞ্চার হয়। ছবি এই তেজালো ওষুধ খায়। বুক পেট মুখ জ্বলে যায়, তবু খেতে হয়। অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠে আসে, তবু খেতে হয়। এই রকম ছ'মাস। ছবির চোখে জল মুখে হাসি। মনে জানে ওষুধ নিষ্প্রয়োজন, তবু ওষুধ খায়।

কিন্তু কুলপ্রদীপের দেখা নেই। ডিস্‌টাণ্ট সিগ্‌নাল পর্যন্ত না। কবিরাজী তেজালো ওষুধের নিবীর্যতা প্রমাণ হয়ে যায়।

ডাক্তার আসেন—অ্যালোপাথ। ছবিকে পরীক্ষা করে বলেন—বন্ধ্যা নয়, তবে জরায়ুর দোষ। ও কিছু নয়। কুলপ্রদীপের আগমন আমি সুগম করে দিচ্ছি।

ইন্‌জেকশন।

ছ'মাস ধরে ইন্‌জেকশন চলতে থাকে। ছবির সারা গা ঝাঁজরা শতচ্ছিদ্র হয়ে যায়। বসতে পারে না—শুতে পারে না; সর্বাঙ্গে ব্যথা। আর মনে? সে কথা বলে আর লাভ কি? তবু সে হাসে। কিন্তু সে-হাসি নিংড়োলে ঝর্ ঝর্ করে রক্ত পড়ে। বুকের

তাজা রক্ত।

এমনি করে বছর ঘুরে যায়।

চোখের কোলে কালি, ছবি ক্রমে শীর্ণ হতে থাকে। যেন গ্রীষ্মের ঝর্ণা, যেন তাপসী অপর্ণা। ক্রমে শয্যা আশ্রয় করে।

ছবির বাবা কৈলাসবাবু দেখতে আসেন। মেয়ে দেখে কেঁদে ফেলেন। মা-হারা মেয়ে, একটিমাত্র সন্তান। এই তার দশা!

ছবিকে তিনি বাড়ি নিয়ে যান। যাবার সময় হারাধনবাবু নোটিস দিয়ে দেন—আর একবছর তিনি দেখবেন, তারপরই আবার ছেলের বিয়ে। কুলপ্রদীপ তাঁর চাই-ই।

তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে ভোম্বল ন্যাকা-ন্যাকা বোকা-বোকা হাসে। পাড়ায় এই নিয়ে আলোচনা হয়। বন্ধুরা বলে, ভোম্বল যোগী—জিতেন্দ্রিয়—। শত্রুরা যা বলে তা শোনা যায় না, কারণ শোনবার আগেই কানে আঙুল দিতে হয়।

৩

ছবি বাপের বাড়ি এসে প্রাণখুলে হাসে। বাড়িতে বাপ ছাড়া আর কেউ নেই, কেবল ঝি চাকর। তবু এ বাড়িতে মন লাগে। এ বাড়িতে কুমির নেই, কোলা ব্যাং নেই; অনাগত কুলপ্রদীপের বিপুলায়তন কালো ছায়া নেই। ছবি আগেকার মত বাড়িময় হেসে খেলে ছুটোছুটি করে বেড়াতে চায়। কিন্তু শরীর দুর্বল—পারে না।

কৈলাসের মনে হারাধনের বিদায়কালীন নোটিস জেগে ওঠে। তিনি ডাক্তার ডাকেন।

পাড়ায় একজন নবীন ডাক্তার এসেছেন। বিলিতি পাস—এম আর সি পি। বয়স বত্রিশ—ভিজিটও তাই। কৈলাস তাঁকেই ডাকেন। মেয়ের রোগের ইতিহাস বলেন। বলতে বলতে প্রায় কেঁদে ফেলেন।

ডাক্তার মন দিয়ে শোনেন, তারপর রোগিণীর ঘরে যান। সুন্দর চেহারা, bed-side manners অতুলনীয়। ডাক্তার ছবিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করেন। কৈলাস ব্যাকুল নেত্রে চেয়ে থাকেন। ডাক্তার ছবিকে প্রশ্ন করেন। ছবি মুখ টিপে হাসে, তারপর চোখ বুজে উত্তর দেয়।

পরীক্ষা শেষ করে ডাক্তার উঠে দাঁড়াল। কৈলাসের মুখের দিকে চেয়ে বলতে চান—আপনার মেয়ের কোনও রোগ নেই, রোগ অন্যত্র। কিন্তু বলতে গিয়ে মুখে কথা বেধে যায়, করুণায় বুক ভরে ওঠে। একটু ভেবে বলেন—একমাস সময় পেলে আমি চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু রোজ রোগিণীকে দেখা চাই।

ডাক্তার চেষ্টা করবেন এই আহ্লাদে কৈলাস কাঁদো কাঁদো হয়ে পড়েন।

পরদিন থেকে নিয়মিত ডাক্তারের যাতায়াত আরম্ভ হয়। ডাক্তারের আসার সময়ের ঠিক নেই। কোনও দিন সকালে, কোনও দিন বিকেলে, আবার কখনও বা দুপুরে। কৈলাস কখনও উপস্থিত থাকেন, কখনও থাকতে পারেন না। ডাক্তারের ওপর অগাধ বিশ্বাস—বিলিতি ডাক্তার!

ডাক্তারের নাম শৈলেন। অল্পদিনের মধ্যে খুব পসার করে ফেলেছে। নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই। দুপুরবেলা যে ফুরসতটুকু পায় সেই সময়ে ছবিকে দেখতে আসে।

ছবির ঘরে গিয়ে শৈলেন জিগ্যেস করে—আজ কেমন আছো?

ছবি হাসে, ঘাড় বাঁকায়, মুখ টিপে বলে—ভাল আছি।

শৈলেন ছবির নাড়ী টিপতে বসে ধ্যানস্থ হয়ে পড়ে। পাঁচ মিনিট—দশ মিনিট—চোখ বুজে নাড়ী দেখে। ছবি ডাক্তারের মুখের দিকে আড়চোখে চেয়ে হাসে। তার

বুকের মধ্যে একরাশ নিশ্বাস জমা হয়ে ওঠে, তারপর সশব্দে বেরিয়ে আসে।

শৈলেন চম্‌কে উঠে বলে—ভয় নেই, শিগ্‌গির সেরে উঠবে।

ডাক্তারে রোগিণীতে চোখাচোখি হয়, তারপর দু'জনেই চোখ ফিরিয়ে নেয়। দু'জনেই জানে রোগ কী এবং কোথায়।

দু' হপ্তা কেটে যায়।

ছবির গালে ডালিম ফুল আবার ফুটে ওঠে। পাতাঝরা লতার মত শীর্ণ দেহ আবার নবপল্লবিত হয়। সারা দিন একলা বাড়িময় ঘুরে বেড়ায়। গুনগুন করে গান করে। সখি রে, কি পুছসি অনুভব মোয়।

ডাক্তার এলে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ডাক্তার জিগ্যেস করে—আজ কেমন আছো?

ছবি হাসে, ঘাড় বাঁকায়, বলে—সেরে গেছি। ও ওষুধ আর খাব না। বড্ড মিষ্টি, গলা কিট্‌কিট্‌ করে—

ডাক্তার ছবির হাত ধরে জানলার কাছে নিয়ে যায়; চোখের পাতা টেনে শরীরে রক্তের পরিমাণ নির্ণয় করে। বলে—আচ্ছা, অন্য ওষুধ দেব। টক্‌-টক্‌, মিষ্টি-মিষ্টি, খুব ভাল লাগবে।

তারপর একথা সেকথা হয়। ছবি হাসে, সহজ ভাবে গল্প করে। শৈলেনের বুকে ছবির হাসি ল্যান্‌সেটের মত বিঁধতে থাকে।

কৈলাসের সঙ্গে ডাক্তারের দেখা হলে কৈলাস জিগ্যেস করেন—এমন কেমন দেখছেন?

শৈলেন বলে—ভাল।

কৈলাস নিজের চোখেই তা দেখতে পান; গলদশ্রু হয়ে পড়েন। বলেন—সে রোগটা সারবে তো?

শৈলেন বলে—আশা করি।

আরও এক হপ্তা কাটে। ডাক্তার নিয়মিত আসে, একদিনও কামাই যায় না। ছবির রূপ হয়েছে আগের মত—একটি পাকা রসে-ফেটে-পড়া ডালিম।

শৈলেন প্রায়ই স্টেথস্কোপ আনতে ভুলে যায়। বাধ্য হয়ে, ছবিকে বিছানায় শুইয়ে তার বুকে মাথা রেখে, হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা নিরূপণ করতে হয়। হৃদ্‌যন্ত্রের মধ্যে তোলপাড় শব্দ শুনে ডাক্তারের ললাট চিন্তাক্রান্ত হয়। জিগ্যেস করে—বুক ধড়্‌ফড়্‌ করছে? ছবি উত্তর দেয় না, চোখ বুজে শুয়ে থাকে। একটু হাসে।

প্রায় রোজ এই রকম হয়।

কোনও কোনও দিন অজ্ঞাতে ছবির একখানা হাত ডাক্তারের মাথার ওপর পড়ে, চুলের ভেতর আঙুলগুলো অজ্ঞাতে খেলা করে, আবার অজ্ঞাতে সরে যায়। ডাক্তার রোগিণীর বুকের মধ্যে দুম্‌দুম্‌ শব্দ শুনতে পায়—যেন দুন্দুভি বাজছে। দশ মিনিটের কমে বুকের ওপর থেকে মাথা তুলতে পারে না।

বেশী কথা হয় না। কথার দরকার হয় না, চারটে চোখ যেখানে এত বাচাল, সেখানে রসনা নীরব হয়েই থাকে।

ডাক্তার বলে—যখন একেবারে সেরে যাবে, আমি আর আসব না—তখন কি করবে?

ছবি হাসে, বলে—শ্বশুরবাড়ি যাব। চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্‌ করে জল পড়ে।

৪

একমাস ফুরিয়ে আসে—আর চার দিন বাকি।

ভোম্বল শ্বশুরবাড়ি আসে। ছবির চেহারা দেখে তার সারা গায়ে আহ্লাদের ভূমিকম্প

জেগে ওঠে—আলিপুরের সাইস্‌মোগ্রাফে সে কম্পন ধরা পড়ে।

ছবিও হেসে লুটিয়ে পড়ে। তার মনে উদয় হয় দুটো চিত্র—তার স্বামীর আর শৈলেন ডাক্তারের—পাশাপাশি।

ভোম্বল বলে—বাবা বললেন তাই নিতে এসেছি। হে হে—

ছবি বলে—আজ নয়, পরশু এসে নিয়ে যেও।

ভোম্বল ফিরে যায়। যাবার সময় ছবির দিকে তাকিয়ে কোল টেনে হাসে—হে হে—

দুপুরবেলা ডাক্তার আসে।

ছবি বলে—পরশু শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি।

তার মুখে বার্ণবিদ্ধ হাসি—crucified.

ডাক্তারের আত্মসংযম হারিয়ে যায়। বলে—ছবি!

দুপুরবেলার অলস বাতাসে ঘরের দরজা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যায়। দরজায় ইয়েল্‌ লক্‌ লাগানো, কড়াত করে শব্দ হয়—

দুপুরবেলার অলস বাতাস প্রকৃতির কোন্‌ ইঙ্গিত বহন করে বেড়ায়?

৫

ছবি শ্বশুরবাড়ি যায়। টক্‌টকে লাল রেশমী শাড়ি পরা—যেন বিয়ের কনে। অনাস্বাদিত মধু—অনাবিদ্ধ রত্ন।

গাড়ি-বারান্দায় মোটর দাঁড়িয়ে—তার মধ্যে ভোম্বল। গাড়ির একদিকের স্প্রিং একেবারে দমে গেছে।

কৈলাস আর ডাক্তার শৈলেন পাশাপাশি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। কৈলাসের চোখ ছলছল; শৈলেনের মুখ পাথরে কোঁদা—নিশ্চল।

ছবি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে মোটরে গিয়ে ওঠে। তারপর বাড়ির দিকে ফিরে তাকায়। হয়তো বাপের দিকেই তাকায়। তার মুখে বার্ণবিদ্ধ হাসি— crucified.

মোটর চলে যায়।

৬

তিন মাস কাটে।

হারাধনবাবুর মুখ-গহ্বরের অন্ধকার বারম্বার দংষ্ট্রাময়ূখে খণ্ড বিখণ্ড হতে থাকে। ভোম্বল মেদতরঙ্গিত দুলকি হাসি হাসে।

কুলপ্রদীপের ডিস্‌টান্ট সিগ্‌নাল পড়েছে।

বন্ধুরা আর কিছু বলে না, কেবল ভোম্বলকে অনুরোধ করে—খাওয়াও!

শত্রুরা যা বলে তা শোনা যায় না, কারণ শোনবার আগেই কানে আঙুল দিতে হয়।

৭ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮

ইতর-ভদ্র

রাত্রি প্রায় এগারটার সময় রসা রোডে প্রফেসার সরকারের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া সমরেশ বাসায় ফিরিতেছিল। অনেকটা পথ যাইতে হইবে, তাহার বাসা মির্জাপুর স্ট্রীটে, কিন্তু এত রাত্রে ট্রাম ও বাসের যাতায়াত কমিয়া আসিয়াছিল; তবু কোনো একটা বাহন পাইবার আশায় সমরেশ ক্লান্তভাবে চৌরঙ্গীর রাস্তা দিয়া চলিয়াছিল।

পাশ দিয়া দুটা খালি বাস চলিয়া গেল, একটা শূন্য ট্যাক্সির চালক সতৃষ্ণভাবে তাহার দিকে তাকাইতে তাকাইতে ধীরগতিতে বাহির হইয়া গেল। সমরেশ লক্ষ্য করিল না।

এইরূপ অসামান্য অমনোযোগের কারণ, আজ তাহার জীবনে ঘৃণা হইয়া গিয়াছিল। সে অত্যন্ত হতাশভাবে এই কথাটাই তোলাপাড়া করিতে করিতে চলিয়াছিল যে, সে ভদ্রলোক নয় এবং কোনো কালেই ভদ্রলোক হইতে পারিবে না। সুতরাং তাহার পক্ষে বাঁচিয়া থাকা না থাকা দুই সমান।

বাপের পয়সা থাকিলেই যে ভদ্রলোক হওয়া যায় না একথা কে না জানে? প্রকৃত ভদ্রলোক হইতে হইলে আরো কতকগুলি সদ্‌গুণের আবশ্যক। বিলাতী মতে জেণ্টল্‌ম্যান বলিতে কতকগুলা সদাচারের সমষ্টি বুঝায়, আমাদের দেশীশাস্ত্রেও আচার বিনয় বিদ্যা প্রভৃতি শব্দের দ্বারা শিষ্টতার একটা আদর্শ খাড়া করা হইয়াছে। সমরেশ বিবেচনা করিয়া দেখিল, সেরূপ গুণ তাহার একটিও নাই। বস্তুতঃ সে যে ভদ্রলোক নয়, এ সন্দেহ তাহার বহুপূর্বেই জন্মিয়াছিল কিন্তু আজ তাহা একেবারে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

প্রথমতঃ, সে স্ত্রীলোকের সঙ্গে সহজ ভাবে কথা কহিতে পারে না কেন? অন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে যদি বা পারে, সুষমাকে দেখিলেই তাহার বাক্‌রোধ হইবার উপক্রম হয় কেন? তাহার বুদ্ধি আছে, বুদ্ধি না থাকিলে কেহ বি.এ. পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে অনার্স লইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারে না। তবু সুষমার সঙ্গে কথা কহিবার একটা দূর সম্ভাবনা উদয় হইবামাত্র তাহার বাহ্যেন্দ্রিয়গুলা এবং সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি-সুদ্ধি অমন জড়ত্ব প্রাপ্ত হয় কেন?

দ্বিতীয় কথা, ভূপেন নামধারী তাহার যে একজন সহপাঠী আছে, যাহার সহিত গত চার বৎসর যাবৎ সে বিদ্যার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আসিতেছে, তাহাকে দেখিবামাত্র আজকাল তাহার মাথায় খুন চড়িয়া যায় কেন? ভূপেন অত্যন্ত মিশুকে এবং স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে কথা কহিতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে মুখ খারাপ করিয়া গালি দিবার প্রবৃত্তি কোন ভদ্রলোকের হইয়া থাকে?

তৃতীয় কথাটা আজ প্রফেসার সরকারের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া অত্যন্ত রূঢ় এবং লজ্জাকর ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে,—তাহা এই যে, সমরেশ শিক্ষিত ভদ্রসমাজে বিচরণ করিবার মত শিষ্টাচার ও আদব-কায়দা কিছুই জানে না। ইহার পর নিজেকে ভদ্রলোক বলিয়া পরের কাছে ঘোষণা করা দূরের কথা, নিজের কাছে স্বীকার করাও সমরেশের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

নিজের সামাজিক চালচলন নিরপেক্ষভাবে অন্যের সহিত তুলনা করিয়া বিচার করিবার উপযুক্ত অন্তর্দৃষ্টি অনেকেরই থাকে না; সমরেশের সেটা ছিল। তাই সে আজ নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিয়াছে যে, সে ভদ্রলোক নয়। কিন্তু ও কথাটা অনেকবার

বলা হইয়া গিয়াছে।

এই সূত্রে কিন্তু একটা কথা আজ সমরেশের কিছুতেই মনে পড়িল না; মনে পড়িলে তাহার মন নিশ্চয় অনেকটা পরিষ্কার হইয়া যাইত। বছর দুয়েক আগে তাহার কলেজের জনৈক সাহেব প্রফেসার অন্যান্য কয়েকটি ভাল ছেলের সঙ্গে তাহাকেও ডিনারে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। খাইতে গিয়া সমরেশ দেখিল টেবিলের উপর ডিনার পরিবেষণ হইয়াছে এবং ছুরি কাঁটা দিয়া খাইবার ব্যবস্থা। তাহা দেখিয়া সে বলিয়াছিল, 'স্যার, ছুরি কাঁটা চালাতে তো জানি না, খাব কেমন করে?'

পাদ্রী প্রফেসার হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'যেমন করে খেয়ে থাকো তেমনি করে খাবে; ভগবান তোমাকে অতগুলো আঙুল দিয়েছেন কি জন্যে?

সমরেশ মাথা নাড়িয়া বলিয়াছিল, 'না স্যার, তা হতে পারে না, ছুরি কাঁটা দিয়েই খাব। আপনারা কিন্তু হাস্‌তে পাবেন না।'

সেদিন সমরেশ ছুরি কাঁটা দিয়াই খাইয়াছিল এবং তাহার খাইবার ভঙ্গী দেখিয়া প্রফেসার সাহেব ও অন্যান্য ক্রিশ্চান ছেলেরা খুব হাসিয়াছিল। কিন্তু সমরেশ তিলমাত্র লজ্জা বা ক্ষোভ অনুভব করে নাই বরং নিজেও হাসিয়া বলিয়াছিল, 'প্রথমবারেই কি হয়। আবার নিমন্ত্রণ করে দেখ্‌বেন, স্যার, টেব্‌ল-ম্যানার্স সব দুরস্ত হয়ে গেছে।'

যাঁহারা এতদূর পর্যন্ত ধৈর্য ধরিয়া পড়িয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয় অধীর হইয়া ভাবিতেছেন—কথাটা কি?

কথাটা সেই পুরাতন কথা। পৃথিবীতে যখন ভদ্রলোক বলিয়া কোনো জীবের বাস ছিল না তখন এ কাহিনীর আরম্ভ হইয়াছিল, এবং ঐ জীবটি পৃথিবী হইতে যখন মরিয়া নিঃশেষ হইয়া যাইবে তখনো এ কাহিনীর সমাপ্তি হইবে না।

কিন্তু একেবারে আদিম কাল হইতে না হোক ব্যাপারটা আর একটু আগে হইতে বলা দরকার।

সমরেশ কলিকাতার ছেলে নয়, তাহার বাপ বাঙলা দেশেরই কোনো একটা বড় শহরের একজন বিখ্যাত ডাক্তার। সমরেশ যখন সম্মানের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল তখন তিনি তাহাকে কলিকাতায় একটা বাসা করিয়া দিয়া কলেজে ভর্তি করিয়া দিয়া গেলেন। সমরেশ একাকী বাসায় থাকিয়া গভীর মনঃসংযোগে পড়াশুনা আরম্ভ করিয়া দিল এবং নিয়মিত কলেজ যাইতে লাগিল।

আই.এ. পরীক্ষায় সমরেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিল। যে ছেলেটি ফার্স্ট হইল তাহার নাম ভূপেন ঘোষ। ভূপেনকে সমরেশ কখনো চোখে দেখে নাই—ভূপেন অন্য কলেজের ছাত্র—কিন্তু আগামীবার তাহাকে পরাস্ত করিবার জন্য সে শুরু হইতেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল।

বি.এ. পরীক্ষায় সমরেশ ফার্স্ট হইল, ভূপেন দ্বিতীয় স্থান পাইল। তারপর এম.এ. পড়িবার সময় দুইজনে একই কলেজে নাম লিখাইল। দুইজনেরই একই বিষয়—এক্সপেরিমেণ্টাল সাইকলজি। প্রথম কিছুদিন দুইজনে একটু দূরে দূরে রহিল, তারপর সামান্য একটু আলাপ হইল। ভূপেন অত্যন্ত শৌখীন ও মার্জিত ভাবের ছোকরা কিন্তু সে-ই যাচিয়া আলাপ করিল, 'আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়া সৌভাগ্য বলে মনে করি।'

সমরেশ হাসিয়া উত্তর করিল, 'সেটা উভয়তঃ। গোড়া থেকে যাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে তাঁকে জানবার ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। এ ভালই হল আমাদের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। এবার কিন্তু আপনার পালা।'

ভূপেন বলিল, 'এ দ্বন্দ্বে আমার দিক থেকে কোনো গ্লানি নেই, আছে শুধু

প্রতিযোগিতার উদ্দীপনা।'

সমরেশ বলিল, 'এ পক্ষেও তাই। হারলে অপমান নেই কিন্তু জিতলে আনন্দ আছে।'

পরিচয় কিন্তু ইহার বেশী অগ্রসর হইতে পাইল না। হঠাৎ একদিন মেয়েলি হাতের একটি ক্ষুদ্র কাঁচি ইহাদের মধ্যেকার ক্ষীণ যোগসূত্রটিকে কাটিয়া দ্বিখণ্ড করিয়া দিল।

সুষমা প্রফেসার সরকারের ভাগিনেয়ী—বয়স আঠারো বৎসর। সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মত তার চেহারা। সে জুতামোজা পরে, একাকিনী পথ দিয়া সোজা হাঁটিয়া যায় এবং প্রয়োজন হইলেই অন্য দেশী চালে কথাবার্তা বলে। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া মনে হয় সে সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা। অন্ততঃ সমরেশ আজ পর্যন্ত তাহার অন্য উপমা খুঁজিয়া পায় নাই। সে কালো কি ফর্সা, সুন্দরী কি মাঝারি, ব্লন্ড কি ব্রুনেটি এসব কথা ভাবিয়া দেখিবার বেচারা অবসর পায় নাই। এ বিষয়ে বিশ্লেষণ-শক্তি প্রস্ফুটিত হইবার পূর্বেই মুকুলে ঝরিয়া গিয়াছিল।

সুষমা আই.এ. পাস করিয়া বেথুন কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়িতেছে; সে হপ্তার মধ্যে দু'তিন দিন মামার লেকচার শুনিতে আসিত, প্রফেসার সরকার অনুমতি দিয়াছিলেন। মামার ক্লাসে ছাত্রের সংখ্যা খুবই কম, গুটি সাত-আটের বেশী নয়। তাহাদেরই মধ্যে একটু তফাতে বসিয়া সুষমা একাগ্রমনে মামার উপদেশ শুনিত এবং ঘণ্টা বাজিলে কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মত উঠিয়া চলিয়া যাইত। দোতলা হইতে সিঁড়ি দিয়া দ্রুত লঘুপদে নামিয়া ফুটপাথের উপর কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিত, পথে ট্যাক্সি দেখিলে সেই ট্যাক্সিতে চড়িয়া বাড়ি যাইত। তাহার বাড়ি শহরের উত্তর দিকে, বোধ হয় হাতীবাগান অঞ্চলে। ক্লাসের একটি ছাত্র বিশেষ করিয়া তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল।

মনস্তত্ত্ব ক্লাশের ছাত্রদের মধ্যে অকস্মাৎ এই মেয়েটির অকুণ্ঠিত আগমনে এমন একটি মনস্তত্ত্বের সৃষ্টি হইল যাহা প্রফেসার সরকারের জ্ঞানগর্ভ লেকচারের বিষয়ীভূত নয়।

ভূপেনের সহিত মেয়েটির বোধ হয় পূর্ব হইতেই পরিচয় ছিল। কারণ, সমরেশ লক্ষ্য করিল, প্রথম দিন সুষমা ক্লাসে পদার্পণ করিতেই ভূপেন তাহার দিকে চাহিয়া একটু ঘাড় নাড়িল। সুষমাও মৃদু হাসিয়া তাহার প্রত্যুত্তর দিল। অপরিচিত যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া কোনো ভদ্রমহিলাই হাসে না, সুতরাং সমরেশের অনুমান যে অভ্রান্ত তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু আলাপ যে খুব ঘনীভূত নয় তাহা বুঝিয়া সমরেশ অনেকটা স্বস্তি অনুভব করিল। প্রফেসার ক্লাসে আসিবার পূর্বে কখনো কখনো ভূপেন গায়ে পড়িয়া মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করিবার চেষ্টা করিত; কিন্তু আলাপ 'কেমন আছেন' 'ভাল আছি'র বেশী কোনদিনই অগ্রসর হইত না, হয় প্রফেসার আসিয়া পড়িতেন নয় সুষমা পাঠ্যপুস্তকে মনোনিবেশ করিত। সমরেশ দূর হইতে তাহাদের কথার মৃদুগুঞ্জন উৎকর্ণ হইয়া শুনিত এবং মনে মনে অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিত।

এইভাবে মাস দুই কাটিবার পর একদিন বেলা তিনটার সময় একটা ব্যাপার ঘটিল। ব্যাপার এমন কিছু গুরুতর নয় কিন্তু স্নায়ুমণ্ডলীর অন্ধ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে প্রফেসার সরকার যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার এমন চমৎকার দৃষ্টান্ত বড় একটা চোখে পড়ে না।

একটা ক্লাস শেষ হইয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় ক্লাসের প্রতীক্ষায় সমরেশ দোতলায় সিঁড়ির ঠিক নীচেই অন্যমনস্কভাবে পায়চারি করিতেছিল। সুষমা মামার সহিত কি একটা কথা কহিবার পর অভ্যাসমত দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসিতেছিল,

হঠাৎ সিঁড়ির শেষ ধাপে আসিয়া তাহার পা পিছলাইয়া গেল। সে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া যাইতেছিল, আত্মরক্ষার চিন্তাহীন তাড়নায় সম্মুখস্থ সমরেশের গলা জড়াইয়া ধরিল। হঠাৎ অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় সমরেশ কাঠের খোঁটার মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং একটিও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিল না।

দারুণ লজ্জায় সমরেশের গলা ছাড়িয়া দিতেই সুষমা আবার পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিল। মাথার মধ্যে বুদ্ধি নামক যে এক পদার্থ আছে তাহা সমরেশের সম্পূর্ণ বিস্মরণ হইয়াছিল, তবু সে না বুঝিয়া সুঝিয়াই সুষমার একখানা হাত টানিয়া ধরিয়া রহিল।

ক্লিষ্ট হাসিয়া সুষমা বলিল, 'পা মচ্‌কে গেছে।'

সমরেশ নির্বাক হইয়া রহিল, বিস্ময়ের চিহ্ন ভিন্ন তাহার মুখে আর কিছুই প্রকাশ পাইল না।

এমন সময় ভূপেন কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, 'এ কি! পড়ে গেছেন নাকি? দেখি দেখি, তাইতো! অ্যাঙ্ক্‌ল স্প্রেন হয়েছে দেখছি! এরি মধ্যে ফুলে উঠেছে। নিন্‌, আমার কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়ান, এখন লজ্জা করবার সময় নয়।—মিত্তির, একটা ট্যাক্সি।'

মিত্তির, অর্থাৎ সমরেশ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকিয়া উঠিয়া ট্যাক্সি ডাকিতে ছুটিল।

ট্যাক্সি আসিলে সুষমা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ভূপেনের স্কন্ধে ভর দিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিল। ভূপেনও তাহার পিছন পিছন গাড়িতে গিয়া উঠিল, চালককে বলিল, 'চালাও হাতীবাগান, জল্‌দি।'

সুষমা আপত্তি করিয়া বলিল, 'আপনার যাবার দরকার নেই—'

ভূপেন বলিল, 'বিলক্ষণ! আপনি গাড়ি থেকে নামবেন কি করে?'

পায়ের যন্ত্রণায় সুষমার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, কথা কাটাকাটি করিবার তাহার শক্তি ছিল না, সে সমরেশের দিকে ফিরিয়া হাসিবার একটা চেষ্টা করিয়া বলিল, 'ধন্যবাদ সমরেশবাবু'—বলিয়া দুই করতল একবার যুক্ত করিল।

প্রত্যুত্তরে সমরেশের মুখ দিয়া কেবল বাহির হইল, 'না না না—' কিন্তু তখন ট্যাক্সি চলিয়া গিয়াছে।

সমরেশ ফুটপাথে দাঁড়াইয়া রহিল, মিনিটখানেক পরে তাহার স্মরণ হইল যে সুষমার নমস্কারের প্রতিনমস্কার করা হয় নাই।

সেদিন আর ক্লাস করা হইল না। বাড়ি ফিরিবার পথে সমস্ত ব্যাপারটা তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া সমরেশ তাহার মধ্যে নিজের গৌরবসূচক একটা ঘটনাও খুঁজিয়া পাইল না এবং অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া মনে মনে সিদ্ধান্ত করিল যে সে এখনো ভদ্রলোক হইতে পারে নাই। কোন্‌ সময় কি বলা এবং কি করা উচিত ছিল, তাহার একটা জীবন্ত অভিনয় তাহার মনের চিত্রপটের উপর খেলিয়া গেল। কিন্তু তখন আর উপায় নাই। তিথি অনুকূল ছিল বটে কিন্তু শুভলগ্ন অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া সমরেশের কল্পনার রঙ্গমঞ্চে এই ক্ষুদ্র ঘটনাটির বহুবার পুনরভিনয় হইয়া গেল। এবং এই অভিনয়ে সে এমন বাগ্মিতা ও প্রত্যুৎপন্নমতি দেখাইল, সুষমার প্রতি কথার এমন সুন্দর ও সরস উত্তর দিল যে সে নিজেই বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, এমন চমৎকার ভাবে কথা কহিবার বুদ্ধি যখন তাহার আছে তখন কাজের বেলায় শুধু 'না না না' ছাড়া আর কিছুই সে বলিতে পারিল না কেন?

আর একটা কথা, হতভাগা ভূপেনটা ঠিক সেই সময় কোথা হইতে আসিয়া জুটিল!

সে অমন অতর্কিতে আসিয়া পড়িয়া নির্লজ্জভাবে বাক্যচ্ছটা বিস্তার না করিলে তো সমরেশ এমন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িত না। ভূপেন যেন ইচ্ছা করিয়া তাহাকে অপদস্থ করিবার জন্যই এমনটা করিয়াছে। আর, ট্যাক্সিতে চড়িয়া সুষমার সংগে যাইবার কি দরকার ছিল? গাড়ি হইতে সুষমা নামিতে পারুক না পারুক ভূপেনের কি? অসভ্য বর্বর কোথাকার!

সমরেশ নিজে ভদ্রলোক না হইতে পারে কিন্তু ভূপেনটা যে তাহার চেয়েও ছোটলোক, উপরন্তু নির্লজ্জ এবং বেয়াদব তাহাতে সমরেশের সন্দেহ রহিল না।

তবু এইরূপ আত্মগ্লানি ও বিদ্বেষের মধ্যে দুটি জিনিস তাহার মনে শেষরাত্রির সুখস্বপ্নের মত জড়াইয়া রহিল। একটি, সুষমা তাহার নাম জানে, নিশ্চয় মামার নিকট তাহার বিষয় শুনিয়াছে। দ্বিতীয়, নিজের কণ্ঠদেশে সুষমার ভয়ব্যাকুল বাহুর নিবিড় বন্ধনের স্পর্শানুভূতি।

ইহার পর একমাস সুষমা আসিল না। পায়ের জন্যই আসিতে পারিতেছে না তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রফেসার সরকারকে স্বচ্ছন্দে সুষমার কুশলপ্রশ্ন করা যাইতে পারিত। কিন্তু তিনি মুখে কিছু না বলুন মনে মনেও তো ভাবিতে পারেন,—সুষমার জন্য তোমার এত দুশ্চিন্তা কেন হে বাপু? এই লজ্জায় সমরেশ তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

কিন্তু ভূপেন যে সুষমা সম্বন্ধে সংবাদ রাখে তাহা সে বুঝিয়াছিল। কোন্ অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রভাবে বুঝিয়াছিল বলা যায় না; কিন্তু নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিল। সুতরাং ভূপেনকে জিজ্ঞাসা করিলেই সুষমার খবর পাওয়া যাইবে তাহাও একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু তবু সমরেশ ভূপেনকে প্রশ্ন করিল না, ভূপেনের মারফতে সুষমার কুশল জানিবার হীনতা সে ঘৃণার সহিত বর্জন করিল। উপরন্তু ভূপেনের সহিত পূর্বে যা দু'একটা কথা হইত তাহাও বন্ধ হইয়া গেল।

কিন্তু সর্বদা আত্মবিশ্লেষণ করা যাহার অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে তাহার পক্ষে মনকে চোখ ঠারা চলে না। ভূপেনের প্রতি বিদ্বেষের মূলে যে ভূপেনের কোনো সত্যকার অপরাধ নাই বরঞ্চ নিজের অক্ষমতাই নিহিত আছে, এই নিগূঢ় সত্যটি গোপন কাঁটার মত নিরন্তর সমরেশের বুকের মধ্যে খচ্ খচ্ করিতে লাগিল।

পা ভাল হইবার পর সুষমা যেদিন প্রথম কলেজে আসিল সেদিন সমরেশ দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল, সুষমা সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিয়া সম্মুখেই সমরেশকে দেখিয়া সহাস্যমুখে তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। দু'টি হাত একত্র করিয়া একটি নমস্কার করিয়া বলিল, 'একমাস আসতে পারিনি—আপনারা নিশ্চয় খুব এগিয়ে গেছেন। এখন আপনাদের নাগাল পাওয়া কি আমার পক্ষে সম্ভব হবে সমরেশবাবু?'

সমরেশ একেবারেই তৈরী ছিল না, তাহার কান দুটা লাল হইয়া অসম্ভব রকম ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। এবং তালু হইতে কণ্ঠ পর্যন্ত শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল।

সুষমা বলিল, 'আপনার নোটগুলো আমায় একবার দেখাবেন, যতটা পারি টুকে নেব। মামার তো লেখা নোট নেই—মুখে মুখে যা ডিক্‌টেট্ করেন।'

সমরেশ ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, তারপর একবার কাশিয়া ভগ্নস্বরে কহিল, 'আপনার পা—আপনার পায়ের—'

সুষমা যেন শুনিতে পায় নাই এমনিভাবে বলিল, 'নোটগুলো দেবেন, কৃপণতা করবেন না যেন।' বলিয়া প্রস্থানোদ্যতা হইল।

সমরেশ পুনরায় ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—এবার গলার স্বর অনেকটা সাফ্ হইয়াছে,— 'আপনার পা এখন বেশ—' এই পর্যন্ত বলিয়াই হঠাৎ একেবারে মূক হইয়া গেল।

সুষমার মুখের উপর লজ্জার যে অরুণাভা ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল তাহার কারণটা সহসা বিদ্যুৎচমকের মত বিকশিত হইয়া যেন তাহার মস্তিষ্ক পুড়াইয়া দিয়া গেল। পা-মচকানোর সঙ্গে এমন একটা দৈবাৎকৃত লজ্জাকর ঘটনা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে গ্রথিত হইয়া আছে যাহার ইঙ্গিত পর্যন্ত সুষমার পক্ষে মস্ত সঙ্কোচের কারণ হইতে পারে, তাহা আচম্বিতে স্মরণ করিয়া সমরেশের জিহ্বা একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেল। সুষমা চলিয়া যাইবার পর সে বারম্বার নিজেও মস্তকের উপর অশনিসম্পাত কামনা করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল, এত বড় গাধা গরু গবেটের মত প্রশ্ন সে করিতে গেল কেন? তাছাড়া, স্ত্রীলোকের পায়ের সম্বন্ধে কোনোপ্রকার কৌতূহলই যে ঘোর অশ্লীলতা।

ক্লাস শেষ হইবার পর সুষমার সহিত সমরেশের আবার চোখাচোখি হইল। সুষমা আবার হাসিমুখে বলিল. 'সমরেশবাবু, ভুলবেন না যেন। কাল তো আমি আসব না, পরশু যেন খাতাগুলো পাই।'

সমরেশ অতিমাত্রায় লাল হইয়া উঠিয়া বলিল, 'আচ্ছা—নিশ্চয়! সে আর আপনাকে—তা বেশ তো, কালই আমি—'

ভূপেন আসিয়া তাহাদের মধ্যে যোগ দিয়া বলিল, 'কোন্ খাতার কথা বলছেন? ও, নোটের খাতা। তা সেজন্যে আপনি ভাববেন না। আপনার জন্যে বিশেষ করে আমি আর এক কপি তৈরী করে রেখেছি, আজই সন্ধ্যাবেলা আপনার বাড়িতে পৌঁছে দেব।'

সুষমা কৃতজ্ঞস্বরে বলিল, 'ধন্যবাদ ভূপেনবাবু।' তারপর কুণ্ঠিতভাবে সমরেশের দিকে তাকাইয়া বলিল, 'কিন্তু সমরেশবাবু—'

ভূপেন বাধা দিয়া বলিল, 'ও'র ভালই হল। নিজের কপিটা আপনাকে দিলে ও'র পড়াশুনোর হয়তো ব্যাঘাত হত।—চলুন, আপনার ট্যাক্সি ডেকে দিই।'

সেদিন বাসায় ফিরিয়া সমরেশ দেখিল তাহার বাবার নিকট হইতে এক পত্র আসিয়াছে। অন্যান্য কথার পর তিনি লিখিয়াছেন—

'তোমার মা তোমার বিবাহের জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছেন। কিন্তু আমি তোমার মত ও রুচির বিরুদ্ধে কিছু করিতে চাই না। তুমি নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ কর ইহাই আমার ইচ্ছা। নিজের ও আমাদের সুখ সুবিধা বিবেচনা করিয়া কাজ করিবার বয়স ও বুদ্ধি তোমার হইয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ে তোমার মতামত জানাইবে।'

সমরেশ চিঠি পড়িয়া তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর দিতে বসিল; লিখিল—'বাবা, কোনো ভদ্রমহিলাকে বিবাহ করিবার উপযুক্ত সামাজিক শিষ্টতা ও ভদ্রতা আমি এখনো শিখি নাই। যদি কখনো শিখি আপনাকে জানাইব।'

এই লিখিয়া তিক্ত অন্তঃকরণে পোস্টকার্ডখানা নিজের হাতে ডাকে দিয়া আসিল।

ইহার পর আরো কয়েকমাস কাটিয়া গিয়াছে। এই মাস কয়েকের মধ্যে অনেকবার সুষমা সমরেশের সহিত কথা কহিয়াছে, সমরেশও কতকটা বুদ্ধিবিশিষ্ট প্রাণীর মত তাহার জবাব দিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু অন্তর হইতে সঙ্কুচিত জড়তা কিছুতেই দূর করিতে পারিতেছে না। সুষমার কথাগুলির মধ্যে তাহার প্রতি যে একটি নম্র শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় তাহা সে বুঝিতে পারে—বেশ উৎসাহিত হয়। কিন্তু কোথা হইতে দুরপনেয় কুণ্ঠা আসিয়া তাহার স্বচ্ছন্দ মেলামেশার পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। নিজের আচরণ প্রতি পদে পরীক্ষা করিতে করিতে আচরণটা প্রতি পদেই আড়ষ্ট ও অস্বাভাবিক হইয়া উঠে।

যখন একলা থাকে তখন নিজেকে শত ধিক্কার দিয়া ভাবে, সুষমা তাহার অসভ্যের মত আচরণ দেখিয়া নিশ্চয় মনে মনে হাসে ও উপেক্ষা করে। হয়তো তাহাকে আরো

হাস্যাস্পদ করিবার জন্যই অনেক সময় নিজে উপযাচিকা হইয়া কথা কহিতে আসে।

কিন্তু একথাটা সে কিছুতেই সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারে না যে তাহার লাজুক ও রমণী-ভীরু স্বভাবের বর্ম ভেদ করিয়া কেহ তাহার নিভৃত অন্তরের সন্ধান পাইতে পারে। যাহা বাহিরে প্রকাশ তাহাই তো লোকে দেখিবে—মনের খোঁজ পাইবার অন্য পথই বা কোথায়?

সেদিন ক্লাস শেষ হইবার পর সমরেশ বাড়ি যাইতেছে এমন সময় কলেজের চাপরাসি আসিয়া জানাইল যে প্রফেসার সরকার তাহাকে সেলাম দিয়াছেন। প্রবীণ প্রফেসারের জন্য একটি আলাদা ঘর নির্দিষ্ট ছিল, সমরেশ পর্দা সরাইয়া সেখানে প্রবেশ করিয়া দেখিল প্রফেসারের নিকট ভূপেন ও সুষমা উপস্থিত রহিয়াছে। অজানা আশঙ্কায় তাহার বুকের ভিতর তোলপাড় করিয়া উঠিল।

মেধাবী ছাত্র ও সংযত আত্মসমাহিত প্রকৃতির লোক বলিয়া সমরেশকে প্রফেসার সরকার মনে মনে শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি ঈষৎ হাসিয়া একখানা চেয়ার নির্দেশ করিয়া বলিলেন, 'বসো সমরেশ।'

সমরেশ বসিল। প্রফেসার সরকার বলিলেন, 'কাল আমার জন্মতিথি। একসঙ্গে বসে একটু আহারাদির বন্দোবস্ত করা গেছে। নিজের জন্মতিথিতে উৎসব করা আমার ভাল লাগে না, কিন্তু সুষমা শোনে না—প্রতি বৎসর করতে হয়। এখন ওটা একটা অনুষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাহোক, তুমি আর ভূপেন কাল রাত্রে আমার বাড়িতেই আহারাদি করবে, নিমন্ত্রণ রইল।'

সুষমা হাসিয়া বলিল, 'মামা, ঐ রকম করে বুঝি নেমন্তন্ন করে? বলতে হয়, মহাশয়, কল্য রাত্রে মদীয় রসা রোডস্থ ভবনে আগমনপূর্বক—তারপর কি বলতে হয় সমরেশবাবু?'

সমরেশ একটা ঢোক গিলিয়া ক্ষীণ হাস্যে বলিল, 'শুভকর্ম সম্পন্ন করাইবেন; পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম, নিবেদন ইতি।'

সুষমা কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। কথাটা বলিয়া সমরেশও একটু খুশী হইয়াছিল, হাসি শুনিয়া তাহার সারা গা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সুষমাকে এমনভাবে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে সে আর কখনো শুনে নাই।

প্রফেসার সরকারও হাসিয়া বলিলেন, 'ঐ হল। সকাল সকাল এসো কিন্তু। আরো অনেকেই আসবেন। সুষমা সকাল থেকেই হাজির থাকবে, ও-ই বলতে গেলে তোমাদের হোস্টেস। ওর মামী তো রুগ্ন শরীর নিয়ে কোনো কাজই করতে পারেন না।'

সমরেশ উঠিয়া—'যে আজ্ঞে'—বলিয়া বিদায় লইবার উপক্রম করিল।

ভূপেন বলিল, 'আমি এইমাত্র প্রফেসার সরকারকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছিলুম—তাঁর জীবনে এই দিনটি যেন বারবার ফিরে আসে।'

মুহূর্ত মধ্যে সমরেশের মুখ মলিন হইয়া গেল। অভিনন্দন তাহারো জানানো উচিত ছিল, এবং সে নিশ্চয় জানাইত—এতটা নিরেট নির্বোধ সে নয়। কিন্তু সুষমা উপস্থিত থাকায় তাহার মধ্যে সব ওলট-পালট হইয়া গিয়াছিল। সে কোনমতে আমতা-আমতা করিয়া বলিল, 'আমিও—আমিও আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি'—বলিয়া এক-রকম ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া গেল।

অতঃপর প্রফেসার সরকারের বাড়ি নিমন্ত্রণ রক্ষা। এইখানেই সমরেশের চরম দুর্গতি হইয়া গেল।

তাই সেখান হইতে ফিরিবার পথে ক্লান্ত দেহ ও উদ্‌ভ্রান্ত মন লইয়া সে ভাবিতে-ছিল, ভদ্রোচিত কোনো ব্যবহারই যখন তাহার দ্বারা সম্ভব নয় তখন মনুষ্য সমাজে

বাঁচিয়া থাকিয়াই বা লাভ কি?

এরূপ মর্মান্তিক ভাবনার যথার্থ কারণ ঘটিয়াছিল কিনা তাহা নিমন্ত্রণ ব্যাপারের আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

সন্ধ্যা সাতটার পর প্রফেসার সরকারের বাড়িতে উপস্থিত হইয়া সমরেশ দেখিল ড্রয়িং-রুমে প্রায় পনের-ষোলো জন পুরুষ ও মহিলা সমবেত হইয়াছেন। সমরেশ একবার চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল,—চেনা লোকের মধ্যে কেবল ভূপেন ও প্রফেসার বড়ুয়াকে দেখিতে পাইল। বিখ্যাত আচার্য বড়ুয়াকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রই চিনিত; এতবড় বিদ্বান সুরসিক ও অমায়িক প্রফেসার সচরাচর দেখা যায় না। তাঁহার হাস্যবিম্বিত মুখ হইতে জ্ঞান কৌতুক দাক্ষিণ্য ও মদের গন্ধ প্রায় সর্বদাই ক্ষরিত হইতে থাকিত। ছাত্রমহলে এমন অব্যাহত প্রসার বিশ্ববিদ্যালয়ের আর কোনো আচার্যই লাভ করিতে পারেন নাই।

সমরেশ দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই সুষমা আসিয়া ঈষদরুণ সহাস্যমুখে তাহার অভ্যর্থনা করিল, 'আসুন সমরেশবাবু। এত দেরী করলেন যে?'

অতিথিকে লৌকিক আপ্যায়িত করা ছাড়াও সুষমার কণ্ঠে যে একটি স্বকীয় আনন্দ-আহ্বান ধ্বনিত হইয়াছিল তাহা সমরেশের কানে পৌঁছিল না; অপরাধ করিয়া করিয়া সে এতই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে যে অপ্রস্তুতভাবে বলিল, 'বড্ড দেরী হয়ে গেছে—না? ভারি অন্যায় করেছি।'

সুষমা বলিল, 'নিশ্চয় অন্যায় করেছেন কিন্তু সেজন্য আপনি দুঃখিত হবেন না, লোকসান আমাদেরি। আর একটু আগে এলে বাবার সঙ্গে দেখা হত। তিনি এইমাত্র চলে গেলেন।'

সমরেশ অনুতপ্ত বিমর্ষ মুখে চুপ করিয়া রহিল; সুষমা বলিল, 'ডাক্তার হবার ঐ মুস্কিল। দেখুন, মা কোথায় মামার জন্মতিথিতে একটু আমোদ আহ্লাদ করবেন তা নয় কোথাকার কোন রুগী ফোন করে ধরে নিয়ে গেল।'

সমরেশের মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে ব্যগ্র স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার বাবা বুঝি ডাক্তার?'

—'হ্যাঁ। কেন বলুন তো?'

সমরেশ তৎক্ষণাৎ সংকুচিত হইয়া পড়িল, বলিল, 'না—অম্‌নি—আমার বাবাও ডাক্তার।'

উৎফুল্লনেত্রে চাহিয়া সুষমা বলিয়া উঠিল, 'তাই নাকি! আপনি তাহলে আমার বাথার ব্যথী বলুন।' বলিয়াই সুষমা লজ্জিত হইয়া পড়িল, কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে তাড়াতাড়ি বলিল, 'চলুন, মামীর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই।'

প্রফেসার-পত্নী অদূরে একটি কৌচে বসিয়া ছিলেন, সমরেশকে তাঁহার কাছে লইয়া গিয়া সুষমা বলিল, 'মামী, ইনি সমরেশবাবু, মামার শ্রেষ্ঠ ছাত্র।'

প্রফেসার-পত্নী মুখ তুলিয়া সাদরে বলিলেন, 'এস বাবা, এস।'

তাঁহার রুগ্ন অথচ প্রীতিপ্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া সমরেশের সংকোচের কুয়াশা অর্ধেক কাটিয়া গেল, সে অবনত হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া তাঁহার পাশে বসিয়া বলিল, 'আমি প্রফেসার সরকারের একজন ভক্ত ছাত্র। তাঁর জন্মতিথি উৎসবে যোগ দিতে পারা আমার পক্ষে যে কতবড় সৌভাগ্য তা বলতে পারি না। উনি দীর্ঘ জীবনলাভ করে এই দিনটিকে বারবার ফিরিয়ে আনুন এই আমাদের কামনা।'

এমন সহজ আন্তরিকতার সহিত সমরেশকে কথা কহিতে সুষমা পূর্বে কখনো শুনে নাই। তাহার বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল, সে আস্তে আস্তে সেখান হইতে

সরিয়া গেল।

ঘরের অন্যদিকে প্রফেসার বড়ুয়া নানাজাতীয় চুট্‌কি গল্পে আসর জমাইয়া তুলিয়াছিলেন, মাঝে মাঝে হাসির ঢেউ বহিয়া যাইতেছিল। ভূপেন সেই দলে বসিয়া ছিল কিন্তু তাহার চক্ষু দু'টা সতর্কভাবে ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

গল্প গুজবে দেড় ঘণ্টা কাটিয়া গেল, সমরেশ এক মুহূর্তের জন্যও প্রফেসার-পত্নীর সঙ্গ ছাড়িল না। নয়টা বাজিতেই ভৃত্য আসিয়া জানাইল যে ডিনার প্রস্তুত। সকলেই উঠিয়া পড়িলেন।

'ডিনার' শুনিয়াই সমরেশ চমকাইয়া উঠিয়াছিল, তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, 'ডিনার? টেবিলে বসে খাওয়া?'

প্রফেসার-পত্নী সমরেশের আতঙ্কের অন্যরূপ অর্থ বুঝিয়া বলিলেন, 'আমরা সাধারণতঃ টেবিলে বসে খাই না, পাত পেড়েই খাই। কিন্তু আজ অনেক অতিথি এসেছেন যাঁরা মাটিতে বসে খেতে পারেন না—তাই টেবিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু রান্না সব বামুনে করেছে, তুমি কি—' বলিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন।

সমরেশ তাড়াতাড়ি বলিল, 'না না—তা নয়—কিন্তু—'

ভোজনকক্ষে প্রবেশ করিবার সময় সুষমাকে তাহার মামী একবার তীক্ষ্ণচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিলেন, 'বেশ ছেলেটি সমরেশ, ভারী মিষ্টি স্বভাব। আর কি চমৎকার কথা কয়, যেন কতকালের চেনা।—ওকে মাঝে মাঝে আমার কাছে ধরে নিয়ে আসিস।'

সুষমা কোনো উত্তর দিল না, কেবল একটু মুখ টিপিয়া হাসিল।

টেবিলে খাইতে বসিয়া সমরেশের মনে হইল তাহার মত হতভাগ্য পৃথিবীতে আর নাই। এতগুলা ছুরি কাঁটা লইয়া সে কি করিবে, কোন্‌টাকে কি ভাবে ব্যবহার করিবে, এতগুলা ছোট বড় চামচেরই বা কি প্রয়োজন তাহা কিছুই ধারণা করিতে না পারিয়া সে একেবারে দিশাহারা হইয়া গেল। তাহার একপাশে একটি তরুণী বসিয়াছিলেন, বোধ হয় সুষমার বন্ধু, অন্য পাশে একটি সাহেব বেশধারী ভদ্রলোক। এই দুইজনের মধ্যস্থলে সমরেশ দারুময় জগন্নাথের মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল।

'সুপ' চামচ দিয়া খাইতে হয়, তাহার জন্য ছুরি কাঁটার দরকার নাই একথা অতি বড় নির্বোধও বিনা উপদেশে বুঝিতে পারে। সুতরাং সে ফাঁড়াটা সহজেই কাটিয়া গেল। গোল বাধিল মৎস্যের সঙ্গে।

খাওয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে, কথোপকথনের একটা মৃদু গুঞ্জনের মধ্যে সমরেশ নিজেকে অনেকটা নিরাপদ মনে করিতেছে, এমন সময় ভূপেনের সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বরে গুঞ্জনধ্বনি চাপা পড়িয়া গেল। ভূপেন টেবিলের অন্যদিকে ছিল, গলা বাড়াইয়া দেখিয়া মুখখানা বেশ গম্ভীর করিয়া বলিল, 'সমরেশবাবু, একটু ভুল করেছেন। ছুরিটা ডান হাতে ধরতে হয় আর কাঁটা বাঁ হাতে।'

সমরেশের ভুলটা যে কেহই লক্ষ্য করে নাই এমন নয় কিন্তু এই খোঁচাটা এতই নিষ্ঠুর এবং অপ্রত্যাশিত যে সকলেই চমকিয়া উঠিলেন। সমরেশের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, সে মূঢ়ের মত দুই হাতে ছুরি কাঁটা ধরিয়া নিজের পাতের দিকে বিহ্বল চক্ষে চাহিয়া রহিল।

শিষ্ট সমাজে ক্বচিৎ এইরূপ দুর্ঘটনা যখন ঘটিয়া যায় তখন, কিছুই ঘটে নাই এমনি ভান করাই একমাত্র ভদ্ররীতি। উপস্থিত সকলে সেই রীতি অবলম্বন করিলেন, যেন শুনিতে পান নাই এমনিভাবে পুনর্বার কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন। শুধু

সুষমার দুইগাল রক্তবর্ণ হইয়া জ্বালা করিতে লাগিল, সে হাত গুটাইয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

কিন্তু দুর্নিয়তি তখনো সমরেশকে ত্যাগ করে নাই। আহার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময় আর একটি ব্যাপার ঘটিল। অসাবধানে হাত নাড়ার জন্যই বোধ হয়, একটা ঝোলের বাটি হঠাৎ সমরেশের সম্মুখ হইতে অদ্ভুত ভাবে লাফাইয়া উঠিয়া তাহার কোলের উপর পড়িয়া গেল এবং তরল সস্নেহ ঝোলে তাহার পাঞ্জাবি ও চাদর অভিষিক্ত করিয়া দিল।

পৃথিবী, দ্বিধা হও, আমি তোমার গর্ভে প্রবেশ করি—এই কামনা সীতাদেবীর পর হইতে বোধ করি অনেক নরনারীকেই সময়-অসময়ে করিতে হইয়াছে। সমরেশও কায়মনোবাক্যে সেই কামনাই করিয়াছিল এমন সময় টেবিলের অপর প্রান্তে ঝন্ ঝন্ শব্দে সকলে সচকিত হইয়া দেখিলেন, সুষমার চমৎকার কলাপাতা রঙের সিল্কের শাড়িটি অনুরূপ তরল সস্নেহ ঝোলে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে এবং সে অপ্রতিভভাবে মুখ নত করিয়া হাসিতেছে।

এই বৃহত্তর দুর্ঘটনায় সমরেশের দুষ্কৃতি চাপা পড়িয়া গেল বটে কিন্তু তাহার মনের অশান্তি দূর হইল না। উপরন্তু কোন্ এক প্রহেলিকার ইঙ্গিত অনুশোচনার সঙ্গে মিশিয়া তাহাকে আরো পীড়িত করিয়া তুলিল।

আহার শেষ হইলে প্রফেসার বড়ুয়া উঠিয়া একটি সুন্দর বক্তৃতা দিয়া সহকর্মীকে অভিনন্দিত করিলেন। উপসংহারে বলিলেন, 'আপনারা পাত্র পূর্ণ করুন, প্রফেসার সরকারের স্বাস্থ্য পান করা চাই।'

প্রফেসার সরকার মৃদুকণ্ঠে আপত্তি করায় বড়ুয়া সাহেব বলিলেন, 'না না, ও কোনো কাজের কথা নয়। কারণবারি না হলে কার্য সুসম্পন্ন হবে না। শ্যাম্পেন আনাও --শ্যাম্পেনে মহিলাদেরও আপত্তি হতে পারে না।'

প্রফেসার বড়ুয়ার জন্য শ্যাম্পেন আনানো ছিল, অগত্যা তাহাই উপস্থিত করা হইল। সকলের পাত্র পূর্ণ করা হইল। প্রফেসার বড়ুয়া নিজের পাত্রটি ঊর্ধ্বে তুলিয়া বলিলেন, 'Long life to Professor Sarkar! Drink hearty!'

মহিলারা কেহই পান করিলেন না, শুধু পাত্র অধরে ঠেকাইয়া নামাইয়া রাখিলেন। ভূপেন একচুমুকে নিজের পাত্র শেষ করিয়া ফেলিল। সমরেশও একচুমুক খাইল বটে কিন্তু পাত্র শেষ করিতে পারিল না।

অতঃপর মহিলারা ড্রয়িং-রুমে ফিরিয়া গেলেন, পুরুষেরাও ইচ্ছামত কেহ কেহ দু'-একপাত্র টানিয়া একে একে তাঁহাদের অনুবর্তী হইলেন।

ঝোল-রঞ্জিত কাপড়চোপড় লইয়া ড্রয়িং-রুমে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা সমরেশের ছিল না, সে অলক্ষিতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া পলায়ন করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। ওদিকে প্রফেসার বড়ুয়াকে কেন্দ্র করিয়া দ্রাক্ষারসের আস্বাদন ও নিম্নকণ্ঠে আলাপ চলিতেছিল, সমরেশের দিকে কাহারো লক্ষ্য ছিল না। এই ফাঁকে সে সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় ভূপেন পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিয়া মুখের একটা ভঙ্গী করিয়া বলিল, "পাঞ্জাবি দিব্যি রঙিয়ে ফেলেছেন দেখছি। 'হোরি খেলত বনুয়ারী'?—তা এখানে বসে কেন? ড্রয়িং-রুমে গেলেই তো পারেন, সেখানে মহিলারা আপনার পাঞ্জাবির বর্ণবৈচিত্র্য দেখে নিশ্চয় খুব আনন্দ পাবেন।"—বলিয়া মুচ্কি হাসিয়া নিম্নকণ্ঠে একটা গানের কলি ভাঁজিতে ভাঁজিতে প্রস্থান করিল।

অপরিসীম আত্মগ্লানির মধ্যেও ক্রোধের শিখা সমরেশের মাথার মধ্যে জ্বলিয়া

উঠিল। ভূপেনের পৃষ্ঠের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া মনের মধ্যে যে কথাগুলো বিষের মত ফেনাইয়া উঠিতে লাগিল, ভাগ্যে সেগুলো মনের মধ্যেই রহিয়া গেল, এই স্থানে মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িলে যে বিশ্রী ব্যাপার ঘটিত তাহার ফলে বোধ করি সমরেশকে আত্মহত্যা করিতে হইত।

মিনিট কয়েক পরে সমরেশ নিঃশব্দে উঠিয়া বাহিরের বারান্দায় গিয়া দেখিল সেখানে কেহ নাই। সে চুপি চুপি বাহির হইয়া যাইতেছিল, হঠাৎ নজর পড়িল দূরে বারান্দার এক কোণে সুষমা ও ভূপেন দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে। সুষমার আরক্ত মুখ ও তীব্র চোখের দৃষ্টি মুহূর্তের জন্য সমরেশের চোখে পড়িল, সে হেঁটমুখে বারান্দা পার হইয়া যাইবার উপক্রম করিল।

সমরেশকে দেখিবামাত্র সুষমা দ্রুতপদে কাছে আসিয়া বলিল, 'সমরেশবাবু, আপনি যাচ্ছেন?'

সমরেশ থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'হ্যাঁ—রাত হয়েছে,—আমি যাই।'

সুষমা তাহার আরো কাছে আসিয়া মিনতিপূর্ণ স্বরে কহিল, 'একটু দাঁড়াবেন না? আমিও তাহলে আপনার সঙ্গে যেতুম, আপনি আমাকে বাড়ি পোঁছে দিতে পারতেন। আপনার সঙ্গে না গেলে, এই রাত্রে আবার মামাকে যেতে হবে আমায় পোঁছে দিতে।'

ভূপেনের বিষাক্ত শ্লেষ তখনো সমরেশের বুকের মধ্যে জ্বলিতেছিল, সুষমার কথাগুলো তাহার কানে অত্যন্ত নিষ্ঠুর বিদ্রূপের মত শুনাইল, সে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না, মাফ করবেন—আমি আর থাকতে পারছিনে—'

সুষমা যেন আহত হইয়া ফিরিয়া আসিল; তাহার মুখ ম্লান হইয়া গেল, তবু সে আর একবার বলিল, 'মামীর সঙ্গে দেখা করে যাবেন না? আমি না হয় তাঁকে এইখানে ডেকে আনছি'—বলিতে বলিতে তাহার দৃষ্টি সমরেশের ঝোলমাখা পাঞ্জাবিটার উপর গিয়া পড়িল।

'না—নমস্কার!' সমরেশ নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। ফুটপাথ হইতে শুনিতে পাইল ভূপেন বলিতেছে—'আপনি চিন্তিত হচ্ছেন কেন? আমি তো রয়েছি, আপনার মামা না যেতে পারেন—'

চৌরঙ্গী পার হইয়া সমরেশ ধর্মতলার রাস্তা ধরিল। হাঁটিতে হাঁটিতে ওয়েলিংটন স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত আসিয়া সে চমক ভাঙিয়া দেখিল রাস্তায় লোক চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে, শূন্যপথের দুইধারে গ্যাসের বাতিগুলো যতদূর দেখা যায় নির্নিমেষভাবে জ্বলিতেছে। দোকানপাট বন্ধ।

সমরেশ ভাবিল, দূর ছাই, আজ আর গাড়ি পাওয়া যাবে না। গলি দিয়েই যাই।

বাসায় চাকরটা এখনো তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া জাগিয়া আছে স্মরণ করিয়া পার্কের ভিতর দিয়া দ্রুতবেগে চলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু পাশে একখানা খালি বেঞ্চি তাহার পরিশ্রান্ত দেহকে বেশীদূর অগ্রসর হইতে দিল না। মোটবাহী কুলি যেমন ঘাড়ের মোট নামাইয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করে, সেও তেমনি ভারাক্রান্ত দেহটাকে বেঞ্চির উপর নামাইয়া বসিয়া পড়িল।

মিনিট পনের পরে কিন্তু আবার তাহাকে উঠিতে হইল। পার্কে বেঞ্চির উপর রাত কাটাইয়া কোনো লাভ নাই, বাসায় ফিরিয়া কোনক্রমে এই উচ্ছিষ্ট কাপড়চোপড়গুলো ছাড়িয়া শয্যা আশ্রয় করিতে পারিলে সে বাঁচে। পায়ের আঙুল হইতে মগের শিরগুলো

পর্যন্ত অপরিসীম অবসাদে ভাঙিয়া পড়িতেছে; কিন্তু বাকী পথটা যে করিয়া হোক অতিক্রম করিতেই হইবে।

গলি দিয়া যাইতে যাইতে সম্মুখে কিছু দূরে সমরেশ দেখিল একখানা ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহার বাহিরে দাঁড়াইয়া একটা লোক হুডের ভিতর মাথা ঢুকাইয়া কাহার সহিত কথা কহিতেছে। আরো খানিকটা অগ্রসর হইয়া শুনিতে পাইল গাড়ির ভিতরে বসিয়া যে কথা কহিতেছে সে স্ত্রীলোক। এই সব পাড়ায় নির্জন রাত্রে অনেক রকম ব্যাপার ঘটিয়া থাকে তাই সমরেশ তাড়াতাড়ি পা চালাইয়া বাহির হইয়া যাইবার চেষ্টা করিল। দণ্ডায়মান ট্যাক্সি ছাড়াইয়া দু'পা অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় যে পরিচিত কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে আসিয়া পেঁছিল তাহাতে সে তীরবিদ্ধের মত ফিরিয়া দাঁড়াইল।

'এ আমাকে কোথায় নিয়ে এলেন? আমি যে বাড়ি যাব।'

উত্তেজনা-বিকৃত কণ্ঠে পুরুষটা বলিল, 'রাস্তার মাঝখানে একটা সীন্ করো না সুষমা; কোনো ভয় নেই—এ আমার বাসা। একবারটি নামো, কেউ জানতে পারবে না। তারপর আমি তোমাকে বাড়ি পেঁছে দেব।'

'না না, আগে আমায় বাড়ি পেঁছে দিন।'

ভূপেন সুষমার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল, 'নেমে এস, নেমে এস। এসব প্রুডারি কি তোমার মত এডুকেটেড গার্লের সাজে!' বলিয়া একটা বিশ্রী হাসি হাসিল।

এক লাফে সমরেশ ট্যাক্সির পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, 'কি হয়েছে? সুষমা?'

সুষমা আর্তস্বরে প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল, 'সমরেশবাবু, আমাকে বাঁচান।'

ভূপেন বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়া সম্মুখে সমরেশকে দেখিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সমরেশও ভূপেনের মুখ দেখিয়া কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল—মানুষের মুখ এত অল্প সময়ের মধ্যে এতখানি পরিবর্তিত হইতে পারে তাহা যেন কল্পনার অতীত। যে হিংস্র পশুটাকে ভূপেন এত দিন শিষ্টতার আড়ালে সযত্নে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, শিকার সান্নিধ্যে পাইয়া সেই পশু যেন মুখ বাহির করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সমরেশের বুকের মধ্যে বহুদিন সঞ্চিত বিদ্বেষ ও ঘৃণা একমুহূর্তে ফাটিয়া পড়িল। তাহার ইচ্ছা হইল ভূপেনের ঐ কদর্য পাশবিক মুখখানাকে লাথি মারিয়া ঘুষি মারিয়া ভাঙিয়া থেঁতো করিয়া একেবারে লুপ্ত করিয়া দেয়। সে এক বজ্রমুষ্টিতে ভূপেনের চুল ধরিয়া অন্য হাতে তাহার গালে একটা বিরাট চপেটাঘাত করিয়া বলিল, 'হতভাগা ছোটলোক জানোয়ার কোথাকার! ক্যাডাভ্যারাস কুকুরের বাচ্চা! আজ তোকে খুন করব।'—বলিয়া আর একটি ততোধিক বিরাট চপেটাঘাত করিল।

ভূপেনও রুখিয়া উঠিয়া বলিল, 'খবরদার বলছি—'

সমরেশ সঙ্গে সঙ্গে তাহার পেটে এক প্রচণ্ড লাথি কষাইয়া বলিল, 'তবে রে—'

তারপর তাহার মুখ দিয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গারের মত যে সমস্ত শব্দ বাহির হইল,—হিন্দি উর্দু ইংরাজী বাংলা মিশ্রিত যে অনুষ্টুপ শ্লোক অবাধে অনর্গলভাবে নির্গত হইতে লাগিল তাহার পুনরুক্তি করিবার সাহস বা শক্তি আমাদের নাই। ভূপেন সেই বাক্যের আগুনে যেন একখণ্ড কাগজের মত পুড়িয়া কুঁকড়াইয়া গেল। গাড়ির মধ্যে সুষমা দুই কানে সজোরে আঙুল পুরিয়া দিয়া, বিস্ফারিত চক্ষে অপূর্ব আলোক ফুটাইয়া নিস্পন্দ বক্ষে বসিয়া রহিল।

প্রিয়তমা নারীর রক্ষার্থে পুরুষ যখন লড়াই করে তখন প্রিয়তমার মনের ভাবটা কিরূপ হয় কে জানে?

ভূপেনের নাকে অন্তিম একটা ঘুষি মারিয়া তাহাকে ফেলিয়া দিয়া সমরেশ বলিল,

'যা শালা কেঁচোর বাচ্চা, নর্দমায় শুয়ে থাকগে যা!' তারপর ট্যাক্সিতে সুষমার পাশে উঠিয়া বসিয়া চালককে বলিল, 'চালাও—হাতীবাগান।'

গাড়ি চলিল। দুইজনে অন্ধকারের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এইভাবে মিনিট পাঁচেক কাটিয়া গেল।

শেষে সুষমা মৃদুস্বরে বলিল, 'কি বলে ঐ সব কথাগুলো মুখ দিয়ে বার করলেন?'

সমরেশের শরীরে ক্লান্তির কণামাত্র আর অবশিষ্ট ছিল না, সে হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, তারপর বলিল, 'ঐ কথাগুলো মুখ দিয়ে বার করা এবং পদাঘাত মুষ্ট্যাঘাত ইত্যাদি চালানোর সঙ্গে সঙ্গে একটা মস্ত কথা বুঝতে পেরেছি যা এতদিন কিছুতেই বুঝতে পারছিলুম না। সেজন্যে দোষ অবশ্য সম্পূর্ণ তোমার, তুমিই আমার মাথা গুলিয়ে দিয়েছিলে!'

অন্ধকারের মধ্যে সুষমা হাসিয়া বলিল, 'কি কথা বুঝতে পেরেছেন শুনি?'

সমরেশ হাতড়াইয়া সুষমার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিল, 'বুঝতে পেরেছি যে আমি একজন খাঁটি ভদ্রলোক। শুধু তাই নয়, আরো অনেক কথা বুঝতে পেরেছি যা চলন্ত ট্যাক্সিতে বসে বলা যায় না।'

সুষমা সাড়া দিল না; সমরেশ তখন তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, 'সুষমা, কাল বিকেলে তোমাদের বাড়িতে আমার চায়ের নেমন্তন্ন রইল,—ঠিক পাঁচটার সময়—বুঝলে? আগে থাকতে খবর দিয়ে রাখলুম—তৈরী হয়ে থেকো।'

সুষমা চুপিচুপি বলিল, 'আমি তো আপনাকে নেমন্তন্ন করিনি—'

সমরেশ বলিল, 'ওঃ! তাও তো বটে! অনিমন্ত্রিত ভাবে যাওয়া তো কোনমতেই ভদ্রতা হবে না। তা, এক কাজ কর, সে ত্রুটি তুমি এখনি সংশোধন করে নাও। বল, মহাশয়, কল্য সায়াহ্নে বেলা পাঁচ ঘটিকার সময় আপনি সবান্ধবে—না না সবান্ধবে নয়, সবান্ধবে নয়—একাকী! কি বল? সুষমা?'

সুষমা কিছুই বলিল না; কিন্তু তাহাদের দু'জনের বাহু যেখানে আঙুলে আঙুলে জড়াইয়া নিবিড়ভাবে পরস্পরের পরিচয় গ্রহণ করিতেছিল সেইখানে সমরেশ সামান্য একটু চাপ অনুভব করিল।

৩০ মাঘ ১৩৩৮

কালকূট

ওই যে উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়েটি তোমাদের হাসি-গল্পের আসর ছাড়িয়া হঠাৎ আড়ষ্টভাবে উঠিয়া বাড়ি চলিয়া গেল, শ্রীমতী পাঠিকা, তোমরা উহাকে চেন কি?

কেন চিনিবে না? ও তো প্রফেসর হীরেন বাগচির স্ত্রী। গত পাঁচ বছর ধরিয়া তোমরা নিত্য উহার সংগে মেলামেশা করিতেছ। ওর নাম কমলা, ওর একটি চার বছরের মেয়ে আছে, ওর বাপের বাড়ি চন্দননগরে, সবই তো তোমরা জান। কেন চিনিবে না?

কিন্তু তবু তোমরা কেহ উহাকে চেন না। ওর মনের সামনে একটা পর্দা পড়িয়া আছে; ওর সুন্দর টুলটুলে মুখখানিতে, ওর পরিপূর্ণ নিটোল দেহটিতে নারী-সৌন্দর্যের সব উপকরণই আছে, শুধু ভিতরকার মানুষটির পরিচয় নাই। পাঁচ বছরের ঘনিষ্ঠ মেলামেশাতেও তোমরা উহাকে সম্পূর্ণ বুঝিতে পার নাই; এই তো সেদিন তোমাদের মধ্যেই কথা হইতেছিল, একজন বলিয়াছিল, দেখ ভাই, কমলা যেন কেমনধারা। এই বেশ হেসে কথা কইছে, আবার এখনই কি রকম গম্ভীর হয়ে পড়ে। তারপরেই উঠে চলে যায়। ওর মনের কথা আজ পর্যন্ত কেউ জানতে পেরেছিস?

আর একজন বলিয়াছিল, আমরা সবাই ওর কাছে বরের গল্প করে মরি, আর ও কেমন মুখ টিপে বসে থাকে দেখেছিস?

তৃতীয়া বলিয়াছিল, সেদিন দেখলি তো, প্রীতির বিয়ের গল্প শুনে যেন পাঙাশ-মূর্তি হয়ে গেল। আচ্ছা, প্রীতি আর তার বরের বিয়ের আগে থাকতে ভালবাসা হয়েছিল, তারপর দু'জনের বিয়ে হল, এতে ভয়ে সিঁটিয়ে যাবার কি আছে ভাই?

তা নয়, স্বামীর কথা উঠলেই ওই রকম হয়ে যায়, তারপর একটা ছুতো করে উঠে পালায়।

যা বলিস ভাই, আমার তো মনে হয়, ওর বর ওকে ভালবাসে না।

দূর! সে হলে মুখ দেখেই বোঝা যেত।

তা নয়। আসল কথা, প্রফেসরের গিন্নী, তাই আমাদের মত মুখ্যুর সংগে মন খুলে কথা কইতে লজ্জা করে।

ও কথা বলিস না। কমলার শরীরে এক ফোঁটা অহংকার নেই, একেবারে মাটির মানুষ, কিন্তু তবু মাঝে মাঝে কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকে।

এই সকল আলোচনা যখন হয়, তখন একটি মেয়ে কোন কথা বলে না, হেঁট হইয়া ক্রুসে লেস তৈয়ার করে। কে জানে হয়তো সে কমলার ব্যথায় ব্যথী নিজের অন্তরের নিগূঢ় বেদনার দ্বারা অপরের মর্মের ইতিহাস বুঝিতে পারে।

কিন্তু মোটের উপর কেহই যে কমলার চরিত্র বুঝিতে পারে নাই, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। বেশী কথা কি, তাহার স্বামী যে তাহাকে ভাল করিয়া চিনিয়াছে, এমন কথাও জোর করিয়া বলা চলে না! অথচ হীরেন তাহাকে ভালবাসে, এত বেশী ভালবাসে যে, এক এক সময়ে সে ভালবাসা বাহিরের লোকের চোখে উৎকট ঠেকে। তাহাদের এই ছয় বছরের দাম্পত্যজীবনে এমন একটা কলহও ঘটে নাই, যাহাকে অজাযুদ্ধ বা ঋষিশ্রাদ্ধের সহিত শ্রেণীভুক্ত করিয়াও উপহাস করা যাইতে পারে।

অন্য পক্ষে, কমলা তাহার স্বামীকে ভালবাসে না, হয়তো বিবাহের পূর্বে সে আর কাহাকেও ভালবাসিত—এমন একটা সন্দেহ অজ্ঞ ব্যক্তির মনে উদয় হইতে পারে। কিন্তু সে সন্দেহ একেবারেই অলীক। স্বামীকে ভালবাসে না, সাধারণ বাঙালীর মেয়ের পক্ষে এত বড় অপবাদ বোধ করি আর নাই। কমলাকে কিন্তু সে অপবাদ কেহ দিতে পারিত না। সে নিজের স্বামীকে ভালবাসিত মনের প্রত্যেক চিন্তাটি দিয়া, শরীরের সমস্ত স্নায়ু শিরা রক্ত দিয়া। কিন্তু তবু এত ভালবাসা সত্ত্বেও, হয়তো বা এত ভালবাসার জন্যই, সময়ে সময়ে দুইজনের মাঝখানে অপরিচয়ের পর্দা নামিয়া আসিত; কমলা মনের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া বিজনে একাকী বসিয়া থাকিত, তখন হীরেন কোনমতেই তাহার নাগাল পাইত না।

কাবার্ডের মধ্যে কঙ্কাল বলিয়া ইংরাজীতে একটা কথা আছে। সেই কথাটার ভাল তর্জমা যদি বাংলায় থাকিত, তাহা হইলে কমলার জীবনের ইতিহাস এক কথায় বুঝাইয়া দিতে পারিতাম। কারণ, ওই কঙ্কালটা যখন খটখট শব্দে নড়িয়া উঠিত, তখনই ভীত বিহ্বল কমলা ছুটিয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিত, তারপর কঙ্কালের সঙ্গে নিজেকে বন্দিনী করিয়া অশ্রুহীন শুষ্ক চক্ষু মেলিয়া নরকের দুঃস্বপ্ন দেখিত।

আসল কথা, শিশু যেমন অবহেলায় খেলাচ্ছলে বহুমূল্য দলিল ছিঁড়িয়া কুটি-কুটি করিয়া ফেলে, কমলাও একদিন তেমনই খেলাচ্ছলে নিজের ইহকাল পরকাল ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল; তাই আজ বাহিরের সংসার যতই ফলে ফুলে ভরিয়া উঠিতেছে, মনের কঙ্কাল ততই তাহার পিছনে প্রেতের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

নারীদেহ যে পবিত্র, তাহার শুচিতা নষ্ট করিবার অধিকার যে তাহার নিজেরও নাই, এ ধারণা নারীর মনে কত বয়সে উদয় হয়? শৈশবে শুচিতা অশুচিতা কোনও জ্ঞানই থাকে না, কৈশোরে কিছু কিছু দেখা দেয়, পরিণত যৌবনে ইহা পরিপূর্ণরূপে বিকাশ পায়। তাই বুঝি যৌবনে নারী নিজ দেহকে অন্যের দৃষ্টি হইতেও রক্ষা করিবার জন্য সর্বদা লজ্জায় সন্ত্রস্ত হইয়া থাকে।

জ্ঞানী ব্যক্তিদের বলিতে শুনিয়াছি যে, মনের অগোচরে পাপ নাই; অর্থাৎ অপরাধ করিতেছি—এ জ্ঞান না থাকিলে অপরাধ হয় না। কথাটা কি সত্য? তাই যদি হয়, তবে অজ্ঞানকৃত দোষের জন্য আমরা লজ্জিত হই কেন? আমার মনে আছে, ছেলেবেলায় একটা ইঁদুরছানা ধরিয়া তাহার ক্ষুদ্র শরীরটিকে অশেষভাবে নির্যাতিত করিয়া শেষে ভাঙা কাচ দিয়া পেঁচাইয়া পেঁচাইয়া তাহার গলা কাটিয়াছিলাম। সেই দুষ্কৃতির স্মৃতি এখনও আমাকে পীড়া দেয় কেন?

তেরো বৎসর বয়সে কমলা একটা অপরাধ করিয়াছিল। তখনও তাহার দেহের শুচিতাবোধ জন্মে নাই। কিন্তু কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই। যাঁহারা কদাচিৎ সত্য কথা শুনিতে ভয় পান, তাঁহারা কানে আঙুল দিতে পারেন।

ডাক্তারী বইয়ে হয়তো এক-আধটা ব্যতিক্রমের উদাহরণ পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সাধারণত তেরো বছর বয়সে মেয়েদের যৌনক্ষুধা জাগ্রত হয় না। যাহা জাগ্রত হয়, তাহা যৌন-কৌতূহল। এই কৌতূহল প্রকৃতিদত্ত এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহারই অদম্য তাড়নায় কত কাঁচ প্রাণ অঙ্কুরে নষ্ট হইয়া যায়, তাহা কে গুণিয়া দেখিয়াছে? এই কৌতূহলকে উত্তেজিত করিবার কারণেরও অভাব নাই। নিজের দৈহিক বিবর্তনই সবচেয়ে বেশী উত্তেজিত করিয়া তুলে। বয়ঃসন্ধিতে পদার্পণ করিয়া পরিবর্তনশীল শরীরই সর্বপ্রথম বিপ্লব বাধায়। অথচ ট্র্যাজেডি এই যে, দেহটাই গোড়ায় এই বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী ফল ভোগ করে।

কমলা তেরো বছরের অর্ধস্ফুট দেহে অনাগত সুখ-সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাইত, অজ্ঞাতকে জানিবার সদা-জাগ্রত কৌতূহল অনুভব করিত; কিন্তু সত্যকার দৈহিক সুখ-লালসা তখনও তাহাকে অধীর করিয়া তুলে নাই। দূরাগত বনমর্মরের মত সে আসন্ন যৌবনের চরণধ্বনি শুনিয়া উচ্চকিত হইয়া থাকিত, কিন্তু সে চরণধ্বনি আর নিকটে আসিত না। কমলার কৌতূহল তাহাতে আরও দুরন্ত হইয়া উঠিত।

কমলার দিদির বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। সে লুকাইয়া বরকে চিঠি লিখিত, কমলাকে দেখিতে দিত না। জামাইবাবু যখন আসিতেন, তখন দিদির সকৌতুক প্রেমলীলার দৃশ্যমান অংশটুকু কমলা সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া আত্মসাৎ করিত। কিন্তু তবু তৃপ্তি পাইত না। অনেকখানিই যেন বাকি থাকিয়া যাইত। শরীরের মধ্যে সে একটা উত্তপ্ত অস্থিরতা অনুভব করিত। অপ্রাপ্তির ক্লেশ তাহাকে চঞ্চল অসহিষ্ণু করিয়া তুলিত।

এইরূপ সঙ্কটপূর্ণ যখন তাহার অবস্থা, সেই সময় হঠাৎ তাহার চোখে পড়িল একটি লোক। লোকটিকে কমলা যে এতদিন দেখে নাই তাহা নয়, প্রত্যহ দুইবেলা দেখিয়াছে। কিন্তু সে যে তাহার দিদির বর জামাইবাবুর স্বজাতি অর্থাৎ পুরুষমানুষ, এবং যে কৌতূহল অহরহ তাহাকে দগ্ধ করিতেছে তাহা তৃপ্ত করিবার ক্ষমতা যে ইহার আছে, এই সম্ভাবনার দিক দিয়া এতদিন সে তাহাকে দেখে নাই। হঠাৎ জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান-স্বরূপ এই ছোকরাকে দেখিয়া কমলার চক্ষু ঝলসিয়া গেল।

ছোকরার বয়স বোধ করি কুড়ি-একুশ; দেখিতে এমন কিছু নয় যে, দেখিবামাত্র কেহ মজিয়া যাইবে। রোগা চেহারা, গাল বসা, চোখের কোলে কালি, কিন্তু চুলের খুব বাহার। তাহার নাম প্রভাস—পাড়ারই কোন ভদ্রলোকের ছেলে। ছেলেবেলা হইতেই তাহার এ বাড়িতে যাতায়াত ছিল এবং বড় হইবার পরও যাতায়াত অব্যাহত রহিয়া গিয়াছিল। মেয়েদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশাও বাড়ির লোকের সহিয়া গিয়াছিল, কেহ আপত্তি করিত না।

সে সময়ে-অসময়ে বাড়িতে ঢুকিত এবং কমলাকে একলা পাইলেই তাহার খোঁপা খুলিয়া দিত, কাপড় ধরিয়া টানিত, কখনও বা গাল টিপিয়া দিত। এক এক সময় সুবিধা পাইলে গলা খাটো করিয়া এমন দুই-একটা কথা বলিত যাহার ইঙ্গিত কমলা বুঝিত না, কিন্তু বুঝিয়াছে—এমনই ভান করিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিত। পূর্বেই বলিয়াছি, কমলার তখনও শরীরের শুচিতাজ্ঞান জন্মে নাই, শুধু জীবনের অজ্ঞাত রহস্য জানিবার অদম্য লিপ্সা ছিল।

কিন্তু সহসা যেদিন প্রভাস কমলার চক্ষে সমস্যার মীমাংসারূপে দেখা দিল, সেদিন হইতে কমলা সর্বদা তাহার জন্য উৎসুক হইয়া থাকিত। তাহার স্পর্শ ও কথা কিসের ইঙ্গিত করিয়া গেল, তাহাই বুঝিবার চেষ্টায় গোপনে মনের মধ্যে সর্বদা আলোচনা করিত। চুম্বকের সামীপ্যে যেমন লোহার চৌম্বক আবেশ হয়, প্রভাসের সংস্পর্শও তেমনই তাহাকে তদ্ভাবিত করিয়া তুলিত।

একদিন দুপুরবেলা, বাড়িতে কেহ কোথাও ছিল না—মা পাড়া বেড়াইতে গিয়াছিলেন, দিদি উপরের ঘরে দোর বন্ধ করিয়া বরকে চিঠি লিখিতেছিল, এমন সময় পা টিপিয়া টিপিয়া প্রভাস ঘরে ঢুকিল। কমলা আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুল আঁচড়াইতেছিল, প্রভাস পিছন হইতে হঠাৎ তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। কমলার ঘাড়ের উপর তাহার উষ্ণ নিশ্বাস পড়িয়া কমলার সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সে অকারণে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, ছাড়। ও কি করছ?

প্রভাস তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চাপা গলায় বলিল, চুপ। আস্তে। কমলি, একটা ভারি মজা দেখবি? খিড়কিপুকুরের ওপারে পড়ো ঘরটাতে সব ঠিক করে রেখেছি, তুই কিছুক্ষণ পরে সেখানে যাস। চুপিচুপি যাস, কাউকে বলিসনি। আমিও সেখানে থাকব।

কমলার বুক ভয়ানক ধড়ফড় করিতে লাগিল, সে রুদ্ধস্বরে কহিল, আচ্ছা।

প্রভাস যেমন আসিয়াছিল তেমনই চোরের মত বাহির হইয়া গেল।

এমনই করিয়া শিশু যেমন অজ্ঞানে খেলাচ্ছলে মহামূল্য দলিল ছিঁড়িয়া ফেলে, কমলা তেমনই করিয়া নিজের ভবিষ্যৎ সুখশান্তি নষ্ট করিয়া ফেলিল!

কিন্তু অমূল্য বস্তু খোয়া গেলেও তৎক্ষণাৎ ক্ষতির জ্ঞান জন্মে না। কমলারও সে বোধ জন্মিতে দেরি হইল। মাস-দুই এইভাবে চলিবার পর আর একটা ঘটনা ঘটিয়া তাহার নিমীলিত চেতনাকে বিস্ফারিত করিয়া খুলিয়া দিল।

সেদিন কমলার মা কমলাকে সঙ্গে লইয়াই পাড়া বেড়াইতে গিয়াছিলেন। বেলা

সাড়ে তিনটার সময় ফিরিয়া বাড়িতে পা দিবামাত্র কমলার দিদি নির্মলা ছুটিয়া আসিয়া রোদনবিকৃত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, মা, ওই হতচ্ছাড়া পেভাকে বাড়ি ঢুকতে দিও না। ও—ও একটা শয়তান। আর—আর আজই আমাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দাও, আমি একদণ্ডও এখানে থাকতে চাই না।

কমলা অবাক হইয়া দেখিল, দিদির দুই চোখ জবাফুলের মত লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। তাহার চুল ও গায়ের কাপড় হইতে জল ঝরিয়া পড়িতেছে, মনে হইল, এইমাত্র সে পুকুর হইতে ডুব দিয়া আসিতেছে।

কমলার মা স্তম্ভিতভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, কমলি, তুই ওপরে যা।

নির্মলার সঙ্গে মায়ের কি কথা হইল, কমলা শুনিতে পাইল না। কিন্তু দিদি যখন কিছুক্ষণ পরে উপরে আসিয়া সিক্তবস্ত্রেই বিছানায় শুইয়া পড়িল, তখন সেও পিছনে পিছনে তাহার পাশে গিয়া বসিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সঙ্কুচিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে দিদি?

বিছানা হইতে মুখ না তুলিয়াই নির্মলা বলিল, কিছু নয়। তুই যা।

মিনতি করিয়া কমলা বলিল, বল না দিদি; আমার বড্ড ভয় করছে।

নির্মলা উঠিয়া বসিয়া বলিল, ওই হতভাগা প্রভাস আমার গায়ে হাত দিয়েছিল।

অতিশয় বিস্মিত হইয়া কমলা কহিল, হাত দিয়েছিল তা কি হয়েছে?

নির্মলা গর্জিয়া উঠিল, কি হয়েছে! তুই কোথাকার ন্যাকা?

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমার ইচ্ছে হচ্ছে, কেরাসিন তেল ঢেলে গা পুড়িয়ে ফেলি। আমি আজই ও'র কাছে চলে যাব, এক রাত্তিরও আর এখানে থাকব না। হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, আচ্ছা, তোর না হয় বিয়েই হয়নি, কিন্তু বয়স তো হয়েছে, বুঝতে তো শিখেছিস। বল দেখি, বর ছাড়া আর কেউ গায়ে হাত দিলে কি মনে হয়? এখনও আমার গা ঘেন্নায় শিউরে শিউরে উঠছে। যাই, আর একবার পুকুরে ডুব দিয়ে আসি।

তারপর কমলার বিবাহ হইয়াছে, স্বামীকে সে ভালবাসিয়াছে, নিজের দেহের অতুল মর্যাদা বুঝিয়াছে। কিন্তু স্মৃতির হাত হইতে নিস্তার নাই—ভুলিবার পথ নাই। ভোলা যায় না। তাহার মস্তিষ্কের উপর দুরপনেয় স্মৃতির কালি দিয়া ছাপ পড়িয়া গিয়াছে। নড়িতে চড়িতে প্রতি পদে তাহার মনে হয়—নাই, নাই, তাহার কিছু নাই। স্বামীকে সে প্রতি পলে বঞ্চনা করিতেছে, সন্তানের নির্মল ললাটে পঙ্কতিলক আঁকিয়া দিয়াছে। পত্নীত্বের, মাতৃত্বের অধিকার তাহার নাই। সে কলুষিতা।

জাগ্রতে স্বপ্নে সদাসর্বদা আশঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া আছে—যদি কেহ জানিতে পারে, যদি কেহ সন্দেহ করে?

শ্রীমতী পাঠিকা, ওই যে দুর্ভাগিনী তোমাদের হাসি-গল্পের মজলিস ছাড়িয়া হঠাৎ উঠিয়া বাড়ি চলিয়া গেল, উহাকে তোমরা চিনিবে না। ব্যথার ব্যথী যদি কেহ থাকে হয়তো সন্দেহ করিবে, কিন্তু সেও মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবে না।

অথচ ছদ্মবেশ পরিয়া যাহারা জীবনের পথে চলে, তাহাদের পদে পদে আশঙ্কা। দুর্দিনের ঝড়ো হাওয়ায় ছদ্মবেশ উড়িয়া যায়, তখন রিক্ত নগ্ন স্বরূপ লইয়া তাহাদের লোকচক্ষুর সম্মুখে দাঁড়াইতে হয়। সে দুর্দিন নারীর জীবনে যখন আসে, তখন সান্ত্বনা দিবার, প্রবোধ দিবার আর কিছু থাকে না।

মেয়েদের হাসি-গল্পের মজলিস হইতে ফিরিয়া কমলা মেয়ে কোলে করিয়া ভাবিতেছিল সেই কঙ্কালটারই কথা। মেয়ে নিজ মনে খেলা করিতেছিল, কথা কহিতেছিল, কিন্তু সে কথা কমলার কানে যাইতেছিল না।

স্বামীর জুতার শব্দে চমক ভাঙিয়া কমলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। হীরেন আসিয়া মেয়েকে কোলে তুলিয়া লইয়া হাসিমুখে বলিল, তোমার বাপের বাড়ির দেশ থেকে একটি ভদ্রলোক এসেছেন—প্রভাসবাবু। তোমাদের সঙ্গে খুব জানা-শোনা আছে শুনলাম। তোমাকেও ছেলেবেলা থেকে জানেন বললেন; তাই তাঁকে ধরে নিয়ে এলুম।

ফিট হইলে যেমন মানুষের শরীর শক্ত হইয়া যায়, তেমনই ভাবে শরীর শক্ত করিয়া অস্বাভাবিক স্বরে কমলা বলিয়া উঠিল, তাড়িয়ে দাও, দূর করে দাও, ওকে বাড়িতে ঢুকতে দিও না। আমি—না না—উঃ—। এই পর্যন্ত বলিয়া সে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। তাহার কপাল স্বামীর জুতার উপর সজোরে ঠুকিয়া গেল।

২৯ আশ্বিন ১৩৩৯

ব্র জ লা ট

একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের যুবক কলিকাতার কোনও বিখ্যাত মাসিক পত্র ও পুস্তক প্রকাশকের বৃহৎ দোকান হইতে বাহির হইয়া ফুটপাথে আসিয়া দাঁড়াইল।

ফাগুন মাসের অপরাহ্ণ তখন ঘোলাটে হইয়া আসিতেছে, বেলা প্রায় সাড়ে পাঁচটা। যুবক ফুটপাথে দাঁড়াইয়া একটু ইতস্তত করিল, এদিক-ওদিক চাহিতে চাহিতে অদূরে একটা রেস্তোরাঁ তাহার চোখে পড়িল। অধর দংশন করিতে করিতে সে হেঁটমুখে কি ভাবিল, তারপর সংযত পদে যেন অন্যমনস্ক ভাবে হাতের ছড়িটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে সেই দিকে অগ্রসর হইল।

যুবকের বেশভূষা দেখিয়া তাহাকে সৌখীন বাবু বলিয়া বোধ হয়। গায়ে ধোপদস্ত সিল্কের পাঞ্জাবি, পরিধানে দিশী ধুতি। একটা কোঁচানো চাদর বগলের নীচে দিয়া বাঁ কাঁধের উপর ফেলা রহিয়াছে। তৈলহীন ঈষৎ রুক্ষ চুল সযত্নে কপাল হইতে পিছন দিকে বুরুশ করা। পায়ে পেটেন্ট চামড়ার পাম্পসু। যুবকের মুখ বেশ সুশ্রী, একটুখানি পাতলা গোঁফ আছে। দেহ ছিপছিপে হইলেও সুগঠিত। কিন্তু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে তাহার মুখে একটা অস্বাভাবিক পাণ্ডুরতা ও শীর্ণভাব লক্ষিত হয়। কপালে ও চোখের কোলে চুলের মত সূক্ষ্ম রেখা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। যাহারা অসংযত স্ফূর্তির তাগিদে দেহের উপর অতিরিক্ত অত্যাচার করে তাহাদের চোখে মুখে এইরূপ

শ্রান্তির লক্ষণ প্রায়ই চিহ্নিত থাকিতে দেখা যায়।

যুবক অলস মন্থর পদে প্রায় রেস্তোরাঁর দ্বারের কাছে পৌঁছিয়াছে এমন সময় পিছন হইতে কে বলিল, 'কি হে ব্রজলাট, কোথায় চলেছ?'

যুবক ফিরিয়া দেখিল—হিরণ। হিরণ পুঁটিমাছ শ্রেণীর একজন সাহিত্যিক; বেশভূষা নিদারুণ দৈন্যের পরিচায়ক। গায়ের কামিজটা অত্যন্ত ময়লা, একটিও বোতাম নাই; চটিজুতার পশ্চাদ্ভাগ এতই ক্ষয়গ্রস্ত হইয়াছে যে পায়ের গোড়ালি ফুটপাথ স্পর্শ করিতেছে। তাহারও বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ, মুখে একটা অতৃপ্ত অসন্তোষপূর্ণ বিদ্রোহের ভাব।

যুবকের পায়ের পাম্পসু হইতে মাথায় চুল পর্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া হিরণ বলিল, 'কি বাবা, তরুণী মৃগয়ায় বেরিয়েছ? আজ শিকার কোনদিকে হে ব্রজলাট?'

ব্রজেন মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল, 'তুমি কোন দিকে?' হিরণ হাসিয়া বলিল, 'মোল্লার দৌড় মসজিদ—আর কোনদিকে? বীরেনের আড্ডায় যাচ্ছি। যাবে নাকি?—না এনগেজমেণ্ট আছে?'

দু'জনে পাশাপাশি চলিতে আরম্ভ করিল।

বীরেনের আড্ডা ক্ষুদ্র সাহিত্যিকদের একটা স্থায়ী মজলিশ। এখানে মা সরস্বতীর সঙ্গে মা লক্ষ্মীর চিরন্তন বিবাদের কথা বেশ খোলাখুলি ভাবে আলোচনা হইত, ঢাক ঢাক গুড় গুড় ছিল না; এবং বীরেনের খরচে চা সিগারেট পান ধ্বংস করাই যে এ সভার মূল উদ্দেশ্য একথাও কেহ গোপন করিত না। বীরেন তাহা জানিত কিন্তু সেজন্য তাহার আতিথেয়তা কোনদিন সঙ্কুচিত হয় নাই। সে নিজে ঠিক সাহিত্যিক না হইলেও সাহিত্যের একজন পাণ্ডা ও সমজদার ছিল।

চলিতে চলিতে ব্রজেন হিরণের দিকে একটা বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, 'হিরণ, তোমার কামিজটা ধোপার বাড়ি দেওয়া দরকার বলে কি এখনো মনে হচ্ছে না?'

হিরণ নিজের দিকে একবার দৃষ্টি নামাইয়া বলিল, 'হচ্ছে। কিন্তু দেওয়া ঘটে ওঠেনি। কারণ কি জানো?—অর্থাভাব! কথাটার মানে তুমি বোধ হয় বুঝতে পারবে না, কিন্তু ওটা পৃথিবীতে আছে। ধোপা আমার অনেক কাপড় বিনা পয়সায় কাচবার পর এবার জবাব দিয়েছে; নগদ পয়সা না পেলে আর কামিজ কাচবে না।—কল্পনা করতে পার?' বলিয়া ব্যঙ্গপূর্ণ চক্ষে ব্রজেনের দিকে চাহিল।

ব্রজেন মুখ না ফিরাইয়াই বলিল, 'পারি। কিন্তু সে দোষ কি ধোপার?'

'না—আমার, কিম্বা আমার বাবার; তিনি আমার জন্যে যথেষ্ট টাকা রেখে যেতে পারেননি। চাকরিও করি না— আমি সাহিত্যিক। যদি কেরানী হতুম তাহলে বোধ হয় ফর্সা জামাকাপড় পরতে পেতুম। কিন্তু এতে আমার লজ্জা নেই ব্রজলাট—লজ্জা বরং তোমার।'

ভ্রূ তুলিয়া ব্রজেন বলিল, 'কিসে?'

'তুমি বাপের পয়সায় বাবুয়ানি করছ, আর যে তা পারে না তাকে বিদ্রূপ করছ। নিজের প্রতিভার জোরে টাকা রোজগার করে আমার মত ফাতুস সাহিত্যিককে যদি ব্যঙ্গ করতে তাহলেও একটা কথা ছিল। কিন্তু সে প্রবৃত্তি তখন তোমার হত না।'

ব্রজেন বিরসকণ্ঠে বলিল, 'ব্যঙ্গ বিদ্রূপ কিছুই আমি করিনি। কিন্তু আমাদের—সাহিত্যিকদের—একটু আত্মসম্মান জ্ঞান থাকা দরকার।'

হিরণ রাস্তার উপরেই ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'তুমি মনে কর তোমার চেয়ে আমার আত্মসম্মান জ্ঞান কম? ওটা তোমার ভুল। তুমি যাকে আত্মসম্মান মনে করেছ সেটা বস্তুত তোমার আর্থিক সচ্ছলতার অভিমান।'

হিরণ আবার চলিতে আরম্ভ করিল, 'কিন্তু তুমি বুঝবে না ব্রজলাট। তুমি সৌখীন গল্প লেখ, ফুরফুরে কবিতা লেখ—ফেঁপরা ফুকো জিনিস নিয়ে তোমার কারবার। ক্ষুধিতের মুখ যেখানে অন্নের দিকে চেয়ে হাঁ করে আছে, অভাব যেখানে মানুষের চরিত্র থেকে মনুষ্যত্বের লক্ষণ মুছে ফেলেছে—আমরা গরীব সাহিত্যিক সেই দিকটাই বেশী করে বুঝি। তাই ছেঁড়া কামিজে আমাদের আত্মসম্মান ক্ষুন্ন হয় না।'

'তা হবে। কিন্তু আমার মনে হয়, গরীবের আত্মসম্মান আর ধনীর আত্মসম্মান আলাদা বস্তু নয়। বরং যে ব্যক্তি গরীব তার আত্মসম্মান জ্ঞান আরো বেশী থাকা দরকার।'

এইভাবে যখন তাহারা বীরেনের আড্ডায় পোঁছিল তখন তাহাদের তর্ক কথার সংঘর্ষে অত্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বীরেনের ঘরে তক্তপোশের উপর গুটি পাঁচেক ছোকরা সাহিত্যিক বসিয়া ছিল; হিরণের উত্তেজিত অবস্থা দেখিয়া অন্নদা জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হে হিরণ, বেজায় চটেছ যে। কথাটা কি?'

হিরণ বলিল, 'কথা সামান্যই। ব্রজলাটকে বোঝাবার চেষ্টা করছি যে পেটেন্ট লেদার পাম্পসু আর আত্মসম্মান এক বস্তু নয়।'

এ আড্ডার সকলেই ব্রজেনকে চিনিত এবং মনে মনে তাহার উপর বিরক্ত ছিল। ব্রজেনের সৌখীনতা ও চিন্তা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বিষয়ে বিলাসিতার আভাস অন্য সকলকে খোঁচা দিয়া যেন তাহাদের জীবনের দৈন্য চেতনাকে প্রকট করিয়া তুলিত। তাহারাও পরিবর্তে ব্রজেনকে শ্লেষ বিদ্রূপের বিষাক্ত কাঁটায় বিঁধিয়া প্রতিশোধ লইত। 'ব্রজলাট' নামটা এই কাঁটা গাছেরই ফুল।

প্রমোদ বলিল, 'ব্রজলাটকে সে-তত্ত্ব বোঝাবার চেষ্টা করো না। যাদের অন্নবস্ত্রের কথা ভাবতে হয় না তাদের আত্মসম্মান ঐ জুতোর সুকতলাতেই আটকে থাকে।'

ব্রজেন সন্তর্পণে তক্তপোশের একপাশে বসিয়া বলিল, 'প্রমোদ, তোমার 'ইটখোলা' গল্পটা পড়লুম। কি রাবিশ লিখেছ? কতকগুলো কুলীমজুরের অসহায় দুর্দশার কাহিনী লিখে কি লাভ হয় আমি তো বুঝতে পারি না। অবশ্য, তারা এই সব দুঃখ দৈন্য দমন করে মাথা তুলেছে—এ যদি দেখাতে পারতে তাহলে কোনো কথা ছিল না। কিন্তু তারা দুর্বল তারা নিপীড়িত তারা অভাবের পায়ে মনুষ্যত্ব বলি দিচ্ছে—এই কথা জোর গলায় ঘোষণা করে কি লাভ হয়?'

প্রমোদ গরম হইয়া বলিল, 'কি লাভ হয়? মানুষের ব্যথা মানুষের কাছে পোঁছে দেওয়া হয়; যাদের প্রাণ আছে তারা বুঝতে পারে দেশের তথাকথিত ভদ্রলোকেরা এই গরীবদের কি করে পায়ের তলায় দাবিয়ে রেখেছে।'

ব্রজেন জিজ্ঞাসা করিল, 'এই গরীবদের দুর্দশার জন্যে তাদের নিজেদের কোনো দায় দোষ নেই?'

প্রমোদ গর্জন করিয়া বলিল, 'না—নেই। দোষ তোমার মত বিলাসী ধনীর—যারা পরিশ্রম করে না অথচ বসে বসে তাদের মুখের অন্ন কেড়ে খায়।'

ব্রজেন ধীরভাবে বলিল, 'আমি আজ পর্যন্ত কারুর মুখের অন্ন কেড়ে খেয়েছি বলে স্মরণ হচ্ছে না। তবে দু'একজনের মুখে অন্ন যুগিয়েছি বটে।'

অট্টহাস্য করিয়া প্রমোদ বলিল, 'তুমি দাতাকর্ণ! কার অন্ন কার মুখে যুগিয়েছ একবার ভেবে দেখেছ কি?

মৃদু হাসিয়া ব্রজেন বলিল, 'আমারই অন্ন, আমি খুব ভাল করে ভেবে দেখেছি।'

অন্নদা শান্ত বিজ্ঞতার কণ্ঠে বলিল, 'ব্রজলাট, গরীবের দরদ বুঝতে হলে গরীব হওয়া চাই—বুঝলে? টাকার কাঁড়ির ওপর বসে থাকলে টাকার গরমে দরদ সব উবে যায়।'

ব্রজেন বলিল, 'তাই হবে বোধ হয়। তোমাদের ভাব দেখে মনে হয় টাকা জিনিসটাকে

তোমরা ভারি ঘেন্না কর।'

প্রমোদ তীব্রস্বরে বলিল, 'হ্যাঁ করি। টাকা আমাদের হাতের ময়লা। আমি তো নিজে গরীব বলে গর্ব অনুভব করি।'

ব্রজেন জিজ্ঞাসা করিল, 'গরীব হওয়ার কোনো বাহাদুরী আছে?'

অন্নদা জবাব দিল, 'হ্যাঁ আছে। দেশের শতকরা নিরেনব্বই জনের মধ্যে আমিও একজন, এই আমরা গর্ব।'

তাহার দিকে ফিরিয়া ব্রজেন বলিল, 'তুমি তো লটারিতে টিকিট কেনো সেদিন বলেছিলে। কেন কেনো? আর মনে কর যদি একলাখ টাকা পেয়ে যাও—সে টাকা কি ফেলে দেবে, না গরীবদের বিলিয়ে দেবে?'

অন্নদা হঠাৎ জবাব দিতে পারিল না। হিরণ তাহার হইয়া বলিল, 'অন্নদা কি করবে না করবে তা তুমি কি করে জানলে ব্রজলাট? বিলিয়েও দিতে পারে। আমি নিজের কথা বলতে পারি, টাকাকে আমি ঘেন্না করিনে বটে কিন্তু টাকা বুকে আঁকড়ে ধরবার মত জিনিস তাও আমার মনে হয় না।'

ব্রজেন বলিল, 'আমারও হয় না, ওখানে আমি তোমার সঙ্গে একমত। কিন্তু তাই বলে নিজের দারিদ্র্যকে ঢাক পিটিয়ে জাহির করে বেড়ানোও আমি অত্যন্ত লজ্জাকর মনে করি।'

অন্নদার এতক্ষণে লুপ্ত কণ্ঠস্বর ফিরিয়াছিল, বলিল, 'কি যাতনা বিষে জানিবে সে কিসে কভু আশীবিষে দংশেনি যারে! He laughs at scars that never felt a wound.'

ব্রজেন বলিল, 'আচ্ছা অন্নদা, সত্যি বল, নিজেদের খেলো করতে একটুও বাধে না? এই যে তোমরা 'আমি হীন আমি দীন আমি নরকের কীট' বলে রাতদিন নাকে কান্না কাঁদছ, যে ছাইপাঁশ সাহিত্য রচনা করছ সেও ওই নাকি কান্নার সুরে—এতে তোমাদের মনের দৈন্য প্রকাশ হয়ে পড়ছে না? এটা যে একটা inferiority complex তা বুঝতে পারছ না?'

অন্নদা উচ্চ অঙ্গের ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না, পারছি না। আমরা তোমার মত snob নই। বীরেন, চা আনাও হে।'

ব্রজেনের চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল, সে তীক্ষ্ম কণ্ঠে বলিল, 'এই যে প্রত্যহ সন্ধ্যেবেলা নিয়ম বেঁধে বীরেনের ঘাড় ভেঙে চা ইত্যাদি ধ্বংস করছ—এতেও নিজেকে ছোট মনে হচ্ছে না?'

সকলের মুখ লাল হইয়া উঠিল। বীরেন লজ্জিতভাবে বলিল, 'আঃ, কি বলছ ব্রজলাট! বন্ধুর বাড়িতে—দোষ কি?'

ব্রজেন বলিল, 'দোষ হত না, যদি এরা শুধু চায়ের লোভেই এখানে না আসত। মনের এই নির্লজ্জ দীনতাকেই আমি ঘেন্না করি।'

হিরণ বলিল, 'এখানে চা খেতে আসাই যে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য তা সবাই জানে, বীরেনেরও অগোচর নেই। সুতরাং ব্রজলাট, তোমার খোঁচাটা মাঠে মারা গেল, আমাদের গায়ে লাগল না।'

ব্রজেন উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'আশ্চর্য, এতবড় খোঁচাটাও তোমাদের গায়ে লাগল না! এত পুরু চামড়া নিয়ে তোমরা সাহিত্য রচনা কর কি করে?'

এই সময় চা আসিল। বীরেন বলিল, 'কিহে—উঠলে নাকি? এক পেয়ালা খেয়ে যাও।'

'না ভাই, আমি উঠলুম। আমার একটু কাজ আছে।'

পেয়ালায় চুমুক দিয়া প্রমোদ হিংস্র কণ্ঠে কহিল, 'Firpo-র চা নয়, ব্রজলাটের

শরীর খারাপ হতে পারে।'

অন্নদা বাঁকা হাসিয়া বলিল, 'তা ছাড়া আত্মসম্মানের হানি হওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু তোমার তো সে ভয় নেই ব্রজলাট, তুমি তো আর আমাদের মত হা-ঘরে নয়। খাও না এক পেয়ালা, আত্মমর্যাদা চিড় খাবে না।"

'না, তোমরা খাও'—বলিয়া ব্রজেন বাহির হইয়া যাইবে এমন সময় আরো দু'তিন জন আড্ডাধারী কলরব করিতে করিতে ঘরে ঢুকিল।

বিরাজ বলিল, 'তুমুল ব্যাপার। হৈ রৈ কান্ড! আর তোমাদের দুঃখ রইল না—বুঝলে হে? স্বয়ং কবি-সম্রাট এবার আসরে নেমেছেন।'

সুধীর বলিল, 'কবি-সম্রাটের মাথায় এত বুদ্ধি খেলত না বাবা, যদি এই শর্মা দিনরাত পশ্চাতে লেগে থেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কাজ হাসিল না করত!'

বীরেন বলিল, 'কি ব্যাপারটা আগে বল না ছাই।'

সুধীর বলিল, 'ব্যাপার আর কি! আমার সেই স্কীম মনে নেই? কবিকে রাজী করিয়েছি। সমিতি তৈরি হয়ে গেছে—স্বয়ং কবি তার সভাপতি। আরো অনেক বড় বড় শাঁসালো লোক আছেন। সমিতির নাম হয়েছে 'বাণী বান্ধব সমিতি'। ছোট বড় সব সাহিত্যিক আর সাহিত্য ব্যবসায়ীর কাছ থেকে চাঁদা তোলা হবে, বাইরে থেকে চাঁদা নেওয়া হবে না। সেই টাকায় তোমার আমার মত যত সাহিত্যিক আছে—যাদের লেখা সহজে প্রকাশকেরা নিতে চায় না—তাদের বই ছাপিয়ে প্রকাশ করা হবে। এই দেখ আবেদন পত্র আর নামের ফিরিস্তি। স্বয়ং কবি গোড়াতেই দু'শো টাকার চেক ঝেড়েছেন।'

বিরাজ বলিল, 'শুধু তাই নয়, সমিতির অন্য উদ্দেশ্যও আছে। যদি কোন সাহিত্যিক কষ্টে পড়েন, তাঁকে অর্থসাহায্যও করা হবে।—এখন যে যার ট্যাঁক থেকে কিছু কিছু বার কর তো দেখি। আমাদের ওপর চাঁদা তোলবার ভার পড়েছে!'

কবির স্বহস্ত লিখিত আবেদন পত্রটা সকলে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। দেখা শেষ হইলে প্রমোদ প্রকান্ড একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'যাক বাবা, এতদিনে অনাথ শিশুদের একটা হিল্লে হল। ওহে বিকাশ, তোমার সেই উপন্যাসখানা—যেটা আমাদের প্রায়ই পড়ে শোনাও—সেটা বগলে করে এবার বেরিয়ে পড়।'

সুধীর বলিল, 'সে তো পরের কথা, এখন কে কত দেবে বল। বীরেন, তুমি কি দিচ্ছ?'

বীরেন বলিল, 'আমি এক টাকা দিলুম। লিখে নাও।'

লিখিয়া লইয়া সুধীর বলিল, 'এবার তোমরা। অন্নদা—কত?'

অন্নদা বলিল, 'আমরা আবার দেব কি বাবা? আমরাই তো হলুম গিয়ে এ ফন্ডের বেনিফিশিয়ারি—আমরা তো নেব।'

ব্রজেনের মুখ ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, সে বলিল, 'নেবে? হাত পাততে লজ্জা করবে না অন্নদা?'

প্রমোদ গাহিয়া উঠিল, 'কিসের দুঃখ কিসের দৈন্য কিসের লজ্জা কিসের ক্লেশ, সপ্তকোটি—'

সুধীর বলিল, 'ঠাট্টা নয়, টাকা বার কর। কবিকে কথা দিয়ে এসেছি।'

প্রমোদ বলিল, 'সুধীর, তুমি হাসালে। আমরা টাকা কোথায় পাব ভাই! পকেটে স্রেফ সুপুরি আছে।—তার চেয়ে ঐ যে টাকার কুতুব মিনার দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁকে ধর। ওঁর হাত ঝাড়লে পর্বত—এখনি দশ বিশ টাকা বেরিয়ে পড়বে।'

সুধীর ব্রজেনের দিকে ফিরিয়া বলিল, 'বেশ, তাহলে তুমিই আরম্ভ কর ব্রজলাট। কত দেবে?'

ব্রজেনের মুখে একটা কঠিন হাসি দেখা দিল, 'আমাকেও দিতে হবে? বেশ, দু'টাকা লিখে নাও।' পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিতে করিতে বলিল, 'দুস্থ সাহিত্যিকদের প্রতিপালন করছি ভেবেও একটু আনন্দ পাওয়া যাবে।'

মনিব্যাগে কেবল একটি দশ টাকার নোট ছিল, ব্রজেন সেটা সুধীরের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। সুধীর বলিল, 'খুচরো টাকা তো নেই। তোমাদের কারুর কাছে আছে? বীরেন, নোটখানা বাড়ি থেকে ভাঙিয়ে এনে দাও না।'

প্রমোদ বলিয়া উঠিল, 'আবার ভাঙিয়ে কি হবে বাবা! ও সবটাই জমা করে নাও।'

সকলেই সানন্দে হাঁ হাঁ করিয়া সায় দিল, পরের টাকা সদ্ব্যয় হইতেছে দেখিলে কাহার না আনন্দ হয়? বিশেষত আজ ব্রজেনের কথায় সকলের গায়েই বিষম জ্বালা ধরিয়াছিল। প্রমোদ বলিল, 'ব্রজলাট, তুমি দশ টাকার কম দিলে লোকে বলবে কি? তোমার সিল্কের পাঞ্জাবির অপমান হবে যে বাবা। তাছাড়া তোমার নিজের উপার্জনের পয়সা তো নয় যে গায়ে লাগবে। পৈতৃক পয়সা—'

ব্রজেন তাহার দিকে ফিরিয়া তীব্র বিদ্রূপের স্বরে বলিল, 'তুমি ঠিক জানো এ আমার পৈতৃক পয়সা—কেমন?'

প্রমোদ বলিল, 'তাছাড়া আর কি হতে পারে লাট? সাহিত্য ব্যবসায়ে উপার্জন করে বাবুয়ানি কর—এ তো বিশ্বাস হয় না।'

ব্রজেন আর কিছু বলিল না। সুধীর সানন্দে বলিল, 'তাহলে দশ টাকাই জমা করে নিলুম।'

ব্রজেন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর 'আচ্ছা চললুম' বলিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

হিরণ তাহাকে ডাকিয়া বলিল, 'দাঁড়াও হে ব্রজলাট, আমিও যাব।—হাঁ হাঁ, কিছু দেব বৈকি। আট আনা লিখে নাও, কিন্তু এখন কিছু দিতে পারছি না। শিগ্গির কিছু টাকা পাবার কথা আছে—'

দু'জনে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল; ব্রজেনের বাসা কাশীপুরের দিকে সকলেই জানিত বটে কিন্তু কেহ আজ পর্যন্ত সেখানে পদার্পণ করে নাই। কিছুদূর গিয়া হিরণ জিজ্ঞাসা করিল, 'বাসায় ফিরবে নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তুমি বাস ধর, তোমাকে আর আট্কাব না।'

'না আমি হেঁটেই যাব। চল না যতদূর একসঙ্গে যাওয়া যায়?'

আরও কিছুদূর নীরবে চলিবার পর হঠাৎ হিরণ বলিল, 'দেখ, তোমার কথাগুলো শুনতে কড়া হলেও সত্যি। কিন্তু কি করবো ভাই, পেরে উঠি না। দাঁত চেপে দারিদ্র্য সহ্য করা সকলের সাধ্য নয়। তুমিও যদি আমাদের মত অবস্থায় পড়তে—'

যে রেস্তোরাঁর সম্মুখে তাহাদের কথা হইয়াছিল সেখানে পৌঁছিয়া ব্রজেন দাঁড়াইয়া পড়িল। একবার টলিয়া নিজেকে সাম্লাইবার চেষ্টা করিল, তারপর হঠাৎ ফুটপাথের উপর সটান পড়িয়া গেল।

রেস্তোরাঁয় লোক ছিল, ব্রজেনের মূর্চ্ছিত দেহ ধরাধরি করিয়া একটা বেঞ্চির ওপর শোয়াইয়া দিল। হিরণ একেবারে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল, সে বলিল, 'কিছুই তো বুঝতে পারছি না। হঠাৎ,—মৃগীর রোগ আছে হয়তো। অ্যাম্বুলেন্সে খবর দিলে ভাল হয়।'

অ্যাম্বুলেন্স আসিলে ব্রজেনকে তাহাতে তুলিয়া দেওয়া হইল। হিরণও সঙ্গে গেল।

হাসপাতালের ডাক্তার ব্রজেনের পরীক্ষা শেষ করিয়া হিরণের কাছে আসিয়া বলিলেন, 'আপনার বন্ধু? না এখনো জ্ঞান হয়নি; তবে শিগ্‌গির হবে আশা করি।—ওঁকে দেখে তো বেশ সংগতিপন্ন বলেই মনে হল। অথচ—আশ্চর্য—উনি বোধ হয় এক-মাস কিছু খাননি। শরীরের টিস্যুগুলো পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে।...কি ব্যাপার বলুন তো?'

২৪ ফাল্গুন ১৩৩৯

সন্ধি-বিগ্রহ

ঘোড়সোয়ারের মত মোটা ডালের দু'পাশে পা ঝুলাইয়া বসিয়া নিতাইবাবু গভীর-ভাবে চিন্তা করিতেছিলেন। ঝোঁকের মাথায় যা-হোক একটা কিছু করিয়া ফেলিবার বয়স আর তাঁহার নাই; প্রবীণ সেনাপতির মত সব দিক দেখিয়া-শুনিয়া অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে হইবে। বিশেষতঃ আজ ব্যাপারটা সত্যই অতিশয় ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে।

বহু নিম্নে বৃদ্ধ বটগাছের নিশ্ছিদ্র ছায়া মূলের চারি পাশের স্থানটিকে অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে, গাছের ঝুরিগুলো সারি সারি দড়ির মত ঝুলিতেছে। বেলা মধ্যাহ্ন। নিতাইবাবু উদরের মধ্যে বৃশ্চিক দংশনের মত একটা জ্বালা অনুভব করিলেন, বুঝিলেন তাঁহার ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে। তিনি কামিজের পকেট দু'টা আর একবার ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কিছুই পাইলেন না। তুঁত ফল ও পেয়ারা যে ক'টা পকেটে ছিল তাহা বহু পূর্বেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। চিন্তিতভাবে নিতাইবাবু উপরের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিলেন। এতক্ষণ একটা একটানা গুঞ্জন ধ্বনি তাঁহার কর্ণে আসিতে-ছিল, কিন্তু মানসিক দুশ্চিন্তা হেতু তাহার কারণ তদারক করা হয় নাই। এখন দেখিলেন, তাঁহার মাথার প্রায় দশ-বার হাত ঊর্ধ্বে একটা মোটা ডাল হইতে প্রকাণ্ড অর্ধচন্দ্রাকৃতি মৌমাছির চাক ঝুলিয়া আছে। নিতাইবাবু তাঁহার ক্ষুধার জ্বালা ও বর্তমান সমস্যা ভুলিয়া কৌতূহলীভাবে কিছুক্ষণ মৌমাছিপূর্ণ চাকটার দিকে চাহিয়া রহিলেন; তার-পর অতি সন্তর্পণে দু'টা ডাল নামিয়া বসিলেন। মৌচাকের সান্নিধ্য যে নিরাপদ নয় নিতাইবাবু তাহা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা ভালরূপে জ্ঞাত ছিলেন।

অতঃপর শাখারূঢ় নিতাইবাবু আবার গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন। বটগাছের পাশ দিয়া পাকা রাস্তা গিয়াছে, রাস্তার অপর পারে ঠিক বটগাছের সম্মুখেই প্রকাণ্ড হাতা-যুক্ত বাড়ির লোহার ফটক, ফটকের পাশে দরোয়ানের দেউড়ি। নিতাইবাবু যেখানে

গাছের উচ্চশাখায় বসিয়া আছেন সেখান হইতে বাড়িখানা ও চতুষ্পার্শ্বের পাঁচিল-ঘেরা ভূভাগ পরিষ্কার দেখা যায়। এমন কি বাড়ি হইতে উঁচু গলায় কথা কহিলে শোনা পর্যন্ত যায়। বাড়ির মধ্যে কাহারা যাতায়াত করিতেছে তাহা পর্যবেক্ষণ করিবারও কোন অসুবিধা নাই।

কিন্তু প্রধান অসুবিধা—নিতাইবাবুর পক্ষে—এই বাড়িতে প্রবেশ করা। প্রথমত, সদরে দরোয়ান আছে, সুতরাং সেদিক দিয়া প্রবেশ করা চলিবে না। পিছনের দেওয়াল ডিঙাইয়া বাগানে ঢোকা যাইতে পারে, কিন্তু তার পর? বাড়ির ভিতর মাথা গলাইবার উপায় কি? সেখানে বিন্দি আছে, দেখিলেই ধরাইয়া দিবে, দয়ামায়া করিবে না। তা ছাড়া নিতাইবাবুর খুড়োমহাশয় স্বয়ং একটা চাবুক হাতে লইয়া বাড়িময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং মাঝে মাঝে গর্জন ছাড়িতেছেন। তাঁহার চক্ষুকে ফাঁকি দেওয়া সহজ হইবে না। অবশ্য, কোন রকমে একবার ঠাকুরমার কাছে গিয়া পেঁাছিতে পারিলে--

কিন্তু একটা কথা এখনো বলা হয় নাই—নিতাইবাবুর বয়ঃক্রম পূর্ণ নয় বৎসর।

অদ্য প্রাতঃকালে তিনি একটি গুরুতর দুষ্কার্য করিয়া বাড়ি হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। কাল সন্ধ্যাবেলা জ্যেষ্ঠা ভগিনী একাদশবর্ষীয়া বিন্দুর সহিত তাঁহার ঝগড়া হইয়াছিল। ফলে, চিরকাল যাহা হইয়া আসিয়াছে, বিন্দি কাকা ও বাবাকে সালিশ মানিয়া মোকদ্দমা জিতিয়া গেল। ক্রুদ্ধ নিতাইবাবু তখন চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু আজ সকালে শয্যা হইতে উঠিয়াই সে-পরাজয়ের ভীষণ প্রতিশোধ লইলেন। নিতাইবাবু বিন্দির সহিত এক শয্যায় শয়ন করিতেন। প্রভাতে বিন্দি ঘুম ভাঙিয়া দেখিল তাহার মাথায় খোঁপা নাই। বিহ্বলভাবে এদিক-ওদিক চাহিতে দৃষ্টি পড়িল খোঁপাটি অবিকৃত অবস্থায় সম্মুখের দেয়ালে ঘুঁটের মত আটকাইয়া রহিয়াছে।

নিতাইবাবু নিজের কার্যের ফলাফল জানিবার জন্য আনাচে কানাচে বেড়াইতেছিলেন, বিন্দির চিল-চীৎকার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি বুঝিলেন কাজটা ভাল হয় নাই, একটু বাড়াবাড়ি হইয়া গিয়াছে। তিনি নিঃশব্দে গৃহত্যাগ করিলেন।

তারপর পাড়ার এদিক-ওদিক বেড়াইয়া, জনৈক প্রতিবেশীর বাগান হইতে কিছু তুঁত ও পেয়ারা সংগ্রহ করিয়া বেলা-দশটা আন্দাজ যখন দেখিলেন যে বাড়ির চাকর-বাকর তাঁহাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে তখন তিনি গোপনে এই বটগাছের শাখায় আশ্রয় লইয়াছেন এবং নিজে অলক্ষ্যে থাকিয়া প্রতিপক্ষের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিতেছেন।

কিন্তু বিপদের কথা এই যে, রসদ একেবারে ফুরাইয়া গিয়াছে। খালি পেটে যুদ্ধ কতক্ষণ সম্ভব? নিতাইবাবু কল্পনার চক্ষে দেখিতে পাইলেন এই সময় কি কি খাদ্য বাড়িতে তৈয়ার হইয়াছে; তাঁহার মুখ লালসার প্রাবল্যে শীর্ণভাব ধারণ করিল। কিন্তু তিনি কোমরের কসি শক্ত করিয়া বাঁধিয়া পা দুলাইতে লাগিলেন। কারণ, কল্পনার চক্ষে ভোজ্য বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে আর একটি জিনিস তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন—সেটি কাকার হাতের লিক্‌লিকে সরু চাবুকটি।

অবশ্য প্রহার বস্তুটি নিতাইবাবুর জীবনে নূতন নয়। সামান্য কিলটা চড়টার কথা ছাড়িয়া দিই, সে তো নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা, কিন্তু যাহাকে 'সাতচোরের মার' বলে সেইরূপ দুর্জয় প্রহারও তাঁহার ভাগ্যে বিরল নয়—প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। বাড়ির লোকের কেমন একটা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, পাড়ার চতুঃসীমায় কোথাও কোন দুর্ঘটনা ঘটিলেই সকলের সন্দেহ নিতাইবাবুর উপর আসিয়া পড়ে এবং সন্দেহটা যথার্থ কি অলীক তাহা নিরাকরণ হইবার পূর্বেই তাঁহার পৃষ্ঠে ও মস্তকে নানাপ্রকার অপ্রীতিকর বস্তু বর্ষিত হইতে থাকে। এই তো সেদিন, নিতান্ত অকারণেই নিতাইবাবুকে অশেষ

লাঞ্ছনা নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে।

এ ব্যাপারে তাঁহার বিন্দুমাত্র দোষ ছিল না; এমন কি, কেমন করিয়া কি হইল, সে বিষয়ে একটা ধোঁকার ভাব তাঁহার মনে রহিয়া গিয়াছিল। বিন্দু ছাদের উপর খেলা-ঘর পাতিয়াছিল, সেদিন তাহার খেলাঘরে চড়ুইভাতি ছিল। বিন্দু ব্যস্তসমস্তভাবে রান্নার যোগাড় করিতে করিতে গলার হারছড়া ছাদে ফেলিয়াই নীচে নামিয়া গিয়া-ছিল। এই সুযোগে নিতাইবাবু নেহাৎ পরিহাসচ্ছলেই হারটা গুড়ের বাটিতে ডুবাইয়া আবার যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে কোন দুরভিসন্ধি ছিল না; কেবল ইহাই উদ্দেশ্য ছিল যে, গুড়ের লোভে হারে পিঁপড়া লাগিবে এবং তার-পর বিন্দু যখন না দেখিয়া আবার সেটা গলায় দিবে তখন একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য অভিনয় ঘটিয়া যাইবে।

অভিনয় কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত রকমের হইল। কিয়ৎকাল পরে বিন্দু চীৎকার করিতে করিতে নামিয়া আসিয়া খবর দিল যে, নিতাই তাহার হার লইয়া পলাইয়াছে। নিতাইবাবুকে ধরিয়া আনা হইল, কিন্তু তিনি সবেগে মাথা নাড়িয়া অভিযোগ অস্বীকার করিলেন। গুড়মাখানোর কথাটাও অবস্থাগতিক দেখিয়া চাপিয়া যাইতে হইল। কিন্তু তাঁহার কথা কেহই বিশ্বাস করিল না। কাকা কর্ণে প্যাঁচ দিয়া বলিলেন, 'কোথায় রেখে-ছিস নিয়ে আয়, তাহলে কিছু বলব না।'

কিন্তু যে-জিনিসের সন্ধান জানা নাই তাহা কি করিয়া আনা যাইতে পারে। নিতাই-বাবু হার আনিতে পারিলেন না। কানুটি চড়ে উঠিল। তথাপি হার বাহির হইল না। তখন কাকা বেত আনিয়া নিতাইবাবুর পৃষ্ঠ ও নিকটবর্তী আর একটা স্থান রক্তবর্ণ করিয়া দিলেন। নিতাইবাবুর মনে হইতে লাগিল যে ইন্দ্রজাল-প্রভাবে যদি একটা সোনার হার তৈয়ার করিয়া আনিয়া দিতে পারিতেন তাহা হইলে দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাই করিতেন। কিন্তু ভোজবিদ্যায় পারদর্শিতা না থাকায় তাঁহাকে কেবল পড়িয়া-পড়িয়া মার খাইতে হইল।

কাকা অবশেষে ক্লান্ত হইয়া ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, 'বড় হয়ে এটা দাগী চোর হবে —একেবারে সি ক্লাস! নিয়ে যা আমার সুমুখ থেকে।'

ইহা দশ-বার দিন আগের ঘটনা। তারপর বিন্দু তাঁহাকে অনেক খোসামোদ করিয়াছে, কিন্তু অত মার খাইবার পর যে সকল নষ্টের গোড়া তাহার সহিত এক কথায় সদ্ভাব স্থাপন করা চলে না; নিতাইবাবু গর্বিতভাবে বিন্দুর সন্ধির প্রয়াস প্রত্যাখান করিয়াছেন এবং হার সম্বন্ধে একটা গভীর রহস্যময় নীরবতা অবলম্বন করিতেছেন। ইহার কয়েক দিন পরেই সামান্য বিষয় লইয়া কাল রাত্রে আবার বিন্দুর সহিত ঝগড়া বাধিয়া গেল। নিতাইবাবু তাঁহার সঞ্চিত ক্রোধ ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়া কাঁচির সাহায্যে বিন্দুর খোঁপা নির্মূল করিয়া দিলেন।

গাছের ডালে ঠেসান দিয়া বসিয়া পা দুলাইতে দুলাইতে বিন্দুর লুপ্তবেণী মস্তকটির কথা স্মরণ হইতেই নিতাইবাবুর শুষ্ক মুখে একটু হাসি দেখা দিল। আর যাহাই হোক, বিন্দুকে দস্তুরমত জব্দ করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন অন্ততঃ ছয় মাসের জন্য নিশ্চিন্ত—বিন্দু খোঁপা বাঁধিতে পারিবে না। নাঃ—বেড়া বিনুনিও নয়। খোঁপার জায়গাটায় মাংস বাহির হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু এই আনন্দ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না, জঠরের বৃশ্চিকদংশন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নিতাইবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। একটা কাঠবেড়ালী অনেকক্ষণ হইতে পাশের একটা ডাল দিয়া ওঠানামা করিতেছিল, চোখে পড়িলেও নিতাইবাবু ভাল করিয়া লক্ষ্য করেন নাই। কাঠবিড়ালীটা

দ্রুতপদে যাতায়াত করিতে করিতে তাঁহার কাছাকাছি আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িতেছিল, কালো কালো পেঁপের বিচির মত চোখ দিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া কিচিমিচি শব্দে মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছিল। নিতাইবাবু এখন তাহার গতিবিধি চক্ষু দ্বারা অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, কাঠবিড়ালী প্রত্যেক বার নীচে হইতে উপরে আসিবার সময় একটি ছোট্ট ফল মুখে করিয়া আনিতেছে এবং সেটিকে একটি কোটরের মধ্যে রাখিয়া আবার ফিরিয়া যাইতেছে।

ক্ষুধার সহিত কৌতূহল যোগ দিয়া নিতাইবাবুকে স্থির থাকিতে দিল না। তিনি ধীরে ধীরে নিজের শাখা হইতে নামিয়া আসিয়া যে-শাখায় কাঠবিড়ালীর কোটর ছিল সেই শাখায় উঠিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কোটরের কাছাকাছি পেঁছিতে না পেঁছিতে কাঠবিড়ালী তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া উত্তেজিতভাবে কিচিমিচি করিয়া উঠিল; নিতাইবাবু তবু উঠিতে লাগিলেন। কাঠবিড়ালী তখন বেগতিক দেখিয়া কোটর ছাড়িয়া পলায়ন করিল এবং বহু ঊর্ধ্বে একটা সরু ডালে বসিয়া অবিশ্রাম নিতাইবাবুকে গালাগালি দিতে লাগিল।

নিতাইবাবু তাহার সমস্ত তিরস্কার অগ্রাহ্য করিয়া কোটরের সম্মুখে শাখার দুই দিকে পা ঝুলাইয়া বসিলেন, কোটরে উঁকি মারিয়া দেখিলেন অন্ধকার, কিছু দেখিতে পাইলেন না। মারের ভয় ছাড়া অন্য কোনও ভয় নিতাইবাবুর শরীরে ছিল না, তিনি স্বচ্ছন্দে সেই অন্ধকার গর্তের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া দিলেন। উপরে কাঠবিড়ালীর চেঁচামেচি ও গালিগালাজ আরও তীব্র হইয়া উঠিল।

কনুই পর্যন্ত হাত প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া নিতাইবাবু অনুভব করিলেন যে, তিনি কাঠবিড়ালীর বাসায় পেঁছিয়াছেন, তুলার মত নরম তুলতুলে একটি স্থান তাঁহার হাতে ঠেকিল। হাতড়াইতে হাতড়াইতে তিনি দেখিলেন, সেই নরম স্থানটিতে কাঠবিড়ালী তাহার রসদ সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। তিনি আর দ্বিধা না করিয়া এক থাম্‌চায় যতখানি পারিলেন সেই রসদ বাহির করিয়া আনিলেন।

কাঠবিড়ালী অতিশয় হিসাবী জন্তু। সন্তানসন্ততি এখনও জন্মগ্রহণ করে নাই, বর্ষাকাল আসিতেও অনেক দেরি আছে, ইহারই মধ্যে সে ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিয়া অনাগত দুর্দিনের জন্য সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। নিতাইবাবু কোলের কাপড়ের উপর শুষ্ক ফলগুলি ঢালিয়া একে একে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। বেশীর ভাগই ছোট ছোট শুকনা ডুমুর, করমচা ও আরও কয়েক প্রকারের নামগোত্রহীন জংলী ফল। তাছাড়া কয়েকটা চীনাবাদাম, ছোলা ও কড়াইয়ের দানা পাওয়া গেল। সেগুলি নিতাইবাবু প্রাপ্তিমাত্র উদরসাৎ করিলেন। দু-তিনটা পুরাতন কাঁঠালবিচি ও হরীতকী ছিল, সেগুলি নিতাইবাবু একবার কামড়াইয়া থু থু করিয়া ফেলিয়া দিলেন। অখাদ্য।

কোটর হইতে আর এক খাব্‌লা বাহির করিয়া তিনি ক্ষুধিতভাবে পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু আর চীনাবাদাম কিংবা ছোলা পাওয়া গেল না। তাহার পরিবর্তে তিনি একটি হারানো জিনিস ফিরিয়া পাইলেন। কয়েকদিন পূর্বে তাঁহার একটি কাচের রঙ্‌চঙা মার্বেল হারাইয়া গিয়াছিল, সেটি রহিয়াছে দেখিলেন। নিতাইবাবু সেটি সযত্নে পকেটে পুরিলেন।

কাঠবিড়ালীটা তখনও ঊর্ধ্বে থাকিয়া তর্জনগর্জন ও লাফালাফি করিতেছিল, একটা কাঁঠালবিচি তাহার উদ্দেশ্যে ছুঁড়িয়া মারিয়া নিতাইবাবু বলিলেন, 'চোর কোথাকার।' শব্দভেদী যুদ্ধে ক্রমশঃ অস্ত্রশস্ত্রের আমদানী হইতেছে দেখিয়া কাঠবিড়ালী রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।

বিমর্ষভাবে আবার নিতাইবাবু স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন। অপ্রচুর ইন্ধনে

তাঁহার জঠরের অগ্নি আবার দ্বিগুণ বেগে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তিনি শাখায় হেলান দিয়া ঊর্ধ্বমুখে ভাবিতে লাগিলেন,—এখন আত্মসমর্পণ করিলে মারের মাত্রা কিছু কমিবে কি-না? বেলা দুইটা বাজিয়া গিয়াছে, সূর্যদেব মাথার উপর হইতে পাশে ঢলিয়া পড়িয়াছেন; গাছের ছায়া বৃক্ষতল ছাড়িয়া সরিতে আরম্ভ করিয়াছে। নিতাইবাবু বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, এখন বাড়ি ফিরিলে হয়তো অল্পের উপর দিয়া ফাঁড়াটা কাটিয়া যাইতে পারে। এত বেলা পর্যন্ত অভুক্ত থাকার পর মা ও ঠাকুরমা নিশ্চয় তাঁহাকে রক্ষা করিবেন, হয়তো প্রত্যাবর্তনের সংবাদ কাকার কানে না-উঠিতেও পারে। কিন্তু ওদিকে প্রতিহিংসাপরায়ণা বিন্দি আছে—সে ছাড়িবে না, নিশ্চয় কাকাকে খবর দিবে। তখন কি হইবে?

নিতাইবাবু গভীর নিশ্বাস মোচন করিলেন। এ অবস্থায় কি করা যায়।

হঠাৎ বাড়ি হইতে উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিয়া নিতাইবাবু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। কান খাড়া করিয়া শুনিলেন দরোয়ান গাড়িবারান্দার তলায় দাঁড়াইয়া বলিতেছে, 'কঁাহি নহি মিলা হুজুর। খোকাবাবু বিলকুল লা-পতা হো গয়ে।'

কাকাকে দেখা গেল না, কিন্তু তাঁহার ভারী গলার আওয়াজ শোনা গেল, 'ক্যা বেওকুফ্‌কা মাফিক বোল্‌তা হ্যয়। লা-পতা হোকে কাঁহা যায়েংগে? জরুর কঁাহি ছিপে হয়ে হ্যঁয়। মহল্লামে দেখা?'

'জী হুজুর।'

'যাও, ফির্‌ আচ্ছি তরহসে খোজো।'

গাছের উপর নিতাইবাবু নিজমনে দাঁত খিঁচাইয়া হাসিলেন। এই দুপুর রৌদ্রে দরোয়ানটা তাঁহাকে মিছামিছি চারিদিক খুঁজিয়া বেড়াইতেছে অথচ তিনি হাতের কাছেই রহিয়াছেন, ভাবিতে বড় মধুর লাগিল। তিনি দেখিলেন, বিষণ্ণ ও বিরক্ত দরোয়ান আবার লাঠি হাতে বাহির হইতেছে।

বাড়ির ফটক হইতে বাহির হইয়া দরোয়ান নিতাইবাবুর গাছের ছায়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। নাগরা জুতা খুলিয়া ভিতরের ধুলা ঝাড়িয়া আবার পরিধান করিল, পাগড়ির পুচ্ছ দিয়া মুখের ঘাম মুছিল, তারপর অর্ধস্ফুট স্বরে কি বলিতে বলিতে প্রস্থান করিল।

নিতাইবাবুর একবার ইচ্ছা হইল, দরোয়ানের মাথায় একটা কাঁটালবিচি কিংবা ঐ প্রকার কোনো দ্রব্য ফেলিয়া নিজের স্থিতিস্থান প্রকাশ করিয়া দেন। কিন্তু তিনি সে লোভ সংবরণ করিলেন। এত শীঘ্র আত্মপ্রকাশ করিলে চলিবে না। যদিও পেটের মধ্যে নেংটি ইঁদুর সবেগে ডন্‌ ফেলিতেছে, তথাপি ধৈর্য ধারণ করিতে হইবে। এখনও সময় উপস্থিত হয় নাই।

দরোয়ান চলিয়া যাইবার কিয়ৎকাল পরে নিতাইবাবু দেখিলেন, ঠাকুরমা বাড়ির ছাদের উপর উঠিয়া আলিসার ধারে দাঁড়াইয়া উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক চাহিতেছেন। নিতাইবাবুর মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, উৎসাহে তাঁহার মুখ দিয়া প্রায় বাহির হইয়া গেল —'ঠাকুমা, এই যে আমি এখানে।' কিন্তু 'ঠা—' পর্যন্ত বাহির হইতে-না-হইতে তিনি সবলে দাঁত দিয়া জিব কাটিয়া ধরিলেন। সর্বনাশ! আর একটু হইলেই সব ফাঁস হইয়া গিয়াছিল!

ঠাকুরমা কিছুক্ষণ নিতাইবাবুর দর্শনাশায় ছাদের এদিক-ওদিক হইতে ব্যাকুলভাবে উঁকি মারিয়া অবশেষে নীচে নামিয়া গেলেন। যতক্ষণ দেখা গেল, নিতাইবাবু সতৃষ্ণনয়নে সেইদিকে তাকাইয়া রহিলেন। তারপর আবার ধীরে ধীরে ঠেসান দিয়া শুইলেন।

বাড়িতে যে বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে তাহার নিদর্শন মাঝে মাঝে পাওয়া

যাইতেছিল। ঝি-চাকরগুলো অনবরত ভিতর-বার করিতেছিল। কাকা জলদগম্ভীর স্বরে মধ্যে মধ্যে তাহাদের ধমকাইতেছিলেন; একবার ঠাকুরমার সঙ্গে কাকার কথা-কাটাকাটি হইল—সে আওয়াজও অস্পষ্টভাবে নিতাইবাবুর কানে পৌঁছিল। শেষে বেলা চারটা বাজিয়া গেল তখন কাকা স্বয়ং খোঁজ করিতে বাহির হইলেন। নিতাইবাবু উপর হইতে গলা বাড়াইয়া তাঁহার ভ্রূকুঞ্চিত উদ্বিগ্ন মুখ দেখিয়া মনে মনে বেশ তৃপ্তি অনুভব করিলেন, আশা হইল আরও কিছুক্ষণ এইভাবে অজ্ঞাতবাস চালাইতে পারিলে হয়তো প্রহারের পালাটা একেবারে বাদ পড়িতেও পারে।

তিনি পুনশ্চ কোমরের কসি টান করিয়া দিয়া, চক্ষু মুদিয়া পা দুলাইতে লাগিলেন। শরীর কিছু নির্জীব হইয়া পড়িয়াছিল, মাথায় উপর মৌচাক হইতে মৌমাছিদের এক-টানা গুঞ্জন শুনিতে শুনিতে ক্রমে তাঁহার ঈষৎ তন্দ্রাকর্ষণ হইল।

তন্দ্রার ঘোরে তিনি দেখিতেছিলেন, কোন অভাবনীয় উপায়ে একটা জীবন্ত কাঠ-বিড়ালী তিনি গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিয়াছেন, সেটা পেটের মধ্যে গিয়া নখ দিয়া তাঁহার অভ্যন্তরভাগ আঁচড়াইতেছে ও তাঁহাকে বাপান্ত করিতেছে। এইরূপ বিপন্ন অবস্থায় নিতাইবাবু ছুটিতে ছুটিতে ঠাকুরমার কাছে গিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ঠাক্‌মা, বড্ড খিদে পেয়েছে!' ঠাকুরমা তাঁহাকে কোলে লইয়া বসিতেই কাঠবিড়ালীটা তাঁহার দক্ষিণ কর্ণের ছিদ্রপথ দিয়া বাহির হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্নব্যঞ্জনপূর্ণ থালা কোথা হইতে সম্মুখে উপস্থিত হইল। নিতাইবাবু ভারী আনন্দিত হইলেন। শত্রুপক্ষ কেহ কাছে নাই; ঠাকুরমা সযত্নে অন্নব্যঞ্জন মাখিয়া নিতাইবাবুর ব্যাদিত মুখে গ্রাস দিতে যাইতেছেন এমন সময় নীচে হইতে কর্কশ গলার আওয়াজে তাঁহার চেতনা ফিরিয়া আসিল।

নিতাইবাবু চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, সূর্য একেবারে পশ্চিম দিগন্তরেখা স্পর্শ করিয়াছে এবং তাহার তির্যক্ রশ্মিতে যে ডালে তিনি ছিলেন তাহা আগাগোড়া আলো-কিত হইয়াছে।

নীচে দৃষ্টিপাত করিলেন, দরোয়ান ও বাড়ির একটা ঝি দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে দৃষ্টিগোচর হইল।

দরোয়ান বলিল, 'ঐসা বিচ্ছু লড়কা কভি নেই দেখা। দেখো তো, সবেরে উঠ্‌কে ভাগা আভিতক্ পতা নই! খোজ্‌তে খোজ্‌তে হামরা নাকমে দম আ গিয়া, দিনভর খানা পিনা কুছ নহি—'

ঝি বলিল, 'সত্যি বাপু, অমন ছেলেও দেখিনি কখনও—গিন্নিমা সমস্ত দিন মুখে জল পর্যন্ত দেননি,—বিন্দুদিদি তো কেঁদেকেটে শুয়ে আছে। আচ্ছা, কি বজ্জাত ছেলে বল দিকিন্ দরোয়ানজী, খোঁপাটি মুড়িয়ে কেটে দিলে গা? একটু মায়া হল না? না বাপু, ও ছেলের রকম-সকম মোটে ভাল নয়, যত বয়স বাড়ছে ততই যেন—'

দরোয়ান তিক্ত স্বরে বলিল, 'আরে দাই, হম্ বোল্‌তে হেঁ, তুম খেয়াল রাখনা, ই লড়কা বড়া হোকে ডাকু বনেগা—বম্ গোলা ছোড়েগা! ইয়াদ হ্যয়? উস্-দিন রাত আঠ বজে চারপাই পর শো কর হমারা থোড়া নিদ্ আ গিয়া থা। লোণ্ডা কিয়া কা—চুপসে হমারা টিক্‌মে ডোরি বাহ্‌কে চারপাইকা পায়াসে বাহ্ দিয়া। উস্‌কো বাদ ছোটে ভইয়াকো যাকে খবর দে দিয়া। ব্যস্, ছোটে ভইয়া জোরসে ফুকারিন, হম্‌ভি হড়-বড়াকে উঠা—'

সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে ঝি বলিল, 'আহা মরে যাই। হেঁচকা লেগে টিকি তো তোমার সেদিন প্রায় উপড়ে গিয়েছিল। তারপর ছোটবাবু কত মারলেন, মার তো লেগেই আছে—কিন্তু তবু কি বজ্জাতি কমে—'

দরোয়ান বলিল, 'লড়কা না লড়কেকা দুম্! ছোটে ভইয়াকা মার সে কুছ নেহি হোগা,

হম্‌কো একদফি সরকারসে হুকুম মিল যায়, হম্‌ ডাণ্ডাসে লৌণ্ডেকা বদমাসি নিকাল দে‌ং—'

লৌণ্ডা! লড়কেকা দুম্‌! এ পর্যন্ত নিতাইবাবু কোন রকমে সহ্য করিয়া ছিলেন, কিন্তু আর পারিলেন না। সক্রোধে পকেট হইতে সেই পুনঃপ্রাপ্ত মার্বেলটা বাহির করিয়া দরোয়ানের মাথা লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিলেন।

নিতাইবাবুর লক্ষ্য ব্যর্থ হইবার নয়, মার্বেল দরোয়ানের পাগড়ির মধ্যস্থিত মুক্ত স্থানটিতে আসিয়া লাগিল, খট্‌ করিয়া একটি শব্দ হইল। দরোয়ান শূন্যে প্রায় চার হাত লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, 'বাপ রে! জান গিয়া!' তারপর ঊর্ধ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উত্তেজিত রাসভের মত চীৎকার করিতে লাগিল, 'উয়হ্‌ বৈঠা! পকড়া হ্যায়! ছোটে ভৈয়া জলদি আইয়ে, খোখাবাবু পেঁড় পর বৈঠা হ্যায়!—হমারা শির ফোড় দিয়া! জল্‌দি আইয়ে—পকড়া হ্যায়!'

ঝি বৃক্ষাসীন নিতাইবাবুর হিংস্র মূর্তি দেখিয়াই জিব কাটিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল।

দেখিতে দেখিতে চক্ষের নিমেষে বাড়িতে যে যেখানে ছিল আসিয়া বৃক্ষতলে জমা হইল, বাবা কাকা হইতে আরম্ভ করিয়া বাড়ির দেড় বছরের ছেলেটা পর্যন্ত কেহই বাদ গেল না। নিতাইবাবু দেখিলেন, মুহূর্তের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে তাঁহার পলায়নের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তিনি ডালের উপর আর এক ধাপ উঠিয়া বসিলেন।

কাকা হাতের চাবুক আস্ফালন করিয়া বলিলেন, 'নেমে আয়।'

নিতাইবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'নামব না।'

কাকা রুদ্র কণ্ঠে কহিলেন, 'শীগ্‌গির নেমে আয় বল্‌ছি হনুমানের বা—' বলিয়াই থামিয়া গেলেন। বাবা মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিলেন।

নিতাইবাবু বলিলেন, 'আগে বল মারবে না, তবে নামব।'

'মারব না? তোকে আজ জ্যান্ত মাটিতে পুঁতব। নাম্‌ শীগ্‌গির।'

'তবে নামব না।'

'নাম্‌বি না? আচ্ছা, দাঁড়া তবে। এই বুদ্ধু সিং, গাছ পর চহ্‌ড়ো, কান পকড়কে উস্‌কো উতার লে আও!'

নিতাইবাবুর কান পাকড়িয়া নামাইয়া আনিবার প্রস্তাবটা খুব মুখরোচক হইলেও বুদ্ধু সিং দরোয়ানের তাদৃশ উৎসাহ দেখা গেল না। তাহার মস্তকের কেশবিরল মধ্য-স্থলটি সুপারির মত ফুলিয়া উঠিয়াছিল, সে ঊর্ধ্বে একটি বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ক্ষীণভাবে বলিল, 'জী হুজুর।'

নাগরা ও পাগড়ি খুলিয়া রাখিয়া দরোয়ান গাছে চড়িতে প্রবৃত্ত হইল। নিতাইবাবু প্রমাদ গণিলেন। এবার তো আর রক্ষা নাই।

হঠাৎ তাঁহার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল। তিনি উপর দিকে উঠিতে উঠিতে বলিলেন, 'বুদ্ধু সিং, হামারা পাস আওগে ত হাম্‌ভি এই চাক্‌মে খোঁচা দেঙ্গে। তুম্‌ হাম্‌কো লৌণ্ডা বোল্‌কে গালি দিয়া থা—হাম্‌ভি তুমকো মজা দেখাবেঙ্গে।'—বলিয়া মাথার ইঙ্গিতে প্রকাণ্ড চাকটা দেখাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেই বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গেলেন।

দরোয়ান খানিকটা দূরে উঠিয়াছিল, পিছলাইয়া নামিয়া আসিল; বলিল, 'হম্‌সে নেহি হোগা হুজুর! মধ্‌মাছিকা খোঁতা হ্যায়—জান্‌ চলা যাগা।'

এই ক্ষুদ্র বালকের কূটবুদ্ধি দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন।

ওদিকে নিতাইবাবুও স্তম্ভিত হইয়া মৌচাকের দিকে তাকাইয়া ছিলেন। এমন অভাবনীয় ব্যাপার যে ঘটিতে পারে তাহা কল্পনা করাও দুষ্কর। অস্তমান সূর্যের আলো পাতার ফাঁক দিয়া মৌচাকের উপর পড়িয়াছিল, মক্ষিকাপূর্ণ চাকটা অভ্রের মত আলোক প্রতিফলিত করিতেছিল। নিতাইবাবু বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে দেখিলেন, ঠিক তাহারই এক হাত দূরে স্থূল শাখার রুক্ষ গায়ে আটকাইয়া ঝুলিতেছে—বিন্দুর সেই হারানো সোনার হার! সোনার উপর সূর্যকিরণ পড়িয়া চিক্‌চিক্‌ করিতেছে, চিনিতে নিতাইবাবুর এক মুহূর্তও বিলম্ব হইল না। ইহা সেই হার যাহা তিনি কয়েকদিন পূর্বে গুড়ের বাটিতে ডুবাইয়া মাধুর্যমণ্ডিত করিয়া দিয়াছিলেন। এতক্ষণ কেবল ওই স্থানটা অন্ধকার ছিল বলিয়াই উহা চোখে পড়ে নাই।

কাঠবিড়ালী, কাক, পিপীলিকা প্রভৃতি ইতরপ্রাণীর আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে নিতাইবাবুর প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা ছিল, সুতরাং কি করিয়া হারছড়া বৃক্ষের উচ্চ শাখায় আসিয়া দোদুল্যমান হইল তাহা অনুমান করিতে তাঁহার কষ্ট হইল না। তিনি বুঝিলেন মিষ্টান্নলুব্ধ কোনো ইতরপ্রাণীই এই কুকার্য করিয়াছে।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলাইয়া লইয়া নিতাইবাবু বিজয়োল্লাসে হাস্য করিলেন; আজিকার যুদ্ধে এরূপভাবে ঘেরাও হইয়াও অবশ্যম্ভাবী পরাজয়কে তিনি যে অচিরাৎ সম্মানসূচক সন্ধিতে পরিণত করিতে পারিবেন তাহাতে আর সংশয় রহিল না।

নিম্নাভিমুখে তাকাইয়া তিনি বলিলেন, 'একটা জিনিস পেয়েছি, বল্‌ব না।'

কাকা কথায় ভুলিবার লোক নয়, তিনি বলিলেন, 'বটে? জিনিস পেয়েছ! আচ্ছা, আগে গাছ থেকে নেমে এস তো দেখি।'

'আগে বল মারবে না।'

বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি জিনিস পেয়েছিস?'

একটু ইতস্ততঃ করিয়া নিতাইবাবু বলিলেন, 'বিন্দির হার।'

বিন্দু উপস্থিত ছিল, শুনিবামাত্র সে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'আমার হার! ও কাকা, শীগ্‌গির আমার হার দিতে বল।'

কাকা প্রশ্ন করিলেন, 'হার কোথায় পেলি?'

'বল্‌ব না। আগে বল মারবে না।'

কাকা বিবেচনা করিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, কম মারব। তুই হার নিয়ে নেমে আয়।'

'তবে নামব না। হারও দোব না।'

বিন্দু বলিল, 'ও কাকা—'

কাকা ও বাবা নিম্নস্বরে পরামর্শ করিলেন, তারপর কাকা দুঃখিতভাবে বলিলেন, 'আচ্ছা আয়, মারব না।'

নিতাইবাবুর সন্দেহ হইল ইহার মধ্যে আইনের ফাঁকি আছে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'থাপ্‌পড়?'

'না—থাপ্‌পড়ও মারব না।'

'কানমলা?'

'না।'

'আচ্ছা, তবে যাচ্ছি।'

'হার নিয়ে আস্‌বি, তা না হলে—'

সন্ধির শর্ত রীতিমত পাকা করিয়া লইয়া নিতাইবাবু হারটি উদ্ধারের চেষ্টায় যত্নবান হইলেন। সূর্যাস্ত হইয়া গিয়াছিল, অতএব মৌমাছিদের দিক হইতে আশঙ্কার বিশেষ কারণ ছিল না। নিতাইবাবু গুটি গুটি অতি সাবধানে মৌচাকের নিকটবর্তী হইলেন।

মৌমাছি জাতিটা অতিশয় স্নায়ুপ্রধান, একটুতেই চটিয়া যায়, ইহা নিতাইবাবুর জানা ছিল; তিনি একটি চক্ষু চাকের উপর নিবদ্ধ রাখিয়া হারের দিকে অগ্রসর হইলেন। নীচে যাহারা ছিল তাহারা বিশ হাত ঊর্ধ্বে হারটি দেখিতে পায় নাই, কেবল এই দুঃসাহসিক বালকের গতিবিধির দিকে চাহিয়া নিস্পন্দ হইয়া রহিল।

চাক নিস্তব্ধ, মৌমাছিদের বোধ করি তন্দ্রা আসিয়াছে। নিতাইবাবু হারের নাগালে আসিয়া আস্তে আস্তে হাত বাড়াইলেন। ভোঁ—! একটা ক্রুদ্ধ গুঞ্জন উঠিল। কয়েকটা মৌমাছি চাক হইতে উড়িয়া একবার পরিক্রম করিয়া আবার চাকে গিয়া বসিল। নিতাই-বাবু বিদ্যুদ্‌বেগে হাত টানিয়া লইয়াছিলেন, কিছুক্ষণ নিশ্চল মূর্তির মত বসিয়া রহিলেন।

আবার চাক নিস্তব্ধ—মৌমাছিরা নিশ্চয় নিদ্রালু। নিতাইবাবু পুনরায় ধীরে ধীরে হাত বাড়াইলেন। হারটা গাছের কর্কশ ত্বক হইতে ছাড়াইতে একটু শব্দ হইল—অমনি ভন্‌ন! তিনটা মৌমাছি তাঁহাকে আক্রমণ করিল। একটা ঠিক নাকের ডগায় হুল ফুটাইয়া দিল, অন্য দু'টা দুই গণ্ডে দংশন করিয়া আবার ফিরিয়া গিয়া চাকে বসিল।

নিতাইবাবুর নাসিকা ও গণ্ডদ্বয় আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু তিনি নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত বসিয়া রহিলেন। একটু নড়িলে যে আত্মরক্ষার আর কোন উপায় থাকিবে না, চাক হইতে কোটি কোটি অর্বুদ অর্বুদ মৌমাছি আসিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। নেহাৎ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে বলিয়াই ইহারা সদল-বলে বাহির হইতেছে না কিন্তু আর বেশী ঘাঁটাইলে সন্ধ্যার দোহাই মানিবে না। তখন তাদের হুলের জ্বালায় না হোক এই বিশ হাত উচ্চ হইতে মাটিতে পড়িলে মৃত্যু অনি-বার্য। অপরিসীম সহিষ্ণুতা সহকারে নিতাইবাবু আরও দু-মিনিট সেইভাবে বসিয়া রহিলেন। তারপর চাক যখন একেবারে নিঃশব্দ হইয়া গেল তখন তিল তিল করিয়া পিছু হটিয়া নামিতে আরম্ভ করিলেন।

পাঁচ মিনিট পরে, অন্ধকারপ্রায় বৃক্ষতলে নিতাইবাবু যখন নামিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার মুখ দেখিয়া বাবা এবং কাকা চমকিয়া একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, 'এ কি! এ আবার কে?'

নিতাইবাবুর নাসিকা ও গলা দু'টি এরূপ বিপর্যয় ফুলিয়া উঠিয়াছিল যে, উপস্থিত কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিল না।

রাত্রে বিছানায় শয়ন করিয়া দুই ভাইবোনে কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল, তারপর বিন্দু আস্তে আস্তে বলিল, 'নিতাই, বড্ড ব্যথা করছে—না রে?'

নিতাইবাবু বলিলেন, 'হুঁ।'

বিন্দুর মনে আর রাগ ছিল না, সে বিগলিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'নাকে একটু হাত বুলিয়ে দেব ভাই?'

নিতাইবাবুর নাকটি মাঝারি-গোছের শাঁকআলুর আকার ধারণ করিয়াছিল, গণ্ডের স্ফীতিবশতঃ চোখ দু'টিও প্রায় বুজিয়া গিয়াছিল; তিনি ক্রন্দনের প্রবল আবেগে ঢোক গিলিয়া বলিলেন, 'হুঁ।'

বিন্দু তাঁহাকে জড়াইয়া লইয়া সযত্নে নাকে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল, 'কেন ভাই, তুই আমার চুল কেটে নিলি? তাই তো ভগবান রাগ করে তোর নাক অমন করে দিলেন।'

অনুতপ্তভাবে নিতাইবাবু বলিলেন, 'আর করব না।'

মানুষকে বুদ্ধিবলে পরাস্ত করিলেও দৈবী প্রতিহিংসার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যে অসম্ভব তাহা নিতাইবাবুর হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল।

বিন্দু সস্নেহে তাঁহার স্ফীত রক্তিম গণ্ডে একটি চুম্বন করিয়া বলিল, 'লক্ষ্মী ভাই, আর কখ্খনো করিসনি।'

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নিতাইবাবু বলিলেন, 'দিদি, তোর চুল আবার গজাবে।'

চুলের কথা নূতন করিয়া স্মরণ হইতেই দিদির দুই চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু সে উদ্গত অশ্রু গিলিয়া ফেলিয়া বলিল, 'হ্যাঁ। তোর নাকও আবার ঠিক হয়ে যাবে, এবার ঘুমো।'

তারপর দুই ভ্রাতা-ভগিনী নিবিড়ভাবে পরস্পরের গলা জড়াইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

১২ চৈত্র ১৩৩৯

উল্কার আলো

এ গল্পের নামকরণ ভুল হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত পড়িবার ধৈর্য যাঁহার আছে, তিনিই এ কথা বুঝিতে পারিবেন। যাঁহার সে ধৈর্য নাই, তাঁহাকে গোড়াতেই জানাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে ইহার নাম হওয়া উচিত ছিল—'স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং'; কিম্বা 'পুরুষস্য ভাগ্যং'; অথবা 'দেবা ন জানন্তি'—। বম্বে ফিল্মের মত শুনাইতেছে, কি করিব, আমি নাচার।

গল্পের শীর্ষদেশে একটা নাম জুড়িয়া দিবার প্রথা কোন্ অর্বাচীন আবিষ্কার করিয়াছিল? গল্পের আখ্যানবস্তুর সহিত ঐ শিরোনামার একটা অর্থগত সংযোগ থাকিবারই বা আবশ্যকতা কি? 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী'র পরিবর্তে বইখানার নাম 'বিরূপাক্ষের বীরত্ব' হইলেই বা পৃথিবীর কি অনিষ্ট হইত? 'যোগাযোগ' যদি 'তিন পুরুষ'ই থাকিত, তাহা হইলে কি সৃষ্টি রসাতলে যাইত? বর্তমান লেখকের একটা নাম আছে কিন্তু নামের সঙ্গে মানুষটার একটুও সাদৃশ্য নাই। তাহাতে কি ক্ষতি হইয়াছে? What's in a name?

এ সকল গুরুতর প্রশ্নের উত্তর আপনারা দিতে পারিবেন না, অতএব সেজন্য অপেক্ষা করিয়া আপনাদের অপ্রতিভ করিব না। তৎপরিবর্তে যে নিদারুণ সংবাদটি দিয়া আপনাদিগকে সচকিত করিয়া তুলিবার অভিলাষ করিয়াছি, তাহা এই—সুনীলা ওরফে বিল্লুর বয়স এখন সতেরো বৎসর; এবং তাহার মত ফাজিল, চপল ও হৃদয়হীনা যুবতী আমি আজ পর্যন্ত দেখি নাই। অনুরূপকে সে—

কিন্তু সব কথাই শুরু হইতে বলা কর্তব্য। কবিবর বলিয়াছেন, আরম্ভের পূর্বেও

আরম্ভ আছে। সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালার আগে সকালবেলায় সলতে পাকানো—অর্থাৎ বাবারও বাবা আছে; অন্ততঃ থাকিলে ভাল হয়।

এই বিল্লুর বয়স যখন আট বৎসর ছিল তখন তাহার কাঁচা রকম একটা বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। নিতান্তই হাসিঠাট্টার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া এই সম্বন্ধ ভ্রূণ অবস্থাতেই বিনষ্ট হইয়া যায়। বিল্লুর বাবা প্রথম শ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বেহারীবাবু সদরে বদলী হইয়া আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র পঞ্চদশ বর্ষীয় বিজয়লালের সহিত স্থানীয় বড় উকিল নিমাইবাবুর পুত্র অনুরূপচন্দ্রের বেজায় বন্ধুত্ব জন্মিয়া গিয়াছিল। এইসূত্রে অনুরূপ প্রায়ই বিল্লুদের বাড়ি যাইত। এমন কি শেষ পর্যন্ত বন্ধুত্ব এমনই গাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল যে স্কুলে এবং স্কুলের বাহিরে এই দু'টিকে কদাপি পৃথক অবস্থায় দেখা যাইত না। বিজয়কে বাড়িতে না পাইলে সকলে বুঝিত, সে অনুরূপের বাড়িতে আছে এবং অনুরূপকে বাড়িতে না পাওয়া গেলেও—তথৈবচ।

হুঁ। পাঠক ভাবিতেছেন—কিন্তু তাহা ভুল। বরঞ্চ ঠিক তাহার উল্টা। বন্ধু-ভগিনীর অত্যাচারে অনুরূপের জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছিল। পাতলা মুখের উপর বড় বড় বিস্ফারিত দুইটি চোখ, লাল টুক্‌টুকে দুইখানি ঠোঁট—বিল্লুকে দেখিয়া সহসা কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না যে, তাহার ঐ আটবছরের ক্ষুদ্র মস্তকের মধ্যে এতপ্রকার দুষ্ট বুদ্ধি সঞ্চিত হইয়া আছে, বয়োজ্যেষ্ঠদেরও তাহাকে আঁটিয়া উঠিবার জো নাই। অনুরূপ এক সময় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ভাবিত, জ্বালাতন করিবার এমন অপরিসীম শক্তি এই ক্ষুদে মেয়েটা কোথা হইতে লাভ করিল? নেহাৎ বন্ধু-ভগিনী বলিয়াই সে নীরবে সহ্য করিয়া যাইত, নচেৎ—

কাল্পনিক প্রতিহিংসা-বিলাসে দাঁত কড়মড় করিয়াই তাহাকে নিবৃত্ত হইতে হইত।

প্রথম দিন বন্ধুর গৃহে পদার্পণ করিবামাত্রই বিল্লু কর্তৃক অনুরূপের নির্যাতন আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। বড় বড় চোখে কিছুক্ষণ তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বিল্লু গম্ভীর-ভাবে তাহার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'তুমি বুঝি দাদার একটা বন্ধু? দাদা সব জায়গায় তোমার মত একটা বন্ধু করে। তোমার নাম কি?'

অনুরূপ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিজের ডাকনামটা বলিয়া ফেলিয়াছিল।

নাম শুনিয়া বিল্লু নাম সিঁটকাইয়া বলিয়াছিল, 'নাকু? এ রাম! বিচ্ছিরি নাম। আমার নাম বিল্লু—ভাল নাম সুনীলা। তোমার চুল অমন খোঁচা-খোঁচা কেন?'

প্রশ্নের উত্তর দিতে দেরি হইতেছে দেখিয়া বিল্লু অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল, 'তুমি কান নাড়তে পারো—না? হাঁ পারো। অত বড় বড় কান নাড়তে পারো না? নিশ্চয় পারো। একটু নাড়ো না দেখি।' বলিয়া ঘাড় হেলাইয়া স্থিরদৃষ্টিতে তাহার কানের দিকে তাকাইয়াছিল।

অনুরূপ কান নাড়িতে পারে নাই, কেবল উদ্দিষ্ট ইন্দ্রিয় দুটা অতিরিক্ত মাত্রায় লাল হইয়া উঠিয়াছিল।

এইভাবে আরম্ভ হইয়া চক্রবৃদ্ধি হারে বিল্লুর অমানুষিক উৎপীড়ন বাড়িয়া চলিয়াছিল। ইহার আনুপূর্বিক ইতিহাস লিখিয়া পৃথিবীর দুঃখভার আর বাড়াইব না, দুই একটা ছোটখাটো উদাহরণ দিয়া এই নৃশংসতার চিত্রের উপর যবনিকা টানিয়া দিব।

বিজয় ও অনুরূপ দুই বন্ধুতে মিলিয়া একত্র একটা ফটোগ্রাফ তোলাইয়াছিল। ছবিটি বিজয়ের পড়িবার টেবিলের উপর সযত্নে সাজানো ছিল। একদিন স্কুল হইতে ফিরিয়া বিজয় দেখিল, ছবি হইতে অনুরূপের মুণ্ডটি কে সাবধানে কাঁচি দিয়া কাটিয়া লইয়াছে এবং তৎপরিবর্তে সচিত্র রামায়ণ হইতে হনুমানের মাথাটি কর্তিত করিয়া সেই

স্থানে জুড়িয়া দিয়াছে। এ কাহার কার্য, তাহা বুঝিতে বিজয়ের বিলম্ব হইল না। বন্ধুর প্রতি এই অপমানে সে ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। বিল্লুর চুলের বিনুনি ধরিয়া টানিয়া আনিয়া ছবির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া সগর্জনে কহিল, 'এ কি করেছিস?'

বিল্লু ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, 'আমি জানি না!'

'জানি না? রাক্ষুসী কোথাকার! শীগ্‌গির আসল মুণ্ডটা দে।'

'আমি জানি না! আসল মুণ্ডই তো রয়েছে—' বলিয়া বিল্লু খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। ইহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, এই আট বৎসর বয়সেই বিল্লু মেয়েটি কিরূপ পরিপক্ক ও ফাজিল হইয়া উঠিয়াছে।

বিজয় তর্জন করিয়া বলিল, 'দিবিনে আসল মুণ্ড? দে বল্‌ছি—'

'দেব না, যাও।'

এমন সময় অনুরূপ আসিয়া উপস্থিত হইল। ছবিতে নিজের মুখাবয়বের শোচনীয় পরিবর্তন দেখিয়া সেও নিরতিশয় ক্রুদ্ধ ও মর্মাহত হইল; কিন্তু অনেক ধস্তাধস্তি করিয়াও দুই বন্ধুতে বিল্লুর নিকট হইতে অনুরূপের আসল মুণ্ড আদায় করিতে পারিল না। শেষ পর্যন্ত অত আদরের ছবিটা ফেলিয়া দিতে হইল।

বলা বাহুল্য, সে মুণ্ড আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, বিল্লু সে মুণ্ড লইয়া কি করিল? এ প্রশ্নের উত্তর আছে—পাঠক খুঁজিয়া দেখুন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটিয়াছিল আর একদিন সকালবেলা। অনুরূপ বিজয়ের পড়িবার ঘরে একাকী বসিয়া অঙ্ক কষিতেছিল এমন সময় বিল্লু আসিয়া পিছন হইতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আদরের সুরে বলিল, 'নাকুদা—'

নিরুৎসুকভাবে নিজের কণ্ঠ বাহুমুক্ত করিয়া লইয়া অনুরূপ বলিল, 'কি?'

বিল্লু ভাসা ভাসা ডাগর চোখ দু'টি তুলিয়া বলিল, 'আমায় দুটো ফুল পেড়ে দেবে, ভাই?'

সন্দিগ্ধভাবে অনুরূপ বলিল, 'কি ফুল?'

'চাঁপা ফুল। ফটকের পাশে ঐ বড় গাছটায় অনেক ফুটেছে। পেড়ে দাও না—খেলা-ঘরের শিবপুজো করব।'

'আমি এখন পারব না—অঙ্ক কষছি। মালীকে বলগে যাও।'

'মালী দিচ্ছে না।—তুমি চল না, নাকুদা, লক্ষ্মীটি। তুমি খুব গাছে চড়তে পার—তোমার মত কেউ পারে না।'

অনুরূপের সন্দেহ দূর হইল না; কিন্তু এতখানি কৈতববাদ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতাও তাহার ছিল না। সে বলিল, 'আচ্ছা, চল।'

গাছের কাছে উপস্থিত হইয়া সে একবার ভাল করিয়া চারিদিক দেখিয়া লইল, কোথাও বিপদের আশঙ্কা আছে কিনা। তারপর আছে চড়িতে প্রবৃত্ত হইল।

বিল্লু গাছের শীর্ষদেশ অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া বলিল, 'ঐখানে অনেক ফুল আছে, নাকুদা,—একেবারে আগায়।'

গাছের ডগা পর্যন্ত অসন্দিগ্ধ-চিত্তে উঠিয়া হঠাৎ অনুরূপ বুঝিতে পারিল কি সাংঘাতিক ফাঁদে সে পা দিয়াছে। সে একটি চীৎকার ছাড়িয়া যথাসম্ভব দ্রুত নামিতে নামিতে বলিতে লাগিল, 'পোড়ারমুখী বাঁদরী, দাঁড়া, আজ তোকে মজা দেখাচ্ছি।' গাছের অর্ধেক নামিয়া সেখান হইতেই সে মাটিতে লাফাইয়া পড়িল। কিন্তু বিল্লু তখন উচ্চকণ্ঠে হাসিতে হাসিতে গ্রীবাভঙ্গে পিছু ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে হরিণশিশুর মত ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়াছে।

অনুরূপ সেখানেই বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে সর্বাঙ্গ চুলকাইতে লাগিল। কিন্তু তখন শত শত মধুপিঙ্গলবর্ণ বিষধর কাঠ-পিঁপড়া তাহার সারাদেহে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অনুরূপ তাহার গায়ের জামাটা টানিয়া খুলিয়া ফেলিল, কিন্তু কেবল জামা খুলিলে কি হইবে? একটু ইতস্ততঃ করিয়া, শেষে গায়ের জ্বালায় অস্থির হইয়া সে একটা যূঁই ফুলের ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং সেখানে বসিয়া নগ্নদেহে বিষাক্ত অন্তঃকরণে প্রাণপণে গা চুলকাইতে লাগিল।

বন্ধু বিজয় আসিয়া যখন তাহাকে উদ্ধার করিল, তখন তাহার সর্বাঙ্গ ফুলিয়া রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। নূতন কাপড় পরিতে পরিতে অনুরূপ হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, 'আর কখখনো তোদের বাড়ি আসব না, বিজয়। ঐ বিল্লুটা যতদিন—' বলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে হনহন করিয়া বাড়ি চলিয়া গেল। বিল্লুর দুষ্কৃতির কথা জানিতে কাহারও বাকী রহিল না। সে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করিয়া বলিল, 'গাছে পিঁপড়ে ছিল, আমি কি করে জান্‌ব?' কিন্তু তাহার এ কৈফিয়ত ধোপে টিকিল না, মালীর নিকট হইতে প্রকাশ পাইল যে, বিল্লু দিদি তাহাকেই প্রথমে গাছে চড়িয়া ফুল পাড়ি'ত অনুরোধ করিয়াছিল; কিন্তু গাছে ভয়ানক কাঠ-পিঁপড়া আছে বলিয়া মালী রাজী হয় নাই। ইহার পর—

ফলে বিল্লু মা বাবার কাছে বিস্তর তিরস্কার ও বিজয়ের কাছে একটা কিল ও দুইটা চড় খাইল। বিল্লু রাত্রিতে তাহার বিবাহিতা দিদি অনিলার কাছে শয়ন করিত। অনিলা শুইতে গিয়া বিল্লুকে বলিল, 'তুই যে নাকুর ওপর অত উৎপাত করিস, ওর সঙ্গে আমরা তোর বিয়ের সম্বন্ধ করেছি, তা জানিস? ও যখন উল্টে তোর ওপর শোধ তুলবে, তখন কি করবি?'

বিল্লু ঘৃণাভরে দুই আঙ্গুল দিয়া নাক টিপিয়া ধরিয়া বলিল, 'এ রাম—ওকে আমি বিয়ে করব না। খরগোসের মত কান, চুল খোঁচা-খোঁচা—ওরকম বর আমি চাই না।'

'চাই না বললেই তো আর হবে না—ওকেই বিয়ে করতে হবে। নইলে তুই জব্দ হবি না—ও প্রত্যেকবার ক্লাসে ফার্স্ট হয় জানিস?'

'হোগ্‌গে। ঐটুকু ছেলেকে আমি বিয়ে করব না।'

'আ গেল! তোর কি এক্ষুণি বিয়ে হচ্ছে নাকি? তোরা বড় হবি, তখন বিয়ে হবে।'

বিল্লু দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'ওকে আমি বড় হয়েও বিয়ে করব না। ও-রকম বর আমার একটুও পছন্দ হয় না।'

বিল্লুর পাকা কথায় সকলেই অভ্যস্ত ছিল, অনিলা জিজ্ঞাসা করিল, 'তবে তোমার কি রকম পছন্দ শুনি?'

বিল্লু তৎক্ষণাৎ বলিল, 'কেন, জামাইবাবুর মত—ঐরকম লম্বা ফর্সা—চোখে চশমা।'

তাহার পিঠে একটা চড় মারিয়া অনিলা বলিল, 'ও! লোকটিকে বড্ডই মনে ধরেছে দেখছি! আচ্ছা দাঁড়াও, তাঁকে চিঠি লিখে দিচ্ছি, তিনি এসে তোমাকে নিয়ে যান,—তুমিই গিয়ে তাঁর কাছে থাকো। আমি না হয় এখানেই পড়ে থাকব। সতীনের ঘর করা আমার পোষাবে না। তাও যেমন তেমন সতীন নয়—তোমার মত সতীন—"

পরিহাসচ্ছলে উক্ত হইলেও আসলে অনিলার কথাটা সত্য। সুন্দরী কন্যা দেখিলেই পুত্রবতী বাঙ্গালী-গৃহিণীর তাহাকে পুত্রবধূ করিবার ইচ্ছা হয়—অনুরূপের মাতারও তাহা হইয়াছিল। দুই পরিবারে বেশ ঘনিষ্ঠতা হইয়া যাইবার পর অনুরূপের মা বিল্লুদের বাড়ি বেড়াইতে গিয়া একদিন বলিয়াছিলেন, 'বিল্লুর মত একটি মেয়ে পাই—আমার বৌ করি।'

বিল্লুর মা উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'বিল্লুর মত দরকার কি ভাই,—বিল্লুকেই নাও না!'
সেই অবধি দুই গৃহিণীর মধ্যে বেয়ান সম্পর্ক পাতানো হইয়া গিয়াছিল; যদিও কর্তারা এই মেয়েলি ব্যাপার শুনিয়া নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করিয়া বলিয়াছিলেন, 'একেই বলে গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল! মেয়ের বয়স আট বছর, ছেলের পনেরো—এরি মধ্যে বিয়ের কথা! আরে, বড় হোক, বেঁচে থাক, তার পর দেখা যাবে। সাধে কি আর মেয়েদের দশহাত কাপড়ে—'

অনুরূপও হাসিঠাট্টার সূত্রে বৌদিদিদের কাছে কথাটা শুনিয়াছিল। উত্তরে সে মনে মনে প্রকাণ্ড একটা 'হুঁ' বলিয়াছিল। বিল্লুকে বিবাহ করার চেয়ে এক লক্ষ মাছি, মশা, বোলতা ও কাঠ-পিঁপড়াকে বিবাহ করা যে ঢের বেশী বুদ্ধিমানের কাজ এ কথা সে প্রকাশ করিয়া না বলিলেও তাহার মনের ভাব কাহারও নিকট অগোচর ছিল না।

তারপর একদিন হঠাৎ কি কারণে বেহারীবাবু বদলী হইয়া অন্য জেলায় চলিয়া গেলেন। বিজয় ও অনুরূপ কিছুদিন সজোরে পত্রবিনিময় চালাইল। কিন্তু দূরত্বের প্রভাবে ক্রমশ অনুরাগের বন্ধন শিথিল হইয়া গেল। উভয় পরিবারও ক্রমে পরস্পরকে প্রায় ভুলিয়া গেলেন। সে আজ প্রায় নয়-দশ বৎসরের কথা।

এই নয়-দশ বৎসরে বহু পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। এই প্রাচীনা পৃথিবীর বয়স আরও নয়-দশ বৎসর বাড়িয়াছে। যাহারা কিশোর ছিল তাহারা যুবক হইয়া পড়িয়াছে, অনেক বৃদ্ধ বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়াছে; ততোধিক শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে,—এবং আরও অনেক প্রকার বিচিত্র দার্শনিক ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গিয়াছে।

বেহারীবাবু জেলার ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া পুরাতন শহরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। অনুরূপ এখানকার পড়া শেষ করিয়া বিলাত গিয়াছিল, সেখান হইতে কি একটা পাস করিয়া রেলের কভেনাণ্টেড চাকরি লইয়া দেশে ফিরিয়াছে। উপস্থিত বাড়িতেই আছে, মাস-খানেকের মধ্যে টুণ্ডলার অফিসে যোগ দিতে হইবে। তাহার চুল এখনও খোঁচা-খোঁচাই আছে বটে, কিন্তু ততটা নহে; কান দুইটিও বোধ করি শরীরের অনুপাতে বাড়ে নাই বলিয়া এখন আর তত বড় দেখায় না। ওদিকে সুনীলা ওরফে বিল্লুর বয়স এখন সতেরো বৎসর এবং তাহার মত ফাজিল, চপল, হৃদয়হীনা যুবতী—

সর্বাপেক্ষা বেশী পরিবর্তন ঘটিয়াছে কিন্তু বেহারীবাবুর পারিবারিক জীবনে। যত দিন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ততদিন তিনি সাধারণ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মতই পুরাতন প্রথায় জীবন কাটাইতেছিলেন। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াই হঠাৎ পুরাদস্তুর সাহেব বনিয়া গিয়াছেন। আগে কেবল তাঁহার অফিস-রুম ছিল, এখন উপরন্তু ড্রয়িং-রুম হইয়াছে। মৈথিলী পাচক নির্বাসিত হইয়া বাবুর্চি নিযুক্ত হইয়াছে—টেবিলে বসিয়া সপরিবারে খানা ভোজন করেন। ম্যাজিস্ট্রেট-গৃহিণী বেড়াইতে বাহির হইলে কোঁচানো শাড়ি ও হাই-হিল জুতা পরেন। পর্দা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। কন্যা বিল্লু ম্যাট্রিক পাস করিয়া উপস্থিত টেনিস ও বৃজ্ খেলিতেছে। বিজয় একটি ব্রাহ্ম মেয়েকে বিবাহ করিয়া বাপের সহিত পৃথক হইয়া স্বাধীনভাবে পুরুলিয়ায় ওকালতি করিতেছে। ছুটি-ছাটায় সস্ত্রীক বাপের কাছে আসে, দুই-চার দিন থাকিয়া আবার সস্ত্রীক চলিয়া যায়।

অনুরূপ বিলাত হইতে বাড়ি ফিরিবার দিন পাঁচ-ছয় পরে তাহার মা বলিলেন, 'ওরে, বেহারীবাবুকে মনে আছে তো?—তোর বন্ধু বিজয়ের বাবা? তিনি যে জেলার কর্তা হয়ে বসেছেন।'

তিন বৎসর পরে বাড়ি ফিরিয়া এ কয়দিন অনুরূপ পারিবারিক চক্রের বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার অবকাশ পায় নাই, কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তাই নাকি? কদ্দিন এসেছেন?'

'এই তো মাস দুই হবে।'

'তোমাদের সঙ্গে দেখাশুনা হয়েছে?'

"হাঁ, আমরা একদিন গিয়েছিলুম। যদিও এখন ওঁরা পুরোপুরি সাহেব হয়ে গেছেন, তবু আমাদের খুব আদর-যত্ন করলেন। এখনও আগেকার কথা ভোলেননি— তোর একবার যাওয়া উচিত।'

'বেশ তো, যাব। বিজয় কোথায়? এখানেই আছে নাকি?'

'না, সে তো পুরুলিয়ায় ওকালতি করছে।'

অনুরূপ হঠাৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'আর বিল্লু? তার বোধ হয় বিয়ে হয়ে গেছে —না?'

'কই আর হয়েছে। এখন কি আর তাঁরা তার বিয়ে দেবেন? মেয়ের যে মোটে সতেরো বছর বয়স।' বলিয়া মা-ও মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

সেই দিনই বৈকালে অনুরূপ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাংলায় দেখা করিতে গেল। বাংলার সামনে একটা শান্-বাঁধানো চাতাল ছিল, সেখানে বসিয়া বেহারীবাবু সস্ত্রীক সকন্যা চা-পান করিতেছিলেন। অনুরূপ সেখানে গিয়া হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া স্মিতমুখে দাঁড়াইল।

বেহারীবাবু আরাম-কেদারায় অঙ্গ প্রসারিত করিয়া শুইয়াছিলেন, বিস্মিতভাবে ঈষৎ ভ্রূকুটি করিয়া তাহার দিকে চাহিলেন। গৃহিণী অপরিচিত ব্যক্তি দেখিয়া কাপড়টা মাথায় তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন; বিল্লু বিস্ফারিত-দৃষ্টিতে মুহূর্তকাল চাহিয়া থাকিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, 'নাকুদা! মা, চিনতে পারছ না? দাদার বন্ধু, নাকুদা— মনে নেই?' বলিয়া আবার সেই নিতান্ত পরিচিত, কৈশোরের বহু নির্যাতনের স্মৃতি-অনুবিদ্ধ হাসি হাসিল।

'ওমা, তাই তো! চিনতে পারিনি—কতদিন পরে দেখলুম! এস বাবা। এই সেদিন বিজয় তোমার কথা বলছিল।—'

'By Jove! Young man, you have grown out of all recognition! Well! Well! Very glad to see you! Sit down! Sit down!'

অনুরূপ একটি চেয়ার টানিয়া বসিল। বিল্লু এক পেয়ালা চা ঢালিয়া তাহার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল, 'নাকুদা, চা খাও।' তাহার ঠোঁটের কোণে একটু চাপা হাসি। অনুরূপ সচকিত হইয়া ভাবিল, সে কি এখানে আসিয়াই হাস্যকর কিছু করিয়া ফেলিয়াছে? নিজের কথাবার্তার উপর একটা কড়া পাহারা বসিয়া গেল।

নানা রকম কথা হইতে লাগিল; অনুরূপ বিলাতে গিয়া কোথায় ছিল, কি পাস করিয়াছে, কোথায় চাকরি পাইল; বেহারীবাবু কতদিন ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াছেন, কোন্ কোন্ জেলা ঘুরিয়াছেন, কমিশনার সাহেব তাঁহার নামে সরকারের কাছে কি কি প্রশংসাসূচক ডি. ও. দিয়াছেন,—এই সব আলোচনার মধ্যে অনুরূপের মনটা কিন্তু বিল্লুর দিকেই সতর্ক হইয়া রহিল। দুই একবার বিল্লুর মুখের উপর চোখ পড়াতে দেখিল, সে তাহারি দিকে তাকাইয়া আছে ও পূর্ববৎ মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে। যেন সে একটা ভারী হাস্যোদ্দীপক জীব,—তাহাকে দেখিলে কিছুতেই না হাসিয়া থাকা যায় না।

অনুরূপ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিল।

হঠাৎ এক সময় অন্য কথার মাঝখানে বিল্লু বলিয়া উঠিল, 'মা, দেখেছ, নাকুদার চুল আর আগেকার মত খাড়া-খাড়া নেই—একটু নরম হয়েছে। আচ্ছা, নাকুদা, তুমি ছেলেবেলার মত এখনও তেমনিই বোকা আছ? না বুদ্ধি বেড়েছে?'

অনুরূপ হাসিবার মত মুখ করিয়া বলিল, 'কি জানি। তোমার কি মনে হয়?'

'এখনই কি বলা যায়? আরও দু'দিন দেখি।'

'তুই চুপ কর, বিল্লু। আমাদের কি কথা হচ্ছিল।' এইভাবে কন্যাকে মৃদু তিরস্কার করিয়া গৃহিণী আবার ব্যাহত প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন।

ঘণ্টা দেড়েক পরে অনুরূপ যখন বিদায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন বিল্লু ঠোঁটের একটা সহাস্য ভঙ্গিমা করিয়া বলিল, 'নাকুদা, কাল আবার আসবে তো?'

অনুরূপ তাহার দিকে ফিরিয়া কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসুভাবে তাকাইয়া রহিল, কথাটার মধ্যে কোন প্রচ্ছন্ন পরিহাস আছে কিনা, তাহাই যেন নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিল; তারপর বলিল, 'আসব বৈ কি! যে ক'দিন আছি, রোজই আসব।'

অনুরূপ বাড়ি ফিরিবার পথে ভাবিতে লাগিল, তাহার প্রতি বিল্লুর মনের ভাবটা কি?—বিদ্রূপ? উপহাস? তাচ্ছিল্য?

কিন্তু কেন? ছেলেবেলায় বিল্লু তাহাকেই বিশেষ করিয়া নিজের উৎপাত ও নিষ্ঠুরতার লক্ষ্যবস্তু করিয়া লইয়াছিল,—এখনও কি তাহার সে ভাব যায় নাই? কিম্বা সকলের সঙ্গেই সে এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে?

সবচেয়ে অনুরূপকে বিঁধিয়াছিল বারবার ঐ 'নাকুদা' সম্বোধনটা; যেন ঐ নামটা কিরূপ হাস্যকর তাহাই বিল্লু পুনঃ পুনঃ খোঁচা দিয়া দেখাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সত্য বটে, নামটি শ্রুতিসুখকর নয়, কিন্তু তাই বলিয়া সেও কি উপহাসের পাত্র?

অনুরূপ ঈষৎ তিক্ত-মনে ভাবিল, আমাদের মেয়েরা একটু লেখাপড়া শিখিলেই মনে করে, কেহ তাহাদের সহিত কথা কহিবার সমকক্ষ নহে।

কিন্তু—বিল্লু কি অপরূপ সুন্দরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার দিকে বেশীক্ষণ তাকাইতে যেন ভয় করে!—অথচ ইহাকেই সে একদিন কিল মারিয়াছে, চড় মারিয়াছে, কান ধরিয়া টানিয়া দিয়াছে, বাঁদরী, পোড়ারমুখী বলিয়াছে—

পাঠক নিশ্চয় এইখানে বিল্লুর একটি রূপ বর্ণনার জন্য উন্মুখ হইয়া আছেন, কিন্তু তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইবে। আমি ধর্মভীরু লোক, রূপ বর্ণনা দিব না, পরের ভাল জিনিসের প্রতি লুব্ধতা সঞ্চার করিয়া নরকে যাইতে পারিব না। আমি শুধু দু'ছত্রে তাহার আজিকার বেশভূষার একটি অসম্পূর্ণ তালিকা দিব, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। গায়ে তাহার ছিল গাঢ় সবুজ রঙের হাতকাটা ব্লাউজ, পরিধানে ছিল ঐ রঙেরই সিল্কের শাড়ি, পায়ে ছিল লাল বনাতের স্লিপার, চুলগুলি কি ভাবে জড়ানো ছিল তাহার শিল্পরহস্য আমি ভেদ করিতে পারি নাই; সুতরাং বলিতে পারিলাম না। অলঙ্কার তাহার গায়ে ছিল না বলিলেই হয়—কেবল দু'গাছি সরু সোনার রুলি সুগোল হাতে যেন চাপিয়া বসিয়া গিয়াছিল, আর গলায় ক্ষীণ একটি হার—তাহার নিম্নপ্রান্তে একটি হীরার লকেট—

আর এই সব বেশভূষা সে তরুণ তনুটিকে আশ্রয় করিয়া ছিল—

ঐ রে! আর একটু হইলেই আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলাম আর কি!

সে-রাত্রিতে বেহারীবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর মধ্যে কথা হইল। গৃহিণী বলিলেন, 'অনুরূপের সঙ্গে বিল্লুর বিয়ে হলে মন্দ হয় না। আগেও তো একবার সম্বন্ধ হয়েছিল।'

কর্তা বলিলেন, 'বেশ তো, ওরা আসুক না আমার কাছে, প্রস্তাব করুক—'

'কিন্তু তা কি ওরা করবে! হাজার হোক, ওরা বর পক্ষ। আমাদের দেশে যে উল্টো নিয়ম, মেয়ের বাপকেই ছুটোছুটি করতে হয়।'

'কিন্তু তাই বলে আমি তো আর উপযাচক হয়ে যেতে পারি না। বুঝলে না?'

গৃহিণী বুঝিলেন, হাকিমি মর্যাদায় বাধে। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'দেখা

যাক, আরও দু'দিন আসা যাওয়া করুক। শেষ পর্যন্ত হয়তো নিজেই—বিলেত ফেরত তো।'

কর্তা বলিলেন, 'সে হলে তো কোনও গোলই থাকে না। তার উপর আর একটা কথা আছে। বিল্লুর পছন্দ অপছন্দ জানা দরকার। ও আবার যে রকম মেয়ে! মনে আছে তো, হাজারিবাগের সেই মনুসেফ ছোকরা! তাকে তো হেসেই উড়িয়ে দিলে, যেন সে মানুষের মধ্যেই গণ্য নয়। The heartless little minx!' বলিয়া সস্নেহে হাসিতে লাগিলেন।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা অনুরূপ ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠিতে উপস্থিত হইয়া শুনিল—সাহেব ও মেমসাহেব একটা পার্টিতে গিয়াছেন,—কেবল মিসিবাবা বাড়িতে আছেন, উপস্থিত বাগানে বেড়াইতেছেন। অনুরূপ মিসিবাবার সন্ধানে প্রবেশ করিল।

একটা লোহার বেঞ্চির উপর বিল্লু পিছন ফিরিয়া বসিয়াছিল, তাহার বসিবার ভঙ্গী দেখিয়া অনুরূপের মনে হইল, সে কোলের উপর বই রাখিয়া পড়িতেছে। ছাঁটা ঘাসে ঢাকা লনের উপর দিয়া অনুরূপ নিঃশব্দে তাহার দিকে অগ্রসর হইল।

বেঞ্চির কাছে পৌঁছিতে যখন আর হাত ছয়-সাত বাকী আছে, তখন বিল্লু হস্তস্থিত জিনিসটা মুখের কাছে তুলিয়া চুম্বন করিল, তারপর সচকিতে কিছুক্ষণ ফিরিয়া চাহিয়াই অনুরূপকে দেখিয়া তড়িদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল।

এইরূপ অবস্থায় যে ধরা পড়ে, তাহার যেমন লজ্জার অবধি থাকে না, যে ধরিয়া ফেলে, সেও কম লজ্জা পায় না। অনুরূপ আরক্ত-মুখে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যে লকেটে বিল্লু চুম্বন করিয়াছিল, তাহা তখনও তাহার হাতে ধরা ছিল, সেটা বন্ধ করিয়া বুকের কাপড়ের তলায় চাপা দিয়া বিল্লু শুষ্ক হাসিল, বলিল, 'চুপি চুপি একেবারে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে যে!' তাহার কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ও অসন্তোষ সুস্পষ্ট।

অনুরূপ চুপি চুপি আসে নাই, পায়ের তলায় ঘাস ছিল বলিয়াই বিল্লু তাহার পদশব্দ শুনিতে পায় নাই। কিন্তু সে কৈফিয়ত দিতে যাওয়া বৃথা। হয়তো তাহার গলা-ঝাড়া দিয়া আগমন-বার্তা ঘোষণা করা উচিত ছিল। সে চুপ করিয়া রহিল।

বিল্লু বলিল, 'এখানেই বসবে, না, ভেতরে যাবে? মা-বাবা পার্টিতে গেছেন।'

অনুরূপ চেষ্টা করিয়া বলিল, 'যেখানে হয়—এখানেই বোসো।'

দুইজনে বেঞ্চিতে বসিল।

কিছুক্ষণ অস্বচ্ছন্দভাবে দুই একটা কথা হইল, তাহার পর বিল্লুর মুখের অপ্রসন্নতা কাটিয়া গেল। সে হাসিয়া বলিল, 'আচ্ছা নাকুদা, বিলেতে থাকতে তুমি ইংরেজ মেয়েদের সঙ্গে মিশতে?'

অনুরূপ সাবধানে বলিল, 'কিছু কিছু মিশেছি।'

বিল্লু জিজ্ঞাসা করিল, 'তারা তোমায় দেখে হাসত না?'

অধর দংশন করিয়া অনুরূপ বলিল, 'না। হাসবে কেন?'

'অমনি' বলিয়া বিল্লু নিজেই জোরে হাসিয়া উঠিল।

ক্ষুব্ধভাবে কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া অনুরূপ বলিল, 'আমাকে দেখলেই তোমার হাসি পায়—না?'

'হ্যাঁ—বড্ড।'—বলিয়া হাসির বেগ রোধ করিতে না পারিয়া বিল্লু মুখে রুমাল চাপিয়া ধরিল।

ধীরভাবে অনুরূপ জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন বলতো?'

'কি জানি—তোমাকে দেখলেই—' কথাটা বিল্লু শেষ করিতে পারিল না।

মিনিট দুই শক্তভাবে বসিয়া থাকিয়া অনুরূপ হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'আচ্ছা,

চললুম!'

রুমাল হইতে মুখ তুলিয়া বিল্লু বলিল, 'রাগ হল নাকি?'

'না।'

কয়েক পা যাইবার পর বিল্লু তাহাকে ফিরিয়া ডাকিল, 'নাকুদা, তুমি ব্রিজ্ খেলতে জান?'

'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাবে দাঁড়াইয়া অনুরূপ বলিল, 'জানি সামান্য।'

বিল্লু বলিল, 'গোড়ায় সবাই ঐ কথাই বলে; তোমারও আবার বিনয় হচ্ছে নাকি?—কাল সন্ধ্যের পর আমাদের বাড়িতে একটা ব্রিজ্ পার্টি বসবার কথা আছে। খেলতে জানে এমন দু'জন লোক পাওয়া গেছে—কেবল একজনের অভাব হচ্ছে। তুমি আসতে পারবে?'

উদাসভাবে অনুরূপ বলিল, 'যদি অভাব হয়—আসতে পারি। কিন্তু আমি ভাল খেলতে জানি না—'

হাসি গোপন করিয়া বিল্লু বলিল, 'এসো তাহলে। ঠিক সাতটার সময়!'

রাত্রিতে ঘুমাইয়া অনুরূপ স্বপ্ন দেখিল,—বিল্লু পিছন হইতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আবদারের সুরে বলিতেছে, 'নাকুদা, আমায় দুটো ফুল তুলে দেবে ভাই?'

অনুরূপ ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল—আট বছরের বিল্লু নহে, সতেরো বছরের বিল্লু। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই—ঘুম ভাঙিয়া গেল।

এমন বিশ্রীভাবে ঘুম ভাঙিয়া যায় কেন, কেহ বলিতে পারেন?

পরদিন সন্ধ্যায় অনুরূপ যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া দেখিল, দুইজন ভদ্রলোক হাজির আছেন। তাঁহাদের সহিত পরিচয় হইল, দুইজনেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, বয়সে তরুণ, বেশ সুপুরুষ। একজনের নাম সমরেশ, অন্যের নাম সুধাংশু। বিল্লু পরিচয় করিয়া দিতে গিয়া বলিল, 'ইনি আমার দাদার ছেলেবেলার বন্ধু—অনুরূপবাবু,—ওঁর একটা ডাকনাম আছে, কিন্তু সে নামটা আর শুনে কাজ নেই।' বলিয়া হাসিয়া ফেলিল।

অনুরূপ লক্ষ্য করিল, এই দুইজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে বিল্লুর ব্যবহার সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। তাহাদের দেখিয়া সে হাসিতেছে না, কথার মধ্যে তীক্ষ্ণ কাঁটার খোঁচা নাই। বেশ সহজ সম্ভ্রমপূর্ণ বন্ধুত্বের ভাব।

তাস খেলিতে বসিয়া বিল্লু অনুরূপের খেঁড়ী হইল। কিন্তু তবু খেলা জমিল না। খেলিতে খেলিতে অনুরূপ কেবলই ভাবিতে লাগিল, এই দুইজনের মধ্যে কাহার ছবি বিল্লুর বুকের মধ্যে লকেটের ভিতর লুকানো আছে? কে তিনি? সুধাংশু না সমরেশ?

এইরূপ প্রশ্নসঙ্কুল মন লইয়া ভাল ব্রিজ্ খেলা চলে না। আধ ঘণ্টা পরে বিল্লু তাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, 'নাঃ নাকুদা, তুমি একেবারে কিছু খেলতে জান না।—আসুন, তার চেয়ে অন্য কিছু করা যাক।'

অনুরূপ আরক্ত-কর্ণমূলে বলিল, 'আমি তো বলেছিলুম, আমি ভাল জানি না—'

তাহার কথার উত্তর না দিয়া বিল্লু বলিল, 'সুধাংশুবাবু, আপনি তো চমৎকার গাইতে পারেন। চলুন, ও ঘরে অর্গান আছে।'

রসশাস্ত্রের বড় বড় পণ্ডিতরা বলিয়াছেন, করুণ রস বেশী ফেনাইতে নাই; নিতান্তই যদি জবাই করিবার দরকার হয়, তবে চটপট সে কাজ সারিয়া ফেলাই বিধি। সুতরাং এই পতঙ্গ ও দীপশিখার উপাখ্যান টানিয়া দীর্ঘ করিয়া আর শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিব না।

মোট কথা, অগ্নিশিখার সংস্পর্শে পতঙ্গের পাখা পুড়িয়া গেল, গায়েও সর্বত্র ফোস্কা পড়িল। কিন্তু তবু সে পলাইতে পারিল না এবং মুখ ফুটিয়া বলিতেও পারিল না—'ওগো দীপ্তিময়ী শিখা, আমি তোমাকে চাই, তুমি আমাকে নিঃশেষে পুড়াইয়া ছাই করিয়া দাও।' সে প্রত্যহ সন্ধ্যায় নিয়মিত শিখার কাছে আসিতে লাগিল এবং নীরবে পাখার খানিকটা পুড়াইয়া দহনক্লিষ্ট-দেহে ফিরিয়া যাইতে লাগিল।

এইভাবে একমাস কাটিয়া গেল। অনুরূপের টুণ্ডলায় গিয়া অফিসে যোগ দিবার সময় উপস্থিত হইল।

বিদেশে যাত্রার আগের রাত্রিতে বেহারীবাবুর বাংলায় অনুরূপের নিমন্ত্রণ হইল—বিদায়-ভোজ। নিতান্তই ঘরোয়া ব্যাপার—আর কেহ নিমন্ত্রিত হয় নাই, শুধু অনুরূপ!

সন্ধ্যার পর হইতে ড্রয়িং-রুমে বসিয়া চারিজনে অলসভাবে গল্প করিয়া শেষে আহার করিতে গেলেন। তারপর প্রায় নীরবে ডিনার শেষ করিয়া ড্রয়িং-রুমে আসিয়া বসিলেন। অনুষ্ঠানটার গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত কেমন যেন প্রাণসঞ্চার হইল না, কোন্ অজ্ঞাত কারণে উহা কুণ্ঠিত ও কৃত্রিম হইয়া রহিল।

আহারাদি শেষ হইবার পরই বিল্লু উঠিয়া গিয়াছিল, অনুরূপকে একটা বিদায়-সম্ভাষণ করিয়া যাওয়াও প্রয়োজন মনে করে নাই। তাহার এই অবেহলা তাহার মা বাবাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাই রাত্রি দশটার সময় অনুরূপ যখন তাঁহাদের পদধূলি লইয়া বিদায় চাহিল, তখন তাহাকে যথারীতি আশীর্বাদ করিয়া গৃহিণী একটু অপ্রস্তুত ভাবে বলিলেন, 'বিল্লুর আজ শরীরটা ভাল নেই, সকাল থেকেই বলছিল। বোধ হয় শুয়ে পড়েছে।'

'থাক্, তাকে বিরক্ত করে কাজ নেই।'

অনুরূপ বাহির হইয়া পড়িল। চন্দ্রহীন রাত্রি—বোধ হয় অমাবস্যা। বাড়ির সদর হইতে কম্পাউণ্ডের ফটক প্রায় একশ' গজ দূরে। অন্ধকারে পরিচিত পথ ধরিয়া যাইতে যাইতে অনুরূপ ভাবিতে লাগিল—এই একমাস ধরিয়া কি উৎকট পাগ্‌লামিই না সে করিয়াছে! বিল্লু আর কাহাকেও ভালবাসে (বোধ হয় তিনি সুধাংশুবাবু), তাহা স্পষ্ট বুঝিয়াও নিজেকে এমন ভাবে খেলো করিবার কি দরকার ছিল? উঠিতে বসিতে বিল্লু তাহাকে বিদ্রূপ করিয়াছে, অন্যের সম্মুখে হাস্যাস্পদ করিয়াছে, সে যে অতিশয় কৃপায় পাত্র, তাহা বুঝাইয়া দিতে ত্রুটি করে নাই। তবু সে নির্লজ্জ মূঢ়ের মত লাগিয়াছিল কোন্ দুর্দৈবের প্ররোচনায়? ভাগ্যে তাহার মনের কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে নাই, নহিলে আরও কত বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইত, কে জানে? কিন্তু যাক, আজ এই হাস্যকর অভিনয়ের সমাপ্তি হইয়াছে, প্রহসনের শেষ দৃশ্যে যবনিকা পড়িয়া গিয়াছে। অভিনয়কালে দর্শকরা আসিয়াছিল বটে, কিন্তু অভিনেতার মনে সুখ ছিল না। এখন সুখ না হোক অন্ততঃ সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে।

ফটক খুলিবার জন্য হাত বাড়াইতেই কাহার হাত হাতে ঠেকিয়া গেল. অনুরূপ চমকিয়া উঠিয়া বলিল, 'কে?'

'নাকুদা নাকি? যাচ্ছ?'—বিল্লুর কণ্ঠস্বর।

অনুরূপ হঠাৎ হাসিয়া উঠিল। তাহার মনের মধ্যে একটা আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। এতটা স্বচ্ছন্দ বেপরোয়া ভাব সে অনেক দিন অনুভব করে নাই, যেন মস্ত একটা সংশয়ের বোঝা বুক হইতে নামিয়া গিয়াছে, এমনি ভাবে বলিল, 'হ্যাঁ ভাই, চললুম। কাল বিকেলেই রওনা হতে হবে, কাজেই এ-যাত্রা আর বোধ হয় তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না। ভালই হল, আমি তো ভেবেছিলুম তুমি শুয়ে পড়েছ—'

'না—আমি রোজ এই সময় একটু বেড়াই।'

এতক্ষণে অনুরূপের ঠাহর হইল যে বিল্লু ফটকে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে,—অন্ধকারে কৃষ্ণতর একটা ছায়ামাত্র, মুখ চোখ কিছুই দেখা গেল না।

সে বলিল, 'কিন্তু আর বাইরে থাকা বোধ হয় ঠিক হবে না। রাত কম হয়নি। এ সময় একটু হিমও পড়ে!'

সে কথার উত্তর না দিয়া বিল্লু জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার কর্মস্থল কোথায় বলছিলে? কানপুরে?'

অন্ধকারে অনুরূপ হাসিল, 'না—তবে কাছাকাছি বটে। টুণ্ডলায়।'

'ও'—কিয়ৎকাল দুইজনেই নীরব।

সহসা অনুরূপ তরল কণ্ঠে বলিল, 'আমি চলে গেলে কিছুদিন তোমার ভারী কষ্ট হবে—না?'

'কষ্ট হবে? কেন?'—তাহার উত্থিতভ্রূ ঈষৎ বিস্ময়ের ভঙ্গী দেখা না গেলেও বুঝা গেল।

'এমন একটা target— একটা সঙ—আর কি সহজে খুঁজে পাবে? যাকে দেখলেই হাসি পায়, এমন লোক তো পৃথিবীতে বেশী নেই কি না, তাই ভাবছি প্রথম প্রথম হয়তো একটু কষ্ট হবে।' তাহার কণ্ঠস্বরে গ্লানির লেশমাত্র নাই।

কিছুক্ষণ বিল্লু জবাব দিল না, তারপর বলিল, 'তোমাকে আজ ভারী খুশী মনে হচ্ছে।'

'খুশী?' অনুরূপ অল্পকাল আত্মানুসন্ধান করিয়া বলিল, 'না, ঠিক খুশী নয়—তবে মনটা একটু হাল্‌কা বোধ হচ্ছে—কাজকর্ম নেই চুপ করে বসে থাকতে আর ভাল লাগছিল না—সেই জন্যই বোধ হয়—'

বিল্লুর হাসি শুনা গেল, 'তুমি আজকাল ভারী কাজের লোক হয়ে উঠেছ—না?'

'হইনি এখনও—তবে পাকে-চক্রে পড়ে হয়তো শেষ পর্যন্ত হয়ে পড়তে পারি।'

'তুমি কোনও কালে কাজের লোক হতে পারবে না।'

'পারব না? কেন বল দেখি?'

'তুমি একেবারে—একেবারে অপদার্থ।'—সঙ্গে সঙ্গে চাপা হাসির শব্দ।

কিছুক্ষণ সমস্ত নিস্তব্ধ,—যেন অন্ধকারে দুইজন মুখোমুখি দাঁড়াইয়া নাই। পাঁচ মিনিট কাটিয়া গেল।

অন্ধকারে একটা গভীর নিশ্বাস পড়িল। অনুরূপ বলিল, 'তোমার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে, কে জানে! হয়তো আর কখনও—আচ্ছা বিল্লু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? কিছু মনে করো না, আমি রাগ বা অভিমান করে বলছি না, শুধু একটা কৌতূহল হচ্ছে। তুমি যে আমাকে কথায় কথায় ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে, লোকের কাছে হাস্যাস্পদ করতে—আমার কি সত্যিই কোনও দোষ ছিল? আমি নিজে অনেক চেষ্টা করেও বুঝতে পারিনি, তাই জান্‌তে চাইছি। কি জানি, হয়তো না জেনে প্রতিপদেই এমন নির্বুদ্ধিতা কিম্বা অসভ্যতা করে ফেলেছি—'

বিল্লু আবার হাসিয়া উঠিল, তাহার চাপা অথচ দুর্নিবার হাসির ঢেউ অনুরূপের কথাগুলি ভাসাইয়া লইয়া গেল।

অত্যন্ত আহতস্বরে অনুরূপ বলিল, 'বিল্লু! হাসি নয়। সত্যি বল আমি কী অন্যায় করেছিলুম—'

'চুপ কর। আমি আর পারছি না—তোমার মত বোকা—'

'বোকা! তাই হবে বোধ হয়।'—আর একটা নিশ্বাস পড়িল, 'আচ্ছা চললুম।'

অনুরূপ ফটক খুলিল।

'যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ'—অনুরূপ ফটকের বাহির হইল।

'—আচ্ছা—এস'—আবার সেই হাসি।

ঠিক এই সময়—উল্কার আলো!

অন্ধকার আকাশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত আলোর দাগ কাটিয়া একটা উল্কাপিণ্ড ফাটিয়া পড়িল। কয়েক মুহূর্তের জন্য তাহারই উজ্জ্বল নীল প্রভায় অনুরূপ দেখিল, বিল্লুর চোখের জলে মুখ ভিজিয়া গিয়াছে এবং সে দু'হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া—

যাহা অনুরূপ চাপা হাসি বলিয়া ভুল করিয়াছিল, তাহা অদম্য রোদনের উচ্ছ্বাস!

আবার অন্ধকার।

'বিল্লু!'

'কি?'—স্বর ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ।

'আমি বুঝতে পারিনি। আমি ভেবেছিলুম—তুমি আর কাউকে—' বিল্লুর নিকট হইতে কোন জবাব আসিল না।

'তোমার লকেটে—' অনুরূপের এ কথাটাও অসমাপ্ত রহিয়া গেল।

কিয়ৎকাল পরে বিল্লুর হাত অনুরূপের হাতে ঠেকিল, বিল্লু একটা ঈষদুষ্ণ ক্ষুদ্র বস্তু তাহার করতলে রাখিয়া হাত টানিয়া লইল। অনুরূপ অনুভব করিয়া বুঝিল—লকেট।

বলিল, 'এ কি হবে?'

'নাও। ওর মধ্যে একটা মুণ্ডু আছে, চিনতে পার কি না দেখো।'

'বিল্লু!'

উত্তর নাই। অনুরূপ আবার ডাকিল, 'বিল্লু!'

বিল্লুর সাড়া পাওয়া গেল না। সে বোধ হয় পা টিপিয়া টিপিয়া চলিয়া গিয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে, বিল্লুর মনে যদি ইহাই ছিল, তবে সে এমন ব্যবহার করিল কেন? ইহার উত্তর বোধ করি বিল্লু নিজেও দিতে পারিবে না। তাই গোড়ায় বলিয়াছিলাম, এ গল্পের নাম হওয়া উচিত ছিল—স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং—কিম্বা—

২৩ চৈত্র ১৩৩৯

অরণ্যে

স্থান বাংলা দেশ, কাল বর্তমান, বেলা আন্দাজ সাড়ে নয়টা। বনের মধ্যে একটি ভাঙা বাড়ি। বাড়িটি পাকা, কিন্তু বহুদিনের অব্যবহারে অত্যন্ত জীর্ণ ও শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। এই বাড়িতে একটিমাত্র বাসোপযোগী ঘর; দেওয়ালের চটা উঠিয়া গিয়াছে, মেঝে অসমতল, উপরে একটা বরগা এক দিক খুলিয়া বিপজ্জনকভাবে ঝুলিয়া আছে। ঘরের দুইটি জানালার কবাটের কব্জা ঢিলা হইয়া গিয়া আপনা-আপনি খুলিয়া আছে—তাহার ভিতর দিয়া রৌদ্রোজ্জ্বল বৃক্ষসমাকীর্ণ বহিঃপ্রকৃতি ফ্রেমে বাঁধানো সুন্দর নিসর্গচিত্রের মত দেখা যাইতেছে। ঘরের মধ্যস্থলে একটি নড়বড়ে টেবিল ও চারি পাশে চারিখানি কাঠের জীর্ণ চেয়ার। ঘরের কোণে তিনটি মাঝারি আয়তনের স্টীল ট্রাঙ্ক উপরা-উপরি করিয়া রাখা আছে। একটা কাঠের কবাট-যুক্ত দেওয়াল-আলমারি ঈষৎ খোলা অবস্থায় ভিতরে রক্ষিত অনেকগুলি টেনিস-বলের মত জিনিস কিঞ্চিন্মাত্র প্রকাশ করিতেছে। একটা বিছানা দেওয়ালের কাছে গুটানো রহিয়াছে। টেবিলের উপর সিগারেটের টিন ও দেশলাইয়ের বাক্স।

দুইটি চেয়ারে দুইজন লোক বসিয়া আছে। প্রথম ব্যক্তি একটি প্রাচীন গলিতপ্রায় ইংরেজী সংবাদপত্র মুখের সম্মুখে ধরিয়া পাঠ করিতেছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি চেয়ারে হেলান দিয়া টেবিলের উপর সন্তর্পণে পা তুলিয়া মৃদুমন্দ হাসিতেছে ও একটি গানের কলি গুঞ্জন করিতেছে। তাহার বয়স তেইশ-চব্বিশ, অল্প পাতলা গোঁফ আছে, মুখখানি চমৎকার ধারালো, বড় বড় স্বপ্নাতুর চোখ, মাথার চুল দীর্ঘ ও ঈষৎ কোঁকড়ানো। তাহাকে দেখিয়া কবিপ্রকৃতির বলিয়া মনে হয়।

যুবক অলসভাবে অর্ধনিমীলিত নেত্রে গুঞ্জন করিতেছিল,—

'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ।'

কিছুক্ষণ কাটিবার পর প্রথম ব্যক্তি সংবাদপত্র নামাইয়া টেবিলের উপর রাখিল, তখন তাহার মুখ দেখা গেল। বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ; মুখখানা ভারী, কিন্তু মাংসল নয়, গোঁফদাড়ি কামানো। চিবুক অত্যন্ত চওড়া, ভ্রূর উপরের অস্থি উঁচু, ভ্রূ প্রায় কেশহীন। নাক মোটা, অথচ অস্থিময়। চোখ ছোট ও তীক্ষ্ণ,—হাঁ বড়। রঙ লালচে গৌরবর্ণ। পিরানে ঢাকা দেহের ঊর্ধ্বভাগ যতটা দেখা যাইতেছে, চওড়া ও মজবুত।

সিগারেটের টিন হইতে একটি সিগারেট লইয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া লোকটি ঊর্ধ্বদিকে ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, সংস্কারের কৈঙ্কর্য্যই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বন্ধন।

দ্বিতীয় লোকটি গান থামাইয়া স্বপ্নভরা চোখ তুলিল, বলিল, নিশ্চয়। সংস্কারের কৈঙ্কর্য্য কাকে বলে?

প্রথমঃ এটা ভাল, ওটা মন্দ, এই সংস্কার। এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া চাই, তবেই সত্যিকারের মুক্তি পাবে।

দ্বিতীয়ঃ [একটু চিন্তা করিয়া] বুঝলুম। কিন্তু আমরা যে মুক্তির পথে চলেছি, সেটা তবে কি?

প্রথমঃ সেটা ছোট মুক্তি, কতকগুলো অনাবশ্যক দুঃখ আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেইগুলো ঘাড় থেকে নামাতে চাই।

দ্বিতীয়ঃ কিন্তু তা নামাবার দরকার কি? একেবারে আসল খাঁটি মুক্তির সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেই তো হয়।

প্রথমঃ তা হয় না। পায়ে কাঁটা বিঁধে থাকলে দৌড়ুতে পারবে না। আগে কাঁটা টেনে বার কর, তারপর শরীর ধাতস্থ হলে খাঁটি মুক্তির পেছনে দৌড় দিও।

দ্বিতীয়ঃ তা হলে, যতদিন কাঁটা না বেরুচ্ছে, ততদিন ভাল-মন্দর জ্ঞান অর্থাৎ সংস্কার-কৈঙ্কর্য্য রাখতে হবে?

প্রথমঃ সংস্কারের কিঙ্কর হবার দরকার নেই, লৌকিকভাবে তাকে মেনে চললেই যথেষ্ট। যেমন আমি নিকটিনের কিঙ্কর নই, তবু সিগারেট খাচ্ছি।

দ্বিতীয়ঃ [সহাস্যে টেবিল হইতে পা নামাইল। সন্তর্পণে একটা সিগারেট ধরাইল] আমি কিন্তু ভাল লাগে বলেই সিগারেট খাই।

প্রথমঃ কাজেই সিগারেট না পেলে তোমার কষ্ট হবে।

দ্বিতীয়ঃ তা তো হবেই, হয়ও। কিন্তু কষ্ট সহ্য করি। বিরহী যেমন প্রিয়ার বিরহ সহ্য করে, তেমনই ভাবে হাহুতাশ করতে করতে সহ্য করি।

প্রথমঃ এই বিরহের ক্লেশ তোমার থাকত না, যদি মিলনের আকাঙ্খাকে মনে পোষণ না করতে।

দ্বিতীয়ঃ হায় হায় দাদা, মিলনের আশাটাই যদি ছেড়ে দিই, তা হলে বাঁচব কিসের জোরে? দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যদি না নামে, বক্ষের দরজায় তা হলে বন্ধুর রথ থামবে কেন? বিচ্ছেদ-বেদনার পূর্ণ পাত্রটি তাঁর হাতে অর্পণ করা যে হবে না।

প্রথমঃ করবার দরকার হবে না ভাই। বিচ্ছেদের বেদনাই যদি না থাকে; মিলনের আগ্রহও সেইসঙ্গে উবে যাবে।

দ্বিতীয়ঃ [মাথা নাড়িয়া] আমি তা চাই না, বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নহে, অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।

প্রথমঃ অর্থাৎ তুমি বৈষ্ণব হতে চাও, ন্যাড়ানেড়ীর দল।

দ্বিতীয়ঃ না দাদা, বৈষ্ণব হতে চাই না, আমি মুসলমানই থাকতে চাই: কিন্তু তারও ওপরে আমি বাঙালী, বাঙালীর ধর্মই আমার ধর্ম। বাঙালী মুক্ত হতে চায় না দাদা, বাঙালী সুখী হতে চায়।

প্রথমঃ তাইতেই তো সর্বনাশ হয়েছে।

দ্বিতীয়ঃ হোক সর্বনাশ। সুখী হবার একান্ত চেষ্টাতেই একদিন বাঙালী এ সর্বনাশকে কাটিয়ে উঠবে। কিন্তু তোমার উপদেশ শুনে সে যদি কেবল উপনিষদের ভূমাকে কামড়ে পড়ে থাকে, তা হলে শেষ পর্যন্ত তাকে ভূমার বদলে ভূমিকেই কামড়ে পড়ে থাকতে হবে।

প্রথমঃ তোমার কথা যে একেবারে মানি না, তা নয়। তবে ভয় হয়, পাছে অতি ছোট সুখ পেয়েই মন তৃপ্ত হয়ে থাকে, আরও বড় জিনিসের প্রতি আগ্রহ কমে যায়।

দ্বিতীয়ঃ কমবে না, সে ভয় নেই দাদা। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব—এ লোভ দিন দিন বেড়েই চলবে।

প্রথমঃ কিন্তু সেটাও তো ভাল নয়।

দ্বিতীয়ঃ সে কথা তখন বল, যখন অপর্যাপ্ত সুখের নেশায় বুঁদ হয়ে আমরা প্রকৃত সুখ কি তা ভুলে যাব। এখনও তার সময় হয়নি। এখন—[সুরে] প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।

এই সময় ভেজানো দরজা ঠেলিয়া একটি মেয়ে ঘরে প্রবেশ করিল। পরিধানে আটপৌরে কালাপেড়ে শাড়ি ও সেমিজ, পা খালি। মেয়েটি কালো, দীর্ঘাঙ্গী, ঈষৎ কৃশ। বয়স উনিশ কিংবা কুড়ি। চোখ দুইটি হরিণের মত আকর্ণবিশ্রান্ত। মাথার ঘন

চুল এত কোঁকড়া যে, কবরীবন্ধ অবস্থাতেও মাথার উপর আঁকাবাঁকাভাবে ঢেউ খেলাইয়া গিয়াছে। দেহ নিরাভরণ, কেবল গলায় একটি সরু সোনার হার আছে। মেয়েটি সুন্দরী নয়, কিন্তু তাহার চোখের দৃষ্টির মধ্যে এমন একটা শক্তি সমাহিত আছে যে, দেখিলেই তাহাকে অসামান্য বলিয়া বোধ হয়।

গান শেষ হইলে সে বলিল, দেবদা, চা খাবে? রান্না নামতে এখনও ঘণ্টা দুই দেরি আছে। জামালদা, তুমি খাবে?

জামালঃ [চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিল] দাদা, এমন অপূর্ব কথা কখনও শুনেছ? কণাদিদি, এ কি শোনালে? গায়ে যে আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে! [সুরে] কি কহব রে সখি আনন্দ ওর—

দেবব্রতঃ জামাল, তুমি একটা আস্ত পাগল। শান্ত হয়ে বস, পাগলামি কর না।

জামালঃ পাগলামি করব না? আলবৎ করব। এতেও যদি পাগলামি না করি, তা হলে করব কিসে? আমার গন্ধর্ব-নৃত্য নাচতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু একলা তো ঠিক হবে না, দাদাকেও অনুরোধ করা বৃথা। অতএব কণাদিদি, তুমি এস।

কণাঃ আমি এখন নাচতে পারব না, আমার অনেক কাজ।

জামালঃ অ্যাঁ! নাচের চেয়ে কাজ বড় হল? বেশ, তাই হোক, তা হলে নাচব না। কিন্তু দিদি, তোমার সংসারে চা আছে, এ খবর আগে দাওনি কেন?

কণাঃ আগে দিলে কি এত ফূর্তি হত?

জামালঃ [মহা উল্লাসে] ঠিক। দাদা! বেদান্ত-দাদা! তোমার বেদান্ত এবার রসাতলে গেল। কণাদিদি কি বললে, তা শুনতে পেলে? শুনতে পেলেও বুঝতে পারলে? যদি না বুঝে থাক, বুঝিয়ে দিচ্ছি।

দেবব্রতঃ জামাল, তুমি একটা—

জামালঃ পাগল। ও প্রসঙ্গ একবার হয়ে গেছে, সুতরাং পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। আমি জানতে চাই, তুমি কণাদিদির কথার গূঢ় মর্মবাণী বুঝতে পেরেছ কি না?

দেবব্রতঃ পেরেছি। তুমি এখন ক্ষান্ত হও, নয়তো এই দণ্ডে এ ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হও।

কণা এতক্ষণ স্মিত মুখে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। সে এবার জোরে হাসিয়া উঠিল।

কণাঃ জামালদার মনের ভাব তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, উনি চা খাবেন। আর তুমি দেবদা? খাবে নাকি?

দেবব্রতঃ খাব, দিও এক পেয়ালা। কিন্তু জামাল, তুমি ওকে 'কণা' বলে ডেকো না, 'অগ্নি' বলে ডেকো।

জামালঃ [শান্ত হইয়া বসিল] ওকে আমার কণাদিদি বলতেই ভাল লাগে।

দেবব্রতঃ কিন্তু ওর নাম অগ্নি। ও আমাদের আগুন, সাক্ষাৎ অগ্নিদেবতা। ওকে কণা বললে ওর মহিমা খাটো করা হয়।

জামালঃ যে আগুন আমাদের বুকের মধ্যে আছে, ও তারই ফুলকি, তাই ওকে কণা বলি। তা ছাড়া ওর নাম শুধু অগ্নি নয়, অগ্নিকণা। অন্যকে পুড়িয়ে ফেলতে পারে, কিন্তু আমার কাছে ও অন্ধকার রাত্রে আগুনের ফুলকির মত, শুধু আনন্দের দেবতা, দাহনের নয়।

দেবব্রতঃ দেখ জামাল, তোমার প্রাণটা বড় বেশী ভাবপ্রবণ। ওটা এ পথে ভাল নয়। ভাবপ্রবণতা কাজের ক্ষতি করে।

জামালঃ কে বললে ক্ষতি করে? আমার প্রাণে যদি ভাবের উন্মাদনা না থাকত, একটা idea যদি আমাকে পাগল করে না দিত, তাহলে আমি সংসারী হতুম দাদা,

এ পথে আসতুম না। কিন্তু যাক ওসব বাজে কথা। এখন কথা হচ্ছে, শ্রীমতী অগ্নিকণা দেবী দিদিঠাকুরানীকে 'কণা' বলা যেতে পারে কি না? দাদা বলছেন, বলা উচিত নয়। কণা, তুমি কি বল?

কণাঃ [ভাবিয়া] আচ্ছা, তুমি একবার আমাকে অগ্নি বলে ডাক তো জামালদা।

জামালঃ [গাম্ভীর্য-বিকৃত কণ্ঠে] অগ্নি।

অগ্নিঃ উঁহু, মোটেই ভাল শুনতে হল না। তোমার মুখে 'কণা'ই মিষ্টি শোনায়। দেবদার মুখে যেমন অগ্নি মানায়, তোমার মুখে তেমনই কণা।

জামালঃ বাস্। শুনলে তো? রফা হয়ে গেল। এখন তুমি অগ্নি বলে ডাক, আমি কণা বলে ডাকি। দু'জনে মিলে পুরো পিতৃদত্ত নামটি পাওয়া যাবে।

দেবব্রতঃ অগ্নিকণা কি ওর পিতৃদত্ত নাম?

জামালঃ তবে?

দেবব্রতঃ ওর পিতৃদত্ত নাম জানি না; ও কখনও বলেনি। বোধ হয় আমাদের দলের কেউ জানে না।

অগ্নিঃ একজন জানে।

প্রস্থান করিল

দেবব্রত ও জামাল কিছুক্ষণ বিস্মিতভাবে দরজার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর দুইজনেই নীরবে সিগারেট ধরাইল। প্রায় পাঁচ মিনিট কোন কথা হইল না।

জামালঃ [দগ্ধাবশেষ সিগারেট ফেলিয়া দিয়া] দাদা, এখানে তো তিন দিন হয়ে গেল। আর কতদিন?

দেবব্রতঃ আজ রাত্রি বারোটার সময় পরেশ আর ভবতোষ আসবে। তাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্রগুলি জিম্মা করে দিয়ে তারপর আমাদের ছুটি। থাকতে ইচ্ছে করলে থাকতে পার, কিন্তু না থাকলেও ক্ষতি নেই।

জামালঃ পরেশ আর ভবতোষ আজ রাত্রে আসবে। কিন্তু তারা অতগুলো রিভলবার আর বোমা নিয়ে যেতে পারবে? ভারী তো কম নয়, প্রায় দু'মণ।

দেবব্রতঃ পারবে। কারণ তারা চাষা সেজে বলদ সঙ্গে করে আসবে।

জামালঃ ও। [কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া] তা হলে কাল সকালে আমি বেরিয়ে পড়ি। কুমিল্লার কাজটা তো আমারই ওপর পড়েছে। আগে থাকতে গিয়ে জায়গাটা দেখে শুনে রাখা যাক।

দেবব্রতঃ বেশ, যাও। অগ্নিও তোমার সঙ্গে যাক। তোমাদের এখনও কেউ চেনে না, সন্দেহও করে না, সুতরাং নিরাপদে যেতে পারবে। আমি আর অখিল আপাতত এইখানেই রইলুম; অন্তত যতদিন না আমার ভাল করে দাড়ি গজায়, ততদিন থাকতেই হবে। আমি একেবারে মার্কামারা, দেখলেই ধরবে।

জামালঃ তা বেশ, তোমরা থাক। এ জায়গাটার ওরা বোধ হয় এখনও সন্ধান পায়নি।

দেবব্রতঃ তাই তো মনে হয়। [ঈষৎ উৎকণ্ঠিতভাবে জানালার বাহিরে তাকাইয়া] আজ অখিলের ফিরতে বড় দেরি হচ্ছে।

জামালঃ হ্যাঁ। বোধ হয় বেচারা গাঁয়ে মাছ পায়নি, তাই একেবারে মাছ ধরিয়ে নিয়ে আসছে। আজ প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছিল, যেমন করে হোক মাছ নিয়ে তবে ফিরবে। কণাও বোধ হয় মাছের অপেক্ষায় রান্না চড়াতে দেরি করছে।

দেবব্রতঃ তাই হবে বোধ হয়।

জামালঃ আচ্ছা দাদা, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ?

দেবব্রতঃ কি?

জামালঃ অখিল আর কণার মাঝখানে কেমন একটা দূরত্ব আছে, ওরা ভাল করে মেশে না। কণা আমাদের সকলকে 'দাদা' বলে, কিন্তু অখিলকে 'অখিলবাবু' বলে।

দেবব্রতঃ হুঁ। অখিল বড় আত্মসমাহিত গম্ভীর, কারুর সঙ্গে ভাল করে মেশবার তার ইচ্ছেও নেই, ক্ষমতাও নেই; ও শুধু নিজের কাজে ডুবে থাকতে চায়। তা ছাড়া মেয়েমানুষ সম্বন্ধে ওর মনে একটা সঙ্কোচ আছে, তাদের ঠিক আপন করে নিতে পারে না।

জামালঃ তা হতে পারে। কিন্তু কণা তাকে দূরে দূরে রাখে কেন?

দেবব্রতঃ অগ্নি কাউকে দূরে রাখে না, কাছেও টানে না। ও হচ্ছে আগুন, ওর প্রভা শুধু আমাদের পথ দেখাবার জন্যে।

জামালঃ না দাদা, অগ্নি শুধু পথ দেখায় না, পথে চলবার প্রেরণাও আনে। আমার এক এক সময় মনে হয়, ও আমাদের এই মুক্তিসাধনার বীজমন্ত্র, স্নেহে তরল অথচ কর্তব্যে কঠিন, সেবায় নারী কিন্তু বুদ্ধিতে পুরুষ, সত্যের মত নির্লিপ্ত আবার সৌন্দর্যের মত মোহময়ী। যে আদর্শ এই আনন্দময় মৃত্যুর পথে আমাদের বার করেছে, অগ্নি হচ্ছে তার প্রতিমা।

দেবব্রতঃ তোমার কবিত্ব বাদ দিলে যা থাকে, অগ্নি তাই বটে।

জামালঃ কিন্তু তবু অখিলের সম্পর্কে ওকে দেখলে কেমন খটকা লাগে। মনে হয়, যেন অগ্নির সহজক্রিয়া কাচের চিমনিতে ঢাকা পড়ে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল।

দেবব্রতঃ ও তোমার বোঝবার ভুল। আসলে অখিল সর্বদা নিজের প্রাণের মধ্যে স্বতন্ত্র হয়ে থাকে, তাই অমন মনে হয়। কিন্তু দরকারের সময় ওদের মধ্যে কোন ব্যবধানই থাকবে না জেনো।

জামালঃ সে আমি জানি। কিন্তু তবু অখিলের জন্যে দুঃখ হয়। এত একাগ্র, এত তন্ময় যে আশেপাশে তাকাবার ওর যেন সময় নেই—এমন আশ্চর্য জীবনটাকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে উপভোগ করতে পেলে না।

দেবব্রতঃ জীবন উপভোগ করবার প্রণালী সকলের এক নয় জামাল।

জামালঃ তাই হবে বোধ হয়। নইলে আজ আমরা চারটি প্রাণী এই জঙ্গলের মধ্যে পড়ো বাড়িতে বসে লাল চালের ভাত আর আলুনি তরকারি খাচ্ছি কেন?

দুটি কলাই-করা সাদা বাটিতে চা লইয়া অগ্নি প্রবেশ করিল। টেবিলে রাখিতেই জামাল একটা বাটি টানিয়া লইয়া এক চুমুক পান করিয়া মুখ চোখাইল।

জামালঃ আঃ। কণা, তুমি হচ্ছ স্বর্গের সাকী; আজ যা খাওয়ালে, এ চা নয়, খাঁটি নির্জলা অমৃত—যা সাগর মন্থন করে উঠেছিল। দাদার নিরাকার পরব্রহ্মের অবস্থা, চিনি ও চিটাতে সমজ্ঞান; কাজেই ওঁর কাছ থেকে প্রশংসা প্রত্যাশা কর না। উনি হয়তো বলবেন, চিনি কম হয়েছে, কিম্বা একেবারেই বাদ পড়েছে। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? অমৃতে চিনি মেশালে কি বেশী সুস্বাদু হয়?

অগ্নিঃ জামালদা, এইজন্যেই তোমাকে খাইয়ে এত সুখ হয়। চিনি ছিল না তাই দিতে পারি নি—দুধও টিনের। দেবদা, চা খারাপ হয়েছে? [দেবব্রত এমনভাবে ঘাড় নাড়িল, যাহার অর্থ হাঁ না—দুই হইতে পারে] দাঁড়াও, আমার চা-ও নিয়ে আসি। ভাত চড়িয়ে দিয়েছি, এখনও ফুটতে দেরি আছে।

প্রস্থান করিল

দেবব্রতঃ অখিলের আজ বড় দেরি হচ্ছে!

জামালঃ ও কিছু নয়—মাছ। যখন প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছে, তখন না নিয়ে

ফিরবে না।

অগ্নি চায়ের বাটি লইয়া প্রবেশ করিল ও একটা চেয়ারে বসিল।

অগ্নিঃ দেবদা, আজ রাত্রে তো ওরা এসে জিনিসপত্রগুলো নিয়ে যাবে—তারপর?

দেবব্রতঃ তারপর তোমাকে নিয়ে জামাল বেরিয়ে পড়বে, আমি আর অখিল আপাতত এখানেই থাকবো।

অগ্নিঃ তোমাদের অন্য কোনও কাজ আছে নাকি?

দেবব্রতঃ না, দাড়ি গজানো ছাড়া আর কোনও কাজ নেই।

অগ্নিঃ জামালদা তো কুমিল্লায় যাবে। আর আমি?

দেবব্রতঃ তুমিও।

অগ্নিঃ আমার কাজ?

দেবব্রতঃ উপস্থিত চুপ করে বসে থাকা ছাড়া আর কোনও কাজ নেই। যথাসময়ে খবর পাবে।

অগ্নিঃ [চিন্তা করিল] আপাতত মেয়ে-ইস্কুলে মাস্টারি নিতে পারি?

দেবব্রতঃ তা পার। কিন্তু দরকার হলেই যাতে ছেড়ে আসতে পার, সে পথ খোলা রেখো।

অগ্নিঃ বেশ। আর কোনও হুকুম আছে?

দেবব্রতঃ না।

একটি লোক ঘরে প্রবেশ করিল। শ্যামবর্ণ, মুখে গোঁফ ও অযত্ন-বর্ধিত খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। মাথার চুল রুক্ষ ও ঝাঁকড়া; ইতরশ্রেণীর লোক বলিয়া মনে হয়, চেহারা দেখিয়া বয়স অনুমান করা কঠিন, পঁচিশ হইতে ত্রিশের মধ্যে যেটা খুশী হইতে পারে। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত; হাঁটু পর্যন্ত কাপড়, নগ্ন পদ। মলিন গামছার এক প্রান্তে বাঁধা সওদা কাঁধ হইতে নামাইয়া মাটিতে রাখিল, তারপর চেয়ারে আসিয়া বসিল। জামালের বাটিতে তখনও আধ বাটি চা ছিল। নিঃশব্দে তুলিয়া লইয়া পান করিল। তারপর সিগারেট ধরাইল।

তিনজনে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

দেবব্রতঃ অখিল, পুলিস সন্ধান পেয়েছে?

অখিল সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। জামাল শিস দিবার মত মুখভঙ্গী করিল। অগ্নি নিষ্পলক নেত্রে অখিলের পানে তাকাইয়া রহিল। দেবব্রতের চোয়ালের হাড় শক্ত হইয়া উঠিল।

দেবব্রতঃ কখন আসছে?

অখিলঃ তারা গাঁ থেকে বেরিয়েছে দেখে এসেছি। খুব সাবধানে আসছে, তাই এসে পৌঁছুতে ঘণ্টাখানেক দেরি হতে পারে।

দেবব্রতঃ দিশী পুলিস?

অখিলঃ জন কুড়ি আর্মড্ পুলিস, আর সঙ্গে গ্রিফিথ।

দেবব্রতঃ গ্রিফিথ?

অখিলঃ হ্যাঁ, গ্রিফিথ।

কিছুকাল সকলে নীরব।

জামালঃ [উঠিয়া] এমন সুযোগ আর হবে না। দাদা, আজ দ্বিতীয় বালেশ্বরের যুদ্ধ দেখিয়ে দেওয়া যাক। কি বল অখিল? কি বল কণা? [দেওয়াল-আলমারি

হইতে রিভলবার লইয়া টোটা ভরিতে লাগিল।]

অগ্নিঃ আমারও তাই মত; কিন্তু অখিলবাবুর কি মনে হয়?

অখিল উত্তর না দিয়া কেবল ঘাড় নাড়িল।

দেবব্রতঃ পালাবার এখনও অনেক সময় আছে, কিন্তু পালালে চলবে না, তা হলে সমস্ত বোমা রিভলবার পুলিসের হাতে পড়বে। এগুলো নিয়ে পালানোও সম্ভব নয়। তাছাড়া পরেশ আর ভবতোষ আজ রাত্রে আসবে। তারা তো খবর জানে না; আর খবর দেবার সময়ও নেই।

সকলে চিন্তিতমুখে ভাবিতে লাগিল। জামাল রিভলবারে টোটা ভরিতে লাগিল। কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল।

দেবব্রতঃ [সহসা মুখ তুলিয়া] এক উপায় আছে। জামাল, এদিকে এস, মন দিয়ে শোন।

জামাল আসিয়া বসিল।

দেবব্রতঃ জামাল, তুমি মুসলমান, অগ্নিকেও কেউ চেনে না। তোমরা দু'জনে এখানে থাক, আমি আর অখিল আড়াল হই।

জামালঃ ঠিক বুঝলুম না দাদা, আর একটু স্পষ্ট করে বল।

দেবব্রত সম্মুখে ঝুঁকিয়া দ্রুত অনুচ্চ কণ্ঠে বলিতে লাগিল। চারিটি মাথা কিছুক্ষণ একত্র হইয়া রহিল। শেষে দেবব্রত চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিল।

দেবব্রতঃ কি বল? এ ছাড়া অস্ত্রগুলো বাঁচাবার আর কোনও উপায় নেই।

অগ্নি ও অখিলের মুহূর্তের জন্য চোখাচোখি হইল। তারপর দুইজনেই ঘাড় নাড়িয়া দেবব্রতের প্রস্তাবে সায় দিল।

জামালঃ [বাঁকিয়া বসিয়া] আমি পারব না।

দেবব্রতঃ [বিস্ফারিত নেত্রে] পারবে না?

জামালঃ না। আমি কণাকে 'দিদি' বলেছি।

দেবব্রতঃ ছিঃ জামাল! ও সব কুসংস্কারের কি এই সময়?

জামালঃ আমি পারব না।

দেবব্রতঃ জামাল, তুমি আমার হুকুম অমান্য করছ?

জামালঃ [হস্তস্থিত রিভলবার দেবব্রতের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া] তার শাস্তি নিতে আমি তৈরি আছি।

দেবব্রতঃ [রিভলবার তুলিয়া লইয়া] হুকুম মানবে না?

জামালঃ না, পারব না। অগ্নি আমার দিদি, আমার বোন। ওর গায়ে আমি ওভাবে হাত দিতে পারব না।

দেবব্রতঃ বেশ, তবে তৈরি হও।

জামালঃ [হাসিয়া] আমি তৈরি আছি।

দেবব্রতঃ [রিভলবার ফেলিয়া দিয়া] Fool! গাধা! আহাম্মক! অভিনয় করতে পারবে না?

জামালঃ কেন? তুমি কিম্বা অখিল অভিনয় কর না।

দেবব্রতঃ আমাদের যে মানাবে না। গ্রিফিথ পাকা ওস্তাদ, একবার দেখেই ধরে ফেলবে।

জামালঃ তোমাকে ধরতে পারে কিন্তু অখিলকে পারবে না। আমাদের মধ্যে মুসলমানের মত চেহারা যদি কারও থাকে তো সে অখিলের।

দেবব্রত অখিলের দিকে চাহিল। অখিল নিঃশব্দে দাড়িতে হাত বুলাইতে লাগিল।

জামালঃ ঐ দাড়ি কামিয়ে যদি থুতনির কাছে একটু নুর রেখে দাও, কার সাধ্য বলে যে অখিলের নাম জামালুদ্দিন মিঞা নয়।

দেবব্রতঃ অখিল, আর সময় নেই। কি বল?

অখিলঃ [অগ্নির দিকে ফিরিয়া] কি বল?

অগ্নিঃ [হাসিয়া উঠিয়া] কপালের লেখা কেউ খণ্ডাতে পারে না। আমার ভয়ে ঘর ছাড়লে তবু নিস্তার নেই। কি আর করবে বল?

অখিলঃ [দাঁড়াইয়া সনিশ্বাসে] আমি রাজী।

জামালঃ [উৎসুকভাবে] ব্যাপারটা কি বল তো? কেমন যেন হেঁয়ালির মত ঠেকছে।

অখিলঃ [ঈষৎ হাসিয়া] এক কথায় বলা যাবে না। যদি বেঁচে থাকি, আজ রাত্তিরে বলব! এখন চটপট সরে পড়, তারা এতক্ষণ এসে পড়ল।

অগ্নিঃ তোমাদের আজ খাওয়া হল না জামালদা।

জামালঃ তা না হোক। অখিল, আমার বাক্সে লুঙ্গি আছে, ক্ষুর আয়না চিরুনি সব পাবে। আচ্ছা, চললুম, রাত্রে আবার দেখা হবে। চল দাদা।

দেবব্রতঃ একটা কথা মনে রেখো অখিল, গ্রিফিথ ভয়ানক ধড়িবাজ, আর সে বাংলা জানে।

উভয়ে প্রস্থান করিল

অখিল ক্ষুর ইত্যাদি বাহির করিয়া দাড়ি কামাইতে বসিল। অগ্নি দেওয়াল-আলমারি খুলিয়া অস্ত্রগুলা সাবধানে তাকের পিছনে সরাইয়া রাখিয়া, তারপর একটা মশারি তাহার উপর চাপা দিল। চেয়ারগুলা ও টেবিল একপাশে সরাইয়া দিয়া মেঝেয় বিছানা পাতিল। ঘরটাকে গুছাইয়া রান্নাঘর অভিমুখে প্রস্থান করিল। কিয়ৎকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, অখিল ক্ষৌরকর্ম শেষ করিয়া লুঙ্গি ও গোলাপী রঙের গেঞ্জি পরিয়াছে, মাথা তৈলসিক্ত করিয়া চুল আঁচড়াইতেছে।

অখিলঃ কেমন দেখাচ্ছে?

অগ্নিঃ বেশ। [মুখ টিপিয়া হাসিয়া] আমাকে ফেলে পালিয়ে আসার ফল পেলে তো?

অখিলঃ পেলুম।

অগ্নিঃ কেন পালিয়েছিলে, বল তো? ভেবেছিলে, আমি তোমায় বাধা দোব?

অখিলঃ তখন তো তোমাকে এমন করে চিনি নি।

অগ্নিঃ এখন চিনেছ?

অখিলঃ চিনেছি।

অগ্নিঃ এখন কেমন মনে হচ্ছে?

অখিলঃ মনে হচ্ছে, পালিয়ে এসে ভালই করেছিলাম।

অগ্নিঃ [কাছে আসিয়া] কেন বল দেখি?

অখিলঃ [অগ্নিকে জড়াইয়া লইয়া] তা না হলে তোমাকে যে এমন করে পেতুম না রানী!

অগ্নিঃ [কণ্ঠলগ্না] আমিও যে তোমাকে এমন করে পাব, তা কে জানত? সব আশা ছেড়ে দিয়েই তো বেরিয়েছিলুম।

কিছুক্ষণ এইভাবে দুইজনে দাঁড়াইয়া রহিল।

অখিলঃ [সুখস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উৎকর্ণভাবে] ওরা এসে পড়েছে—এস।

শয্যার উপর অগ্নি শয়ন করিল; অখিল তাহার পাশে কাত হইয়া কনুইয়ে ভর

দিয়া শুইয়া মৃদু স্বরে কথা কহিতে লাগিল ও মাঝে মাঝে তাহার অধর চক্ষু চুম্বন করিতে লাগিল। অগ্নিও থাকিয়া থাকিয়া তাহার গলা ধরিয়া টানিয়া তাহার ওষ্ঠে চুম্বন করিতে লাগিল।

অতি সন্তর্পণে দরজা ঠেলিয়া একজন মিলিটারী বেশধারী সাহেব প্রবেশ করিল, তাহার হাতে রিভলবার। ক্ষিপ্র দৃষ্টিতে ঘরের চারিদিক দেখিয়া লইয়া কড়া সুরে বলিয়া উঠিল, Hands up—both of you. You're under arrest.

অখিল ও অগ্নি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। অগ্নি চীৎকার করিয়া উঠিল, ওমা, আমি কোথা যাব? এ যে সায়েব!

অখিলঃ [ভয়কম্পিত স্বরে] তাই তো দেখছি। Who—who are you?

গ্রিফিথঃ You put your hands up first, or my gun might go off. [অখিল দুই হাত তুলিল] Ask your companion to do the same.

অখিলঃ হাত তোল—সায়েব বলছে। [অগ্নি হাত তুলিল]

গ্রিফিথঃ That's good. হুকুম সিং!

জনৈক জমাদার প্রবেশ করিল।

গ্রিফিথঃ Handcuff লাগাও। [হুকুম সিং হাতকড়া লাগাইল] Now search the man. মরদকা অঙ্গা-ঝাড়ি করো। [হুকুম সিং তাহাই করিল] Nothing there? All right!

অগ্নিঃ ওগো, কি হবে? আমাদের কি বেঁধে নিয়ে যাবে?

অখিলঃ কি জানি, হয়তো তোমার বাবা পুলিসে খবর দিয়েছেন।

গ্রিফিথঃ [চেয়ারে বসিয়া] Now come and sit down here in front of me. [দুইজনে ভয়ে ভয়ে চেয়ারে বসিল] That's right. Now tell me who you are.

অগ্নিঃ ওগো, সায়েব কি বলছে? আমাদের মেরে ফেলবে না তো? আমার যে বড্ড ভয় করছে। [কাঁদিতে লাগিল]

গ্রিফিথঃ Ask your friend to be quiet.

অখিলঃ কণা, চুপ কর, সায়েব রাগ করছে।

গ্রিফিথঃ What's your name?

অগ্নিঃ ওগো, নাম জিজ্ঞাসা করছে নাকি? দোহাই তোমার, নিজের নাম বল না।

অখিলঃ [অধর লেহন করিয়া] My name is—is অনিলকুমার রায়।

গ্রিফিথঃ [মাথা নাড়িয়া] It's no use, young man, come out with the real one. And let me tell you. I know Bengalee. আমি বাংলা জানি।

অগ্নিঃ ওমা, কি হবে—সায়েব বাংলা জানে! [মাথায় কাপড় টানিবার চেষ্টা করিল। অখিল মূঢ়বৎ বসিয়া রহিল।]

গ্রিফিথঃ এবার আসল নামটি বল তো দেখি।

অখিলঃ সায়েব, আমার আসল নাম মহম্মদ জামালুদ্দিন।

গ্রিফিথঃ জামালুদ্দিন! Who is this young lady then?

অখিলঃ [থতমত] উনি—উনি আমার স্ত্রী।

গ্রিফিথঃ মিথ্যে বল না— She is a Hindu girl. [অগ্নিকে] তোমার সঙ্গে এর কি সম্বন্ধ?

অগ্নিঃ [লজ্জারুদ্ধ কণ্ঠে] সায়েব, আমি ওর সঙ্গে—ওর সঙ্গে ঘর ছেড়ে পালিয়ে

এসেছি।

গ্রিফিথঃ [শিস দিয়া] I see! I see! কোথায় তোমার ঘর?

অগ্নিঃ সায়েব, আমায় মেরে ফেল, কেটে ফেল, কিন্তু ও কথা মুখ দিয়ে বার করতে পারব না। নিজে যা করবার করেছি, বাবার মুখে কালি লাগাতে পারব না।

গ্রিফিথঃ [অখিলকে] তোমার বাড়ি কোথায়?

অখিলঃ চব্বিশ পরগণায়। এর বেশী বলতে পারব না।

গ্রিফিথঃ এই জঙ্গলের মধ্যে তোমরা কি করছ?

অখিলঃ লুকিয়ে আছি—তোমাদের ভয়ে।

গ্রিফিথঃ [হাসিতে লাগিল] Well, you are a nice pair of lovers! হুকুম সিং, handcuff খোল দেও।

হুকুম সিং হাতকড়া খুলিয়া দিল।

অগ্নিঃ সায়েব, আমাদের ছেড়ে দিলে? আমাদের ধরে নিয়ে যাবে না?

গ্রিফিথঃ I was after bigger game. তোমাদের মত চুনোপুঁটির খোঁজে তো আমি আসিনি। আমি খবর পেয়েছিলাম, একদল বিপ্লবী —terrorist এখানে লুকিয়ে আছে।

অখিলঃ [সভয়ে] বিপ্লবী! সায়েব, আমরা তার কিছু জানি না। আজ তিন দিন হল, আমরা এখানে আছি। আমি ওকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি, এই আমার অপরাধ। বিপ্লবীদের আমি জানি না।

গ্রিফিথঃ It seems I was misinformed— ভুল খবর পেয়েছিলাম। But in any case, আমি তোমাদের জিনিসপত্র তল্লাস করে দেখতে চাই।

অগ্নিঃ দেখ সায়েব, দেখ, আমাদের বাক্স-প্যাঁটরা যেখানে যা আছে সব দেখ। আমরা নিরপরাধ।

গ্রিফিথঃ Very good. হুকুম সিং, তোম লোগ সবকোই মিলকে দুসরা দুসরা ঘর খানাতল্লাস করো। [হুকুম সিং প্রস্থান করিল] Now let us see what you have got here.

[উঠিল]

অখিলঃ [অগ্নির নিকট হইতে চাবি লইয়া] এই নাও সায়েব, চাবি।

গ্রিফিথ সতর্ক চক্ষে ঘরের চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে একবার ঘরটা প্রদক্ষিণ করিল। দেওয়াল-আলমারির কবাট খুলিয়া দেখিল, একটি মশারি গুটানো রহিয়াছে।

গ্রিফিথঃ What's this? A mosquito net?

অখিলঃ Yes sir. This jungle is very full of mosquitoes.

অগ্নিঃ সায়েব, চা খাবেন?

গ্রিফিথঃ চা —tea? No, thank yau. This is not my time for tea. দরকার নেই।

অগ্নিঃ না সায়েব, এক পেয়ালা খেতেই হবে, তোমার নিশ্চয় তেষ্টা পেয়েছে। আমি এখুনি তৈরি করে এনে দিচ্ছি।

গ্রিফিথঃ [ইতস্তত করিয়া] Well, if it is no trouble to you, young lady. দাও এক পেয়ালা।

অগ্নিঃ [কৃতজ্ঞভাবে] আচ্ছা সায়েব, এখুনি আনছি। আপনি আমাদের ওপর এত দয়া করলেন, এটুকুও যদি আপনার জন্যে না করি, তা হলে মনে বড় দুঃখ হবে।

প্রস্থান করিল

গ্রিফিথঃ [কতকটা নিজ মনে] A pretty siren! Just the sort that finds home dull and dreary. [বাক্স খুলিয়া দেখিতে লাগিল। সর্বশেষের বাক্স হইতে একটি বোতল তুলিয়া লইল] Bless me! What's this?

অখিলঃ [সাগ্রহে] মদ সায়েব, খাবে?

গ্রিফিথঃ By all that's—but why didn't you tell me? This is real stuff—whisky!

অখিলঃ একদম ভুলে গিয়েছিলুম সাহেব, তোমার তাড়া খেয়ে কিচ্ছু মনে ছিল না। খাবে?

গ্রিফিথঃ Sure we shall take a sip together, though it's not the time. Tell the young lady she needn't make tea. This will do. Bring three glasses.

অখিলঃ Very Well সায়েব। কাচের গেলাস তো নেই, বাটি আনছি।

প্রস্থান করিল

গ্রিফিথঃ [চাবির গোছা-সংলগ্ন কর্কস্ক্রু দিয়া বোতল খুলিতে খুলিতে] They seem to be all right. Just an ordinary case of elopement. But still,—there is something wrong somewhere. What is it? (চিন্তা করিয়া) Well, I shall test the girl. If she takes the whisky and can stand it, I shall know what to think. A good Hindu girl will never stand whisky.

তিনটি বাটি লইয়া অগ্নি ও অখিলের প্রবেশ। গ্রিফিথ প্রত্যেক বাটিতে একটু করিয়া মদ ঢালিল।

গ্রিফিথঃ [অগ্নিকে] I suppose you are used to it? অভ্যাস আছে তো?

অগ্নি মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

গ্রিফিথঃ No soda I believe? Well, it does'nt matter. I prefer it raw. Here's to you! [পান করিল]

অখিলঃ To you! [অগ্নি ও অখিল পান করিল]

গ্রিফিথঃ [অগ্নিকে] How do you like it? কেমন মনে হচ্ছে?

অগ্নিঃ চমৎকার সায়েব। আমার নাচতে ইচ্ছে করছে!

গ্রিফিথঃ Good Lord! নাচতে ইচ্ছে করছে! But there's no time for that, I'am afraid. [সহাস্যে মাথা নাড়িল]

হুকুম সিং প্রবেশ করিল।

হুকুম সিংঃ হুজুর, কঁহি কুছ নহি মিলা।

গ্রিফিথঃ Oh well, never mind. I didn't expect you would find anything. হুকুম সিং, বিলকুল ঝুট খবর মিলা। অব লৌট চলো।

হুকুম সিংঃ হুজুর!

গ্রিফিথঃ Well, so long. Wish you both a very good time.

অখিলঃ Thank you sir.

অগ্নিঃ সায়েব, যাচ্ছেন? [জোড়হাত করিয়া] সায়েব, আমাদের প্রাণের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আপনি ইচ্ছে করলে আমাদের ধরে নিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু তবু দয়া করে ছেড়ে দিলেন। আপনাকে আর কি বলব—থ্যা—থ্যাঙ্ক ইউ।

গ্রিফিথঃ Don't thank me, young lady, rather thnak your own luck that I am after bigger game. [টুপি তুলিয়া] Good-bye! But look here. You must clear out of this place as quickly as you can. [আঙুল তুলিয়া] If ever I come back and find you here still, I shall surely send you up. Good day!

অখিলঃ Good day.

গ্রিফিথ দ্বার পর্যন্ত গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

গ্রিফিথঃ [অর্ধস্ফুট স্বরে] Lord! Four chairs! [ফিরিয়া] By the way, there is none else with you?

অখিলঃ না সায়েব, কেবল আমরা দু'জন।

গ্রিফিথঃ No servant or anything of the sort?

অখিলঃ না সায়েব।

গ্রিফিথঃ All right! Ta ta.

প্রস্থান করিল

অগ্নি ও অখিল শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাহিরে হুকুম সিং-এর গলা শুনা গেল—'ফর্ম ফোর্‌স', 'রাইট টার্ন', 'কুইক মার্চ', জুতার মশমশ শব্দ ক্রমে দূরে মিলাইয়া গেল।

অগ্নিঃ [কম্পিত কণ্ঠে হাসিয়া] ওগো, আমায় একবার ধর। মাথাটা ঘুরছে।

অখিলঃ মাথা ঘুরছে? [অগ্নিকে জড়াইয়া ধরিল]

অগ্নিঃ [বুকে মাথা রাখিল] মদ গিলেছি, মনে নেই?

পটক্ষেপ

দ্বিতীয় দৃশ্য

সেই ঘর। গভীর রাত্রি। টেবিলের উপর একটি লণ্ঠন জ্বলিতেছে। দেবব্রত, জামাল ও অগ্নি তিনটি চেয়ারে গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে। যেন কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছে।

অখিল প্রবেশ করিয়া বসিল।

দেবব্রতঃ পরেশ ভবতোষ চলে গেল?

অখিলঃ হ্যাঁ, তাদের বনের ধার পর্যন্ত পেঁাছে দিয়ে এলুম।

দেবব্রতঃ যাক, এখন নিশ্চিন্দি। [সিগারেট ধরাইল]

জামালঃ যাক। কণাদিদি, এখন আসল কথাটা হোক। এতদিন ফাঁকি দিয়েছ, এখন গল্পটা বল।

অগ্নিঃ কোন্ গল্প?

জামালঃ তোমার আর অখিলের গল্প।

অগ্নিঃ [অখিলের দিকে ফিরিয়া] তুমি বল।

অখিলঃ বলবার বিশেষ কিছু নেই। কণা আমার বউ। তবে পুরোপুরি নয়—আধখানা।

জামালঃ হেঁয়ালি রাখ—সব কথা খুলে বল।

অখিলঃ এক শহরেই আমাদের বাড়ি। যখন ইস্কুলে পড়তুম তখন থেকেই ওর

সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক ছিল।

জামাল : অর্থাৎ তখন থেকেই ভালবাসা জন্মেছিল।

অখিল : ভালবাসা! কি জানি! যে জন্যে লোকে ভালবাসে—রূপ—তা ওর কস্মিনকালেও ছিল না।

অগ্নি : আর তুমি বুঝি নবকার্তিক ছিলে?

অখিল : না। চেহারায় দু'জনেই পরস্পরকে টেক্কা দিতুম, এখনও দিচ্ছি; কিন্তু তা নয়। ওকে ভালবাসতুম কি না বলতে পারি না, তবে ওর একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। আর মনে মনে ওকে একটু ভয় করতুম।

জামাল : আর কণাদিদি, তুমি?

অগ্নি : অমন নীরস লোককে কেউ ভালবাসতে পারে? তুমিই বল।

জামাল : তা পারে না, তবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে পারে—যেমন তুমি বেরিয়েছ। তারপর?

অখিল : ক্রমে দু'জনে বড় হলুম। আমার মন দু'দিকে টানতে লাগল—এক দিকে কণা আর এক দিকে দেশ। ভাল কথা, ওর নাম অগ্নি নয়, ওর সত্যিকারের নাম কনক। যাক, তারপর—অর্থাৎ একদিন—ভাববার সময় পেলুম না—আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। যেন নেশার ঘোরে বিয়ে করে ফেললুম। যেদিন বউ নিয়ে বাড়ি ফিরে এলুম, সেদিন চোখ থেকে হঠাৎ ঠুলি খসে পড়ল। বুঝলুম, যে বাড়িতে কণা আছে, সে বাড়িতে থেকে আমি অন্য কিছু করতে পারব না, আমার মনের সে জোর নেই। ওর মনের পরিচয় তখনও পাই নি; শুধু ওর একটুখানি হাসি দেখে ওর ভালবাসার ইসারা পেয়েছিলুম—তাই ভয় আরও বেড়ে গেল। কণা, মনে আছে?

অগ্নি : হুঁ।

অখিল : তখনও কুশণ্ডিকা হয়নি। সেই অবস্থাতেই ঘর ছেড়ে নিঃশব্দে চম্পট দিলুম। পিছু ফিরে তাকালুম না, পিছু ফিরলে আর যেতে পারতুম না। তারপর দু'বছর কেটে গেল। শেষে একদিন হঠাৎ বরিশালের মিটিং-এ কণার দেখা পেলুম। ও তখন আমাদের মধুচক্রের মক্ষিরানী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপর থেকে সবই তোমরা জান।

জামাল : হুঁ। কণাদিদি, এবার তোমার তরফটা শুনি।

অগ্নি : আমার তরফে শোনবার কিছুই নেই। বড় হয়ে অবধি ওঁর সঙ্গে দেখা বড় একটা হত না, যদিও এক পাড়াতেই বাড়ি, কখনও কদাচিৎ দেখা হলে উনিও কথা কইতেন না, আমিও না। কিন্তু তবু, ওঁর মনের গতি কোন্ দিকে, তা আমি বুঝতে পেরেছিলুম। কি করে বুঝেছিলুম জানি না, বোধ হয় ভালবাসার যিনি ভগবান তিনিই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তাই নিজেকে ওঁর উপযুক্ত করে তৈরি করতে লাগলুম, ভাবলুম দু'জনে মিলে কাজ করব। তারপর বিয়ে হতে না হতেই উনি নিরুদ্দেশ হলেন।

পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে গেল। তারপর অন্ধকার যখন হাল্কা হল, তখন ভাবলুম, তাতেই বা ক্ষতি কি? উনি যে পথে গিয়েছেন, আমিও তো স্বাধীনভাবে সেই পথে যেতে পারি।

মন ঠিক করতে কিছুদিন গেল। তারপর আমিও একদিন কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়লুম।

কিছুক্ষণ ঘর নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। জামালের চোখ আনন্দের স্বপ্নে আচ্ছন্ন. অগ্নি নিজের মনের অতলে তলাইয়া গিয়াছে, দেবব্রত পাহাড়ের মত নিশ্চল, অখিল অন্যমনস্কভাবে বাহিরের অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া আছে।

জামালঃ [উঠিয়া দাঁড়াইয়া] আজ আমাদের কণাদিদির ফুলশয্যা। দাদা, আমরা এখানে কেন? চল, বনে বনে ঘুরে বেড়াইগে।

দেবব্রতঃ [উঠিয়া দাঁড়াইয়া] ঠিক কথা। অখিল, অগ্নি, এতদিন আমি তোমাদের মোড়ল নেতা কর্তা গুরু, যা বল ছিলুম; মনে ভাবতুম, মোড়ল হওয়ার অধিকার আমার আছে। আজ সে পদবী আমি ত্যাগ করলুম। তোমরা দু'জনে আজ থেকে আমাদের গুরু হলে। এখন কি করব হুকুম কর।

অখিল ও অগ্নি দেবব্রতকে প্রণাম করিল।

অখিলঃ দাদা, আপাতত আমাদের বিয়েটা সম্পূর্ণ করে দাও।

দেবব্রতঃ সে কি?

অখিলঃ কুশণ্ডিকা হয়নি যে।

দেবব্রতঃ পাগল! কুশণ্ডিকায় তোমাদের দরকার নেই। তোমাদের বিয়ে—সত্যি-কারের বিয়ে—অনেক আগে হয়ে গেছে।

অখিলঃ তা হোক দাদা, তবু তুমি বিয়ে দাও। তুমি পণ্ডিত মানুষ, তোমার মুখ থেকে দুটো সংস্কৃত শ্লোক শুনলেই প্রাণটা ঠাণ্ডা হবে। জানি, তুমি বলবে—অন্ধ সংস্কারের কৈঙ্কর্য্য। কিন্তু আজ দুপুর থেকে প্রাণে শান্তি পাচ্ছি না। কণার শরীরটাকে নিয়ে যে ভাবে—, না দাদা, তুমি যা হোক দুটো মন্ত্র আউড়ে দাও—অগ্নি-দেবতা তো সামনেই রয়েছেন।

লণ্ঠনের দিকে ইঙ্গিত করিল

দেবব্রতঃ বেশ, তোমাদের যখন ইচ্ছে, তখন তাই হোক। কিন্তু কুশণ্ডিকার মন্ত্র তো জানি না। শুধু আধখানা শ্লোক মনে আছে,—তাও নবেল পড়ে শেখা। আচ্ছা, তাতেই হবে। অগ্নি, তুমি অখিলের হাত ধর, ওর মুখের দিকে চেয়ে বল—ওঁ মমব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু, মমচিত্তং অনুচিত্তং তেঽস্তু।

অগ্নিঃ ওঁ মমব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু, মমচিত্তং অনুচিত্তং তেঽস্তু।

দেবব্রতঃ অখিল, তুমি বল।

অখিলঃ ওঁ মমব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু, মমচিত্তং অনুচিত্তং তেঽস্তু।

দেবব্রতঃ বাস্, হয়ে গেল। আমার মন্তরের পুঁজি ফুরিয়েছে।

জামালঃ এবার সিঁদুর। এই সময় কপালে সিঁদুর দিতে হয় না? সকলে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল।

দেবব্রতঃ সিঁদুর তো নেই।

জামালঃ দাদা, শুনেছি সেকালে যবনের আঙুল কেটে রাজা-রানীর কপালে রাজটীকা পরানো হত। সিঁদুর যখন নেই, তখন সেই ব্যবস্থাই হোক। যবন তো উপস্থিত আছে। [ছুরি দিয়া আঙুল কাটিয়া অগ্নির কপালে রক্তের ফোঁটা দিল। অগ্নি জামালের পদধূলি লইল।]

জামালঃ [আঙুল চুষিতে চুষিতে] যাক, শুভকর্ম শেষ। অখিল, Congratulations! কণা, চিরায়ুষ্মতী হও। দাদা, চল এবার আমরা অন্তর্হিত হই।

অখিলঃ সত্যিই যাবে?

অগ্নি জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

জামালঃ আলবাৎ যাব। দাদা, আর দেরি নয়, বরকনে কি রকম অধীর হয়ে পড়েছে, দেখছ তো? বর যদি বা মুখ ফুটে বললেন, সত্যিই যাবে?—কনের মুখে কথাটি নেই। [প্রস্থানোদ্যত] শুধু একটা জিনিসের অভাব বোধ হচ্ছে—এই সময় রোশনচৌকি থাকত!

বাহিরে বন্দুকের আওয়াজ হইল। জানালার বাহিরের অন্ধকার হইতে গ্রিফিথের কণ্ঠস্বর শুনা গেল।

গ্রিফিথঃ Hands up, young lady. Don't move, I have you covered.

অগ্নি ধীরে ধীরে হাত তুলিল। ঘরের মধ্যে মিনিটখানেক অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল। তারপর অখিল মৃদুকণ্ঠে হাসিল।

অখিলঃ জামাল, রোশনচৌকি খুঁজছিলে না? বাজন্দারেরা এসে পড়েছে। একেবারে গোরার ব্যাণ্ড।

দেবব্রতঃ যাক, এই ভাল। আমাদের কাজ হয়ে গেছে, এখন মরলেও ক্ষতি নেই। [আলমারির ভিতর হইতে রিভলবার লইয়া অখিল ও জামালকে দিল]

গ্রিফিথঃ [বাহির হইতে] Do you surrender?

দেবব্রতঃ [গর্জন করিয়া] No, damn you!

অখিলঃ দাদা, আমাদের দোষ। গ্রিফিথ যে বুঝতে পেরেছে, তা আমরা ধরতে পারিনি।

দেবব্রতঃ কিছু আসে যায় না অখিল। একদিন তো মরতেই হবে, আজ হলেই বা ক্ষতি কি?

গ্রিফিথঃ [বাহির হইতে] Listen you! We have surrounded you, you can't escape. If you don't surrender, we shall kill you all and I shall begin with the lady.

জামালঃ No, you won't. তা কি হয় সায়েব? কণা, আমি তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি, তুমি সরে যেও। [জামাল পাশ হইতে বিদ্যুদ্বেগে কণার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল; কণা সরিয়া গেল। বাহিরে বন্দুকের আওয়াজ হইল। বুকে গুলি খাইয়া জামাল জানালার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল]

জামালঃ [উচ্চ হাস্য করিয়া পরিষ্কার কণ্ঠে] A miss, Griffith! Now take that and that and that— [গুলি ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে জামালের মৃতদেহ মাটিতে এলাইয়া পড়িল]

দেবব্রতঃ জামাল তো গেল। অখিল, এবার আমাদের পালা।

তখন দুই জানালা দিয়া ঘরে ধারার ন্যায় গুলি বর্ষিত হইতে লাগিল। দেবব্রত ও অখিল জানালার নীচে লুকাইয়া বাহিরে গুলি ছুঁড়িতে লাগিল। অগ্নি টোটা সরবরাহ করিতে লাগিল।

দেবব্রত প্রথম পড়িল।

দেবব্রতঃ অগ্নি, যাই—

অগ্নিঃ এস দাদা [দেবব্রতের মৃত্যু]

অখিলঃ কণা, আমিও [চিত হইয়া পড়িল]

অগ্নিঃ [তাহার মুখের উপর মুখ রাখিয়া] চললে? চললে? একটু অপেক্ষা করতে পারবে না? একসঙ্গে যেতুম।

অখিলঃ কণা—এস—[মৃত্যু]

কণা উঠিয়া দাঁড়াইল। অখিলের হাত হইতে রিভলবার লইয়া নিজের খোঁপার মধ্যে গুঁজিয়া দিল।

কণাঃ [উচ্চকণ্ঠে] I surrender. আমি ধরা দিচ্ছি।

গ্রিফিথঃ [বাহির হইতে] What about the others?

কণাঃ তারা কেউ বেঁচে নেই।

গ্রিফিথঃ Good! Throw down your gun. বন্দুক ফেলে দাও।

কণাঃ আমার বন্দুক নেই—টোটাও ফুরিয়ে গেছে।

গ্রিফিথঃ Good! [বন্দুক হস্তে দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া] All the same, you put your hands up. That's right. So you were four after all. You played me a pretty trick this morning, young lady. But I saw through it all right. Now I suppose you are coming quietly with me.

কণাঃ On the contrary, Griffith, it is you who are coming quietly with me.

গ্রিফিথঃ Eh! What do you mean--coming quietly with you?

কণাঃ গ্রিফিথ! শুধু আমরাই যাব—তুমি যাবে না?

কণা চুলের ভিতর হইতে ক্ষিপ্রহস্তে রিভলবার বাহির করিল। দুইজনে একসঙ্গে বন্দুক ছুঁড়িল। গ্রিফিথ পড়িল।

কণা টলিতে টলিতে অখিলের বুকের উপর গিয়া পড়িল। অখিলের গলা ভাল করিয়া জড়াইয়া লইয়া তাহার বুকের উপর মাথা রাখিতেই তাহারও প্রাণ বাহির হইয়া গেল।

২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০

আলোর নেশা

আমরা 'আরও আলো', 'আরও আলো' করিয়া গ্যেটে'র মত খুঁজিয়া বেড়াইতেছি; কিন্তু হঠাৎ তীব্র আলোর সাক্ষাৎকার ঘটিলে চট্ করিয়া চোখ বুজিয়া ফেলি। অনাবৃত আলোকের উগ্র দেবসুরা আকণ্ঠ পান করিতে পারি না; নেশা হয়, টলিতে টলিতে আবার নর্দমার অন্ধকারে হোঁচট খাইয়া গিয়া পড়ি। আলোকের ঝরণা-ধারায় ধৌত হইবার প্রস্তাবটা মন্দ নহে, কিন্তু ঝরণার তোড়ে ডুবিয়া মরিবার আশঙ্কা আছে কি না, সে দিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত।

একরাশ এলোমেলো উপমার মধ্যে আসল কথাটা জট পাকাইয়া গেল। ইহাকেই বলে ধান ভানিতে শিবের গীত।

পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত প্রণয়-ব্যাপার ঘটিয়াছে, অন্ততঃ যে-সব প্রণয়-

ব্যাপারের লিপিবন্ধ ইতিহাস আছে, তাহা আলোচনা করিলে দেখা যায়, পনের আনা ক্ষেত্রে নায়ক নায়িকাকে কোনও বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার ফলে উভয়ের মধ্যে প্রণয়-বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে। এই প্রথাটির অনেক সুবিধা আছে,—এক ঢিলে অনেকগুলি পাখি মারা যায়। নায়ক বীর, নায়িকা কোমলাঙ্গী, ইত্যাদি অনেক ভাল ভাল কথা একসঙ্গে বলা হইয়া যায়। তাই, আমারও লোভ হইতেছে যে, এই চিরাচরিত সুন্দর প্রথাটিকে অবলম্বন করিয়া গল্প আরম্ভ করি। কিন্তু একটা বড় প্রতিবন্ধক রহিয়াছে। অন্য সময় যাহা খুশী বলিতে পারি, কিন্তু গল্প বলিতে বসিয়া নিছক সত্য কথা বলিতেই হইবে, এমন কি, রসের রসান পর্যন্ত দেওয়া চলিবে না,—ইহাই আধুনিক সাহিত্যকলার নব-ন্যায়। সুতরাং সত্যের খাতিরে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, উপস্থিত ক্ষেত্রে নায়িকাই নায়ককে (প্রথমে বিপদে ফেলিয়া) বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল।

নায়কের নাম হারাণ। হারাণ নাম শুনিয়া ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিবেন না। সে বাঙালী যুবক-সম্প্রদায়ের মূর্তিমান নমুনা,—অর্থাৎ তাহাকে দেখিলেই বাঙালী যুবক বলিতে কি বুঝায়, তাহা মোটামুটি আন্দাজ করিয়া লওয়া যায়। সে কলেজে পড়ে, সে রোগা ও কালো, লম্বাও নহে, বেঁটেও নহে। সে বুদ্ধিমান, কিন্তু বুদ্ধির লক্ষণ মুখে কিছু প্রকাশ পায় না। মুখখানি ঈষৎ শীর্ণ, চোখে একটা অস্বচ্ছন্দ সঙ্কোচের ভাব; কখনও কখনও আঘাত পাইয়া তাহা রূঢ়তার শিখায় জ্বলিয়া উঠে। বাঙালীর মজ্জাগত অভিমান —*sensitiveness*—চারিদিক হইতে খোঁচা খাইয়া যেন একই কালে ভীরু এবং দুঃসাহসী হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষার ধারা যে পথে গিয়াছে, সহবৎ সে পথে যাইতে পারে নাই—তাই মনটা তাহার আশ্রয়হীন নিরালম্ব হইয়া আছে।

হারাণ মেসে থাকিয়া কলেজের থার্ড ইয়ারে পড়ে। বয়স কুড়ি। তাহার বাবা গোয়ালন্দ জাহাজ অফিসের হেডক্লার্ক। হারাণ বি. এ. পাস করিলেই বাবার অফিসে ঢুকিবে এইরূপ একটা কথা স্থির হইয়া আছে।

কিন্তু তাই বলিয়া সে লেকে বেড়াইতে যাইবে না, এমন কোনও কথা নাই। আমি জোর করিয়া বলিতেছি, সে লেকে বেড়াইতে গিয়াছিল এবং সন্ধ্যার পর বৃষ্টিতে ভিজিয়া ঢোল হইয়া বাসায় ফিরিতেছিল। সঙ্গে ছাতা ছিল না।

ইহার অপেক্ষাও পরিতাপের বিষয়, তাহার পকেটে পয়সা ছিল না। আষাঢ় মাসের সন্ধ্যায় হাতে ছাতা ও পকেটে পয়সা না লইয়া যে ব্যক্তি পথে বাহির হয়, তাহার মত 'নিরেট' পৃথিবীতে আর কয়জন আছে? তবে সত্য কথাটা বলিতেই হইল। হারাণের বাবা তাহাকে মাসে মাসে ত্রিশ টাকা করিয়া পাঠাইতেন বটে, কিন্তু তাহার ছাতা ছিল না। ছাতাটা গত বর্ষায় ছিঁড়িয়া ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া সে লেকে বেড়াইতে যাইবে না? এ যে বড় অন্যায় কথা!

জলে ভিজিয়া হারাণের চেহারা হইয়াছিল একটি সিক্ত মার্জারের মত। সে চুপসিয়া একেবারে আধখানা হইয়া গিয়াছিল—কাপড় ও কামিজ গায়ে জুড়িয়া গিয়াছিল, জুলপি হইতে জল গড়াইয়া চিবুক বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। বৃষ্টি তখনও থামে নাই, তবে বেগ অনেকটা কমিয়া ছিল; তাহারই মধ্যে দিয়া ভিজা ভারি জুতায় নানাবিধ শব্দ করিতে করিতে সে চলিয়াছিল।

কিন্তু যাইতে হইবে অনেক দূর,—শহরের অন্য প্রান্তে। একটা রিকশ'র ঝুনঝুনি পর্যন্ত কোথাও শুনা যাইতেছিল না। যে পথ দিয়া হারাণ চলিয়াছিল, সেটা সাধারণতঃ একটু নির্জন, এখন বৃষ্টির প্রভাবে একবারে জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল।

একটা ছোট চৌমাথা পার হইতে গিয়া তাহার বিপদ উপস্থিত হইল। রাস্তার আধাআধি পৌঁছিতেই পিছন হইতে মোটর-হর্নের অধীর চীৎকার শুনিয়া সে ঘাড়

ফিরাইয়া দেখিল, মোটরখানা তাহার অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেই পা পিছলাইয়া গেল, সে চিৎ হইয়া ভূমি-শয্যা গ্রহণ করিল।

মোটর-চালক ঠিক সময়ে মোটর রুখিয়া ফেলিল বটে, কিন্তু স্কিড্ করিয়া গাড়ি-খানা প্রায় গজ দুই অগ্রসর হইয়া গেল। চিৎ-পতিত হারাণ দেখিল, সে মোটরের তলায় বিরাজ করিতেছে।

মোটরের ভিতর হইতে একটি ভয়সূচক ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শুনা গেল। গাড়ির আরোহিণী চালকের আসন হইতে নামিয়া আসিয়া দেখিল, হারাণ সরীসৃপের মত কোনও প্রকারে মাথাটি গাড়ির তলা হইতে বাহির করিয়া সম্মুখের নম্বর প্লেটের পানে বুদ্ধিভ্রষ্টের মত তাকাইয়া আছে।

গাড়ির সোফার এতক্ষণে নিঃশব্দে নিজের ন্যায্য স্থানে আসিয়া বসিয়াছিল, আরোহিণী বিপন্নকণ্ঠে তাহাকে ডাকিল, 'প্যারে, জল্‌দি আও।'

প্যারে ও আরোহিণী দু'জনে মিলিয়া নম্বর প্লেট পাঠনিরত হারাণকে তলা হইতে টানিয়া বাহির করিল। হারাণের লাগে নাই, সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিজ্ বিজ্ করিয়া বলিল, 'থ্রি সেভন নাইন ফোর টু।'

আরোহিণী ও সোফার মুখ-তাকাতাকি করিল। সোফার ক্ষিপ্র দৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, পুলিস বা অন্য কেহ কোথাও নাই। সে পুনর্বার গাড়িতে উঠিয়া স্টার্ট দিল।

আরোহিণী কিন্তু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, একটা লোককে চাপা দিয়া নির্বিকার চিত্তে প্রস্থান করিতে বোধহয় বিবেকে বাধিল। সোফার জাতীয় জীবের বিবেক বলিয়া কিছু নাই।

আরোহিণী জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার লাগেনি তো?'

হারাণ চমকিয়া উঠিল; দেখিল, একটি নব-যুবতী তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে। সে যেন আঁৎকাইয়া উঠিয়া বলিল, 'অ্যাঁ! না না, লাগেনি।' তারপর আর কোনও কথা ভাবিয়া না পাইয়া বলিল, 'থ্রি সেভন নাইন ফোর টু।'

নব-যুবতীর মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়িল, সে বলিল, 'আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিই।'

হারাণ বলিল, 'না না, দরকার নেই—'

এই সময় বিবেকহীন সোফারটা দূরে একজন লোক আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ির দরজা খুলিয়া বলিল, 'আইয়ে বাবু, জল্‌দি ভিতর আইয়ে!'

তন্দ্রাচ্ছন্নের মত হারাণ গাড়ির ভিতর গিয়া বসিল, নব-যুবতীটি তাহার পাশে বসিল। গাড়ি ছাড়িয়া দিল। হারাণ মনে মনে 'না না না' বলিতেছিল, কিন্তু তাহা কেহ শুনিতে পাইল না।

নব-যুবতী সোফারকে বলিল, 'ঘর চলো।' তারপর হারাণের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি ঠিক বলছেন আপনার লাগেনি?'

হারাণ সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না।'

যুবতী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'যাক, তবু ভাল। আমার এমন ভয় হয়েছিল—'

কিছুক্ষণ কোনও কথা হইল না; হারাণের অঙ্গ নিগলিত জল মোটরের ভিতরটা জেবড়া করিয়া তুলিল। হারাণ কাঠের মত শক্ত হইয়া রহিল।

যুবতী জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার বাড়ি কোন্ দিকে?'

হারাণ বাসার ঠিকানা দিল; যুবতী বলিল, 'আমাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে প্যারে আপনাকে বাসায় পৌঁছে দেবে।' তারপর হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, 'আপনি এমন হঠাৎ পড়ে গেলেন যে, গাড়ি থামানো গেল না। আচ্ছা, কে মোটর চালাচ্ছিল আপনি দেখেছিলেন কি?'

হারাণ মাথা নাড়িল, এ প্রশ্নের মানেই বুঝিতে পারিল না।

গাড়ি আসিয়া চক্রবেড়ে রোডের কাছাকাছি একটা বড় বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। বাড়ির ঘরে ঘরে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলিতেছে। যুবতী নামিয়া পড়িয়া বলিল, 'আচ্ছা, আপনাকে তাহলে পৌঁছে দিক—'

হারাণও নামিবার উপক্রম করিতেছিল, যুবতী বলিল, 'না না, আপনি নামবেন না, please! প্যারে, বাবুকো মোকাম পৌঁছাও।' তারপর গাড়ির মধ্যে গলা বাড়াইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, 'I am very sorry for the accident—I hope you understand?—আচ্ছা—Good night!' বলিয়া হাসিয়া একবার নড্ করিয়া দ্রুত পদে গৃহে প্রবেশ করিল। বৃষ্টি এ-দিকটায় তখন থামিয়া গিয়াছিল।

যথাসময়ে হারাণ মোটর চড়িয়া বাসায় গিয়া পৌঁছিল।

অতঃপর হারাণের মনের ভাব যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিতে আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে এ কাহিনী শেষ করিবার দুরাকাঙ্খা ত্যাগ করিতে হয়। হিমাদ্রিশৃঙ্গে যেদিন অকস্মাৎ আসন্ন আষাঢ় নামিয়া আসে সেদিন শিলাসংকীর্ণ পথে রুদ্ধবেগে স্রোতস্বিনীর কিরূপ অবস্থা হয়, তাহার যথার্থ বিবরণ দান করা সকলের কর্ম নহে। আমি কেবল এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হইব যে হারাণ সে রাত্রিটা জাগিয়াই কাটাইয়া দিল।

পরদিন বেলা প্রায় সাড়ে নয়টার সময় একটি ভদ্রলোক মেসে তাহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। ইংরাজী বেশে সুসজ্জিত মধ্যবয়সী ভদ্রলোক, চাল-চলনে একটা গাম্ভীর্য ও গুরুত্ব আছে; তাঁহাকে দেখিয়াই হারাণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। হারাণ তখন স্নান করিয়া চুল আঁচড়াইতেছিল, ভদ্রলোক পাঁশনে চশমার ভিতর দিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'আপনিই কাল রাত্রে মোটর চাপা পড়েছিলেন? আমার মেয়ে মিণ্টু গাড়িতে ছিল, তারই মুখে শুনলুম। আমার নাম শ্রীহেমেন্দ্র নাথ ভট্ট!'

ঘরে একটি মাত্র চেয়ার ছিল, হারাণ তাড়াতাড়ি তাহা অগ্রসর করিয়া দিল। হেমেন্দ্রবাবু তাহাতে উপবেশন করিয়া কার্ডকেস হইতে কার্ড বাহির করিয়া হারাণের হাতে দিয়া বলিলেন, 'আমাকে বোধ হয় আপনি চেনেন না।' তাঁহার কণ্ঠস্বরে একটু কৃপার আভাস পাওয়া গেল।

হারাণ কার্ড পড়িয়া দেখিল, হেমেন্দ্রবাবু বড় কেও-কেটা নন, হাইকোর্টের এক-জন মস্ত চাকরে; বোধ হয় দুই-আড়াই হাজার টাকা মাহিনা পান। হারাণ কার্ডখানি সসম্ভ্রমে হাতে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হেমেন্দ্রবাবু গম্ভীর মুখে বলিলেন, 'কালকের ঘটনা যে রকম শুনলুম, তাতে আপনারই দোষ দেখা যাচ্ছে।'

হারাণের বুক ঢিব-ঢিব করিয়া উঠিল। যে দোষী তাহারই দণ্ড হইয়া থাকে, হেমেন্দ্রবাবু হাইকোর্টের মস্ত বড় লোক, তবে কি তিনি হারাণের দণ্ডবিধানের জন্যই আসিয়াছেন?

হেমেন্দ্রবাবু পুনশ্চ বলিলেন, 'এ রকম বেপরোয়াভাবে পথচলা উচিত নয়, সকলেরই সিভিক-ডিউটি আছে। (হারাণ স্পন্দিত-বক্ষে ভাবিল—সিভিক-ডিউটি কাহাকে বলে?) ভবিষ্যতে সাবধান হয়ে পথ চলবেন।'

হারাণ ক্ষীণস্বরে বলিল, 'যে আজ্ঞে।'

হারাণকে পুরোদস্তুর ভয় পাওয়াইয়া হেমেন্দ্রবাবু ঈষৎ সদয়কণ্ঠে বলিলেন, 'যা হোক, আপনার যে আঘাত লাগেনি এই যথেষ্ট। আমার মেয়ে মিণ্টু একটু চিন্তিত হয়েছিল, সেই আমাকে আপনার খোঁজ-খবর নিতে পাঠালে। আপনার নামটি কি?'

বাষ্পরুদ্ধ-স্বরে হারাণ বলিল, 'শ্রীহারাণচন্দ্র লাহিড়ী।'

হেমেন্দ্রবাবু গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "কোর্টে যাব বলে তৈরি হয়ে বেরিয়েছি, on the way আপনাকে দেখে গেলুম।' তারপর লৌকিক শিষ্টাচার অনুযায়ী বলিলেন, 'আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভারি খুশী হলাম,—আমার বাড়িতে যদি কখনও যান, আরও খুশী হব।' বলিয়া আঙুল তুলিয়া অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

তারপর কি হইল? এইখানেই তো এ ব্যাপার শেষ হইবার কথা। গরুর গাড়ির চাকার সহিত দৈবক্রমে পুষ্পক-রথের মার্ড্-গার্ডের ছোঁয়াছুঁয়ি হইয়াছিল, তাহাতে গরুর গাড়ির তো জখম হইবার কথা নহে। অথচ—

ফিল্-আপ্-দি-ব্ল্যাঙ্কস্ নামক যে ধাঁধার সৃষ্টি করিয়া পরীক্ষকবৃন্দ ছাত্রদের ঠকাইয়া থাকেন, সেইরূপ একটি ধাঁধার অবতারণা এখানে করা দরকার। কারণ হারাণের ন্যায় লোকের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করার মত ক্লান্তিকর কাজ আর নাই। মৌখিক শিষ্টাচার ও আন্তরিক নিমন্ত্রণে কি তফাৎ তাহা হারাণ বুঝিত না; অবশ্য অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিও যে সব সময় ধরিতে পারেন না, এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে। ধমক দিয়া ফরিয়াদীকে আসামী করা যায়, এ তত্ত্বও সকলের সুবিদিত নহে। তাহার উপর, যে নব-যুবতীটির নাম মিণ্টু সে হারাণের জন্য চিন্তিত হইয়াছিল, ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে। এক দিকে সঙ্কোচ-জড়তা—inferiority complex, অপর দিকে দুর্নিবার্য্য বাসনা, এই দুই পক্ষে দেব-দানবের দড়ি টানাটানি;—এক কথায় হারাণের মনস্তত্ত্বরূপ নীরস সমস্যার পাদপূরণের ভার পাঠকের হস্তে অর্পণ করিয়া আমরা পুরা এক সপ্তাহ কাটাইয়া দিলাম।

এক সপ্তাহ পরে একদিন বৈকালে হারাণ গুটি গুটি হেমেন্দ্রবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হইল। বুকের ধড়ফড়ানি চাপিয়া দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবু কোথায়?'

দারোয়ান অফিস-ঘর দেখাইয়া দিল। হারাণের ইচ্ছা হইল, এখান হইতেই পলায়ন করে; আর পা উঠিতেছিল না। তবু সে জোর করিয়া অফিস-রুমে ঢুকিয়া হেমেন্দ্রবাবুকে একটা নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল।

হেমেন্দ্রবাবু চিনিতে না পারিয়া ঈষৎ ভ্রূকুটি করিলেন; প্রথমটা ভাবিলেন, তাঁহার অফিসের কোনও ছোকরা কেরানী, হয়তো কোনও বিপদে পড়িয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছে। তারপর হঠাৎ চিনিতে পারিয়া বলিলেন, 'ও! You are the young man whom—, মনে পড়েছে। তারপর খবর কি? বসুন।'

হেমেন্দ্রবাবু একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। মিণ্টুর অবৈধ গাড়ি চালানোর ফলে যে ক্ষুদ্র ঘটনার উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে মিটিয়া গিয়াছে মনে করিয়া তাহার হিসাব তিনি মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছিলেন। এখন হারাণকে পুনরায় আবির্ভূত হইতে দেখিয়া তিনি ভাবিলেন,—'আবার কি হল?'

হারাণ উপবিষ্ট হইলে দু'একটা সাধারণ কথার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি খবর বলুন তো? আমার সঙ্গে কি কোনও দরকার আছে?'

একটা কোনও দরকারের কথা আবিষ্কার করিতে পারিলে বোধ করি হারাণ বাঁচিয়া যাইত; সে সঙ্কুচিত হইয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, 'না—আমি এমনি দেখা করতে এসেছি।'

'Social call! ও—তা বেশ বেশ',—মুখে উৎফুল্লতার ভাব আনিয়া হেমেন্দ্রবাবু স্বিধাভরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, 'আসুন, ড্রয়িংরুমে গিয়া বসা যাক।' বলিয়া

পাশের দরজা দিয়া হারাণকে একটি চমৎকার সুসজ্জিত কক্ষে লইয়া গেলেন।

ড্রয়িংরুমে মিণ্টু বাহিরে যাইবার জন্য সাজিয়া-গুজিয়া বসিয়াছিল, হেমেন্দ্রবাবু কন্যাকে সম্বোধন করিয়া একটু অস্বাচ্ছন্দ্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন, 'মিণ্টু, দেখ তো এ'কে চিনতে পার কি না?' আসলে হারাণের নামটা তিনি কিছুতেই স্মরণ করিতে পারিতেছিলেন না।

পিতার চেয়ে মিণ্টুর স্মরণশক্তি বেশী, সে তাহার সহাস্য চোখ দুটি তুলিয়া বলিল, 'চিনেছি বৈ কি, উনি তো হারাণবাবু!'

হারাণ একটা অনভ্যস্ত আড়ষ্ট নমস্কার করিল। সকলে উপবিষ্ট হইলেন। শিক্ষা ও আবহাওয়ার গুণে মিণ্টু বাহিরে একটু চপল ও তরলস্বভাব হইয়া পড়িলেও তাহার মনের ভিত্তিটা সরল ও সাদাসিধাই রহিয়া গিয়াছিল। আলোর সমুদ্রে সে মনের সুখে সাঁতার কাটিতেছিল, নিম্নের অতলে যে সব দংষ্ট্রাকরাল ক্ষুধিত জীব ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় তখনও হয় নাই। সে ভারি সুন্দরী, সবেমাত্র আঠারোয় পা দিয়াছে; রূপ, যৌবন, শিক্ষা, মিষ্ট স্বভাব, ধনী বাপ ইত্যাদি নানা কারণে মিলিয়া সে উচ্চ সমাজের মধ্যে পরম লোভনীয় belle-এর আসনে অধিষ্ঠিত হইবার উপক্রম করিতেছিল।

হারাণের সঙ্গে সে বেশ সহজ সহৃদয়তার সঙ্গেই কথা আরম্ভ করিল, কিন্তু হারাণ এমনি মূক বধির প্রাণীর মত বসিয়া রহিল যে, শেষ পর্যন্ত তাহাকে থামিয়া যাইতে হইল। হারাণ অনেক চেষ্টা করিয়াও না পারিল ভাল করিয়া মিণ্টুর মুখের পানে চাহিতে, না পারিল গুছাইয়া দুটা কথা বলিতে। হাঁ—না—এই একাক্ষর শব্দ দুটা ছাড়া তাহার মুখ দিয়া আর বিশেষ কিছু বাহির হইল না। অথচ গত সাত দিন ধরিয়া সে কতই না সংকল্প করিয়াছিল।

মিনিট পনের পরে হেমেন্দ্রবাবু আলস্যভরে একটা হাই চাপিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই হারাণও চমকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'আমি তা হলে আজ—'

মিণ্টুও উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্মিতমুখে বলিল, 'চললেন? আচ্ছা, আবার আসবেন।'

হারাণ ঘাড় নাড়িয়া একটা নমস্কার করিয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সে চলিয়া যাইবার পর পিতা ও কন্যা কিছুক্ষণ পরস্পর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর হেমেন্দ্রবাবু মুখের একটা ভঙ্গী করিয়া বিরসকণ্ঠে বলিলেন, 'Poor fellow! He was out of his depth here. I wonder why he came.'

মিণ্টু হাসিয়া বলিল, 'জড়ভরত গোছের লোক—না? এই জন্যেই বোধ হয় সেদিন মোটর চাপা পড়েছিল।'

হেমেন্দ্রবাবু বলিলেন, 'বুদ্ধি-সুদ্ধি বিশেষ আছে বলে তো বোধ হয় না। বললে বি. এ. পড়ে; পড়ে হয়তো! কিন্তু কি যে পড়ে তা ভগবানই জানেন।' বলিয়া উদাস-ভাবে হাতটা উল্টাইলেন।

মিণ্টু কব্জির ঘড়ি দেখিয়া বলিল, 'বাবা, আমি চললুম, আমার already দেরি হয়ে গেছে। ছটার আগে মিসেস সিনহার বাড়িতে পৌঁছুবার কথা।'

হেমেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'একলা যাচ্ছ? তোমার মা যাবেন না?'

'মার মাথাটা ধরেছে, তিনি যেতে পারবেন না।' সকৌতুকে ভ্রূ তুলিয়া কহিল, 'আমার কি আবার স্যাপেরোণ দরকার না কি? বাবা, তুমি দিন দিন একদম সেকেলে হয়ে যাচ্ছ।'

হেমেন্দ্রবাবু কন্যার চেহারাখানি একবার আগাগোড়া নিরীক্ষণ করিয়া একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, 'আচ্ছা যাও, কিন্তু নিজে ড্রাইভ্ করো না যেন। একে তোমার লাইসেন্স নেই, তার ওপর আবার কোন্ হারাণকে চাপা দিয়ে বসে থাকবে।'

মিণ্টু হাসিয়া বলিল, 'ভয় নেই, একটি হারাণকে চাপা দিয়েই আমার শিক্ষা হয়ে গেছে।'

ওদিকে বুদ্ধিহীন এবং জড়ভরত হারাণের অবস্থা আরও কাহিল হইয়া পড়িয়াছিল। মিণ্টুকে সে মুখ তুলিয়া দেখে নাই বটে, কিন্তু দু' একবার আড়চোখে যতটুকু দেখিয়াছিল তাহাতেই তাহার সর্বনাশ সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। প্রবল স্রোতের টানে অপটু সন্তরণকারী যেমন কখনও ভাসিতে ভাসিতে, কখনও ডুবিতে ডুবিতে বহিয়া যায়, সেও তেমনই অসহায়ভাবে ভাসিয়া চলিল। এক্‌ল ওকূল কোনও কূলেই যে সে কোনও দিন উঠিতে পারিবে এমন আশা রহিল না।

হারাণ হেমেন্দ্রবাবুর বাড়ি রীতিমত যাতায়াত আরম্ভ করিল; কোনও হপ্তায় দু' বারও যাইতে লাগিল। কিন্তু তবু তার মুখে ভাল করিয়া কথা ফুটিল না। সে মুগ্ধের মত—মূঢ়ের মত ড্রয়িংরুমে বসিয়া থাকিত; মিণ্টুর হাসি-কথা শুনিত। যখন অন্য লোক কেহ থাকিত তখন সে দ্বিগুণ অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিত, সুবিধা পাইলে পলাইয়া আসিত। তাহাকে লইয়া অন্য সকলের মধ্যে যে নেপথ্যে মুচ্‌কি হাসি ও চোখ-টেপাটিপি চলিত তাহা দেখিবার মত চক্ষু তাহার ছিল না। বস্তুতঃ এই একান্ত অপরিচিত সমাজের লোকেরা তাহাকে কি চক্ষে দেখে, তাহা সে কোন দিন ভাবিয়া দেখে নাই, বুঝিতেও পারে নাই।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সে মাঝে মাঝে ঈর্ষার তীক্ষ্ন সূচীবেধ অনুভব করিত। কোনও যুবক—হেমেন্দ্রবাবুর বাড়িতে যুবকদের গতায়াত সম্প্রতি খুব বাড়িয়া গিয়াছিল—মিণ্টুর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে হাসি-গল্প করিতেছে দেখিলেই তাহার গায়ে কাঁটার মত ফুটিত। কিন্তু বদনমণ্ডল যাহার ভাব-লেশহীন ও মুখে যাহার কথা নাই, তাহার মনোভাব কে বুঝিবে? তবু কেহ কেহ যেন আন্দাজ করিয়াছিল।

একদিন হারাণ উঠিয়া যাইবার পর মিণ্টুর মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হ্যাঁরে, ও ছেলেটা কি জন্যে আসে বল তো? কথাও কয় না, কেবল জড়সড় হয়ে বসে থাকে—কি চায় ও?'

মিণ্টু হাসিতে লাগিল, ইংরাজীতে যাহাকে gigle বলে সেই ধরণের হাসি; শেষে বলিল, 'জানি না।'

সেই দিনই দৈবক্রমে হারাণের সহিত একজন পরিচিত ব্যক্তির সাক্ষাৎ হইয়া গেল। হারাণ হেমেন্দ্রবাবুর বাড়ি হইতে বাহির হইয়া ফুটপাথে পড়িয়াছে, এমন সময় পিছন হইতে কে ডাকিল, 'আরে! কে ও, হারাণ না কি?'

হারাণ পিছু ফিরিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল, 'খগেন!'

খগেন গোয়ালন্দের স্কুলে সহপাঠী ছিল। খগেনের মত সুন্দর চেহারা বাঙ্গালীর মধ্যে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। সাহেবদের মত টকটকে রঙ, একহারা লম্বা চেহারা, মুখখানা যেন গ্রীক শিল্পী বাটালি দিয়া কুঁদিয়া বাহির করিয়াছে; মাথায় ঘন কোঁকড়ানো চুল, চোখের মণির মধ্যে যেন আগুন প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। ঠোঁট দুটি পাকা বিম্বফলের মত লাল।

কিন্তু তবু তাহার চেহারার মধ্যে এমন কিছু ছিল—যাহা মানুষকে আকর্ষণ না করিয়া দূরে ঠেলিয়া দিত। বোধ হয়, তাহার চোখের দৃষ্টি ও অধরের ভঙ্গিমায় এমন একটা নির্মম বুদ্ধি ও আত্মপ্রধান নিষ্ঠুরতা ফুটিয়া উঠিত যে, লোক সঙ্কোচে তাহাকে পাশ কাটাইয়া যাইত। হারাণের সঙ্গেও তাহার বন্ধুত্ব ছিল না, কেবল পরিচয় ছিল। খগেন

বড়লোকের ছেলে, সে হারাণকে চিরদিনই নিরতিশয় অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিত। তা ছাড়া, চরিত্রগত প্রভেদও এমনই দুর্লঙ্ঘ্য ছিল যে প্রীতির ভাব জন্মিবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। স্কুলে পাঠকালেই খগেন একটি মাস্টারের কন্যাকে লইয়া যে কাণ্ড করিয়াছিল—নেহাৎ বড়মানুষের টাকার জোরেই ব্যাপারটা চাপা পড়িয়া গেল, অন্যথা একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারী হইয়া যাইত।

স্কুলের পড়া শেষ করিয়া দু'জনেই কলিকাতায় আসিয়াছিল, এ কয় বছরে দুই তিনবার পথে ঘাটে দেখাও হইয়াছিল; কিন্তু খগেন যে হারাণকে চেনে, ইতিপূর্বে একবার ঘাড় নাড়িয়াও তাহা স্বীকার করে নাই।

খগেন এখন হারাণের দিকে সহাস্যে অগ্রসর হইয়া বলিল, 'কি হে, ব্যাপার কি? আজকাল খুব high circle-এ move করছ দেখছি।' বলিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উল্টাইয়া হেমেন্দ্রবাবুর বাড়ির দিকে নির্দেশ করিল।

হারাণ এই অযাচিত সহৃদয়তায় কিছুকাল বিস্মিত হইয়া থাকিয়া বলিল, 'না—হ্যাঁ, ওঁদের সঙ্গে পরিচয় আছে—'

'তা তো বুঝতেই পারছি। Lucky old dog!' বলিয়া খগেন মুরুব্বীর মত তাহার পিঠ ঠুকিয়া দিল।

দু'জনে আবার চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, হারাণ একটু শঙ্কিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি ওদের চেন না কি?'

খগেন বলিল, 'পরিচয় নেই, তবে মুখ চিনি। হেমেন্দ্রবাবু is one of the leaders of enlightened society, বলতে গেলে নব্য সমাজের মাথা। আর তাঁর মেয়ে মিন্টু, she is a peach.'

হারাণের মুখখানা উত্তপ্ত হইয়া উঠিল; খগেন তাহার দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়া কথা ফিরাইয়া বলিল, 'তারপর, তুমি আছ কোথায়? প্রায়ই মনে করি তোমার সঙ্গে দেখা করব, কিন্তু ঠিকানা জানি না বলে হয়ে ওঠে না। আমি এই কাছেই ভবানীপুরের দিকে থাকি। চল না, বাসাটা ঘুরে আসবে।'

হারাণ বলিল, 'না, আজ থাক। কোথায় যাচ্ছ?'

'আমি সিনেমায় যাচ্ছিলুম, কিন্তু বিশেষ কোনও আগ্রহ নেই; just to kill time. কলকাতায় এসে বন্ধুবান্ধব বড় একটা জোটেনি—যারা জুটেছিল তারা, you know the sort, পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙে ফুর্তি চালাতে চায়। I have choked them off.—তাই একলা পড়ে গেছি। তা চল না, একসঙ্গে সিনেমাই দেখা যাক; বেশ ভাল জিনিস, Fox Production.'

হারাণ অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, 'না ভাই, আমি এখন বাসায় ফিরি। একটু কাজ আছে—'

খগেন পীড়াপীড়ি না করিয়া বলিল,'Right O! business first, কিন্তু তোমার ঠিকানা তো বললে না।'

হারাণ ঠিকানা দিল। তখন খগেন সহাস্য-মুখে 'টা-টা' বলিয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে অলস-পদে ভিন্ন পথে প্রস্থান করিল।

দিন দুই পরে খগেন হারাণের বাসায় গিয়া দেখা দিল। বিকালবেলা হারাণ কলেজ হইতে ফিরিয়া স্টোভে চা তৈয়ার করিতেছিল, চার পয়সার জলখাবার ঠোঙ্গায় করিয়া টেবিলের উপর রাখা ছিল, খগেনকে দেখিয়া সে তটস্থ হইয়া উঠিল। খগেন ঘরে ঢুকিয়া একবার ঘরের চারিদিকে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিল; নিরাভরণ ঘর, একটা তক্তপোষ, একটা কাঠের আসনযুক্ত চেয়ার ও একখানা কেরোসিন-কাঠের টেবিল—ইহাই ঘরের আসবাব।

ঘরের এক কোণে দুই দেওয়ালে দড়ি টান করিয়া কাপড়-চোপড় রাখবার ব্যবস্থা। বইগুলি টেবিলের উপরেই থাক করিয়া সাজানো; তক্তপোষের নীচে কাদা-মাখা জুতা যেন লজ্জিতভাবে আশ্রয় লইয়াছে। খগেনের ঠোঁট নিজের অজ্ঞাতসারে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল,—সে সন্তর্পণে চেয়ারে বসিয়া হাতের ছড়িটা টেবিলের উপর রাখিয়া মৃদুহাস্যে বলিল, 'Plain living and high thinking! বেশ বেশ! চা হচ্ছে না কি? আমাকেও এক পেয়ালা দিও।'

হারাণ তাড়াতাড়ি আরও কিছু জলখাবার আনাইল। তারপর দুইজনে কলাই-করা পেয়ালায় চা পান করিল। ঘণ্টাখানেক ধরিয়া খগেন নানা প্রকার গল্প করিতে লাগিল; ত্রুটি-কুণ্ঠিত অস্বচ্ছন্দভাবে হারাণও কথাবার্তা কহিতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহার এই শ্রীহীন দারিদ্র্যের মধ্যে সুবেশ, সুন্দর ও পরিমার্জিত খগেনকে যে নিতান্ত বেমানান্ ঠেকিতেছে, ইহা সে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করিতে লাগিল।

খগেন হঠাৎ এক সময় বলিল, 'কি হে, তোমাকে detain করছি না তো? তোমার কোথাও engagement থাকে তো বল।'

হারাণ অকারণ লজ্জিত হইয়া বলিল, 'না না, আমি তো রোজ ওখানে যাই না—মাঝে মাঝে—'

খগেন বলিল, 'The lady protests too much! [illegible] shy, আমার কাছে অত লুকোচুরি নাই বা করলে! যাবে তো চল—আমিও ঐ দিকেই যাব, এক সঙ্গে যাওয়া যাক।'

একবার একটু প্রলোভন হইলেও ভিতরে ভিতরে হারাণের মনটা বাঁকিয়া বসিল। খগেন যে কিসের জন্য টোপ ফেলিতেছে, তাহা ঠিক ধরিতে না পারিলেও একটা আশঙ্কা তাহাকে সন্দিগ্ধ করিয়া তুলিল, 'না, আজ আর যাব না।'

খগেন হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া—'আচ্ছা, আমি তবে চললুম' বলিয়া একটু যেন বিরক্তভাবে বাহির হইয়া গেল।

খগেনের আসা-যাওয়া কিন্তু বন্ধ হইল না, সে প্রায়ই হারাণের বাসায় আসিতে লাগিল। ভাবে ভঙ্গীতে মাঝে মাঝে ইসারা দিলেও সে যে হারাণের কাছে কি চায়, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে কিন্তু তাহার আত্মসম্মানে বাধা পাইতে লাগিল। সে হেমেন্দ্রবাবুর বাড়ির কথা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিত, মিন্টুর বিষয়ে দু'একটা ঠাট্টা-তামাসাও করিত, কিন্তু হারাণ এমনই নিরেট নির্বোধের মত বসিয়া থাকিত যে কথাটা অগ্রসর হইতে পাইত না। একদিন এই ধরণের কথাবার্তা আরম্ভ হইতেই হারাণ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা খগেন,—কিছু মনে করো না—তোমার আগেকার অভ্যেসগুলো এখনও আছে কি?'

বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া খগেন বলিল, 'আগেকার অভ্যেসগুলো— O—you mean —those!'

খগেন উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল—'My dear boy. তুমি কি মনে কর আমি একটা saint? Young blood must have its way, lad, and every dog his day! তোমার মত কেবল বই পড়ে আর কলেজে গিয়ে যৌবনটা বরবাদ করে ফেলতে তো পারি না।'

হারাণ অস্বস্তিপূর্ণ হৃদয়ে চুপ করিয়া রহিল—আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না; প্রশ্নটা উত্থাপন করিবার সাহস সে কোথা হইতে পাইল তাহাই যেন বুঝিতে পারিল না।

উঠিবার সময় খগেন বলিল, 'ভাল কথা, কাল রাত্রে আমার বাসায় তোমার ডিনারের নেমন্তন্ন রইল। আমি এতবার তোমার বাসায় এলুম আর তুমি একবারও return

visit দিলে না—this is extremely rude of you!'

হারাণ অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, কিন্তু খগেন বলিল, 'সে হবে না, ওজর আপত্তি শুনছি না—বুঝলে?' বলিয়া হারাণকে রাজী করাইয়া প্রস্থান করিল।

পরদিন সন্ধ্যার পর খগেনের ঠিকানায় গিয়া হারাণ দেখিল—চমৎকার ছোট একটি বাসা; নীচে বসিবার ঘর ও ডাইনিং রুম, উপরে শয়নকক্ষ, পড়িবার ঘর ইত্যাদি। খগেন তাচ্ছিল্যভরে সমস্ত দেখাইয়া বলিল, 'সত্তর টাকা এই বাড়িটার জন্যে ভাড়া দিই। কিন্তু বাসাটা আমার পছন্দ নয়। একলা থাকি বটে, তবু যেন কুলোয় না। ভাবছি একটা ভাল বাসায় উঠে যাব।'

বাড়ির সব ঘর দেখাইয়া খগেন হারাণকে নীচের বসিবার ঘরে আনিয়া বসাইল। ঘরটি ছোট, মেঝেয় কার্পেট পাতা, কয়েকটি গদি-মোড়া চেয়ার ইতস্ততঃ সাজানো, মাঝখানে একটি ছোট টিপাইয়ের উপর বিলাতী কাচের ভাসে একগুচ্ছ গোলাপফুল। সিগারের বাক্স বাহির করিয়া খগেন হারাণের সম্মুখে ধরিল, হারাণ নীরবে ঘাড় নাড়িল। খগেন বলিল, 'ও তুমি বুঝি এ-সব খাও না। সিগারেট? তাও না। O dear! তুমি একেবারে পুরোদস্তুর পিউরিটান।' বলিয়া নিজে সাবধানে একটি সিগারেট বাছিয়া লইয়া ধরাইল।

খগেন ইচ্ছা করিলে বেশ চিত্তাকর্ষকভাবে গল্প করিতে পারিত; তাই দেখিতে দেখিতে রাত্রি সাড়ে আটটা বাজিয়া গেল। ভৃত্য আসিয়া খবর দিল, 'খানা তৈয়ার!'

দু'জনে ডাইনিং রুমে উঠিয়া গেল। টেবিলের উপর খানা পরিবেশিত হইয়াছিল, খগেন হাসিয়া বলিল, 'তোমার বোধ হয় ছুরি-কাঁটা চালানো অভ্যেস নেই, তা—হাতই চালাও; এখানে তো আর কেউ নেই।'

খগেনের একতরফা বাক্য-স্রোতের মধ্যে আহার শেষ হইয়া গেল। দু'জনে আবার বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিল।

খগেন ইঙ্গিত করিতেই ভৃত্য একটা বোতল ও দুটি মদের গেলাস আনিয়া সম্মুখে রাখিল। বোতলের ছিপি খোলা হইতেছে দেখিয়া হারাণ ভীতভাবে বলিল, 'ও কি?'

খগেন হাসিয়া উত্তর করিল, 'ভারমুথ। নাও—খাও।' বলিয়া একটা গেলাস আগাইয়া দিল।

হারাণ সভয়ে হাত নাড়িয়া বলিল, 'আমি মদ খাই না।'

খগেন বলিল, 'আরে, খাও একটু for old times sake! Liquor নয়, সরবৎ, নেশা হবে না।'

'না না, আমি ও-সব খাব না।'

খগেন মুখ বাঁকাইয়া হাসিয়া বলিল, 'তুমি চিরকালই একটা—ইয়ে রয়ে গেলে। ভদ্রসমাজে মিশছো—এ-সব খেতে শেখো। আচ্ছা, এমনি না খাও, তোমার—কি বলে —মিণ্টুর health drink কর। Here is to the sweetest loveliest' —বলিতে বলিতে গেলাস ঊর্ধ্বে তুলিল।

হারাণ ধড়মড় করিয়া চেয়ার ঠেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, অর্ধ-রুদ্ধ স্বরে বলিল, 'আমি চললুম—'

'আরে বোসো। আচ্ছা, না হয় খেও না। আমি একাই খাচ্ছি।'

গেলাস নিঃশেষ করিয়া একটা টার্কিশ সিগারেট ধরাইয়া খগেন বলিল, 'বোসোই না ছাই—একেবারে দাঁড়িয়ে উঠলে যে! তোমার সঙ্গে দুটো কাজের কথা আছে।'

হারাণ দাঁড়াইয়া রহিল, বলিল, 'কি কথা, বল, আমি শুনছি।'

খগেন খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, কথাটা বলিতে তাহার দারুণ অপমান বোধ

হইতেছিল। শেষে সিগারেটের ছাই ঝাড়িতে ঝাড়িতে গলার সুরটা খুব হাল্‌কা করিয়া বলিল, 'তোমার বন্ধু হেমেন্দ্রবাবুর পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দাও না। কলকাতায় আছি, অথচ নিজের ক্লাশের লোকের সঙ্গে আলাপ হল না; বুঝতেই তো পারছ—সময় কাটাবার অসুবিধা হয়—'

অস্বাভাবিক তীব্র কণ্ঠে হারাণ বলিয়া উঠিল, 'ও-সব হবে না। আমি পারব না।'

একটা ভ্রূ ঈষৎ তুলিয়া খগেন বলিল, 'পারবে না? কেন?'

কোণ-ঠাসা বিড়াল যেমন নখ বাহির করিয়া ফোঁস করিয়া উঠে, হারাণ তেমনই ভাবে বলিয়া উঠিল, 'তুমি একটা লম্পট, জঘন্য চরিত্রের লোক—তোমার মতলব কি আমি বুঝিনি? তোমার মত লোককে তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার চেয়ে—' কথার অভাবে হারাণ চুপ করিল।

খগেনের মুখের উপর দিয়া একটা কুটিল বিদ্রূপের ছায়া খেলিয়া গেল, কিন্তু গলার আওয়াজ চড়িল না। অনুচ্চ গরল-ভরা সুরে হাসিয়া সে বলিল, 'you fool! you abysmal fool! তুই ভেবেছিস তোর গলায় মিণ্টু মালা দেবে—না? আমি গিয়ে তোর মুখের গ্রাস কেড়ে নেব—এই তোর ভয়! তোর মত গাধা দুনিয়ায় নেই। তোকে তারা কি চোখে দেখে জানিস? একটা ঘোড়ার সহিসকে তারা তোর চেয়ে বেশী খাতির করে। তোকে নিয়ে তারা সঙ সাজিয়ে বাঁদর-নাচ নাচায়, তা বোঝবারও তোর ক্ষমতা নেই। অসভ্য uncultured চাষা কোথাকার!'

হারাণ আর সেখানে দাঁড়াইল না—একবার তাহার ইচ্ছা হইল খগেনের মুখখানা দেওয়ালে ঠুকিয়া থে'তো করিয়া দেয়; কিন্তু তাহা না করিয়া সে কশাহত ঘোড়ার মত ছুটিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল। খগেনের শ্লেষবিষাক্ত হাসি ফুটপাথ পর্যন্ত তাহার অনুসরণ করিল।

বাসায় ফিরিয়া হারাণ অনেকটা সুস্থ বোধ করিতে লাগিল। খগেনের সঙ্গে মাখামাখির পালা যে এমনভাবে শেষ হইবে ইহা সে প্রত্যাশা করে নাই। বস্তুতঃ, অনীপ্সিত সহৃদয়তার জাল হইতে মুক্তিলাভ করিবার উপায় তাহার জানা ছিল না, তাই খগেনের এই জোর-করা বন্ধুত্ব তাহাকে ভিতরে ভিতরে পীড়িত করিয়া তুলিলেও পরিত্রাণ পাইবার পথ সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। আজ নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে এই অযাচিত বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া সে খুশী হইয়া উঠিল। খগেনের মত লোকের বাড়িতে বসিয়া তাহার মুখের উপর কড়া কথা শুনাইয়া দিবার ক্ষমতা যে তাহার আছে ইহাতে তাহার আত্মবিশ্বাস অনেকটা বাড়িয়া গেল।

কিন্তু তবু খগেনের বিষ-তিক্ত কথাগুলিও তাহার কানে লাগিয়া রহিল—You abysmal fool! তোকে নিয়ে তারা সঙ সাজিয়ে বাঁদর নাচায়—অসভ্য uncultured চাষা—

ইতিমধ্যে সে যথারীতি হেমেন্দ্রবাবুর বাড়ি যাতায়াত করিতেছিল; অনেকটা অভ্যাসও হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই ঘটনার পর যেদিন সে হেমেন্দ্রবাবুর দ্বারে উপস্থিত হইল সেদিন তাহার সেই প্রথম দিনের সঙ্কুচিত জড়তা ফিরিয়া আসিল। কেবলই মনে হইতে লাগিল,—'সত্যিই কি ওরা আমাকে—'

কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়া সে অনেকটা আশ্বস্ত হইল—কাহারও ব্যবহারে অবজ্ঞা বা অবহেলার লক্ষণ দেখিতে পাইল না; মিণ্টু স্বাভাবিক সরস হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিল; এমন কি মিণ্টুর মা তাহার সাংসারিক অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। হারাণ তৃপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসিল।

এইভাবে আরও দুই হপ্তা কাটিয়া গেল। তার পর একদিন আত্মবিস্মৃত আলোর-

নেশায়-মাতাল হারাণ ল্যাম্পপোস্টে মাথা ঠুকিয়া পরিপূর্ণ চেতনা ফিরিয়া পাইল।

সে দিনটা শনিবার ছিল। কলেজ হইতে সকাল-সকাল ফিরিয়া হারাণ একটু বিশেষ সাজগোজ করিয়া লইল। পাঁচ সিকা দিয়া একজোড়া রবার-সোল্ টেনিস্ সু কিনিয়াছিল, তাহাই পরিয়া পাঞ্জাবির বাহার দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। পূজার ছুটির আর দেরি নাই, শীঘ্রই বাড়ি যাইতে হইবে, অতএব—

হেমেন্দ্রবাবুর বাড়িতে যখন পৌঁছিল তখনও চারটে বাজে নাই। ড্রয়িংরুমের নিকটবর্তী হইতেই, অনেকগুলি যুবতী-কণ্ঠের হাসির ঢেউ তাহার কানে আসিয়া লাগিল। ভিতরে বহু সখী মিলিয়া একটা ভারি কৌতুককর আলোচনা চলিতেছে— সঙ্কোচে হারাণের পা আপনিই থামিয়া গেল।

ঘরের মধ্যে হাসি মিলাইয়া গেলে একটি কণ্ঠস্বর শুনা গেল, ...'তুই এত নকল করতেও পারিস! এমন অদ্ভুত জীবটি কোত্থেকে জোগাড় করলি, ভাই?'

আর একটি কণ্ঠস্বর,—'আমাদের একদিন দেখা না, মিণ্টু!'

হঠাৎ ঘরের ভিতর হইতে নিজের কণ্ঠস্বর শুনিয়া হারাণ চমকিয়া উঠিল,— 'আজকেই আপনারা—অ্যাঁ—তাঁর দেখা পাবেন, তিনি এই এলেন বলে! আজ শনিবার তো—ঠিক পাঁচটার সময় উদয় হবেন। তার নাম—হ্যাঁ—কি বলে—হারাণচন্দ্র—'

কি আশ্চর্য! তাহার জড়তাপূর্ণ দ্বিধা-বিঘ্নিত কথা বলিবার ভঙ্গীটি পর্যন্ত অবিকল নকল হইয়াছে!

আবার এক-পশলা সুমিষ্ট হাসির বৃষ্টি হইয়া গেল। হারাণ স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল।

'মিণ্টু, কোত্থেকে এমন চীজ আবিষ্কার করলি, বল্?'

মিণ্টুর স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর শুনা গেল,—'আবিষ্কার করিনি, ভাই, আপনি এসে জুটেছে। দোষের মধ্যে একদিন ওকে মোটর চাপা দিয়েছিলুম—সেই থেকে আসতে শুরু করেছে। কিছু বলাও যায় না!'

একজন টিপ্পনী কাটিয়া বলিল, 'বুকের ওপর দিয়ে চাকা চালিয়ে দিয়েছিলি বুঝি?'

আর একজন সরু গলায় বলিল, 'তুই encourage করিস কেন? একদিন একটু শক্ত হলেই আর আসে না। ও-সব uncultured লোকগুলোকে আমল দেওয়াই উচিত নয়।'

মিণ্টু বলিল, 'সে ভাই আমি পারি না। আর, লোকটি এমন helpless কাঠের পুতুলের মত বসে থাকে যে কিছু বলতে মায়া হয়।'

একজন হাসি-হাসি গলায় বলিল, 'ও নিশ্চয় তোর লভে পড়েছে। মন্দ হয়নি—— beauty and the beast.'

আর একটি পরিহাস চপল কণ্ঠ বলিল, 'দেখিস মিণ্টু, তুই যেন উল্টে ওর প্রেমে পড়ে যাসনি। তা হলেই বিপদ!'

হাসির উচ্ছ্বাস থামিলে মিণ্টু বলিল, 'এবার চুপ কর ভাই, হয়তো এক্ষুনি—'

পা টিপিয়া টিপিয়া চোরের মত হারাণ ফিরিয়া আসিল, পাছে কেহ তাহাকে দেখিয়া ফেলে, এই ভয় তাহার অন্তরের অপরিসীম গ্লানিকেও যেন ঢাকিয়া দিল।

ফুটপাথে নামিয়া সে ঊর্ধ্বশ্বাসে একদিকে ছুটিয়া চলিল। চোখের সম্মুখে একটা রক্তাভ কুজ্ঝটিকা জাল পাকাইতেছিল,—তাহার ভিতর দিয়া সমস্ত পৃথিবীটাই ঘোলাটে বোধ হইতেছিল। কিন্তু পৃথিবীর দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না,—তাহার বুকের মধ্যে যে কালকূট ফেনাইয়া উঠিতেছিল, তাহাই কাহারও উপর উদ্‌গিরণ করিবার জন্য

তাহার অন্তরাত্মা সাপের মত ফণা বিস্তার করিয়া গর্জন করিতেছিল।

সে কোন্ দিকে চলিয়াছিল তাহারও ঠিকানা ছিল না, কতক্ষণ এইভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহাও খেয়াল ছিল না। স্থান-কালের ধারণা তাহার মন হইতে মুছিয়া গিয়াছিল; হঠাৎ একজনের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়া তাহার বাহ্য চেতনা ফিরিয়া আসিল। ক্রুদ্ধ আরক্ত নেত্রে তাহার দিকে ফিরিতেই দেখিল—খগেন!

কিছুক্ষণ দু'জনে পরস্পরের পানে চাহিয়া রহিল। তারপর হারাণ হাসিয়া উঠিল—বিকৃত কণ্ঠের বিষ-জর্জরিত হাসি! খগেনের সুবেশ মূর্তিটা আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'খগেনবাবু! কোন্ দিকে চলেছেন?'

খগেন উত্তর দিল না, ভ্রূ তুলিয়া চাহিল! হারাণ তখন তিক্তস্বরে বলিয়া উঠিল, 'তুমি ওদের সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিলে না? করবে আলাপ? ঠিক রাজযোটক হবে। এস।' বলিয়া খগেনের সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া তাহার একটা বাহু ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

হেমেন্দ্রবাবুর ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিয়া হারাণ দেখিল, সম্মুখেই সখীপরিবৃতা মিণ্টু! কোনও দিকে না তাকাইয়া সে মিণ্টুর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, খগেনের প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া কহিল, 'ইনি আমার বন্ধু বাবু খগেন্দ্রনাথ—খুব বড়মানুষের ছেলে, অতিশয় পরিমার্জিত, এ'র সঙ্গে আলাপ করুন।—খগেন, ইনি মিণ্টু দেবী। Good luck!—আচ্ছা, চললুম!' বলিয়া যেন একটা দুর্দমনীয় হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতে করিতে ঝড়ের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কাহিনীটা এইখানেই শেষ করিতে পারিলে ভাল হইত,—পাঠক দীর্ঘ গল্প-পাঠের শ্রান্তি হইতে মুক্তিলাভ করিতেন, এই হতভাগ্য লেখকও অপ্রিয় সত্যভাষণের প্রয়োজন হইতে নিষ্কৃতি পাইত। কিন্তু শেষ করিতে চাহিলেই কথা শেষ হয় না, নিজের গতির বেগে নূতন কথার সৃষ্টি করিয়া চলে। ব্রেক্ কষিতে কষিতে ধাবমান ট্রেণ ভাঙ্গা পুলের মাঝখানে আসিয়া পড়ে।

যা হোক, আর বাজে কথা নয়; দ্রুতবেগে কাহিনীটা শেষ করিয়া ফেলি।

তিন মাস কাটিয়া গেল। হারাণ শামুকের মত দু'দিনের জন্য মুণ্ড বাহির করিয়াছিল, আবার খোলের মধ্যে মুণ্ড ঢুকাইয়া লইয়াছে। তাহার মুখখানা আরও কৃশ ও সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে; সে-মুখ ভাবপ্রকাশের উপযোগী কোনকালেই ছিল না, তাই ক্ষণিক আলোক-অভিসারের কোনও চিহ্নই সেখানে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সে দিন, অগ্রহায়ণের গোড়ার দিকে বেশ শীত পড়িয়াছিল, সন্ধ্যার পূর্বে হারাণ গায়ে একটা র‍্যাপার জড়াইয়া কলেজ স্কোয়ারের সম্মুখের রাস্তা দিয়া চলিয়াছিল। একখানা খোলা মোটর ঠিক তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল; মোটরখানা এত নিকট দিয়া গেল যে হারাণ ইচ্ছা করিলে তাহাতে উপবিষ্ট যুবতীকে হাত বাড়াইয়া স্পর্শ করিতে পারিত।

কিন্তু যুবতী তাহাকে দেখিতে পাইল না—তাহার চক্ষু সম্মুখের শূন্যের পানে তাকাইয়া ছিল। চক্ষু যখন দৃশ্য বস্তুকে দেখে না অথচ উন্মীলিত হইয়া থাকে—এ সেই দৃষ্টি। ঠোঁটের কোণ দুটি একটু চাপা—যেন নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। একটু শুষ্ক ক্লান্ত ভাব—অনবদ্য সুন্দর মুখের ডোলটি যেন ঈষৎ শীর্ণ। হারাণ সে দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতে লইতে মোটরও মৃদুমন্দ গতিতে বাহির হইয়া গেল। কলেজ স্কোয়ারে পঁচিশ বার দ্রুতপদে চক্র দিয়া হারাণ বাহির হইল। পকেটে কয়েকটা পয়সা ছিল, সে ভবানীপুরের বাসে চাপিয়া বসিল।

খগেন বাড়িতেই ছিল, হারাণকে দেখিয়া সবিস্ময়ে দীর্ঘ শিস্ দিয়া বলিয়া উঠিল,

'Hullo! হারাণ যে!'

হারাণ ঘরে গিয়া বসিল, কিছুক্ষণ ঘাড় গুঁজিয়া চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ জ্বলন্ত চক্ষু তুলিয়া বলিল, 'তুমি মিণ্টুকে এ কি করেছ?'

খগেন ভ্রূর একটি বিদ্রুপপূর্ণ ভঙ্গী করিয়া বলিল, 'কি করেছি?'

'তুমি—তুমি তাকে—' হারাণ কথাটা শেষ করিতে পারিল না। কি বলিবে? কেমন করিয়া উচ্চরণ করিবে?

খগেন একটা চুরুট ধরাইয়া বলিল, 'যদি কিছু বলতে চাও, স্পষ্ট করে বল। আমার সময় নেই, এখনই একটা পার্টিতে যেতে হবে।'

হারাণ সহসা ভাঙিয়া পড়িয়া বলিল, 'খগেন, একটি বালিকার জীবন নষ্ট করে দিলে?'

খগেন বলিল, 'My dear fellow, don't be melodramatic. Please, I can't stand it! অবশ্য মিণ্টুর সঙ্গে আমার ভাব হয়েছিল, যত দূর ভাব হতে পাবে হয়েছিল। সেজন্যে তোমাকেই আমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। কিন্তু সে সব এখন শেষ হয়ে গেছে। মিণ্টুর সঙ্গে এখন আর আমার কোন সম্বন্ধই নেই। Social-এ পার্টিতে মাঝে মাঝে দেখা হয়, কিন্তু আমরা যতদূর সম্ভব পরস্পরকে এড়িয়ে চলি। That aflair is closed.' বলিয়া মুখের একটা অরুচি-সূচক ভঙ্গিমা করিল।

হারাণ বলিল, 'খগেন, তুমি মিণ্টুকে বিয়ে করলে না কেন?'

খগেন যেন চিন্তা করিতে করিতে বলিল, 'এক সময় মনে হয়েছিল বুঝি বিয়েই করতে হবে। কিন্তু—'খগেন হাসিতে লাগিল,—'মিণ্টু বাইরে খুব স্মার্ট গার্ল, কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটু বোকা আছে। নিজেই এসে ধরা দিলে—'

কিছুক্ষণ নীরবে সিগারেট টানিয়া খগেন আবার আরম্ভ করিল, 'জানো, মিণ্টু আমার এই বাসায় কতবার এসেছে? ত্রিশ বারের কম নয়। প্রথম দু'একবার তার মা সঙ্গে ছিল, তারপর একলা। Well, you know after that—'

'কিন্তু তুমি তাকে বিয়ে করলেই তো পারতে, খগেন!'

'কথাটা নেহাৎ আহাম্মকের মত বললে, বিয়ের আগেই যে মেয়ে বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে, তাকে বিয়ে করব কি জন্যে? শেষ পর্যন্ত আমাকেই বলতে হল,—মিণ্টু, নেশা ছুটে গেছে, এবার বিদায় দাও।'

'কিন্তু কেন? কেন?'

'তা জানি না। প্রকৃতির এই নিয়ম বোধ হয়। রবিবাবুর পুরুষের উক্তি পড়েছ তো—'ক্রমে আসে আনন্দ আলস!' কিন্তু তোমাকে এত কথা কেন বলছি জানি না; তুমি মিণ্টুর গার্জেনও নও, ভাবী স্বামীও নও।' হাসিয়া খগেন উঠিয়া দাঁড়াইল—'আমায় এখনি বেরুতে হবে।'

'খগেন, তুমি একটা পশু—একটা জানোয়ার।'

খগেন ফিরিয়া দাঁড়াইল। 'তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে আমার ভাল লাগে না। আমি যা হাতের কাছে পেয়েছি—নিয়েছি; সেজন্য কাউকে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নই। আমি না দিলে আর কেউ নিত। যাও—বেরোও এখন।' বলিয়া দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল।

হারাণ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, রাস্তায় গ্যাস জ্বলিয়াছে, শীতের আকাশে নক্ষত্র মিটমিট করিতেছে। হারাণকে বুকে পিষিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল—'আমার দোষ! আমার দোষ! কেন আমি এমন পাগলের মত কাজ করলুম!'

দেয়ালীর সময় অসংখ্য পোকা পুড়িয়া মরিতে দেখিয়া মনে হয় বুঝি পোকার বংশ নিঃশেষ হইয়া গেল, পৃথিবীতে আর পোকা নাই। পরের বৎসর আবার অসংখ্য পোকার আবির্ভাব হয়—যুগে যুগে এই চলিতেছে। আলো যতদিন আছে ততদিন পতঙ্গ পুড়িয়া মরিবে। দোষ কাহার?

১৪ আশ্বিন ১৩৪০

ট্রেনে আধঘণ্টা

ট্রেন স্টেশন ছাড়িয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময়ে মণীশ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া একটা ছোট ইণ্টার ক্লাস কামরায় উঠিয়া পড়িল।

রাত্রি এগারটা পঁচিশের প্যাসেঞ্জার ধরিয়া আজ বাড়ি ফিরিবার কোনো আশাই তাহার ছিল না; করুণাকেও বলিয়া আসিয়াছিল যে সকালের গাড়িতে অন্যান্য বর-যাত্রীদের সঙ্গে সে ফিরিবে। কিন্তু হঠাৎ সুযোগ ঘটিয়া গেল।

আজ বৈকালের গাড়িতে এক বন্ধুর বিবাহে তাহারা বরযাত্রী আসিয়াছিল। পাশা-পাশি দুটি স্টেশন—মাঝে মাত্র পনের মাইলের ব্যবধান, ট্রেনে আধঘণ্টার বেশী সময় লাগে না। কিন্তু অসুবিধা এই যে এগারটা পঁচিশের পর রাত্রে আর গাড়ি নাই। তাই স্থির হইয়াছিল যে, রাত্রে ফেরা যদি সম্ভব না হইয়া উঠে, পরদিন প্রাতে ফিরিলেই চলিবে। সকলেই প্রায় রেলের কর্মচারী—রেল তাহাদের ঘর-বাড়ি।

এগারটা বাজিয়া পাঁচ মিনিটের সময় আহার শেষ করিয়া অন্যান্য বরযাত্রীরা যখন গাড়ি ধরিবার আশা ত্যাগ করিয়া পান-সিগারেটের জন্য হাঁকাহাঁকি করিতেছিল, সেই ফাঁকে মণীশ কাহাকেও কিছু না বলিয়া চুপিচুপি সরিয়া পড়িয়াছিল। বিবাহ বাড়ি হইতে স্টেশন পাকা দুই মাইল—এই কয় মিনিটে এতটা পথ হাঁটিয়া আসিয়া সে এই মাঘ মাসের শীতেও ঘামিয়া উঠিয়াছিল। চুরি করিয়া বন্ধুর বিবাহের আসর হইতে পলাইয়া আসার জন্য পরে তাহাকে লজ্জায় পড়িতে হইবে তাহাও বুঝিতেছিল কিন্তু তবু রাত্রেই বাড়ি ফিরিবার দুরন্ত লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই। বাসায় আর কেহ নাই—করুণা সারারাত একলা থাকিবে—দিনকাল খারাপ, এম্নি কয়েকটা কৈফিয়ত সে মনে মনে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল।

করুণার জন্য বস্তুত ভয়ের কোনো কারণ ছিল না। স্টেশনের কাছেই মণীশের কোয়ার্টার, আশেপাশে অন্যান্য রেল-কর্মচারীদের বাসা, আজিকার বরযাত্রীদের মধ্যে তাহার মত অনেকেই তরুণী স্ত্রীকে একলা রাখিয়া আসিয়াছিল। প্রয়োজন হইলে

নাইট ডিউটির সময় সকলকেই তাহা করিতে হয়, কখনো কাহারও বিপদ উপস্থিত হয় নাই। তবু যে মণীশ রাত্রেই বাড়ি ফিরিবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল তাহার একমাত্র কারণ—; কিন্তু ওটা একটা কারণ বলিয়াই গ্রাহ্য হইতে পারে না। সত্য বটে, মণীশের মাত্র দুই বছর বিবাহ হইয়াছে এবং বৌ ছাড়িয়া থাকিতে পারে না—এমন বদ-নামও তাহার রটিয়া গিয়াছে; কিন্তু কৈফিয়ত হিসাবে ওকথা উত্থাপন করা অতীব লজ্জাকর।

সে যাহোক, বারটার মধ্যেই সে বাড়ি পৌঁছিয়া যাইবে, আধঘণ্টার পথ। হয়তো করুণা লেপের মধ্যে ঢুকিয়া পরম আরামে ও গরমে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, করুণা মোটে রাত জাগিতে পারে না। মণীশকে হঠাৎ দেখিয়া তাহার ঘুমন্ত চোখে বিস্ময় ও আনন্দ ফুটিয়া উঠিবে। মণীশ পরিপূর্ণ তৃপ্তির একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িল। ট্রেন তখন সবেগে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

কামরার মধ্যে দুইটি লোক। একজন একটা বেঞ্চি জুড়িয়া লম্বাভাবে লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া কেবল মুখটি বাহির করিয়া ছিলেন; গোলাকৃতি থলথলে মুখমণ্ডলে হপ্তাখানেকের দাড়ি গজাইয়া কৃষ্ণতার একটা গাঢ়তর প্রলেপ লাগাইয়া দিয়াছিল; তিনি শুইয়া শুইয়া অনিমেষ চক্ষে মণীশকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। অপর ব্যক্তিকে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক বলিয়া বোধ হয়—সেও একটা বিলাতী কম্বল গায়ে দিয়া অন্য ধারের বেঞ্চির কোণে ঠেসান দিয়া বসিয়া ছিল এবং পরম কৌতূহলের সহিত মণীশকে পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। তাহার চেহারা রোগা—হাড় বাহির করা, গাল বসিয়া গিয়া চোয়ালের অস্থি অস্বাভাবিক রকম উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, দুই চোখের কোলে গভীর কালির আঁচড়। এই দুই যাত্রীর মধ্যে একটা বেশ রসালো গল্প জমিয়া উঠিয়াছিল, মণীশের আগমনে তাহা অর্ধপথে থামিয়া গিয়াছে।

মণীশ বসিলে রোগা লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, 'কদ্দুর যাওয়া হবে?'

মণীশ বলিল, 'আমি পরের স্টেশনেই নেমে যাব।'

একজাতীয় লোক আছে, রেলে উঠিয়াই অন্য যাত্রীদের পরিচয় গ্রহণ করিবার অদম্য আগ্রহ তাহাদের চাপিয়া ধরে। রোগা লোকটি সেই শ্রেণীর। মণীশের রুপালী বোতাম লাগানো কালো রঙের ওভারকোট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি রেলেই কাজ করেন?'

'হ্যাঁ, আমি ও স্টেশনের পার্সেল ক্লার্ক।'

লোকটি তখন হাসিয়া বলিল, 'বেশ বেশ। আসুন এই কম্বলের ওপর বসুন। আমি অনেক রকম লোকের সঙ্গে মিশেছি, কিন্তু রেলের বাবুদের মত এমন মাই-ডিয়ার লোক খুব কম দেখা যায়। কিছুতেই পেছপাও নন। তা মহাশয়ের জলপথে চলা অভ্যাস আছে কি? যদি থাকে মালের অভাব হবে না।'

মণীশ একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, 'জলপথ?'

লোকটি রসিক, একটা শিহরণের অনুকরণ করিয়া বলিল, 'মাঘ মাসের শীত, তার ওপর ট্রেন-জার্নি। শরীর গরম থাকে কি করে, বলুন দেখি!'

মণীশ হাসিয়া ফেলিল, 'ও, বুঝেছি। না, আমার ও-জিনিস চলে না। কিন্তু আপনি যদি চালাতে চান, কোনো বাধা নেই।'

লোকটি বেঞ্চির তলা হইতে একটি হ্যান্ডব্যাগ তুলিয়া লইয়া তাহার ভিতর হইতে একটি বোতল ও গেলাস বাহির করিল, বোতলের তরল পদার্থ গেলাসে ঢালিতে ঢালিতে বলিল, 'একলা এ জিনিস খেয়ে সুখ হয় না। ও-ভদ্রলোককে অফার করলুম, তা উনিও এ রসে বঞ্চিত। বলুন দেখি, এর মত ফুর্তির জিনিস পৃথিবীতে আছে কি?'

মণীশ মৃদুহাস্যে বলিল, 'তা তো বটেই।'

গেলাসের পানীয় গলায় ঢালিয়া দিয়া উৎসাহিতভাবে লোকটি বলিল, 'সেই কথাই এতক্ষণ ও-ভদ্রলোককে বলছিলুম, দুনিয়ায় আসা কিসের জন্যে। যতদিন বেঁচে আছি, প্রাণ ভরে মজা লুটব, কি বলেন।'

মণীশ যতই গৃহের নিকটবর্তী হইতেছিল ততই উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল, বলিল, 'ঠিক কথা।'

বোতল গেলাস ব্যাগে পুরিয়া নামাইয়া রাখিয়া লোকটি পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিল, একটি নিজে ঠোঁটে ধরিয়া মণীশকে একটি দিল। সিগারেট ধরাইয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, 'আমার নাম চারুচন্দ্র গুপ্ত, ইন্সিওরেন্সের দালালী করি, ছত্রিশ বছর বয়স হয়েছে। অনেক বাজার ঘেঁটে বেড়িয়েছি মশায়; কিন্তু এ দুনিয়ায় সার বস্তু যদি কিছু থাকে তো সে ওই বোতল, আর—; বুঝেছেন তো?'

মণীশ সিগারেট টানিতে টানিতে বলিল, 'হুঁ।'

চারুচন্দ্র গুপ্ত বলিল, 'এতে লজ্জাই বা কি? পুরুষ হয়ে জন্মেছি কি জন্যে? মজা লুটব ব'লে। কিন্তু মশায়, একটি বিষয়ে আপনাদের সাবধান করে দি, যদি ফুর্তি করতে চান, বিয়ে করবেন না। খবরদার, খবরদার। ও পথে হেঁটেছেন কি সব ভেস্তে গেছে।'

মণীশ কোনো কথা বলিল না, চারু আবার আরম্ভ করিল, 'এই আমাকেই দেখুন না—পনের বছর বয়স থেকে ফুর্তি করতে আরম্ভ করেছি, কখনো ঠকেছি কি? নিজে রোজগার করি, নিজের ফুর্তিতে ওড়াই, কারুর তোয়াক্কা রাখি না। ক্যা মজায় আছি বলুন তো? কিন্তু বিয়ে করলে এটা হত কি? অ্যাদ্দিনে সতেরটা ছানা গজিয়ে যেত। প্যান-প্যান ঘ্যান-ঘ্যান, ডাক্তার আর ঘর, একবার ভেবে দেখুন দিকি!'

মণীশ এবারও চুপ করিয়া রহিল। লেপের মধ্যে শয়ান লোকটির মুখ দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, অবিবাহিত জীবনের অপ্রাপ্য সুখৈশ্বর্যের কথা স্মরণ করিয়া এখনি তাঁহার মুখ দিয়া নাল গড়াইয়া পড়িবে। তিনি কোনোমতে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, 'যে গল্পটা হচ্ছিল সেটাই হোক না।'

চারু মণীশকে বলিল, 'ওঁকে আমার জীবনের ইতিহাস শোনাচ্ছিলুম, ইতিহাস তো নয়, মহাভারত। পনের বছর বয়স থেকে আজ পর্যন্ত কত কাণ্ডই যে করলুম! শুনলে বুঝবেন।' গলা খাটো করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কখনো ইলোপ্‌ করেছেন?'

মণীশ সভয়ে বলিয়া উঠিল, 'না।'

লেপ-ঢাকা ভদ্রলোকটি স্মরণ করাইয়া দিলেন, 'ওটা হয়ে গেছে। শাল্‌কের গল্পটা বলছিলেন।'

চারু বলিল, 'হ্যাঁ, শাল্‌কের গল্পটা। কিন্তু ওতে নূতনত্ব কিছু নেই মশায়। অমন দশটা আমার জীবনে হয়ে গেছে।'

মণীশ ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'শাল্‌কের গল্প?'

চারু বলিল, 'হ্যাঁ, তখন আমি শাল্‌কেয় থাকি। বছর তিনেক আগেকার কথা।—ঠিক পাশের বাড়িতেই, বুঝলেন কিনা, একটি ষোল বছরের তরুণী। খাসা দেখতে মশায়, রঙ্ ফেটে পড়ছে, ঠিক বাঁ চোখের নীচে একটি তিল; আর গড়ন—সে কথা না-ই বললুম, মনে মনে বুঝে নিন। এক কথায় যাকে বলে—রমণী! বলুন দেখি, লোভ সামলানো যায়?

'তার তখনো বিয়ে হয়নি, তবে হব-হব করছিল। আমি দেখলুম, বিয়ে হলেই তো পাখি উড়বে; অতএব তার আগেই—বুঝলেন কি না? মতলব ঠিক করে জানলা দিয়ে চিঠি ফেলতে আরম্ভ করলুম। চিঠি যথাস্থানে গিয়ে পেঁচুচ্ছে কিন্তু জবাব নেই। সে আগে জানলায় এসে দাঁড়াত, আজকাল আর তাও দাঁড়ায় না; আমাকে দেখে মুখ

রাঙা করে সরে যায়। কিন্তু আমিও পুরোনো ঘাগী, অত সহজে ছাড়বার পাত্র নই। লেগে রইলুম। বুঝলুম কিছুদিন খেলবে। তারপর, দিন পনের পরে হঠাৎ একদিন জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে খুব গরম হয়ে বললে, 'আপনি আমাকে যদি আর চিঠি দেন, বাবাকে বলে দেব।'

চারু কিছুক্ষণ মনে মনে হাসিয়া বলিল, "বাবাকে বলে দেব' কথাটা সব মেয়েরই বাঁধি গৎ, বুঝেছেন। ন্যাকামি। আসলে পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ। আমি আরো প্রেম্সে চিঠি চালাতে লাগলুম। কিন্তু এক হপ্তা কেটে গেল, তবু সে কোনো সাড়াশব্দ দিলে না; অবিশ্যি বাপকেও বলসে না, সেকথা বলাই বাহুল্য।

'বাড়ির ঝিটাকে আগে থাকতেই টাকা খাইয়ে হাত করেছিলুম, ঠিক করলুম, এবার আর চিঠি নয়, অন্য চাল চাল্তে হবে। খবর পেলুম, রোজ সন্ধ্যের পর ছুঁড়ি খিড়কির বাগানে যায়। একদিন শর্মাও পাঁচিল ডিঙিয়ে সেখানে গিয়ে হাজির। আচমকা আমাকে দেখে তো আঁতকে উঠল, পালাবার চেষ্টা করলে। আমি পথ আগলে দাঁড়ালুম, থিয়েটারি কায়দায় বললুম, 'বুক ফেটে যাচ্ছে তোমার জন্যে।' সে চেঁচামেচি করে লোক ডাকবার চেষ্টা করলে। আমি তখন নিজ মূর্তি ধারণ করলুম, বললুম, 'চেঁচালে কোনও ফল হবে না। আমি বড় জোর দু'ঘা মার খাব, কিন্তু তোমার ইহকাল পরকালের দফা রফা, সেটা ভেবে চেঁচিয়ে লোক জড় কর।'

'মেয়েটা চেঁচালে না বটে, কিন্তু তবু বাগ মানতে চায় না। তখন আমি ব্রহ্মাস্ত্র ঝাড়লুম, বললুম, 'আমার দু'জন মুসলমান বন্ধু পাঁচিলের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে। চেঁচামেচি গোলমাল করেছ কি তারা এসে মুখে কাপড় বেঁধে—বুঝলে? কিন্তু যদি ভাল কথায় রাজী হও তাহলে আর কেউ জানবে না, শুধু তুমি আর আমি।' চারু আবার ব্যাগটা বাহির করিল, বোতল হইতে গেলাসে মদ ঢালিতে প্রবৃত্ত হইল!

লেপ-ঢাকা ভদ্রলোকটির চোখ হইতে লুব্ধতা ঝরিয়া পড়িতেছিল, তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'তারপর?'

গেলাস গলায় উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া চারু একটু মুখ বিকৃত করিল, তারপর হাসি হাসি মুখে বলিল, 'তারপর আর কি—হে হে—রাজী হয়ে গেল।'

মণীশের হাতের সিগারেট অর্ধদগ্ধ অবস্থায় নিবিয়া গিয়াছিল, সমস্ত শরীর শক্ত করিয়া সে এই কাহিনী শুনিতেছিল। এখন হঠাৎ সিগারেটের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে সেটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

চারু বলিল, 'কিন্তু হলে কি হবে মশায়, মেয়েটা পোষ মানলে না। তারপর থেকে খিড়কির বাগানে আসাই ছেড়ে দিল। ওদিকে বিয়ের সম্বন্ধও ঠিক হয়ে গিয়েছিল, আমারও শালুকের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল।'—ব্যাগটা আবার বেঞ্চের নীচে রাখিয়া দিল, 'দিন কয়েক পরে আমিও শালুকে ছেড়ে দিলুম, তার বিয়েটা আর দেখা হল না।' বলিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল।

ট্রেনের বেগ ডিস্টান্ট-সিগ্নালের কাছে আসিয়া মন্দীভূত হইল। চারু আর একটা সিগারেট ধরাইয়া বাক্সটা মণীশের দিকে বাড়াইয়া দিল, বলিল 'খান আর একটা। আপনার তো এসে পড়ল! শুনলেন তো গল্পটা? এর পর আর কোন ভদ্রলোকের বিয়ে করতে সাধ হয়? ভাবুন দেখি, আমার কপালেই যদি ঐ রকম একটি—; নিন না—'

মণীশ হাত নাড়িয়া সিগারেট প্রত্যাখান করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মণীশের মুখখানা স্বভাবত খুব ধারালো না হইলেও বেশ সুশ্রী, কিন্তু গত কয়েক মিনিটের মধ্যে তাহা শুকাইয়া কুঁকড়াইয়া যেন কদাকার হইয়া গিয়াছিল। গাড়ি প্ল্যাটফর্মে থামিতেই সে কম্পিত হস্তে হাতল ঘুরাইয়া নামিবার উপক্রম করিল।

চারু বলিল, 'আচ্ছা, তাহলে নমস্কার মশায়।' ,

মণীশ নামিতে গিয়া হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার অন্তরে একটা ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল, সে মনে মনে বলিতেছিল, না, জিজ্ঞাসা করব না, জিজ্ঞাসা করব না; কিন্তু শেষে আর পারিল না, স্খলিতকণ্ঠে বলিল, 'মেয়েটির নাম কি?'

চারু বলিল, 'নাম? নামটা—রসুন—করুণাময়ী! কিন্তু নামের সঙ্গে চরিত্রের একটুও মিল নেই মশায়, হ্যা হ্যা, আচ্ছা, নমস্কার নমস্কার!'

মণিমণ্ডিত-দেহ বিষোদ্গারী সর্পের মত অন্ধকার আকাশে গাঢ় ধূম নিক্ষেপ করিতে করিতে ট্রেন চলিয়া গেল।

মণীশও একটা হোঁচট খাইয়া প্ল্যাটফর্মের বাহিরে আসিল। টিকেট-কলেক্টর তাহার বন্ধু, ডিউটির জন্য সে বরযাত্রী যাইতে পায় নাই, নিদ্রাজড়িত স্বরে তাহাকে কি জিজ্ঞাসা করিল, মণীশ শুনিতে পাইল না।

স্টেশন হইতে একশত গজের মধ্যেই মণীশের ছোট্ট লাল ইটের বাসা; অন্ধকার পথ দিয়া এক রকম অভ্যাসবশেই সে সেই দিকে চলিল। মাথার মধ্যে তাহার রক্ত ঘুরপাক খাইতেছিল! করুণা! করুণা এই! আজ দু'বছর ধরিয়া সে অন্যের উচ্ছিষ্ট নারীকে নিজের একান্ত আপনার স্ত্রী বলিয়া ভাবিয়া আসিতেছে! একদিনের জন্যেও সন্দেহ করে নাই যে করুণা তাহাকে ঠকাইতেছে। উঃ, এই করুণা!

একটা শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিয়া সে বাহ্য চেতনা ফিরিয়া পাইল। দেখিল তাহার শরীরের সমস্ত পেশীগুলা শক্ত হইয়া আছে। মুষ্টিবদ্ধ হাতের নখ হাতের তেলোয় বিঁধিয়া জ্বালা করিতেছে। সে জোর করিয়া পেশীগুলা শিথিল করিয়া দিল; তারপর দ্রুতপদে বাড়ির দিকে চলিল। করুণা একটা—

কি করা যায়। এরূপ অবস্থায় মানুষ কি করে? খুন!—হাঁ, খবরের কাগজে তো এমন অনেক দেখা যায়। যাহার স্ত্রী কুমারী অবস্থায় লম্পট দ্বারা উপভুক্ত হইয়া'ছ, সে আর কি করিতে পারে? করুণাকে খুন করিয়া নিজে ফাঁসি যাওয়া ছাড়া অন্য পথ কোথায়?

কিন্তু—, মণীশ থমকিয়া রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িল। সেই লম্পটটাকে সে ছাড়িয়া দিল কেন? তাহাকে আগে খুন করিয়া তারপর করুণাকে—

বাড়ির সম্মুখস্থ হইয়া সে দেখিল, তাহার শয়নঘরের জানালা দিয়া আলো আসিতেছে। আলো কিসের? করুণা তো ঘুমাইয়াছে! তবে কি—?

পা টিপিয়া টিপিয়া চোরের মত গিয়া মণীশ জানালার কাচের ভিতর দিয়া উঁকি মারিল। দেখিল, করুণা মেঝেয় কম্বল পাতিয়া একটা র‍্যাপার গায়ে জড়াইয়া বসিয়া বই পড়িতেছে।

মণীশ কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর গিয়া দরজায় ধাক্কা মারিল, চাপা বিকৃতস্বরে বলিল, 'দোর খোল।'

করুণা দোর খুলিয়া দিতেই মণীশ ঘরে ঢুকিয়া দরজায় খিল আঁটিয়া দিল, তারপর করুণার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল!

করুণা মৃদু হাসিয়া বলিল, 'আমি জানতুম তুমি এ গাড়ুতে ফিরে আসবে, তাই শুইনি।'

মণীশের মাথার ভিতরটা যেন ওলট-পালট হইয়া গেল। এই কথাগুলির পরিপূর্ণ অর্থ পরিগ্রহ করিবার শক্তি তাহার ছিল না; তবু সে অস্পষ্টভাবে অনুভব করিল যে,

ইহার বেশী আর কেহ কোন দিন পায় নাই, প্রত্যাশা করিবার অধিকারও কাহারও নাই। নিশীথরাত্রে তাহার জন্য করুণার এই নিঃসঙ্গ প্রতীক্ষা, ইহার তুল্য পৃথিবীতে আর কি আছে?

'করুণা!'

সহসা সে দুই হাত বাড়াইয়া করুণাকে বুকে চাপিয়া ধরিল। এত জোরে চাপিয়া ধরিল যে, করুণার শ্বাস রোধের উপক্রম হইল। সে হাঁপাইয়া উঠিয়া বলিল, 'কি?'

মণীশ তাহার গলার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া অবরুদ্ধ স্বরে বলিল, 'কিছু না। ট্রেনে আসতে আসতে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। উঃ! এমন বিশ্রী দুঃস্বপ্ন দেখলুম! চল শুইগে।'

১৯ অগ্রহায়ণ ১৩৪০

আদিম

এই কাহিনীতে আদৌ স্থান কাল পাত্র-পাত্রীর প্রকৃত নাম বদল করিয়া লিখিতেছি।—

মহারাজ সূর্যশেখর শত্রু জয় করিয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়াছেন। মরুভূমির পরপারে নির্জিত শত্রু মাথা নত করিয়াছে। মহারাজ সূর্যশেখর সহস্র বন্দী ও সহস্র বন্দিনী সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে সাধারণ মানুষও আছে, আবার অভিজাত বংশের যুবক-যুবতীও আছে। বড় সুন্দর আকৃতি এই বন্দী-বন্দিনীদের; রজতশুভ্র দেহবর্ণ, স্বর্ণাভ কেশ। যুবতীদের দিকে একবার চাহিলে চোখ ফেরানো যায় না।

মহারাজ ঘোষণা করিয়াছেন, একশত বন্দী ও একশত বন্দিনী তিনি স্বয়ং বাছিয়া লইবেন; বাকি যাহা থাকিবে, প্রধান সেনাপতি হইতে নিম্নতম নায়ক পর্যন্ত সকলে পদমর্যাদা অনুযায়ী ভাগ করিয়া লইবে। উপরন্তু লুণ্ঠিত ধনরত্ন যাহা সঙ্গে আসিয়াছে তাহাও ভাগ-বাঁটোয়ারা হইবে।

একদিন অপরাহ্ণে উত্তরায়ণের সূর্য মরুপ্রান্তর প্রজ্জ্বলিত করিয়া অস্তোন্মুখ হইয়াছে এমন সময় বিজয় বাহিনী রাজধানীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হইল। পুরোভাগে মহারাজ সূর্যশেখরের চিত্রবিচিত্র শ্যেনলাঞ্ছন চতুর্দোলা, তাহার পশ্চাতে শিবিকা ও দোলিকায় সেনাপতির দল, তারপর বন্দী-বন্দিনীর শ্রেণী এবং লুণ্ঠিত ধনরত্নবাহী যান-বাহন। সর্বশেষে বিপুল সৈন্যবাহিনী।

কিন্তু আজ আর সদলবলে পুরপ্রবেশের সময় নাই; মহারাজ স্বনির্বাচিত বন্দী-বন্দিনীদের লইয়া ডঙ্কা বাজাইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। সেনাপতিরাও নগরে যাইতে-

ছেন; তাঁহারা কাল প্রাতে আসিয়া বন্দী-বন্দিনী বাছাই করিয়া লইয়া যাইবেন। কেবল সৈন্যদল ধনরত্ন ও বন্দী-বন্দিনীদের রক্ষকরূপে রহিল। কাল প্রাতে ধনরত্ন ভাগ হইবে, সৈনিকেরা যে-যার অংশ লইয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিবে।

একজন কনিষ্ঠ সেনানীর নাম সোমভদ্র। বয়স একুশ বাইশ, বলিষ্ঠ দেহ, তাম্রফলকের ন্যায় দেহবর্ণ; সুন্দর আকৃতি। রাজধানীতেই তাহার গৃহ, তাহার পিতা একজন মধ্য-শ্রেণীর ভদ্র গৃহস্থ। সোমভদ্র এই প্রথম যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল; যুদ্ধে সে অসীম পরাক্রম দেখাইয়াছে, প্রধান সেনানায়কদের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে, মহারাজের ভীমকান্ত মুখের প্রসন্ন হাস্য তাহাকে পুরস্কৃত করিয়াছে। তাহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কিন্তু আজ গৃহের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া যখন সকলের মন গৃহের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে তখনও তাহার প্রাণে শান্তি নাই। গৃহের কথা স্মরণ হইলেই তাহার মন শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে। গৃহে পিতামাতা আছেন, কনিষ্ঠা ভগিনী শফরী এবং বালক-ভ্রাতা শ্যেনভদ্র আছে; ক্ষুদ্র সংসার। কিন্তু সোমভদ্রের সবচেয়ে ভয় শফরীকে। শফরী শুধুই তাহার অনুজা নয়—

উদ্‌ভ্রান্তভাবে সৈন্য সমাবেশের প্রান্তভূমিতে বিচরণ করিতে করিতে সোমভদ্র গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল; সৈন্যদল শত্রু বিজয় করিয়া ফিরিয়াছে, তাহাদের মনে চিন্তা নাই; তাহারা উচ্চকণ্ঠে গান গাহিতেছে, নিজেদের মধ্যে হুড়াহুড়ি করিতেছে। কাল প্রাতে তাহারা বেতন পাইবে, লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ পাইবে; হয়তো দুই একটি দাস-দাসী পাইবে, তারপর মহানন্দে গৃহে ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু সোমভদ্রের অবস্থা অন্য-রূপ; তাহার মন দুইদিকে টানিতেছে। সম্মুখে নীয়মান পতাকায় ন্যায় তাহার মন পিছনদিকে তাকাইয়া আছে।

শত্রু বিজয় করিয়া ফিরিবার পথে সহস্র বন্দিনীর মধ্যে একটি বন্দিনীর কাছে সোমভদ্র হৃদয় হারাইয়াছে। ইহা কেবলমাত্র দৈহিক আকর্ষণ নয়, গভীরতর বস্তু। বন্দিনীর নাম মেরুকা; শুভ্রশিখা দীপবর্তিকার ন্যায় তার রূপ, বন্দিনীর ছিন্ন-গলিত বস্ত্রাবরণ ভেদ করিয়া রূপশিখা স্ফুরিত হইতেছে। নীল চোখে কঠিন সহিষ্ণুতা। সে উচ্চবংশের কন্যা, দৈবনিগ্রহে বিজাতীয় শত্রুর কবলিত হইয়া স্বজন হইতে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত, পৃথিবীতে আপন বলিতে তাহার কেহ নাই; সে এখন নির্মম শত্রুর পণ্যবস্তু। কিন্তু এই মহা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়িয়াও মেরুকা মনের স্থৈর্য হারায় নাই।

বন্দিনীদের মধ্যে সুন্দরী অনেক আছে, সকলেই সুন্দরী ও যুবতী; কারণ বাছিয়া বাছিয়া সুন্দরী যুবতীদেরই হরণ করিয়া আনা হইয়াছে। কিন্তু সোমভদ্র একমাত্র মেরুকাকে দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়াছে। প্রত্যাবর্তনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে করিতে দু'জনে পরস্পরের সান্নিধ্যে আসিয়াছে; চেনাশোনা হইয়াছে, দুই চারিটি সংক্ষিপ্ত কথার বিনিময় হইয়াছে, দু'জনে পরস্পরের নাম জানিয়াছে, অতীত জীবনের ইতিবৃত্ত জানিয়াছে। সোমভদ্র কিন্তু নিজের মনের কথা মেরুকাকে বলে নাই; বলিবার প্রয়োজন হয় নাই, সোমভদ্রের চোখের ভাষা মেরুকা বুঝিয়াছে।

কিন্তু আজ যাত্রাপথের প্রান্তে পৌঁছিয়া আর নীরব থাকা চলে না, মনের কথা মুখের ভাষায় প্রকাশ করা প্রয়োজন। তাই সোমভদ্রের মন এত বিভ্রান্ত। হৃদয়ে আবেগ আছে, শান্তি নাই। পথের প্রান্তে নয়, সে যেন দ্বিভুজ পথের কোণবিন্দুতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

সেনাপতিরা সকলে চলিয়া গিয়াছেন। সূর্য অস্তগামী; সৈনিকেরা অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া রাত্রির আহারের উদ্যোগ আয়োজন করিতেছে। সোমভদ্রের প্রতি কাহারও লক্ষ্য নাই। সে সহসা মনস্থির করিয়া বন্দিনীদের সাময়িক উপনিবেশের দিকে চলিল।

বন্দী ও বন্দিনীদের পৃথক অবরোধ। সৈন্যযূথের বিশ্রাম কালে দোলা-শকটাদি বাহনগুলিকে পর পর সাজাইয়া দুইটি পরিবেষ্টন নির্মিত হয়, একটিতে বন্দিগণ ও অপরটিতে বন্দিনীগণ থাকে। এই শকট-ব্যূহের মধ্যে রাজা ও দুই তিনজন প্রধান সেনাপতি ভিন্ন অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। সোমভদ্র শকট-ব্যূহের বহির্দেশ ঘিরিয়া ধীর পদে পরিক্রমণ আরম্ভ করিল।

আবেষ্টনীর মধ্যে বন্দিনী মেয়েরা দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের দৃষ্টি বাহিরের দিকে। কাহারও চোখে আতঙ্ক, কাহারও চোখে নীরব অশ্রুর ধারা। কেহ বা নিয়তির ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করিয়া উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে। কাহারও দৃষ্টি সম্মুখে ভীম নগর-তোরণের উপর নিবদ্ধ, কাহারও চক্ষু পশ্চাতে অদৃশ্য মাতৃভূমির দিকে প্রসারিত। তাহাদের সম্মিলিত মনের নিপীড়িত আকাঙ্খা কে নির্ণয় করিবে?

আবেষ্টনীর পশ্চাদ্ভাগে মেরুকা দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার চোখের দৃষ্টি সম্মুখেও নয়, পশ্চাতেও নয়; মনে হয় আপন মনের গহন জটিলতার মধ্যে তাহার চক্ষু দুটি পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে।

সোমভদ্র তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল; মাঝখানে একটি শকটের ব্যবধান। কিন্তু মেরুকা তাহাকে দেখিতে পাইল না। সোমভদ্র কিয়ৎকাল একাগ্র চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া অবরুদ্ধ স্বরে ডাকিল—'মেরুকা!'

চকিতে মেরুকার চক্ষু বহির্মুখী হইল। সে ক্ষণকাল স্তিমিত নেত্রে সোমভদ্রকে নিরীক্ষণ করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল—'সেনানী সোমভদ্র!'

শকটের উপর ঝুঁকিয়া সোমভদ্র প্রশ্ন করিল—'মেরুকা, তুমি কি ভাবছিলে?'

মেরুকা আকাশের পানে চাহিল। এক ঝাঁক পাখি কলকূজন করিয়া বাসায় ফিরিতেছে। মেরুকা ধীরে ধীরে বলিল—'কি ভাবছিলাম জানি না। বোধ হয় নিজের নিয়তির কথা ভাবছিলাম।'

উদ্গত আবেগ দমন করিয়া সোমভদ্র কহিল—'মেরুকা, তুমি আশা হারিও না।'

মেরুকা বলিল—'যেদিন বন্দিনী হয়েছি সেদিন থেকে আশা আশঙ্কা দুই-ই ত্যাগ করেছি। শুধু ভাবি, আমার নিয়তি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, ঝড়ের মুখে মরুভূমির বালুকণা কোন্ সমুদ্রের জলে ডুবে যাবে।'

তাহার নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বরে যে অপরিসীম হতাশা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা সোমভদ্রের হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলিল; সে মেরুকার পানে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া আবেগ-স্খলিত স্বরে বলিল—'মেরুকা, তুমি আমার ভগিনী! আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

দীর্ঘকাল নীরব থাকিয়া মেরুকা বলিল—'ভগিনী! তোমাদের দেশে ভ্রাতা-ভগিনীর বিবাহ হয়! আমাদের দেশে হয় না। কিন্তু তুমি আমার ভ্রাতা নও, তুমি যদি আমাকে বিবাহ কর, আমি স্বর্গ হাতে পাব।'

মেরুকার শুষ্ক চক্ষু সহসা বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল, সে সোমভদ্রের দিকে হাত বাড়াইয়া দিল। শকটের দুই পার হইতে আঙুলে আঙুলে ছোঁয়াছুঁয়ি হইল।

সোমভদ্র বলিল—'আমি কাল প্রত্যূষে আসব। একটি বন্দিনী আমার প্রাপ্য। আমি তোমাকে বেছে নেব, তারপরে বাড়ি নিয়ে গিয়ে তোমাকে বিয়ে করব।'

মেরুকার অধর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে কথা বলিতে পারিল না, কেবল দুর্দম আকাঙ্ক্ষা ভরা চোখে সোমভদ্রের পানে চাহিয়া রহিল।

সোমভদ্র যখন নিজ গৃহের সম্মুখীন হইল সূর্য অস্ত গিয়াছে, অদূরস্থ নদীর নিস্তরঙ্গ নীল জলে অস্তরাগের খেলা চলিতেছে। গৃহ-প্রাঙ্গণের দ্বারে তাহার পিতা মাতা, ভগিনী শফরী ও বালক-ভ্রাতা শ্যেনভদ্র দাঁড়াইয়া; সকলের দৃষ্টি একসঙ্গে সোম-ভদ্রের উপর পড়িল। মায়ের মুখে হাসি, চোখে জল; পিতার মুখ তৃপ্তি-গম্ভীর। শ্যেন-ভদ্র ছুটিয়া দাদার কাছে যাইবার উপক্রম করিলে পিতা তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে আটকাইয়া রাখিলেন। কেবল শফরীকে কেহ আটকাইল না। সোমভদ্রকে স্বাগত সম্ভাষণ করিবার অগ্রাধিকার তাহারই।

শফরীর বয়স সতরো। রূপ ও যৌবন মিলিয়া সাবলীল স্বর্ণাভ শফরীর মতই তাহার দেহ। সে লঘুপদে ছুটিয়া গিয়া সোমভদ্রের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, গ্রীবার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া গদগদ স্বরে ডাকিল—'ভাই!'

ক্ষণকালের জন্য সোমভদ্রের মনে হইল, তাহার সন্তাপ শান্ত হইয়াছে, অঙ্গ জুড়াইয়া গিয়াছে, দেহমন ভরিয়া একটি পরিতৃপ্ত আনন্দ সুগন্ধি ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে শফরীর স্কন্ধ জড়াইয়া লইল।

শফরী মুখ তুলিল। দুই চক্ষে আনন্দ বিকীর্ণ করিয়া সোমভদ্রের অধরের কাছে অধর ধরিল। বলিল—'চুমু খাও।'

সোমভদ্রের মন আবার অশান্ত হইয়া উঠিল। শফরীকে বলিতে হইবে, মেরুকার কথা বলিতে হইবে। সে শফরীর অধরে অধর স্পর্শ করিয়া বলিল—'শফরি, তুমি ভাল আছ?'

শফরী বলিল—'উঃ, কতদিন পরে তুমি ফিরে এলে!'

সোমভদ্র লঘু হাসিয়া বলিল—'যদি না ফিরে আসতাম? যদি যুদ্ধে মরে যেতাম!'

শফরীর মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, সে বুভুক্ষু চক্ষে কিছুক্ষণ সোমভদ্রের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—'তাহলে—তাহলে আমিও মরে যেতাম।'

না, আর নয়, এ প্রসঙ্গ আর বাড়িতে দেওয়া উচিত নয়। সোমভদ্র নিজেকে শফরীর বাহুমুক্ত করিয়া বলিল—'না, তুমি মরে যেতে কেন? কিছুদিন হয়তো আমার জন্য দুঃখ করতে, তারপর অন্য কারুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হত। শফরী—'

তাহার কথা শেষ হইল না, শ্যেনভদ্র পিতার হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া আসিয়া বন-বিড়ালের মত তাহার পৃষ্ঠে লাফাইয়া পড়িল, হাঁচোড় পাঁচোড় করিয়া তাহার স্কন্ধে উঠিয়া বসিল। শ্যেনভদ্রের বয়স দশ বছর।

তিনজনে হাসিতে হাসিতে মাতাপিতার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। সোমভদ্র নতজানু হইয়া মাতাপিতাকে অভিবাদন করিল। শফরীর চক্ষু সারাক্ষণ সোমভদ্রের মুখের উপর নিবদ্ধ হইয়া রহিল। সোমভদ্রের আচরণে কোথায় যেন বিকলতা রহিয়াছে, সে তাহাকে ভগিনী বলিয়া ডাকে নাই, শফরী বলিয়া ডাকিয়াছে। কেন?—

বাড়িতে অনাড়ম্বর উৎসবের হাওয়া। প্রাঙ্গণে বাঁধা শ্বেত গর্দভটি ঘন ঘন কর্ণ আন্দোলিত করিয়া কোমল চক্ষে চাহিয়া সোমভদ্রকে সম্ভাষণ জানাইয়াছে, গরু ছাগল ও মেষ নিজ নিজ ভাষায় সংবর্ধনা করিয়াছে। মা রন্ধনশালাতে গিয়াছেন, শফরী তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে। পিতা প্রীতিবিম্বিত মুখে প্রাঙ্গণ-বেদীর উপর স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। কেবল শ্যেনভদ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গ ছাড়ে নাই, ছায়ার মত তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে এবং নানা প্রশ্ন করিয়া তাহার মন আরও উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে।

সন্ধ্যার পর আহারের সময় সকলে সমবেত হইলে সোমভদ্র তাহার যুদ্ধযাত্রার অনেক বিচিত্র কাহিনী বলিল। সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনিল। তারপর মাতা ক্লান্ত সোম-ভদ্রকে শয়ন করিতে পাঠাইলেন। শ্যেনভদ্র শফরীর কোলে মাথা রাখিয়া নিদ্রালু হইয়া-

ছিল, সে তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল পিতামাতা ঘনিষ্ঠ হইয়া বসিয়া বিবাহের আলোচনা করিতেছেন। সোমভদ্র ও শফরী বড় হইয়াছে; সোমভদ্র যুদ্ধে কীর্তি অর্জন করিয়া ফিরিয়াছে, এখন আর বিলম্ব করিয়া লাভ নাই, যত শীঘ্র সম্ভব বিবাহ দেওয়া প্রয়োজন। কালই পিতা মন্দিরে গিয়া পুরোহিতের সহিত দিন ক্ষণ স্থির করিয়া আসিবেন।

শফরী দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া তাহাদের কথাবার্তা শুনিল। তাঁহাদের স্বর ক্রমশ গাঢ় ও স্মৃতিমধুর হইয়া আসিল; তখন শফরী শয়ন করিতে গেল। নিজের শয়নকক্ষে যাইবার আগে একবার সোমভদ্রের কক্ষে উঁকি মারিল।

ঘরের কোণে প্রদীপের নিষ্কম্প শিখা মৃদু আলোক বিতরণ করিতেছে। সোমভদ্র শয্যায় শুইয়া আছে। তাহার একটি বাহু চোখের উপর ন্যস্ত; নিশ্চয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। শফরী চাহিয়া চাহিয়া একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিল। তাহার হৃদয়ে একটি প্রশ্ন বারংবার কাঁটার মত ফুটিতে লাগিল। কেন? কেন সোমভদ্র তাহাকে ভগিনী বলিয়া ডাকিল না? তবে কি সে আর তাহাকে ভালবাসে না? তবে কি?—

শফরী নিজ কক্ষে গিয়া শয়ন করিল, কিন্তু তাহার ঘুম আসিল না। গৃহ নিঃশব্দ হইয়া গিয়াছে, বাহিরে নদীতীরে ক্বচিৎ হংস বা সারসের উচ্চকিত ধ্বনি শুনা যাইতেছে। নগর সুপ্ত, গৃহ সুপ্ত; কেবল শফরী জাগিয়া আছে।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে শফরী উঠিল। অন্ধকারে ধীরে ধীরে সোমভদ্রের কক্ষের দিকে চলিল। ঘরের কোণে দীপশিখাটি ক্ষুদ্র হইয়া আসিয়াছে, সোমভদ্র পূর্ববৎ চক্ষের উপর বাহু রাখিয়া শুইয়া আছে। শফরী নিঃশব্দে তাহার শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার বুকে দুরন্ত ব্যাকুলতা আলোড়িত হইয়া উঠিল। আমার প্রিয়তম! আমার ভাই! এক রক্ত, এক দেহ; আমরা পরস্পরের হয়ে জন্মেছি, পরস্পরের জন্যে বড় হয়েছি, আমাদের মাঝখানে ব্যবধান নেই। আমরা কি কখনো আলাদা হতে পারি!

শয্যাপার্শ্বে নতজানু হইয়া শফরী সোমভদ্রের বুকের মাঝখানে অতি সন্তর্পণে চুম্বন করিল।

সোমভদ্র তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে শয্যায় পড়িয়া ছিল, চমকিয়া জাগিয়া উঠিল।

আজ গৃহে ফিরিবার পর হইতে সে সকলের কাছে মেরুকার কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু বলি-বলি করিয়াও বলিতে পারে নাই; মেরুকার নাম কণ্ঠ পর্যন্ত আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। মনে হইয়াছে, মেরুকার নাম উচ্চারণ করিলেই গৃহের এই শান্ত আনন্দময় পরিমণ্ডল চূর্ণ হইয়া যাইবে। সতেরো বছর পূর্বে শফরী যেদিন জন্ম-গ্রহণ করে সেইদিন হইতে স্থির হইয়া আছে তাহারা দু'জনে স্বামী-স্ত্রী। দু'জনে একসঙ্গে বড় হইয়াছে, কেহ অন্য কথা ভাবিতেও পারে নাই। তারপর যুদ্ধযাত্রা। কোথা হইতে বন্দিনী মেরুকা আসিয়া তাহার হৃদয় হরণ করিয়া লইল। সোমভদ্র প্রাণমন দিয়া মেরুকাকে ভালবাসিয়াছে, তাহাকে বিবাহ করিতে চায়। কিন্তু গৃহে ফিরিবার পর পিতামাতার মুখের পানে চাহিয়া, শফরীর মুখের পানে চাহিয়া তাহার মনে অপরাধের গ্লানি আসিয়াছে, মুখ ফুটিয়া মনের কথা বলিতে পারে নাই। গৃহে ফিরিয়াই সকলের মনে আঘাত দিতে তাহার মন সরে নাই।

কিন্তু একথা বেশীক্ষণ লুকাইয়া রাখা চলিবে না। কাল প্রাতেই সে মেরুকাকে আনিতে যাইবে; মেরুকাকে লইয়া গৃহে ফিরিবার পর কিছুই আর অজ্ঞাত থাকিবে না। পিতামাতা তখন কি করিবেন, শফরী কি করিবে কিছুই অনুমান করা যায় না। তার চেয়ে আগেই কথাটা জানাইয়া রাখা ভাল। পিতামাতা যদি অমত করেন তখন মেরুকাকে লইয়া সে অন্যত্র ঘর বাঁধিবে। তাহার অর্থের অভাব নাই; সে যোদ্ধা, যুদ্ধে

কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে, অর্থও প্রচুর অর্জন করিবে—

তবু সে বলিতে পারে নাই। বিক্ষুব্ধ মন লইয়া সে শয়ন করিতে গিয়াছিল। তারপর তন্দ্রার ঘোরে সে পিতামাতা ও শফরীর সঙ্গে তর্ক করিয়াছে, স্বপ্নে মেরুকাকে ভগিনী বলিয়া চুম্বন করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে, আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে—এইভাবে অর্ধেক রাত্রি কাটিয়াছে।

শফরীর চুম্বনে ঘুম ভাঙিয়া সে উঠিয়া বসিল। চোখের জড়িমা দূর হইলে দেখিল, মেরুকা নয়, শফরী। তাহার মন অপ্রত্যাশিতভাবে স্বস্থ ও নিরুদ্বেগ হইল। শফরী একাকিনী, তাহাকে সে সব কথা বলিতে পারিবে। শফরীর সহিত তাহার মনের একটি সংযোগ আছে, নাড়ীর যোগ, শফরী তাহার মনের কথা বুঝিতে পারে। তাহাকে মেরুকার কথা বলিলে সে বুঝিবে।

সোমভদ্র শফরীর হাত ধরিয়া তাহাকে শয্যার পাশে বসাইল, চুপি চুপি বলিল—'শফরী, তোর সঙ্গে কথা আছে।'

শফরী তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল—'কি কথা?'

প্রায় আলিঙ্গনবদ্ধভাবে বসিয়া দু'জনের মধ্যে হ্রস্বকণ্ঠে কথা হইতে লাগিল। জোরে কথা বলিলে মা-বাবার ঘুম ভাঙিয়া যাইতে পারে।

সোমভদ্র বলিল—'আমি একটা মেয়েকে ভালবেসে ফেলেছি। কী সুন্দর মেয়ে, একবার দেখলে তুইও ভালবেসে ফেলবি।'

সোমভদ্রের বাহুবেষ্টনের মধ্যে শফরীর দেহ শক্ত হইয়া উঠিল—'কে সে?'

সোমভদ্র বলিল—'তার নাম মেরুকা, যাদের আমরা যুদ্ধে বন্দিনী করে এনেছি তাদেরই একজন। বন্দিনী হলেও উঁচু ঘরের মেয়ে। আমি তাকে বোন বলে ডেকেছি, তাকেই বিয়ে করব।'

শফরীর মেরুযষ্টি লৌহশঙ্কুর ন্যায় ঋজু হইয়া রহিল, সে ধীরে ধীরে বলিল—'তাকে বিয়ে করবে। কিন্তু সে তো তোমার সত্যিকার বোন নয়।'

সোমভদ্র বলিল—'নাই বা হল সত্যিকার বোন। যার সঙ্গে ভালবাসা হয় সেই তো বোন। ভেবে দ্যাখ, যার সত্যিকার বোন নেই তার কী হয়? সে তো বাইরের মেয়েকে বিয়ে করে। আমিও তেমনি বাইরের মেয়েকে বিয়ে করব।'

শফরীর জিহ্বা শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। অনেকক্ষণ পরে সে বলিল—'কিন্তু ওর তো ঘর নেই। ওকে নিয়ে তুমি যাবে কোথায়?'

'অবশ্য স্ত্রীর ঘরেই স্বামীকে যেতে হয়। কিন্তু ওর যখন ঘর নেই তখন বাবাকে বলব এই বাড়িতেই আমাদের স্থান দিতে। তা যদি তিনি না দেন তখন আলাদা ঘর বাঁধব।'

'আর আমি? আমার কি হবে?' কথাগুলি শফরী অতিকষ্টে কণ্ঠ হইতে বাহির করিল।

সোমভদ্র তাহার কণ্ঠস্বরের মর্মান্তিক শুষ্কতা লক্ষ্য করিল না, সাগ্রহে বলিল—'তুইও আমার মত বাইরে বিয়ে করবি। শাস্ত্রে বলেছে মাঝে মাঝে বাইরে বিয়ে করতে হয়, নইলে বংশের অধোগতি হয়। কিন্তু তুই যদি নিতান্তই বাইরের মানুষকে ঘরে না আনতে চাস—তাহলে শ্যেনভদ্র তো রয়েছে! দু'চার বছরের মধ্যে ও জোয়ান হয়ে উঠবে—'

শফরী সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল—'আমি যদি বিয়ে না করি তাতেই বা ক্ষতি কি? তোমার যা ইচ্ছা তুমি তাই কর।—আচ্ছা, এবার ঘুমোও।'

সোমভদ্র তাহার হাত টানিয়া বলিল—'আমি ভোর না হতেই চলে যাব মেরুকাকে

আনতে। মা-বাবাকে তুই কথাটা শুনিয়ে রাখিস।'

'আচ্ছা—' শফরী তাহার হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। সোমভদ্র অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে আবার শয়ন করিল। এ ভালই হইল। পিতামাতাকে নিজের মুখে কিছু বলিতে হইবে না।

শফরী নিজের কক্ষে ফিরিয়া গেল, অনেকক্ষণ শয্যায় মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। মন বুদ্ধি অবশ হইয়া গিয়াছিল, আবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল; তখন সে শয্যায় উঠিয়া বসিল।

তাহার হৃদয় হিংসায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। কোথাকার একটা ঘৃণ্য বিজাতীয়া বন্দিনী রূপের লোভ দেখাইয়া তাহার ভাইকে ভুলাইয়া লইবে। না না, আমি দিব না। আমার ধন দিব না, তার চেয়ে—

শয্যা হইতে উঠিয়া শফরী দেওয়ালের কুলঙ্গী হইতে একটি শল্য তুলিয়া লইল। পিত্তল নির্মিত তীক্ষ্ণধার শল্য। শফরীর পিতা একজন অতি নিপুণ ধাতুশিল্পী, তিনি এই শল্যটি স্বহস্তে নির্মাণ করিয়া কন্যাকে উপহার দিয়াছিলেন। শফরী শল্যটির সূক্ষ্ম অণি নিজের বুকের মাঝখানে ফুটাইয়া পরখ করিল, তারপর আবার শয্যায় আসিয়া বসিল।

সোমভদ্র নিজ শয্যায় ঘুমাইতেছে। তাহার মন ওই মায়াবিনী রাক্ষসীর রূপে নিমজ্জিত হইয়া আছে; হয়তো ঘুমাইয়া তাহাকে স্বপ্ন দেখিতেছে। কাল সকালেই সে রাক্ষসীকে আনিতে যাইবে। না না, তার পূর্বেই—। সোমভদ্রের বুকের মাঝখানে, যেখানে সে চুম্বন করিয়াছিল, ঠিক সেইখানে এই শল্য বসাইয়া দিবে; তারপর শল্য নিজের বুকে বিঁধিয়া দিয়া দু'জনে একসঙ্গে পরলোকে যাইবে। জন্মাবধি যে বন্ধন আরম্ভ হইয়াছিল, মৃত্যুর পরও তাহা ছিন্ন হইবে না। একই তরণীতে হাত ধরাধরি করিয়া তাহারা মৃত্যু-নদীর খরস্রোত পার হইবে।

শফরী দৃঢ়মুষ্টিতে শল্য ধরিয়া সোমভদ্রের শয্যাপাশে গিয়া দাঁড়াইল, তাহার নিশ্চিন্ত নিদ্রিত মুখের পানে চাহিল। সহসা অদম্য রোদনের বেগ তাহার বক্ষ হইতে কণ্ঠ পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল। অতি কষ্টে বাষ্পোচ্ছ্বাস সংবরণ করিয়া সে ফিরিয়া গেল, নিজের শয্যায় পড়িয়া অশ্রুর উৎস মুক্ত করিয়া দিল। না, সোমভদ্রের বুকে সে শল্য বিঁধিতে পারিবে না।

শুইয়া শুইয়া অসহায়ভাবে সে মেরুকাকে গালি দিতে লাগিল—রাক্ষসী! পিশাচী! ডাকিনী!—পিশাচী! রাক্ষসী! ডাকিনী!

নদীতীর হইতে একটা সারসের কেংকার ভাসিয়া আসিল। শফরীর মনে হইল, সারস বলিল—ডাকিনী!

ডাকিনী! এতক্ষণ শফরীর স্মরণ ছিল না, নদীতীরে শর-কাণ্ডের কুটীরে এক ডাকিনী বাস করে। ডাকিনী তন্ত্রমন্ত্র জানে, মারণ বশীকরণ জানে। শফরী নদীতীরে তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছে, দু'একবার কথাও বলিয়াছে, শীর্ণ কৃষ্ণকায়া বিকট-দশনা বৃদ্ধা, প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় বাস করে। কিন্তু রাত্রে তাহার কাছে লোক আসে, যাহারা মন্ত্রৌষধির বলে গোপন অভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে চায় তাহারা অন্ধকারে গা ঢাকিয়া চুপি চুপি ডাকিনীর কাছে আসে।

শফরী ক্ষণকাল নিশ্চল বসিয়া রহিল। তারপর উঠিয়া নিঃশব্দে গৃহের বাহির হইল। তীক্ষ্ণ শল্যটি বস্ত্রের মধ্যে লুকাইয়া লইল। সে ডাকিনীর কাছে যাইবে, ডাকিনীর মন্ত্র-

ধলে শত্রু নিপাত করিবে।

গৃহ হইতে অল্প দূরে শরবনের মধ্যে ডাকিনীর কুটীর; কুটীরের মাঝখানে মাটির উপর অঙ্গার কুণ্ড। কিন্তু অঙ্গারের রক্তাভ আলোকে কুটীরের মধ্যে মানুষ দেখা যাইতেছে না।

শফরী শঙ্কিত বক্ষে দ্বারের বাহিরে কিয়দ্দূরে আসিয়া দাঁড়াইল; বেশী কাছে যাইতে ভয় করে। সে কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল—'ডাকিনি।'

যেন মন্ত্রবলে ডাকিনী তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইল; বিকট হাসিয়া বলিল—'বিদেশিনী তোর ভাই-এর মন কেড়ে নিয়েছে, তাই এসেছিস?'

শফরী ভয় ভুলিয়া গেল, ডাকিনীর হাত ধরিয়া আবেগভরে বলিল—'হ্যাঁ ডাকিনি, তুই আমার ভাইকে ফিরিয়ে দে।'

ডাকিনীর আঙুলে দীর্ঘ নখ, সে নখযুক্ত আঙুল শফরীর মুখে বুলাইয়া বলিল—'ভাই ওমনি পাওয়া যায় না। কি দিবি?'

শফরী বলিল—'তুই যা বলবি তাই দেব।'

'বুকের রক্ত দিতে পারবি?'

'পারব।'

'তবে তাই দে।' বলিয়া ডাকিনী শফরীর বুকের সামনে নিজ করতল গণ্ডূষ করিয়া ধরিল।

শফরী শল্য বাহির করিয়া নিজের বুকে আঁচড় কাটিল, দরদর করিয়া রক্ত ডাকিনীর গণ্ডূষে পড়িতে লাগিল। গণ্ডূষ পূর্ণ হইলে ডাকিনী বলিল—'এতেই হবে। তুই দাঁড়া, আমি আসছি।'

সে কুটীরে প্রবেশ করিল। শফরী রক্তক্ষরিত বক্ষে বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, অঙ্গার-কুণ্ডের সম্মুখে নতজানু হইয়া ডাকিনী পূর্ণ করতল আগুনের উপর উপুড় করিয়া দিল। অগ্নি ক্ষণকাল স্তিমিত হইয়া রহিল, তারপর দপ্ করিয়া শিখা তুলিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ডাকিনী তখন মন্ত্র পড়িতে পড়িতে বামাবর্তে অগ্নি পরিক্রমণ করিতে লাগিল।

অন্ধকারে দাঁড়াইয়া শফরী কম্প্রবক্ষে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল।

অগ্নিশিখা প্রশমিত হইলে ডাকিনী ধুনী হইতে এক টিপ ভস্ম লইয়া শফরীর কাছে ফিরিয়া আসিল, বলিল—'ভয় নেই, ভাইকে ফিরে পাবি। বিদেশিনী তোর ভাইকে কেড়ে নিতে পারবে না।'

রুদ্ধশ্বাসে শফরী বলিল—'পারবে না?'

'না, আমার মন্তর মিথ্যে হয় না!—এই ভস্ম বুকের কাটায় লাগিয়ে দে, কাটা জুড়ে যাবে।'

ভস্ম লইয়া শফরী বুকে মাখিল; মনে হইল ভস্ম নয়, চন্দন। ডাকিনী তখন বলিল—'এবার আমায় কি দিবি বল।'

'তোমায় কী দেব?' ডাকিনীকে শফরীর অদেয় কিছুই ছিল না, কিন্তু সঙ্গে যে কিছুই নাই! সে অমূল্য শল্যটি ডাকিনীর হাতে দিয়া বলিল—'এই নাও। আমার বাবা আমার জন্যে নিজের হাতে গড়ে দিয়েছেন, সারা দেশে এর জোড়া নেই।'

'দে দে—' শল্য লইয়া ডাকিনী কুটীরে ফিরিয়া গেল। শফরী দেখিল, সে শল্যটি আগুনের কাছে ধরিয়া লোলুপ চক্ষে দেখিতেছে এবং শিশুর মত খিলখিল করিয়া হাসিতেছে।

টলমল উদ্বেল হৃদয়ে শফরী গৃহে ফিরিয়া গেল। আশার উৎকণ্ঠায় সারা রাত্রি

শয্যায় পড়িয়া জাগিয়া রহিল।

বন্দিনীদের অবরোধে মেরুকাও সারা রাত্রি ঘুমায় নাই। ঊষার উদয়ে সোমভদ্র আসিবে, তাহার প্রতীক্ষায় জাগিয়া আছে। গৃহহীনা বন্দিনী গৃহ পাইবে, স্বামী পাইবে, মেষ-ছাগের মত দাসীহাটে বিক্রীত হইতে হইবে না। তাই আশার উৎকণ্ঠায় তাহার চোখে ঘুম নাই।

ঊর্ধ্বে নক্ষত্রগুলি ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া আসিল, আকাশের অগ্নিকোণে যে উজ্জ্বল নক্ষত্রটি সূর্যোদয়ের পূর্বে উদিত হইলে নদীতে জল বাড়ে, সেই নক্ষত্রটি দপদপ করিতে লাগিল। ক্রমে সে নক্ষত্রটিও নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল; প্রত্যুষের ধূসর আলো অলক্ষিতে পরিস্ফুট হইতে লাগিল।

সোমভদ্র কিন্তু আসিল না। মেরুকার ব্যাকুল চক্ষু নগর-দ্বারের দিকে চাহিয়া আছে—ঐ বুঝি সে আসিতেছে! ঐ বুঝি সোমভদ্র!

কিন্তু না, যাহারা আসিতেছে তাহাদের মধ্যে সোমভদ্র নাই। অন্যান্য সেনাপতিরা আসিতেছেন, তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়া বাছাই করিয়া নির্ধারিত সংখ্যক বন্দী-বন্দিনী লইয়া যাইবেন। সকলের সঙ্গে বহু সশস্ত্র রক্ষী।

সূর্যোদয় হইলে সেনাপতিরা বন্দিনীদের অবরোধে প্রবেশ করিলেন। আর আশা নাই। মেরুকার বুক ফাটিয়া নিশ্বাস বাহির হইল। যুদ্ধে বন্দিনী ক্রীতদাসীর ভাগ্য এত শীঘ্র সুপ্রসন্ন হইবে, ইহা সে কেমন করিয়া আশা করিয়াছিল? ছিন্নমূল লতায় কি ফুল ফোটে!

মেরুকা মনে মনে নিজের ভবিষ্যৎ জীবন কল্পনা করিল। একজন মাংসলোলুপ সেনাপতি তাহাকে লইয়া যাইবেন। কিছুদিন পরে তাহার ভোগতৃষ্ণা চরিতার্থ হইলে তিনি তাহাকে দাসীহাটে বিক্রয় করিবেন। কোনও মধ্যবিত্ত ব্যক্তি তাহার ক্লান্ত-যৌবন দেহটা ক্রয় করিবে। আবার কিছুকাল পরে সেও তাহাকে কোনও দরিদ্র কৃষকের কাছে বিক্রয় করিবে। তারপর একদিন তাহার ভগ্ন জীর্ণ দেহটা নদীর গর্ভে সমাধি লাভ করিবে। ইহাই তাহার জীবনের সুনিশ্চিত পরিণাম।

অমোঘভল্ল নামক এক সেনাপতি মেরুকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বয়স অনুমান চল্লিশ, দৃঢ় গঠন, মাংসল দেহ, ললাটে গভীর অস্ত্রক্ষত চিহ্ন, চক্ষে কর্তৃত্বের অভিমান। আঠারো বছর হইতে চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ করিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, জীবনে সারবস্তু কেবল দুইটি আছেঃ শত্রুর শোণিত এবং নারীর যৌবন। মেরুকার দেহ নিরাবরণ করিয়া তিনি ভোগপ্রবীণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলেন, চিবুক ধরিয়া তাহার মুখ তুলিয়া চোখের উপর চোখ রাখিয়া সহজ গম্ভীর স্বরে বলিলেন—'নাম কি?'

তুষারশীতল কণ্ঠে মেরুকা নাম বলিল।

অমোঘভল্ল প্রশ্ন করিলেন—'হাসতে জানো?'

অন্তরে বিদ্বেষের তুষানল জ্বালিয়া মেরুকা দশনপ্রান্ত উন্মোচিত করিয়া মুখে হাসির ভঙ্গিমা করিল।

সেনাপতি অমোঘভল্ল সন্তুষ্ট হইলেন। মেরুকার কণ্ঠস্বর মিষ্ট, দন্তপংক্তি সুন্দর। তিনি দুইজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন—'একে আমার প্রমোদ-বাটিকায় নিয়ে যাও।'

মেরুকা একবার চোখ তুলিয়া মহানায়ক অমোঘভল্লের পানে চাহিল, তারপর নিঃশব্দে দুই ভৃত্যের মধ্যবর্তিনী হইয়া দাঁড়াইল। ভৃত্যেরা তাহার দেহে একখণ্ড লঘু

উত্তরীয় জড়াইয়া দিল।

সোমভদ্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

শফরীর সহিত কথা বলিবার পর তাহার মন নিরুদ্বেগ হইয়াছিল, সে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। একেবারে ঘুম ভাঙ্গিল যখন সূর্যোদয় হইতেছে। সে কিছুক্ষণ জড়বৎ বসিয়া রহিল, তারপর স্মৃতিশক্তি ফিরিয়া আসিলে মুখে অব্যক্ত শব্দ করিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিল।

সেনাপতি অমোঘভল্লের ভৃত্যদ্বয় মেরুকাকে দোলায় তুলিবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় সোমভদ্র সৈন্যব্যূহের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

'মেরুকা!'

মেরুকা উচ্চকিত হইয়া দেখিল সোমভদ্র ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে। তাহার অন্তরের সমস্ত হতাশা কঠিন-তিক্ত বিদ্বেষে পরিণত হইল, চক্ষু হিমশীতল উপলখণ্ডের ন্যায় নিষ্প্রাণ হইয়া গেল। সে সোমভদ্রের দিকে পিছন ফিরিয়া দোলায় আরোহণের উপক্রম করিল।

সোমভদ্র ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—'মেরুকা! তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

সেনাপতি অমোঘভল্লের ভৃত্যেরা সোমভদ্রকে চিনিত না, একজন রূঢ়হস্তে তাহাকে সরাইয়া দিয়া বলিল—'সাবধান! দূরে থাকো।'

সোমভদ্র ক্রোধ-দীপ্ত চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া বলিল—'আমি সেনানায়ক সোম-ভদ্র। তোমরা কে? একে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'

নাম শুনিয়া ভৃত্যেরা নরম হইল, বলিল—'আমরা মহানায়ক অমোঘভল্ল মহাশয়ের ভৃত্য। মহানায়ক এই বন্দিনীকে নির্বাচন করেছেন। তাই ওকে তাঁর প্রমোদ-বাটিকায় নিয়ে যাচ্ছি।'

মেরুকা তখন দোলায় উঠিয়া বসিয়াছে, দারুগঠিত মূর্তির ন্যায় দেহ কঠিন করিয়া বসিয়া আছে। সোমভদ্র একবার তাহার পানে চাহিল, একবার ভৃত্যদের পানে চাহিল। তারপর দৃঢ় আদেশের সুরে বলিল—'তোমরা দাঁড়াও, চলে যেও না। আমি মহানায়ক অমোঘভল্লের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি।'

সোমভদ্র দ্রুত ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিল। ভৃত্যদ্বয় ফাঁপরে পড়িয়া কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে মন্ত্রণা করিল, তারপর দোলা তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। তাহাদের কাছে প্রভুর আদেশই গরিষ্ঠ।

দোলার মধ্যে মেরুকা দারু-পুত্তলীর ন্যায় বসিয়া রহিল। নিয়তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে নাই, তাহাতে নিয়তি আরও নিষ্ঠুর হইয়া ওঠে। হয়তো এই বৃষস্কন্ধ প্রবীণ যোদ্ধার অন্তরে দয়া-মায়া আছে, হয়তো সে চিরদিনের জন্য তাঁহার গৃহে আশ্রয় পাইবে, হয়তো—হয়তো—

দূর্বাঘাসের মত আশা মরিয়াও মরে না। বুদ্ধির দর্পণে অনিবার্য ভবিষ্যৎ দেখিয়াও মরিতে চায় না—

সোমভদ্র বন্দিনীদের আবেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, মহানায়ক অমোঘভল্ল একটি বন্দিনীর বস্ত্র মোচন করিয়া পরীক্ষা নিরীক্ষা করিতেছেন। তিনি পাঁচটি বন্দিনী পাইবেন, এটি দ্বিতীয়। সোমভদ্রকে আসিতে দেখিয়া অমোঘভল্ল পরম সমাদরের সহিত তাহাকে সম্বোধন করিলেন—'দেখ তো সোমভদ্র, এই বন্দিনীটাকে বেশ শক্ত-সমর্থ মনে

হচ্ছে। আমার বিহার-নৌকার দাঁড় টানতে পারবে?'

সোমভদ্র একবার বন্দিনীর প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া নিরুৎসুক কণ্ঠে বলিল—'পারবে।' তারপর ব্যগ্রস্বরে কহিল—'মহানায়ক, আপনার সঙ্গে আমার আড়ালে একটা কথা আছে।'

মহানায়ক অমোঘভল্ল ঈষৎ বিস্ময়ে একটু সরিয়া আসিয়া বলিলেন—'কি কথা?'

সোমভদ্র অধর লেহন করিয়া বলিল—'মহানায়ক, যে-বন্দিনীকে আপনার ভৃত্যেরা নিয়ে যাচ্ছে, সে—সে—'

অমোঘভল্ল বলিলেন—'যে বন্দিনীটার নাম মেরুকা তার কথা বলছ?'

'হ্যাঁ মহানায়ক। মেরুকা—আমি—আমি তাকে নিতে চাই। তাকে—'

অমোঘভল্ল উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া বলিলেন, 'এখন আর হয় না বন্ধু। আমি তাকে হস্তগত করেছি। জানো তো, যে আগে আসে সে আগে পায়।'

সোমভদ্র বলিল 'কিন্তু—আপনি আমাকে এই অনুগ্রহ করুন ভদ্র। আমি মেরুকাকে বিবাহ করতে চাই।'

অমোঘভল্লের হাস্যমুখ সহসা গম্ভীর হইল। তিনি বলিলেন—'বিবাহ! তুমি একটা বিদেশিনী বন্দিনীকে বিবাহ করতে চাও!'

সোমভদ্র অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—'হ্যাঁ মহানায়ক, আমার হৃদয় মেরুকাকে চায়। আমি তাকে বিয়ে করে সংসার পাততে চাই।'

অমোঘভল্ল ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন—'তোমার গৃহে ভগিনী নাই?'

সোমভদ্র চক্ষু নত করিয়া বলিল—'আছে ভদ্র।'

'যুবতী ভগিনী? বিবাহযোগ্যা?'

'হ্যাঁ ভদ্র।'

অমোঘভল্ল তখন গভীর ভর্ৎসনার কণ্ঠে বলিলেন—'ধিক সোমভদ্র। গৃহে বিবাহযোগ্যা যুবতী ভগিনী থাকতে তুমি একটা অজ্ঞাতকুলশীলা অজ্ঞাতচরিত্রা বন্দিনীকে বিবাহ করতে চাও! ওরা তো দু'দিনের সম্ভোগের সামগ্রী, ওরা কি ভগিনীর পদ অধিকার করার যোগ্য? তুমি সদ্বংশজাত, তুমি রাজ্যের একজন সেনানায়ক; তুমি যদি এমন কুদৃষ্টান্ত স্থাপন কর, তাহলে সামান্য লোকে কী করবে? জাতির সংস্কৃতি বিজাতীয় ভাবের বন্যায় ভেসে যাবে। তাছাড়া তুমিও সুখী হতে পারবে না। যার সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ নেই, সে কি কখনও হৃদয়ের আত্মীয় হতে পারে? সে কি গৃহের গৃহিণী হতে পারে?'

কিন্তু উপদেশ বাক্যে সোমভদ্রের রুচি নাই। সে ত্বরান্বিত কণ্ঠে বলিল—'মহানায়ক, অনুগ্রহ করুন, মেরুকাকে দান করুন।'

অমোঘভল্ল দৃঢ়স্বরে বলিলেন—'কখনই না। তুমি উন্মত্ত, জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়েছ; তোমাকে প্রশ্রয় দিলে তোমারই সর্বনাশ হবে। যাও, গৃহে ফিরে যাও, আপন ভগিনীকে বিবাহ কর।'

সোমভদ্র কিছুক্ষণ বুদ্ধিভ্রষ্টের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার অন্তর বিদ্রোহ করিতে চাহিল; কিন্তু সে যোদ্ধা, আদেশ লঙ্ঘনে অনভ্যস্ত। সে টলিতে টলিতে ফিরিয়া চলিল।

অমোঘভল্ল সদয়কণ্ঠে তাহাকে ডাকিলেন—'শোনো সোমভদ্র।'

সোমভদ্র আবার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। অমোঘভল্ল সস্নেহে তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন—'হতাশ হয়ো না। চুপি চুপি একটা কথা বলি শোনো। দু' মাস পরে হোক ছ'মাস পরে হোক মেরুকাকে আমি বিক্রি করব। তখন যদি তুমি ওকে চাও,

তাহলে তোমার হাতেই ওকে বিক্রি করব, অন্য কাউকে দেব না। ইতিমধ্যে তুমি তোমার ভগিনীকে বিবাহ করে সংসারী হও। কেমন?'

সোমভদ্র আর সেখানে দাঁড়াইল না।

অদূরে শক্ত-সমর্থ বন্দিনীটা এতক্ষণ নগ্নদেহে অপেক্ষা করিতেছিল, মহানায়ক অমোঘভল্ল হাসিতে হাসিতে তাহার কাছে ফিরিয়া গেলেন।

ওদিকে শুষ্ক চক্ষু মেলিয়া শফরী শয্যায় পড়িয়া ছিল। সূর্যোদয় কালে সোমভদ্র যখন ছুটিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল, তখন সে দুঃস্বপ্নময় চিন্তার জাল সরাইয়া শয্যা হইতে উঠিল। ইতিমধ্যে পিতামাতাও জাগিয়াছেন। শফরী তাঁহাদের কাছে গিয়া সোমভদ্রের সংকল্পের কথা জানাইল, তারপর সহসা মায়ের গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মাতাপিতা প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। তারপর মাতা শফরীকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সান্ত্বনা দিতে গিয়া নিজেই অসংবৃত হইয়া পড়িলেন। পিতার মাথায় ঝাঁকে ঝাঁকে দুশ্চিন্তা আসিয়া জুটিল। সোমভদ্র বয়ঃপ্রাপ্ত এবং স্বাধীন, তাহাকে শাসন করা যায় না...বিজাতীয়া নারীকে বিবাহ করিয়া সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে... এরূপ বিবাহ কখনো সুখের হয় না; মিশ্র রক্তের সন্তানসন্ততি কখনো ভাল হয় না, উন্মার্গগামী হয়...এদিকে শফরীর কি হইবে...শ্যেনভদ্র নিতান্ত বালক; অগ্রজার সহিত অনুজের বিবাহ নিষিদ্ধ না হইলেও বাঞ্ছনীয় নয়...বাহিরের পাত্র ঘরে ডাকিয়া আনিতে হইবে; ধাতুপ্রকৃতির বিষমতায় সংসারের সুখশান্তি নষ্ট হইবে, খাল কাটিয়া কুমীর আনা এবং বাহিরের জামাতা ঘরে আনা একই কথা...সোমভদ্র এ কী করিল। অন্ধমোহের বশে সুখের সংসার ছারখার করিয়া দিল!

সকলের মনে বিষণ্ণ ব্যাকুলতা, সকলের দৃষ্টি বাহিরের দিকে। ওই বুঝি বধূর হাত ধরিয়া সোমভদ্র আসিতেছে! শফরী ভাবিতেছে, বধূকে দেখিয়া সে কী করিবে? সংযম হারাইবে না তো?

কিন্তু প্রভাত বহিয়া গেল, সোমভদ্র ফিরিল না। সকলের মন উৎকণ্ঠিত; শফরীর মনে ক্ষীণ আশা ঝিকমিক করিতে লাগিল—তবে কি ডাকিনীর মন্ত্রতন্ত্র ফলিয়াছে। তবে কি—?

দ্বিপ্রহরেও যখন সোমভদ্র ফিরিল না, তখন পিতা চিন্তিত মুখে তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইলেন। মাতা শংকা-ভরা বুকে রন্ধনশালায় গেলেন। শফরী অঙ্গনে ছটফট করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তারপর হঠাৎ তাহার বুক সন্ত্রাসে চমকিয়া উঠিল। বাল্যকাল হইতে সোমভদ্রের অভ্যাস ছিল, যখনই কোনও কারণে তাহার মন খারাপ হইত, তখনই সে নদীর ধারে গিয়া বসিয়া থাকিত। একবার শফরীর প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিল—বড় শান্ত শীতল ওই নদীর জল। যেদিন এ পৃথিবী আর ভাল লাগবে না, সেদিন ওর তলায় গিয়ে শুয়ে থাকব।

আতঙ্ক-শরবিদ্ধ হৃদয় লইয়া শফরী হরিণীর মত নদীতীরে ছুটিল।

জলের কিনারে একটি বালিয়াড়ির আড়ালে সোমভদ্র পাশ ফিরিয়া শয়ান রহিয়াছে, অলস হস্তে নুড়ি কুড়াইয়া একটি একটি করিয়া জলে ফেলিতেছে। শফরী তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, সে দেখিতে পাইল না। অন্তরের অতল গুহায় ডুবিয়া আছে।

শফরী মৃদু গদগদ স্বরে ডাকিল—'ভাই!'

সোমভদ্রের নিরুৎসুখ চক্ষু শফরীর দিকে ফিরিল। শফরীর বুকের মাঝখানে কাটা

দাগের উপর দৃষ্টি পড়িল। সে বলিল—'কি করে কেটে গেল?'

শফরী ভঙ্গুর হাসিয়া বলিল—'কাটেনি। ঘুমের ঘোরে নখ দিয়ে আঁচড়ে ফেলেছি। চল, বাড়ি চল।'

সোমভদ্রের চোখে একটু সচেতনতা দেখা দিল, সে বলিল—'বাড়ি? কেন?'

'সারাদিন খাওনি। এস।' শফরী সোমভদ্রকে কোনও প্রশ্ন করিল না, শুধু হাত বাড়াইয়া দিল। সোমভদ্র হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, আর কোনও কথা না বলিয়া শফরীর পাশে পাশে বাড়ির দিকে চলিল।

কয়েক মাস পরে একদিন অপরাহ্ণে শফরী অঙ্গনের দ্বারের কাছে ঘোরাঘুরি করিতেছিল। প্রাতঃকালে সোমভদ্র কয়েকজন বন্ধুর সহিত নদীর পরপারে মৃগয়ায় গিয়াছে, এখনও ফিরিয়া আসে নাই।

দূরে সোমভদ্রকে আসিতে দেখা গেল। তাহার স্কন্ধে ধনু, পৃষ্ঠে মৃত হরিণ-শিশু, মুখে পরিতৃপ্তির হাসি। শফরী হর্ষসূচক শব্দ করিয়া তীরের মত তাহার দিকে ছুটিল। পিতামাতা অঙ্গনের বেদিকার উপর বসিয়া ছিলেন, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। সোমভদ্র আসিতেছে।

শফরীকে আসিতে দেখিয়া সোমভদ্র দাঁড়াইল; ধনু ও হরিণ মাটিতে নামাইয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া দিল। শফরী নীড়প্রত্যাশী পাখির মত তাহার বাহুবেষ্টনের মধ্যে প্রবেশ করিল। বহুদিন পরে সে সোমভদ্রের মুখে সেই পুরাতন অকুণ্ঠ হাসি দেখিয়াছে। এতদিন পরে বিদেশিনী কুহকিনীর মোহজাল ছিঁড়িয়া সোমভদ্র তাহার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে।

শফরী মুখ তুলিয়া ক্ষুধিত চক্ষে সোমভদ্রের পানে চাহিল। সোমভদ্র তাহার অধরে চক্ষে ললাটে চুম্বন করিল। শফরী দ্রুত নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিল—'বলো ভগিনী—বলো বহিন—বলো বোন।'

সোমভদ্র বলিল—'ভগিনী—বহিন—বোন।'

অতঃপর মন শান্ত হইলে শফরী ধনু ও হরিণ তুলিয়া লইল। দু'জনে গৃহে প্রবেশ করিল।

সোমভদ্র পিতার সম্মুখে গিয়া সলজ্জ অনুযোগের স্বরে বলিল—'বাবা, আমাদের বিয়ে দেবে কবে?'

পিতা সচকিতে পুত্র ও কন্যার মুখের পানে চাহিলেন, তারপর কোমল গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—'এখনি পুরোহিতের কাছে যাচ্ছি।'

সোমভদ্র ও শফরী গৃহের অভ্যন্তরে চলিয়া গেল। পিতামাতা পরস্পরের পানে চাহিয়া হাসিলেন। মাতার চক্ষু আনন্দে বাষ্পাচ্ছন্ন হইল।

তাঁহারাও ভ্রাতা-ভগিনী।

এইবার কাহিনীর স্থান কাল বলা যাইতে পারে। ঘটনাস্থল প্রাচীন মিশর; ঘটনাকাল আজ হইতে অনুমান পাঁচ হাজার বছর পূর্বে। মিশরবাসীরা তখন চক্রযানের ব্যবহার জানিত না, লৌহ তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই, অশ্বের সহিত মনুষ্য জাতির পরিচয় ছিল না। যে মানুষগুলির কাহিনী লিখিলাম, তাহারা কিন্তু আমাদের মতই মানুষ ছিল।